॥ শ্রীহরিঃ ॥

1996

स्तुति (बँगला)

সোমনাথ মুখার্জী

गीताप्रेस गोरखपुर
GITA PRESS, GORAKHPUR

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিনম্র নিবেদন

স্তুতি মানুষকেও করা হয়, দেবতাদেরও হয় আবার ভগবানকেও করা হয়। তবে মানুষের প্রতি স্তুতিতে অতিশয়োক্তি থাকে, তা নাহলে স্তুত ব্যক্তি পরিতোষ লাভ করে না।

দেবতার প্রতি স্তুতি হল তাঁদের স্বরূপ বর্ণন, তাতেই তাঁরা তুষ্ট হন। শ্রীশ্রীচণ্ডিকার ধ্যানে তাই বলা হয়েছে—

ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীং।
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ॥
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাম্।

(শ্রীশ্রীচণ্ডিকার ধ্যান ১)

অর্থাৎ হে মা ! তুমি ত্রিনেত্রা, রক্তবসনা, উন্নতা স্তন সংযুক্তা এবং তোমার চার হাতে পুস্তক, রুদ্রাক্ষমালা, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা বিরাজমানা। তোমাকে নিত্য উত্তমরূপে ধ্যান করি। এইরূপে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার সময় তাঁদের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়।

আর ভগবানের তো অনন্ত রূপ, অনন্ত মহিমা, তাঁকে কেই বা এবং কীভাবেই বা স্তুতি করবে ? ভগবান যাকে যতটুকু কৃপা করেন সে তার হৃদয়ের সেই প্রকটিত ভাব নিয়ে, ততটুকুই স্তুতি করতে পারে। মহাভারতে ভীষ্ম উক্ত বিষ্ণুসহস্রনাম, তণ্ডিপ্রোক্ত শিবসহস্রনাম আদি স্তব হল ভগবানের বিভূতির কণামাত্র আর তা ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মাদের দ্বারা স্তুত। আমাদের এই গ্রন্থে ভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত এইরূপ ঋষি-মহাত্মা, দেবতাদের স্তুত ভগবৎ স্তুতিই আলোচিত হয়েছে।

* * *

এই স্তুতি বা প্রার্থনা কেবল শব্দের সমষ্টিমাত্র নয়, এ হল ভক্তের ভগবৎ পিপাসা ও নির্ভরতার সুস্পষ্ট প্রকাশ। স্তুতি আনে ভক্তহৃদয়ে তুষ্টি, আবার আরাধ্য দেবতার মনেও তার প্রতিফলন হয়। হৃদয়ের গভীরতাসহ অশ্রুজলে

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে ভক্তের চেতনার ধারা ঊর্ধ্বে ওঠে। যাঁরা স্তবে প্রবৃত্ত হন তাঁদের মনে ও শরীরে যে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার ভাব কিভাবে ফুটে ওঠে তা 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর মহিষতন্ত্রী-স্তুতি'র প্রথম শ্লোকে প্রকাশ পেয়েছে। দেবতাগণ দেবীর স্তবে প্রবৃত্ত হলে তাঁদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—**'প্রণতিনম্র শিরোধরাংসাঃ'** আর **'প্রহর্ষপুলকোদ্‌গম-চারুদেহা'**। অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন প্রণতিশীল। তাঁদের গ্রীবা ও স্কন্ধ আনত। আনন্দে তাঁদের দেহ রোমাঞ্চিত। অন্তরের পুলকবশত তাঁদের দেহের সুকুমারতা যেন অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

ভগবৎ স্তুতির ভাব ভক্তের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে প্রকাশ পেলেও তা তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে স্ফূরিত, তাই ভগবৎ স্তুতি ভগবানের কৃপা ছাড়া সম্ভবপর নয়। ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ের ধ্রুবচরিতে বর্ণিত হয়েছে —ধ্রুব কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলে ভগবান স্বয়ং তাঁকে দর্শন দেন। ধ্রুব সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানকে দর্শনে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলেন, নয়নযুগল দ্বারা ভগবানের অনন্তরূপ সুধা পান করলেন, মুখ দ্বারা চরণ চুম্বন করলেন আর বাহু দ্বারা তাঁর চরণদ্বয় আলিঙ্গন করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর একান্ত ইচ্ছা হল ভগবানের স্তুতি করেন, কিন্তু তিনি যে পঞ্চম বর্ষীয় বালকমাত্র, স্তুতি কী করে করতে হয় তা তো তাঁর জানা নেই! কিন্তু ভগবান অন্তর্যামী, তিনি সবই বুঝলেন এবং তাঁর বেদময় শঙ্খ (জ্ঞানের প্রতীক) দ্বারা ধ্রুবর গণ্ডস্থল স্পর্শ করলেন। শঙ্খ স্পর্শ করা মাত্র ধ্রুব ভগবৎ কৃপা লাভ করলেন এবং বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় অমোঘ কীর্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের স্তবে প্রবৃত্ত হলেন।

ভগবদ্ স্তুতি সর্বজনীন তাই দেবতারা বা সাধকেরা তা কেবল নিজের জন্যই প্রার্থনা করেন না, তাঁরা সর্বভূতের কথা চিন্তা করেও প্রার্থনা করেন। তাই চণ্ডীর মহিষতন্ত্রী স্তুতির শেষে দেবী বর প্রদানে উদ্যত হলে, দেবতারা বলছেন—

যশ্চ মর্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে।
তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্।। (শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।৩৬-৩৭)

অর্থাৎ হে দেবী ! তুমি যদি আমাদের প্রতি প্রসন্না হয়ে থাক তবে এই বরদান কর যে, যারাই এই স্তুতি (পাঠ) করবে, তুমি তাদের প্রতিও প্রসন্না হবে

আর তাদের প্রাচুর্য প্রদান করবে।

কিন্তু ভাব ও অধিকারী ভেদে প্রার্থনা ও আর্তিরও প্রকারভেদ হয়। চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে **'অর্গলাস্তোত্র'** পাঠের বিধান আছে। অর্গল শব্দের অর্থ হল দরজার খিল। যেমন গৃহ অর্গলাবদ্ধ থাকলে সহসা কেউ ঘরে ঢুকতে পারে না, সেইরকম অর্গলাস্তোত্র পাঠ করলে বাহ্যবিষয়সমূহ চিত্তক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না। জীব স্বভাবত বিষয়বিমুগ্ধ, বাসনার আগুনে বিদগ্ধ, তাই বাসনা পূর্ণ করার সহজ উপায় হল ভগবানকে প্রার্থনা। পুরাণে আমরা তাই ঋষি, মহাত্মা, দেবতা ছাড়াও অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ সবারই স্তুতি দেখতে পাই। উল্লিখিত এই অর্গলাস্তোত্রের প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রেরই প্রথম অর্ধে আছে ভগবানের বিভূতি বর্ণনা আর শেষার্ধে আছে প্রার্থনা—**'রূপং দেহি'**, **'জয়ং দেহি'**, **'যশো দেহি'**, **'দ্বিষো জহি'**। আবার প্রার্থনা করছেন—**'দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যম্'**, **'পত্নীং মনোরমাং দেহি'** ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সবই জাগতিক কামনা পূরণের ইচ্ছা।

অর্থাৎ—মা ! আমাকে সুন্দর দেহ দাও, স্বাস্থ্যবান করো।

মা ! আমাকে জয় দাও।

মা ! আমাকে যশ দাও।

মা ! আমার শত্রু নাশ করো।

মা ! আমাকে সৌভাগ্যবান করো, আমাকে আরোগ্য দান করো।

মা ! আমাকে মনোরমা ভার্যা দাও, যে আমার মনের মতো চলবে।

আবার এই কামনাসক্ত জীবের চিত্ত যখন আত্মাভিমুখী হয়, ভগবৎ লাভের তীব্র পিপাসা জাগে, তখন বহির্মুখী চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে আর একই স্তোত্রর ভাব ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়। তখন একই মন্ত্রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা হয়—

রূপং দেহি—অর্থাৎ মা ! জগৎময় তোমারই যে রূপ তা বুঝিয়ে দাও।

জয়ং দেহি—মা ! আমাকে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়জয়ে অধিকারী করো।

যশো দেহি—মা ! আমাকে সাধন-সমরে জয়লাভের যশ দাও।

দ্বিষো জহি—মা ! আমার সাধনার বিরোধী ভাবসমূহ দূরীভূত করো।

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যম্—মা ! তোমাকে লাভ করবার সৌভাগ্য আমাকে দাও।

পত্নীং মনোরমাং দেহি—মা আমার যেন আত্মাভিমুখী ইচ্ছাশক্তি (ভার্যা) লাভ হয় আর সেই শক্তি যেন আমার মনেরও প্রিয়তমা হয় এবং আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ যেন সেই শুভশক্তির অনুসরণ করে।

পুরাণে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ আদিরও স্তুতি আছে, আবার ধ্রুব, প্রহ্লাদেরও স্তুতি আছে এবং দেবতাদের, গোপীদেরও স্তুতি আছে। শ্রীশুকদেব মহারাজ এই সম্বন্ধে পরীক্ষিৎকে বলছেন— 'মহারাজ ! এ জগতে তিনপ্রকার মানুষ দেখতে পাওয়া যায় তারা হল—সুবুদ্ধি, বুদ্ধিমান ও নির্বোধ।' এর মধ্যে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ হরিভজনে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ মোক্ষসাধনে আর নির্বোধ ব্যক্তিগণ ভোগলালসায় কালাতিপাত করে থাকেন। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের দশটি শ্লোকে (২—১১) শুকদেব এই তিনপ্রকার মানুষের কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম আটটি শ্লোকে ভোগলালসায় আসক্ত নির্বোধ এবং নবম ও দশম শ্লোকে বুদ্ধিমান ও সুবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির কথা বলেছেন।

ব্রহ্মবর্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণস্পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্॥ ২
দেবীং মায়াং তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্যকামোঽথ বীর্যবান্॥ ৩
অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্ দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্॥ ৪
আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ॥ ৫
রূপাভিকামো গন্ধর্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সরউর্বশীম্।
আধিপত্যকামঃ সর্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্॥ ৬
যজ্ঞং যজেদ্ যশস্কামঃ কোশকামঃ প্রচেতসম্।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীম্॥ ৭

ধর্মার্থ উত্তমশ্লোকং তন্তুং তন্বন্ পিতৃন্ যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদ্‌গণান্॥ ৮
রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিং ত্বভিচরন্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্॥ ৯
অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ১০
এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্‌ভাগবতসঙ্গতঃ॥ ১১

(ভাগবত ২।৩।২-১১)

অনুবাদ—যিনি ব্রহ্মতেজ কামনা করেন তিনি বৃহস্পতিকে, যিনি ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যকামী তিনি ইন্দ্রকে এবং সন্তানকামনাযুক্ত ব্যক্তি দক্ষাদি প্রজাপতিগণের আরাধনা করবেন॥ ২ ॥ ঐশ্বর্যকামী ব্যক্তি মায়াদেবী (দুর্গা)-কে, তেজস্কামী ব্যক্তি অগ্নিকে, ধনকামী বসুদেব এবং বীর্যকামী ব্যক্তি রুদ্রগণের পূজা করবেন॥ ৩ ॥ যিনি ভোজ্য ও ভক্ষ্য বস্তু কামনা করবেন তিনি অদিতিকে ; স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি দ্বাদশ আদিত্যকে, রাজ্যাভিলাষী ব্যক্তি বিশ্বদেবতাকে এবং প্রজাদের বশ্যতাভিলাষী ব্যক্তির সাধ্যগণের আরাধনা করা উচিত॥ ৪ ॥ আয়ুলাভের ইচ্ছায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, পুষ্টিকামনায় পৃথিবীদেবীকে এবং প্রতিষ্ঠাকামনায় লোকমাতা পৃথিবী ও দ্যৌ (আকাশ)-কে পূজা করবেন॥ ৫ ॥ সৌন্দর্যলিপ্সায় গন্ধর্বদের, স্ত্রীকামনা হলে ঊর্বশীনাম্নী অপ্সরাকে এবং সকলের ওপর প্রভুত্ব কামনায় ব্রহ্মার উপাসনা করবেন ॥ ৬ ॥ যশের কামনা হলে যজ্ঞমূর্তি বিষ্ণুকে, অর্থসঞ্চয় কামনায় বরুণদেবকে ; বিদ্যা কামনায় মহাদেবকে এবং দাম্পত্যসুখ কামনায় পার্বতীর উপাসনা করবেন॥ ৭ ॥ ধর্ম উপার্জনের ইচ্ছায় শ্রীবিষ্ণুর, বংশবৃদ্ধির কামনায় পিতৃগণের, বিঘ্নবিনাশকামী ব্যক্তি যক্ষদের এবং বলের কামনায় মরুৎগণের উপাসনা করবেন॥ ৮ ॥ রাজ্যকামনায় মন্বন্তরাধিপতি দেবতাদের, অভিচারের ইচ্ছায় নির্ঋতিকে অর্থাৎ শত্রুবধকামনায় রাক্ষসের, ভোগলিপ্সায় চন্দ্রকে এবং নিষ্কাম অর্থাৎ বৈরাগ্য কামনায় পরমপুরুষ শ্রীভগবানের উপাসনা করবেন॥ ৯ ॥ বুদ্ধিমান পুরুষ

নিষ্কাম (ভক্ত) হোন অথবা সর্ববিধ কামনাযুক্তই হোন অথবা মোক্ষাভিলাষীই হোন—তিনি গভীর ভক্তিযোগ আশ্রয় করে কেবলমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকেই পূজা করবেন॥ ১০ ॥ যিনি যে কামনায় যে দেবতার আরাধনাই করুন না কেন যদি তাঁর ভগবদ্‌ভক্ত সঙ্গলাভ হয় তবে তিনি শ্রীভগবানে অচলা ভক্তি লাভ করে কৃতকৃতার্থ হন॥ ১১ ॥

বুদ্ধিমান ও সুবুদ্ধি ব্যক্তিদের হৃদয়ে সদা এই ভগবদ্বাণী '**অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ**' জাগরূক থাকে, তাই যদি কখনো তাঁদের মনে কামনার উদ্রেক হয় তাহলে তাঁরা কাম্যবস্তু পাওয়ার জন্য অন্যের শরণাপন্ন না হয়ে অখিল ফলদাতা শ্রীগোবিন্দ চরণভজনে রত হন। তবে এঁদের কামনা জাগতিক নয়, অন্য তিন প্রকারের হয়—স্বর্গাদি অনিত্য সুখ কামনা, কৈবল্য সুখ কামনা আর শ্রীগোবিন্দের চরণসেবার সুখ কামনা। প্রথম দুটি সকাম ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির দ্বারা আর শ্রীগোবিন্দ চরণারবিন্দ সেবা কামনা নিষ্কাম এবং তা সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা হয়ে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম শ্লোকে এই তিন প্রকার ব্যক্তিকে 'সর্বকাম', 'মোক্ষকাম' ও 'অকাম' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার একাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যিনি যে কামনাতাড়িত হয়ে যে দেবতারই আরাধনা (স্তুতি) করুন না কেন, তাঁর যদি ভাগ্যক্রমে শ্রীভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হয় তাহলেই তিনি শ্রীভগবানে অচলাভক্তি লাভ করে কৃতার্থ হন। ভক্তসঙ্গে শ্রীগোবিন্দ ভজনের পরমলাভ এই যে, কামনা অনুযায়ী কাম্যবস্তুও লাভ হয় আবার শ্রীগোবিন্দচরণে ভক্তি বা প্রেমলাভও হয়। এইজন্য সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মহৎসঙ্গ ও শ্রীগোবিন্দ ভজনই জীবনের সার সম্বলরূপে অবলম্বন করেন।

বর্তমান সংকলনে কেবল সুবুদ্ধিসম্পন্ন ভক্তের স্তুতির কথাই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সুবুদ্ধি, বুদ্ধিমান ও নির্বোধ ব্যক্তিগণ ঈশ্বর দেবতাদির প্রার্থনায় (স্তুতিতে) রত থাকলেও যে যেমন অধিকারী তার তেমন ভাব ফুটে ওঠে আর ভগবান হলেন '**ভাবগ্রাহী জনার্দন**'—তিনি স্তুতির সেই ভাবই গ্রহণ করেন। ভগবান কার ভাব কী করে গ্রহণ করেন তা নিয়ে এক ছোট্ট আখ্যান আছে—

একটি আখ্যান—একবার দুই দেবদূত মর্ত্যে এসেছেন। তাঁরা দেখছেন

পৃথিবীতে প্রচুর পাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবাই ওপরে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু অধিকাংশ পাখিই পৃথিবীর ধরাতলেই ঘোরাফেরা করছে, আকাশে যেতে পারছে না। কিন্তু কিছু কিছু পাখি আবার স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়ে যাচ্ছে তারপর উড়তে উড়তে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় তাঁরা দেখলেন এক সুন্দর পাখি হঠাৎ এসে অবলীলাক্রমে আকাশে উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছে। এক দেবদূত বললেন—এত পাখি কোথা থেকে এল, এরা কে ? অন্য দেবদূত বললেন, চলো আমরা পাখিদের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসি ওরা কে, কোথায় যাচ্ছে।

দেবদূত দুজন উড়ন্ত পাখিদের পেছনে পেছনে চলতে চলতে গোলোকে ভগবানের ধামে পৌঁছে গেলেন। দেখলেন অনেক পাখি ওখানে আগেই পৌঁছে গেছে আর ভগবানকে কিছু নিবেদন করছে। ভগবান প্রীত মনে তাদের কথা শুনছেন আর তথাস্তু বলছেন, তারপর পাখিগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় অতি সুন্দর সেই পাখিটি ভগবানের কাছে পৌঁছল, তার গায়ের সুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হচ্ছিল। সেও ভগবানের কাছে তার প্রার্থনা নিবেদন করল। ভগবানের অপূর্ব মুখাবয়ব আনন্দবল্লরীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি অত্যন্ত প্রীত মনে পাখিটিকে আশীর্বাদ দিলেন এবং সেই অদ্ভুত পাখিটি ভগবৎ আশীষ নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে গেল।

দেবদূত দুজন বললেন, চলো দেখে আসি পাখিটা কোথায় যাচ্ছে। ওরা দুজনেই আবার পৃথিবীতে নেমে এলেন, দেখলেন পাখিটি এক ক্ষুদ্র কুটিরে এক দীন-হীন যুবকের শরীরে প্রবেশ করল। যুবকটি দিব্য শরীরবিশিষ্ট আর পাখিটি শরীরে প্রবেশ করায় তার শরীর আরো কান্তিময় হয়ে উঠল। যুবকটির একটা হাত নেই, অতি দীনদরিদ্র অবস্থা কিন্তু শরীর জ্যোতির্ময়। যাইহোক, দেবদূত দুজন দেখলেন যুবকটি সুষুপ্ত অবস্থায় ; তাই তাঁরা তার অন্তরাত্মার সঙ্গে কথা বলতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু ! যুবকটি কী ভগবানের বিশিষ্ট ভক্ত, কী করে ও ভগবানের আশীষ লাভ করল ?

অন্তরাত্মা বললেন—আচ্ছা, আগে আপনারা বলুন তো ভক্তের লক্ষণ কী ? দেবদূতগণ বললেন—হে ভগবন্ ! ভক্ত সুখের সময় ভগবানের মহিমা কীর্তন করে আর দুঃখের সময় কষ্ট নীরবে সহ্য করে।

অন্তরাত্মা হেসে বললেন—দুঃখের সময় কষ্ট সহ্য তো সব প্রাণীই করে, খিদে পেলে নিরুপায় হয়ে কুকুর-বেড়ালও কষ্ট সহ্য করে। ভক্ত কিন্তু সেরকম নয়—ভক্ত বাহিরে-ভিতরে **'সর্বত্র সমদর্শনম্'** অর্থাৎ তার বাইরে শত্রু-মিত্র ভেদ নেই আর অন্তরে **'সমত্বম্'** অর্থাৎ সুখে-দুঃখে সম। সে নিত্যই ভগবানে যুক্ত, তাই সুখে-দুঃখে সদাই ভগবানের মহিমা কীর্তনে রত থাকে। সে ভজে **'তেরা ফুলো সে ভি প্যার, তেরে কাঁটো সে ভি প্যার'**।

দেবদূতগণ অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন— প্রভু ! পৃথিবীতে এত পাখি দেখলাম এরা কোথা থেকে এল। এদের মধ্যে অধিকাংশ পাখি পৃথিবীর ধরাতলে ঘোরাফেরা করছে আর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কিছু পাখি আকাশে উড়ে গিয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছে মিলিয়ে যাচ্ছে আর একটা অতি সুন্দর পাখি ভগবানকে আর্তি নিবেদন করে তাঁর আশীষ নিয়ে এই যুবকটির দেহে প্রবেশ করল। এ বিষয়ে যদি কিছু বলেন।

অন্তরাত্মা বললেন—তোমরা দেবদূত, সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে তাই এই পাখিদের আর ভগবৎলোক অবধি তাদের গমন দেখতে পারছ। দেখো, এই পৃথিবীতে শতকোটি মানুষ আছে আর প্রতিমুহূর্তেই তাদের কত বাসনাই না উদ্গম হচ্ছে। এই সব বাসনা কখনও পূরণ হয়, কখনও হয় না, তারপর মিলিয়ে যায়। তোমরা এই বাসনারূপী পাখিদেরই ধরাতলে দেখেছ।

বদ্ধজীবের কামনা— যেসব রজ-তম গুণসম্পন্ন মানুষের বাসনা নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডী, নিজ স্বার্থ সিদ্ধিতেই আবদ্ধ, সেই সব বাসনা-পক্ষী তেমন তেজসম্পন্ন হয় না, তাই তারা বেশি উপর উঠতে পারে না, ভগবানের কাছে যেতেও পারে না। তারা ধরাতলে থেকেই সেই কামনা-বাসনাসম্পন্ন জীব বা মানুষের কাছেই ঘোরাফেরা করে। সেই সব মানব হল **'স্বকর্মফল ভুক পুমান্'** অর্থাৎ নিজ কর্মফল ভোগ করেই জীবন অতিবাহিত করে। তাদের কর্ম, তাদের বাসনাই তাদের বর্তমান জীবন আর পরবর্তী জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। এ যেন **এরোপ্লেন** আর **দূরগামী রকেট**। প্রথমটা এয়ারপোর্ট থেকে এয়ারপোর্ট ওঠে-নামে, ধরাতলেই থাকে, আর অতি তেজসম্পন্ন রকেট পৃথিবীর আকর্ষণের বন্ধন কাটিয়ে দূর দূর গ্রহান্তরে যায়, অধিকাংশই নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে নষ্ট হয়ে যায় আবার বিশেষ শক্তিসম্পন্ন কিছু ফিরে এসে গ্রহ-গ্রহান্তরের

খবর জানান দেয়।

সত্ত্বগুণীর প্রার্থনা—কিছু মানুষের মধ্যে যখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় তখন তারা নিজ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে অন্যের কথা ভাবে, তাদের দৃষ্টি হয়ে ওঠে **'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় চ'**। তাদের বাসনাও তখন পরিবর্তিত হয়ে তেজস্বরূপ হয়, হয় ভগবৎ ইচ্ছার অনুরূপ। এই প্রকার বাসনা, প্রার্থনা আকারে ভগবানের কাছে নিবেদিত হলে তা ভগবানের কাছে পৌঁছায় আর ভগবানও তা অঙ্গীকার করেন। অন্তরাত্মা বললেন, দেখো ! গোলোকে তোমরা এইপ্রকার বাসনাসম্পন্ন পক্ষীদেরই দেখেছ যারা ভগবানকে এই সব সাধু-মহাত্মাদের হৃদয়ের আর্তি, তাঁদের জগতের দুঃখ দূর করার প্রার্থনাই নিবেদন করছিল আর ভগবান তথাস্তু বলে তা অনুমোদন করছিলেন।

ভক্তের ভগবৎ মহিমা কীর্তন—আবার আধ্যাত্মিক চেতনা অতি উচ্চ স্তরে উঠলে জগতের সকল বস্তু, সকল ক্রিয়াই ভগবৎময় হয়ে ওঠে। উপলব্ধি হয় এ সবই সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় চলছে। করুণাকেতনের করুণাধারা সবার প্রতিই অঝোর ধারায় বইছে, কিছুই চাওয়ার নেই, কিছুই পাওয়ার নেই। তখন সাধক হয়ে ওঠে ঐকান্তিক ভক্ত, তার হৃদয় সর্বদা ভগবৎ প্রেমরসে ভরপুর থাকে, মন থাকে ভগবানের মহিমা কীর্তনে রত।

এই প্রকার ভক্তও হয় দু'প্রকারের—জ্ঞানীভক্ত ও প্রেমীভক্ত। জ্ঞানীভক্ত ভগবানের ঐশ্বর্য মহিমা বর্ণনা করেন আর প্রেমীভক্ত কৃপাসাগর ভগবানের প্রেমমহিমা নিত্য কীর্তন করেন। ভক্তহৃদয়ের নির্যাস এই মহিমাকীর্তন ভগবানকে অত্যন্ত প্রীত করে। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর সৃষ্ট মায়া-জগতের বন্ধন কাটিয়ে কোনো এক **অনন্ত চিন্তয়ন্ত** সাধক তাঁর শরণাগত হয়েছে, আর তখন তিনি হন **'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'** অর্থাৎ সেই ভক্তর জাগতিক ও পারমার্থিক সকল দায়ভার নিজ হাতে তুলে নেন। অন্তরাত্মা বললেন, এই যুবকটি এইরকম এক ভক্ত। তাই তার অন্তর থেকে নির্গত ভগবানের এই মহিমাকীর্তন ভগবানকে তার দিকে আকর্ষণ করে আর তিনিও তাঁর আশীষ পাঠিয়ে ভক্তকে তাঁর দিকে চালিত করেন।

গীতায় চার প্রকার ভাবের ভক্ত—গীতায় ভগবান বলেছেন চার প্রকার

ভক্ত তাঁর ভজনা করেন। এঁরা হলেন—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। আর এই সব ভাবের সাধক সকলেই ভক্ত। এর মধ্যে আর্ত ও অর্থার্থী ভাবের সাধক তাঁরা দুঃখ নিবৃত্তির জন্য কেবল ভগবানেরই শরণাপন্ন হন। যাঁদের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা আছে তাঁরা তা পূরণে কেবল ভগবানের কাছেই প্রার্থনা করেন এবং জ্ঞানীর স্তুত মহিমা কীর্তন কেবল ভগবানের প্রতিই হয়।

আর্ত ও অর্থার্থী ভাব—আর্ত ও অর্থাথী ভাব দেব, মনুষ্য ও সব জীবেরই হয়ে থাকে তবে তার স্বরূপ ভিন্ন। ব্রহ্মা ও অন্য লোকপালাদি দেবতাগণ প্রায়শই তাঁদের অধিকার হারানোর ভয়ে শঙ্কিত থাকেন। তাই তাঁরা কখনো আর্তভাবে কখনো অর্থার্থীভাবে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ১১শ অধ্যায়ে এই প্রকার চারটি স্তুতি আছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ স্তুতি আছে। অষ্টবিংশ চতুর্যুগের ত্রেতাযুগে যখন কংস, শিশুপালাদি অসুরগণের অত্যাচারে ধরিত্রী ভারাক্রান্ত, তখন ব্রহ্মা অন্যান্য দেবাদিগণসহ ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্তুতি করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এও হল আর্ত ও অর্থার্থী ভাবের স্তুতি এবং ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে তা বর্ণিত হয়েছে। আবার কংস কারাগারে দেবকী গর্ভে শ্রীকৃষ্ণর জন্মের পরও ব্রহ্মা ও দেবগণ একই রকম স্তুতি করেছেন যা ভাগবতের দশম স্কন্ধে উল্লিখিত।

জিজ্ঞাসু ভাব—জিজ্ঞাসু ভাব কেবল মানুষের মধ্যেই ফুটে ওঠে। গীতায় দশম ও একাদশ অধ্যায়ে আছে অর্জুন কীভাবে ভগবানের বিভূতি ও বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য জিজ্ঞাসু ভাব নিয়ে প্রার্থনা করেছেন। আবার বিশ্বরূপ দর্শনের সময় ভীত হয়ে তা নিবারণের জন্য আর্তভাবেও অর্জুন স্তুতি করেছেন তা আছে একাদশ অধ্যায়ের শেষে।

জ্ঞানী ভাব— জ্ঞানী ভক্তর ভগবানের মহিমা ও প্রেমের স্তুতি বেদ ও ভাগবতের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে।

ভাগবতের পঞ্চরস—যে সব ভক্ত ভগবানকে সম্বন্ধের বাঁধনে বাঁধতে চায়, তারা ভগবানের আরাধনা করে পাঁচটি রসের মাধ্যমে— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য।

শান্তরস — ভক্তরা সাধারণত জ্ঞানমার্গী। তাঁরা ভগবানকে পেতে চায় তাদের অন্তরে, ধ্যানের মাধ্যমে, সমাধির মাধ্যমে। তাঁদের ভগবৎ স্তুতি হল

মুখ্যত ভগবানের ঐশ্বর্য, মহিমা বর্ণন, বিভূতি বর্ণন। বেদের অনেক মন্ত্রেরই (সূক্তর) হল এই ভাব। তবে বেদের ঋষিরা কেবল আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরে থেকে, তাঁদের আরব্ধ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হতেন না, সকল জীবের জাগতিক দুঃখ-কষ্টও তাঁদের সমভাবে ব্যথিত করত। তাই বেদের অনেক মন্ত্রে সর্বজীবের কল্যাণ কামনারও বহু প্রার্থনা আছে।

ভাগবতেরও তৃতীয় স্কন্ধে (১৬ অধ্যায়) সনৎকুমারাদি চতুঃসনের স্তুতি, চতুর্থ স্কন্ধের (২০ অধ্যায়) মহারাজ পৃথুর স্তব আর ২৪ তম অধ্যায়ে রুদ্রের স্তবেও ঐশ্বর্য মহিমার প্রাধান্য আছে। তবে দীনতা, দাস্য ভাব না হলে কোনো স্তুতিই পুষ্টিলাভ করে না, তাই এই মহিমাকীর্তন স্তবেও প্রভুর কাছে দাস্যভাবের প্রার্থনা আছে।

দাস্যরস—দাস্যভাবের ভক্তর থাকে সেবাভাব, কিন্তু তাঁরা ভগবান ও তাঁর বিগ্রহকে নিরন্তর সেবা করা ছাড়াও নিত্য ভগবৎ চিন্তায় ও স্তুতিতে মগ্ন থাকেন। কলিতে দাস্য ভাবের ভজনাই অতি সুগম।

সখ্যরস— সখ্যভাবের ভক্ত ভগবানের পার্ষদ, তাই কলিকালে সখ্যভাব বিরল। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের সখ্যভাব ছিল, কিন্তু দশম ও একাদশ অধ্যায়ে তাঁর স্তুতিতে বারংবার দাস্যভাব এসেছে, তিনি স্তুতিতে বলছেন—**'তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্'** (গীতা ১১।৪৪) অর্থাৎ হে প্রভো ! আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি, আপনি সর্বতোভাবে পূজনীয় ঈশ্বরস্বরূপ, আপনি কৃপা করে আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। এমনকি বিপ্র সুদামা—যিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সখা, তাঁর সহপাঠী ; তিনিও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের মহানতায় মুগ্ধ হয়ে বলছেন—

যস্যচ্ছন্দোময়ং ব্রহ্ম দেহ আবপনং বিভো।

শ্রেয়সাং তস্য গুরুষু বাসোঽত্যন্তবিড়ম্বনম্।। (ভাগবত ১০।৮০।৪৫)

হে প্রভো ! পারমার্থিক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সাধন যে 'বেদ' তা তোমা হতেই উদ্ভূত। তুমি 'শাস্ত্রযোনি' —সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রের উদ্ভবস্থান। তোমার যে গুরুকুলে বাস তা কেবলমাত্র লোকশিক্ষার জন্যই। তোমার মনুষ্যদেহে এই যে অবতরণ তাও তোমার জগৎ কল্যাণ হেতু লীলামাত্র। তোমার সঙ্গলাভ করে ও সখা হয়ে আমার সকল পুরুষার্থ ও পরমার্থ লাভ হয়ে গেছে বলে মনে করি।

বাৎসল্যরস — বাৎসল্যভাবের ভক্ত ভগবানের নিত্য পার্ষদ — তাঁর শুদ্ধসত্ত্বর অংশ। তাঁরা ভগবানের আগেই ধরাধামে অবতীর্ণ হন আর প্রভুর লীলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখেন।

মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই ভাবের ভক্তরা অপত্য-স্নেহ দ্বারা ভগবানকে বাল্যকালে লালন করেন, দরকার মতো শাসন করেন, আবার তাঁর অদর্শনে রোদন করেন, কিন্তু ভাগবতে বা অন্য কোথাও বাৎসল্যরসে ভক্তের স্তুতি দেখা যায় না। যদিও কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর তাঁর পিতা-মাতা বসুদেব ও দেবকীও ভগবানের স্তুতি করেন (ভাগবত দশম স্কন্ধ-তৃতীয় অধ্যায়ের তেইশতম থেকে একত্রিশতম শ্লোক) কিন্তু তা বাৎসল্যরস মণ্ডিত নয়, তা দাস্যভাবে ভাবিত। তবে কলিকালে যশোদার ভাবে গোপালের বাৎসল্যরস সেবা প্রচলিত আছে এবং তা অনেক সাধকের জীবনে পরমার্থ লাভের পথ খুলে দিয়েছে।

মাধুর্যরস — প্রেমরসের ভক্তরা ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির অংশ। তাঁরা ভগবানের সঙ্গেই আবির্ভূত হন আর তাঁর তিরোভাবের সঙ্গেই বিলীন হন। যেহেতু তাঁদের জন্মই প্রভুর আনন্দাংশ, তাই প্রাকৃত শরীরে তাঁদের একমাত্র কাজ হল অবতাররূপে আবির্ভূত প্রভুর আনন্দ বিধান করা। ভগবানের সাথে তাঁদের নিত্য-মিলন, নিত্য-বিরহ। ভাগবতে ও অন্যান্য শাস্ত্রে এই ভগবৎ শক্তির সঙ্গে ভগবানের বিভিন্ন লীলার বর্ণনা আছে। ভাগবতের দশম স্কন্ধের কুড়িটি অধ্যায় (একুশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত) শ্রীশ্রীরাধা ও তাঁর অনুগামিনী ব্রজগোপিনীদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ও প্রেমের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে আবার পাঁচটি অধ্যায় (উনত্রিশ থেকে তেত্রিশ পর্যন্ত) হল রাসলীলা। যা ভাব গাম্ভীর্যে, প্রেমের পরাকাষ্ঠায়, ভগবানের প্রেমাধীনতা অবধি, তাই একে রাসোপনিষদও বলা হয়। এই রাসলীলার অন্তর্বর্তী **'গোপীগীতা'** বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

প্রেমরস সমস্ত রসের মুকুটমণি। সমস্ত রস এই মধুর রসের অন্তর্গত। কিন্তু ভগবানকে মধুর রস সাধনের মাধ্যমে লাভ করা অতি দুরূহ, কলিকালে তো বটেই, অন্যান্য যুগেও তাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সঙ্গে যে মধুর লীলা করেছেন তা অনুকরণযোগ্য নয়, কেননা ব্রজগোপীরা সকলে তাঁরই অংশ, আর গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করে গোপীদেহ ধারণ না করতে পারলে

রাসলীলায় প্রবিষ্ট হতে পারা যায় না। এমনকী—লক্ষ্মীদেবী, মহাদেব বা অন্য দেবতারাও তাঁর রাসলীলায় অংশগ্রহণ করতে না পেরে দূর থেকেই দর্শন করে ধন্য হন। এখনও রাসলীলা গণ্ডীর বাইরে মন্দিরে প্রতীক্ষারত লক্ষ্মীদেবী ও মহাদেবকে (গোপেশ্বর মহাদেব) দেখা যায়। আর দেবতাদেরও একই অবস্থা, শ্রীশুকদেব রাসলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাগবতে তাই বলেছেন—

যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণমৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্॥ (ভাগবত ১০।৩৩।৪)

অর্থাৎ দেবতারা রাসলীলা দর্শনে উৎকণ্ঠিত হয়ে নিজ নিজ স্ত্রীগণের সঙ্গে বিমানে আরোহণ করে কেবলমাত্র আকাশ থেকে ভগবানের এই প্রাকৃত লীলা দেখতে লাগলেন। তাঁরা দুন্দুভি বাজিয়ে, পুষ্পবৃষ্টি করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্মল যশগান করতে লাগলেন। এইভাবে প্রকৃত অধিকারী ব্রজগোপী ছাড়া রাসলীলায় অংশগ্রহণ করা বা সাক্ষাৎভাবে ভগবানে শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও তাঁর সঙ্গে লীলাক্রীড়া করতে আর কেউই সমর্থ নন।

তাহলে শ্রীশুকদেব রাসলীলা বর্ণনায় কেন বললেন—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ (ভাগবত ১০।৩৩।৩৬)

অর্থাৎ শ্রীভগবান ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করার জন্য এমন সব চিত্তাকর্ষিণী লীলাসমূহ সম্পাদন করেন যা শুনে মানুষ অধিকার ভেদে ভগবৎপরায়ণ হয়।

এর উত্তর পাওয়া যায় প্রেমের ঠাকুর গৌরাঙ্গর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের লীলারস আস্বাদন করেছেন আর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু প্রেমরস বিলিয়ে দিয়েছেন।

বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সংকীর্তন।
অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস আস্বাদন॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

মহাপ্রভু অধিকারী ভেদে কাউকে নাম সংকীর্তন (বহিরঙ্গ), কাউকে বা রাধা-কৃষ্ণের অপার্থিব লীলারসের (অন্তরঙ্গ) অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু ভগবানের সঙ্গে লীলা বা তাঁর প্রত্যক্ষভাবে সেবা কেবল তাঁর আনন্দাংশ শ্রীরাধা এবং তাঁর সখীদেরই সাধ্য, তাই মধুর ভাবের সাধকগণ ব্রজগোপীদের আনুগত্যেই রাধা-কৃষ্ণের লীলামাধুরী আস্বাদন করেন।

শ্রীরাধার সখীর সখী হল মঞ্জরী আর সাধকের মঞ্জরী হয়ে ওঠার সাধনাকে বলে 'রাগানুগা'। এ সাধন মহাপ্রভুরই দান।

রাগানুগা সাধনা —এ হল গৌড়ীয় ভক্তদের মাধুর্য ভাবের সাধনা। শ্রীকৃষ্ণর কথা হচ্ছে **'লীলা'** আর রামাদির কথা **'চরিত'**। চরিত হচ্ছে অনুকরণীয় কিন্তু লীলা হচ্ছে নানুকরণীয়, তা আস্বাদনীয়। ভাগবতের নবম অধ্যায়েও রামের কথা আছে কিন্তু তা চরিত হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণকথা মন দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়, তর্ক-যুক্তি দিয়েও নয়, তা চিত্ত দিয়ে আস্বাদন করতে হয়। মন যেন একটা ক্যামেরার 'লেন্স', তাতে সব কিছুই ভেসে ওঠে কিন্তু কিছুই স্থায়ী ভাবে থাকে না। তাই কৃষ্ণকথা মন দিয়ে শুনে তা চিত্তরূপী ক্যামেরার 'ফিল্মে' ছেপে রাখতে হয়, যাতে তা স্থায়ী হয়। চিত্ত হচ্ছে স্মৃতি বা সংস্কারের স্থান। তাই কৃষ্ণলীলা চিত্তে থাকলে তা মননে সাহায্য করে, আমাদের পরের পরের জন্মে উন্নত সংস্কারে, ভগবৎভক্তি বৃদ্ধিতে, প্রেম-পিপাসা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাই দেবতারা দেবীকে স্তুতি করে বলেছেন—

যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।৬৪)

আর এই সংস্কারের ফলেই আমাদের জীবনে কখনো কখনো সময় আসে যখন আমাদের ভগবৎ মহিমা কীর্তন, শ্রবণ বা পাঠ করতে ভালো লাগে। অধিকাংশ বাঙালিদের মধ্যে দেবীপক্ষের পূর্বে মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর চণ্ডীপাঠ বয়ে আনে এক অনাস্বাদিত আনন্দ। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্রহ্মাদি দেবতাদের স্তব শ্রবণে, গীতায় অর্জুনের স্তুতি পঠনে, ভাগবতের গোপীগীতা মননে যে অপূর্ব ভাবের উদয় হয় বহু শাস্ত্রপাঠেও সেরূপ হয় না। আমি যখন অল্প অল্প গীতা, চণ্ডী, ভাগবতাদি গ্রন্থ পড়তে শুরু করলাম তখন ক্রমশঃ স্তুতির দিকে আকৃষ্ট হলাম। দেবতাদের প্রার্থনা, ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির সেবা ও দাস্যভাব এবং ভগবানের মহিমাকীর্তন তথা গোপীদের প্রেমের আধ্যাত্মিক উচ্চতা, ভাবগাম্ভীর্য, হৃদয়ের নির্যাসে মোড়া আর্তি মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। আর শাস্ত্রসমূহ তো সাধক ভক্তগণের মহিমা, চিন্তা ও ভাব নিয়েই উদ্ভূত, তাই সকল স্তুতি নিয়ে এক সংকলন করার বাসনা জাগল। আর তারই ফলশ্রুতি হল এই পুস্তক।

কিন্তু যেহেতু গ্রন্থটি স্তুতির সংকলন, তাই এতে আমার কোনো অবদানই

নেই। আমি কেবল মহাপুরুষদের ব্যাখ্যা পড়ে তা সাধ্যমতো সাজিয়ে নিয়েছি। কিছু কিছু সন্ত-মহাপুরুষদের গ্রন্থ—যা পড়ে উপকৃত হয়েছি এবং সংকলনে সাহায্য নিয়েছি তাঁরা হলেন—পরিতোষ ঠাকুর, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ আদিদের লেখা বেদাদি গ্রন্থ ; মহানামব্রত ব্রহ্মচারী লিখিত সপ্তশতী চণ্ডী, মহর্ষি সত্যদেবের সাধন সমর বা শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্যাখ্যা ; মহাত্মা রামসুখদাস, প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্ত, বালগঙ্গাধর তিলক লিখিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা-ব্যাখ্যা ; প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী, অনন্তদাস বাবাজী (রাধাকুণ্ড), কেদার মহারাজ (পাঠবাড়ি) এবং গৌড়ীয় মঠ প্রকাশিত শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থ।

বর্তমান পুস্তকে **বেদ, গীতা, চণ্ডী ও ভাগবতের স্তুতি** সংকলিত হয়েছে। **বেদে** আছে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের ভগবৎ মহিমা কীর্তন, **গীতায়** অর্জুনের জিজ্ঞাসু ও আর্তভাবের স্তব আর **চণ্ডীতে** আছে ব্রহ্মাদি দেবতাদের আর্ত ও অর্থার্থী ভাবের স্তুতি। **ভাগবতের** স্তুতিতে আবার পঞ্চরসের ভাব একাকার হয়ে গেছে —**আর্ত-দাস্য ভাবে** নাগরাজ (কালীয়), যক্ষরাজ (নরকুবের ও মণিগ্রীব), দেবরাজ (ইন্দ্র), প্রজাপতি ব্রহ্মা ও পিতৃব্য অক্রূর ; **শুদ্ধ-শান্তভাবে** চতুঃসন, পৃথু, রুদ্র, প্রহ্লাদ, ধ্রুব ; **প্রেম-দাস্যভাবে** বিপ্রপত্নী এবং **বিশুদ্ধ প্রেমভাবে** গোপিগণের স্তুতি বর্ণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য যে দেব, দ্বিজ, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, অসুর সকলেই শরণাগত হয়ে ভগবানের স্তুতি করলেও সকলের প্রকৃতি ভিন্ন, পরিবেশ ভিন্ন এবং অধিকারীভেদে ভাবের স্তরও ভিন্ন, তাই প্রত্যেক স্তুতির রসে ও ভাবে ভেদ দৃষ্ট হয়।

তাই এই স্তুতিসমূহর প্রকৃত ভাব আস্বাদন করার জন্য, প্রতিটি স্তুতির পূর্বে ভক্তের বংশ, পরিবেশ ও পরিস্থিতির যথাসাধ্য বর্ণনা দেওয়া হয়েছে পূর্বকথা বা প্রাক্‌কথন নামে।

আশাকরি **'স্তুতি'** গ্রন্থটি পাঠ করে, ভক্তগণের শরণাগতি ভাব আস্বাদন করে সাধক-পাঠকদের ভালো লাগবে। গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে ভাগবতের আরো কিছু স্তুতি বা শিবের স্তুতি (শিব-মহিমন্ স্তুতি) যোগ করা গেল না। পাঠকগণের কাছে এইজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় ভগবানের স্তুতি ভগবানকেই সমর্পণ করলাম।

—সোমনাথ মুখার্জী

———০———

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র

—o—

বিষদ্ সূচীপত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডী

———o———

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বেদ

প্রাক্‌কথন

'বেদ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান অনন্ত বলে বেদও অনন্ত—**'অনন্তা বৈ বেদাঃ'**। বেদের বক্তব্য বিষয়কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এক ভাগের নাম **'মন্ত্র'** অন্য ভাগের নাম **'ব্রাহ্মণ'**। তাই বলা হয় **'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্'**। এই দুই বিষয়বস্তুর মধ্যে মন্ত্র অংশগুলিতে সাধারণত থাকে—'দেবতাদের নিকট প্রার্থনা-নিবেদন' ও 'বিভিন্ন দেবতার স্তব-স্তুতি' আর ব্রাহ্মণ অংশে থাকে ওই মন্ত্রগুলিকে কে, কখন, কীভাবে এবং কোন্ যজ্ঞে প্রয়োগ করবেন তার আলোচনা।

বেদের মন্ত্রগুলি তিন প্রকারের—পদ্যবদ্ধ, গীতবদ্ধ ও গদ্যবদ্ধ। বেদের এই পদ্যবদ্ধ মন্ত্রের নাম **'ঋক্'**, গীতবদ্ধ মন্ত্রের নাম **'সাম'** ও গদ্যবদ্ধ মন্ত্রের নাম **'যজুঃ'**। এছাড়াও বেদে পদ্যময়, গদ্যময় অথবা পদ্য-গদ্যময় কিছু মন্ত্রও সংকলিত আছে যাদের নাম **'অথর্ব'**। এইভাবে বেদকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—ঋকবেদ,যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ।

এই চার বেদে মন্ত্রের সংখ্যা এইরূপ—

ঋগ্‌বেদ—১০, ৫৫২ মন্ত্র

যজুর্বেদ—১, ৯৭৫ মন্ত্র

সামবেদ—১, ৮৭৫ মন্ত্র

অথর্ববেদ—৫, ৯৭৭ মন্ত্র

সাকুল্যে এই চার বেদে মন্ত্রের সংখ্যা বিশ হাজার তিনশো উনআশি (২০, ৩৭৯)।

বেদ কেবল চার ভাগে বিভক্তই নয়, প্রতিটি বেদে মন্ত্রের সংকলন (সংহিতা) ছাড়াও আছে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ অংশও। বেদচতুষ্টয়ের ব্রাহ্মণ আর আরণ্যক অংশে আছে যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়মাবলী আর উপনিষদে আছে পরমাত্মার কথা। তাই ব্রাহ্মণ ও আরণ্যককে **কর্মকাণ্ড** বলে আর উপনিষদকে বলে **জ্ঞানকাণ্ড**। বেদে উল্লিখিত উপনিষদের সংখ্যা অনেক, তবে তার মধ্যে বারোটি উপনিষদ্ বিশেষ উল্লেখ্য যেগুলির ভাষ্য শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য আদি অনেক মনীষীই রচনা করেছেন। এই দ্বাদশটি উপনিষদ্ নিম্নলিখিত বেদের অন্তর্গত—

ঋগ্বেদীয়—কৌষীতকী, ঐতরেয়।

সামবেদীয়—ছান্দোগ্য, কেন।

যজুর্বেদীয়—তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক, ঈশা, কঠ।

অথর্ববেদীয়—প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য।

বেদ অধ্যাত্মবিদ্যার আকর। বেদের অন্তর্নিহিত শব্দের আক্ষরিক বা স্থূল প্রচলিত অর্থ ধরলে বেদবাক্যগুলি সব অসংবদ্ধ, অসঙ্গত মনে হয়। বস্তুত বেদের গূঢ় অর্থ ও উদ্দেশ্য জৈব বৃত্তির তোষণ ও পোষণ নয়, এ হল আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরই প্রতীকী বর্ণনা। বেদে ভগবৎ অনুভূতির বীজ যেন তিলে তৈলের মতো প্রচ্ছন্ন আছে—'**তিলেষু তৈলবদ্ বেদে বেদান্তঃ প্রতিষ্ঠিতঃ**।' কিন্তু বেদ বড়ই দুরবগাহ, উহার স্বরূপও দুর্বোধ্য এবং অর্থও দুরধিগম্য। বেদ ত্রিকাণ্ড মূলক—কর্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড কিন্তু সবই ব্রহ্মকেই প্রতিপাদ্য করে। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান উদ্ধবকে বলছেন—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্ বেদ কশ্চন॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্।
এতবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্॥
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিদ্ধ্য প্রসীদতি।

(ভাগবত ১১।২১।৪২-৪৩)

অর্থাৎ এই ত্রিকাণ্ড সমন্বিত বেদের 'কর্মকাণ্ডের বিধান', 'দেবতা-

কাণ্ডের মন্ত্রের প্রকাশ' বা 'জ্ঞানকাণ্ডের আশ্রয়'—সবই সেই পরমপুরুষকেই নির্দিষ্ট করে। বেদার্থের তাৎপর্যই এই যে, শব্দ মাত্র আশ্রয় করে বেদ একই ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ডরূপী তাঁর বিভিন্নতা প্রকাশ করে। অবশেষে যখন সকল ভেদই মায়ামাত্র প্রতীত হয়, তখন লোকে তার নিরাকরণের জন্য নিবৃত্তপরায়ণ হয়। কিন্তু বেদের মন্ত্রসমূহের সংকলন (বেদসংহিতা) যখন বেদান্তর (উপনিষদের) পাশাপাশি অধ্যয়ন করা হয়, তখন নির্বাক হতে হয়। বেদান্ত যেখানে পরব্রহ্মর ভেদশূন্য একত্ব নির্দেশ করে, কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে ওঠার আহ্বান করে, সেখানে বেদসংহিতার মন্ত্রে আছে অগণিত দেবতার স্তবস্তুতি, আছে তাঁদের কাছে ভোগ-বাসনা তৃপ্ত করার প্রার্থনা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আর্ত, ভীত মানুষের যেন পরিত্রাহি আর্তনাদ—**'ত্রাহি মাম্', 'রক্ষ মাম্'**। অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত তাই বলেন, এ যেন আদিম যুগের চাষার গান।

কিন্তু না, বেদের বাহ্যরূপে ভাসা ভাসা অর্থের অন্তঃস্থলে আছে সুগভীর মর্মকথা। শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীঅনির্বাণ, শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী আদি আধুনিক যুগের বেদানুসারী ব্যাখ্যাতৃগণ আমাদের দিশারীরূপে, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের মাধ্যমে, এই গূঢ় রহস্যের দিকে দৃষ্টি চালনা করেছেন। বেদও এইভাবে নিজেই নিজের কথা বলেছেন—বেদের অর্থ যথার্থই লুক্কায়িত আছে। কোথায় আছে ? না অপ্রকাশিত লোকে, পরমব্যোম—যেখানে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন।

বেদ আরো বলছে—বেদের এই রহস্যময় তাৎপর্য যে যথাযথ জানে না, তার বেদপাঠে কীই বা ফল ?

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

(ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৩৯)

ভাগবতেও ভগবান উদ্ধবকে এই কথা একইভাবে বলেছেন—**'বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে। পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্॥'** (ভাগবত ১১।২১।৩৫) অর্থাৎ কর্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড

সমন্বিত বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম ও আত্মা হলেও, ঋষিরা তা পরোক্ষভাবেই (গোপন রহস্যে মুড়ে) প্রকাশ করেছেন, কারণ পরোক্ষবাদই আমার প্রিয়। মহাভারতেও এইরকম গূঢ় শ্লোকসমূহ আছে, যাকে 'ব্যাসকূট' বলা হয়েছে আর তাকেই বেদের ঋষিরা বলেছেন **'নিন্যা বচাংসি'**—**'এতা বিশ্বা বিদুষে তুভ্যং বেধো নীথান্যগ্নে নিণ্যা বচাংসি'** (ঋগ্বেদ ৪।৩।১৬)।

ঋষিবাক্যের অর্থ অতি নিগূঢ় আর তাঁরা যখনই ব্রহ্মবিষয়ক রহস্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা প্রকাশিত করেছেন গুপ্ত শব্দের মোড়কে **'নিন্যা বচাংসি'**। কিন্তু সমস্ত ধর্মের আকর, বেদের মন্ত্রসকল এত রহস্যে মোড়া কেন ? মহাভারত এই বিষয়ে বলেছেন—

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥

(মহাভারত ১।১।২৬৭)

অর্থাৎ যিনি অল্পপাঠী, যিনি অল্পজ্ঞ, বেদ তাঁর কাছ থেকে প্রহার বা অপব্যাখ্যার ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে।

'ন বেদানাং বেদিতো কশ্চিদস্তি বেদ্যেন বেদং ন বিদুর্ন বেদম্'। অর্থাৎ কেবল বেদের মন্ত্র মুখস্থ করলেই বেদ জানা যায় না (মহাভারত উদ্যোগপর্ব ৪৩।৫৩)। যিনি সত্যে স্থিত, যিনি মর্মজ্ঞ তিনিই বেদকে জানেন।

অভিজানামি ব্রাহ্মণং ব্যাখ্যাতারং বিচক্ষনম্।
যশ্ছিন্ন বিচিকিৎসঃ স ব্যাচষ্টে সর্বসংশয়ম্॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৪৩।৫৬)

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই কেবল বেদের ব্যাখ্যা করতে পারেন, কেননা, যাঁর নিজের ভেতরে সকল সংশয় জাল ছিন্ন হয়েছে তার পক্ষেই অপরের অজ্ঞান (সংশয়) দূর করা সম্ভব।

তাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের কাছে বেদের মন্ত্রসমূহ **'নিন্যা বচাংসি'**রূপে প্রতিভাত হয়েছিল এবং তাঁরা ঠিক সেইভাবেই প্রকাশ করেছেন—এখানে **'নিন্যার'** অর্থ—'যা সাধন করে নির্ণয় করতে হবে, আপাতদৃষ্টিতে বেদের যা গ্রাহ্য অর্থ, মানে যা আমরা পড়ি, তা মুখোশ মাত্র।' যুগের অবক্ষয়ে, সাধনার অভাবে বেদের গুপ্ত শব্দসমূহের অর্থ খোলার যে চাবিকাঠি ছিল, তা আমরা

হারিয়ে ফেলেছি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদের টীকাকার **সায়নাচার্য**ও ওই চাবি পাননি বা খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বেদের অভিধান 'নিরুক্ত'কারক যাস্কও পাননি। তিনি বেদের এক-একটি শব্দের দশ-পনেরোটি অর্থ করে গেছেন। আধুনিক যুগের কথা তো বলাই বাহুল্য। ওই চাবি না পেয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা বেদের বিভিন্ন মন্ত্রের যে অর্থ করেছেন তা অনেকস্থানেই হাস্যাস্পদ। বেদ নিজেই এবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন—'সতী নারী সর্বাঙ্গে বস্ত্রালংকারে আবৃত হয়ে চলেন, কিন্তু তাঁর প্রাণবল্লভের কাছেই কেবল তিনি তাঁর সমস্ত উন্মুক্ত করে থাকেন।' সেইরকম বেদার্থ আবৃতই থাকে, কিন্তু তা কেবলমাত্র ঋষিতুল্য ব্যক্তির কাছেই ব্যক্ত হয়। ঋষি কে তা বোঝাও বড় কঠিন।

ঋষি কে ?

বেদমন্ত্র অপৌরুষেয় ও নিত্য। এ মন্ত্র মনুষ্য দ্বারা তো সৃষ্ট নয়ই, এমনকি দেবতা বা কোনো বিশেষ পুরুষের দ্বারাও সৃষ্ট নয়। যা নিত্যসত্য তা স্বয়ং প্রকাশ, তা কারোর সৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না। বেদমন্ত্রকে যারা সাক্ষাৎ দর্শন করেন তাঁরাই ঋষি। ঋষ ধাতুর অর্থ দেখা। দেখি তো চক্ষুষ্মান্ আমরা সকলেই, কিন্তু দেখার মতো দেখি না। ঋষিরা কিন্তু অতি গভীরভাবে দেখেন, তাঁদের দৃষ্টি অখণ্ড, তাই ঋষির দৃষ্টিই সৃষ্টি। সকল সিদ্ধ মন্ত্রেরই অর্থ নিত্য, শাশ্বত। কিন্তু বেদের মন্ত্রের অর্থই কেবল নিত্য নয়—অক্ষরও নিত্য। যেমন বিশ্বামিত্র ঋষি-দৃষ্ট গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থই কেবল নিত্য নয়, ওই মন্ত্রের আনুপূর্বিক অক্ষর-বিন্যাসও নিত্য। **ঋষি মন্ত্র প্রত্যক্ষ করেন, অক্ষরগুলি সাক্ষাৎ দর্শন করেন।** সেই মন্ত্রই বেদমন্ত্র। তিনি উচ্চারিত মন্ত্র শোনেন, সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেন। মন্ত্রটি তাঁর যেন এক স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, যেন ভাবের অনুকূল ভাষার স্পন্দন। প্রথমে আসে আনন্দের স্পন্দন, তা '**পরা**'। তারপর তাঁরা দেখেন রূপ—তা '**পশ্যন্তী**'। রূপ ফুটে ওঠে ভাবের স্পন্দনে—তা '**মধ্যমা**'। অবশেষে ভাব ফুটে ওঠে ভাষায়—তা '**বৈখরী**' রূপে যা আমাদের কাছে আসে। ঋষিরা মন্ত্রর প্রবক্তা, কিন্তু এই মন্ত্রে তাঁদের কোনো কর্তৃত্ব নেই, কোনো মালিকানা স্বত্ব নেই। কারণ মন্ত্র সত্য, আর এই অপৌরুষেয় মন্ত্ররাজিকে তাঁরা কেবল গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সহস্র সহস্র বৎসর কণ্ঠে ধরে রেখেছেন। বেদের ঋক্‌গুলি সব মন্ত্রমূর্ত—'**ঋঙ্‌মূর্তিরব্যয়**' (কৈষীতকি উপনিষদ্ ১।৬)।

আপন তপস্যার তেজে ও শুদ্ধ মনের প্রয়োগে ঋষিরা এই সত্যকেই পরিস্ফুট করেন আপন হৃদয়ে।

বেদের মন্ত্র যেমন অপৌরুষেয়, এই মন্ত্রের দ্রষ্টাকেও তেমনি হতে হবে অপৌরুষেয়, পুরুষকর্তৃত্বহীন। 'আমি কর্তা' এই অভিমান যাঁর সর্বতোভাবে বিদূরিত হয়েছে, তিনিই অপৌরুষেয় বাণী গ্রহণের যোগ্য। ঋষির মন্ত্রপ্রাপ্তি তখনই ঘটে যখন তিনি আর একটি ক্ষুদ্র মানুষ থাকেন না, তিনি ক্ষুদ্র মানুষের, ক্ষুদ্র পুরুষাকারের ঊর্ধ্বে ওঠেন।

বেদের মুখ্য তত্ত্ব—বেদের মুখ্য তত্ত্ব কী? সমগ্র বেদ মুখ্যত দুটি তত্ত্ব-কথা জানাতে চেয়েছেন— ১) পরম ব্রহ্ম কী ? ২) তাঁকে পাওয়ার উপায় কী?

বেদ বলেছেন বহুত্বের মধ্যে একত্বের উদ্ধার এও হল এক যুদ্ধ। মায়ার অন্ধকারের আবরণ কেটে সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানা— তাঁর উপাসনা করা, এই সাধন-সমর এক কঠিনতম সমর। ঋষি বলছেন—বেদ পড়লে কী হয়— না বেদ পড়লে ভেদ জ্ঞান থাকে না। ভেদজ্ঞানই জীবনপথের যুদ্ধ। ভেদজ্ঞানের ঊর্ধ্বে গেলে যুদ্ধবিরতি। এ যুদ্ধ অস্ত্র-শস্ত্রের যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ হচ্ছে ভাব রাজ্যে, মানসভূমিতে আরাধ্যের প্রাধান্য নির্ণয়ে।

এই সাধ্য বস্তুকে জানতে হলে এবং শুধু জানা নয়, ভেদজ্ঞান রহিত হয়ে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার যে সাধনা, তাই জানিয়েছেন বেদের 'পুরুষসূক্ত'। পুরুষসূক্তের প্রধান কথা হল, বিরাট সৃষ্টিসংসার এক যজ্ঞ, এক বিরাট যজ্ঞ। এই যজ্ঞে পুরুষ আপনাকে আহুতি দিয়েছেন, দিচ্ছেন ও অনন্তকাল ধরে দিয়ে যাবেন। এই যজ্ঞ নিরন্তর চলছে এবং এর যজমানও তিনি, পুরোহিতও তিনি আবার বলিও তিনি। এ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে, সকলেই এই মহাযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত, আমাদের প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়েও এই যজ্ঞ চলছে।

আর সাধ্য লাভে, সেই পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলনের পথে, আমাদের সাধন হচ্ছে, ওই মহাযজ্ঞে আত্মবলিদান। বেদের সাধ্য হচ্ছে পরাৎপর ব্রহ্ম, ক্ষুদ্র সর্বস্ব দানের ফলে অখণ্ড সর্বস্বলাভ। আর পরব্রহ্মে আত্মাহুতি লাভই হল বেদের সাধনা। সমস্ত আমিত্বকে হারিয়ে যজ্ঞাগ্নিতে একাকার হতে হবে।

गोवर्धन-धारण
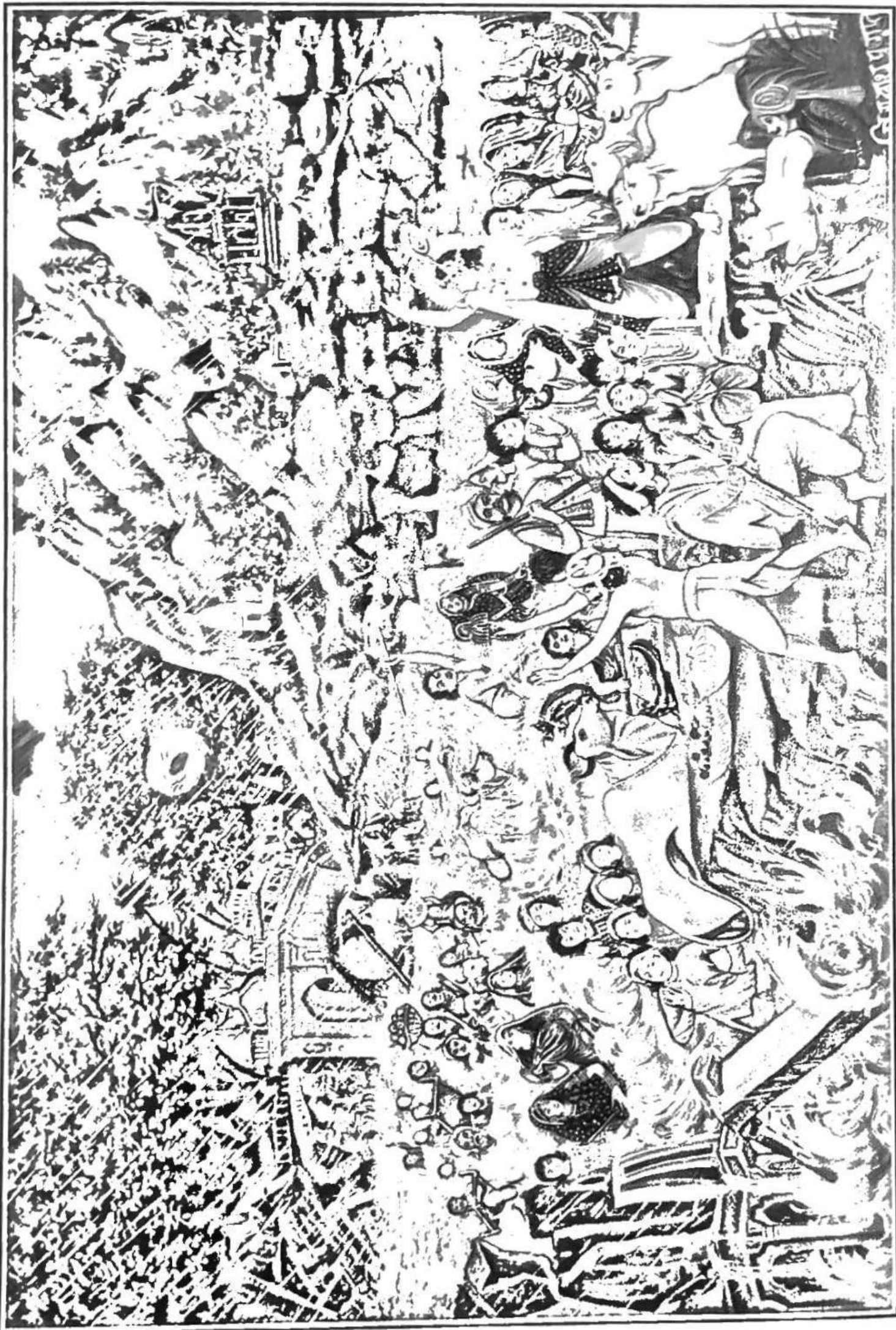
जलमें अक्रूरजीको भगवद्दर्शन

महारास

प्रह्लादपर कृपा
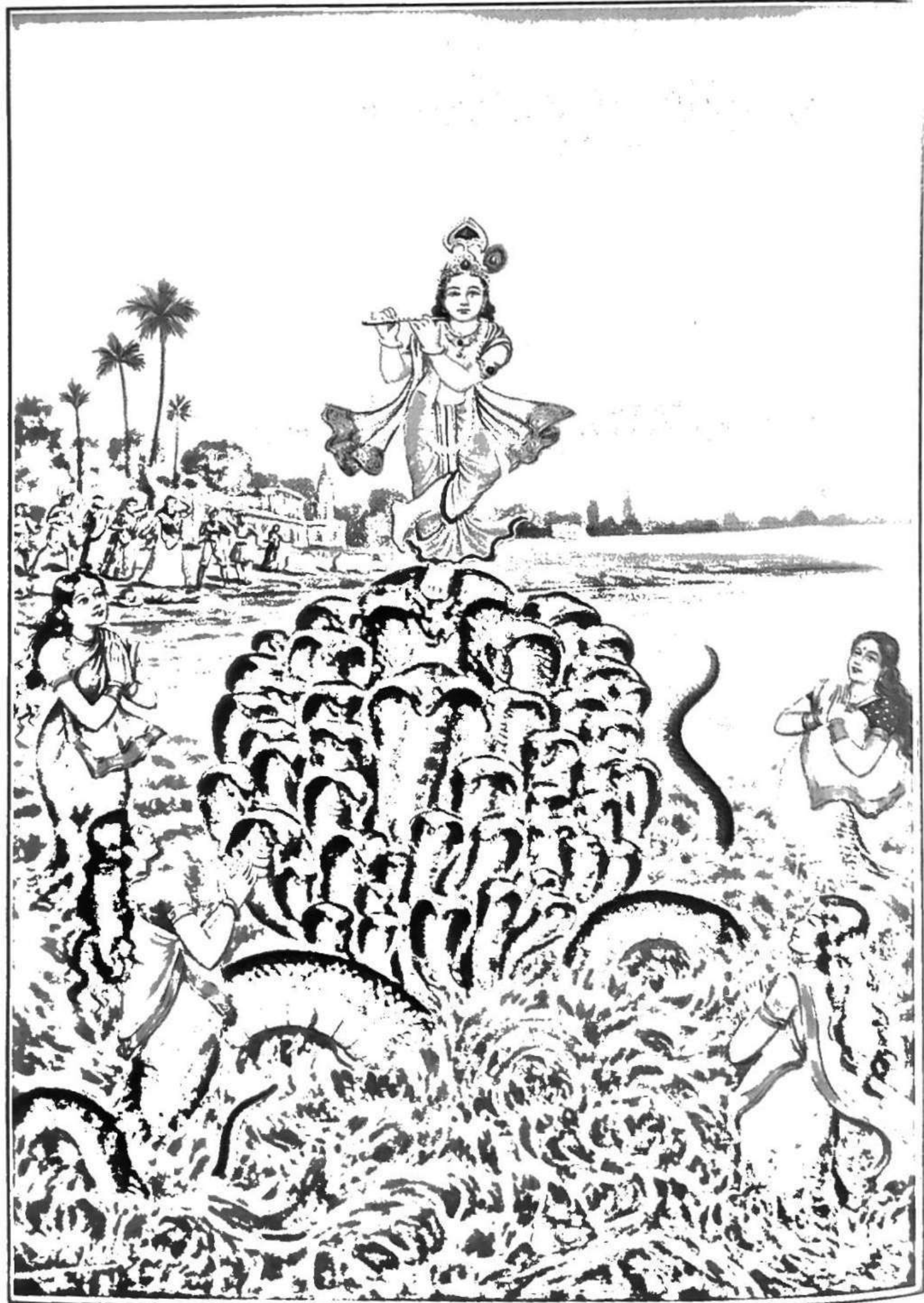
कालियदहमें भगवान् श्रीकृष्ण

আমিত্বকে নিয়ে কেউ কোনো কার্যে যোগ্য হতে পারে না। যেখানে 'আমি' নেই, রিক্ত হয়েছি, সেই আমিই সর্বকার্যে সার্থক।

এই প্রসঙ্গে পরমপূজ্য মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী এক সুন্দর উপমা দিয়েছেন। গ্রামগঞ্জে বা আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট চলে গেলে আমরা পেট্রোম্যাক্স জ্বালাই। এই পেট্রোম্যাক্সে এক প্রকার সিল্ক বা রেশমের জাল মতো লাগান হয়, যাকে বলে ম্যান্টল, আর ওটা জ্বললেই চারপাশ আলোকিত হয়ে ওঠে। যখন এই ম্যান্টল ঘরে বা দোকানে থাকে তখন ওটা আলো দেয় না, কিন্তু যখন ওটা জ্বলে ছাই হয়ে যায়, তখনই ওর আলোয় চারিদিক ভরে ওঠে। সেইরকম যখন কারোর নিজের আমিত্ব বিলুপ্ত হয়ে ছাই হয়ে যায়, তখন তিনি পরমপুরুষের এই মহাযজ্ঞে নিজেকে অর্পণ করতে পারেন, পারেন বিশ্ব ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছা মিলিয়ে দিতে। আর তখনই তিনি হন ঋষি পদবাচ্য, তাঁর ভেতরে তত্ত্বজ্ঞান মূর্ত হয়ে ওঠে, তাঁর দিব্যজ্ঞান প্রভাবে জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ইন্দ্র-বৃত্তাসুর আখ্যান—বেদে ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্তাসুরের যুদ্ধের উপাখ্যান আছে। অথর্ব মুনির পুত্র দধীচি কঠোর তপস্বী। তাঁর ছিল সর্বভূতে সমদৃষ্টি। একবার অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচিকে অনুরোধ করেন যেন তিনি যজ্ঞের আহুতির ভাগ তাঁদেরও অর্পণ করেন। কোমলমনা দধীচি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলেন যে, তাঁদের যজ্ঞভাগ নিবেদনের কথা জানলে ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর (দধীচির) মাথাই কেটে দেবেন। তাই তাঁরা যজ্ঞ আহুতির পর, তাঁর মাথা কেটে ঘোড়ার মাথা লাগিয়ে দেবেন, আবার ইন্দ্র মাথা কেটে নিলে তাঁরা পুরানো মাথা জুড়ে দেবেন। দধীচি আশুতোষ, সর্বভূতে তাঁর সম্প্রীতি। তিনি রাজী হয়ে গেলেন এবং তাঁদের অনুরোধে যজ্ঞভাগও প্রদান করলেন। কিন্তু পরে সব শুনে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে এসে দধীচির মাথা কেটে নিলেন আর অশ্বিনীকুমারদ্বয় সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁর নিজের মাথা জুড়ে দিলেন।

এর পরে বৃত্তাসুরের সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্র জানতে পারেন যে, অতিশয় দানশীল (ত্যাগী) কোনো সাধক, যাঁর দেহ-অস্থি তেজোময়, সেই সাধকের অস্থি দ্বারা নির্মিত বজ্রের দ্বারাই বৃত্তকে বধ করা সম্ভব। দধীচিই হলেন সেই

মহান ত্যাগী সাধক। ইন্দ্র তখন দধীচি ঋষির কাছে এলেন এবং বজ্র তৈরির জন্য তাঁর দেহ প্রার্থনা করলেন। মহানুভব দধীচি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন এবং যোগবলে তাঁর শরীর ত্যাগ করে, তাঁর অস্থি দ্বারাই ইন্দ্রকে বজ্র করার সুযোগ করে দেন। ইন্দ্র এই বজ্র দিয়েই বৃত্তাসুরকে বধ করেন।

বেদের বৃত্ত হলেন আবরিকা শক্তি। সত্যকে, জ্ঞানকে, তত্ত্বকে বৃত্ত আবৃত করে রাখে। এই আবরণ দূর করা ক্ষুদ্র মানুষের কার্য নয়। বেদের ইন্দ্রই পরব্রহ্ম। আর এই যে আবরিকা শক্তি, যাকে আমরা জানি তাঁর মায়া বলে, তা তিনি দূর করেন তাঁর কৃপাশক্তি দ্বারা। আর এই কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হয় দধীচির মতো আত্মদর্শী, আত্মত্যাগী মহাপুরুষদের মধ্যে দিয়েই, যাঁরা পরমাত্মার এই মহাযজ্ঞে নিজেদের আত্মবলী দিতে পারেন। ভগবানের এই কৃপাশক্তি যা কেবল আত্মদর্শী সাধকের আত্মত্যাগের অনুসরণের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়, তা ভিন্ন মানুষের সাধ্য নেই মায়ার ওই আবরণ দূর করার। 'যাহা কৃষ্ণ, তাহা নাই মায়ার অধিকার'।

রবীন্দ্রনাথ বেদের বাণী মূর্ত করেছেন, তার কাব্যে—

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা-ওঙ্কার ধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোল আজি দ্বার
হেথায় সবার হবে মিলিবারে
আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

(গীতাঞ্জলী, ভারততীর্থ)

আমরা চারটি বেদের প্রথম ও শেষ মন্ত্র আলোচনা করব, তারপর বেদের কিছু কিছু মন্ত্র, যাতে ভগবানের মহিমা, সর্বভূতে ভগবান, ভগবৎ স্তুতি ও ভগবানের প্রার্থনা আছে এবং যা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়—তা আলোচনা করব।

চতুর্বেদের প্রথম ও অন্তিম মন্ত্র

ঋগ্‌বেদের প্রথম মন্ত্র—

ওঁ। অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।

হোতারং রত্নধাতমম্॥ (ঋগ্‌বেদ ১।১।১)

অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান। অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী। আমি অগ্নির স্তুতি করি।

এঁর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে মানুষের এই জীবনপথের (যজ্ঞের) পথপ্রদর্শক বা গুরু (পুরোহিতং) হচ্ছেন অগ্নি (ব্রহ্ম)। অগ্নি সর্বদা ঊর্ধ্বমুখী তাই আমরাও যেন আমাদের জীবনকে উন্নত পথে নিয়ে যাই, কখনও আসক্তির পঙ্কিল পথে না যাই। অগ্নি দীপ্তিমান, প্রকাশময়। আমরা যেন সকলের জন্য ভগবৎ-পথের দিশারী হই। অগ্নি তাপদায়ক, শীতলতা দূর করে। আমরাও যেন সমস্ত প্রাণীর দুঃখ-কষ্ট দূর করি, তাদের সেবা করি। এখানে অগ্নিকে বলা হয়েছে **'রত্ন ধাতম্'** অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট রত্নের দাতা। রত্ন হচ্ছে অমৃত চেতনা বা উপনিষদের প্রজ্ঞানঘনতা।

সামবেদের প্রথম মন্ত্র—

ওঁ। অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।

নি হোতা সৎসি বর্হিষি। (সামবেদ ১।১।১)

সামবেদের প্রথম মন্ত্রটিতে অগ্নির আহ্বান। মন্ত্রের ঋষি অগ্নিকে স্তুতি করে বলছেন—হে অগ্নি! আনন্দের জন্য এসো, স্তবযুক্ত হয়ে দেবলোকে আহুতি ভার বহনের জন্য এসো। হে দেবগণের আহ্বাতা, যজ্ঞাসনে উপবেশন করো।

যজুর্বেদের প্রথম মন্ত্র—

ওঁ ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ

দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে।

আপ্যায়ধ্ব মঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতী রনমীবা অযক্ষ্মা।
ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বী।
যজমানস্য পশূন্ পাহি॥ (যজুর্বেদ ১।১।১)

হে দেবগণ ! তোমরা সৎকর্মের প্রবর্তক, আমাদের সদাই শ্রেষ্ঠতম কর্মে পরিচালিত করো। হে অজয়, অক্ষয়, অবিনশ্বর, লোকপালিকা দেবীগণ, ইন্দ্রের (ব্রহ্মার) উদ্দেশে প্রদত্ত আমাদের পূজা সম্যক্‌রূপে বর্ধন করুন। হে সদ্বৃত্তিসমূহ, তোমাদের শৈথিল্যবশত, যেন পাপমতি ইন্দ্রিয়াদি-রূপ চোরগণ আমাদের চিত্ত হরণ না করতে পারে। হে দেবগণ ! তোমরা সত্যস্বরূপ, সদ্বৃত্তিসমূহ জ্ঞানের আধারভূত, তোমরা কৃপা করে আমাদের হৃদয়ে নিয়ত দেবভাবের স্ফুরণ করো। হে দেবগণ ! আমাদের পাপ হতে রক্ষা করো।

অথর্ববেদের প্রথম মন্ত্র—

ওঁ। যে ত্রিষপ্তাঃ পরিযন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে॥ ১
পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ।
বসোস্পতে নিরময় ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতম্॥ ২

হে ভগবান্ ! তুমি অসংখ্যরূপ পরিগ্রহ করে জগতের কল্যাণের জন্য জগতে সর্বত্র পরিভ্রমণ কর। আমি যেন এই ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ হই॥ ১

হে জ্ঞানাধিপতি ! তুমি প্রকাশমান সত্ত্বগুণের দ্বারা আমাকে উদ্ভাসিত করো, আমার মনের সাথে মিলিত হও। হে জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্যের অধিপতি ! আমার অন্তরে সদা অবস্থান করো, আমাকে মেধা সমৃদ্ধি প্রদানে আনন্দিত করো॥ ২

ঋগ্‌বেদের অন্তিম মন্ত্র—

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে॥ ২
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥ ৩

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥ ৪

(ঋগ্‌বেদ ১০।১৯১।২-৪)

বন্ধুগণ ! একই পথে চলো। একই স্বরে স্তোত্র উচ্চারণ করো। একই সূত্রে মন গ্রথিত করো। দেবতাগণ একমত হয়ে আমাদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন। আমাদের মন্ত্রোচ্চারণ, আমাদের মন এক হোক, আমাদের চিত্ত অভিন্ন হোক। আমরা সকলে যেন একত্বের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে একইভাবে অগ্নিতে হবি অর্পণ করি। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আমাদের হৃদয় অভিন্ন হোক, আমাদের চিন্তা অভিন্ন হোক, আমরা যেন পূর্ণভাবে পরস্পরের পার্থক্য বিভেদ ভুলে একই পথে চলতে পারি।

সামবেদের অন্তিম মন্ত্রদ্বয়—

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাঁ স্তনূভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ॥

(সামবেদ ২৫।২১)

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥
ওঁ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥

(সামবেদ ২৫।১১)

হে দেবগণ ! আমরা যেন সর্বদাই কল্যাণকর বাক্য শুনি। হে যজনীয় দেবগণ, আমরা যেন সর্বদাই কল্যাণকর বস্তু দেখি ; আমরা যেন সুস্থ দৃঢ় শরীর লাভ করে তোমাদের স্তুতি করতে পরি, উপাসনা করতে পারি। হে মহাকীর্তি ইন্দ্র ! সর্বজ্ঞানসম্পন্ন জগৎপোষক সূর্য, অপ্রতিহত জলের ক্ষরণকারী দেবতা বজ্রযুক্ত তার্ক্ষ ! এই বিশাল জগতের পালকরূপী বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

এখানে লক্ষণীয় যে ঋষিদের প্রার্থনায় সকলের জন্যই চাওয়া হয়েছে, নিজের জন্য নয়। অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র যেমন পরমেশ্বরের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস, ঋষিগণও সেইরূপ স্বাভাবিকভাবেই অপৌরুষেয় হয়ে যান, তাঁদের তখন আর আমি-আমাররূপ অহংবোধ থাকে না। সর্বভূতে আত্মদর্শন করে

তখন তাঁদের সকল কথা, সকল কার্য হয় সকলেরই তরে মঙ্গল করা।

যজুর্বেদের অন্তিম মন্ত্র—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভুয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।
হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্।
ওম্ স্বং ব্রহ্ম॥

(যজুর্বেদ ৪০।১৬-১৭)

হে ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নি ! পরম সম্পদ লাভের জন্য আপনি আমাদের উত্তম মার্গে নিয়ে চলুন। হে দেব, আপনার সকল প্রাণীর কর্ম আর চিত্তবৃত্তি আপনি জানেন, আপনি আমাদের সকল কুটিলতা আর পাপ দূর করুন। আপনার উদ্দেশে আমাদের বহুতর নমস্কার।

সুবর্ণময় পাত্রের (কামনা-বাসনাদির) আবরণ দ্বারা আমরা সত্যপুরুষ হতে বিযুক্ত। পাপ, কুটিলতা ও দুর্বাসনার হেতু পরমেশ্বর আমাদের নিকট অপ্রকাশিত থাকেন। হে দেব ! আমাদের জীবনের সকল অমঙ্গল রাশি দূর করুন, যাতে সত্যস্বরূপের দর্শনলাভে জীবন ধন্য হয়।

অথর্ববেদের কালসূক্তীয় মন্ত্র—

ইমং চ লোকং পরমং চ লোকং
পুণ্যাংশ্চ লোকান্ বিধৃতীশ্চ পুণ্যাঃ।
সর্বাল্লোকানভিজিত্য ব্রহ্মণা
কালঃ স ঈয়তে পরমো নু দেবঃ॥

(অথর্ববেদ ১৬।৬।৯।৫)

অথর্ববেদের এই সুক্তে বলা হয়েছে—কাল ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আর নিখিল ভুবনের প্রকাশক। কালই দ্যুলোক–পৃথিবীর সৃষ্টিকারী, সকলের নিয়ন্তা। কাল ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে প্রজাপতিকে (ব্রহ্মাকে) ভরণ করেন, পরমাত্মা হয়ে অপ্‌সমূহ, সূর্য আদি সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় তা কালেই লয়প্রাপ্ত হয়। কালের আশ্রয়েই সমগ্র জগৎ, সমগ্র বিশ্ব অবস্থান করে। কালের আর একটি রূপ হল—বীজ হতে উৎপন্ন হয় বৃক্ষ, বৃক্ষ হতে হয় ফল, আবার ফল হতে হয়

বীজ। চক্রাকারে কালের এই যে সৃজন— ক্রিয়া যা বারে বারে একইভাবে আবর্তিত হচ্ছে, মহাভারতে তাকে বলেছে—**'সর্বে কালেন সৃজ্যন্তে হ্রিয়ন্তে চ'** (মহাভারত ১৩।১।৫৬)। আর কালের এই সৃজন ক্রিয়ার কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই।

আবার সাধকের সাধনায় **'কালের'** অন্য রূপ। সাধকের সাধন-ভজন হল ঈশ্বর লাভের জন্য। একই নাম গান, একই মন্ত্রের বারে বারে জপ, একই শ্রীমূর্তির ধ্যানই হল সাধনা। সাধনার আরম্ভে সাধকের যে অবস্থা থাকে, সাধনার শেষে সাধকের চিত্তাবস্থার এক আমূল পরিবর্তন ঘটে থাকে। চিত্তের এই ক্রমোন্নত অবস্থা বা ঊর্ধ্বগতি যিনি ঘটান তিনিই হলেন কাল।

ভগবানের মহিমা

ভগবান অদ্বিতীয় ও জ্ঞানস্বরূপ

ন দ্বিতীয় ন তৃতীয়শ্চতুর্থী নাপ্যুচ্যতে।
ন পশ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে॥
নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে।
য এতং দেবমেকবৃতং বেদ॥

(অথর্ববেদ ১৩, সূঃ ৫, মন্ত্র ১৬-২১)

পরমাত্মা এক। তিনি ছাড়া দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দশম ঈশ্বর বলে কিছুই নাই। যিনি তাঁকে এক বলে মানেন তিনিই তাঁকে প্রাপ্ত হন।

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তমাদজায়ত ॥

(যজুর্বেদ ৩১।৭)

সেই সর্বপূজ্য পরমাত্মা হতে ঋগ্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ ও যজুর্বেদ উদ্গম হয়েছে।

ভাবার্থ—যাঁহা হতে চার বেদ উৎপন্ন হয়েছে তিনিই উপাস্য। প্রতি সৃষ্টির প্রারম্ভে মানব জাতির শৈশবাবস্থায় পরমাত্মা উপদেষ্টা ও রক্ষকরূপে জন্মের সুকৃতিসম্পন্ন ঋষিদের স্বচ্ছ হৃদয়ে বেদবাণী প্রেরণ করেন। ইহাই নৈমিত্তিক

জ্ঞান। ইহার গবেষণাতেই মানবের শিক্ষা সভ্যতার জন্ম হয়। শুধু সহজাত জ্ঞান দ্বারা মানব সভ্যতার বিকাশ হতে পারে না। তাই অপৌরুষেয় জ্ঞান বা ভগবৎ প্রদত্ত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিনত্বা মাহূরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

(ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬)

একমাত্র সত্তা পরব্রহ্মকে জ্ঞানীরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিবা, গরুৎমান, যম, মাতরিশ্বা আদি বহুৎ নামে অভিহিত করেন।

এখানে যিনি পরম ঐশ্বর্যবান তিনি ইন্দ্র। যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন ও প্রীতির পাত্র তিনি মিত্র। যিনি বরুণযোগ্য তিনি বরুণ। যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সর্বজ্ঞ, প্রাপ্তব্য ও পূজ্য তিনি অগ্নি। যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ তিনি দিব্য। যিনি উত্তমরূপে পালন করেন তিনি সুপর্ণ। যিনি নিয়ন্তা তিনি যম। যিনি বেগবান বা জ্ঞানদাতা তিনি বায়ু বা মাতরিশ্বা। এইরূপ অসংখ্য নামে একই পরমাত্মার অসংখ্য গুণ, ক্রিয়া ও স্বভাবের বর্ণনা করা হয়েছে।

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥

সেই পরমাত্মাই অগ্নি, আদিত্য, বায়ু, চন্দ্রমা, শুক্র, ব্রহ্মা, আপ ও প্রজাপতি। অর্থাৎ এই পরমাত্মার অসংখ্য নাম, তাঁহার অসংখ্য গুণ, কর্ম ও স্বভাবের ভিন্নতা।

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ।
উপস্থায় প্রথমজামৃত স্যাত্মনাঽঽত্মনভি সংবিবেশ॥

(যজুর্বেদ ৩২।১১)

যিনি প্রাণীদিগকে, লোক লোকান্তরকে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারিদিক, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈর্ঋত চার উপদিক এবং উপর, নীচ এই দশদিক্ ব্যাপ্ত থেকে সত্যের স্বরূপে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, তাঁকে বেদবাণী হৃদয়ঙ্গম করে শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ।
হিরণ্যগর্ভ ইত্যেষ মা মা হিংসীদিত্যেষা যস্মান্ন জাতঃ ইত্যেষঃ॥

(যজুর্বেদ ৩২।৩)

সমস্ত মহতী কীর্তিতেই যাঁর নামের স্মরণ হয়, যিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আধার, তাঁহা হতে বিমুখ না হই—তাঁর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করতে হয়। জন্ম-মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করতে পারে না। তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য।

সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

(যজুর্বেদ ৩১।১)

যে জগৎ উৎপন্ন হয়েছিল, যে জগৎ উৎপন্ন হয়েছে এবং যে জগৎ উৎপন্ন হবে সবেতেই সেই পুরুষ স্থিত। উৎপন্ন জগৎ ও প্রাণী তাঁর এক চরণ, তাঁর তিন চরণ স্বীয় জ্যোতি স্বরূপে বিনাশরহিত অমৃতরূপে অবস্থিত। ভাবার্থ হচ্ছে, জগৎ কার্যরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহা ব্রহ্মের এক অংশ এবং অমৃতস্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিন শক্তি বাকি অংশে অবস্থিত।

অব্যসশ্ব ব্যচসশ্চ বিলং বিষ্যামি মায়য়া তাভ্যামুদ্ধৃত্য বেদমথ কর্মানি কৃনমাহ। (অথর্ববেদ ১৯।৬৮।১)

জীবাত্মা ও পরমাত্মার রহস্যকে জানতে হবে। বৈদিক জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং কর্ম করতে হবে।

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরুয়োধ্যা।
তস্যাং হিরণ্যয়াঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ॥

(অথর্ববেদ ১০।২।৩১)

দিব্যপুরী অর্থাৎ মনুষ্য শরীর অত্যন্ত বলশালী। এই পুরী দুই চক্ষু, দুই কান, দুই নাক, এক মুখ, এক মলদ্বার ও এক মূত্রদ্বার অর্থাৎ নয় দ্বারবিশিষ্ট। ইহা আবার ত্বক, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বীর্য ও ওজঃ এই আটটি চক্রযুক্ত। এতে যে জ্যোতিষ্মান কোষ (জীবাত্মা) আছে তাহাই স্বর্গ, কেননা তা জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মা দ্বারা আবৃত।

সর্বভূতে ভগবান

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥

(যজুর্বেদ ৪০।১ ; ঈশোপনিষদ্ ১)

এই চলমান জগৎ এক অচল সত্তারই অভিব্যক্তি মাত্র। এই অচঞ্চল স্থির সত্তাই ঈশ্বর। তিনি সকলের অন্তরে বাস করছেন এবং সকলের অন্তরে থেকে সব কিছুকেই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করছেন। বিশ্বের অন্তরে থেকে তিনিই আবার নিজেকে প্রকাশিত করছেন। মানুষকে এই অন্তর্যামী ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতে হবে ; সর্বভূতে ঈশ্বরকে দর্শন করতে হবে। আর যাঁর এই অনুভূতি হয়েছে তাঁর জগৎ সংসারে কিছুর প্রতি আসক্তি বা মোহ থাকতে পারে না। ত্যাগ ও বৈরাগ্যে তাঁর মন ভরে ওঠে। তাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলছেন—**'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'**—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো। ধন বা সম্পত্তি তা নিজেরই হোক বা অপরের হোক—তার প্রতি লোভ করো না।

বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা॥

(ঋগ্বেদ ১।২২।১৯)

যিনি জীবের সাথে সর্বস্থানে সর্বসময়ে যুক্ত থাকেন, যিনি সর্ব সুখদাতা, যাঁর জন্য জীব শুভকর্মকে লাভ করে সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মার সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কার্য সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত হও। বিশ্বসংসার পরমাত্মার নিয়মানুসারেই চলছে। এই নিয়মকে জানলেই নিয়ন্তাকে জানা যায়।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

(অথর্ববেদ ১০।৪।২)

তুমি স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী। তুমিই বৃদ্ধাবস্থায় যষ্ঠির সাহায্যে গমনাগমন করো। তোমার সুখ সর্বত্র।

এর ভাবার্থ হল এই যে আত্মার লিঙ্গ ও বয়সের ভেদ নেই। শরীরের অবস্থাই তার ওপর আরোপিত হয়। আত্মা প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব বিষয়ে ভোগ করে।

উতৈষাং পিতো বা পুত্র এষামুতৈষাং জ্যেষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠঃ।
একো হ দেবো মনসি প্রবিষ্টঃ প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ॥

(অথর্ববেদ ১০।৮।২৮)

এর ফলেই জীবাত্মা সম্বন্ধ বিশেষে কারও পিতা, কারও পুত্র, কারও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা কারও কনিষ্ঠ ভ্রাতা হয়। এই দেব প্রথমে মনে প্রবিষ্ট করেন এবং পরে গর্ভে প্রবেশ করে জন্মগ্রহণ করেন।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

(যজুর্বেদ ৪০।৫)

সেই পরমাত্মা পাপীর দৃষ্টি থেকে চলায়মান হন কিন্তু স্বীয় স্বরূপ হতে চলায়মান হন না। তিনি অধার্মিকের দৃষ্টি থেকে বহুদূরে কিন্তু ধার্মিকের দৃষ্টিতে অতি নিকটে। তিনি সকল জীব ও জগতের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান।

এর অর্থ পুণ্যবানের নিকট তিনি প্রত্যক্ষ বিরাজমান কিন্তু পাপী পরমাত্মাকে বুঝতে পারে না। তিনি ভিতরে, দূরে নিকটে সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব সমগ্র সংসার খুঁজেও তাঁকে পায় না।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরযঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥

(ঋগ্বেদ ১।২২।২০)

ধার্মিক জ্ঞানীরা দ্যুলোকের বিশাল চক্ষু সূর্যাদির ন্যায় সর্বব্যাপক পরমাত্মার সেই পরমপদ দর্শন করেন।

ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, প্রাণী যেমন শুদ্ধ নেত্র দ্বারা সূর্যের সাহায্যে মূর্তিমান পদার্থকে দর্শন করেন সেইরূপ ধার্মিক বিদ্বানেরাও শুদ্ধ নেত্র দ্বারা নিজেদের মধ্যে পরমাত্মার পরমপদ সন্দর্শন করেন।

বিজানীহ্যার্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন॥

(ঋগ্বেদ ১।৫১।৮)

যাঁরা আর্য বা শিষ্ট, তাঁদের জানো এবং যারা দস্যু বা পরপীড়ক তাদেরও জেনে ধর্মকার্য সাধনের জন্য তাদের অধর্মকে বিনাশ করো।

ধর্মহীন মানুষকে শিক্ষা দান করো, সঙ্গে সঙ্গে শুভকর্ম সম্পন্নকারী

মনুষ্যগণের উৎসাহদান করো ও নিজে শক্তিমান হও। সুখপূর্ণ স্থানে তোমার ক্ষমতার, তোমার সর্বপ্রকার শুভকর্ম নিষ্পন্ন হোক এই ইচ্ছাই হোক।

এখানে পরমাত্মা মানবকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, যারা ধর্মে যুক্ত তারাই আর্য এবং যারা ধর্মহীন তারাই দস্যু। ধর্মহীনকে যদি ধর্মজ্ঞান দান কর তবে নিজেই সুখী ও শক্তিমান হবে।

অভ্রাতৃব্যো অনাত্বমনাপিরিন্দ্র মনুষা সনাদসি যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে।

(ঋগ্বেদ ৮।২১।১৩)

হে পরমাত্মন্! তুমি সর্বদাই শত্রুরহিত, অজাতশত্রু অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ। তবু তুমি সম্বন্ধ সূত্রে জীবের বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর। এর অর্থ পরমাত্মা কারো সাহায্য বা সহানুভূতির অপেক্ষা করেন না কিন্তু জীব তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হোক এই ইচ্ছা করেন।

শেষে বলেষু মাত্রোঃ সংত্বা মর্ত্তসি ইন্ধ্যতে।
অতন্দ্রো হব্য বহসি হবিষ্কত আদিদ্দেবেষু রাজসি॥

(ঋগ্বেদ ৮।৬০।১৫)

হে পরমাত্মন্! তুমি সব প্রাণীর আত্মায় এবং মাতৃগর্ভে চেতন বীজরূপে প্রসুপ্ত থাক। তোমাকে মরণশীল প্রাণীগণ প্রাপ্ত হয়। আলস্যরহিত হয়ে যারা শুভ কর্ম করে তুমি তাদের ভোগ্য পদার্থকে তাঁদের ইন্দ্রিয়গণের নিকট নিয়ে যাও। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে তুমি সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হও।

পরমাত্মা আত্মায় ও ইন্দ্রিয়ে— এমনকি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেও ব্যাপক রয়েছেন। শুভকার্যের অনুষ্ঠান করলে ইন্দ্রিয়র সাহায্যেও তাঁকে অনুভব করা যায়।

অতীহি মন্যুষাবিণং সুষুবাং সমুপারণে।
ইমং রাতং সুতং পিব॥

(ঋগ্বেদ ৮।৩২।২১)

হে পরমাত্মন্! তুমি ক্রোধী পুরুষকে ত্যাগ করো, শুভকর্মা পুরুষের নিকটেই অবস্থান করো এবং তার আনন্দের সময় তার শুভ বুদ্ধির অনুভব করো।

ভাবার্থ হল এই যে, ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষেরা পরমাত্মাকে জানতে পারে না।

সুকর্মা ও স্থিরচিত্ত পুরুষেরাই তাঁকে লাভ করে।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

(যজুর্বেদ ৩১।১৮)

প্রভু, যিনি মহান্, জ্যোতিঃস্বরূপ ও অন্ধকারের পারাপার, তাঁকে আমি জেনেছি। তাঁকে জেনেই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে। পরমপদ লাভ করার অন্য দ্বিতীয় পন্থা নেই।

স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত॥

(যজুর্বেদ ৩২।১০)

বিদ্বানেরা যে তৃতীয় ধামে মোক্ষ সুখ লাভ করে যথেচ্ছ বিচরণ করেন সে প্রভু আমাদের বন্ধু ও জনক। তিনি সকলকে ধারণ করে আছেন এবং জন্ম, নাম ও স্থানসমূহকে অবগত আছেন।

ভাবার্থ হল সর্বজ্ঞ প্রভুর নিকট কিছুই অজ্ঞাত নেই। প্রথম ধাম জীবের, দ্বিতীয় ধাম প্রকৃতির। প্রথম ধাম সুখের, দ্বিতীয় ধাম দুঃখের। পরমাত্মা এই সুখ ও দুঃখের অতীত তৃতীয় ধামে আনন্দরূপে অবস্থান করছেন।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ন ন্যো অভিচাকশীতি॥

(ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২০)

সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট সম সম্বন্ধযুক্ত দুটি পক্ষী মিত্র রূপে একটি বৃক্ষে আশ্রয় করে আছে। তাদের মধ্যে একটি পক্ষী বৃক্ষের ফলকে স্বাদের জন্য ভক্ষণ করে এবং অন্যটি ফলকে ভক্ষণ না করে সব দিক দেখছে।

ভাবার্থ হল এই যে, বৃক্ষটি জগৎ এবং পক্ষী দুটির একটি হল জীবাত্মা আর অপরটি পরমাত্মা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই অনাদি। উভয়েই সখ্যস্বরূপ। জীবাত্মা সংসার বৃক্ষের পাপ-পুণ্যরূপী ফল ভোগ করে জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হয় কিন্তু পরমাত্মা ফলভোগ করেন না। তিনি **সাক্ষীরূপে** বর্তমান।

তব শরীরং পতয়িষ্ণ্বর্ব তব চিত্তংবাত ইব ধ্রজীমান।
তব শৃঙ্গাণি বিষ্ঠিতা পুরুত্রারণ্যেষু জর্ভুরাণা চরন্তি॥
(ঋগ্‌বেদ ১।১৬৩।১১)

হে আত্মন্! তোমার আশ্রিত শরীর পতনশীল, তোমার চিত্ত বায়ুর ন্যায় বেগবান, তোমার ইন্দ্রিয়রূপী শৃঙ্গসমূহ বাসনারূপী অরণ্যসমূহে নিরন্তর বিচরণ করে।

এর তাৎপর্য হল এই যে, **জীবাত্মা শরীর থেকে পৃথক্**। ইন্দ্রিয়সকল বিষয় বাসনায় আবদ্ধ হলে ও মন চঞ্চল হলে বিপদ ঘটে।

অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোই মর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ।
তা শশ্বন্ত্যা বিষুচীনা বিয়ন্তা নন্যং চিক্যুর্ণ নি চিক্যুরন্যম্॥
(ঋগ্‌বেদ ১৬৪।৩৮)

জীবাত্মা অশুভ কার্য করে নীচ গতি প্রাপ্ত হয় ও শুভ কার্য করে ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়। সে মৃত্যুহীন কিন্তু মরণশীল দেহাদির সঙ্গে বাস করে এবং অন্ন-জলাদি গ্রহণ করা শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম করে। আসলে কিন্তু জীবাত্মা শরীর থেকে সর্বতোভাবে পৃথক। কেবল শরীরের প্রতি তাদাত্মবশতঃই সে কর্মফল ভোগ করার জন্যই লোক-লোকান্তরে গমন করে। **মরণশীল মনুষ্যই জীবাত্মাকে শরীর থেকে পৃথক মনে করে না।**

ইয়ং কল্যাণ্য জরামর্ত্যস্যামৃতা গৃহে।
যস্মৈ কৃতা শয়ে স যশ্চকার জজার সঃ॥
(অথর্ববেদ ১০৪।২।২৬)

জীবাত্মা অমর, অজর ও মঙ্গলময় কিন্তু সে মনুষ্যের শরীররূপী বিনাশশীল গৃহে বাস করে। যে পুরুষার্থী মানুষ নিজ উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করে, সেই প্রশংসনীয় হয়।

ভগবৎ স্তুতি

যো অগ্নৌ রুদ্রো যে অপ্স্বন্তর্য ওষধীর্বিরুধ্ব আবিবেশ।
য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চাকলৃপে তস্মৈ রুদ্রায় নমঃ অস্ত্বগ্নয়ে॥
(অথর্ববেদ ৭।৮৭।১)

যে পরমাত্মা অগ্নিতে, জলে, বিবিধ ওষধীতে, বনস্পতিতে ব্যাপ্ত আছেন, যিনি এই নিখিল ভুবন রচনা করেছেন, সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মাকে নমস্কার।

ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ।
অধা তে সুম্মমীমহে॥

(ঋগ্‌বেদ ৮।৯৮।১১)

হে পরমাত্মন্! তুমি সকলের আশ্রয়স্থল, অগণিত শুভকার্যের সম্পাদক। তুমি সকলের পিতা, তুমিই মাতা, এজন্য তোমাকে উত্তমরূপে মনন করি।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

(যজুর্বেদ ১৩।৪)

যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে গর্ভে স্থান দিয়েছেন, জগতের একমাত্র প্রসিদ্ধ রক্ষক, তিনি জগদুৎপত্তির পূর্বেও ছিলেন এবং এই পৃথিবী ও সূর্যাদিকে ধারণ করে আছেন, আমরা সেই সুখস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রেমের সহিত পূজা করি।

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

(যজুর্বেদ ২৫।১৩)

যিনি আত্মজ্ঞান ও শক্তির দাতা, সমগ্র মনুষ্য ও সূর্যাদি দেবতা যাঁর আজ্ঞা পালন করেন, যাঁর আশ্রয় মোক্ষদায়ক ও যাঁকে বিস্মৃত হওয়া জন্ম-মৃত্যু আদি দুঃখের হেতু, আমরা সেই সুখস্বরূপ পরমাত্মাকে অন্তঃকরণ দ্বারা উপাসনা করি।

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

(যজুর্বেদ ২৩।৩)

যিনি মহিমা বলে চেতন ও জড় জগতের রাজা, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর ওপর শাসন করছেন, সেই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে মনের দ্বারা

উপাসনা করি।

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তম্ভিতং যে ন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

(যজুর্বেদ ৩২।৬)

তেজস্কর দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁর দ্বারা দৃঢ় হয়েছে, সূর্যাদি লোক লোকান্তরকে যিনি ধারণ করে আছেন, যাঁর দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, যিনি অনন্ত শূন্যে লোক-লোকান্তরসমূহের নিয়ামক, আমরা সেই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে ভক্তির সহিত উপাসনা করি।

যো ভূতং চ ভব্যং সর্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥

(অথর্ববেদ ১০।৪।২।১)

যিনি ভূতকাল, ভবিষ্যৎকাল ও বর্তমান এবং এই নিখিল জগতের অধিষ্ঠাতা, সুখই যাঁহার কেবল স্বরূপ সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্মকে নমস্কার।

যস্য ভূমিঃ প্রমান্তরিক্ষমুতোদরম্।
দিবং যশ্চক্রে মূর্ধানং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥

(অথর্ববেদ ১০।৪।১।৩২)

ভূমি যার পাদমূল সদৃশ, অন্তরীক্ষ যাঁর উদরসদৃশ আর দ্যুলোককে যিনি মস্তক সদৃশ সৃষ্টি করেছেন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্মকে নমস্কার।

যস্য সূর্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চপুনর্ণবঃ।
অগ্নিং যশ্চক্র আস্যং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥

(যজুর্বেদ ১০।৭।৩৩)

যিনি সৃষ্টির আদিতে বার বার নব নব রূপ ধারণ করে সৃষ্টি করেন। সূর্য, চন্দ্র যাঁর নেত্র সদৃশ, অগ্নি যাঁর মুখ সদৃশ সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্মকে নমস্কার।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ।
ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

(যজুর্বেদ ১৬।৪১)

কল্যাণ ও সুখের কারণকে নমস্কার। কল্যাণদাতা ও সুখদাতাকে নমস্কার।

কল্যাণময় ও সুখময়কে নমস্কার।

স নঃ পিতেব সুনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে॥

(ঋগ্বেদ ১।১।৯)

হে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মন্! পুত্রের নিকট পিতার মতো তুমি আমাদের নিকট সহজলভ্য হও। কল্যাণের জন্য তুমি আমাদের পরস্পরকে যুক্ত করো।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা

ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়ৎ॥

(ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০, যজুর্বেদ ৩।৩।৫, ৩০।২, সামবেদ উঃ আর্চিক ৬।৩।১০)

এই ত্রিলোকের সৃষ্টিকারী পরম বরণীয় জ্যোতিঃস্বরূপ হে দেব! তোমাকে আমি হৃদয়ে ধারণ করি। যেন আমাদের প্রজ্ঞা সদা তোমার দিকে চালিত হয়।

ভাবার্থ হল এই যে, পরমাত্মাই জগতের স্রষ্টা এবং জীবনের কর্মফলদাতা। তিনিই জীবনের একমাত্র উপাস্যদেব। তাঁর স্বরূপ চিন্তাই উপাসনা। তাঁর উপাসনা করলে বুদ্ধিবৃত্তি, শুভ গুণ, কর্ম ও স্বভাব সব তাঁর দিকে চালিত হয় এবং এতেই জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। (যজুর্বেদ ৩০।৩)

হে জগতের উৎপত্তি কর্তা সুখদাতা পরমেশ্বর! তুমি আমাদের দুঃখ ও দুর্গুণসমূহকে দূর করে যা শুভ তাই প্রদান করো।

তেজোঽসি তেজোময়ি ধেহি বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি বলমসি বলং ময়ি ধেহি ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি সহোসি সহো ময়ি ধেহি।

(যজুর্বেদ ১৯।৯)

হে পরমাত্মন্! তুমি তেজস্বী, আমাতে তেজ স্থাপন করো। তুমি বীর্যবান, আমাতে বল স্থাপন করো। তুমি ওজস্বী, আমাতে ওজঃ স্থাপন করো। তুমি অধর্মের দণ্ডদাতা, আমাতে অধর্ম দমনের শক্তি স্থাপন করো। তুমি সহনশীল, আমাতে সহনশক্তি স্থাপন করো।

স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো আদিতে কৃধি॥

(ঋগ্বেদ ৫।৫১।১৪)

প্রাণ ও অপান কল্যাণময় হোক। ধনাগমের পথ কল্যাণময় হোক। ঐশ্বর্য ও অগ্নি কল্যাণময় হোক। হে পরমাত্মন্! আমাদের কল্যাণ সাধন করো।

স্বস্তি পন্থা মনুচরেম সূর্যচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমে মহি॥

(ঋগ্বেদ ৫।৫।১৫)

সূর্য চন্দ্রের মতো আমরা কল্যাণ মার্গের আচরণ করি। আমরা দানশীল হই, আমরা অহিংসক হই, আমরা বিদ্বান সৎ-পুরুষের সঙ্গলাভ করি।

ভাবার্থ হল এই যে যেমন সূর্য, চন্দ্র কোনো দিকে দৃকপাত না করে পরমাত্মার আজ্ঞা পালন করে, সেইরূপ আমরাও যেন সদা সত্যপথে বিচরণ করি।

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥

(যজুর্বেদ ২৫।১৯)

অনন্ত কীর্তিমান, ঐশ্বর্যময়, জ্ঞানের অধীশ্বর, পুষ্টিদাতা, শুদ্ধ গতিমান, তীব্র বেগবান, লোক-লোকান্তরের আধার পরমাত্মা, আমাদের জন্য সুখের বিধান করুন।

বোধিন্মনা ইদস্তু নো বৃত্রহা ভূর্যাসুতিঃ।
শৃণোতু শক্র আশিষম্॥

(সামবেদ পূর্বার্চিক ২।৫।৯)

হে পরমাত্মন্! আমাদের শক্তিশালী আত্মা অজ্ঞানান্ধকার দূর করে ও অত্যধিক সমাহিত বৃত্তিযুক্ত হয়ে জ্ঞানশীল হোক। সে নিজ কামনাকে নিজের মধ্যে শ্রবণ করুক।

অপামীবামপ বিশ্বামনাহুতিমপারতিং দুর্বিদত্রা মঘায়তঃ।
আরে দেবা দ্বেষো অস্মদ্যুয়োতনোরুণঃ শর্ম যচ্ছতা স্বস্তয়ে॥

(ঋগ্বেদ ১০।৬৩।১২)

হে দেবতা, হে পরমাত্মন্ ! আমাদের মধ্য থেকে সর্ববিধ ব্যাধি, কার্পণ্য, শত্রুতা, পাপেচ্ছা ও দ্বেষকে দূরে অপসারণ করে শুভ আশ্রয় দান করো।

তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসেবয়মূহুমহে।
পূষা নো যথা বেদসাম সদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে॥

(যজুর্বেদ ২৫।১৮)

হে পরমাত্মন্ ! আমার চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, বুদ্ধির দাতা জগদীশ্বরকে পূজা করি। সেই পুষ্টিদাতা, রক্ষক, পালক, অবিনাশী প্রভু আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির সহায়ক হোন।

ভগবৎ পথে সবাই সমান

তে অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উদ্ভিদোঽমধ্যমাসো মহসা বি বাবৃধুঃ।
সুজাতাসো জনুষা পৃশ্নি মাতরো দিবো মর্যা আ নো অচ্ছা জিগাতেন॥

(ঋগ্বেদ ৫।৫৯।৬)

মানুষের মধ্যে কেহ বড়, ছোট বা মধ্যম নহে। সবাই উন্নতি লাভের জন্য এসেছে এবং উৎসাহের সঙ্গে প্রযত্নের পথে এগিয়ে চলেছে। তারা দিব্য ও জন্ম থেকেই কুলীন। **সকলে সত্য পথে থেকে ভগবানের নিকট গমন করুক।**

সমাজে স্ত্রীদের স্থান

যথা সিন্ধুর্নদীনাং সাম্রাজ্যং সুষুবে বৃষা।
এষা ত্বং সাম্রাজ্ঞ্যেধি পত্যুরস্ত্যং পরেত্য॥
সম্রাজ্ঞ্যেধি শ্বশরেষু সম্রাজ্ঞুত দেবৃষু।
ননান্দুঃ সম্রাজ্ঞ্যেধি সম্রাজ্ঞ্যুত শ্বশ্রুঃ॥

হে বধূ ! যেমন বলবানা সমুদ্র নদীসমূহের ওপর সাম্রাজ্য স্থাপন করে, তুমিও সেইরূপ পতিগৃহে গিয়ে সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকো। শ্বশুরদের মধ্যে,

দেবরদের মধ্যে, ননদ ও শাশুড়িদের সঙ্গে মিলে সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকো।

উতত্বা স্ত্রী শশীয়সী পুংসো ভবতি বস্যসী।
অদেবত্রাদরাধসঃ॥

(ঋগ্বেদ ৫।৬১।৬)

ইহা নিশ্চিত যে বহু পতিব্রতা স্ত্রী শুভকর্ম বর্জিত ও ঈশ্বরোপসনা রহিত পুরুষ থেকে অধিক প্রশংসাভাজন।

পরমাত্মার সৃষ্টিসকলই মধুময়-মধুমতী

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ॥
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধু মাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

(ঋগ্বেদ ১।৯০।৬-৮)

হে পরমাত্মন্! বায়ু ও নদীসমূহ মধু বর্ষণ করুক, আমাদের জন্য ঔষধী সকল মধুময় হোক।

আমাদের রাত্রি ও উষা মধুময় হোক। পৃথিবীর ধূলিকণাও মধুময় হোক, বর্ষণশীল ও পুষ্টিকারী দ্যুলোকও মধুময় হোক।

বনস্পতি আমাদের মধুময় হোক। সূর্য আমাদের জন্য মধুময় হোক। গো জাতি আমাদের মধুময় হোক।

———o———

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

প্রাক্‌কথন

ভগবদ্‌গীতার মহিমা অপার ও অসীম। ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থ প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্গত। মানুষ মাত্রেরই উদ্ধারের জন্য তিনটি রাজমার্গকে 'প্রস্থানত্রয়' নামে অভিহিত করা হয়। একটি হল বৈদিক প্রস্থান যাকে 'উপনিষদ্' বলা হয়, দ্বিতীয়টি হল দার্শনিক প্রস্থান যাকে 'ব্রহ্মসূত্র' বলা হয় এবং তৃতীয়টি হল স্মার্ত প্রস্থান যাকে 'ভগবদ্‌গীতা' বলা হয়। এই তিনটি শাস্ত্রই একই তত্ত্বের ত্রিমুখী বিকাশ।

বেদ (উপনিষদ্) হল **শ্রুতিপ্রস্থান**—অনাদি সত্য অপৌরুষেয়। ইহা কেহ নির্মাণ করেনি। ইহা কেবল ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট হয়েছিল আর গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে অনন্ত জ্ঞান প্রবাহের এই ভাণ্ডার। বেদান্ত সূত্র (ব্রহ্মসূত্র) হল **দার্শনিক প্রস্থান,** ইহা সুসিদ্ধান্তরূপে সংস্থাপিত। আর গীতাকে বলে **স্মার্ত প্রস্থান**। বেদের অন্তর্নিহিত সত্যই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদের মাধ্যমে প্রকটিত হয়েছে গীতাগ্রন্থ।

বেদ (উপনিষদ্) হল মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত, ব্রহ্মসূত্র হল সূত্র দ্বারা রচিত এবং ভগবদ্‌গীতা হল শ্লোকের মাধ্যমে কথিত। গীতা শ্লোকের মাধ্যমে সৃষ্ট হলেও ভগবানের বাণী হওয়ায় এগুলি আসলে মন্ত্রই। এই শ্লোকগুলির অর্থ অত্যন্ত গভীর হওয়ায় এগুলিকে সূত্রও বলা হয়। **'উপনিষদ্'** হল অধিকারী ব্যক্তিদের উপযোগী, **'ব্রহ্মসূত্র'** হল ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সাধকের চর্চার বিষয় কিন্তু **'ভগবদ্‌গীতা'** হল সকল মানুষের জন্যই উপযোগী। ভগবদ্‌গীতা এক অসাধারণ গ্রন্থ। সাধক ব্যক্তির উপযোগী সমস্ত সাধন সামগ্রীই এতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান উদ্ধবকে বলেছেন—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥

(ভাগবত ১১।২০।৬)

অর্থাৎ নিজ কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের জন্য আমি তিনটি যোগপথ বলেছি— জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এই তিনটি ছাড়া কল্যাণ প্রাপ্তির আর কোনো পথ নেই। ভগবদ্গীতায় এই তিন যোগ ছাড়াও আনুষঙ্গিক সাধনার অন্যান্য সমস্ত পথই নির্দেশিত হয়েছে। গীতার উপদেশ দেশ, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়— এ সকলের ঊর্ধ্বে, কালের অতীত, চিরায়ত, চিরন্তন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতেরই কথিত একটি অংশ। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের পঁচিশ অধ্যায় থেকে বিয়াল্লিশ অধ্যায় পর্যন্ত এই আঠারো অধ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে খ্যাত। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শুরু ভীষ্মের অধিনায়কত্বে ভীষ্মপর্ব থেকে। কিন্তু ভীষ্মর মৃত্যুর পরে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয় আর কুরুক্ষেত্রে থাকতে পারেননি, তিনি ত্বরিতে হস্তিনাপুরে এসে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মর নিধন সংবাদ দিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের সমস্ত খবর জানতে চাইলেন। সঞ্জয় এই পর্বেরই ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে চব্বিশ অধ্যায় পর্যন্ত (দ্বাদশটি অধ্যায়) যুদ্ধের রণসজ্জার বর্ণনা করে, পঁচিশ অধ্যায় থেকে পরের আঠারোটি অধ্যায় কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন কথিত গীতার বর্ণনা করেছেন।

বেদব্যাস-শিষ্য মহাত্মা বৈশম্পায়ন যিনি মহারাজ জনমেজয়কে সমগ্র মহাভারত বর্ণনা করেছেন, গীতার বর্ণনার অন্তে তিনি রাজাকে বলছেন—

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।।
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ।
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ববেদময়ো মনুঃ।।
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে।
চতুর্গকারসংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।

হে রাজন্! গীতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত, তাই একে ভালোভাবে স্বাধ্যায় করে বাস্তবায়িত করা উচিত, অধিক শাস্ত্র পাঠ মোটেই সাধন উপযোগী নয়। গীতায় সর্বশাস্ত্রের সমাবেশ, ভগবান সর্বদেবময়, গঙ্গায় সর্বতীর্থের বাস আর মনু সকল দেবস্বরূপ। গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী আর

গোবিন্দ—গ-কারযুক্ত এই চার নাম হৃদয়ে স্থিত হলে আর এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্ম নিতে হয় না।

গীতার ১৮টি অধ্যায় আর এই অধ্যায়গুলির নামকরণও হয়েছে এক একটি যোগ হিসাবে। প্রতিটি অধ্যায় ভগবৎ সাধনের এক একটি পথ। গীতার যোগ ভগবৎ মুখনিঃসৃত, আর অর্জুন ইহা উপদিষ্ট হয়েছেন। তাঁর যেমন যেমন সংশয় হয়েছে তিনি তেমন তেমন প্রশ্ন করেছেন এবং ভগবানও তার গভীর ব্যঞ্জনাত্মক ও সরল ভাবসহ উত্তর দিয়ে এই সন্দেহ নিরসন করেছেন। গীতা সংকলিতও হয়েছে এই সংশয়রূপ প্রশ্ন ও নিরসনরূপ উত্তরের মধ্য দিয়ে[১]।

সমগ্র গীতা ভগবানের উপদেশামৃত হলেও দশম ও একাদশ এই দুটি অধ্যায় বিশেষভাবে অনুধাবনীয় কেননা এই অধ্যায় দুটিতে অর্জুনের কোনো প্রশ্ন নেই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনো উপদেশ নেই, আছে কেবল অর্জুনের প্রার্থনা, অর্জুনের আর্তি। তাই এই অধ্যায় দুটি 'স্তুতি' পুস্তকে সংকলিত হয়েছে।

গীতার দশম অধ্যায়টি হল **'বিভূতিযোগ'**। এই অধ্যায়ে অর্জুন প্রার্থনা করেছেন ভগবৎ বিভূতি জানার জন্য আর ভগবান তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেছেন তাঁর বিভূতি সংক্ষেপে বর্ণনা করে। ভগবান তারপরে বলেছেন —**'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ'** (১০।৪২) অর্থাৎ আমার বিভূতি অনন্ত, তাই আমার এত বিভূতি জানার তোমার দরকারই বা কী ? এই সমগ্র জগৎ তো আমারই বিভূতির এক অংশেই স্থিত।

আবার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন প্রার্থনা করেছেন ভগবানের 'বিশ্বরূপ' দর্শনের জন্য। ভগবান অর্জুনের প্রার্থনা পূরণ করেছেন তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে, তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে। কিন্তু ভগবানের অনন্ত রূপের 'কালরূপী' একটি রূপ দেখেই অর্জুন ভয়ভীত হয়ে পড়ে তাঁকে 'আর্তি, স্তুতি' করেছেন। এটি হল **বিশ্বরূপ দর্শন যোগের** স্তুতি।

গীতার এই অধ্যায় দুটিই এই অংশে আলোচিত হয়েছে।

---

[১]দ্রষ্টব্য—গীতা প্রেস থেকে প্রকাশিত 'গীতা রসামৃত'।

অর্জুনের স্তুতি—বিভূতিযোগ

প্রাক্‌কথন

দশম অধ্যায়ের ৪২টি শ্লোকের মধ্যে প্রথম ১১টি শ্লোক ভগবান বলেছেন অর্জুনের পূর্ববর্তী সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে[১]। আর বাকি ৩১টি শ্লোকে বিভূতিযোগের বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনাটি ৩টি প্রকরণে বিভক্ত।

ভক্তের ওপর ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহের কথা শুনে অর্জুন দশম অধ্যায়ের প্রথম প্রকরণের চারটি শ্লোকে (১২-১৫) ভগবানের স্তুতি করেছেন। আর ভগবানের বিভূতি জ্ঞান যেহেতু তাঁর প্রতি ভক্তের ভক্তি দৃঢ়তর করে তাই পরবর্তী তিন শ্লোকে (১৬—১৮) অর্জুন শ্রীভগবানের কাছে তাঁর বিভূতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করতে অনুরোধ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের শেষ প্রকরণের ২৪টি শ্লোকে (১৯—৪২) অর্জুনের প্রার্থনা পূরণ করে সংক্ষেপে তাঁর বিভূতির বর্ণনা করেছেন।

বিভূতিযোগের প্রকরণ—

শ্রীভগবানের মহিমা বর্ণনা (শ্লোক ১২—১৫)

ভগবৎ বিভূতি বর্ণনের প্রার্থনা (শ্লোক ১৬—১৮)

শ্রীভগবানের প্রার্থনা পূরণ, বিভূতির বর্ণনা (শ্লোক ১৯—৪২)

ভগবানের মহিমা বর্ণনা

(শ্লোক ১২—১৫)

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩
সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।

---

[১]দ্রষ্টব্য—গীতা রসামৃত (পৃষ্ঠা ১৬৬)।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫

সরলার্থ — অর্জুন বললেন — পরমব্রহ্ম, পরমধাম এবং মহাপবিত্র আপনিই। আপনি শাশ্বত, দিব্যপুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত এবং সর্বব্যাপী বিভু—এইরূপে সকল ঋষি, দেবর্ষি, নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসদেব বলে থাকেন এবং আপনি নিজেও আমাকে বলেছেন। ১২-১৩

হে কেশব ! আপনি আমাকে যা বলেছেন তা সব আমি সত্য বলে মানি। হে ভগবান ! দেবতা বা দানব কেউই আপনার প্রকট হওয়ার তাৎপর্য জানে না। ১৪

হে ভূতভাবন ! হে ভূতেশ ! হে দেবদেব ! হে জগৎপতে ! হে পুরুষোত্তম ! আপনি স্বয়ংই নিজের দ্বারা নিজেকে জানেন। ১৫

মূলভাব—স্তুতির প্রথমেই অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আটটি স্বরূপ বর্ণনা করে বলেছেন—হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি পরমব্রহ্ম, পরমধাম, মহাপবিত্র (পবিত্রাণাং পবিত্রং যঃ), শাশ্বত পুরুষ (নিত্য), দিব্য, আদিদেব, অজ (জন্মরহিত) ও সর্বব্যাপী। এ সকল মহিমাই আপ্তবাক্য অর্থাৎ এই সকল মহিমা ভগবানকে প্রাপ্ত ঋষিগণ কর্তৃক বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ঋষিগণের উক্ত এই ভগবদ্ বর্ণনা মহাভারতের ভীষ্মপর্বেও উল্লিখিত আছে। **মার্কণ্ডেয় ঋষি** বলছেন—'শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞাদির যজ্ঞ, তপস্যাদির তপ এবং তিনিই ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান' (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৬৮।৩)। **ঋষি ভৃগু** বলছেন—ইনি দেবাদিদেব এবং পরম প্রাচীন বিষ্ণু (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৬৮।৪)। **ঋষি অঙ্গিরা** বলছেন—ইনি সকল প্রাণীর স্রষ্টা (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব)। **দেবর্ষি নারদ** বলছেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল লোকের স্রষ্টা ও সমস্ত ভাবের প্রকাশক। ইনি সাধ্যগণ ও দেবগণের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর।' (মহাভারত, বনপর্ব ১২।৫০)। **মহর্ষি বেদব্যাস** বলছেন—'আপনি বসুদের বাসুদেব, ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রদানকারী এবং দেবগণেরও পরম দেবতা।' (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৬৮।৫)।

অর্জুন আরও বলছেন **'ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিম্'** অর্থাৎ তোমার ভগবত

তত্ত্ব অচিন্তনীয় এবং তোমার এই প্রকটিত হওয়ার কারণ মনুষ্য, দেবতা ও দানবদেরও চিন্তার অতীত। দেবতাদের মধ্যে মানুষের চেয়েও অধিক দিব্যতা থাকে কিন্তু এই দিব্যতা দিয়েও ভগবদ্‌তত্ত্ব জানা যায় না। কারণ এই দিব্যতাও প্রাকৃত (উৎপত্তি ও বিনাশশীল), তাই এর দ্বারা তাঁকে জানা সম্ভব নয়। আবার দেবতারাই যখন তাঁকে জানতে পারেন না, তখন দানবরাই বা তাঁকে জানবে কী করে ? এখানে **'দানবাঃ'** কথাটির অর্থ হল যারা বিশেষ প্রকার মায়া জানে এবং তার দ্বারা নানা অদ্ভুত প্রভাব দেখাতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবান অনন্ত, অসীম আর দানবদের মায়াশক্তি যতই বিশেষ হোক তা হল প্রাকৃত, সীমিত এবং বিনাশশীল। তাই এই সীমিত, বিনাশশীল বস্তুর সাহায্যে কিভাবে ভগবদ্‌তত্ত্ব মানা সম্ভব ?

এখানে অর্জুনের স্তুতির তাৎপর্য এই যে ; মানুষ, দেবতা বা দানব কেউই নিজ নিজ শক্তি, সামর্থ্য বা বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে জানতে পারে না ; আবার ত্যাগ, বৈরাগ্য, তপ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি যদিও চিত্তকে নির্মল করে, কিন্তু এই শক্তির দ্বারাও প্রকৃতির অতীত ভগবদ্‌তত্ত্ব জানা যায় না। তাঁকে জানার উপায় শ্রুতি বলেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃনুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃনুতে তনূ স্বাম্‌॥

(কঠোপনিষদ্ ১।২।২৩)

অর্থাৎ উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন, মনের ধারণা, চিন্তাশক্তি, বহু শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায় না। কেবল তিনি যাঁকে বরণ করেন সেই তাঁকে পেয়ে থাকে। তিনি কাকে বরণ করেন সে সম্বন্ধে গীতা বলছে—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

(গীতা ৮।১৪)

অর্থাৎ 'অনন্যভাবে তাঁর শরণ গ্রহণ করলেই তাঁর কৃপায় তাঁকে জানা যায়।'

পরের পঞ্চদশ শ্লোকে অর্জুন ভগবানের পাঁচটি মহিমার কথা বলেছেন।

অর্জুন স্তুতি করে বলছেন— হে ভগবান আপনি '**ভূতভাবন**' অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর উৎপন্নকারী, আপনি '**ভূতেশ**' ও '**দেবদেব**' অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী ও দেবতাগণেরও অধীশ্বর, আপনি '**জগৎপতি**' অর্থাৎ জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গমরূপ সমগ্র জগতের পালন-পোষণকারী এবং আপনি '**পুরুষোত্তম**' অর্থাৎ সকল পুরুষেরও উত্তম বা শ্রেষ্ঠও আপনি, তাই বেদে এবং ত্রিলোকে আপনি এই নামেই অভিহিত হন। কিন্তু আপনাকে জানার উপায় নেই, কারণ আপনাকে একমাত্র জানেন আপনিই।

তবে ভগবানের অংশ জীবও নিজের দ্বারা নিজেকে (অর্থাৎ **আত্মা দ্বারা স্বরূপকে**) জানতে পারেন, কিন্তু আপনাকে কখনই ইন্দ্রিয়াদি, মন বা বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় না। ইন্দ্রিয়াদিকে ইন্দ্রিয়গুলি দেখে না দেখে মন, মনকে যে দেখে সে হল বুদ্ধি, মন নয়। বুদ্ধিকে বুদ্ধি দ্বারা দেখা যায় না দেখে অহং আর অহংকেও অহং দেখে না দেখে স্বয়ং অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ। কিন্তু স্ব-স্বরূপ নিজেই নিজেকে দেখেন। নিজেকে নিজে জানার অর্থ হল—জ্ঞাতাও তিনি, জ্ঞানও তিনি, জ্ঞেয়ও তিনি। অর্থাৎ তাৎপর্য হল এই যে তিনি ছাড়া আর তো কেউ নেই, কিছুই নেই, তখন কে কাকে জানবে ?

'**নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা**' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২।৭।২৩)

ইনি ছাড়া দ্রষ্টা আর কেউ নেই।

'**বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ**' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২।৪।১৪)

যিনি সকলের বিজ্ঞাতা তাঁকে কেমন করে জানবে ? সকলের জ্ঞাতার জ্ঞাতা আর কেউ হতে পারে না, তাই পরমাত্মতত্ত্ব নিজেই নিজের জ্ঞাতা। তবে শ্রীভগবান এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে বলেছেন—

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ (গীতা ১০।৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য তত্ত্বত জানেন, অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে মেনে নেন তিনি অবিচলভাবে ভগবানে ভক্তিযোগে যুক্ত হন। শ্রীভগবানের শক্তি ও সামর্থ্যকে বলে '**যোগ**' আর এই যোগ দ্বারা প্রকটিত ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থ যা প্রকটিত হয় তাকে বলে '**বিভূতি**'। ভগবানের বিভূতির

মাহাত্ম্যের কথা শুনে অর্জুনের মনে হল তাহলে ভগবানে ভক্তি দৃঢ় করার সহজ উপায় হল তাঁর বিভূতির শ্রবণ ও মনন। তাই এই অধ্যায়ের পরবর্তী প্রকরণে আছে ভগবানের প্রতি অর্জুনের বিভূতি বর্ণনা করার প্রার্থনা।

ভগবৎ বিভূতি বর্ণনার জন্য প্রার্থনা
(শ্লোক ১৬—১৮)

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১৭
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

সরলার্থ—অতএব যেসব বিভূতি দ্বারা আপনি সর্বলোকে ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে অবস্থান করছেন, সেইসকল দিব্য বিভূতি সম্পূর্ণভাবে আপনিই বর্ণনা করতে সক্ষম।১৬

হে যোগী ! সর্বদা সর্বতোভাবে চিন্তারত আমি আপনাকে কেমন করে জানব ? এবং হে ভগবান ! আপনি কোন কোন ভাবের মাধ্যমে আমার দ্বারা চিন্তনীয় হতে পারেন ? অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ কোন কোন ভাবের সাহায্যে আপনাকে আমি চিন্তা করব ? ১৭

হে জনার্দন ! আপনি আপনার যোগ (সামর্থ্য) এবং বিভূতিগুলি বিস্তারিতভাবে পুনরায় বলুন ; কারণ আপনার এই অমৃতময় বচন শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। ১৮

মূলভাব—অর্জুন স্তুতির প্রারম্ভে প্রার্থনা করেছেন—'**বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ**' (গীতা ১০।১৬) অর্থাৎ যেসব বিভূতি দ্বারা আপনি সর্বলোকে ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে অবস্থান করছেন, সেইসকল দিব্যবিভূতিসমূহ আমাকে বর্ণনা করুন।

ভগবানও বিভূতি বর্ণনার প্রারম্ভে বলেছেন—'**হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা**

হাত্মবিভূতয়ঃ' (গীতা ১০।১৯) অর্থাৎ ভগবান বলছেন আমার দিব্য বিভূতিগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

আর বিভূতিযোগের উপসংহারে বলছেন— '**নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতিনাং পরন্তপ**' (গীতা ১০।৪০) অর্থাৎ আমার দিব্য বিভূতিসমূহের অন্ত নেই। আমি তোমাকে আমার যা বিভূতি বর্ণনা করছি, তা শুধু আমার বিভূতিগুলির সংক্ষেপ।

এখানে তিনটি স্থানেই ভগবানের দ্বারা 'দিব্য' পদটি উল্লেখিত হয়েছে। কারণ দিব্য শব্দটি অলৌকিকতা ও বিলক্ষণতার প্রতীক। **সাধকের মন যেখানেই যাক সেখানেই ভগবদ্চিন্তা হলে, দিব্যতা স্বতঃই প্রকটিত হয় ;** কারণ ভগবানের ন্যায় দিব্য আর কেউই নেই। যদিও মর্ত্যলোকের তুলনায় দেবতাদের আয়ু, সামর্থ্য, ভোগ্যবস্তু ইত্যাদি বিশেষ হওয়ায় তাদের দিব্য বলা হয় কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তাঁরা দিব্য নন। প্রকৃত অর্থে দিব্য হলেন একমাত্র ভগবান।

ভগবানের যতগুলি বিভূতি আছে সবই দিব্য। কিন্তু সাধকদের কাছে বিভূতিগুলির দিব্যতা তখনই প্রকট হয় যখন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হয় ভগবদ্প্রাপ্তি আর তখন তিনি ভগবদ্তত্ত্ব জানার জন্য রাগ-দ্বেষরহিত হয়ে কেবল তাঁর বিভূতিগুলিই চিন্তন করেন।

আবার এখানে যদিও অর্জুন উৎকৃষ্ট শিষ্য ও বিশিষ্ট শ্রোতা এবং শ্রবণেন্দ্রিয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়র অপেক্ষা অনেক বেশি উপযোগী এবং সক্ষম তবুও অর্জুনের অনুরোধ সত্ত্বেও ভগবান তাঁর সমগ্র বিভূতির বর্ণনা না করে সংক্ষেপে তাঁর কিছু প্রধান প্রধান বিভূতির কথা বর্ণনা করেছেন। কারণ ভগবান অনন্ত আর তাঁর বিভূতিও অনন্ত। '**হরি অনন্ত হরি কথা অনন্তা**' (শ্রীরামচরিতমানস ১।৪০।৫)। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান বলেছেন '**সংখ্যানাং পরমাণুনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া। ন তথা মে বিভূতিনাং সৃজোতোঽগুনি কোটিশঃ॥**' (ভাগবত ১১।১৬।৩৯) অর্থাৎ আমার দ্বারা সৃষ্ট পরমাণু সংখ্যার গণনা যদি বা সম্ভব হয় কিন্তু আমার বিভূতির গণনা সম্ভব নয়। গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে ভগবানের একশো চুরানব্বইটি

বিভূতি বর্ণিত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবানের কারণরূপে সতেরোটি বিভূতি (গীতা ৭।৮-১২), নবম অধ্যায়ে কার্যকারণরূপে সাঁইত্রিশটি বিভূতি (গীতা ৯।১৬-১৯), দশম অধ্যায়ে ভাবরূপে কুড়িটি বিভূতি (গীতা ১০।৪-৫) এবং ব্যক্তিরূপে পঁচিশটি বিভূতি (গীতা ১০।৬) আর এই অধ্যায়ে বর্তমান আলোচ্য অংশে বিরাশিটি বিভূতির বর্ণনা আছে। এর মধ্যে মুখ্য হল একাশিটি বিভূতি (গীতা ১০।২০-৩৮) ও সাররূপে একটি বিভূতি (গীতা ১০।৩৯)। পঞ্চদশ অধ্যায়ে প্রভারূপে তেরোটি বিভূতি (গীতা ১০।১২-১৫) বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ের কুড়ি থেকে উনচল্লিশ শ্লোক পর্যন্ত (এই কুড়িটি) শ্লোকে বিরাশিটি বিভূতির বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে—

চব্বিশতম ও সাতাশতম শ্লোকে তিনটি করে, বত্রিশতম ও ছত্রিশতম শ্লোকে পাঁচটি করে, চৌত্রিশতম শ্লোকে নয়টি, উনচল্লিশতম শ্লোকে একটি এবং বাকি চৌদ্দোটি শ্লোকে চারটি করে বিভূতির বর্ণনা আছে।

এই অধ্যায়ে যে বিরাশিটি বিভূতির কথা বলেছেন তার তাৎপর্য এই নয় যে তাঁর সম্বন্ধে ছোট-বড় অথবা উত্তম-মধ্যম-অধম বিষয়ে মানুষকে জানানো, বরং তাঁর বিভূতির বর্ণনা করা হয়েছে এই কথা জানানোর জন্য যে, যে কোনো ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা বা পরিস্থিতিই উপস্থিত হোক না কেন তাতে ভগবদ্‌ চিন্তাই হওয়া উচিত।

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগদ্‌সর্বং দৃশ্যতে শ্রুয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥

(মহানারায়ণোপনিষদ্‌ ১১।৬)

এই জগতে যা কিছু দেখা বা শোনা যায়, তার সবকিছুর বাইরে বা ভিতরে ব্যাপ্তস্বরূপ হয়ে ভগবানই স্থিত আছেন।

বিষ্ণুপুরাণও বলছে—

সর্বে চ দেবা মনবসমস্তাস্‌সপ্তর্ষয়ো যে মনুসূনবশ্চচ।
ইন্দ্রশ্চ যোঽয়ং ত্রিদশেশভুতো বিষ্ণোরভুশেষাস্ত বিভূতয়স্তাঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৩।১।৪৬)

সমস্ত দেবতা, মনুষ্য, সপ্ত ঋষি, মনু, ইন্দ্রাদি সকলেই সেই

বিষ্ণুরই বিভূতি।

এখন প্রশ্ন এই যে, যখন সম্পূর্ণ জগৎ-সংসারই ভগবৎস্বরূপ তখন বিভূতি বর্ণনা করার প্রয়োজন কী ? এর তাৎপর্য হল এই যে, অর্জুনের প্রশ্ন ছিল—**'কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্'** (গীতা ১০।১৭) অর্থাৎ আমি আপনাকে কোন্ কোন্ জায়গায় চিন্তা করব ? ভগবান জানেন যে জগৎ-সংসারে তিনি অন্তর্নিহিত থাকলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে তা উপলব্ধি করা দুরূহ। তাই অর্জুনের প্রার্থনার উত্তরে ভগবান বলছেন, প্রকৃতপক্ষে সবই তাঁর প্রকাশ হলেও মানুষ যে সব বস্তুতে শক্তির বিশেষ প্রকাশ দেখে এবং আকর্ষিত হয়, সেই সেই বস্তুতে ভগবানকে দেখা ও চিন্তা করা সহজ হয়। কারণ তার মনে সব সময় তাঁর সেই সেই বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হতে থাকায় মন স্বতঃই সেই দিকে যায়। সেইজন্যই ভগবান তাঁর বিভূতিসকল বর্ণনা করেছেন।

ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদেও ভগবান উদ্ধবকে বলেছেন—

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি॥

(ভাগবত ১১।২৯।১৫)

যে ব্যক্তি সর্বপ্রাণীতে নিত্য ঈশ্বরভাব চিন্তা করে, তার অহংকার, অসূয়া, স্পর্ধা ও আক্রোশ স্বতঃই বিনাশ হয়।

মানুষের হৃদয়ে জগতের **অস্তিত্ব, মহত্ত্ব** ও **সম্বন্ধই** মানুষকে আবদ্ধ করে। তাই জগতে মানুষের যেখানে আকর্ষণ বেশি থাকে, আর সেখানে যদি তার ভোগবুদ্ধি না হয়ে ভগবদ্‌বুদ্ধি হয়, তাহলে তখন তার হৃদয়ে জগতের অস্তিত্ব, মহত্ত্ব ও সম্বন্ধ চিন্তা না হয়ে ভগবানের অস্তিত্ব, মহত্ত্ব ও সম্বন্ধই সবসময় প্রতীয়মান হবে।

গীতায় ভগবান যেমন তাঁর বিভূতির বর্ণনা করেছেন সেইরকম ভাগবতেও (একাদশ স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে) ভগবান উদ্ধবকে তাঁর বিভূতির বর্ণনা করেছেন। গীতায় কথিত কয়েকটি বিভূতির বর্ণনা ভাগবতে নেই আবার ভাগবতের কিছু বিভূতির বর্ণনা গীতায় নেই। আবার কোনো কোনো বিভূতির বর্ণনাতেও পার্থক্য আছে। যেমন গীতায় বলেছেন—**'পুরোধসাং চ**

মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্' (১০।২৪) আর ভাগবতে ভগবান বলেছেন—**'পুরোধসাং বসিষ্ঠোঽহম্'** (ভাগবত ১১।১৬।২২)। এর তাৎপর্য হল এই যে গীতা ও ভাগবতের বিভূতি বর্ণনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, যা কিছুতেই শ্রদ্ধা আসবে তাকেই ভগবানের বিভূতি বলে মনে করা, যা কিছুতেই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা যে কোনো স্থান, বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতিই হোক না কেন সমস্ত ভাবেই যেন ভগবানের বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত করা এবং, **সমস্ত পরিস্থিতিকেই মঙ্গলময় ভগবানের কল্যাণকর বিধান বলে মেনে নেওয়াই হল প্রকৃষ্ট সাধনা, ভগবানকে পাওয়ার সহজ পথ।**

ভক্তচরিত

আখ্যান— কাকভূশণ্ডি— লোমশ মুনির অভিশাপে কাকভূশণ্ডি ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পক্ষী (কাক) হয়ে যান, কিন্তু তাতেও তাঁর ভয় হয়নি, দীনতা আসেনি বা কোনো সংশয়ও হয়নি। বরং এতে তিনি মুনির দোষ না দেখে প্রসন্নই হলেন, কারণ তা ভগবানেরই প্রেরণা বলে মনে করেছিলেন—

সুনু খগেস নহিঁ কছু রিষি দূষন। উর প্রেরক রঘুবংস বিভূষন॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৩।১)

চিত্রকেতু—রাজা চিত্রকেতু সঙ্কর্ষণ দেবের অনুগ্রহে অতুল ঐশ্বর্য ও মহিমা লাভ করেও নিজ কর্মদোষে পার্বতী কর্তৃক অভিশাপগ্রস্ত হয়ে অসুর যোনি প্রাপ্ত হন। একবার বিষ্ণুদত্ত রথে আরোহণ করে আকাশপথে বিচরণকালে ভগবতী শঙ্করীকে ভগবান শঙ্করের কোলে বসা অবস্থায় দেখে উপহাস করায়, তিনি পার্বতী কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে বৃত্রাসুর হন। কিন্তু ভক্তির এতই মহিমা যে তিনি এতেও বিচলিত হলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রথ থেকে নেমে দেবীর নিকট অবনত মস্তকে দাড়িয়ে তাঁকে বললেন—

প্রতিগৃহ্ণামি তে শাপমাত্মনোঽঞ্জলিনাম্বিকে।
দেবৈর্মর্ত্যায় যৎ প্রোক্তং পূর্বদিষ্টং হি তস্য তৎ॥

(ভাগবত ৬।১৭।১৭)

হে মাতঃ ! আপনার এই শাপ আমি অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করেছি। আমি এই শাপ মোচন করতে ইচ্ছে করি না কারণ কর্মফল ভোগে জীবের কোনো

স্বাধীন কর্তৃত্বই নেই। অনাদি সংসার প্রবাহের ন্যায় কর্মপ্রবাহও অনাদি। আর এই কর্মপ্রবাহে পতিত জীবকে, নিজ নিজ পূর্ব কর্ম অনুযায়ী ভগবান সমুচিত ফল প্রদান করেন। ভগবান সমদর্শী, তিনি ইচ্ছেমতন কাহাকেও যেমন তেমন ফলপ্রদান করেন না, জীবের যেমন প্রাক্তন কর্ম, তদনুসারে ফলের ব্যবস্থা করেন, এতে অন্য কারোর দোষ নাই। পরম করুণাময় ভগবান যা বিধান করেন তাতে আর দুঃখ কী ?

অথ প্রসাদয়ে ন ত্বাং শাপমোক্ষায় ভামিনি।
যন্মন্যসে হ্যসাধূক্তং মম তৎ ক্ষম্যতাং সতি॥

(ভাগবত ৬।১৭।২৪)

হে দেবী ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন। আমি শাপমোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি না। আমার প্রার্থনা এই যে আমার যে উক্তিকে আপনি অন্যায় বলে মনে করেছেন, তা ক্ষমা করুন।

শাপগ্রস্ত চিত্রকেতু এইরূপে দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং কোনো প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই স্বীয় রথে আরোহণপূর্বক প্রস্থান করলেন। তা দেখে শংকর ও শংকরী বিশেষ বিস্ময়ান্বিত হলেন এবং মহাদেব অতঃপর বললেন—

নাহং বিরিঞ্চো ন কুমারনারদৌ, ন ব্রহ্মপুত্রা মুনয়ঃ সুরেশাঃ।
বিদাম যস্যেহিতমংশকাংশকা ন তৎস্বরূপং পৃথগীশমানিনঃ॥

(ভাগবত ৬।১৭।৩২)

অর্থাৎ আমি ব্রহ্মা, সনৎকুমার, নারদ, ব্রহ্মার পুত্র মরীচি প্রমুখ মহর্ষিগণ এবং প্রধান প্রধান দেবগণ — আমরা কেহ ভগবানের অংশ, কেহ বা অংশস্বরূপ, অথচ আমরাই তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পারি না। পরম সৌভাগ্যশালী এই চিত্রকেতু ভগবান শ্রীহরির প্রিয়ভক্ত, তাই তিনি বিদ্যাধর সম্প্রদায়ের অধিপতি হয়েও ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ হওয়ায় শাপ, বর, ভাল, মন্দ আদি জগৎ সংসারে যতকিছু দ্বন্দ্ব সব অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন।

শ্রীশুকদেব বলেছেন— **'মাহাত্ম্যং বিষ্ণুভক্তানাং শ্রুত্বা বন্ধাদ্বিমুচ্যতে'**

(ভাগবত ৬।১৭।৪০) অর্থাৎ মহাত্মা চিত্রকেতুর এই পবিত্র ইতিহাস বিষ্ণুভক্তগণের মাহাত্ম্য প্রকাশক। ইহা শ্রবণ করলে জীব সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এইরকম মানুষও যদি এইভাবে সকল বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা বা পরিস্থিতির মূলে ভগবানের মঙ্গলময় হাত দেখে, তবে সে সর্বদা আনন্দে থাকবে।

জগতে যা কিছু বিশেষরূপে দেখা যায়, সেগুলিকে যদি জগতের (বা নিজের) বলে মনে করা হয় তবে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, আর তার ফলেই তার পতন ঘটে। তাই ভগবান অত্যন্ত সরল সাধন প্রণালী জানিয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, যে যে স্থানে, যে যে বিশেষত্বর দিকে বিশেষভাবে মন আকৃষ্ট হয়, সেগুলিকে তাঁরই বিশেষত্ব বলে জানতে হবে। এই সকল বিশেষত্বই ভগবানের এবং তাঁর থেকে আহরিত এবং তা কখনই এই পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল জগতের নয়।

জীব ভগবানেরই অংশ কিন্তু সে ভ্রমক্রমে অসৎ অর্থাৎ শরীর-সংসারাদির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেয়। কিন্তু যখন জগতের যা কিছু মহত্ত্ব, বিশেষত্ব, শোভা আদিকে জীব পরমাত্মার বলে মনে করে তখন তার মতি জগতের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পরমাত্মার দিকেই যায় অর্থাৎ সে উদ্ধারলাভ করে।

গীতায় ভগবান বলছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

(গীতা ৮।১৪)

অর্থাৎ অনন্যচিত্তে যে ব্যক্তি আমাকে নিত্য স্মরণ করে (জগতের সকল বস্তুর মধ্যে ভগবানের প্রকাশ দেখে), সেই নিত্যযুক্ত ব্যক্তির কাছে আমি সহজলভ্য।

আবার যদি জীব ওইসব বিশেষত্বকে জগতের (বা নিজের) বলে ভেবে নেয় তবে সে জগতের আকর্ষণেই আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ তার পতন হয়। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান জগতের বিষয়াকৃষ্ট জীবের পতনের কারণ সম্বন্ধে বলছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩

(গীতা ২।৬২-৬৩)

তাই জাগতিক প্রবৃত্তিকালে যাতে জগতের চিন্তা না হয়ে সতত পরমাত্মার চিন্তা হয় তবে তাঁকে তত্ত্বত জানা যায়, আর সেইজন্যই এই বিভূতিগুলির বর্ণনা করা হয়েছে।

অবশ্য এই অধ্যায়ে বর্ণিত সমস্ত বিভূতি সকলের অনুভূতিযোগ্য নয়, আবার পরমাত্মার অন্য অনেক বিভূতি আছে যেগুলি আমাদের বিশেষ আকর্ষণ করলেও সেগুলির বর্ণনা এখানে করা হয়নি। সুতরাং সাধকের উচিত যে স্থানে কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্যবশত তাদের মন জগতের কোনো বিশেষত্বর প্রতি আকর্ষিত হয়, সেখানেই এবং সেগুলিকেই তাঁরা যেন ভগবানের বলে মনে করেন, তাঁকেই চিন্তা করেন, তা ভগবান এখানে বর্ণনা করুন বা নাই করুন।

পূর্বে সপ্তম, নবম ও দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভেও ভগবান তাঁর কতিপয় বিভূতির কথা বলেছেন কিন্তু তাতে অর্জুনের মন ভরেনি, তাই তিনি স্তুতি করে বলেছেন '**বক্তুমর্হস্যশেষেণ**' অর্থাৎ আপনি কৃপা করে আপনার সমস্ত বিভূতিগুলিই বলুন যাতে আপনার প্রতি আমার ভক্তি দৃঢ়তর হয়। অর্জুন এরপর জিজ্ঞাসা করছেন '**কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া**' (গীতা ১০।১৭) অর্থাৎ কোন্ কোন্ ভাব নিয়ে আপনাকে চিন্তা করব ? কারণ ভগবান আগে বলেছেন, 'যে আমাকে অনন্যভাবে চিন্তা করে তার যোগক্ষেম আমি বহন করি।' তাৎপর্য হল **ভগবদ্ চিন্তাই হল সাধনা আর ভগবানকে তত্ত্বত জানাই হল সাধ্য।**

অর্জুন তাই জিজ্ঞাসা করছেন—'আমি কোন্ কোন্ স্থানে, কী কী বস্তু, কেমন ব্যক্তি ইত্যাদিতে আপনার চিন্তা করব ? ভগবান তার উত্তরে বলেছেন, তোমার চিন্তনে যা যা আসে সবেতেই তুমি আমায় চিন্তা করবে, কারণ আমি

সকল বস্তু, ব্যক্তি, দেশ, কাল ইত্যাদিতে পরিপূর্ণভাবে আছি। তাছাড়াও তোমার আর যা কিছু বিশেষত্ব, মহত্ব, সৌন্দর্য ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয়, সেগুলিতেও তুমি আমায় চিন্তা করবে এবং সমস্ত বিশেষত্বগুলিই আমার বলে জানবে। কারণ বিশেষত্বগুলি যদি তুমি সংসারের (অর্থাৎ তোমার নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির সামর্থ্য) বলে মনে করো তবে তোমার মন সংসারে আকৃষ্ট হবে আর যদি আমার (ভগবানের) বলে মনে করো তবে নিয়ত ভগবৎ চিন্তাই হবে। এইভাবে সাংসারিক জীবনে চিন্তায় পরিবর্তন আনতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ভগবানের বিভূতির জ্ঞান হলে ভগবানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হয় এবং সহজেই ভগবানে অবিচলিত ভক্তি হয়। তাই অর্জুন ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—'**বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন**' অর্থাৎ হে প্রভু ! আপনি আপনার যোগ (সামর্থ্য ও শক্তি) এবং বিভূতি (শক্তির প্রকাশ) আমাকে বিশেষভাবে বলুন। **এই বিভূতি শোনার অবশ্য ফল হল, মনের গতি সংসারের দিকে না গিয়ে ভগবদ্‌মুখী হওয়া, ভগবানে দৃঢ়ভক্তি হওয়া এবং তার ফলে অনায়াসে কল্যাণ লাভ করা। কী সহজ, সরল ও সুগম সাধনা !**

তাই অর্জুন তাঁর স্তুতিতে বারংবার ভগবানকে তাঁর বিভূতি বিশেষভাবে জানাতে বলেছেন। আবার ভগবানের অমৃতময় বচন দু'কান দিয়ে শুনেও যেন তাঁর তৃপ্তিসাধন হচ্ছে না। অর্জুন বলছেন—'**ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্**'। ক্ষুধার্তের যেমন খাদ্য, পিপাসার্তের যেমন জল ভালো লাগে, তেমনি অর্জুনেরও ভগবানের বাণী ও বিভূতি খুবই মনে ধরেছে, ভালো লাগছে ও ভগবানের প্রতি আকর্ষণ তীব্রতর হচ্ছে।

শ্রবণেন্দ্রিয়র উৎকর্ষতা—ভগবানের প্রতি অর্জুনের এই যে প্রাণের টান, তার মূলে আছে ভগবৎ বিভূতি শ্রবণ। আর এখানেই হচ্ছে শ্রবণেন্দ্রিয়র উপযোগিতা। শব্দ শ্রবণের মধ্যে দিয়ে কাজ করে। এই শব্দ দুই প্রকারের— বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। কানের সাহায্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ শুনে আমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (স্বর্গ, নরকাদির) জ্ঞান হয়। আবার চোখের সাহায্যে বর্ণাত্মক শব্দ পড়েও (পুস্তকাদি পড়ে) উপরোক্ত জ্ঞান হয়। সেইজন্য

বেদান্তাদি শাস্ত্রে (শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন আদিতে) সর্বাগ্রে শ্রবণ কথাটি আছে। আর এইভাবে ভক্তিশাস্ত্রেও (শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন আদিতে) শ্রবণ কথাটি প্রথমে এসেছে। শাস্ত্রে যে পরমাত্মতত্ত্বর ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার পরোক্ষ জ্ঞান আমাদের কান দিয়েই হয় অর্থাৎ কানে শুনে সেই অনুযায়ী করা (কর্মযোগ), জানা (জ্ঞান যোগ) ও মানা (ভক্তিযোগ) এই সব সাধনায় প্রবৃত্ত হই এবং এর দ্বারাই আমরা সেই পরমাত্মতত্ত্বর সাক্ষাৎলাভের পথে এগিয়ে যেতে পারি।

শব্দে অচিন্ত্য শক্তি আছে—

শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাৎ শব্দাদেবাপরোক্ষধীঃ।

প্রসুপ্তঃ পুরুষো যদ্বচ্ছব্দেনৈবাববুধ্যতে॥ (সদাচারানুসন্ধানম্‌ ১৯)

মানুষ যখন ঘুমায় তখন ইন্দ্রিয়গুলি সঙ্কুচিত হয় মনে, মন সঙ্কুচিত হয় বুদ্ধিতে, আর বুদ্ধি সঙ্কুচিত হয়ে অজ্ঞানে (অবিদ্যায়) লীন হয়। অবশেষে অবিদ্যা লীন হয় স্বয়ং-এ। এইভাবে নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়সকল সুপ্ত থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন মানুষকে তার নাম ধরে ডাকা হয়, সে জেগে ওঠে। এর অর্থ শব্দের এত শক্তি যে যখন শব্দ করে ডাকা হয়, তা অবিদ্যায় লীন হওয়া মানুষকেও জাগিয়ে দেয়।

দৃষ্টি (দেখার শক্তি) চক্ষু পর্যন্ত যায় কিন্তু শব্দ কর্ণ ভেদ করে স্বয়ং পর্যন্ত পৌঁছায়। ইন্দ্রিয়গুলি কেবল নিজ নিজ বিষয়কেই ধরে, কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব ধরতে পারে না। কারণ পরমাত্মতত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় নয়, পরমাত্মতত্ত্ব হল কেবল স্বয়ং এরই বিষয় অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বর জ্ঞান হয় কেবল স্বয়ং-এর থেকেই। অর্জুন তাই দশম অধ্যায়ে বলেছেন—

'**স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম**' (গীতা ১০।১৫) অর্থাৎ আপনাকে (পরমাত্মাকে) কেবল আপনিই (স্বয়ং বা জীবাত্মাই) জানতে পারেন। এর তাৎপর্য হল এই যে, যেহেতু পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞান করণ-নিরপেক্ষ (ইন্দ্রিয়াতীত), তাই চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তাঁকে দেখা বা জানা যায় না কিন্তু শব্দ যেহেতু স্বয়ং অবধি পৌঁছতে পারে তাই তার দ্বারা তাঁকে কিছুটা পরিমাণ জানা গেলেও যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, দুইভাবে ভগবানের চিন্তন করা যায়—

১) **নিত্য-অনিত্য বোধ**—এই সাধনা হল সৎ-অসৎ বিবেক জাগ্রত করা অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া আর কিছু চিন্তা না করা। আর যদি কখনও বা অন্য (অসৎ বা নশ্বর অনিত্য বস্তুর) চিন্তা হয়ও তবে মনকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে ইষ্টদেবের (যা নিত্য বা অবিনশ্বর) ধ্যানে ব্যাপৃত করা।

২) **সর্বভূতে ভগবৎদর্শন**—এই সাধন হল মনে যদি কোনো ভাবের উদয় হয় তবে সেটিকে ভগবানের বিশেষত্ব বলে ভাবা। আর এই ভাবে ভগবৎ চিন্তার বা ধ্যানের বিস্তারের জন্যই ভগবৎ বিভূতিগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। এই ভাবের বিশেষ তাৎপর্য হল এই যে, যদি কোনো বিশেষত্বর জন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি চিন্তা যায় তবে সেখানেও ভগবানের চিন্তাই করা উচিত, কোনোভাবেই ব্যক্তি বা বস্তুর বলে নয়।

ভগবানের প্রার্থনা পূরণ ও বিভূতি বর্ণন (শ্লোক ১৯—৪২)

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০
যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২

সরলার্থ—শ্রীভগবান বললেন আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি আমার প্রধান দিব্য বিভূতিগুলি তোমার জন্য সংক্ষেপে বলছি। কারণ হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার বিস্তারিত বিভূতির কোনো অন্ত নেই। ১৯

হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন ! সকল প্রাণীর আদি, মধ্য এবং অন্তে আমিই অবস্থিত এবং তাদের হৃদয়ে (অন্তঃকরণে) আত্মারূপেও আমিই অবস্থান করছি। ২০

আমি অদিতির পুত্রদের মধ্যে বিষ্ণু (বামন), জ্যোতিষ্মান বস্তুর মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য। আমিই মরুৎদের মধ্যে তেজ এবং নক্ষত্রদের অধিপতি চন্দ্র। ২১

বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে আমি মন এবং প্রাণীদের মধ্যে আমি চেতনা। ২২

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শংকর ও যক্ষ-রাক্ষসদের মধ্যে কুবের, অষ্ট বসুর মধ্যে আমি পাবক বা অগ্নি এবং চূড়াযুক্ত পর্বতের মধ্যে আমি সুমেরু পর্বত। ২৩

হে পার্থ ! পুরোহিতগণের মধ্যে আমাকে প্রধান বৃহস্পতি বলে জেনো, সেনানায়কদের মধ্যে আমি স্কন্দ (কার্তিক) এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর। ২৪

মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু, বাণীর (শব্দের) মধ্যে আমি একাক্ষর ওঁ-কার

অর্থাৎ প্রণব। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয়। ২৫

সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি কপিলমুনি। ২৬

অশ্বগণের মধ্যে অমৃতমন্থনকালে প্রকটিত হওয়া উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, শ্রেষ্ঠ হাতিদের মধ্যে ঐরাবত নামক হাতি এবং মানুষদের মধ্যে রাজাকে আমারই বিভূতি বলে জানবে। ২৭

অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র এবং ধেনুগণের মধ্যে আমিই কামধেনু। আমি সন্তান উৎপত্তির হেতু কন্দর্প এবং সর্পগণের মধ্যে বাসুকি। ২৮

নাগগণের মধ্যে অনন্ত (শেষনাগ) এবং জলচর প্রাণীদের মধ্যে আমি জলাধিপতি বরুণ। পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা এবং শাসনকারীদের মধ্যে যমরাজ। ২৯

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ এবং গণনাকারীদের মধ্যে কাল। পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ ও পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়। ৩০

পবিত্রকারীদের মধ্যে আমি বায়ু এবং শস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি রাম, জলচর জীবের মধ্যে আমি মকর এবং স্রোতস্বতী নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা। ৩১

হে অর্জুন ! সমস্ত সর্গের আদি, মধ্য এবং অন্তে আমিই বিরাজমান। বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম-(ব্রহ্ম)বিদ্যা এবং পরস্পর শাস্ত্রার্থকারীর (তার্কিকগণের) মধ্যে আমি হলাম বাদ। ৩২

অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার এবং সমাসসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস আমি। আমিই অক্ষয় কাল অর্থাৎ কালের মহাকাল এবং সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট ধাতা (পালন-পোষণকারী)ও আমি। ৩৩

সর্বসংহারকারী মৃত্যু এবং উৎপন্ন হওয়া প্রাণীদের উদ্ভবস্বরূপ আমিই ; নারীজাতির মধ্যে আমিই কীর্তি, শ্রী, বাক্‌, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। ৩৪

সুরধর্মী শ্রুতিগুলির মধ্যে বৃহৎসাম এবং বৈদিক ছন্দগুলির মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ আমিই। বৎসরের দ্বাদশ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) এবং ছ'টি ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতুও আমি। ৩৫

ছলনাকারীগণের মধ্যে জুয়া এবং তেজস্বীগণের মধ্যে তেজ আমি, বিজয়ী পুরুষদের জয়, উদ্যমকারীদের নিশ্চয় এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের সাত্ত্বিক ভাবও আমি। ৩৬

বৃষ্ণি বংশীয়দের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্যও আমি। ৩৭

দমনকারীদের মধ্যে দণ্ডনীতি এবং জয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে নীতি আমি। আমি গোপনীয় অর্থাৎ গুপ্ত রাখার যোগ্য ভাবসকলের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানীদিগের জ্ঞান। ৩৮

হে অর্জুন ! সর্বপ্রাণীর যা বীজ, সেই বীজ আমিই ; কারণ আমা ব্যতীত চরাচরে কোনো প্রাণী নেই অর্থাৎ চরাচরে সবই আমি। ৩৯

হে পরন্তপ ! আমার দিব্য বিভূতিসমূহের কোনো অন্ত নেই। আমি তোমাকে আমার যা কিছু বিভূতি বিস্তার বর্ণনা করেছি, তা তো শুধু বিভূতিগুলির সংক্ষেপ। ৪০

যে যে বস্তু (প্রাণী, পদার্থ প্রভৃতি) ঐশ্বর্যযুক্ত, শোভাযুক্ত এবং বল-সম্পন্ন, সেসবই তুমি আমারই তেজ (যোগ অর্থাৎ সামর্থ্যের) অংশ হতে উৎপন্ন বলে জানবে। ৪১

অথবা হে অর্জুন ! তোমার এত বহুবিধ কথা জানবার প্রয়োজন কী ? আমি নিজের একাংশ মাত্র দিয়ে জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছি অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার কোনো এক অংশমাত্রে বিরাজমান। ৪২

মূলভাব—ভগবান তাঁর বিভূতিকে দিব্য বলেছেন আর বর্ণনাও করেছেন সংক্ষেপে। এখানে দিব্য বলার অর্থ হল এ জগৎ-সংসারে যে কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনাদিতে যা কিছু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় তা সবই ভগবানের। সেগুলিকে ভগবানের বলে বোধ হওয়াই দিব্যতা আর শক্তির বিশেষত্বকে প্রকৃতির বলে মনে করাই হল অদিব্যতা বা জাগতিক দৃষ্টি।

ভগবান অনন্ত আর তাঁর বিভূতিও অনন্ত। তাই ভগবানের অনন্ত বিভূতি না কেউ বর্ণনা করতে সক্ষম, না শুনতে সক্ষম। তাই ভগবান বলেছেন 'আমি আমার বিভূতিগুলি সংক্ষেপে জানাব।'

ভগবান বিংশ শ্লোকের প্রথমেই বলেছেন '**অহমাত্মা**' অর্থাৎ সাধকের দৃষ্টি যখন যে প্রাণীদের প্রতি পড়বে তখন যেন 'সেই সমস্ত প্রাণীতেই' ভগবান আত্মারূপে বিরাজিত এই চিন্তা হয়। আবার বলছেন '**অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ**' (গীতা ১০।২০) অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্তে ভগবানই বিরাজমান, এই কথার তাৎপর্য হল— ভগবান ছাড়া কিছুই নেই অর্থাৎ সবই ভগবানময়। ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমগ্র, জীবাত্মা হল তাঁর বিভূতি বা পরা প্রকৃতি এবং জীবের শরীর, মন, অন্তকরণ ও জগৎ-সংসারাদি হল তাঁর অপরা প্রকৃতি**।

পরা ও অপরা প্রকৃতি দুইই ভগবান হতে অভিন্ন। ভগবান এইভাবে তাঁর বিভূতি বলা শুরু করে পরবর্তী ২০টি শ্লোকে (২১শ-৩৯শ) তাঁর বিরাশিটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন।

আদিত্যানামহং বিষ্ণু— ভগবান বলছেন দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে তিনি হচ্ছেন স্বয়ং বিষ্ণু। কশ্যপ-অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ৩৩টি সন্তান (দেবতা) ; দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু ও দুই অশ্বিনী কুমার। এই দ্বাদশ আদিত্য হলেন—ইন্দ্র, সূর্য, রবি, অরুণ, বরুণ, তপন, যম, ধাতা, সবিতা, ত্বষ্টা, মিত্র ও বিষ্ণু। এই বারোজন আদিত্য বারোমাসের বাচক আবার মহাকাশস্থিত দ্বাদশ রাশিরও বাচক। এই দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু বা বামনই প্রধান। ভগবানই বামন অবতাররূপে জন্ম নেন।

জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্—চন্দ্র, অগ্নি আদি যতপ্রকার জ্যোতিষ্মান বস্তু আছে তাদের মধ্যে কিরণমালী সূর্যই ভগবানের প্রধান বিভূতি। কারণ প্রকাশ করায় সূর্যের প্রাধান্য থাকে, সূর্যের কিরণেই সব কিছুই প্রকাশিত হয়।

মরীচির্মরুতামস্মি— মরুৎ হলেন ঋকবেদের অন্যতম দেবতা। বেদে আছে সাতজন মরুতের উল্লেখ আর পুরাণে আছে উনপঞ্চাশ জনের। ঋকবেদের ৩৩টি সূক্তে এঁদের স্তব আছে। মরুৎগণ উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় ও তাদের দেহ বিদ্যুৎবিজড়িত। ভগবান বলছেন মরুৎদেবের যে উজ্জ্বলতা সেও আমি।

নক্ষত্রাণামহং শশী—দক্ষ প্রজাপতির ৫১ কন্যা। এদের মধ্যে ২৭টি

চন্দ্র, ১৩টি ধর্ম, ১০টি কশ্যপ ও একজনের (সতীর) মহাদেবের সঙ্গে পাণি গ্রহণ হয়। চন্দ্রর স্ত্রীরূপী এই ২৭ কন্যাই আকাশস্থিত অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী আদি ২৭ নক্ষত্ররূপে বিরাজিত হয়ে চন্দ্রকেই ঘিরে থাকে। ভগবান বলেছেন তাদের অধিপতি চন্দ্রই তিনি। চন্দ্রের যে বিশেষত্ব, যে মহত্ত্ব তাও বাস্তবে ভগবানেরই।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি—বেদের যে শ্লোকগুলি স্বরসহিত গীত হয় সেগুলিকে সামবেদ বলা হয়। সামবেদে ইন্দ্ররূপে ও অন্য দেবরূপে ভগবানের স্তুতির বর্ণনা আছে। তাই সামবেদ ভগবানের বিভূতি।

দেবানামস্মি বাসবঃ—সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ আদি যত দেবতা আছেন তার মধ্যে ইন্দ্র হলেন প্রধান এবং সকলের অধিপতি। তাই ভগবান তাঁকে নিজের বিভূতি বলেছেন।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি—চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়র মধ্যে মনই হল প্রধান। সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি মনের সাহায্যেই কাজ করে। মনের এই বিশেষত্ব ভগবান থেকেই এসেছে। তাই ভগবান মনকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

ভূতানামস্মি চেতনা—সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যে চেতনাশক্তি (বা প্রাণশক্তি), যার দ্বারা মৃতব্যক্তি ও শায়িত ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় তাকে ভগবান বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি—ঋকবেদে অগ্নি হচ্ছেন রুদ্র, যজুর্বেদে ইনি হচ্ছেন মুক্তিদাতা। উপনিষদে রুদ্র বলছেন তিনি সর্বপ্রথমে এসেছেন, তাঁর ওপরে বা পূর্বে কেউ নেই। তিনিই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত জীব তাঁর কথায় চালিত হয়। প্রলয়ে তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন। রুদ্রদের সংখ্যা একাদশ, যথা—অজ, ভব, ঈশান, ত্রম্বক, পশুপতি, ভীম, মহাদেব, শঙ্কর, রুদ্র, শিব এবং পিনাকী। এদের মধ্যে শংকর সকল রুদ্রর অধিপতি। তিনি কল্যাণপ্রদানকারী এবং কল্যাণস্বরূপ। ভগবান তাই তাঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

বিত্তেসা যক্ষরক্ষসাম্—মহর্ষি পুলস্তর পুত্র হলেন বিশ্রবা এবং বিশ্রবা ও ভরদ্বাজ কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র হলেন কুবের। তিনি আবার রাবণেরও

বৈমাত্রেয় ভাই। তিনি নিজে যক্ষ ও রাক্ষসের অধিপতি এবং ধনাধ্যক্ষ। তিনি ভক্ত এবং সমস্ত যক্ষ ও রাক্ষসগণের প্রধান হওয়ায় তিনিও ভগবানের বিভূতি।

বসূনাং পাবকাশ্চাস্মি—অষ্টবসু হলেন আট গণদেবতা। ঋকবেদে এঁদের প্রকৃতির নিয়ামক বলা হয়েছে। অষ্টবসু হলেন ধর্ম ও বসুর (দক্ষর এক কন্যার) সন্তান। এঁরা হলেন—**আপ, ধ্রুব** (পুত্র হলেন কাল, সংহার কর্মে নিযুক্ত), **সোম** (পুত্র হলেন বর্চা, অভিমন্যু যিনি জীবকে তেজ প্রদান করেন), **ধর্ম, অনিল, অগ্নি** (পুত্র হলেন কুমার কার্তিকেয়), **প্রত্যুষ, প্রভাস** (পুত্র বিশ্বকর্মা)। ভগবান বলেছেন তিনি সকল বসু নামধারী দেবতার মধ্যে যজ্ঞের আহুতি বিতরণকারী অগ্নি, যিনি ভগবানের মুখস্বরূপ। সেইজন্য ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

মেরুঃ শিখরিণামহম্‌— মেরু পর্বত পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটা পর্বত এবং সব পর্বতের অধিপতি। অপর মতে ইনি হিমালয়ের সুবর্ণময় শৃঙ্গ এবং এর চারদিক গন্ধর্ব ও দেবতারা ঘিরে থাকেন। পাপীরা এখানে আসতে পারে না। সূর্য, চন্দ্র এই মেরুকেই প্রদক্ষিণ করেন। ভগবান বলেছেন আমি পর্বতের মধ্যে সুমেরু পর্বত।

পুরোধাসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌—বৃহস্পতি দেবতাদের কুলপুরোহিত। ঋকবেদে বৃহস্পতি দেবতারূপে কোথাও একা, কোথাও বা ইন্দ্রের সঙ্গে স্তুত। শতপথ ব্রাহ্মণে ইনি ব্রহ্মা ও যজ্ঞস্বরূপ। বেদের কোনো কোনো মন্ত্রে ইনি যজ্ঞ রক্ষাকর্তা, সর্বময় পিতা ও সর্বদেবতা স্বরূপ। মন্ত্রের অধিপতি দেবরূপেও ইনি খ্যাত। এঁর প্রসাদ ছাড়া যজ্ঞফল লাভ হয় না। পৃথিবীতে যত পুরোহিত আছেন তাঁদের মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধিতে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তাই ভগবান বলছেন যে বৃহস্পতিকে তাঁর বিভূতি বলে জানবে।

সেনানীনামহং স্কন্ধঃ—স্কন্দ (কার্তিক) শংকরের পুত্র। এর ছয়টি মুখ ও বারোটি হাত। ইনি দেবগণের সেনাপতি এবং জগতের সকল সেনাপতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

সরসামস্মি সাগরঃ— পৃথিবীতে যত জলাশয় আছে তাদের মধ্যে সব

থেকে বিরাট হল সাগর। সাগরই হল জলাশয়ের অধিপতি, প্রশান্ত ও স্বমহিমায় স্থিত। তাই ভগবান সাগরকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

মহর্ষিণাং ভৃগুরহম্—ভৃগু ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং দশ প্রজাপতির মধ্যে একজন। প্রতিদিন তর্পণের সময় ভৃগুকে জল দিতে হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা বিচার করতে তিনি বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করেন, কিন্তু বিষ্ণু ক্রোধ না করে ভক্তশ্রেষ্ঠ হিসাবে ভৃগুর পা টিপে দিতে থাকেন। সেই থেকে বিষ্ণুর বুকে ভৃগুর পদচিহ্ন (শ্রীবৎস চিহ্ন) মুদ্রিত আছে। দশাশ্বমেধ ঘাটের পশ্চিমে ভৃগু একবার শিবের তপস্যা করেন, তার নাম **'ভৃগুতীর্থ'**। শিবের বরে তীর্থটি চিরপবিত্র হয়ে আছে। নহুষের পতনও হয়েছিল ভৃগু মুনির ইচ্ছা অনুযায়ী অগস্ত্য মুনির শাপে। ভগবান তাই বলেছেন মহর্ষিদের মধ্যে তিনি ভৃগু।

গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্—সৃষ্টির আদিতে সর্বপ্রথম এক অক্ষরবিশিষ্ট প্রণব (ওঁ-কার) প্রকটিত হয়। প্রণব থেকে ত্রিপদী গায়ত্রী, তার থেকে বেদ এবং বেদ হতে অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ এবং তার থেকে সমস্ত বাঙ্ময় জগৎ প্রকটিত হয়েছে। এই সবের কারণ হওয়ায় এবং এ সবের থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় ভগবান এক অক্ষররূপী প্রণবকে নিজ বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

যজ্ঞাণাং জপযজ্ঞোঽস্মি—মন্ত্রের সাহায্যে যত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলিতে নানা প্রকার বস্তু, পদার্থ ও বিধি-নিয়মের প্রয়োজনীয়তা থাকে এবং তাতেও কিছু না কিছু ত্রুটি থেকেই যায়। কিন্তু জপযজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্নাম জপ করায় কোনো পদার্থ বা বিধি-নিয়মের প্রয়োজন নেই। এতে ত্রুটি তো দূরের কথা বরং এর দ্বারা সমস্ত দোষ দূর হয়। জপ করতে সকলেই সক্ষম। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবদ্নামের পার্থক্য থাকলেও নাম-জপের দ্বারা যে কল্যাণ হয় তা সকলেই মানেন। তাই ভগবান জপযজ্ঞকে নিজের বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ—যত পর্বত আছে তার মধ্যে তপস্যার স্থল হওয়ায় হিমালয় মহাপবিত্র। আবার গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি তীর্থস্বরূপ নদীগুলোও হিমালয় থেকে উৎপন্ন। ভগবান শঙ্করও হিমালয়েরই কৈলাশ শৃঙ্গে বাস করেন। সেইজন্য ভগবান হিমালয়কে তাঁর বিভূতি বলে বর্ণনা করেছেন।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাম্— অশ্বত্থ একটি সৌম্য বৃক্ষ। অশ্বত্থ গাছকে পূজা করার অনেক মহিমা আছে। তাই ভগবান অশ্বত্থবৃক্ষকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

দেবর্ষীণাং চ নারদ—'দেবর্ষি নারদ' ভগবানের ইচ্ছানুসারে চলেন এবং ভগবানের লীলার ভূমিকা তিনিই তৈরি করেন। তাই নারদকে বলা হয় ভগবানের মন। বাল্মীকি ও বেদব্যাসকে নারদই উপদেশ দিয়েছিলেন রামায়ণ ও ভাগবতের ন্যায় গ্রন্থ রচনার। নারদের কথা মানুষ, দেবতা, অসুর, নাগ সবাই মান্য করে, বিশ্বাস করে, আর তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে। মহাভারতে তাঁর অশেষ গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ভগবান নারদকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথ—স্বর্গের গায়কদের বলে গন্ধর্ব। আর তাদের মধ্যে চিত্ররথ হলেন প্রধান। তিনি হলেন ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্ত ও অর্জুনের মিত্র। তাই ভগবান তাঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ—সিদ্ধ দুই প্রকারের হয়। এক 'জন্মসিদ্ধ' আর দ্বিতীয় 'সাধন-ভজন করে সিদ্ধ'। কপিল ছিলেন 'জন্মসিদ্ধ' আর তাঁকে 'আদিসিদ্ধ' বলা হয়। তিনি সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা আর সকল সিদ্ধগণের গণাধীশ। তাই ভগবান তাঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্— সমুদ্র মন্থনকালে প্রকটিত চতুর্দশ রত্নের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব একটি রত্নবিশেষ। এটি ইন্দ্রের বাহন এবং সমস্ত অশ্বের অধিপতি। তাই ভগবান একে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

ঐরাবতং গজেন্দ্রানাম্—হাতির মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ তাকে বলা হয় গজেন্দ্র। আর গজেন্দ্রর মধ্যে ঐরাবত শ্রেষ্ঠ। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বর ন্যায় ঐরাবত হাতিরও উৎপত্তি সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র থেকে এবং এটিও ইন্দ্রর বাহন। ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

নরাণাঞ্চ নরাধিপম্—সমস্ত প্রজাকুলের পালন, সংরক্ষণ ও শাসনকারী হওয়ায় রাজা সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সাধারণ মানুষের থেকে রাজার মধ্যে

বিশেষত্ব বেশি থাকে। বর্তমান মন্বন্তরে বিবস্বান মনুকেও রাজা বলা যেতে পারে। তাই ভগবান রাজাকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

আয়ুধানামহং বজ্র— আয়ুধ বা অস্ত্রের মধ্যে বজ্র হল ইন্দ্রর অস্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ। এটি দধিচী মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত এবং এতে তাঁর তপস্যার তেজ নিহিত আছে, তাই ভগবান এটিকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

ধেনুনামস্মি কামধুক্—সকল ধেনু বা গাভীদের মধ্যে কামধেনু শ্রেষ্ঠ। ইনি সমুদ্র মন্থনে প্রকট হয়েছিলেন। সকল দেবতা ও মানুষের কামনা পূরণকারী বলে এঁকে কামধেনু বলা হয়। তাই এটিও ভগবানের বিভূতি।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্প—সংসার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় কামের দ্বারা। ধর্মের অনুকূলে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য, সুখবৃদ্ধিরহিত হয়ে যে কাম উপযোগ করা হয়, সেই কামই হল ভগবানের বিভূতি। ভগবান আগেও বলেছেন '**ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ**' অর্থাৎ সকল প্রাণীতে আমি ধর্মের অনুকূল কাম হয়ে আছি।

সর্পাণামস্মি বাসুকি—বাসুকি সকল সর্পের অধিপতি ও ভগবদ্‌ভক্ত। সমুদ্র মন্থনের সময় একে মন্থন রজ্জু হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাই ভগবান একে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম্—শেষনাগ নাগদের রাজা। ইনি ভগবানের লীলা-সঙ্গী। লক্ষ্মণ, বলরাম রূপে সব অবতারেই ইনি ভগবানের সঙ্গী। ক্ষিরোদ সমুদ্রে ইনি সহস্র ফণাযুক্ত হয়ে ভগবানের শয্যারূপে বিরাজমান থাকেন। ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

বরুণো যাদসামহম্—বরুণ হলেন সম্পূর্ণ জল-জন্তু এবং জলদেবতার অধিপতি এবং ভগবানের ভক্ত। তাই ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

পিতৃনামর্যমাচাস্মি —কব্যবাহ, অনল, সোম প্রভৃতি সাত পিতৃপুরুষ বিরাজিত। এদের মধ্যে 'অর্যমা' নামধারী পিতৃপুরুষ প্রধান। তাই ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

যমঃ সংযতামহম্—প্রাণীদের মধ্যে শাসনকারী যত পুরুষ আছে তাদের মধ্যে প্রধান হলেন 'যমরাজ'। ইনি প্রাণীদের পাপ-পুণ্য ভোগ করিয়ে শুদ্ধ

করেন। এর শাসন ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত। ইনি ভগবদভক্ত ও লোকপাল। তাই ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাম্— দিতির গর্ভজাত সন্তানদের বলা হয় দৈত্য। এদের মধ্যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন প্রহ্লাদ। তিনি পরম ভগবদ্ বিশ্বাসী ও নিষ্কাম ভক্ত। তাই ভগবান তাঁকে নিজ বিভূতি বলেছেন।

কালঃ কলয়তামহম্— যে শাস্ত্র ধরে আয়ু, সময় আদি গণনা করা হয়, সেই কাল হল ভগবানেরই বিভূতি। একাদশ অধ্যায়ে ভগবানের কালরূপী বিশ্বরূপ দর্শন করেই অর্জুন ভীতচকিত হয়ে পড়েছিলেন।

মৃগাণাঞ্চ চ মৃগেন্দ্রোহহম্—যত প্রকার পশু আছে তাদের মধ্যে সিংহ হচ্ছে বলবান, তেজস্বী, শূরবীর এবং সাহসী দলপতি। তাই ভগবান একে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

বৈনতেয়শ্চ পক্ষীণাম্— কশ্যপ-বিনতার পুত্র গরুড় সমস্ত পক্ষীকুলের রাজা ও পরম ভাগবত। তিনি ভগবানের বাহন ও তাঁর ওড়ার সময় পাখা থেকে স্বতঃই সামবেদের মন্ত্র ধ্বনিত হয়। তাই ভগবান গরুড়কে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

পবনঃ পবতামস্মি—বেগবান যা কিছু আছে তাদের মধ্যে বায়ু দ্বারা সব কিছু পবিত্র হয়, বায়ুই নিরোগতা বহন করে আবার প্রাণধারণেও সাহায্য করে। তাই ভগবান বায়ুকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

রাম শস্ত্রভৃতামহম্—ভগবান রাম সাক্ষাৎ অবতার। কিন্তু শস্ত্রধারীদের মধ্যে গণনা করলে, তিনিই শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারী। তাই ভগবান তাঁকে নিজ বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

ঋষাণাং মকরশ্চামি—জলচর প্রাণীদের মধ্যে মকর (কুমির) সব থেকে শক্তিশালী, ভগবান তাই তাকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

স্রোতসামস্মি জাহ্নবী—জল প্রবাহরূপ যত স্রোতস্বিনী আছে, গঙ্গা তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। পবিত্র গঙ্গার জল ভগবানের চরণামৃতস্বরূপ। গঙ্গার দর্শন ও স্পর্শে উদ্ধার পাওয়া যায়। তাই ভগবান গঙ্গাকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহম্—যত সর্গ ও মহাসর্গ (সৃষ্টি) হয় অর্থাৎ

যত বার প্রাণীর উৎপত্তি হয়, তাদের পূর্বেও তিনি বিরাজ করেন, মধ্যেও করেন আবার অন্তেও তিনি থাকেন।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্—যে বিদ্যায় মানুষের কল্যাণ হয় তাকে বলা হয় অধাত্মবিদ্যা (তাতে স্বরূপের প্রাধান্য থাকে)। অন্যান্য জাগতিক বিদ্যা যতই শিক্ষা করা হোক না কেন, তাতে কিছুই জানা হয় না। কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যা প্রাপ্ত হলে কোনো কিছুই জানার বাকি থাকে না।

বাদঃ প্রবদতামহম্—তার্কিকদের শাস্ত্রার্থে যে আলোচনা করা হয়, তা তিন প্রকার—

১) **জল্প**—যুক্তি-প্রযুক্তি দ্বারা নিজ পক্ষকে রক্ষা এবং অপর পক্ষকে খণ্ডন করে নিজ পক্ষের জয় ও অপর পক্ষের পরাজয়ের চিন্তায় যে শাস্ত্র আলোচনা হয় তাকে বলে জল্প।

২) **বিতণ্ডা**—নিজের কোনো পক্ষ না হলেও অপরের যুক্তিজাল খণ্ডন করা যে শাস্ত্রার্থ তাকে বলে বিতণ্ডা।

৩) **বাদ**—কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে শুধুই তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য যে শাস্ত্রার্থ বিচার তাকে বলে বাদ। আর এই তিন প্রকার শাস্ত্রর মধ্যে 'বাদ' হল শ্রেষ্ঠ। তাই ভগবান বাদকে নিজ বিভূতি বলেছেন।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি—বর্ণমালার মধ্যে প্রথম অক্ষর হল 'অ-কার'। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ—এই দুয়েতেই অকার হল প্রধান। তাই ভগবান অকারকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ—যার সাহায্যে দুই শব্দ মিলে একটি শব্দ তৈরি হয় তাকে বলে সমাস। দুটি শব্দের মধ্যে যদি অর্থে পূর্ব শব্দের প্রাধান্য হয় তবে তাকে বলা হয় অব্যয়ীভাব সমাস। যদি পরের শব্দটির অর্থ প্রধান হয় তবে সেটি 'তৎপুরুষ সমাস'। আর যদি দুটি শব্দই যোগ হয়ে অন্য কাউকে বোঝায় তাকে বলে 'বহুব্রীহি' সমাস। যদি দুটি শব্দেরই প্রাধান্য থাকে তাকে বলে 'দ্বন্দ্ব সমাস'। দ্বন্দ্ব সমাসে দুটি শব্দের অর্থই প্রধান বলে ভগবান এটিকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ—যে কাল কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না সেই কালই হল

ভগবান। সূর্য থেকেই সর্গ (সৃষ্টি) ও প্রলয় গণনা করা হয় কিন্তু মহাপ্রলয়ে যখন সূর্যও লীন হয়ে যায় তখন পরমাত্মা গণনার আধার হন। তাই পরমাত্মাই হলেন কালেরও কাল, অক্ষয় কাল। এই যে কালের কথা বলা হয়েছে সেটি কখনো পরিবর্তিত হয় না। এই অক্ষয় কাল সব কিছু গ্রাস করেও নিজে একইভাবে বিরাজ করে। তাই ভগবান একে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ—ভগবান সর্বদিক মুখবিশিষ্ট অর্থাৎ ভগবানের দৃষ্টি সর্বপ্রাণীর প্রতি থাকে। তাই সকলের ধারণ ও পোষণে ভগবান অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। কোন প্রাণীর কী প্রয়োজন, ভগবান তার খেয়াল রাখেন এবং সময় মতো জুগিয়ে থাকেন। তাই ভগবান তাঁর এই শক্তিকে তাঁরই বিভূতি বলেছেন।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্— হরণকারীদের মধ্যে মৃত্যুই সর্বশ্রেষ্ঠ। তার এত সামর্থ্য যে, মৃত্যুর পর এখানকার সব স্মৃতিও অপহৃত হয়ে যায়। বাস্তবে এই সামর্থ্য ভগবানেরই, মৃত্যুর নয়। ভগবদ্ প্রদত্ত এই সামর্থ্য যদি মৃত্যুর না থাকত তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ধরে যে চিন্তা মানুষের ইহজন্মে থাকে, তা জন্ম-জন্মান্তরের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হত আর মানুষের দুঃখ, মোহ আর চিন্তার অন্ত থাকত না। মৃত্যুতে মানুষের স্মৃতি বিস্মৃত হওয়ায়, পূর্ব পূর্ব জন্মের চিন্তা আর মোহ দূরীভূত হয়। মোহ উপগত হওয়ার এই যে সামর্থ্য মৃত্যুর আছে তা ভগবানেরই, তাই ভগবান একে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

উদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন, তিনি সকলের ধারক ও পোষক আর এখানে বলছেন উৎপন্ন হওয়া সকল প্রাণীর উৎপত্তির হেতুও তিনি।

কীর্তিঃ শ্রীবাক্ চ নারীনাম্ স্মৃতির্মেধা ধৃতি ক্ষমা—কীর্তি, শ্রী, বাক, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা জগতের নারীদের মধ্যে এই সাতজনকে শ্রেষ্ঠ বলে ধরা হয়। এঁদের মধ্যে কীর্তি, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা— এই পাঁচজন হলেন প্রজাপতি দক্ষর কন্যা। শ্রী, মহর্ষি ভৃগুর এবং বাক ব্রহ্মার কন্যা। এই সাতটি স্ত্রী নামক সাতটি গুণ—যথা কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, ধৃতি এবং ক্ষমা নারীদের মহৎ গুণ ও সংসারে প্রসিদ্ধ।

কীর্তি—সদ্‌গুণ নিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠা, প্রসিদ্ধিকে বলে কীর্তি।

শ্রী—ঐশ্বর্য দুই প্রকার—স্থাবর ও জঙ্গম। জমি, বাড়ি আদি স্থাবর সম্পত্তি এবং গোরু, মহিষ আদি জঙ্গম সম্পত্তি। এই উভয় ঐশ্বর্যকে বলা হয় 'শ্রী'।

বাক্‌— যে বাণী ধারণ করলে জগতে যশ-প্রতিষ্ঠা হয় এবং যার ফলে মানুষকে পণ্ডিত, বিদ্বান বলা হয়, তাকে বলা হয় 'বাক্‌'।

স্মৃতি—আগেকার শোনা, জানার ব্যাপার পুনরায় স্মরণে আনাকে বলে 'স্মৃতি'।

মেধা—বুদ্ধিকে স্থায়ীরূপে ধারণ করার যে শক্তি অর্থাৎ যে শক্তির সাহায্যে বিদ্যা ঠিকমতো স্মরণে থাকে তাকে বলে 'মেধা'।

ধৃতি—মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত, স্বীকৃতি ইত্যাদিতে স্থির থাকা এবং তার থেকে বিচলিত না হওয়াই হল 'ধৃতি'।

ক্ষমা—কোনো ব্যক্তি অকারণে কোন অপরাধ করলে (১) তা শাস্তিযোগ্য হলেও তাকে শাস্তি না দেওয়া (২) তার যেন ইহলোক বা পরলোক কোথাও অশান্তি না হয় এই চিন্তা করা এবং (৩) এই মনোভাব নিয়ে তাকে মার্জনা করাকে বলা হয় 'ক্ষমা'।

কীর্তি, শ্রী এবং বাক্‌—এই তিনটি হল প্রাণীদের বিশেষ বহিরঙ্গ লক্ষণ। আর স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা এই চারটি হল অন্তরের বিশেষ লক্ষণ। এই সাতটি লক্ষণ যা নারীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশ পায় ভগবান বলছেন এসব তাঁরই বিভূতি।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং— সামবেদে বৃহৎসাম নামে একটা গীতি আছে যেখানে ইন্দ্ররূপে পরমেশ্বরেরই স্তুতি আছে। এই অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকেও ভগবান সামবেদকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন আর এখানে (পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে) সামবেদের 'বৃহৎসাম'-কেই তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌— বেদে যত ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র আছে সেইগুলির মধ্যে গায়ত্রীই প্রধান, এঁকে বলা হয় বেদজননী কারণ এঁর থেকেই বেদ প্রকটিত হয়েছেন। ভগবান সেইজন্য গায়ত্রীকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্‌— অন্নের সাহায্যে সমস্ত প্রাণী জীবিত থাকে

এবং সেই অন্নর উৎপত্তি মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসেই হয়। মহাভারতের সময় এই মার্গশীর্ষ মাস থেকেই নতুন বর্ষ শুরু হত। এই জন্যই ভগবান মার্গশীর্ষ মাসকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

ঋতুনাং কুসুমাকরঃ—বসন্ত ঋতুতে বর্ষা ছাড়াই বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি পত্র-পুষ্প শোভিত হয়ে ওঠে। এই ঋতুতে অধিক শীতও থাকে না, গরমও থাকে না। তাই ভগবান বসন্ত ঋতুকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি—ছলনা করে অপরের রাজ্য, ঐশ্বর্য, সম্পত্তি আদি হরণ করার যে কৌশল তাকে বলা হয় জুয়া। ভগবান এই জুয়াকেও তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন। যদি কারোর জুয়া খেলার নেশা থাকে অথবা অন্য কাউকে জুয়া খেলতে দেখে তার হার জিত লক্ষ করে, তবে সেই হার-জিতের শক্তি ভগবানেরই বলে মনে করা উচিত। এইভাবে জুয়াকে ভগবানের বিভূতি বলার তাৎপর্য এই যে, সে যেন সবসময় ভগবানের চিন্তাতেই রত থাকে।

তেজস্তেজস্বিনামহম্—মহাপুরুষদের দৈব-সমৃদ্ধসম্পন্ন প্রভাবকে বলে তেজ, যার প্রভাবে পাপীও পাপকার্য থেকে বিচ্যুত থাকে। সেই তেজকেই ভগবান তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

জয়োঽস্মি—প্রত্যেক প্রাণীর কাছেই বিজয় অত্যন্ত প্রিয়। বিজয়ের এই বিশেষত্ব ভগবানেরই। নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যে বিজয়লাভ, তাতে সুখ উপভোগ না করে, তাকে নিজ বিজয়লাভ না ভেবে, তাতে ভগবদ্‌বুদ্ধি মানা উচিত, যেন বিজয়রূপে ভগবানই উপস্থিত।

ব্যবসায়োঽস্মি—ব্যবসায় বলা হয় নিশ্চয়তাকে। ভগবদ্‌গীতায় নিশ্চয়তার অনেক মহিমা গীত হয়েছে। ভগবদ্‌মুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যে নিশ্চয়তা, একনিষ্ঠতা থাকে, তাকে ভগবান তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্—সাত্ত্বিক মানুষের মধ্যে যে সত্ত্বগুণ, সাত্ত্বিক ভাব ও আচরণ দেখা যায় তা ভগবানেরই বিভূতি। এর অর্থ এই যে, রজোগুণ ও তমোগুণকে অবদমিত করে যে সাত্ত্বিক গুণ বৃদ্ধি পায়, তা যেন সাধক নিজের গুণ বলে মনে না করেন, এগুলি আসলে ভগবানেরই গুণ। নিজের সেই গুণাবলীর দিকে দৃষ্টি গেলে, তাতে যেন তত্ত্বতঃ ভগবানই বিরাজমান এইরূপ অনুভব হয়, ভগবৎ স্মরণ হয়।

বৃষ্ণিনাং বাসুদেবোঽস্মি—ভগবান শ্রীকৃষ্ণর জন্ম চন্দ্র বংশে। এই বংশ সংস্থাপকদের মধ্যে পুরুরবা-যযাতি-যদু-নহুষ-হৈহয়-বৃষ্ণি আদি বিখ্যাত। বৃষ্ণি হলেন বৃষ্ণি বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ভগবান বলছেন এই বৃষ্ণি বংশের মধ্যে আমি বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ।

পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ—পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুনের যে বৈশিষ্ট্য তা ভগবানেরই।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ—বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করা এবং পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র আদি সকল শাস্ত্রই ব্যাসদেবের কৃপার ফল। সেইজন্য সমস্ত মুনিদের মধ্যে ব্যাসই শ্রেষ্ঠ। বলা হয় **'ব্যাসোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বং'**। ভগবান তাই তাঁকে নিজের বিভূতি বলেছেন। অর্থাৎ শ্রীব্যাসদেবের বৈশিষ্ট্য দেখে এইরূপ ভগবদস্মরণ করা উচিত যে এইসব বৈশিষ্ট্য ভগবানেরই এবং এসব তাঁর থেকে প্রাপ্ত।

দণ্ডো দময়তামস্মি—দুষ্টগণকে দণ্ড প্রদান করে তাদের সঠিক পথে আনার জন্য দণ্ডনীতিই হল প্রধান। ভগবান তাই দণ্ডকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

নীতিরস্মি জিগীষতাম্—নীতির আশ্রয় নিলেই মানুষ বিজয়প্রাপ্ত হয় এবং এই নীতিতেই বিজয় স্থায়ী হয়। তাই নীতিকে ভগবান তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যনাম্—গুপ্ত রাখার যত ভাব থাকে সেগুলির মধ্যে মৌন ভাবই প্রধান। তাই গোপনীয় ভাবের মধ্যে ভগবান মৌন ভাবকেই তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্— জগতে কলা-কৌশল ইত্যাদি জ্ঞাতাদের মধ্যে যে জ্ঞান তা ভগবানেরই বিভূতি। এখানে সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান থেকে তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত—সমস্ত জ্ঞানকেই 'জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্'-এর অন্তর্গত ধরা যেতে পারে।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন—ভগবান এখানে সমস্ত বিভূতির সারকথা জানাতে গিয়ে বলছেন যে তিনি সবকিছুর বীজ বা কারণ। বীজ বলার অর্থ হল, ভগবান জগৎ সৃষ্টির উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ তো বটেই, আবার জগৎরূপে সৃষ্ট হয়ে তিনিই আছেন।

———০———

অর্জুনের স্তুতি—বিশ্বরূপ দর্শন

প্রাক্‌কথন

বিভূতি শ্রবণেচ্ছা—দশম অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান বলেছেন—'**এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥**' (গীতা ১০।৭)। অর্থাৎ যাঁরা তাঁর পরম ঐশ্বর্যরূপ বিভূতি এবং যোগশক্তি তত্ত্বতঃ জানেন, তাঁরা তাঁর প্রতি অবিচল ভক্তিযোগে যুক্ত হন অর্থাৎ তাদের ভগবৎভক্তি দৃঢ়তর হয়। এইকথা শুনে অর্জুন ভগবানের বিভূতি জানার জন্য প্রার্থনা করেছেন। অর্জুনের স্তুতি ও ভগবানের প্রার্থনা পূরণই পূর্ব অধ্যায়ের (দশম অধ্যায়) বিভূতিযোগে বর্ণিত হয়েছে।

বিশরূপ দর্শনেচ্ছা— আবার এই বিভূতিযোগ বর্ণনার শেষে ভগবান বলছেন '**বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ**' (গীতা ১০।৪২) অর্থাৎ আমি আমার একাংশ মাত্র দিয়েই জগৎ পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছি। তাৎপর্য হল, আমার একাংশেই অনন্ত সৃষ্টি— সবই আমি ! তবে আমার দিকে দৃষ্টি রাখলে আর কোনো বিভূতিই বাকি থাকে না। এই কথা শুনে অর্জুন একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন—'**দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম**'। অর্থাৎ হে পরমেশ্বর ! আমি আপনার ঐশ্বরিক রূপ দেখতে ইচ্ছা করি।

ভগবান অত্যন্ত কৃপালু, তাঁর কৃপাসাগরের অন্ত নেই। নানারূপে, নানাভাবে তিনি ভক্তদের কৃপা করেন, কিন্তু কীভাবে তা আসবে অনেক ভক্ত তা জানতেই পারে না। অর্জুন যখন গর্বভরে ভগবানকে উভয় পক্ষের সেনাদের মধ্যে রথ স্থাপনের অনুরোধ করেন ; তখন ভগবান অর্জুনের ক্রোধভাব যেন জাগ্রত হয়, তাই ওর রথটিকে দুর্যোধনাদির রথের সম্মুখে স্থাপন না করে পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যর রথের সম্মুখে স্থাপন করে বললেন—এই কুরুবংশীয়দের দেখো—'**কুরূন্ পশ্য**' (গীতা ১।২৫)। এর ফলে অর্জুনের মধ্যে ক্রোধের বদলে স্বজনপ্রীতির সুপ্ত মোহ জেগে ওঠল। এতেই মনে হয় ভগবান কৃপা করে গীতা প্রকটিত করতে চেয়েছিলেন, তা না হলে গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের গর্বভাবও নাশ হত না, তিনি শোকমগ্নও হতেন না

এবং গীতার উপদেশও আরম্ভ হত না।

আবার যখন ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করানোর ইচ্ছা জাগ্রত করলেন, তখন তিনি তাঁর সেই বিরাট রূপ দেখার আকাঙ্ক্ষাও অর্জুনের মধ্যে প্রকটিত করেন এবং দেখার আগ্রহও জাগরিত করেন। তখন অর্জুন সেই রূপ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভগবান, তাঁর বিরাট রূপ প্রদর্শন করেন কিন্তু অর্জুন তাও দেখতে সমর্থ না হওয়ায় তাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করে তার ইচ্ছা পূরণ করেন। এর তাৎপর্য হল এই যে, ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে, ভগবান শরণাগতর সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন করার দায়িত্বও নিজেই গ্রহণ করেন।

ভক্ত যখন ভগবৎ স্তুতি করে কখনো তা হয় আর্ত ভাবে, কখনো অর্থার্থী ভাবে, কখনো বা ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য আবার কখনো তা নির্মল প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে। একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন তিনবার স্তুতি করেছেন। প্রথম স্তুতি বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অর্থাৎ **'অর্থার্থী ভাবে'**। দ্বিতীয় স্তুতি বিশ্বরূপ দর্শনের পর যখন তিনি অতি উগ্ররূপ দর্শনে ভীত হয়ে পড়েছিলেন, স্তুতি করেন **আর্তভাবে**। আর অর্জুনের তৃতীয় স্তুতি হল **নির্মল প্রেমের স্তুতি**, যখন তিনি ভগবানের মহানতাকে অনুভব করে নিজেকে ভগবানে সমর্পণের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। স্তুতির শেষে আছে ভগবানকে পাওয়ার পথনির্দেশ। বিশ্বরূপ দর্শনের স্তুতিটি পাঁচটি প্রকরণে স্তুত।

অর্জুনের স্তুতিতে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ

(শ্লোক ১—৫১)

১) অর্জুনের অর্থার্থীভাবে স্তুতি	**(শ্লোক ১-১৪)**
বিশ্বরূপ দর্শনের অনুনয়	শ্লোক ১-৪
ভগবানের আশ্বাসন	শ্লোক ৫-৮
সঞ্জয়ের বিশ্বরূপ দর্শন, বর্ণনা	শ্লোক ৯-১৪
২) অর্জুনের আর্তভাবে স্তুতি	**(শ্লোক ১৫-৩৪)**
দেবভাবের বর্ণনা	শ্লোক ১৫-১৮
উগ্ররূপের বর্ণনা	শ্লোক ১৯-২২

অর্জুনের অর্থার্থীভাবে স্তুতি (১—১৪)

বিশ্বরূপ দর্শনের অনুনয় (শ্লোক ১-৪)

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥ ৪

সরলার্থ—অর্জুন বললেন আমার প্রতি কৃপাবশত আপনি যে পরম গোপনীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব আমাকে জানালেন, তাতে আমার মোহ বিদূরিত হয়েছে। ১

কেননা হে কমললোচন ! সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও লয় সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকেই সবিস্তারে শুনেছি এবং আপনার অবিনাশী মাহাত্ম্যও জেনেছি। ২

হে পুরুষোত্তম ! আপনি নিজেই নিজেকে যেমন বললেন বাস্তবেও তা তেমনই। হে পরমেশ্বর ! আমি আপনার ঐশ্বরিক রূপ দেখতে ইচ্ছা করি। ৩

হে প্রভু ! আপনি যদি মনে করেন যে আমি সেই রূপ দর্শনের যোগ্য, তাহলে হে যোগেশ্বর ! আপনি আপনার সেই অক্ষয় অবিনাশী রূপ আমাকে দর্শন করান। ৪

মূলভাব—আগের অধ্যায়ে (দশম অধ্যায়) ভগবান বলেছেন—'**তেষা-মেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ**' (গীতা ১০।১১)। অর্থাৎ আমার ভজনাকারীদের আমি কৃপা করে অজ্ঞানজনিত তমোনাশ করে থাকি, তাদের হৃদয় ভক্তিতে ভরে দিই। কথাটির খুব প্রভাব পড়েছিল অর্জুনের উপর তাই তিনি একাদশ অধ্যায়ে ভগবানের কৃপাপ্রার্থী হয়ে তাঁর স্তুতি শুরু করেন। আর তখনই ভগবান কৃপা করে তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। প্রকৃতপক্ষে যদিও **ভগবানের সকল ক্রিয়াই কৃপাপূর্ণ, কিন্তু মানুষ তা বুঝে উঠতে পারে না। ভগবানের এই কৃপা অনুভব করতে পারলে, ভগবদ্‌তত্ত্ব অনুভব করা অত্যন্ত সহজ হয় ও শীঘ্র হয় ; জগৎ অমৃতময় ও মধুময় হয়ে ওঠে।**

দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগ শ্রবণের পর অর্জুন ভগবৎকৃপা অনুভব করায়, ভাববিহ্বল হয়ে একাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই অর্জুন তিনটি শব্দ বলেছেন—**মদনুগ্রহায়, পরমংগুহ্যমধ্যাত্মসঙ্গিতম্** ও **মোহোঽয়ং বিগতো মম**।

মদনুগ্রহায় অর্থাৎ আপনি যে এই তত্ত্ব উপদেশ দিয়েছেন তা কেবল আমাকে কৃপা করার জন্যই দিয়েছেন।

পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্—ভগবান এ পর্যন্ত ভক্তির যত কথা বলেছেন সবই গোপনীয় আধ্যাত্ম উপদেশ। দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলেছিলেন, '**একাংশেন স্থিতো জগৎ**' অর্থাৎ এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর এক অংশেই অবস্থিত। আর একাদশ অধ্যায়ের এই অংশে ভগবান স্বয়ং নিজের পরিচয় দিয়ে জানাচ্ছেন তিনি কেমন, আর সেটিকেই অর্জুন পরম গোপনীয় বলেছেন।

অর্জুনের তৃতীয় শব্দটি হল '**মোহোঽয়ং বিগতো মম**'—ভগবান আগের অধ্যায়ে তাঁর বিভূতিযোগ প্রসঙ্গে বলেছেন—

১) ভগবান সকল প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্তে বিরাজমান।

২) তিনি সকল প্রাণীর বীজস্বরূপ এবং

৩) তাঁর বিভূতি অনন্ত।

এসবই তিনি সংক্ষেপে বলেছেন আর তারপর বলছেন যে তাঁর একাংশেই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই সব শুনে অর্জুনের মনে হল যে তাঁর মোহদৃষ্টি দূর হয়েছে। ভগবান কিন্তু অর্জুনের এই বাক্য অনুমোদন করেননি কেননা তিনি বুঝেছেন যে অর্জুনের মোহ তখন কেবল আংশিকভাবেই দূর হয়েছে, সম্পূর্ণ নয়। তাই ভগবান এই অধ্যায়ের শেষে বলেছেন—**'মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো'** (গীতা ১১।৪৯)। অর্থাৎ তুমি ব্যথিত হয়ো না, বিমূঢ়ও হয়ো না। ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের পরে তাই আরো ৭টি অধ্যায়ব্যাপী উপদেশ দিয়ে তার আসক্তি নাশ করেছেন যতক্ষণ না তাঁর পূর্বস্মৃতি ফিরে আসে।

দ্বিতীয় শ্লোকে অর্জুন ভগবানের দুইটি বিপরীতধর্মী বিভূতির কথা বলেছেন—**'ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্'** এবং **'মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্'**। অর্থাৎ আমি জানি যে সকল প্রাণীই আপনার থেকে উৎপন্ন হয়, আপনাতে অবস্থান করে এবং আপনাতেই লীন হয়, এটা আপনার বিনাশী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল মাহাত্ম্য।

আর আপনার বিভূতি ও যোগ তত্ত্বত জানলে যে ভক্তি ও প্রেম হয়, ভগবানের প্রতি যে অভিন্নতা হয়, তা সবই অব্যয় অর্থাৎ আপনার অপরিবর্তনশীল মাহাত্ম্য।

তাৎপর্য হল এই যে, সৎ-অসৎ সবই আপনি—**'সদসচ্চাহম্'** (গীতা ৯।১৯)।

ভগবানের আশ্বাসন (শ্লোক ৫-৮)

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত॥ ৬

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮

সরলার্থ—ভগবান বললেন, হে পার্থ! তুমি এবার আমার নানাপ্রকার বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট শত-সহস্র দিব্যরূপ দর্শন করো।

হে ভরতবংশোদ্ভব ! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দুই অশ্বিনীকুমার এবং উনপঞ্চাশজন মরুৎগণকে অবলোকন করো এবং যা তুমি আগে কখনো দেখোনি, তেমন নানাবিধ আশ্চর্যজনক রূপও দর্শন করো।

হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন ! আমার এই দেহের একাংশে চরাচরসহ সমগ্র জগৎ এখনই পরিদর্শন করো। এছাড়া তুমি আর যা কিছু দেখতে চাও, তা-ও দেখে নাও।

কিন্তু তুমি তোমার এই চক্ষুর সাহায্যে অর্থাৎ চর্মচক্ষু দ্বারা আমাকে দেখতে পাবে না। তাই তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু প্রদান করছি, যার সাহায্যে তুমি আমার ঐশ্বরিক সামর্থ্য অবলোকন করো।

মূলভাব—অর্জুনের সসঙ্কোচ প্রার্থনা শুনে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। কারণ, অর্জুন নিজেকে অযোগ্য মনে করে ভগবানের ঐশ্বরিক রূপ দেখার প্রার্থনা করেছেন এবং তা ভগবানের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। ভগবান তখন অর্জুনকে তাঁর শত সহস্র রূপ দেখাবার কথা বলেছেন, যদিও অর্জুন তাঁর একটিমাত্র রূপ (কালরূপ) দর্শন করেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন। এতে বোঝা যায় যে, ভগবানের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলে সাধকের যে লাভ হয়, তা নিজের ইচ্ছা বা বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিলে হয় না। সাধকের মধ্যে যত সারল্য, কাতরতা, নিরভিমানতা থাকবে, ততই সে ভগবানকে জানতে সক্ষম হবে, ততই তার দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে। আর যতই সে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করবে ততই সে পারমার্থিক দৃষ্টিতে নির্বোধ থাকবে।

পরবর্তী শ্লোকে (ষষ্ঠ) ভগবান তাঁর বিশ্বরূপে সকল দেবতাদের দর্শনের কথা বলেছেন। দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু ও দুই

অশ্বিনীকুমার— এই তেত্রিশ (কোটি বা প্রকারের) দেবতাদের মধ্যে মরুদ্গণকেও ধরা হয়। কিন্তু উনপঞ্চাশ মরুৎগণকে তেত্রিশ কোটি দেবতাদের থেকে আলাদা করে বলা হয়েছে কারণ এরা সকলেই দৈত্য থেকে দেবতায় পরিণত হয়েছেন। ভগবান তাই এদের 'তথা' বলে আলাদাভাবে সম্বোধন করেছেন। ভগবানের এখানে সমস্ত দেবতার কথা বলার অর্থ হল সকল দেবতাই তাঁর স্বরূপ অর্থাৎ দেবতারূপে তিনিই বিরাজ করেন।

পরের (সপ্তম) শ্লোকে ভগবান বলছেন **'যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি'** (গীতা ১১।৭) অর্থাৎ ভগবানের শরীরে সবই বর্তমান। যেগুলি অতীত হয়ে গেছে, যা বর্তমানে হচ্ছে বা যা ভবিষ্যতে হবে তা সবই তাঁর দেহেই ঘটছে। তাই ভগবান বলছেন, তুমি যা কিছু দেখতে চাও তা আমার শরীরেই দেখে নাও। অর্জুন কী দেখতে চেয়েছিলেন ? তাঁর মনে সন্দেহ ছিল যে যুদ্ধে তাঁদের জয় হবে, না কৌরবদের জয় হবে— **'ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা ন জয়েয়ুঃ'** (গীতা ২।৬) তাই ভগবান বলছেন যুদ্ধের কী গতি হবে তাও তুমি আমার শরীরের এক অংশে দেখে নাও।

এই শ্লোকে উল্লিখিত পশ্য কথাটি গীতায় দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধির (বিবেকের) সাহায্যে দেখা ও চক্ষু দ্বারা দেখা। নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন **'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** (গীতা ৯।৫) অর্থাৎ বুদ্ধির সাহায্যে দেখার (জানার) কথা। আর এখানেও বলছেন **'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** (গীতা ১১।৯) অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা দেখার। আর এই চক্ষুর দ্বারা দেখার জন্য ভগবান **'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ'** অর্থাৎ অর্জুনকে ভগবান দিব্যচক্ষু প্রদান করেছেন, যাতে তিনি ভগবানের দিব্য অতীন্দ্রিয় রূপ দর্শন করতে পারেন।

সঞ্জয়ের বিশ্বরূপ দর্শন, বর্ণনা (শ্লোক ৯-১৪)

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১
দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

সরলার্থ—সঞ্জয় বললেন, হে রাজন্ ! এই কথা বলে মহাযোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (হরি) অর্জুনকে তাঁর পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখালেন। ৯

যাঁর অনেক মুখ ও অসংখ্য চোখ, নানাপ্রকার অদ্ভুতদর্শন, নানা দিব্য অলংকারবিশিষ্ট, হাতে উত্তোলিত অনেক দিব্য আয়ুধ এবং যাঁর গলায় অনেক দিব্য মালা, যিনি দিব্য বস্ত্র পরিহিত, যাঁর ললাট এবং দেহ চন্দন-চর্চিত—এরূপ আশ্চর্যময়, অনন্তরূপশালী, চতুর্মুখবিশিষ্ট (নিজ দিব্যস্বরূপ) রূপ ভগবান প্রদর্শন করালেন। ১০-১১

আকাশে যদি একই সঙ্গে হাজারো সূর্য উদিত হয়, তাহলেও সেই সবগুলির প্রভা একত্রে এই মহাত্মার (বিরাটরূপ পরমাত্মার) প্রভার সমকক্ষ হতে পারে না। ১২

তখন অর্জুন দেবাদিদেবের দেহের কোনো একটি স্থানে স্থিত নানাভাগে বিভক্ত সমস্ত জগৎ অবলোকন করলেন। ১৩

ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট হলেন এবং তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। তিনি করজোড়ে বিশ্বরূপ-দেবকে অবনত মস্তকে প্রণাম করে বললেন। ১৪

মূলভাব—দশম অধ্যায়ের প্রথমে ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে অজ্ঞ অর্জুন প্রার্থনা করেছেন—**'বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ'** (১০।১৬) অর্থাৎ

আপনার দিব্য বিভূতিগুলি সম্পূর্ণভাবে আমাকে বলুন। ভগবান কিন্তু তাঁর সমগ্র বিভূতি না বলে কেবল কিয়দংশই দশম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন আর অন্তিমে বলছেন —**'নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ'** (গীতা ১০।৪০) অর্থাৎ আমার দিব্য বিভূতিসমূহের কোনো অন্ত নেই, তাই কিছু কিছু প্রধান বিভূতিই সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।

আর বর্তমান একাদশ অধ্যায়ের প্রথমে অর্জুন বলছেন—**'দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্‌'** (গীতা ১১।৩) অর্থাৎ হে পরমেশ্বর ! আপনার এই ঐশ্বরিক রূপ দেখতে চাই। কিন্তু ভগবানের অনন্তরূপের একটি রূপ, মানে তাঁর কালরূপী ভীষণ বিশ্বরূপ দর্শন করেই অর্জুন ভীত হয়ে বলছেন —**'পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষং'** (গীতা ১১।১৭) অর্থাৎ হে ভগবান ! দিব্যদৃষ্টি দেওয়া সত্ত্বেও এই দেদীপ্যমান বিশ্বরূপ দর্শন আমার অসহ্য মনে হচ্ছে। ভীত অর্জুন আরো বলছেন, **'তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে'** (গীতা ১১।৪৬) অর্থাৎ তুমি পুনরায় চতুর্বাহু রূপ ধারণ করো।

এইভাবে ভগবানের প্রেরণায় অর্জুন ভগবানেরই দিব্য বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন, বিশ্বরূপ দর্শন করে তাঁর রূপ বর্ণনা করেছেন আর ভীত হয়ে এই রূপ প্রত্যাহার করার জন্য মিনতি জানিয়েছেন।

সঞ্জয়ের বিশ্বরূপ বর্ণনায় ভগবানের অনেক দিব্যবর্ণনা আছে—

মহাযোগেশ্বরঃ— সঞ্জয় ভগবানকে বলেছেন 'মহাযোগেশ্বর' অর্থাৎ সমস্ত যোগেরই তিনি ঈশ্বর, সমস্ত যোগই তাঁর অন্তর্গত। তার আগে অর্জুন ভগবানকে যোগেশ্বর বলেছেন— **'যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানম-ব্যয়ম্‌'** (গীতা ১১।৪)। সঞ্জয় ভগবানকে মহাযোগেশ্বর বলেছেন কারণ সঞ্জয়ের অর্জুনের থেকে ভগবানকে বেশি জানতেন। আবার সঞ্জয় থেকে ভগবানকে বেশি জানেন ব্যাসদেব, কেননা সঞ্জয় বলেছেন —**'ব্যাসপ্রসাদচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্‌'** (গীতা ১৮।৭৫) অর্থাৎ ব্যাসের কৃপাতেই আমার এই গুহ্যতম সংবাদ শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। আবার বেদব্যাস থেকেও ভগবানকে বেশি জানেন স্বয়ং তিনি, কেননা ভগবানই বলেছেন—**'ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ'** (গীতা ১০।২),

'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম' (গীতা ১০।১৫) অর্থাৎ ভগবানকে জানার ক্ষমতা দেবতাদেরও নেই মহর্ষিদেরও নেই। তাঁকে একমাত্র তিনি নিজেই জানেন।

অনেকবক্ত্রনয়নম্— বিরাট রূপে প্রকাশিত ভগবানের যতগুলি মুখ ও চোখ দেখা যাচ্ছিল তা সবই দিব্য। আবার বিরাট রূপের মধ্যে যত প্রাণী দেখা যাচ্ছিল, তাদেরও মুখ, চোখ, হাত, পা ইত্যাদি সর্ব অঙ্গ ভগবানেরই, কারণ তিনিই বিরাট রূপে প্রকাশিত।

অনেকাদ্ভুতদর্শনম্—ভগবানের বিরাট রূপে যত রূপ, আকৃতি এবং বর্ণ দেখা যাচ্ছিল তা সবই অদ্ভুত।

অনেকদিব্যাভরণম্—বিরাট রূপে দেখতে পাওয়া তাঁর আভরণাদি সবই দিব্য।

দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্—তাঁর বিরাট রূপ হাতে যে অশেষ প্রকার আয়ুধ আছে তা সবই দিব্য।

দিব্যমাল্যাম্বরধরম্—বিরাট রূপ ভগবান তাঁর গলায় যে সব মাল্য ও বস্ত্র আদি ধারণ করেছিলেন তাও সবই দিব্য।

দিব্যাগন্ধানুলেপনম্—বিরাট রূপ ভগবান তাঁর শরীরে যত প্রকার সুগন্ধ আদি অনুলেপন করেছিলেন এবং ললাটে যে কস্তুরী, চন্দনাদি তিলক ধারণ করেছিলেন তা সবই দিব্য।

এইভাবে আশ্চর্যময়, অনন্তরূপশালী এবং চতুষ্পার্শ্বে মুখবিশিষ্ট এবং পরম ঐশ্বর্যময় ভগবানের অনন্ত রূপ অর্জুন দর্শন করলেন।

এই অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকটি অতি গূঢ়। **'দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥'** (গীতা ১১।১২)। অর্থাৎ আকাশে উদিত শত সহস্র তারকারাজি মিলিত হলেও যেমন তাদের প্রভা এক চন্দ্রের সমান হয় না, বা সহস্র চন্দ্র এক হলেও যেমন এক সূর্যের সমকক্ষ হয় না, তেমনি আকাশে একসঙ্গে শত সহস্র সূর্য উদিত হলেও তাদের মিলিত প্রভা বিশ্বরূপ ভগবানের কণামাত্র হয় না। সূর্যের প্রভা হল ভৌতিক আর ভগবানের প্রভা হল দিব্য। তাই ভৌতিক প্রভা যত উজ্জ্বলই হোক

না কেন তা দিব্যপ্রভার তুলনায় তুচ্ছই থাকে। সূর্যের প্রভা কখনই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না কেননা তা তাঁর থেকেই উৎসারিত। ভগবান তাই পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলেছেন— **'যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।'** (গীতা ১৫।১২)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে, ১৯৪৪ সালে আমেরিকার নেভাডাতে 'অ্যাটম্ বোমা' বিস্ফোরণের প্রথম পরীক্ষা হয়। বোমাটি মাটির অত্যন্ত গভীরে ফাটানো হয় এবং সমস্ত জগদ্বরেণ্য বিজ্ঞানী এই পরীক্ষা উদগ্রীব হয়ে নিরীক্ষণ করেন। সেই বিস্ফোরণের তেজ দেখে পরীক্ষাগারের অধ্যক্ষ 'স্যার রবার্ট ওপেনহাইমার' যাঁকে 'অ্যাটম বোমার জনক' বলা হয় তিনি গীতার উপরোক্ত এই শ্লোকটি গেয়ে ওঠেন এবং ভগবানের বিভূতির কাছে বারংবার মাথানত করেন।

এইভাবে অর্জুন ভগবানের শরীরের একাংশেই জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, স্থাবর-জঙ্গম, নভচর-স্থলচর আদি চুরাশি লক্ষ যোনি, চতুর্দশ ভুবন—এ সমস্ত নানাভাবে বিভক্ত অবস্থায় অবলোকন করলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে, মা যশোদা কানাই-এর ছোট্ট মুখবিবরে বিশ্বরূপ দর্শন করেন। যশোদা দেখেন সেই মুখবিবরে সমগ্র জগৎ, এমন কী নন্দগ্রাম, নন্দভবনসহ নিজেও সেখানে উপস্থিত—**'এতদ্বিচিত্রং সহ জীবকাল ব্রজং মহাত্মানম্ বীক্ষ্য'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮।৩৯)।

অর্জুনের আর্তভাবে স্তুতি (শ্লোক ১৫-৩৪)

ভগবানের দেবরূপের বর্ণনা (শ্লোক ১৫-১৮)

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।

পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮

সরলার্থ—অর্জুন বললেন, হে দেব ! আমি আপনার দেহে সকল দেবতাকে, প্রাণীদের বিশেষ সম্প্রদায়গুলিকে, কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, মহাদেব, সমস্ত ঋষিকুল এবং সমস্ত দিব্য সর্পগুলিকে দেখছি। ১৫

হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! আপনাকে আমি বহু হাত, উদর, মুখ এবং নেত্রবিশিষ্ট ও সবদিকে অনন্ত রূপসম্পন্ন দেখছি। আমি আপনার আদি, মধ্য বা অন্ত কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। ১৬

আমি আপনাকে কিরীট (মুকুট), গদা, চক্র (এবং শঙ্খ ও পদ্ম)-ধারী রূপে দেখছি। আপনাকে তেজোরাশিযুক্ত, সবদিক প্রকাশকারী, দেদীপ্যমান অগ্নি এবং সূর্যের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন, দুর্নিরীক্ষ্য এবং সবদিক থেকে অপ্রমেয় স্বরূপে দেখছি। ১৭

আপনিই জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর ব্রহ্ম, আপনি সমগ্র বিশ্বের পরম আশ্রয়, সনাতন ধর্মের রক্ষকও আপনি এবং আপনিই অবিনাশী সনাতন পুরুষ—এরূপ আমি মনে করি। ১৮

মূলভাব—অর্জুন স্তুতিতে প্রবৃত্ত হয়ে পঞ্চদশ শ্লোকের প্রথমেই বলছেন **'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্'** অর্থাৎ ভগবৎ প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টি এত অনুপম ছিল যে, অর্জুন দেবলোক তো বটেই, পরিষ্কারভাবে ত্রিলোকও দেখতে পাচ্ছিলেন। তাছাড়াও দেখছিলেন ত্রিলোকের স্রষ্টা ব্রহ্মা, প্রতিপালক বিষ্ণু ও সংহারক মহাদেবকে। তিনি দেখছেন তাঁর দেহের এক একটি রোমকূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান। ভাগবতেও ব্রহ্মামোহন স্তবে ব্রহ্মা ভগবানকে স্তুতি করে বলছেন—

ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা বাতাধ্বরোম-বিবরস্য চ তে মহিত্বম্।

(ভাগবত ১০।১৪।১১)

অর্থাৎ হে ভগবন্ ! আপনার এক একটি রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তেমনিভাবে ওঠানামা করে যেমন গবাক্ষের ছিদ্রপথে প্রবেশকারী সূর্যকিরণে

ধুলার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাকে (ত্রসরেণু) ওঠানামা করতে দেখা যায়।

পরের ষষ্ঠদশ শ্লোকে অর্জুন ভগবানের অন্তহীনতা সম্বন্ধে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—**'অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং, সর্বতোঽনন্তরূপম্'** ও **'নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং'**। অর্থাৎ ভগবানের হাত, উদর, মুখ, চোখের কোনো অন্ত নেই, এগুলি সবই অনন্ত। আবার তিনি দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ চতুর্দিকেই অনন্ত বলে প্রতিভাত হচ্ছেন তাই তাঁর বিরাট রূপের কোথায়ই বা আদি, কোথায় মধ্য, কোথায় বা অন্ত অর্জুন তারও দিশা খুঁজে পাচ্ছেন না।

পরের সপ্তদশ শ্লোকে অর্জুনের কথায় বোঝা যাচ্ছে যে ভগবানকে দিব্যদৃষ্টির দ্বারাও পূর্ণভাবে জানা যায় না। তাই অর্জুন বলছেন—**'দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্'**, **'দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্'** ও **'অপ্রমেয়ম্'**। অর্থাৎ ভগবানের বিরাট রূপ অত্যন্ত প্রদীপ্ত অগ্নির মতো সমুজ্জ্বল। তাঁর এই রূপ দর্শন করলে চোখ ধাঁধিয়ে যায় তাই তাঁর এইরূপ **'দুর্নিরীক্ষ্যং'** মানে তাঁকে নিরীক্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন।

আবার তিনি **'অপ্রমেয়ম্'** অর্থাৎ তাঁকে কোনো প্রমা বা মাপের সাহায্যেও সীমাবদ্ধ করা যায় না। কারণ প্রমার শক্তি তো তিনিই, আর তাঁর প্রদত্ত শক্তিতেও অর্জুন ভগবানের বিরাট রূপ সম্পূর্ণভাবে দর্শন করতে সক্ষম হননি। এর কারণ ভগবান নিজেকেও সম্পূর্ণভাবে জানেন না, জানলে কী করে আর তিনি অনন্ত হন!

ভগবানের দেবরূপ বর্ণনার শেষ শ্লোকে (অষ্টাদশ) অর্জুন ভগবানের নির্গুণ নিরাকার ও সগুণ সাকার রূপের বর্ণনা করেছেন। অর্জুন বলছেন—**'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্'**, **'ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্'** ও **'ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম-গোপ্তা'**। অর্থাৎ প্রথমটিতে বলা হয়েছে তিনি নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ—নির্গুণ নিরাকার যে ভগবৎসত্তা, যা বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, মহাপুরুষদের বাণী এবং তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত দ্বারা জ্ঞাতব্য তাও তিনি। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে যে, জগৎ-সংসার সগুণ-সত্তারূপে আমাদের অনুভূতির মধ্যে আসে তাও তিনি এবং শেষে বলেছেন, সগুণ-সাকাররূপ অবতাররূপে ধর্মরক্ষা করতে ও অধর্ম নাশ করতে যিনি আসেন, তাও তিনি।

ভগবানের উগ্ররূপের বর্ণনা (শ্লোক ১৯-২২)

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্টাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২

সরলার্থ—আপনাকে আমি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, অনন্ত প্রভাবশালী, অসংখ্য বাহু, চন্দ্র-সূর্য নেত্রস্বরূপ, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় মুখমণ্ডলবিশিষ্ট এবং নিজের তেজে জগৎকে সন্তপ্তকারী রূপে দেখছি। ১৯

হে মহাত্মন্ ! এই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং সকল দিক আপনার দ্বারাই পরিপূর্ণ। আপনার এই অদ্ভুত ও উগ্রমূর্তি দর্শন করে ত্রিলোক ব্যথিত (ব্যাকুল) হচ্ছে। ২০

ওই দেবসমুদায় আপনাতেই প্রবেশ করছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় কৃতাঞ্জলি হয়ে আপনার নাম ও গুণকীর্তন করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধমহাপুরুষগণ 'কল্যাণ হোক !' 'মঙ্গল হোক !' এইরূপ স্বস্তিবাক্য ও উত্তম স্তোত্রের দ্বারা আপনার স্তুতি করছেন। ২১

যে একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, দ্বাদশ সাধ্যগণ, দশ বিশ্বদেব, দুই অশ্বিনীকুমার, উনপঞ্চাশ মরুৎ, সপ্ত উষ্মপায়ী পিতৃদেব এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ আছেন, তাঁরা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আপনাকে দর্শন করছেন। ২২

মূলভাব— অর্জুনের বর্ণনায় তাঁর পূর্বোক্ত দেবরূপ বর্ণনার কিছুটা বা পুনরুক্তি হয়েছে বলে মনে হয়। তিনি দেখছেন যে দেবতারাও তাঁর মতন এই বিরাট রূপ দেখে বিস্মিত হচ্ছেন, ভয়ভীত হচ্ছেন। উনিশতম শ্লোকে ভগবানের অনন্তময়তার পুনঃবর্ণনা করে অর্জুন বলছেন—**'স্বতেজসা বিশ্বমিদং**

তপন্তম্' অর্থাৎ যে তেজের দ্বারা বিশ্ব সন্তপ্ত হয়, সেই তেজও আপনি। তাৎপর্য হল এই যে, যে সব ব্যক্তি, বস্তু, পরিস্থিতি দ্বারা প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয় সেই সন্তাপকারী ও যারা সন্তপ্ত হয় উভয়েই সেই এক বিশেষ রূপেরই অঙ্গ।

পরবর্তী বিংশতি শ্লোকে অর্জুন ভগবানের দেশকৃত ব্যাপ্তির বর্ণনা করে তাঁর অন্য উগ্ররূপ বর্ণনা করেছেন। অর্জুন বলেছেন—'**দ্যাবা-পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ**' অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম আদি চারিদিক, উত্তর ও পূর্বের মাঝে ঈশান, পূর্ব ও দক্ষিণের মাঝে অগ্নি, দক্ষিণ ও পশ্চিমের মাঝে নৈর্ঋত এবং পশ্চিম ও উত্তরের মাঝে বায়ু আদি চারি কোণ এবং ঊর্ধ্ব ও অধঃ এই দশ দিক্ এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ আদি সবই ভগবানের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ এই সমস্ত দিক্গুলিতে একমাত্র তিনিই বিরাজমান।

অর্জুন আবার বলছেন—'**দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্**' অর্থাৎ দশদিক্ ব্যাপ্ত এই ভয়ংকর রূপ দেখে সকল প্রাণীই ব্যথিত হচ্ছে, ভয়ার্ত হচ্ছে। আসলে বিরাট রূপ দেখে যে প্রাণীসকল ব্যথিত বা ভয়ভীত হচ্ছে তা নয় কিন্তু যেহেতু তাদের দিব্যচক্ষু নেই তাই তারা তাঁর বিরাট রূপ (লোকক্ষয়কারী কালরূপ) দেখতে পাচ্ছিলেন না ফলে তারা নিজ নিজ মৃত্যুর ভয়েই ভীত ও সন্ত্রস্ত হচ্ছিলেন। এর তাৎপর্য এই যে সন্তাপিত হওয়া ও সন্তপ্তক করা অথবা ব্যথিত হওয়া ও ব্যথা প্রদানকারী হওয়া— এ সবই বিরাট রূপের অঙ্গ। আসলে আমাদের দেখা, শোনা ও বোঝার যে জগৎ আছে তা ভগবানের দিব্য বিরাট রূপেরই এক অতি ছোট্ট সংস্করণ। জগতের যে পরিবর্তনশীলতা, অ-দিব্যতা, তাও প্রকৃতপক্ষে বিশ্বরূপেরই এক ঝলক, এক লীলামাত্র। বিশ্বরূপের দিব্যতার অবশ্য স্বতন্ত্র সত্তা থাকে, কিন্তু জগতের যে অ-দিব্যতা তার পৃথক সত্তা থাকে না। জগতের প্রতি ভোগদৃষ্টি থাকলে জগতের প্রতি যে ভাব বিদ্যমান থাকে, ভোগদৃষ্টি দূর হয়ে গেলে আর সে ভাব থাকে না। যেমন বালকদের খেলায় দৃষ্টি থাকায় ছোটবেলায় কাঁকর, পাথর ইত্যাদি আকৃষ্ট করে কিন্তু বড় হলে তাদের সেগুলির প্রতি আর সেই আকর্ষণ থাকে না। তেমনি যাদের ভোগদৃষ্টি থাকে তাদেরই জগৎ সত্য বলে প্রতিভাত হয় আর তারাই বিরাট রূপের মধ্যে ভীত ও সন্তাপিত প্রাণীরূপে অর্জুনের কাছে

দৃষ্ট হচ্ছিলেন। আর যাঁদের ভোগদৃষ্টি থাকে না, সেইসব মহাপুরুষদের কাছে এই জগৎই ভগবদ্স্বরূপ রূপে প্রতিভাত হয়।

যেমন একই নারীকে বালক দেখে মা-রূপে, পিতা কন্যা-রূপে, পতি পত্নী-রূপে এবং ক্ষুধার্ত জন্তু খাদ্য-রূপে দেখে, তেমনি এই জগৎ **বদ্ধজীবের** চর্মচক্ষুতে সত্য, **বিবেকদৃষ্টিতে** পরিবর্তনশীল, **দিব্যদৃষ্টিতে** বিরাট রূপের এক ক্ষুদ্র অংশ আর **ভাবদৃষ্টিতে** ভগবদ্স্বরূপ রূপ প্রতিভাত হয়।

পরবর্তী একবিংশ ও দ্বাবিংশ শ্লোকে ভগবান স্বর্গলোকের দেবতাদেরও ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থার কথা বলেছেন। দেবতাদের মধ্যে যাঁরা দীর্ঘায়ু অর্থাৎ কল্পের আরম্ভ থেকে কল্পের শেষ অবধি দেবরূপে থাকেন সেই অজান দেবতারাও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর নাম-লীলা-গুণকীর্তন করছেন। আবার সপ্তঋষি, মহর্ষিগণ, সনকাদি ঋষিগণ নানা স্বস্তিবচন (কল্যাণ হোক ! মঙ্গল হোক ! ইত্যাদি) ও উত্তম স্তোত্রাদির দ্বারা তাঁর স্তুতি করছিলেন। এছাড়াও একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং উনপঞ্চাশ মরুৎ আদি সকলেই বিস্মিত হয়ে তাঁর স্তুতি করছেন। অন্য দেবতারাও যেমন দ্বাদশ সাধ্য (মন, অনুপন্তা, প্রাণ, নর, যান, চিত্তি, হয়, নয়, হংস, নারায়ণ, প্রভব এবং বিভু — বায়ুপুরাণ ৬৬।১৫-১৬) আদি দেবগণও এই বিরাট রূপের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছেন। এছাড়াও দশজন বিশ্বদেব—ক্রতু, দক্ষ, শ্রব, সত্য, কাল, কাম, ধুনি, কুরুবান, প্রভাবান ও রোচমান (বায়ুপুরাণ ৬৬।৩১-৩২) এবং কশ্যপ মুনি ও অরিষ্টা কর্তৃক উদ্ভূত গন্ধর্ব আদি দেবগণ, আর কশ্যপ-পত্নী মসা হতে উদ্ভূত যক্ষগণ, কর্দম ও দেবাহুতি হতে উদ্ভূত কপিলমুনি যিনি আদি সিদ্ধ এবং দেবগণ বিরোধী অসুর সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আপনাকে দর্শন করছেন। এই সব দেবতা যারা ভগবানকে বিস্মিত বিমূঢ়ভাবে দর্শন করছেন এবং অন্যান্য সবাই কিন্তু পরমাত্মাই।

ভগবানের অতি উগ্ররূপের বর্ণনা
(শ্লোক ২৩-৩১)

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্।। ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥ ২৮
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ৩০
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১

সরলার্থ—হে মহাবাহো ! আপনার বহু মুখ, চক্ষু, বাহু, উরু, পদ, উদর ও বহু বিকট দন্তমুখাকৃতিসম্পন্ন এই বিশাল রূপ দর্শন করে সকল প্রাণী ব্যথিত হচ্ছে এবং আমিও ব্যথিত হচ্ছি। ২৩

কেননা হে বিষ্ণু ! আপনার দেদীপ্যমান বিচিত্র বর্ণ, আপনি আকাশকে স্পর্শ করছেন অর্থাৎ সবদিকেই বৃহৎ আকৃতি, আপনার মুখ বিস্তারিত, আপনার চোখ প্রদীপ্ত এবং বিশাল। আপনার এই রূপ দেখে ভয়ভীত আমি ধৈর্য এবং শান্তি পাচ্ছি না। ২৪

আপনার প্রলয়াগ্নি সদৃশ প্রজ্বলিত এবং বিকট দন্তসমন্বিত ভীষণ মুখসকল দর্শন করে আমি দিশাহারা হয়েছি, আমি স্বস্তিলাভ করছি না। সেইজন্য হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি প্রসন্ন হোন। ২৫

আমাদের পক্ষের প্রধান যোদ্ধাগণসহ ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণও আপনার

মধ্যে প্রবেশ করছেন। রাজন্যবর্গসহ ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রগণও আপনার বিকট দন্তবিশিষ্ট ভয়ংকর মুখবিবরে সবেগে প্রবেশ করছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চূর্ণবিচূর্ণ মস্তকসহ আপনার দন্তসন্ধির মধ্যে সংলগ্ন রয়েছে। ২৬-২৭

যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ স্বাভাবিকভাবে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, তেমনই এই জগতের মহাশূরবীরগণ আপনার সর্বদিকে প্রজ্জ্বলিত মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হচ্ছেন। ২৮

যেমন পতঙ্গকুল মোহবশত মরণের জন্য অতি বেগে ধাবিত হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই এইসব লোকেরা মোহবশত নিজের মৃত্যুর জন্য অতি বেগে ধাবিত হয়ে আপনার মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে। ২৯

আপনি সকল লোককে জ্বলন্তমুখসমূহের দ্বারা গ্রাস করে চতুর্দিক থেকে বারংবার লেহন করছেন এবং হে বিষ্ণু ! আপনার তীব্র প্রভা, তার নিজস্ব তেজের দ্বারা সমগ্র জগৎকে পরিপূর্ণ করে সকলকে তাপিত করছে। ৩০

আমাকে বলুন এই উগ্ররূপধারী আপনি কে ? হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে প্রণাম করি ! আপনি প্রসন্ন হোন। আদিপুরুষ আপনাকে আমি তত্ত্বত জানতে চাই, কারণ আমি আপনার উদ্দেশ্য কী তা জানি না। ৩১

মূলভাব—অতঃপর তাঁর অতি উগ্ররূপে ভীত অর্জুন পুনরায় ভগবানের বহু মুখ, নেত্র, বাহু, পাদ, হস্ত, উদর আদির বর্ণনা করেছেন। অর্জুন স্তুতিতে বলছেন ভগবানের মুখগহ্বর বহু এবং বিকট দন্তবিশিষ্ট, এবং তাঁর এই ভয়ানক বিকট রূপ দর্শন করে সকল প্রাণী এবং তিনি নিজেও ভীত হচ্ছেন। তিনি বলছেন—**'নভঃস্পৃশম্ দীপ্তম্'** অর্থাৎ ভগবানের বিরাট রূপের দীর্ঘ অবয়ব আকাশ স্পর্শ করছে। অর্জুনের যতদূর দৃষ্টি যায় তিনি ভগবানের বিরাট রূপই দেখতে পাচ্ছিলেন। তাৎপর্য হল ভগবানের বিশ্বরূপ হল অসীম, যার কাছে অর্জুনকে দেওয়া দিব্যদৃষ্টির শক্তিও সীমিত।

পরের শ্লোকে (পঁচিশতম) অর্জুন বিরাট রূপের বর্ণনায় বলেছেন—**'দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি'** অর্থাৎ হে বিষ্ণু ! আপনার প্রলয়াগ্নি সদৃশ প্রজ্বলিত এবং দন্তসমন্বিত ভীষণ মুখসকল দর্শন করে

আমি দিশাহারা হয়েছি। মহাপ্রলয়কালে সমগ্র ত্রিভুবন ভস্মকারী যে অগ্নি প্রকটিত হয় তাকে সংবর্তক বা কালাগ্নি বলে। বিশ্বরূপধারী ভগবানের মুখও কালাগ্নি-সদৃশ আর তা ভীষণ দন্তসজ্জিত। তাই অর্জুন বলছেন, এই রূপ দেখে তাঁর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়েছে। এর তাৎপর্য হল—মানুষের দিশার জ্ঞান হয় সূর্যের উদয় ও অস্ত থেকে, আর সেই সূর্যই এখন বিরাট রূপের অন্তর্গত হয়ে গেছেন, তাই অর্জুন দিশাহারা বোধ করছেন। ভগবান অর্জুনকে বিরাট রূপ দর্শন করান অতি প্রসন্নচিত্তে কিন্তু এই বিরাট রূপ দর্শন করে অর্জুনের ভ্রম হল যে ভগবান তার প্রতি হয়তো প্রসন্ন নন। তাই তিনি ভগবানকে স্তুতি করে বলছেন—হে সমগ্র দেবতাদের অধীশ্বর আপনি **'প্রসীদ'** অর্থাৎ প্রসন্ন হন।

পরের চারটি শ্লোকে (ছাব্বিশ-উনত্রিশ) অর্জুন প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের ভগবানের বিরাট রূপের মধ্যে প্রবেশের বর্ণনা করেছেন। এই যোদ্ধাদের মধ্যে দুই প্রকার ব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়েছে।

প্রথম প্রকার ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেছেন—

'ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ' অর্থাৎ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও কিছু পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধা যাঁরা কর্তব্যনিষ্ঠ তাঁরাও তাঁর মুখমধ্যে প্রবেশ করেছেন।

ভীষ্ম—ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা পৃথিবীখ্যাত। তিনি পিতার সুখের জন্য বিবাহ না করার পণ করেছিলেন ও অবাল্য ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি তাঁর এই প্রতিজ্ঞায় এমন অটল ছিলেন যে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য গুরুর সঙ্গে যুদ্ধেও পরান্মুখ হননি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়েও ভীষ্মর প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ভগবান স্বয়ং তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন। ভীষ্ম ছিলেন হস্তিনাপুরের অধিপতির অভিভাবক তাই তাঁকে কর্তব্যবোধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল।

দ্রোণ— অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য ছিলেন দুর্যোধনের বৃত্তিভোগী। তাই তিনি যুদ্ধকে নিজ কর্তব্য মনে করে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। শেষে দেবতাদের ও মুনি-ঋষিদের উপদেশ শুনে এবং নিজ ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম বুঝে যুদ্ধে উপরত হন। দ্রোণাচার্যর মধ্যে এমন নিরপেক্ষতা ছিল যে তিনি গুরুভক্ত, শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও ধর্মপথে স্থিত অর্জুনকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ ও তার প্রত্যাহার বিদ্যা এই

দুইই শিখিয়েছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গুণ না থাকায় নিজ পুত্র অশ্বত্থামাকে শুধুই প্রয়োগ শেখান, প্রত্যাহার কৌশল শেখাননি।

কর্ণ— দুর্যোধনের সঙ্গে কর্ণর বিশেষ সখ্যতা ছিল আর সেই বন্ধুত্বের কর্তব্যের খাতিরেই তিনি যুদ্ধে যোগদান করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর কুন্তীর অনুরোধ সত্ত্বেও কর্ণ দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করতে সম্মত হননি। তবে তিনি কুন্তীকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন যে, তিনি অর্জুন ছাড়া কোনো পাণ্ডবকেই মারবেন না। কর্ণ অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও অতিশয় দানবীর ছিলেন। নিজ মৃত্যুর কারণ জেনেও তিনি ইন্দ্রের প্রার্থনায় নিজ সহজাত কবচ ও কুণ্ডলী তাঁকে দান করেন।

এতদ্ব্যতীত ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ আদি অর্জুনের সপক্ষীয় সকল যোদ্ধাই তাঁর বিরাট রূপে প্রবেশ করেছেন।

আবার পরের শ্লোকে অপর প্রকার ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে বলেছেন **'অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ'** অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ও তৎপক্ষীয় রাজন্যবৃন্দ বিরাটরূপী বিকট দ্রংষ্টাকরাল সম্বন্ধিত ভীষণ মুখগহ্বরে সবেগে প্রবেশ করছেন। কারোর বা মস্তক দাঁতের ফাকে লেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

এখানে একটা সংশয় হয় যে, যোদ্ধাগণ এখনও যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান তাহলে অর্জুন কিভাবে এদের সবাইকে সেই বিরাট রূপে প্রবিষ্ট হতে দেখলেন। এর উত্তর হল এই যে, ভগবান অর্জুনকে আসন্ন ভবিষ্যৎ দেখাচ্ছিলেন। ভগবান কালাতীত হওয়ায় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এই তিন কালই ভগবানের মধ্যে বিরাজমান।

ভগবান অর্জুনকে কেবল দুই প্রকার যোদ্ধার কথা বলেননি, তাদের দু'প্রকার গতির কথাও বলেছেন। প্রথম প্রকার যোদ্ধা কর্তব্যনিষ্ঠ এবং কর্তব্যকর্ম মনে করেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। নদীর দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁদের সম্বন্ধে বলেছেন—**'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি'** অর্থাৎ যেমন নদীসমূহের জলপ্রবাহ, স্বাভাবিকভাবে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি এই জগতের মহাশূরবীরগণও সেই বিরাট রূপের মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট

হচ্ছেন। এই শ্লোকটির তাৎপর্য এই যে জলমাত্রেরই মূল হল সমুদ্র, তাই নদীগুলো স্বাভাবিকভাবে সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়। এইসব জলপ্রবাহ সমুদ্রে প্রবেশ করলে তাদের নামরূপ পরিত্যাগ করে সমুদ্ররূপ ধারণ করে। তখন তাদের আর সমুদ্র ছাড়া কোনো অস্তিত্ব থাকে না। প্রকৃতপক্ষে তাদের আগেও কোন অস্তিত্ব ছিল না (কারণ সমুদ্রর জলই মেঘ হয়ে পৃথিবীতে বর্ষিত হয় এবং তাই ঝরনার জলের ধারা হয়ে নদীরূপ ধারণ করে), কিন্তু নদীগুলি প্রবাহরূপ হওয়ায়, পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়।

সেইরকম সংসারে জীবমাত্রেরই নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই কিন্তু ভ্রমবশত এই বিনাশশীল দেহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায় এবং জাগতিক পদার্থের সংগ্রহ ও সংযোগজনিত সুখে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে নিজেকে পৃথক অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে করে। জীবের মধ্যে তিনিই প্রকৃত বীরপুরুষ যিনি জাগতিক পদার্থ সংগ্রহ ও সুখভোগে ব্যাপৃত না হয়ে তাঁরা কর্তব্যনিষ্ঠ এবং ঈশ্বরলাভের জন্য নিষ্কাম কর্তব্যকর্মে তৎপর থাকেন। এইরূপে যুদ্ধে উপস্থিত যোদ্ধারা হলেন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ, তাই তাঁরা ভগবানের প্রদীপ্ত (জ্ঞানস্বরূপ) মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হচ্ছেন। জগতে এইরূপ পরমাত্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। তাই তাদের উপলক্ষ্য করে পরোক্ষবাচক **'অমী'** পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

অপর দিকে যাঁরা প্রশংসা ও লোভের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন অর্থাৎ যাঁরা জাগতিক সংগ্রহ ও ভোগাদিতে ব্যাপৃত থাকেন তাঁদের সঙ্গে পতঙ্গের তুলনা করা হয়েছে—**'যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গবিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ'**। অর্থাৎ যেমন পতঙ্গকুল মোহবশত মরণের জন্য অতি বেগে উড়ে এসে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই এইসব সংসার আসক্ত লোকেরাও নিজের মৃত্যুর পথে অতি বেগে ধাবিত হয়ে নিজেদের নাশের জন্যই বিরাট রূপের মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে। সবুজ ঘাসের পতঙ্গকুল যেমন অন্ধকার রাত্রে কোথাও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দেখলে তাতে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে এগিয়ে যায়। তার মধ্যে কিছু পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করে আবার কিছু পতঙ্গ পাখা পুড়ে যাওয়ায় মৃত্যু-যাতনায় ঝটপট করে। তবু সেইসব

পতঙ্গদের লালসা অগ্নির দিকেই থাকে। যদি কেউ অগ্নিটি নিভিয়ে দেয় তবে সেই পতঙ্গগুলি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ভাবে আমরা কী সুখ হতে বঞ্চিত হলাম!

এইভাবে ভোগ ও সংগ্রহে তৎপর থাকা ব্যক্তিরাও মনে মনে সেগুলিকে সদাই চিন্তা করে আর ভাবে জীবনে এসব না থাকলে জীবনই বৃথা—আর একেই বলে সাংসারিক বেগ। এই বেগসম্পন্ন হয়েই দুর্যোধন প্রভৃতি রাজন্যবর্গ পতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত বেগে কালচক্ররূপ এই বিরাট রূপের মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে অর্থাৎ পতনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এর ফলে তারা বারংবার চুরাশি লক্ষ জন্ম ভোগ করছে অথবা নরকের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এর তাৎপর্য হল যে মানুষ প্রায়শই জাগতিক ভোগ-সুখ-মান-যশ ইত্যাদির জন্য দিনরাত্রি ছুটছে। আর তা অর্জন করতে তাকে প্রায়শই অপমান, নিন্দা সহ্য করতে হয় এবং সে চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়। জীবনের আধার যে আয়ু তাও ক্রমশ ফুরিয়ে আসে কিন্তু তবু তার বিনাশশীল ভোগ ও সংগ্রহের প্রতি অন্তরের লালসা কমে না।

ভর্তৃহরি বৈরাগ্যশতকে বলেছেন—

অজানন্ দাহাত্ম্যং পততি শলভো দীপদহনে
স মীনোঽপ্যজ্ঞানাদ্বড়িশযুতমশ্নাতি পিশিতম্।
বিজানন্তোঽপ্যেতে বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা॥

(ভর্তৃহরি বৈরাগ্যশতক)

পতঙ্গ প্রদীপের দাহিকাশক্তি না জানায় তাতে ঝাঁপ দেয়, মাছও অজ্ঞতাবশত বঁড়শিতে লেগে থাকা মাংসের টুকরোর দিকে ছোটে। কিন্তু আমরা জেনেশুনেও বিপত্তির জালে আবদ্ধকারী কামনাগুলিকে পরিত্যাগ করি না। অহো! মোহের মহিমা কত গভীর।

গীতায় শ্লোক দুটিতে এইভাবে নদীসমূহ ও পতঙ্গাদির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। পতঙ্গাদি অবাস্তব কিছু পাওয়ার আশায় মোহগ্রস্ত হয়ে অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু নদী নিজেকে সমর্পণের জন্যই সমুদ্র অভিমুখে যায়। যে ব্যক্তি পাওয়ার আশা রাখেন তিনি মোহগ্রস্ত পতঙ্গের ন্যায় আর যিনি সমর্পণের আর্তি

রাখেন তিনি নদীর মতো শরণাগত হন।

নেওয়ার ভাব প্রবল হলে জড়ত্বের ভাব আসে এবং তা বন্ধনকারক হয় আর দেওয়ার ভাব উন্মেষিত হলে তাতে চেতন ভাব জন্মায় এবং তা মুক্তিকারক হয়।

নেওয়ার ভাব হল অশুভ কর্ম ও সেই আকাঙ্ক্ষাকারীদের বারংবার জন্ম-মৃত্যু এবং নরক থেকে স্বর্গবাস পর্যন্ত হয় কিন্তু দেওয়ার উদগ্রীবকারী বা ত্যাগভাব প্রবল হওয়া হল শুভকর্ম এবং তাতে মোক্ষলাভ পর্যন্ত হয়।

পরের ত্রিংশ শ্লোকে অর্জুন ভগবানের 'সমগ্র ভুবন গ্রাসকারী' বিশ্বরূপের বর্ণনা করেছেন।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥

(গীতা ১১।৩০)

অর্থাৎ অর্জুন বর্ণনা করে বলছেন ভগবানের বিশ্বরূপের (কালরূপী) তেজ বা প্রভা অত্যন্ত উগ্র আর এই উগ্রতেজ দ্বারা তিনি প্রাণীসমূহকে সংহার করেছেন। আবার যাতে কেউ এদিক-ওদিক না চলে যায় তাই বারংবার জিভ দিয়ে লেহন করে সবাইকে নিজের প্রজ্জ্বলিত মুখগহ্বরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ কালরূপী ভগবানের (গ্রাস) জিহ্বার লেহন থেকে কেউই বাঁচতে পারে না।

এখানে ভগবানের বর্ণনায় অর্জুন বলছেন **'লোকান্ সমগ্রান্'** আর **'জগৎ সমগ্রম্'** অর্থাৎ দৃষ্ট সকল লোক, জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম আদি সমস্তই ভগবানের সমগ্ররূপের অন্তর্গত। ভগবান আগেও নিজ মুখে বলেছেন—**'অসংশয়ম সমগ্রং মাম্'** (গীতা ৭।১) অর্থাৎ তিনি নিজেও সমগ্র, এবং **'যজ্ঞয়াচরতঃ কর্ম সমগ্রম্'** (গীতা ৪।২৩) অর্থাৎ সমগ্র কর্মও তিনি। এর অর্থ হল সমগ্র জগৎ, সমস্ত জীবলোক, সমগ্র কর্ম এবং স্বয়ং ভগবান এসবই তাঁরই সমগ্ররূপ।

এই প্রকরণের অন্তিম একত্রিংশ শ্লোকে ভগবানের রূপের সমগ্রতা ও তাঁর উগ্ররূপ দেখে, ভীত অর্জুন তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য প্রার্থনা করেছেন—

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌॥

(গীতা ১১।৩১)

অর্জুন কর্তৃক ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনায় দেখা যায় যে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অর্জুনও তাঁর বিশ্বরূপ অনুধাবন করতে পারছিলেন না। বিশ্বরূপ দর্শন করা যে অত্যন্ত কঠিন তা বুঝে অর্জুন বলছেন—**'দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্‌'** (গীতা ১১।১৭)। আবার তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন যে 'এই উগ্ররূপসম্পন্ন আপনি কে?' মনে হয়, যদি অর্জুন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে একথা না জিজ্ঞাসা করতেন, তবে ভগবান বোধহয় তাঁর কালরূপ ছাড়াও আরো অন্যান্য রূপ বিশেষভাবে প্রকটিত করতেন। কিন্তু অর্জুন ভীত হয়ে পড়ায় এবং এই প্রশ্ন করায় ভগবান তার রূপদর্শন স্থগিত রেখে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করেন।

ভগবানের আশ্বাসন (শ্লোক ৩২-৩৪)

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্‌ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্‌ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌॥ ৩৩
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্‌।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্‌॥ ৩৪

সরলার্থ—শ্রীভগবান বললেন, আমি সমগ্র লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল এবং এখন এইসব লোকেদের সংহার করতে এসেছি। তোমার বিপক্ষে যেসব যোদ্ধা উপস্থিত হয়েছেন, তুমি যুদ্ধ না করলেও তাঁরা কেউই বাঁচবেন না। ৩২

সুতরাং তুমি যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও, যশ লাভ করো এবং শত্রুদের জয় করে ধনধান্য সমন্বিত রাজ্য ভোগ করো। এদের আমি পূর্বেই বধ করে রেখেছি। হে সব্যসাচী অর্জুন (উভয় হস্ত দ্বারা বাণ নিক্ষেপে পারঙ্গম)! তুমি এদের নিধনে নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য শূরবীরগণ সকলকেই আমি পূর্বেই বধ করে রেখেছি, তুমি নিহতদেরই বধ করো। ব্যথিত হয়ো না, যুদ্ধ করো ; নিঃসন্দেহে তুমি যুদ্ধে জয়ী হবে। ৩৪

মূলভাব—আগের প্রকরণের শেষ শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্রোরূপো' (গীতা ১১।৩১) অর্থাৎ এই উগ্ররূপী তুমি কে ? আর তার উত্তর ভগবান এখানে দিয়েছেন।

ভগবান উত্তরে বলছেন—**'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো'** অর্থাৎ এই উগ্ররূপ যা তুমি দেখছ তা আমার অনন্তরূপের একটি মাত্র রূপ, লোকক্ষয়কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া অক্ষয়কাল। তার কার্য হচ্ছে—**'লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্ত'** অর্থাৎ তা উভয়পক্ষের সেনানীদের সংহাররূপী যে কাল, সে কালরূপই তোমার সামনে দৃশ্যমান হয়েছে।

তার হাতেই এত লোকের মৃত্যু হবে এই আশঙ্কায় অর্জুন আগে বলেছিলেন **'ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দ'** (গীতা ২।৯) অর্থাৎ আমি যুদ্ধ করব না। আর তাই ভগবান এখানে বলছেন **'ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ'** অর্থাৎ অর্জুন তুমি যদি যুদ্ধ নাও কর তবুও এই উভয় পক্ষীয় যোদ্ধাগণের মৃত্যুতে কোনো পার্থক্য হবে না। কারণ যাদেরই সময় হয়ে যায় তাদেরই ভগবানের কালরূপ গ্রাস করে। অর্জুনের যুদ্ধ করা বা না করায় সেই ফলের ব্যতিক্রম হতে পারে না।

পরের শ্লোকের (তেত্রিশতম) দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম অংশে ভগবান বলছেন—**'ময়ৈব নিহতা পূর্বমেব'** অর্থাৎ মৃত্যুপথযাত্রী এই সেনানীগণকে আমি পূর্বেই বধ করে রেখেছি। আর শ্লোকের পরের অংশে ভগবান গীতার সেই অমূল্য বাণী শুনিয়েছেন। **'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'** অর্থাৎ তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। এখানে নিমিত্ত মাত্র হওয়ার তাৎপর্য হল যে, বুদ্ধি-পরাক্রম কোনোটারই কম ব্যবহার নয় বরং সতর্কতার সঙ্গে তা পূর্ণরূপে ব্যবহার করা, কিন্তু আমি বধ করেছি, আমি বিজয়লাভ করেছি এইরূপ অহংকার না থাকা। কার্যের সিদ্ধিতে একেবারেই অহংকার রাখতে নেই। যেমন কর্মযোগী সাধকদের, তেমনি ভক্তিযোগী সাধকদেরও পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য নিজ বল-

বুদ্ধি-যোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হয়, ন্যূনতা রাখতে নেই। আবার এই সাধনের পথে, পরমাত্মা প্রাপ্তির পথে নিজ উদ্যোগ-যোগ্যতা-তৎপরতা-জিতেন্দ্রিয়তা-পরিশ্রম-সাত্ত্বিক সংস্কার আদিকে কখনোই 'নিজেই তার কারণ' বলে মেনে অহংকার করা উচিত নয়, বরং তা ভগবানের কৃপা বলে মনে করা উচিত। সাধক যদি নিজ শক্তির ভরসায় সাধন করেন তখন আত্ম-অহংকারের দোষে বারংবার বিফলতা আসে আর তত্ত্বপ্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু সাধক যদি নিজের শক্তি সম্বন্ধে অহংকার একেবারেই না রাখেন তবে তাঁর তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিলাভ হয়। পরমাত্মা হলেন নিত্যপ্রাপ্ত, শুধু নিজের পুরুষার্থের অহংকার থাকার জন্যই তাঁর অনুভূতি হতে বিলম্ব হয়। পুরুষার্থের অহংকার ত্যাগই হল **'নিমিত্তমাত্র ভব'** আর তখন ভগবৎকৃপা স্বতঃই প্রস্ফুটিত হয়।

ভগবান গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাই বলেছেন—

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥

(গীতা ১৮।৫৮)

অর্থাৎ যদি আমাতে মদ্‌গত চিত্ত হও তবে আমার কৃপাতেই সমস্ত বিঘ্ন অনায়াসে দূর হয় আর যদি অহংকার ত্যাগ না হয় তবে তার নাশ হবে। আবার বলেছেন—

'মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।'

অর্থাৎ আমার কৃপাতেই শাশ্বত অবিনাশী পদ লাভ হয়। সুতরাং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থেকে কর্তব্য-কর্ম পালন করলে তবেই ভগবৎ-কৃপায় ভগবৎপ্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়।

মানুষের বন্ধন, চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ, নরক-প্রাপ্তি এ সবই তার (মনুষ্যের) নিজ কৃতিসাধ্য আর মুক্তি, কল্যাণ, ভগবদ্ প্রাপ্তি, ভগবদ্‌প্রেম এসবই স্বতঃসিদ্ধ এবং ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ।

যেমন গোবৎস তার মায়ের একটি স্তন থেকে দুধ পান করলেও ভগবান গোমাতার চারটি স্তন দিয়েছেন, ভগবান এইভাবে মুক্তিকামী মানুষের জন্য চারদিক থেকে কৃপাবর্ষণ করেন। তাই ভগবান বলছেন 'নিমিত্ত মাত্র' হয়ে

অর্থাৎ অহংকারবিহীন হয়ে সাধন করো তাহলেই বিজয়লাভ অর্থাৎ তাঁকে পাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

ভগবান আরো বলছেন—'**তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব**' অর্থাৎ অর্জুন তুমি যুদ্ধ না করলেও প্রতিপক্ষের সৈন্যরা বাঁচবে না। কিন্তু এই দৈব নিবন্ধন সবার অজানা, তাই একে বলে অদৃষ্ট। তাই তিনি এখানে নিজেই অর্জুনকে সকলের ভবিতব্যর কথা বলে দিয়েছেন এবং যুদ্ধের জন্য উত্থিত হয়ে, শত্রুকে পরাস্ত করে যশোলাভের কথা বলেছেন। ভগবানের কথিত '**যশো লভস্ব**' অর্থ অবশ্য এই নয় যে যশোপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে ভাবা ইহা নিজ পুরুষার্থ দ্বারা অর্জিত। মনে এই ভাব জাগলেই জীব আবদ্ধ হয়—'**ফলে সক্তো নিবধ্যতে**' (গীতা ৫।১২)। তাই ভগবান বলেছেন—'**নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্**' অর্থাৎ সাধকের যেন সদা এই অনুভূতি হয় যে এই লাভ-ক্ষতি, যশ-অপযশ সবই প্রভুর হাতে। তিনি কখনোই যেন যশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করেন, সদাই মনে করেন সব প্রারব্ধ কর্মফলগুলি দৈবীনির্দিষ্ট, এগুলি হবেই হবে।

পূর্ব শ্লোকে এই কথা বলার পর ভগবান এই প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে বলেছেন '**মা ব্যথিষ্ঠা**' (গীতা ১১।৩৪) অর্থাৎ ব্যথিত হয়ো না। পিতামহ ভীষ্ম আর গুরু দ্রোণাচার্যকে হত্যা করা অর্জুন পাপ বলে মনে করেছিলেন, তাই তাঁর মনে এই জন্য দুঃখ বা ব্যথা ছিল। কিন্তু ভগবান বলছেন তুমি তোমার ধর্ম পালন করো অর্থাৎ ক্ষাত্রধর্ম অনুযায়ী যুদ্ধ করো, কখনোই স্বধর্ম ত্যাগ করো না। এর কারণ হিসাবে ভগবান পূর্ব শ্লোকে বলেছিলেন '**ময়ৈবৈতে নিহতা পূর্বমেব**' আর এই শ্লোকে বলছেন '**ময়া হতাংস্তং জহি**' অর্থাৎ এই সমস্ত শূরবীরগণ কেউই জানে না যে তারা সকলেই মৃত্যুপথযাত্রী এবং আমিই তাদের আগেই বধ করে রেখেছি, তুমি কেবল সেই কথা এখন জানলে, তাই নিজ নিজ কাল ক্ষয় হয়ে যাওয়া সেই নিহতদেরই মাত্র অভিমানহীন হয়ে বধ করো।

ভগবান এখানে বলতে চেয়েছেন স্বধর্ম পালন করবে কিন্তু তা হবে সমত্ব ভাব নিয়ে, কখনোই যশোলাভ বা দুঃখলাভের উদ্দেশ্য করে নয় যা অহংকার থেকেই উদ্ভূত।

অনেক সময় সাধকের মনে এই ভাব আসে যে তাঁর স্বভাবের এই দুর্গুণ-

দুরাচার দূর হচ্ছে না কেন, অমুকটি শীঘ্র হওয়া উচিত কিন্তু তা হচ্ছে না তাহলে কী করবেন ? আসলে এই চিন্তা অহংকারের ফলেই হয় ; আর তা আসে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস, ভরসা এবং আশ্রয়ভাব কম হওয়ার, কমে যাওয়ার ফলে। দুর্গুণ-দুরাচার ভালো লাগে না, এই চিন্তা দোষের নয়, দোষের হল সাধক হওয়া সত্ত্বেও এই সব শীঘ্র দূর হচ্ছে না কেন, এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করায়। এইরূপ আক্ষেপ সাধকদের কখনো করা উচিত নয়। ভগবান তাই অর্জুনকে বলেছেন, এই শূরবীরগণকে আমি আগেই বধ করে রেখেছি। সাধকদের এর অর্থ বুঝতে হবে যে তাদের রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি আগেই তিনি মেরে রেখেছেন অর্থাৎ এদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়েছে। সাধক কিন্তু এদের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে এবং নিজের দ্বারা (অহংকার দ্বারা) তা দূর করার চেষ্টা করেন এবং তার ফলেই ঈশ্বরলাভে বিলম্ব ঘটে।

আমি করেছি এই কর্তাভাব, এই অহংকার ছাড়াও তার এই ভাবও যেন না আসে যে, কাউকে মারলে সে ভগবানের দ্বারাই নিহত হয়েছে তাই হত্যাকারীর পাপ হওয়া উচিত নয়। আসলে কাউকে মারার বা দুঃখ দেওয়ার অধিকার মানুষের নেই, তার অধিকার কেবল সকলকে সুখী করা, সকলের সেবা করাতেই আছে। মারার বা কষ্ট দেওয়ার অধিকার যদি থাকত তবে শাস্ত্রে নানা বিধিনিষেধ, যেমন সুকর্ম করা, অশুভ কর্ম না করা ইত্যাদি বলা হত না। তাই মানুষকে মারলে বা দুঃখ দিলে তাতে পাপ হবেই কারণ ইহা রাগ-দ্বেষবশতঃই হয় এবং এই রাগ-দ্বেষবশতঃ সকল কর্মই তো বিকর্ম বা অনধিকার কর্ম। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা যদি শাস্ত্রবিহিত যুদ্ধ প্রাপ্ত হন এবং তা স্বার্থ ও অহংকার বর্জিত হয় তবে তা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্মই হয়। তাতে পাপ হয় না।

অর্জুনের প্রণত স্তুতি (শ্লোক ৩৬-৪৬)

অর্জুনের স্তুতির এই অংশে আছে ২০টি শ্লোক। এতে নেই উগ্র বা অতি উগ্র রূপের বর্ণনা বরং আছে ভগবৎ মহিমা স্তুতি ও আর্তি—

ভগবানের ঐশ্বর্য বর্ণনা — শ্লোক ৩৬-৪০

ভগবানের ঐশ্বর্য বর্ণনা (শ্লোক ৩৬-৪০)

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥ ৩৭
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ ৩৮
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥ ৪০

সরলার্থ—অর্জুন বললেন, হে অন্তর্যামী ভগবান ! আপনার নাম, গুণ, লীলা, কীর্তনে সমস্ত জগৎ হর্ষিত হচ্ছে এবং আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। আপনার নাম, গুণ ইত্যাদির কীর্তন-মাহাত্ম্যে ভীত হয়ে রাক্ষসেরা চতুর্দিকে পলায়ন করছে এবং সিদ্ধগণ আপনাকে প্রণাম করছেন। এসবই যথোচিত। ৩৬

হে মহাত্মন্ ! গুরুর এবং ব্রহ্মারও আদিকর্তা আপনাকে (এই সিদ্ধগণ) প্রণাম কেন করবেন না ? কারণ হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্ম ; আপনিই সৎ, অসৎও আপনি এবং সৎ-অসতের অতীত যা কিছু আছে, সে সবও আপনি। ৩৭

আপনি আদিদেব এবং অনাদি পুরুষ আর আপনিই এই জগতের পরম আশ্রয়। আপনিই সকলের জ্ঞাতা এবং জ্ঞাতব্য, পরমধাম। হে অনন্তরূপ! আপনিই এই জগতে ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে বিরাজিত। ৩৮

আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, দক্ষাদি প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ (ব্রহ্মার জনক)ও আপনি। আপনাকে সহস্রবার প্রণাম করি! প্রণাম!! এবং পুনরায় আপনাকে প্রণাম করি! প্রণাম!! ৩৯

হে সর্বস্বরূপ! আপনাকে সম্মুখে নমস্কার করি, পশ্চাতে নমস্কার করি! সর্বদিক (দশদিক) থেকেই নমস্কার করি! হে অনন্তবীর্য! অমিত বিক্রমশালী আপনি সকলকে সমাবৃত করে রেখেছেন; সুতরাং সবকিছু আপনিই। ৪০

মূলভাব—অর্জুন তাঁর ভগবৎ-মহিমা স্তুতিতে ছত্রিশতম শ্লোকে প্রথমে ভগবানকে সম্বোধন করে বলছেন—**স্থানে হৃষীকেশ**—হৃষীক হল ইন্দ্রিয়বর্গ, আর তাদের ঈশ বা অধীশ্বর হলেন ভগবান। এর অর্থ ভগবান সর্বদা সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সত্তা-স্ফূর্তি করেন।

শ্লোকটির উত্তরার্ধে ভক্ত, রাক্ষস ও সিদ্ধদের ওপর ভগবানের নাম, লীলা, গুণ-কীর্তনের প্রভাব বর্ণনা করে অর্জুন বলছেন—**'তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ'** অর্থাৎ সংসারে বীতরাগ হয়ে প্রসন্নতার জন্য ভক্তরা নিত্য আপনার নাম-গুণ, লীলা কীর্তন করেন, আপনার চরিত্র আলোচনা করেন আর এতেই সমস্ত জগৎ আহ্লাদিত হয়। তাৎপর্য এই যে, মন সংসার অভিমুখী হলে অশান্তি আসে ও পরস্পরের মধ্যে রাগ-দ্বেষাদির সৃষ্টি হয়, কিন্তু যাঁরা আপনার শরণাগত হয়ে সাধন-ভজন করেন, জীবমাত্রেই তাঁদের কাছ থেকে শান্তিলাভ করে, প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়, তা সেই জীব বুঝতে পারুক আর না পারুক।

চণ্ডীতেও এইরূপ স্তুতি করে বলা হয়েছে—

'ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা হি আশ্রয়তাং প্র-যান্তি।'

অর্থাৎ তোমার আশ্রিতদের কখনোই বিপদ হয় না। পরন্তু তাঁহারাই সকলের আশ্রয়স্থল হয়ে থাকেন।

ভগবান অবতাররূপে এলে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম, জড়-চেতনসম্পন্ন

পৃথিবী আনন্দিত হয়ে ওঠে অর্থাৎ বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি স্থাবর আর দেবতা, মানুষ, ঋষি, মুনি, কিন্নর, গন্ধর্ব, পশু, পাখি ইত্যাদি জঙ্গম এবং নদী, দিঘি ইত্যাদি জড়—সব কিছুই প্রসন্ন হয়, আনন্দিত হয়। তেমনি ভগবানের নাম-লীলা-গুণ-কীর্তনাদি করলেও তার প্রভাব সকলের ওপর পড়ে এবং সকলেই আহ্লাদিত হয় এবং মানুষের মন ক্রমে ভগবানে আকৃষ্ট হয় আর অন্তরে ভগবৎপ্রেম জাগে।

ভক্তদের সম্বন্ধে বলে অর্জুন অতঃপর তাঁর স্তুতিতে রাক্ষসদের সম্পর্কে বলছেন—**'রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি'** অর্থাৎ ভগবানের নাম-গুণ কীর্তন করলে রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ আদি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে। আসলে রাক্ষস, ভূত, প্রেতাদির পলায়ন করার কারণ ভগবানের নাম, গুণ, কীর্তন নয়, তার আসল কারণ হল তাদের নিজেদের অন্তরের পাপ। নিজেদের পাপের জন্যই তারা পবিত্র থেকে পবিত্রতম, মঙ্গল থেকে মঙ্গলতম ভগবানের গুণগান সহ্য করতে পারে না। এদের মধ্যে যে তা সহ্য করতে পারে সেই সংশোধিত হয়ে থাকে ; দুষ্ট যোনি থেকে মুক্ত হয় তার কল্যাণপ্রাপ্তি হয়।[১]

ভক্ত ও অসুরের কথা বলে, অতঃপর অর্জুন সাধুমহাত্মা সম্বন্ধে বলছেন—**'সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ'** অর্থাৎ সিদ্ধ, সন্ত-মাহাত্মা এবং ভগবৎ শরণাগত-সহ যত সাধক আছে সকলেই আপনার নাম, গুণ, কীর্তন, লীলা কথাদি শ্রবণ করে সদাই আপনাকে নমস্কার করে।

এই প্রকরণের প্রথম শ্লোকে অর্জুন ভগবানের নাম মাহাত্ম্যের কথা বলে পরবর্তী ৪টি শ্লোকে (৩৭-৪০) ভগবানের ২২টি স্বরূপ বিভূতি বর্ণনা করেছেন—

গরীয়সে—অর্থাৎ আপনি হচ্ছেন গুরুর গুরু। পতঞ্জলি বলেছেন, **'পূর্বেষামপি গুরু'** (যোগদর্শন ১।২৬) মানে পূর্বে পূর্বে যত ব্রহ্মা প্রকটিত হয়েছেন আপনি তাহাদের সকলের গুরু।

ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে—অর্জুন স্তুতি করে বলছেন, আপনি কেবল সকলের গুরুই নন, পিতামহ ব্রহ্মা আদি সকলের সৃজনকর্তাও আপনি।

---

[১]মাম্ হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ (গীতা ৯।৩২)।

অনন্ত—অর্থাৎ দেশ (স্থান), কাল, পাত্র, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি যেভাবেই আপনাকে দেখা হোক আপনার কোনো অন্ত পাওয়া যায় না। দেশের (স্থানের) দিক দিয়ে দেখলে আপনার কোথায় যে আরম্ভ আর কোথায় যে শেষ কিছুই বোঝা যায় না। কালের দিক দিয়ে দেখলে আপনি কবে থেকে আছেন আর কতদিন আছেন তারও হিসেব নেই। আর বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে কতরূপে প্রকটিত তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই। সব দিক দিয়েই আপনি অনন্ত, অসীম, অপার, অগাধ।

দেবেশ — ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি যতপ্রকার দেবতার বর্ণনা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, সেই সব দেবতাদের আপনিই প্রভু, নিয়ন্তা ও শাসক। তাই আপনি দেবেশ।

জগন্নিবাস—কেবল ব্রহ্মা, দেবতাদিই নয় অনন্ত বিশ্বও আপনার একাংশে অবস্থিত তাই আপনি 'জগন্নিবাস'।

ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ—অর্জুন স্তুতি করে বলছেন হে ভগবন্! স্বতঃসিদ্ধ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যার থাকে সেই সৎও আপনি, আর সৎ-এর আশ্রিত হওয়ায় যার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় সেই অসৎও আপনি। আবার সৎ ও অসৎ-এর অতীত, যা কোনোভাবে নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয়, যাঁকে মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় দ্বারাও কল্পনা করা যায় না অর্থাৎ যা সমস্ত কল্পনারও অতীত তাও আপনি।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ — আপনি সকল দেবতার আদি কারণ। আপনার আগে কেউ প্রকটিত হয়নি। আপনি অনাদি পুরুষ, সর্বদা ছিলেন এবং থাকবেন।

ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং—এই জগতের যা কিছু শোনা, বোঝা বা জানা যায়, বা জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের যে কারণ, সেসবেরই আধার হলেন আপনি।

বেত্তাসি—ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কাল এবং দেশ, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি যা কিছু আছে তার জ্ঞাতা (সর্বজ্ঞ) ও আপনি।

বেদ্যম্ — যা কিছু জানার আছে অর্থাৎ বেদ, শাস্ত্রাদি বা সাধু-সন্ত-মহাপুরুষেরা যা কিছু জানতে আকাঙ্ক্ষা করেন সে সবের শেষ সীমাও আপনি।

পরমধাম—যাকে মুক্তি, পরমপদ ইত্যাদি বলা হয়, যেখানে গেলে আর ফিরে আসে না, যাঁকে জানলে আর কিছু জানার, আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না সেই পরমধামও ভগবান।

অনন্তরূপ—বিরাট রূপই হোক বা অন্য রূপেই হোক তা ভগবানের অনন্ত রূপেরই এক খণ্ডরূপ।

ত্বয়া ততং বিশ্বম্—সমস্ত জগৎ সংসার আপনার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ জগতের প্রতিটি কণায় আপনিই ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে বিরাজমান।

বায়ুঃ—যার থেকে সকলে প্রাণ লাভ করে, প্রাণীমাত্রই বেঁচে থাকে, সকলে সামর্থ্য পায়, ভগবানই সেই বায়ু।

যমঃ—যিনি সংযমনী পুরীর অধিকর্তা এবং সমস্ত জগৎ যাঁর শাসনে চলে, সেই যমও ভগবান আপনি।

অগ্নিঃ—যা সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত থেকে শক্তি প্রদান করে, প্রকটিত হয়ে দীপ্তি প্রদান করে, জঠরাগ্নিরূপে অন্ন পরিপাক করে, সেই অগ্নিও ভগবান।

বরুণঃ—যার সাহায্যে সকলেই জীবন প্রাপ্ত হয়, সেই জলের অধিপতি বরুণও ভগবান।

শশাঙ্কঃ—যে চন্দ্রের সাহায্যে ঔষধ ও বনস্পতি সৃষ্ট হয়, পুষ্টি লাভ করে সেই চন্দ্রও ভগবান।

প্রজাপতিঃ—প্রজা উৎপাদনকারী দক্ষাদি প্রজাপতিগণও ভগবান।

প্রপিতামহঃ—পিতামহ ব্রহ্মারও প্রকাশক হওয়ায় ভগবান সকলের প্রপিতামহ।

ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে অর্জুন বলছেন—হে অনন্তস্বরূপ ভগবান ! আপনার স্তুতি আমি কীভাবে করব ? আর কীভাবেই বা মহিমা গাইব ? আমি আমার শক্তি অনুযায়ী কেবল আপনাকে প্রণামই করতে পারি অর্থাৎ শরণাগতিই আপনাকে পাওয়ার একমাত্র পথ।

এই প্রকরণের অন্তিম চতুর্বিংশতি শ্লোকে অর্জুন ভগবানের সর্বব্যাপিত্ব দুই বিভূতি প্রসঙ্গে বলছেন—

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্তং—অর্জুন ভগবানকে বলছেন 'অনন্তবীর্য'

অর্থাৎ তাঁর তেজ, বল ইত্যাদি অনন্ত। তিনি 'অমিত বিক্রম' অর্থাৎ তাঁর শক্তিও অনন্ত, পরাক্রমও অনন্ত।

সর্ব সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব— অর্থাৎ ভগবন্ ! আপনিই সব কিছু সমাবৃত করে রেখেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর, রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, অশ্বীনিকুমার, মরুদ্‌গণ, পিতৃকুল, সর্প, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, ঋষি-মহর্ষি, সিদ্ধ, বায়ু, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য আদি দেবগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ আদি রাজন্যবর্গ এবং স্বয়ং অর্জুন, সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, কৌরব ও পাণ্ডবসেনা সকলেই সেই বিরাট রূপের অন্তর্গত। অর্জুন উপলব্ধি করেছেন যে—ভগবান সৃষ্টির মধ্যে পরিপূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন আর এই অনন্ত সৃষ্টিও তাঁর মাত্র একাংশে অবস্থিত।

সাধকেরও অনুভব করা উচিত যে, যেমন জলের একটি কণা বা সমুদ্রে একই জলতত্ত্ব বিদ্যমান তেমনি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম এবং বৃহৎ হতে বৃহত্তম প্রত্যেক বস্তু একই পরমাত্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ। আর এই উপলব্ধি হলে সাধক ভগবানের শরণাগত হয়ে মনে মনে সকলকেই নমস্কার করেন। বৃক্ষ, নদী, পাহাড়, প্রস্তর, জীব, জগৎ যা কিছুই দর্শন করুন না কেন, তার মধ্যে নিজ ইষ্ট দর্শন করেন—প্রার্থনা করেন হে প্রভু ! সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে নিহিত আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনি আমার মধ্যে আপনার প্রেম প্রদান করুন। এইভাবে তিনি সর্বত্রই ভগবদ্দর্শন করেন, কেননা আসলে সবই তো ভগবান।

ভগবানের মহিমা না বোঝায় অর্জুনের কাতরতা
(শ্লোক ৪১-৪৪)

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎ কৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্॥ ৪৪

সরলার্থ—আপনার মহিমা এবং স্বরূপ না জেনে 'আমার সখা' বলে মনে করে ভুলবশত বা প্রণয়বশত হঠকারী হয়ে (অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে) 'হে কৃষ্ণ! হে যাদব ! হে সখা !' এইরূপ যা কিছু বলেছি ; হে অচ্যুত ! হাস্যপরিহাসছলে, চলতে-ফিরতে, শয়নে-জাগরণে, উঠতে-বসতে, খাওয়ার সময় একা অথবা ওই সব আত্মীয়-বন্ধু প্রভৃতির সমক্ষে আমি আপনার যত অনাদর করেছি, তার জন্য অপ্রমেয়স্বরূপ, আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ৪১-৪২

আপনিই সকল চরাচরের পিতা, আপনি পরমপূজ্য, গুরুরও মহান গুরু। হে অনন্ত প্রভাবশালী ভগবান ! ত্রিলোকে যখন আপনার সমানও কেউ নেই, তখন আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ বা বড় কেউ হবেই বা কীভাবে ? ৪৩

তাই হে সকলের বন্দনীয় ঈশ্বর, আমি দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক আপনার স্তুতি করে, আপনাকে প্রসন্ন করার জন্য প্রার্থনা করছি। পিতা যেমন পুত্রের, মিত্র যেমন মিত্রের, পতি যেমন পত্নীর দ্বারা হওয়া অপমান সহ্য করেন, তেমনই আপনিও আমার কৃত অপমান সহ্য করতে সমর্থ। ৪৪

মূলভাব—এই প্রকরণের চারটি শ্লোকে অর্জুন তাঁর ভগবৎ উপলব্ধি দেরিতে হওয়ায় কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। অর্জুন ভগবানকে বলছেন—

অজানতা মহিমানং তবেদং—অর্থাৎ তোমার মহিমা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে অর্জুন ভগবানের স্বরূপ, মহিমা, প্রভাব কিছুই জানতেন না। তিনি ভগবানের লৌকিক স্বরূপ অবশ্যই জানতেন, তা না হলে এক অক্ষৌহিণী সেনার বদলে নিরস্ত্র ভগবানকে বরণ করতেন না। কিন্তু ভগবানের শরীরের একাংশে যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আর তার এইরূপ প্রভাব, এই স্বরূপ, এই মহিমা অর্জুন তা আগে জানতেন না। ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে বিশ্বরূপ দর্শন করালে অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের মহিমার

দিকে পড়ে, আর তখন ভগবানের বিভূতি কিছু কিছু জানতে পারেন। তখন তাঁর বিচিত্র অনুভূতি হয় যে—'কোথায় আমি আর কোথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ'। তাই হঠকারিতাবশত এতদিন যা করেছেন, যা বলেছেন তার জন্য অনুতপ্ত অর্জুন একচল্লিশতম ও বিয়াল্লিশতম শ্লোকে বলছেন—

'ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি'।

'যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু'

অর্থাৎ তাঁকে নিজের সমকক্ষ সাধারণ বন্ধু বলে মনে করে হাস্য-পরিহাসবশত চলা-ফেরায়, শয়নে-জাগরণে, ওঠা-বসায়, ভোজনকালে যে বাক্য ব্যবহার করেছেন তার জন্য শ্লোকের অন্তিমে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলছেন—

'তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্'।

এখানে অর্জুন তাঁর তিনটি দোষ স্খালনের কথা বলেছেন— **প্রমাদাৎ** (ভ্রমবশত), **অবহাসার্থম্** (হাস্যে-পরিহাস্যে) এবং **প্রণয়েন** (প্রণয়ে)। এই তিনটি কথার ইঙ্গিত করে পরের (চুয়াল্লিশতম) শ্লোকে অর্জুন একটু বিস্তৃত করে বলছেন— **'পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয় প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্'** অর্থাৎ তাঁর যে কৃষ্ণের প্রতি অসৌজন্য ব্যবহার হয়েছে তা মূলত তাঁর প্রমাদের জন্য হয়েছে, যেমন পিতা-পুত্রের মধ্যে হয় ; হাস্য-পরিহাসের জন্য হয়েছে, যেমন বন্ধু-বন্ধুর মধ্যে হয় আর হয়েছে তাঁর কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়ের জন্য, যেমন পতি-পত্নীর মধ্যে হয়। ভগবানের প্রতি অর্জুনের এমনই সখ্য সম্পর্ক ছিল, কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য দেখে অর্জুন তাঁর সখা সম্পর্ক বিস্মৃত হচ্ছেন এবং ভগবানকে দেখে অতীব আশ্চর্য হচ্ছেন, ভীতসন্ত্রস্ত হচ্ছেন। তিনি কখনো কল্পনাও করতে পারেননি যে তাঁর সখা এইরূপ ! অর্জুনের মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি সখ্য ভাব তাই ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হচ্ছে আর তাঁর প্রতি ঐশ্বর্য ভাব প্রকটিত হচ্ছে। তিনি তেতাল্লিশ শ্লোকে বলছেন— **'পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য....'** অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ-পশু-পাখি আদি জঙ্গম প্রাণী এবং বৃক্ষ-লতাদি যত প্রকার স্থাবর প্রাণী আছে সেই সবের উৎপন্নকারী এবং পালনকারী পিতাও আপনি, আবার তাদের সবার পরমপূজ্য ও শিক্ষা

প্রদানকারী গুরুও আপনি—**'ত্বমস্য পূজ্যস্য গুরুর্গরীয়ান্‌'**।

অর্জুন ভগবানের মহিমা বর্ণনা শেষ করে চুয়াল্লিশতম শ্লোকে বলছেন—**'তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্‌'**। অর্থাৎ হে ভগবন্‌ ! আপনিই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। তাই আপনিই একমাত্র সকলের স্তুতিযোগ্য। আপনার গুণ, প্রভাব, প্রকাশ সবই অনন্ত, তাই অনন্তকাল ধরে ঋষি, মহর্ষি দেবতা, মহাপুরুষ সকলেই সর্বক্ষণ আপনার স্তুতি করে থাকেন, তবু আপনার মহিমা শেষ হয় না। হে কৃষ্ণ ! আপনার স্তুতি, ক্ষুদ্র আমি কীভাবে করব ? আপনাকে স্তুতি করার মতো শক্তি ও সামর্থ্য আমার কিছুই নেই। আমি শুধু আপনার শ্রীচরণে বারংবার দণ্ডবৎ প্রণাম করতে পারি এবং তার দ্বারাই আপনাকে প্রসন্ন করতে চাই।

চতুর্ভুজরূপ দর্শনের জন্য প্রার্থনা (শ্লোক ৪৫-৪৬)

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥ ৪৬

সরলার্থ—আমি এইরকম রূপ পূর্বে কখনো দেখিনি। এই রূপ দেখে আমি হর্ষিত হচ্ছি এবং (সেই সঙ্গে) ভয়ে আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে। সুতরাং আপনি আপনার সেই দেবরূপ (সৌম্য বিষ্ণুমূর্তি) ধারণ করুন। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি প্রসন্ন হন।

আমি আপনাকে সেইরূপ কিরীটধারী ; গদা-চক্র হস্তে অর্থাৎ চতুর্ভুজরূপে দেখতে ইচ্ছা করি। তাই হে সহস্রবাহো ! হে বিশ্বমূর্তে ! আপনি সেই চতুর্ভুজ (শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী) মূর্তি ধারণ করুন।

মূলভাব—অর্জুন স্তুতি শেষ করেছেন এই শেষ দুটি শ্লোকে প্রার্থনা করে। অর্জুন প্রার্থনা করছেন যেন ভগবান তার কালরূপী ভীষণরূপ প্রত্যাহৃত করে তাঁর দেবরূপ দর্শন দান করেন। অর্জুন ভাবলেন বিশ্বরূপ দেখাবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করায় ভগবান যেমন বিশ্বরূপ দেখালেন, সেইরকম

দেবরূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই ভগবান তাঁর দেবরূপ দেখাবেনই। অর্জুন বলছেন—**'হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে'** অর্থাৎ আপনার এরকম অলৌকিক আশ্চর্যময় ও বিশাল রূপ আমি কখনো দেখিনি আর আপনার যে এমন রূপও আছে তাও আমার জানা ছিল না। এই রূপ দর্শন করার যোগ্যতাও আমার নেই, কেবল আপনার কৃপাতেই আমি এই রূপ দেখতে সক্ষম হয়েছি। আমি এই রূপ দেখে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী মনে করছি। আর সেই সঙ্গে আপনার স্বরূপের উগ্রতা দেখে আমার মন ভয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে, ব্যাকুল হচ্ছে, বিচলিত হচ্ছে।

গীতায় ভগবৎ দর্শনের জন্য, তাঁকে উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন চক্ষুর কথা বলা হয়েছে। বিশ্বরূপ এত দিব্য ও এত অলৌকিক যে সহস্র সূর্যের প্রভাবও এর দীপ্তির সমান হতে পারে না। **'দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥'** (গীতা ১১।১২) অর্থাৎ আকাশে যদি একই সঙ্গে সহস্র সূর্য উদিত হয় তাহলেও সেই সবগুলি একত্রেও সেই মহাত্মার (বিরাট রূপ পরমাত্মার) প্রভাবের সমকক্ষ হতে পারে না। তাই এই বিশ্বরূপ **'দিব্যচক্ষু'** ব্যতীত আর কেউই দেখতে পারে না।

আসলে মাধুর্য-লীলাতে ভগবান দ্বিভুজ-রূপেই বিরাজ করেন, কিন্তু যখন কাউকে কোনো ঐশ্বর্য দেখাবার প্রয়োজন হয়, সেখানে তিনি পাত্র, অধিকার, ভাব ইত্যাদি ভেদে তাঁর বিরাট রূপকে দর্শন করান ; যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মনুষ্যরূপে প্রকটিত ভগবান তাঁর দ্বিভুজরূপ শরীরের একাংশে বিশ্বরূপ দর্শন করান। ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য, অসীম মাধুর্য এবং তিনি সৌন্দর্য, ঔদার্য আদি নানা গুণে সমন্বিত। আর তাঁর বিশ্বরূপও সেই অনন্ত দিব্যগুণগুলিকে নিয়েই। ভগবান যাকেই এই বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন তাকেই প্রথমে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছেন, তা তাকে জানিয়েই হোক বা অজান্তেই হোক। আবার দিব্যদৃষ্টি দিলেও ভগবান তার যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ীই স্তরভেদে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন।

যশোদা মাতার বিশ্বরূপ দর্শন—বৃন্দাবনে মৃত্তিকা ভক্ষণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণ

মাতা যশোদাকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। যশোদা মা শিশু কৃষ্ণকে মুখ হাঁ করতে বললে তিনি কৃষ্ণের মুখগহ্বরে দেখলেন—

সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়্বগ্নীন্দুতারকম্।
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্মান্ বিয়দেব চ
বৈকারিকানীন্দ্রিয়ানী মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ॥

(ভাগবত ১০।৮।৩৭)

সমস্ত স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষলোক ; পর্বত, দ্বীপ ও সমুদ্রের সঙ্গে ভূলোক ; বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র ও তারকাদি-সহ স্বর্লোক ; জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চতন্মাত্র এবং সত্ত্বাদি গুণ সমন্বিত এই বিশ্ব। যশোদা তাঁর পুত্রের স্বল্প পরিমিত বদন বিবরে সমগ্র জীব, কাল, স্বভাব, কর্ম ও আশয় বিচিত্র নানা দেহ সমন্বিত বিশ্ব এবং গোকুল ও কৃষ্ণসহ নিজেকে দেখে শঙ্কাকুল হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার ক্রোধাপনয়ন ও ভাবান্তর উৎপাদনের জন্যই তাঁর মুখবিবরে মাটি অন্বেষণরত মার সম্মুখে এই বিচিত্র দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এতে বাৎসল্যময়ী যশোদার নিজ পুত্রের প্রতি অমঙ্গল আশঙ্কা দূর হওয়া দূরে থাক—তা আরো বর্ধিত হল। মা যশোদা তখন '**সুদুর্বিভাব্যং প্রণতোস্মি তৎপদম্**' (ভাগবত ১০।৮।৪১) পুত্রের মঙ্গল কামনায় অচিন্ত্য মহাশক্তি শ্রীনারায়ণের চরণে শরণাগত হলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন হে নারায়ণ ! আমি যশোদা, নন্দ আমার পতি, কৃষ্ণ আমার পুত্র এইসব ভ্রান্তবুদ্ধি যে মায়ায় সংঘটিত হয়, সেই মায়ার বন্ধন ছিন্ন করো, কেবল নারায়ণই আমার গতি হন।

যশোদার এই প্রকার বৈরাগ্য দেখে কৃষ্ণ আর স্থির থাকতে পারলেন না, কেননা যশোদার যদি মমতা না থাকে তাহলে শ্রীভগবানের আর বাল্যলীলা থাকে না। শ্রীভগবানের লীলামাধুর্য ও ভক্তের প্রেম—এই দুই বস্তু পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা করে থাকে এবং পরস্পর পরস্পরকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত করে। মা যশোদার ব্যাকুলতা দেখে কৃষ্ণও ব্যাকুল হলেন আর তখনই

তাঁর কৃপাশক্তির আবির্ভাব হল। আর এই কৃপাশক্তির আবির্ভাবে তাঁর ঐশ্বর্য শক্তি অন্তর্হিত হল।

শ্রীশুকদেব বলছেন—

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপীকায়াং স ঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ ॥

(ভাগবত ১০।৮।৪৩)

অর্থাৎ কৃষ্ণজননী এই প্রকার নির্বেদযুক্তা হলে শ্রীভগবান তাঁর স্বরূপ-শক্তিরূপা কৃপাশক্তি (নিজ মায়া) বিস্তার করলেন। আর তৎক্ষণাৎ যশোদার পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তিনি পূর্ববৎ স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করলেন।

কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা মায়ার (বৈষ্ণবী মায়া) স্বভাবই এই যে, তিনি কৃষ্ণ-ভক্তগণকে তাঁদের ভাবানুরূপ সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাই কৃষ্ণের এই কৃপাশক্তির আবির্ভাব মাত্র তাঁর ঐশ্বর্য শক্তি অন্তর্হিত হল, কৃষ্ণের মুখবিবরে প্রকাশিত সমগ্র বিশ্বের দৃশ্যও বিলুপ্ত হল, আর মা যশোদাও পূর্ববৎ পুত্রস্নেহে বিবশ হয়ে পড়লেন।

এখানে উল্লেখ্য ভগবান মা যশোদাকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন তাঁর নিজের তাগিদেই, আবার এই বিশ্বরূপ দর্শন প্রত্যাহৃতও করেছেন নিজের তাগিদে, যশোদা মায়ের প্রার্থনায় নয়।

ভগবান বড়ই গর্ব করে গীতায় বলেছেন—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১) অর্থাৎ যে আমাকে যেভাবে ভজনা করবে, আমিও তাকে সেইভাবে ভজনা করব। কিন্তু ভগবানের ব্রজলীলায় যেন তাঁর এই প্রতিজ্ঞা রাখা দায়। ব্রজের গোপ-গোপিনীরা অনন্য ভক্ত, তাঁরা সব ছেড়ে কৃষ্ণেই সমর্পিত, কিন্তু কৃষ্ণর পক্ষে তো সর্বস্ব ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ব্রজরাজনন্দন যিনি **'স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধন চতুর'** গোপীদের বিনা প্রার্থনাতেই সমস্ত কিছু দেওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকেন।

কৌরব সভায় বিশ্বরূপ দর্শন—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্‌কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণের জন্য কৌরব সভায় দৌত্য করেছিলেন। কিন্তু দুর্মতি দুর্যোধন কৌরব সভায় আসীন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করার চক্রান্ত করেন। তখন

শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ অট্টহাস্য করে সভার মধ্যে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করান। তখন তাঁর সর্ব অঙ্গে বিদ্যুতের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দেবতাদের দেখা গেল। তাঁর ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষঃস্থলে রুদ্র, হাত দুটিতে লোকপাল এবং মুখে অগ্নিদেব দৃশ্য হলেন। আদিত্য, সাধ্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র সহ মরুদ্গণ, বিশ্বদেব, যক্ষ, গন্ধর্ব ও রাক্ষস—এ সবই তাঁর দেহে অভিন্ন হয়ে রয়েছেন। ধনুর্ধারী অর্জুন তাঁর দক্ষিণ হাতে আর বলভদ্র বাম হাতে বিরাজমান ছিলেন। ভীম, যুধিষ্ঠির এবং নকুল-সহদেব তাঁর পৃষ্ঠদেশে আর প্রদ্যুম্ন ইত্যাদি অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় যাদবগণ অস্ত্র-শস্ত্রসহ তাঁর সম্মুখে ছিলেন। সেইসময় শ্রীকৃষ্ণের বহু বাহু দৃষ্টিগোচর হল আর সেই বাহুগুলিতে শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, ধনুক, হল ও খড়্গ ধরা ছিল। তাঁর চক্ষু নাসিকা ও কর্ণরন্ধ্রে ভীষণ আগুনের শিখা এবং রোমকূপ থেকে সূর্যের কিরণের ন্যায় জ্যোতি দেখা যাচ্ছিল।

ভগবানের এই ভীতিজনক ভীষণ মূর্তি কিন্তু কৌরব সভায় উপস্থিত সকল রাজা দেখতে সমর্থ হলেন না।

'ন্যমীলয়ন্ত নেত্রানি রাজানস্ত্রস্তচেতসঃ'।

(মহাভারত, উ.প. ১২২।১৭)

শ্রীকৃষ্ণর সেই ভয়ংকর রূপ দেখে সমস্ত রাজারা ভীত হয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

কিন্তু ভগবান অধিকারী ভেদে কৃপাও করেছেন—

ঋতে দ্রোণঞ্চ, ভীষ্মঞ্চ, বিদুরঞ্চ মহামতিম্।
সঞ্জয়ঞ্চ মহাভাগমৃষীংশ্চৈব তপোধনান্।
প্রাদাত্তেষাং স ভগবান দিব্যং চক্ষুর্জনার্দনঃ॥

(মহাভারত, উ.প. ১২২।১৭,১৮)

অর্থাৎ ভীষ্ম, দ্রোণ, মহামতি বিদুর, মহাভাগ সঞ্জয় এবং তপোধন ঋষিরা কিন্তু ভীতচিত্ত হলেন না, নয়নও মুদ্রিত করলেন না কারণ ভগবান সেইসময় তাঁদের দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন যার দ্বারা তাঁরা কৃষ্ণের সেই রূপ দেখতে লাগলেন। ভগবান ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু দেন যাতে তিনি ভগবৎ রূপ দর্শন করতে পারেন।

তৎপরে দেবগণ, গন্ধর্বগণ, লোকপালগণ ও ঋষিগণ সকলে স্তুতি

করলেন—

ক্রোধং প্রভো ! সংহর সংহর স্বং রূপঞ্চ যদ্দর্শিতমাত্মসংস্থম্।
যাবত্তিমে দেবগণৈঃ সমেতা লোকাঃ সমস্তা ভুবি নাশমীয়ুঃ॥

(মহাভারত, উ.প. ১২২।২১)

প্রভু ! আপনি নিজের যে রূপ দেখিয়েছেন সেই রূপ ও ক্রোধ সংবরণ করুন, সংবরণ করুন। না হলে দেবগণের সঙ্গে জগতের সমস্ত লোকই ভয়ে বিনষ্ট হবে। হে মহাবাহো ! আপনার নিকট এই রাজারাই বা কতটুকু, এদের শক্তি বা পরাক্রমই বা কতটুকু ? এদের জন্যই আপনাকে এই দিব্যরূপ দেখাতে হল ?

অতঃপর পুরুষশ্রেষ্ঠ অরিন্দম্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের সেই ঐশ্বর্যময় এবং অলৌকিক, অদ্ভুত ও বিভূতিসম্পন্ন রূপ উপসংহার করলেন।

গীতায় অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনার প্রথম প্রকরণে ভগবানের **দেবরূপ**, পরের প্রকরণে **উগ্ররূপ** ও অন্তিম প্রকরণে **অতি উগ্ররূপের** প্রাধান্য ছিল। কিন্তু অর্জুন যখন তাঁর অত্যুগ্র রূপ দেখে ভীতচকিত হলেন তখন ভগবান তাঁর দিব্যাতিদিব্য রূপের স্তর দেখানো বন্ধ করে দেন। এর তাৎপর্য এই যে, ভগবান তাঁর দিব্য বিশ্বরূপের অনন্ত স্তরগুলির মধ্যে মাত্র সেই স্তরগুলিই (কালরূপ) অর্জুনকে দর্শন করালেন যেগুলিতে তাঁর প্রয়োজনীয়তা ছিল ও অর্জুনের যতগুলি স্তর দেখার যোগ্যতা ছিল।

বিভিন্ন চক্ষু — দিব্যচক্ষুর দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন ছাড়াও ভগবদ্‌কৃপা হলে অন্য দৃষ্টিও খুলে যায়—(১) জগতের মূল সত্ত্বারূপে পরমাত্মার যে অবস্থিতি, সেই বোধের জন্য **'জ্ঞানচক্ষু'** প্রদান করেন (২) জগৎ যে ভগবানেরই স্বরূপ (সর্বভূতে প্রেম) সেই বোধ লাভের জন্য **'ভাবচক্ষুর'** উন্মীলন হয়। (৩) আর আমাদের মতো সাধারণ বদ্ধজীবের জন্য আছে **'চর্মচক্ষু'** যার দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শনও হয় না, তত্ত্ববোধও হয় না বা জগৎ যে ভগবৎস্বরূপ তাও প্রতিভাত হয় না। কারণ 'চর্মচক্ষু' প্রকৃতিরই অঙ্গ তাই এর সাহায্যে কেবল প্রকৃতির স্থূল কার্যাদিই উপলব্ধি হয়।

অর্জুন স্তুতি শেষে প্রার্থনা করছেন—

'চতুর্ভুজেন সহস্রবাহু ভব বিশ্বমূর্তে'। অর্থাৎ হে সহস্রবাহু বিশিষ্ট

বিরাটরূপী ভগবান ! আপনি চতুর্ভুজসম্পন্ন বিষ্ণুরূপে দর্শন দিন। হে অনন্তরূপসম্পন্ন ভগবান ! আপনি একরূপসম্পন্ন হোন।

ভগবানের আশ্বাসন (শ্লোক ৪৭-৪৯)

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্॥ ৪৭
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯

সরলার্থ—শ্রীভগবান বললেন, হে অর্জুন ! আমি প্রসন্ন হয়ে স্বীয় সামর্থ্যে (যোগপ্রভাবে) এই অত্যন্ত তেজঃপূর্ণ, আদ্য, অনন্ত বিশ্বরূপ তোমাকে দেখালাম, তুমি ব্যতীত এই রূপ পূর্বে আর কেউ দেখেনি। ৪৭

হে কুরুপ্রবীর ! এই প্রকারের বিশ্বরূপবিশিষ্ট আমাকে মনুষ্যলোকে তুমি ছাড়া (কৃপাপাত্র ভিন্ন) আর কেউই বেদাধ্যয়ন দ্বারা, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা, দানাদির দ্বারা, তীব্র তপস্যার দ্বারা কিংবা অন্য কোনো ক্রিয়ার দ্বারা দেখতে সক্ষম নয়। ৪৮

আমার এই ঘোর রূপ দেখে তোমার ব্যথিত হওয়া উচিত নয় এবং বিমূঢ় হওয়াও উচিত নয়। এখন নির্ভয় হয়ে প্রসন্ন হৃদয়ে তুমি পুনরায় আমার এই (চতুর্ভুজ) মূর্তি ভালো করে দর্শন করো। ৪৯

মূলভাব—এই প্রকরণের তিনটি শ্লোকে (৪৭-৪৯) ভগবান অর্জুনের প্রার্থনা পূরণের আশ্বাস দিয়ে তাঁর সৌম্যরূপ (দ্বিভুজধারী মানুষীরূপের) দর্শনের কথা বলেছেন, বলেছেন বিশ্বরূপ দর্শনে যোগ্যতার কথা, আর বলেছেন তাঁর কৃপার কথা।

ভগবান বলেছেন— অর্জুন ! তুমি যে আমার বিরাট রূপ দেখে ভীত হয়েছ, আর ভেবেছ আমি ক্রোধান্বিত হয়ে বা তোমাকে ভয় দেখাবার জন্য এই

রূপ দেখিয়েছি, আসলে তা নয় ; আমি কিন্তু প্রসন্নচিত্তেই তোমাকে এই রূপ দেখিয়েছি, কারণ বিশ্বরূপ দর্শনের ব্যাপারে আমার কৃপাভিন্ন আর অন্য কোনো হেতু থাকতে পারে না। তোমার দেখতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তো তারই নিমিত্তমাত্র।

ভগবান এর পরে বলছেন — **'যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্'** (গীতা ১১।৪৭) অর্থাৎ এই বিশ্বরূপ তুমি ব্যতীত আর কেউ দেখেনি। এই কথার কারণ কী ? রাম অবতারে মাতা কৌশল্যা, কৃষ্ণ অবতারে মাতা যশোদা এবং কৌরব সভায় ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয়, বিদুর এবং মুনি-ঋষিগণও তো ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন। এর উত্তরে ভগবান পরবর্তী শ্লোকে আর একটু পরিষ্কার করে বলেছেন **'এবংরূপঃ'** (গীতা ১১।৪৮) অর্থাৎ এই ভয়ংকর বিশ্বরূপ, যার মুখগহ্বরে বিরাট বিরাট যোদ্ধা, সেনাপতি আদি প্রবেশ করছেন এবং যা ভবিষ্যতে ঘটতে চলেছে, সেটা আগে কেউ কখনো দেখেনি। এই শ্লোকে ভগবান আরো বলেছেন—**'ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ'** অর্থাৎ বেদাদি অধ্যয়ন করা হোক, বিধিনিষেধ অনুসারে যজ্ঞাদি করা হোক, প্রচুর দান করা হোক, কঠিন থেকে কঠিনতম তপস্যাদি করা হোক বা তীর্থ-ব্রতাদি শুভকর্মই করা হোক—এর কোনোটিই বিশ্বরূপ দর্শনের হেতু হতে পারে না। বিশ্বরূপের দর্শন কোনো কর্মফললভ্য নয়, এ শুধু তাঁর কৃপার দ্বারা, তাঁর প্রসন্নতার দ্বারাই লভ্য হয়।

সঞ্জয়ও যে বিশ্বরূপ দর্শন লাভ করেছিলেন তা ব্যাসদেবের কৃপায় প্রাপ্ত দিব্যদৃষ্টির দ্বারাই, অন্য কোনো সাধনার দ্বারা নয়। তাৎপর্য এই যে, **যে কাজ ভগবান বা তাঁর ভক্তদের কৃপার দ্বারা সম্ভব তা সাধনার দ্বারা সম্ভব নয়।** আর ভগবানের কৃপা অহৈতুকীই হয়। ভগবানের যে কত কৃপা তা জানার সামর্থ্য মানুষের থাকে না, কারণ তাঁর কৃপা অপার-অসীম আর মানুষের জানার সামর্থ্য সীমিত। সাধক প্রায়শই অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদিকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন আবার কেউ কেউ সৎসঙ্গ লাভ, সাধন-ভজনের উপযুক্ত পরিস্থিতি, সৎ ভাবে কাজকর্মের আগ্রহ, মনে ভগবানের প্রতি অনুরাগ ইত্যাদিকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন। এইভাবে শুধুমাত্র

অনুকূল পরিস্থিতিকে কৃপা বলে মনে করা হল কৃপাকেই সীমাবদ্ধ করা, এর ফলে অসীম কৃপা অনুভূত হয় না। অনুকূল কৃপাতে সন্তুষ্ট থাকা হল কৃপা ভোগ করা। সাধকদের তাই কখনোই কৃপাকে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয় বা কৃপাকে ভোগ করাও উচিত নয়।

সাধন ঠিকমতো হলে যে সুখ হয়, সেই সুখে সুখী হওয়া বা সন্তুষ্ট হওয়াও কিন্তু ভোগ—যার দ্বারা বন্ধন হয় **'সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ'** (গীতা ১৪।৬)। যদি কোনো পরিস্থিতিতে সুখ আসে তবে সুখের সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া দূষণীয় নয় কিন্তু তার সঙ্গ করা, তাতে সুখী হওয়া, তাতে প্রসন্ন হওয়াই দোষের। সাধনজনিত সাত্ত্বিক সুখ উপভোগ করলে তা গুণাতীত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা আনে। তাই সাধকদের অত্যন্ত প্রসন্নতা সহকারে সাত্ত্বিক সুখের প্রতিও আসক্তিবর্জিত হওয়া উচিত। তবে যদি সাধক এই সুখে আসক্তিবর্জিত নাও হন অর্থাৎ প্রসন্নতা সহকারে এই সাত্ত্বিক সুখ গ্রহণ করেন কিন্তু সঙ্গে সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন তবে তাঁরও ক্রমে ক্রমে এই সুখে স্বাভাবিকভাবে অরুচি আসে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তবে সাধক যদি সতর্কতাসহ আসক্তবর্জিত হন, তাঁর তত্ত্বজ্ঞান অতি শীঘ্র লাভ হয়।

অর্জুনের ভীতি নিরসনের জন্য ভগবানের আশ্বাস—ভগবানের বিকট দন্তযুক্ত বিরাট বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন কেবল দেবরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষাই করেননি, তিনি ভয়ও পেয়েছিলেন। অর্জুন ভগবানকে স্তুতি করে পূর্বে বলেছেন **'প্রব্যথিতাস্তথাহম্'** (গীতা ১১।২৩) অর্থাৎ আমি ভীষণ ভীত হয়ে পড়ছি। আরো বলেছেন **'প্রব্যথিতান্তরাত্মা'** (গীতা ১১।২৪) অর্থাৎ এই রূপ দেখে আমার অন্তরাত্মা কাঁপছে। তার উত্তরে ভগবান উনপঞ্চাশতম শ্লোকে বলছেন, **'মা তে ব্যথা'** (গীতা ১১।৪৯) অর্থাৎ অর্জুন তুমি ভীত হয়ো না। অর্জুনের ভীত হওয়ার কারণস্বরূপ ভগবান বলছেন—**'মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্'** অর্থাৎ প্রথমে তোমার মধ্যে যে মোহভাব আছে তাই তোমার এই ভীতির কারণ। আমি কিন্তু কৃপা করেই এই রূপ দেখাচ্ছি, এটি দর্শন করে তাই তোমার মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

বিভূতিযোগ শুনে এই অধ্যায়ের প্রথমেই প্রীত অর্জুন বলেছিলেন **'বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম'** (গীতা ১১।১) অর্থাৎ এই পরম গুহ্য

অধ্যাত্মতত্ত্ব শুনে আমার মোহ দূর হয়েছে। ভগবান কিন্তু এখানে (বর্তমান শ্লোকে) বলছেন, অর্জুন ! প্রকৃতপক্ষে তোমার মোহ মোটেই দূর হয়নি কেননা তোমার যে ভয় লাগছে তা তোমার শরীরের প্রতি অহং ও মমত্ববোধ (আমি ও আমার ভাব) থাকার ফলেই হচ্ছে। তোমার অহং-মমত্বসম্পন্ন বস্তু (দেহ) যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যই তুমি ভীত হচ্ছ আর এটাই হচ্ছে তোমার মূর্খতা, অজ্ঞতা। এগুলি অবশ্যই পরিত্যাজ্য কেননা এই হল মোহ, যা আসুরী সম্পদের মূল।

আর যারা ভগবানের শরণাগত হয় তাদের প্রাণে এই মোহ থাকে না, ভীতি থাকে না, তাদের সর্বত্র ভগবদ্‌ভাব ও ভগবদ্‌প্রেম থাকে। আর ভগবদ্ পথে চলাই দৈবী সম্পদের মূল। ভগবানের ভয়ঙ্কর নৃসিংহ মূর্তি দেখে দেবগণ ভীত হয়ে পলায়ন করেছিলেন কিন্তু প্রহ্লাদ ভয় পাননি। কারণ তাঁর সর্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি ছিল, তিনি নৃসিংহ অবতারের কাছে গিয়ে বলছেন—

নাহং বিভেম্যজিত তেঽতিভয়ানকাস্যজিহ্বার্ক নেত্র ভ্রূকুটী রভসোগ্রদংস্ট্রাৎ। (ভাগবত ৭।৯।১৫)

অর্থাৎ হে অজিত ! তোমার অতি ভয়ানক বদন, সূর্যসম নেত্র, ভ্রুকুটি সঞ্চালন, উদগ্র দন্তশ্রেণী, অন্ত্রের মালা, রক্তাক্ত কেশর, অভিবিদারণ নখর-শ্রেণী দেখেও আমি ভীত হয়নি, যদিও আপনার এই 'রূপ' স্মরণ করলে সকল ভয়ই পলায়ন করে— '**সর্বে জনাঃ বিভয়ায় রূপং স্মরন্তি**' (ভাগবত ৭।৯।১৪)। প্রহ্লাদ করজোড়ে প্রার্থনা করছেন, প্রভু আপনি '**তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে**' (ভাগবত ৭।৯।১৬) অর্থাৎ কৃপা করে প্রীত হয়ে আপনার চরণকমলে আশ্রয় দিয়ে কৃতার্থ করুন। নৃসিংহরূপধারী ভগবানও তখন তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে লেহন করতে লাগলেন।

ভগবানও তাই অর্জুনকে বারে বারে বলছেন—'**ব্যপেতভীঃ**' অর্থাৎ তুমি নির্ভয় হও, মোহবিমুক্ত হও। আর বলছেন '**প্রীতমনাঃ**' অর্থাৎ আমাকে সর্ব সমর্পণ করো তাহলে হৃদয় প্রীতসম্পন্ন হবে।

এখানে উল্লেখ্য অর্জুন ও সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল ?

অর্জুন— অর্জুন ভগবানের কাছে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য প্রার্থনা করেন —'**দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম**' (গীতা ১১।৩) আর তার উত্তরে

ভগবান তাকে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে বলছেন **'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগেশ্বরম্'** (গীতা ১১।৮)। অর্থাৎ আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দিলাম, তুমি আমার বিশ্বরূপ অবলোকন করো। অতঃপর অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ, দেবরূপ, উগ্ররূপ, অতি উগ্ররূপ আদি দর্শন করে ভীত হয়ে পড়লেন এবং ভগবানকে স্তুতি করে বলতে লাগলেন—'আমার চিত্ত ভীষণ ব্যাকুল হচ্ছে, আপনি আমাকে আপনার চতুর্ভুজ রূপ দেখান।' ভগবান তখন অর্জুনকে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়ে পরে দ্বিভুজ রূপ ধারণ করেন।

এর থেকে অনুমিত হয় যে একাদশ অধ্যায়ের দশ থেকে উনপঞ্চাশ শ্লোক পর্যন্ত অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি ছিল। পঞ্চাশতম শ্লোকে সঞ্জয় ও একান্নতম শ্লোকে অর্জুন বলছেন—হে ভগবান ! আপনার এ দ্বিভুজ মনুষ্যমূর্তি দেখে আমি চেতনা ফিরে পেলাম আর নিজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছি। অর্জুনের বিশ্বরূপ দেখার বিশেষ ইচ্ছা ছিল কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শনের সময় তিনি ভীত ব্যাকুলিত হয়ে পড়েন এবং বিশ্বরূপ দর্শনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন তাই ভগবানও তাঁর দিব্যদৃষ্টি অপসারণ করেন।

সঞ্জয়—ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কৃপাবশত ব্যাসদেবও সঞ্জয়কে যুদ্ধের প্রারম্ভে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন।

এষ তে সঞ্জয়ো রাজন্ যুদ্ধমেতদ্বদিষ্যতি।
এতস্য সর্বং সংগ্রামে ন পরোক্ষং ভবিষ্যতি॥
চক্ষুষা সঞ্জয়ো রাজন্ দিব্যেনৈব সমন্বিতঃ।
কথয়িষ্যতি তে যুদ্ধং সর্বজ্ঞস্য ভবিষ্যতি॥

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ২।৯-১০)

বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—রাজা ! আমার বরে এই সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে তোমার নিকট যুদ্ধের বিবরণ বলবে। কারণ ও সর্বজ্ঞ হয়ে যুদ্ধের সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করবে।

কিন্তু যুদ্ধের অন্তিম লগ্নে যখন দুর্যোধন মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন সঞ্জয় শোকে ব্যাকুল হয়ে পড়েন ও তাঁর দিব্যদৃষ্টি অপসারিত হয়। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন—

তব পুত্রে গতে স্বর্গে শোকার্তস্য মমানঘ।

ঋষিদত্তং প্রণষ্টে তদ্ দিব্যদর্শিত্বমদ্য বৈ॥

(মহাভারত, সৌপ্তিকপর্ব ৯।৬২)

হে নরেশ ! আপনার পুত্রের স্বর্গলাভে আমি অত্যন্ত শোকাতুর হলে এই দিব্যদৃষ্টি অপসারিত হয়।

এর তাৎপর্য এই যে সঞ্জয় ও অর্জুন যদি শোকে ও ভয়ে কাতর না হতেন, বিমূঢ় না হয়ে পড়তেন তবে তাঁদের দিব্যদৃষ্টি অপসারিত না হয়ে আরো স্থায়ী হত এবং তাঁরা ভগবানের আরো অনেক রূপ দেখতে পেতেন।

এইভাবে যখন মানুষ মোহ দ্বারা সংসারে আসক্ত হয় তখন তার বিবেক-বুদ্ধি কাজ করে না আর তাই ভগবানের দিব্য এই বিরাট রূপের দর্শনেরও অধিকারী হয় না। আমরা এই ভৌতিক বিশ্বজগৎ দেখলেও তার অন্তর্নিহিত দিব্য বিশ্বজগৎ (বিরাট রূপ) দেখতে পাই না—এর কারণ হল মোহ অর্থাৎ আমাদের শরীরের প্রতি আসক্তি (আমি ও আমার ভাব) ও আমাদের সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা। যদি এই ভোগেচ্ছার জন্য জগতের এক ক্ষুদ্র অংশের প্রতি (শরীরের প্রতি) আকর্ষণ না থাকত তবে সর্বত্রই বিরাট রূপ দৃষ্ট হত।

মোহ দূর হয়ে তত্ত্ববোধ জাগ্রত হলে জ্ঞানী সংসারকে দেখে চিন্ময়রূপে আর প্রেমী দেখে মাধুর্যরূপে। জীবের যেমন নিজ শরীরের প্রতি প্রিয়ভাব থাকে তেমনি প্রেমী ভক্তেরও প্রাণীমাত্রের প্রতি স্বাভাবিক প্রিয়ভাব থাকে। ভগবানের এই দিব্য বিরাট রূপ এক হলেও ভাবনা অনুসারে অনেক রূপে প্রতিভাত হয় আবার অনেক রূপে দৃষ্ট হলে তা একই থাকে। একের মধ্যে অনেক আর অনেকের মধ্যে ঐক্যই হল ভগবানের বৈশিষ্ট্য, অলৌকিকত্ব ও বৈচিত্র্য। অর্জুন ভগবানের ঐশ্বর্যরূপী বিরাট রূপ দেখতে চেয়েছিলেন তাই বলেছেন— '**দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম**' (গীতা ১১।৩) তাই তিনি সেই রূপই দেখতে পেলেন।

অর্জুনের স্বস্তি (শ্লোক ৫০-৫১)

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

সরলার্থ— সঞ্জয় বললেন, ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলে পুনর্বার সেইভাবেই নিজ দেবরূপ দেখালেন এবং মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আবার সৌম্যমূর্তি (দ্বিভুজ রূপ) ধারণ করে ভীতসন্ত্রস্ত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন। ৫০

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন ! আপনার এই সৌম্য মনুষ্য রূপ দর্শন করে আমি এখন প্রকৃতিস্থ হলাম এবং নিজ স্বাভাবিক স্থিতি ফিরে পেলাম। ৫১

পঞ্চাশতম শ্লোকে সঞ্জয় বলছেন যে অর্জুনের এই কাতর প্রার্থনা শুনে ভগবান পুনর্বার নিজ সৌম্যরূপ ধারণ করে অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন। অর্জুন স্তুতি করে বলছেন—**'দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন'** অর্থাৎ মনুষ্য রূপে প্রকটিত হয়ে আপনি যে লীলা করে থাকেন তা দেখে মনুষ্য কেন পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদিও পুলকিত হয়ে ওঠে। আর তাই আমিও এখন **'ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতাঃ'** অর্থাৎ আপনার এই সৌম্য দ্বিভুজ রূপ দেখে আমার হৃদয় ভরপুর হল, আমি প্রকৃতিস্থ হলাম।

ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ীতেও শ্রীশুকদেব দ্বিভুজধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব রূপমাধুরী দেখে মনুষ্য, প্রাণী, স্থাবর-জঙ্গম সমন্বিত ত্রৈলোক্যেরও পুলকিত হওয়ার কথা বলছেন—

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদং চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।

(ভাগবত ১০।২৯।৪০)

গোপিগণ কাতর স্বরে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—হে কৃষ্ণ ! আমাদের মতো রমণীগণের কথা তো দূরে থাক, তোমার ভুবনমোহন রূপে ও বংশীতানে পক্ষী, বৃক্ষ এবং গবাদি পশুগণ পর্যন্ত পরমানন্দে পুলকিত হয়ে যায়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও উল্লেখ আছে—

দ্বিভুজো রাধিকাকান্তো লক্ষ্মীকান্তশ্চতুর্ভুজঃ।
গোলোকে দ্বিভুজস্তস্থৌ গোপৈর্গোপীভিরাবৃতঃ॥

চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠং প্রযয়ৌ পদ্ময়া সহ।
সর্বাংশেন সমৌ তৌ দ্বৌ কৃষ্ণনারায়ণৌ পরৌ॥
(ব্রহ্মপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ৩৫।১৪-১৫)

দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ হলেন রাধিকাপতি আর চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু হলেন লক্ষ্মীপতি। শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপিনী পরিবৃত হয়ে গোলকে এবং শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে সপার্ষদ বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবিষ্ণু দুজনেই সর্বপ্রকার সমান অর্থাৎ দুজনেই এক।

তাৎপর্য হল এই যে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ, চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু ও সহস্রভুজ এই বিরাট রূপ সবই ভগবানের সমগ্র রূপ।

ভগবৎপ্রাপ্তির পথ (শ্লোক ৫২-৫৫)

একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের অন্তিম প্রকরণে ভগবান তাঁকে প্রাপ্তির পথ বলেছেন। প্রকরণটি দু'ভাগে বলা হয়েছে (১) ভগবৎপ্রাপ্তির বাধাস্বরূপ কারা ভগবানকে পায় না, (২) ভগবানে শরণাগত জন কীরূপে ভগবানকে পায়।

ভগবৎ পথের বাধা (শ্লোক ৫২-৫৩)
ঈশ্বর লাভের উপায় (শ্লোক ৫৪-৫৫)

ভগবৎ পথের বাধা (শ্লোক ৫২-৫৩)

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩

সরলার্থ—শ্রীভগবান বললেন, তুমি আমার যে রূপ দেখলে, তার দর্শন লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। এই রূপ দর্শন করার জন্য দেবতাগণও নিত্য লালায়িত হন। ৫২

আমাকে তুমি যে রূপে দেখলে, সেই রূপে (চতুর্ভুজসমন্বিত) আমাকে বেদের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দানের দ্বারা বা যজ্ঞের দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। ৫৩

মূলভাব—ভগবান বলছেন তাঁর এই রূপ দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ। আর এই রূপ **'দেবা অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্খিণঃ'**। অর্থাৎ এই রূপ দর্শন দেবতাদেরও নিত্য আকাঙ্ক্ষিত। এর অর্থ হল দেবগণ অতি পুণ্যের ফলে উচ্চপদ লাভ করেন, উচ্চ ও দিব্য ভোগ প্রাপ্ত হন কিন্তু এই পুণ্যের ফলে বা তাঁদের পদাধিকার বলেও তাঁরা ভগবৎদর্শন লাভে সমর্থ হন না।

মুদ্গল চরিত

একটি আলেখ্য— পুণ্য তীর্থ কুরুক্ষেত্র। ধর্মাত্মা মুদ্গল এখানেই বাস করেন। তিনি সত্যবাদী, সংযতচিত্ত ও অসূয়াশূন্য। শিলোঞ্ছবৃত্তি তাঁর জীবিকা। কৃষক পাকাধান কেটে নেওয়ার পর গাছে যে দু'-চারটে মঞ্জরী অবশিষ্ট থাকে এবং যে সব দানা মাটিতে ঝরে পড়ে সেগুলি সংগ্রহ করে তিনি প্রাণধারণ করতেন, ইহাই শিলোঞ্ছবৃত্তি। কিন্তু ওই সামান্য উপকরণ দিয়েই কেবল তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্ত হত না, চলত অতিথি সৎকার, নিত্যনৈমিত্তিক কার্য এমনকি ইষ্টিযাগ, দর্শযাগ, পৌর্ণমাস যাগ আদিও হত যথাশাস্ত্র। স্বয়ং ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্রও অন্য দেবতাগণের সঙ্গে আসতেন মুদ্গলের যজ্ঞে হবির্ভাগ গ্রহণের জন্য। এছাড়া তিনি শত শত বিদ্বান ব্রাহ্মণেরও মাৎসর্যহীন ও প্রীতিপূর্ণভাবে সেবা করতেন।

একবার দুর্বাসা মুনি উন্মত্তের ন্যায় মুদ্গলের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, ব্রহ্মন্! আমি অন্নপ্রার্থী, আপনি আমাকে অন্ন দান করুন। দুর্বাসা এইরূপ প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের ভোজনের সময় এসে সমস্ত অন্ন খেয়ে চলে যেতেন আর মুদ্গল ও তাঁর পরিবার উপবাস থাকতেন। এইভাবে তিনমাস অতিবাহিত হল কিন্তু দুর্বাসার প্রতি মুদ্গলের বিন্দুমাত্র ক্রোধ, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা বা উদ্বেগ কিছুই হল না। প্রসন্ন ও মুগ্ধ দুর্বাসা বললেন— আপনি সত্যিই মাৎসর্যহীন দাতা। চিত্ত সংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, ধৈর্য, দয়া, সত্য, ধর্ম সবই আপনাতে বিদ্যমান। স্বর্গবাসীরাও আপনার এই অদ্ভুত দানের প্রশংসা করেন। আপনি সশরীরেই স্বর্গে যাবেন—

'সশরীরো ভবান্ গন্তা স্বর্গং সুচরিতব্রতঃ।'

বর প্রদান করে ঋষি দুর্বাসা প্রস্থান করলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধিযুক্ত

একখানি বিমান স্বর্গ থেকে নেমে এল। বিমানের থেকে নেমে দেবদূত বললেন—হে মুনিবর ! আপনি পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন ; আসুন এই বিমানে উঠুন, স্বর্গে যাবেন। মুদ্গাল জিজ্ঞাসা করলেন স্বর্গটা কেমন ? দেবদূত বলল, স্বর্গ জানেন না ? স্বর্গ হল সুখের স্থান। সুন্দরী অপ্সরা, নন্দন বন, আর কত কী ভোগ্য সেখানে আছে। সেখানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, শীত, গ্রীষ্ম, ভয় নেই। স্বর্গে ঘৃণাজনক ও অমঙ্গলজনক কোনো বস্তুই নেই। সেখানকার গন্ধ-মনোহর, বায়ু সুখস্পর্শ, শব্দ শ্রুতিমধুর, সেখানে শোক, জরা, শ্রম, বিলাপ নেই। সেখানে সকলের দেহই তেজোময়, তাই শরীরে ঘর্ম, দুর্গন্ধ, বিষ্ঠা, মূত্র নেই, পরিধেয়ও মলিন হয় না। এই পৃথিবী হল কর্মভূমি আর স্বর্গ ভোগভূমি।

মুদ্গাল জিজ্ঞাসা করলেন, হে দেবদূত ! আপনি কেবল স্বর্গের গুণ নয়, দয়া করে স্বর্গের যদি কোনো দোষ থাকে তবে তাও কীর্তন করুন। তখন দেবদূত বললেন, অবশ্য এইসকল গুণের ন্যায় স্বর্গলাভে বহু দোষও আছে। কর্মক্ষয়ের পর জ্ঞাতসারে পতন হয় আর সুখভোগের সময় যদি অপরের দীপ্তশ্রী দেখে স্বর্গবাসীর পরিতাপ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয় তবে তার ফলে অজ্ঞাতসারে তার পতন হয়। সেটাই স্বর্গের বড় দোষ। কণ্ঠস্থ মাল্য যখন মলিন হতে থাকে তখনই স্বর্গ থেকে স্বর্গবাসীর পতনের সূচনা। সে সময় বুদ্ধিভ্রম, রজোগুণের আক্রমণ ও ভয় জন্মে। মুনিবর আরো শুনুন, স্বর্গভোগের পর পুণ্যাত্মারা মনুষ্যযোনিতেই জন্মগ্রহণ করেন। তাতে তাঁরা সুখীই হন। তবে যদি এই যোনিতেও ধর্মজ্ঞান লাভ না করেন তবে অধম যোনিতে পতন হয়।

সব শুনে মুদ্গাল বললেন—হে দেবদূত ! সব শুনে বুঝলাম স্বর্গটা শাশ্বত নয়। সাময়িক সুখ হলেও দুঃখের সম্ভাবনাই অধিক। আপনাকে নমস্কার, আপনি ফিরে যান। এই গুরুতর দোষযুক্ত স্বর্গে বা স্বর্গসুখে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি চাই কৈবল্য মুক্তি—যেখানে গেলে শোক, দুঃখ নেই, পতনও নেই।

যত্রগত্বা ন শোচন্তি ন ব্যথন্তি চলন্তি বা।
তদহং স্থানমত্যন্তং মার্গয়িস্যামি কেবলম্॥

দেবদূতকে বিদায় করে মুদগল পুনরায় সেই অভ্যস্ত শিলোঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন এবং উত্তম যোগে মগ্ন হলেন। অবশেষে বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে

পরমাত্মার ধ্যানেই তিনি তত্ত্ববোধস্বরূপ পরাসিদ্ধি লাভ করেন।

তাৎপর্য এই যে, পুণ্যকর্মের দ্বারা উচ্চলোক, উচ্চভোগ পাওয়া সম্ভব হলেও তা ভগবদ্ দর্শন করাতে পারে না। ভগবদ্ দর্শনের জন্য এই সব প্রাকৃত গুণের কোনো মূল্যই নেই।

তাহলে প্রশ্ন এই, 'ভগবান যে বলছেন দেবতারাও তাঁর দর্শন নিত্য আকাঙ্ক্ষা (লালসা) করেন তবু তাঁরা ভগবানের দর্শন পান না কেন ?' এর কারণ হল ভগবানে দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে বলে 'অনন্য ভক্তি' কিন্তু দেবতাদের নিত্য দর্শনের আকাঙ্ক্ষা 'অনন্য ভক্তি'র পরিচায়ক নয়। ভক্তের নিত্য আকাঙ্ক্ষার (লালসার) অর্থ হল ভগবানেই নিত্য নিরন্তর আকর্ষণ থাকা এবং অন্য কিছুতে আকর্ষণ না রাখা। এইরূপ লালসা যদি সত্যি হৃদয়ে আসে তবে অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও ভগবানের প্রীতি লাভ করেন ও তার ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু দেবতাদের ক্বচিৎ এইরকম লালসা হয় কারণ জীব অত্যধিক পুণ্যকর্ম করলে তবেই তার কর্মফল স্বরূপ প্রাপ্ত ভোগ-বিলাসের জন্যই দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তখন ভোগ-বিলাসই তাঁদের উদ্দেশ্য হয়।

তবে দেবতাদের লালসা কেমন ?

তা হল অধিকাংশ আস্তিক মানুষের লালসা বা ইচ্ছের মতো। তারা চায় যেন ভগবদ্ দর্শন যদি হয় তবে হোক কিন্তু তাতে যেন ভোগ ও সম্পদ থেকে বিচ্ছেদ না হয়। এর তাৎপর্য হল —'**মার্গে প্রয়াতে মণিলাভবন্মে লভেত মোক্ষো যদি তর্হি ধন্যঃ**।' অর্থাৎ পথিক যেমন পথ চলার সময় মণি-মুক্তো পেয়ে গেলে খুশি হন তেমন আস্তিক লোকেরও ইচ্ছে সংসার, ধর্ম, কর্মর মধ্যে থেকেই যদি মুক্তিলাভ হয় তবে ভাল। তাদের মধ্যে এইপ্রকার গৌণভাবে মুক্তির ইচ্ছে থাকে ভগবান যদি দর্শন দেন তো ভালোই, দর্শন হয়ে যাবে কিন্তু প্রাপ্ত কর্মফল অর্থাৎ ভোগ যেন ত্যাগ করতে না হয়। দেবতাদের মধ্যেও এইরূপ গৌণভাবে ভগবদ্ দর্শনের ইচ্ছা থাকে।

দেবতারা ভোগযোনি, কর্মে স্পৃহা কম। তার ওপর তাঁরা চিন্তা করেন, আমরা অত্যন্ত উচ্চলোকে অবস্থিত, আমাদের স্থান অতি উচ্চ, আমাদের পদ, শরীর, ভোগ দিব্য, আমরা অত্যন্ত পুণ্যবান, তাহলে আমাদের ভগবদ্ দর্শন কেন হবে না ! দেবতাদের দেবত্ব, পদ ইত্যাদির অহংকার থাকে কিন্তু ক্ষমতা,

পদ আদি দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না। অর্জুন তাই পূর্ব অধ্যায়ে বিভূতি যোগে বলেছেন— **'ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ'** (গীতা ১০।১৪) অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনার প্রকটিত হওয়ার তাৎপর্য দেবতা বা দানবের কেউই জানে না। দেবতাদের যেমন অনেক ঐশ্বর্য আছে, দানবদেরও তেমন নানা বিচিত্র মায়া ও অনেক মন্ত্রসিদ্ধি জানা থাকে, কিন্তু এর দ্বারাও ভগবানকে জানা যায় না। অর্জুন এইভাবে দেবতা ও দানবদের একই শ্রেণীতে রেখেছেন।

দেবতা ও দানবদের প্রসঙ্গ বলে ভগবান পরের শ্লোকে মানুষের কথা বলেছেন। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক যদি যজ্ঞ-তপস্যা-দান আদি শুভকর্ম করে তবে তার দ্বারাও ভগবানকে পাওয়া যায় না। তাৎপর্য হল এই যে, যে জিনিস যে দামে কেনা যায়, সেই জিনিসটির মূল্য কিন্তু তার থেকে কমই হয়, তাই নানা বেদ অধ্যয়ন করলে, অনেক তপস্যা করলে, নানাবিধ দান করলে বা মস্ত বড় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেও তার পুণ্যফলেই ভগবানকে যে পাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নেই। ভগবান এখানে বলেছেন—**'নাহং শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং'** অর্থাৎ মহৎ ক্রিয়া যত বড়ই হোক না কেন কিংবা যোগ্যতা যতই অর্জিত হোক না কেন তার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না।

ঈশ্বরলাভের উপায়
(শ্লোক ৫৪-৫৫)

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ৫৪
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫

সরলার্থ—কিন্তু হে পরন্তপ অর্জুন! এইরকম (চতুর্ভুজসম্পন্ন রূপ) আমাকে অনন্য ভক্তি দ্বারাই তত্ত্বত জানা, সাকার রূপে দর্শন এবং প্রাপ্ত করা অর্থাৎ আমাতে প্রবেশ করা সম্ভবপর হয়। ৫৪

হে পাণ্ডব ! যে ব্যক্তি আমার জন্য কর্ম করে, মৎপরায়ণ হয়, আমার ভক্ত হয় ও সর্বতোভাবে আসক্তিবর্জিত এবং সমস্ত প্রাণীতে নির্বৈর (শত্রুতাবর্জিত) হয়, সেই ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত করে। ৫৫

অধ্যায়ের অন্তিম প্রকরণে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনের রহস্য সমাপন করেছেন অনন্য ভক্তির বর্ণনা করে। সমগ্র বর্ণনার তাৎপর্য এই যে, ভগবদ্ দর্শন কেবল তাঁর কৃপাতেই সম্ভব হয়। আর তাঁর কৃপালাভ হলেই তাঁর প্রতি 'অনন্য ভক্তি' জন্মায়। দেবতা ও মানুষ উভয়েই তাঁকে অনন্য ভক্তির দ্বারা লাভ করতে পারেন। তবে প্রেমীভক্ত যেমন প্রেমপূর্বক ভগবানকে দর্শন করতে চান, দেবগণ সাধারণত সেভাবে দেখতে চান না, তাই ভগবান ভক্ত-প্রেমিকের অধীন হলেও তিনি কখনই দেবতাদের অধীন নন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভগবৎকৃপা তখনই লাভ হয়, যখন মানুষ তার সামর্থ্য, সময়, বুদ্ধি, সামগ্রী ইত্যাদি সর্বতোভাবে ভগবানকে সমর্পণ করে, নিজের মধ্যে দুর্বলতা, অযোগ্যতা অনুভব করে এবং বিন্দুমাত্র অভিমান পোষণ না করে ভগবানকে অনন্যভাবে ডাকে। এই অনন্যভাবে ডাকাই হল অনন্য ভক্তি। ভগবান নিজমুখে বলেছেন—**'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জুন'** (গীতা ১১।৫৪)। মানুষের যতক্ষণ প্রাকৃত বস্তুর, নিজের যোগ্যতার, বুদ্ধির প্রতি গুরুত্ব, আশ্রয় ও নির্ভরতা থাকে, ততক্ষণ ভগবান অত্যন্ত নিকট হলেও দূরে বলে প্রতিভাত হন। আর অনন্য ভক্তির অর্থ হল—শুধু ভগবানেই আশ্রয়, তাঁর ওপরই আশা, ভরসা, বিশ্বাস রাখা। এই অনন্য ভক্তিই পারে ভগবানকে ভক্তের কাছে টেনে আনতে।

এক ভরোসো এক বল এক আস বিস্বাস।
এক রাম ঘনস্যাম হিত চাতক তুলসীদাস॥

(তুলসী দোঁহাবলী ২৭৭)

আর এই অনন্য ভক্তি—**স্বয়ং** থেকেই উৎপন্ন হয় ; মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির থেকে নয় কেননা কেবল **স্বয়ং**-এরই এইরূপ ব্যাকুলতাপূর্বক উৎকণ্ঠা থাকে। এই স্থিতিতে ভগবান ব্যতীত একটি ক্ষণও স্বস্তি থাকে না। এই ব্যাকুলতা, এই অস্থিরতাই অনন্ত জন্মের পাপরাশীকে ভস্ম করে দেয়।

এইরকম অনন্যচিত্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—'**তস্যাহং সুলভঃ পার্থ**' (গীতা ৮।১৪) আর বলেছেন —'**যোগক্ষেমং বহাম্যহম্**' (গীতা ৯।২২) অর্থাৎ সেই ভক্তরা আমাকে খুব সহজেই লাভ করে। আর আমি তাদের সকল পার্থিব ও পারমার্থিক প্রয়োজনীয়তা নিজেই বহন করি।

অনন্য ভক্তির তাৎপর্য হল পার্থিব কোনো জিনিসের ওপর ভরসা না রাখা এমনকি নিজ ভজন, স্মরণ, মনন, ব্যাকুলভাবে ডাকা ইত্যাদি সাধনার ওপর যে ভরসা, তাও যেন একেবারে না থাকে। তবে সাধনা কীসের জন্য ? এ হল শুধু **অহং দূর করার সাধনা**, নিজের মধ্যে যে পার্থিব বা পারমার্থিক শক্তির আভাষ দেখা যায় তা নিজের বলে ভাবা দূর করার সাধনা। আসলে কোনো সাধনার দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না, তা হয় কেবল যখন চিত্ত সাধনার দ্বারা বিগলিত হয়, তার ফলেই। আর সাধনার অহংকার দূর হলেই, সাধকের ওপর ভগবানের কৃপা পরিপূর্ণভাবে আপনিই বিস্তারলাভ করে। অর্থাৎ সেই কৃপার পথে কিছু বাধা সৃষ্টি হতে পারে না এবং সেই কৃপা দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়।

অনন্য ভক্তির সাধকের এই অতি উচ্চাবস্থার কথা বলে, শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে ভগবান সেই সাধকদের তাঁকে প্রাপ্তির কথা বলেছেন। ভগবান বলছেন—'**জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ**' (গীতা ১১।৫৪) অর্থাৎ ভক্তর ওপর কৃপা বর্ষিত হলে তারা আমাকে জানতে পারে, দর্শন করতে পারে এবং পেতেও পারে। এখানে ভগবানকে বিভিন্নভাবে প্রাপ্তির সম্বন্ধে এইভাবে বলা হয়েছে—

জ্ঞাতুম্—কথাটির অর্থ হল, আমি যেমন সেইরূপে আমাকে জানা। জানার অর্থ কিন্তু এই নয় যে ভগবান বুদ্ধির অন্তর্গত হন। এর তাৎপর্য হল, ভগবদ্কৃপায় তাঁর জানার শক্তি পরিপূর্ণ হয়। তখন ভক্ত '**বাসুদেবঃ সর্বম্**' (গীতা ৭।১৯) ও '**সদসচ্চাহম্**' (গীতা ৯।১৯) এইরূপে সর্বত্রই তাঁকে প্রতিভাত করেন। বাক্যটি ভগবান জ্ঞানমার্গীদের সম্পর্কে পরেও বলেছেন—জ্ঞানের দ্বারাও ভগবানকে স্বরূপত জানা যায় আর প্রাপ্ত করাও সম্ভব হয় (গীতা ১৮।৫৫), কিন্তু তিনি দর্শন প্রদান করতেও পারেন বা নাও পারেন।

দ্রষ্টুম্—এই বাক্যটির অর্থ হল ভক্ত যেভাবে ভগবানের সত্ত্বরূপ দেখতে চান অর্থাৎ বিষ্ণু, রাম, শ্রীকৃষ্ণ আদি এই সব রূপেই তাঁর দর্শন হয়।

প্রবেষ্টুম্—এই বাক্যটির তাৎপর্য হল, ভক্ত ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করেন অর্থাৎ তখন তাঁর নিত্যলীলায় প্রবেশ ঘটে। নিত্যলীলায় প্রবেশ করতে ভক্তর ইচ্ছা ও ভগবানের ইচ্ছা উভয়ই প্রধান হয়। যদিও সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলে ভক্তর যে ইচ্ছা লীন হয়ে যায়, তবু ভগবানের মহত্ত্ব হল এই যে, পূর্বে ভক্তর তাঁর নিত্যলীলায় প্রবেশ করার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তা তিনি পূর্ণ করেন। তিনি যে ভক্তর কেবল পারমার্থিক ইচ্ছা পূরণ করেন তা নয়, তিনি ভক্তর পূর্বের সমস্ত সাংসারিক বাসনাও চরিতার্থ করেন। ভগবদ্ দর্শনের পূর্বে ধ্রুবর রাজত্বর ইচ্ছে ছিল তাই ভগবান তাকে ছত্রিশ হাজার বর্ষব্যাপী রাজত্ব প্রদান করেন। আর বিভীষণও রাজত্ব চেয়েছিলেন, রামের কৃপায় তিনি লাভ করেছিলেন এক কল্পব্যাপী রাজত্ব। ভগবান এইভাবে ভক্তর পূর্ব ও বর্তমান সকল ইচ্ছা পূরণ করেন আর তারপর 'তাঁর' নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে পূর্ণতা প্রদান করেন, যার ফলে ভক্তর আর কোনো কিছু করার, জানার, পাওয়ার অবশিষ্ট থাকে না।

জ্ঞান ও ভক্তি—ভগবান যেস্থানে জ্ঞানের পরনিষ্ঠার কথা জানিয়েছেন, সেখানে জ্ঞানের দ্বারা কেবল জানা ও প্রাপ্ত হওয়ার কথাই বলেছেন। **'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্'** (গীতা ১৮।৫৫)। অর্থাৎ জ্ঞানের পরনিষ্ঠা হলে দর্শন পাওয়া যায় না যা ভক্তির পরনিষ্ঠায় পাওয়া যায়। আর এই স্থানে অনন্যা ভক্তির কথা বলা হয়েছে যার দ্বারা জানা, দেখা ও প্রাপ্ত হওয়া—তিনটিই সম্ভবপর। এই হল ভক্তির বিশেষ মহিমা যার দ্বারা সমগ্র প্রাপ্তি লাভ হয়।

সাধন পঞ্চক — এই প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে ভগবান অনন্য ভক্তির পাঁচটি সাধনের কথা বলেছেন। এই সাধন পঞ্চকের মধ্যে প্রথম তিনটিতে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সাধনের কথা বলা হয়েছে— **মৎকর্মকৃৎ, মৎপরমো** ও **মদ্ভক্তঃ** এবং পরের দুটিতে বলা হয়েছে সংসারের সঙ্গে আসক্তি ত্যাগের কথা—**'সঙ্গবর্জিত'** ও **'নির্বৈর সর্বভূতেষু'**।

মৎকর্মকৃৎ—যে ব্যক্তি জপ, ধ্যান, কীর্তন, ভজন, সৎসঙ্গ আদি ভগবদ্

সম্বন্ধীয় কর্ম এবং বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল আদি পরিস্থিতি অনুসারে প্রাপ্ত লৌকিক কর্মসকল কেবল ভগবানের প্রসন্নতার জন্যই করেন তিনিই হলেন 'মৎকর্মকৃত'। বাস্তবিক ভাবে দেখলে কর্মের দুটি রূপ যথা—পারমার্থিক ও লৌকিক—এই দুটিই বাহ্যিক রূপ। যখন সাধকের অন্তরে সব কর্ম শুধু ভগবানের জন্যই করতে হবে, এই একটি মাত্র ভাব বা উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তখন ভক্ত তাঁর শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সাহায্যে যা কিছু করেন, তা পারমার্থিকই হোক বা লৌকিকই হোক সে সকলেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তিনি বিচার করেন তাঁর শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, যোগ্যতা, প্রতিষ্ঠা, কর্ম করার ক্ষমতা সবই ভগবৎপ্রদত্ত, তাই তিনি শুধুমাত্র ভগবানের প্রসন্নতার জন্য, ভগবানের আদেশ অনুযায়ী এবং ভগবদ্‌প্রদত্ত শক্তিতে নিমিত্ত মাত্র হয়ে কর্ম করে থাকেন। এই হল ভক্তর 'মৎকর্মকৃৎ' হওয়া।

মৎপরমঃ—যে সাধক ভগবানকেই পরম ধ্যেয় মনে করে, তাঁরই পরায়ণ হয়ে, তাঁরই আশ্রয় থাকেন, তিনি মৎপরমঃ।

মদ্ভক্তঃ—সেই ভক্ত হল 'মদ্ভক্ত' যে তাঁর সঙ্গে অটল সম্পর্ক স্থাপন করে এবং যার মধ্যে সদা এই উপলব্ধি হয় যে 'আমি শুধুমাত্র ভগবানের আর ভগবানই শুধু আমার'—**মেরে তো গিরিধারী গোপাল দুসরা ন কোই**। অর্থাৎ 'আমি অন্য কারোর নই বা কেউই আমার নয়। এইরূপ সম্পর্ক 'মীরাবাঈ'-এর হয়েছিল, তাতে ভগবানে অত্যন্ত প্রেম হয়, কারণ প্রেম জাগ্রত হওয়ার মুখ্য কারণই হল আপনত্বভাব।

সেই ভক্ত সর্বদেশে, সর্বকালে, সমস্ত বস্তু-ব্যক্তিতে এবং নিজের মধ্যেও সদা-সর্বদা প্রভুকে পরিপূর্ণ ভাবে দেখেন। এইরূপ ভাব যিনি রাখেন তিনি 'মদ্ভক্ত'।

সংসারের সঙ্গে আসক্তি ছিন্ন হওয়ার পথ—

সঙ্গবর্জিত ও নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু—ভগবানের ভক্ত হলে, তাঁর জন্য কর্ম করলে, তাঁর শরণাগত হলে, কী হয় ঃ— সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। ভগবান এদের সম্বন্ধেই বলেছেন 'সঙ্গবর্জিত' অর্থাৎ সেই ভক্তর সংসারে আসক্তি, মমতা বা কামনা একেবারেই থাকে না।

আবার ভগবানে প্রেম জাগ্রত হলে সর্বত্র ভগবদ্‌ভাব আসে আর তখন

তার সঙ্গে যতই দুর্ব্যবহার করা হোক বা অনিষ্ট করা হোক তার এই অনিষ্টকারীদের প্রতি বিন্দুমাত্রও বৈরভাব উৎপন্ন হয় না। সে এসবই ভগবানের ইচ্ছা ও কৃপা বলে মনে করেন। এরূপ ভক্তকে ভগবান '**নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু**' বলেছেন। ভগবান এইরূপ উপদেশ আগেও দিয়েছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ (গীতা ৯।৩৪)

অর্থাৎ হে অর্জুন ! তুমি আমার ভক্ত হও, মদ্‌গত চিত্ত হও, আমার পূজনকারী হও, আমাকে প্রণাম করো। এইভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত হলে, মৎপরায়ণ হলে, তুমি আমাকেই লাভ করবে।

আগে নবম অধ্যায়ের রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগে একথা বলা সত্ত্বেও ভগবানের মনে হয়েছিল, অর্জুন কী সত্যিই গূঢ় রহস্যের কথা বুঝতে পেরেছেন ? আর একথা বোঝাবার জন্যই ভগবান দশম অধ্যায়ে বিভূতি যোগ ও একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন যোগের অবতারণা করেছেন। জীবগণ বিনাশশীল সংসারের প্রতি আসক্তিবশত এরই আশ্রয়ে থাকে আর এর ফলে অবিনাশী ভগবানে বিমুখ থাকে। এই বিমুখতা দূর করে, জীবগণকে ভগবৎমুখী করাতেই হল দশম ও একাদশ অধ্যায়ের অবতারণা।

মানুষের মন ও ইন্দ্রিয় এদের মধ্যে, দুটি বিশেষ শক্তি আছে—চিন্তা করার ও দেখার। এর মধ্যে চিন্তার করার যে শক্তি সেটি ভগবানের বিভূতিতে নিয়োগ করা উচিত। অর্থাৎ যে কোনো বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে যা কিছু বিশেষত্ব, মহত্ত্ব, অলৌকিকত্ব অনুভব হয় ও মন আকর্ষিত হয় সেগুলি ভগবানেরই মনে করে সেস্থানে ভগবানকেই চিন্তা করা উচিত। সেই জন্যই ভগবান দশম অধ্যায় বর্ণনা করেছেন।

মানুষের অপর একটি শক্তি হল দেখার শক্তি আর সেটিও ভগবানে নিয়োজিত করা উচিত। ভগবানের দিব্য ও অবিনাশী বিশ্বরূপে অনেক রূপ আছে আর দৃষ্ট এই জগৎ-সংসার সেই বিশ্বরূপেরই এক অঙ্গ। সাধক যেন এই দৃষ্টিতে সকলকে পরমাত্মা স্বরূপই দেখেন। আর সেইজন্যই ভগবান একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন। অর্জুনও এই দুই ব্যাপারে দুইবার প্রার্থনা করেছেন।

দশম অধ্যায়ে অর্জুন বলছেন—

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া॥

(গীতা ১০।১৭)

হে ভগবন্ ! আপনাকে কেমন করে জানব ? কোন্ কোন্ ভাবের সাহায্যেই বা আপনাকে চিন্তা করব ? এর উত্তরে ভগবান চিন্তাশক্তি ব্যবহারের জন্য তাঁর বিভূতিগুলি বর্ণনা করেছেন।

আবার অর্জুন একাদশ অধ্যায়ে বলেছেন — '**দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরম্ পুরুষোত্তম**' (গীতা ১১।৩) অর্থাৎ হে পরমেশ্বর ! আমি আপনার ঈশ্বরীয় বিশ্বরূপ দর্শন করতে ইচ্ছা করি।

ভগবান তখন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করালেন এবং সেটি দেখবার জন্য অর্জুনকে দিব্যচক্ষু প্রদান করেন। '**দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্**' (গীতা ১১।৮) অর্থাৎ ভগবান বলছেন—অর্জুন, তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু প্রদান করছি, যার সাহায্যে তুমি আমার ঐশ্বরিক সামর্থ্য অবলোকন করো।

এর তাৎপর্য এই যে, সাধক তার চিন্তা ও দর্শন-শক্তি যেন ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে ব্যয় না করেন। অর্থাৎ সাধক চিন্তা করলে কেবল পরমাত্মারই করবেন এবং যা কিছু অবলোকন করবেন তাতে যেন পরমাত্মাই দর্শন করেন।

ভগবৎ প্রাপ্তির যে পথ ভগবান এখানে বলেছেন তা পরিপূর্ণভাবে ভগবৎ প্রাপ্তিরই পথ।

মৎকর্মকৃৎ—স্থূল শরীর দ্বারা ভগবানের পরায়ণ হতে হয়।

মৎপরমঃ—সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর দ্বারা ভগবৎপরায়ণ হওয়া।

মদ্ভক্তঃ—স্ব-স্বরূপ বা স্বয়ং-এর দ্বারা ভগবানের পরায়ণ হওয়া। কারণ 'আমি ভগবানের ও ভগবান আমার'—এ হল কেবল স্বরূপেরই স্বীকৃতি। আর ভক্ত এই তিনভাবে ভগবৎপরায়ণ হলে, ভগবান বলেছেন—'**স মামেতি**' অর্থাৎ সে সমগ্রভাবেই আমাকে প্রাপ্ত হয়।

———o———

শ্রীশ্রীচণ্ডী

স্তুতি চতুষ্টয়

প্রাক্‌কথন

মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত তেরোটি অধ্যায় (৮১ থেকে ৯৩তম) হল দেবীমাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডী। এই ১৩টি অধ্যায়ে সাতশত মন্ত্র আছে এইজন্য চণ্ডীকে সপ্তশতীচণ্ডীও বলা হয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তবগুলি অভূতপূর্ব। ব্রহ্মা ও দেবগণ কর্তৃক এই মাতৃস্তুতির স্তবগুলিতে দার্শনিক তত্ত্ব ও ভক্তিরস একীভূত হয়ে গেছে আর এর প্রসন্ন-গম্ভীরত্ব একে অতুলনীয় করেছে।

চণ্ডীতে তিনটি চরিত আছে। প্রথম চরিত মধু-কৈটভ বধ। ব্রহ্মার আরাধনায় যোগনিদ্রারূপিণী মহাকালী আবির্ভূতা হলেন। তিনি যোগনিদ্রায় রত বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গ করলেন। অতঃপর বিষ্ণুই মধু-কৈটভ অসুরদ্বয় বধ করেন।

মধ্যমচরিতে মহিষাসুর বধ। দেবগণ কর্তৃক মহিষাসুরের অত্যাচারের বর্ণনা শুনে কোপিত বিষ্ণুর মুখ হতে তেজ নির্গত হল। তৎপর অন্য সমস্ত দেবতাদের শরীর হতেও তেজরাশী নির্গত হয়ে বিষ্ণু-নির্গত তেজের সঙ্গে যুক্ত হল। সেই তেজঃসমষ্টি হতে মহালক্ষ্মীরূপী দুর্গা আবির্ভূতা হয়ে মহিষাসুরকে বধ করেন। এই দশভুজারূপিণী দুর্গাই শরৎকালে অকালবোধনে পূজিতা হন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তরচরিতে আছে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের আখ্যান। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে আবির্ভূত হলেন দেবী সরস্বতী, ইঁহারই নামান্তর মহাসরস্বতী। ইনিই ধূম্রলোচন, রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভ আদি দৈত্য বধ করেন।

এই তিন চরিত্র সম্বন্ধীত চণ্ডী গ্রন্থে মোট চারটি স্তুতি আছে। প্রথম অধ্যায়ে আছে মধু-কৈটভ বধ প্রসঙ্গে ব্রহ্মা-কৃত দেবীস্তুতি। ইহাকে **'বিশ্বেশ্বরী স্তুতি'** বলা হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে আছে দেবগণ-কর্তৃক মহিষাসুর বধান্তর উল্লাসপূর্ণ এক স্তুতি। ইহাকে **মাহিষহন্ত্রী স্তুতি** বা শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতিও বলে। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের নিমিত্ত দেবগণ কর্তৃক স্তুতি যাকে দেবীসূক্ত বা

বিষ্ণুমায়া স্তুতি বলে। এরপরে শুম্ভবধের অবসানে একাদশ অধ্যায় আছে দেবগণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্তুতি। এই স্তুতিকে বলে **'নারায়ণী স্তুতি'**। এই চারটি স্তুতির মধ্যে প্রথম দুটি মাতৃমহত্ব, মাতৃকরুণা, মায়ের সর্ব শক্তিমত্তা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর পরের দুটি স্তুতি মূলত 'প্রণতি প্রধান'। আর প্রণতিই সাধনার মূল রহস্য। ভক্তিপূর্বক প্রণত হলে সবকিছুই লাভ হয়।

এই স্তুতিগুলিতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভ্রান্তি আদি সর্বভাবের ভেতর দিয়েই তাঁকে দর্শন ও পুনঃপুনঃ প্রণাম করা হয়েছে। যতটুকু পরিমাণে জ্ঞানের বিকাশ হতে থাকে সেই সেই পরিমাণেই জীব বুঝতে পারে যে 'আমি' ভাবটি এক দুরপনেয় অজ্ঞানতামাত্র। সুতরাং এই অজ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তার সামনে সৎ-অসৎ রূপে যা কিছু উপস্থিত হয়, সাধক তাকেই মাতৃবোধে দর্শন করেন। আর নিজ আমিত্বকে ভগবৎ চরণে অবনত করতে চেষ্টা করেন। এইরূপে সাধক জ্ঞানের যত উচ্চস্তরে আরোহণ করেন, ততই তিনি অবনত হয়ে পড়েন। অজ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে পারলে, তখন তাঁর আর জ্ঞানের চরণে অবনত হতে কোনোরূপ সঙ্কোচ বা দ্বিধা উপস্থিত হয় না। দেবতাগণ তাই পুনঃপুনঃ প্রণাম করে তাঁদের অভীষ্ট লাভের পথ সুগম করেছেন।

বিশ্বেশ্বরী স্তুতি (প্রথম অধ্যায় শ্লোক ৭৩-১০৪)

প্রাক্কথন

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে বিশ্বেশ্বরী স্তুতি এবং উপলক্ষ মধু-কৈটভ অসুরদ্বয় বধ। মধু শব্দের অর্থ আনন্দ, কৈটভ শব্দের অর্থ বহুত্ব। বহুত্বের বীজই কৈটভ নামে অভিহিত। এই 'বহুভাবেচ্ছামূলক' আনন্দ পরমাত্মার স্বরূপানন্দ হতে ভিন্ন। যাই হোক জীবের মধ্যে নিহিত অহংবোধাত্মক আনন্দ আর বহুভাবেচ্ছা হওয়ার আনন্দ এই দুটিই অতি দুরপনেয় সংস্কার। উহারা সাধনের সাধক, সাধকের কৈবল্য ভাবের বিরোধী, তাই তারা ঘোর অসুর বলে অভিহিত হয়। পরমাত্মযুক্ততাই জীবন আর তদ্‌বিমুখতাই হনন।

অসুরদ্বয় যখন ব্রহ্মাকে—সৃষ্টিকর্তাকে (বা মনকে) প্রথম দেখেন তখন

তিনি বিষ্ণুর নাভিকমল (প্রাণশক্তির) অঙ্গে ধ্যানস্থ অবস্থায় আছেন নিশ্চলভাবে, প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায়। তাই সংস্কারদ্বয় (বহুত্বভাবেচ্ছারূপক অসুর) মনকে নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে পুনরায় ক্রিয়াশীল করতে তাকে জগদাকারে আকরিত হওয়ার জন্য উদ্বেলিত করতে থাকে। এই হল মধুকৈটভের **'হন্তুং ব্রহ্মনমুদ্যতৌ'**—ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হওয়া। আমি বহু হব, বহুভাবের আনন্দ উপভোগ করব, এ ইচ্ছাও পরমেশ্বরের ভাবের, সুতরাং অমোঘ। ভগবৎ লীলার এই ইচ্ছাটা আমাদের বুকে থাকে তাই, মা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায়, স্বাধীন আনন্দে জগৎ সৃষ্টি-ভোগ করার জন্য অসংখ্য যোনি ভ্রমণ করিয়েছেন।

আবার যখন বহুজন্ম ভ্রমণের পর জীব মাতৃ-অঙ্কের সন্ধান পেয়ে, পরমাত্মার স্বরূপের আভাস পায়, তখন আর তার ওই বহুত্ব ও তৎ সম্বন্ধীয় আনন্দ ভালো লাগে না। তখনই হয় মধুকৈটভ-বধের সূত্রপাত। কল্পান্তে মহাপ্রলয়ের সময় অখিল ব্রহ্মাণ্ডসহ ব্রহ্মাদি সকলই কারণার্ণবে লীন হয়। আর মহাবিষ্ণু হন সেই কারণ সমুদ্রে নিদ্রিত। আবার নতুন নতুন সৃষ্টির প্রারম্ভে বা মহাসর্গে, বিষ্ণু কারণার্ণবে ঈক্ষণ করলে তাঁর নাভিমূলে ব্রহ্মা উদ্ভূত হয়ে নতুন সৃষ্টির ধ্যানে হন নিমগ্ন। এমন সময় বিষ্ণুর কর্ণমল (কানের ময়লা) থেকে উদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামক দুই অসুর ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হয়। ব্রহ্মা সেই অসুর দ্বারা আক্রান্ত অথচ দেখছেন বিষ্ণু তখনও নিদ্রিত।

তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।
বিবোধনার্থায় হরের্হরি নেত্রকৃতালয়াম্॥
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৬৯—৭১)

সরলার্থ—তখন ব্রহ্মা শ্রীহরির জাগরণের নিমিত্ত তাঁহার নেত্রে লগ্না যোগনিদ্রাকে একাগ্রচিত্তে স্তুতি করতে লাগলেন। (৬৯)

এই বিশ্বের জগদীশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতি সংহারকারিণী এবং তেজঃস্বরূপ, ভগবান বিষ্ণুর অনুপম যে শক্তি, সেই ভগবতী নিদ্রাদেবীকে দিয়ে বিষ্ণুর জাগরণ ও অসুরদ্বয় বধ, এই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মাকৃত দেবীর প্রতি এই

স্তুতিই বিশ্বেশ্বরী স্তুতি। (৭০-৭১)

ব্রহ্মার স্তব (৭৩—৮৭)

ব্রহ্মার এই স্তবটি চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের ১৫টি শ্লোকে (৭৩—৮৭) স্তুত এবং পাঁচটি প্রকরণে বর্ণিত হয়েছে।

- সৃষ্টি-কারিণী রূপে দেবী (৭৩—৭৬)
- বেদের মূর্তিমতী রূপে দেবী (৭৭)
- আদি প্রকৃতি ও জগতের যাবতীর শক্তির আদিভূতারূপে দেবী (৭৮—৮১)
- সমস্ত উদ্দেশের মূল কারণ রূপে দেবী (৮২—৮৪)
- মধু-কৈটভের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ব্রহ্মার আর্তি (৮৫—৮৭)

সৃষ্টিকারিণীরূপে দেবী (৭৩—৭৬)

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা॥
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।
অর্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ॥
ত্বমেব সন্ধ্যা সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা।
ত্বয়ৈতদ্ ধার্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ॥
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৭৩—৭৬)

সরলার্থ— দেবি ! তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা এবং তুমিঁই বষট্কার। স্বরও তোমারই স্বরূপ। তুমিঁই জীবনদায়িনী সুধা। নিত্য অক্ষর প্রণবের অকার, উকার, মকার— এই তিনমাত্রারূপে তুমিঁই স্থিত, আবার এই তিন মাত্রা ছাড়া বিন্দুরূপা যে নিত্য অর্ধমাত্রা—যাকে বিশেষরূপে আলাদাভাবে উচ্চারণ করা যায় না, তাও তুমিঁই। দেবি ! তুমিঁই সন্ধ্যা, সাবিত্রী তথা পরম জননী। দেবি ! তুমিঁই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছ। তোমার থেকেই এই জগতের সৃষ্টি হয়।

তোমার দ্বারাই এই জগতের পালন হয় এবং সর্বদা প্রলয়কালে তুমিই এর সংহার কর। জগন্ময়ী দেবি ! এই জগতের সৃষ্টিকালে তুমি সৃষ্টিরূপা, পালনকালে স্থিতিরূপা এবং প্রলয়কালে সংহারশক্তিরূপা। (৭৩—৭৬)

মূলভাব—ব্রহ্মা বলছেন—মা ! তুমি **স্বাহা**। স্বাহা হল বেদ হবির্দান মন্ত্র। তুমি **স্বধা**—এটি পিতৃদান মন্ত্র আর তুমিই **বষট্‌কার**—অর্থাৎ যাবতীয় মন্ত্রর উপলক্ষণ। মা ! তুমি এইভাবে একধারে স্বাহা, স্বধা ও বষটকার। অর্থাৎ পূজা, হোম, ব্রত, জপ পুরশ্চনাদি দেবকার্য, শ্রাদ্ধতর্পণাদি পিতৃকার্য এবং এই উভয়বিধ কার্যে যে মন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়, সে সকলই তুমি।

আবার মন্ত্রসমূহ পাঠ করতে গেলে যে ত্রিবিধ স্বর উচ্চরিত হয়, যা **উদাত্ত, অনুদাত্ত** ও **স্বরিৎ** নামে অভিহিত হয় এবং যে স্বরের সামান্য উচ্চারণ তারতম্য অনুসারে কাম্য-কর্মসমূহের ফলগত তারতম্য হয়ে থাকে সেই স্বর-স্বরূপও তুমি। ইন্দ্রের নিধন কামনায় বৃত্তাসুরের উৎপত্তির জন্য ঋষিগণ যখন উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠপূর্বক আহুতি প্রদান করছিলেন, তখন তুমিই তো মা, সেই সত্যদর্শী ঋষিদের কণ্ঠে অবস্থান করে, 'ইন্দ্রশত্রু' পদের উচ্চারণ-কালে তাঁহাদের কণ্ঠে অনুদাত্তর বদলে উদাত্ত স্বর নির্গত করিয়েছিলে। তার ফলে ইন্দ্র নিহত হওয়ার বদলে, ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্তাসুর নিহত হয়। তাই তুমিই মা স্বরাত্মিকা।

আবার জীবগণের কণ্ঠ হতে নাদরূপে যে স্বর নির্গত হয় যা **পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা** ও **বৈখরী** নামে অভিহিত, তারও স্বরূপ হলে তুমি মা।

কর্মমাত্রেরই একটি সাধারণ ফল আছে, যার নাম জ্ঞান। আর জ্ঞানের উন্মেষ করাই হল কর্মরূপিণী মা তোমার প্রধান উদ্দেশ্য। জ্ঞান 'নিত্য' তাই অমৃত। যখন জীবের বোধ আসে যে, মা তুমি অক্ষরা, তুমি নিত্যা, তুমি দেবকার্যে ও পিতৃকার্যে নিত্য প্রকটিতা, তুমিই আবার উদাত্তাদি স্বরভেদে এবং মন্ত্ররূপে উচ্চারিতা, তখন কর্মফলগুলিই সুধা বা অমৃতে পরিণত হয়। মা ! জ্ঞান উন্মেষকারিণী শক্তিরূপে তুমিই তো প্রকাশিতা।

তন্ত্রমতে, দেবশক্তি মন্ত্রের মধ্যে নিহিত থাকেন। দেবতাদের জাগাতে হলে মন্ত্রচৈতন্য করতে হয়। ব্রহ্মা তাই মন্ত্ররূপিণী দেবীর স্তুতিতে

বলছেন—হে দেবী তুমি ত্রিধামাত্রা রূপে অবস্থিত (অ, উ,ম) অর্থাৎ তুমি প্রণবরূপী 'ওঁ'। মাত্রা শব্দের অর্থ হল স্পন্দন বা শক্তিপ্রবাহ। চিন্ময়ী মহাশক্তি স্থূল জগদাকারে প্রকাশিত হয়ে জড়শক্তি নামে অভিহিত হন। এই শক্তিপ্রবাহ তিনভাবে কাজ করে।

প্রথম—উৎপত্তি বা নামরূপবিশিষ্ট এক ঘনীভূত শক্তিকেন্দ্র। ইহা সৃষ্টি বা অকার মাত্রা।

দ্বিতীয়—স্থিতি অর্থাৎ ধারণ। এই ধারণ শক্তিকেন্দ্র যতক্ষণ লয়শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জগৎ-সৃষ্টিকে স্থির রাখতে সমর্থ হয় ততক্ষণই উহা স্থিতি বা উকার মাত্রা।

তৃতীয়—লয় অর্থাৎ যখন উক্ত শক্তিকেন্দ্র, মহাশক্তির অঙ্কে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন তিনি লয় বা মকার মাত্রা বলে কথিত হন।

প্রথম স্পন্দন হল সৃষ্টি বা অকার মাত্রা, সাধন ভাষায় উহাই ব্রহ্মা। যোগিগণ ইহাকে মনরূপে দর্শন করেন।

দ্বিতীয় স্পন্দন হল স্থিতি বা উকার মাত্রা, সাধন ভাষায় ইহাকে বিষ্ণু বলে। যোগিগণ ইঁহাকে প্রাণরূপে দর্শন করেন।

তৃতীয় স্পন্দন হল নাশ, প্রলয় বা মকার মাত্রা। সাধন ভাষায় ইহাকে শিব বলে। যোগিগণ ইহাকে জ্ঞানরূপে দর্শন করেন।

প্রলয় একটা আকস্মিক পরিবর্তন নয়, এটি প্রতি পরমাণুর প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনের ফল। জগতের প্রত্যেক পদার্থে প্রতিমুহূর্তে এই ত্রিবিধ স্পন্দন বা শক্তিপ্রবাহ চলছে, আর যখন যে স্পন্দনটি প্রবলভাবে ক্রিয়া করে তখন সেইটিই প্রত্যক্ষ হয়। যোগচক্ষুমান ব্যক্তি এই জগৎকে ত্রিবিধ স্পন্দন ছাড়া আর কিছু দেখেন না।

পরের শ্লোকে (৭৪) ব্রহ্মা বলছেন—মা ! তুমি উপরোক্ত জগৎরূপে অভিব্যক্ত হয়েছো। তোমার এই স্বরূপটি অতি মনোহর হলেও এর চেয়েও উৎকৃষ্ট তোমার আরো একটি স্বরূপ আছে যা অনুচ্চার্য, অর্থাৎ যা বিশেষভাবে উচ্চারণ করা যায় না। ইহা অর্ধমাত্রা নামে কথিত এবং এই হল তোমার নিত্যস্বরূপ। আর এই অর্ধমাত্রাস্বরূপ তোমার তুরীয় অবস্থা, তখন তুমি অচিন্ত্যে,

অনির্দ্দেশ্য, সর্ব ইন্দ্রিয় অগম্য এবং সত্য।

এই তৃতীয় মাত্রা বা মকারটি ব্যঞ্জন আর ওটাই অর্ধমাত্রা। ওঁ-কারের মস্তকে ওই অর্ধমাত্রাই নাদ বা বিন্দুরূপে প্রকাশিত। যার অবস্থিতি আছে কিন্তু বিস্তৃতি নেই, তাকেই বিন্দু বলে। ব্রহ্মময়ী মা বিন্দুরূপে নির্গুণ, নাদরূপে সগুণা এবং ত্রিমাত্রাস্বরূপে জগৎরূপে অভিব্যক্ত হয়েছেন। মা ! তোমার এই অর্ধমাত্রাস্বরূপটি নিত্য, পরিবর্তনহীন ও অনুচ্চার্য এবং বাক্যের অগোচর। হে মাতঃ ! ত্রিমাত্রা রূপে তুমি জগজ্জননী, সাবিত্রী, জগৎ প্রসবকর্ত্রী আবার অর্ধমাত্রা রূপে তুমিই পরাজননী।

পরবর্তী দুই শ্লোকে ব্রহ্মা মাকে জগৎ সৃষ্টিকারিণীরূপে বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্মা বলছেন—মা ! সৃষ্টির পূর্বে বীজরূপে এই বিশ্ব তোমারই গর্ভে বিধৃত থাকে ; সৃষ্টির কালে আবার তুমিই উক্ত বীজকে পরিবর্তনশীল জগৎরূপে প্রসব কর। তারপর তুমিই ইহাকে প্রতিপালন কর এবং অন্তকালে ভক্ষণ বা সংহরণ করে থাক।

দেবতাদের স্তুত এই মন্ত্রে ধার্যতে, সৃজ্যতে, পাল্যতে এবং অৎসি—এই চারটি ক্রিয়াপদ দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের মহামায়াত্ব বা মাতৃত্ব পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়েছে। যখন জীব সৃষ্ট হয় তখন মা তুমি আমাদের মধ্যে বিন্দু বিন্দু জ্ঞান সঞ্চার করো, আমাদের অমরত্ব লাভের জন্য, যোগ্যতা অর্জনের জন্য, অসংখ্য জন্মমৃত্যু প্রভৃতি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাও। এই অসংখ্য জন্মে, আমরা যে কতভাবে প্রকৃতিরূপ তোমাকে ভোগ করতে চাই তা ভাবলে স্তব্ধ হতে হয়। আমরা যখন যেভাবে চেয়েছি, মাত তুমি তখনই সেইভাবে সেজে এসেছ। আমাদের ভোগ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তুমি আমাদের বাসনানুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'বিষয়ের' মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছো।

তুমিই বিষয়াকারে এসে, আমাদের ইন্দ্রিয় ভোগ পূর্ণ করার জন্য উদ্দাম লালসার আহার যোগাও। আর এ একদিন নয়, আমরা জন্মজন্মান্তরে যে যে উচ্ছৃঙ্খল বাসনা নিয়ে ছুটছি তুমি তা তখনই পূরণ করেছো। আমরা অজ্ঞানে এতদিন তোমায় ভোগ করেছি এখন তুমি আমায় গ্রহণ করো মা। মা তুমি সুধা ; অমৃতই তোমার আহার। আমরা অমৃতত্ব লাভ করতে পারিনি—তুমি

সুধা, তাই তুমি আমাদের গ্রহণ করতে পারছ না। তুমি কৃপা করো যাতে আমরা পূর্ণজ্ঞানময় হয়ে উঠতে পারি, তখন অমৃত হয়ে তোমার অন্ন হতে পারি। ব্রহ্মা বলছেন **'ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা'**—মানে তখন তুমি আমাদের অশন বা সংহরণ করে তোমার অন্নপূর্ণা নাম সার্থক করবে।

মা ! চাওয়া রূপ বাসনা তো তুমিই আমার হৃদয়ে ফুটিয়েছিলে। এটা তোমার লীলা। মা সংসারে বাসনা আর চাই না, তোমার যে আনন্দময় জগৎলীলা, তা সম্যক্‌ভাবে তোমার সঙ্গে মিলে গিয়েই অনুভব করব, আর পৃথকভাবে নয়।

বেদের মূর্তিমতী ও সর্ববিরুদ্ধভাবের সমন্বয়রূপে দেবী
(৭৭ উত্তরার্ধ ও ৭৮ প্রথমার্ধ)

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ ॥
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী।

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৭৭ উত্তরার্ধ ও ৭৮ প্রথমার্থ)

সরলার্থ—তুমিই মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতি, মহামোহরূপা, মহাদেবী ও মহাসুরী। (৭৭-৭৮)

মূলভাব—ব্রহ্মা স্তুতিতে বলছেন—হে দেবী ! পরমবিদ্যাস্বরূপ 'তত্ত্বমসি' বাক্যের তুমি প্রতিমূর্তি— তাই তুমি **মহাবিদ্যা**। সর্বজন মোহিনী বলে তুমি **মহামায়া**। বিশ্বের যাবতীয় অবধারণকর্তা তুমিই **মহামেধা**। বেদবিদ্যা-রূপিণী **মহাস্মৃতি** তুমি। জীবের ভোগেচ্ছারূপ **মহামোহ** তোমা হতেই উদ্বুদ্ধ। মহা দেবশক্তিও তুমি (**মহাদেবী**)। আবার মহা আসুরী শক্তিও তুমি (**মহাসুরী**)। মা ! যাবতীয় অসম্ভব ব্যাপার তোমাতেই সম্ভব। আলো আর অন্ধকার অতি বিরুদ্ধ পদার্থ হলেও তোমাতেই সহাবস্থান করে। মহতী দৈবী প্রকৃতি আর মহতী আসুরী প্রকৃতি রূপে তুমি বিরাজিতা। মা ! তুমি মহতী ব্রহ্মবিদ্যারূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েও জীবজগৎরূপে মহামায়া-মূর্তিতে বিরাজিতা। তুমিই আত্মজ্ঞান-ধারণনোপযোগিনী মহতী ধীস্বরূপা মহামেধা আবার তোমাকে ভুলে থাকা, তোমার অস্তিত্ব বিস্মৃত হওয়া রূপ মহতী অস্মৃতিও তুমি। মা ! তুমি মহতী বিস্মৃতিরূপে জীবরূপে বিরাজিতা তাই

মহামোহরূপিণীও তুমি।

জ্ঞান অজ্ঞান, মেধা বিস্মৃতি যুগপৎ অবস্থান করতে পারে না, কিন্তু মা তোমাতে সবই সম্ভব। দৈবী এবং প্রকৃতি পরস্পরের অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয়েও তোমাতে নিত্য অবস্থিত।

আদি প্রকৃতি ও জগতের সকল শক্তির আদিভূতারূপে দেবী (৭৮—৮১ উত্তরার্দ্ধ)

প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী॥
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা॥
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ।
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা॥
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা।
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৭৮—৮১ উত্তরার্ধ)

সরলার্থ—তুমিই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের সৃষ্টিকারিণী সর্বময়ী প্রকৃতি। ভয়ংকর কালরাত্রি, মহারাত্রি ও মোহরাত্রিও তুমিই।

তুমিই শ্রী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই হ্রী এবং তুমি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি ও ক্ষমাও তুমিই। তুমি খড়্গধারিণী, শূলধারিণী, ঘোররূপা, তথা গদা, চক্র, শঙ্খ ও ধুনর্ধারিণী।

বাণ, ভূশণ্ডি ও পরিঘ—এসবও তোমার অস্ত্র। তুমি সৌম্যা ও সৌম্যতরা শুধু তাই নয়, যত কিছু সৌম্য এবং সুন্দর পদার্থ আছে, সেই সবের থেকেও তুমি অত্যধিক সুন্দরী। (৭৮-৮১)

মূলভাব—মা ! তুমি কেবল সমষ্টিরূপা মহতী প্রকৃতি নও, ব্যষ্টি প্রকৃতিরূপেও তুমি। প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্র প্রকৃতিরূপের তুমিই প্রতিষ্ঠাত্রী। প্রকৃতি শব্দের স্থূল অর্থ—স্বভাব।

সমষ্টিতে তোমার যেমন মহাদেবী ও মহাআসুরী রূপ তেমন ব্যষ্টিতেও কারও দৈবী প্রকৃতি, কারও আসুরী প্রকৃতি, কেহ সাধু কেহ অসাধু।

নির্গুণা মা আমার, জগৎ সৃষ্টিতে তুমি 'গুণত্রয়বিভাবিনী' অর্থাৎ তুমি নিজেকে বিশিষ্টরূপে ত্রিধা বিভক্ত করে, তিন গুণে গুণিত হও। সমষ্টিতে মহতী-দৈবী ও আসুরী প্রকৃতিরূপে এবং ব্যষ্টিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণে জীব-প্রকৃতিরূপে অভিব্যক্ত হও।

তুমিই আবার এই জীব-ভাব থেকে জীবকে মুক্ত করার জন্য—এই তিন গুণকে সম্যক্ লয় করার জন্য, তুমি **'কালরাত্রি', 'মহারাত্রি'** ও **'মোহরাত্রি'** রূপেও প্রকটিত হও।

কালও যে স্থানে স্তব্ধ সেই হল কালরাত্রি। সত্ত্বগুণের প্রলয় স্থানকেই 'কালরাত্রি' বলে। যখন জীব কালের অতীত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হবে, তখন জীবত্ব চিরদিনের জন্য ঘুচে যাবে।

রজঃগুণের লয়স্থানকে 'মহারাত্রি' বলে। মা ! তুমি মহারাত্রিরূপে আবির্ভূত হয়ে জীবের মহত্তত্ত্ব পর্যন্ত চঞ্চলতা চিরদিনের মতো বিলুপ্ত কর, সে নৈষ্কর্মসিদ্ধি লাভ করে আর তখন তার কেবল চৈতন্যময় আত্মবোধ উদ্বুদ্ধ থাকে।

আবার যখন তুমি মোহরাত্রিরূপে প্রকটিত হও, তখন জীবের জগৎ মোহ, সংসার ধাঁধা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়। মোহ তমোগুণের বহিঃপ্রকাশ আর তাই তমোগুণের লয়স্থানকে বলে মোহরাত্রি। জীব তখন অজেয় মোহকে জয় করে নিত্য চিন্ময়ী মূর্তিতে চিরতরে মুহ্যমান থাকে।

ব্রহ্মা স্তুতিতে বলছেন—মা ! তোমার এই মূর্তিত্রয় অতি দারুণ, অতীব ভয়ংকরী। যেখানে কালশক্তি নিরুদ্ধ, জগৎপ্রকাশ সুপ্ত, মোহশক্তি বিমুগ্ধ সেই কৃষ্ণা রাত্রি মূর্তির স্মরণ করলে জীবের ভীতি উপস্থিত হয়। অমাবস্যার ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারেও বরং একটা প্রকাশ আছে, কিন্তু মা তোমার কৃষ্ণামূর্তিতে তাও লুপ্ত। সর্ববিধ প্রকাশ সেখানে বিলুপ্ত যমরাজ কর্তৃক নচিকেতাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশচ্ছলে (কঠোপনিষদে) বলেছেন—'**ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্। নেমা বিদ্যুতো ভ্রান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥**' (কঠ. ২।২।১৫) অর্থাৎ ব্রহ্ম সন্নিধানে সূর্য, চন্দ্র, তারকাদি কেহও দীপ্তি পায় না, অগ্নি তো তুচ্ছ। তাঁর সে কী দারুণ মূর্তি। অথচ তুমি তো স্বপ্রকাশ, অনন্ত-শান্তিময়ী। আমিত্বের

গাত্রসংলগ্ন সর্ববিধ জঞ্জাল দূরীভূত করে, মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহংকারের রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে, শুধু আত্মবোধটি সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে অবস্থান করা যায়।

দেবীপুরাণে আছে—'**ব্রহ্মমায়াত্মিকারাত্রিঃ পরমেশ লয়াত্মিকা**' অর্থাৎ জীব তো দূরের কথা পরমেশ্বর পর্যন্ত যাতে বিলীন হয় সেই হল একমাত্র ব্রহ্মমায়ার স্বরূপ। হে ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিরূপিণী মা ! তোমার ত্রিগুণলয়ের জন্য প্রকটিত এই যে কালরাত্রি, মহারাত্রি ও মোহরাত্রিরূপ তা জীবভাব প্রাপ্তদের পক্ষে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ।

পরবর্তী শ্লোকে ব্রহ্মা তাঁর স্তুতিতে 'মা'র **ঘোরা ও সৌম্যরূপে** প্রতিটিতে দশবিধ স্বরূপ প্রকাশের কথা বলেছেন।

(ক) যে জীবভাবে মুগ্ধ হয়ে মায়ের স্বরূপকে নিজভাবে ভোগ করে, তার জন্য মা **ঘোরা** রূপে প্রকাশিত হন। (খ) আর যে এই সর্ববিধ শক্তিকে 'মা'র বলে অনুভব করে মা তার কাছে **সৌম্যা**।

পরবর্তী ৮০ ও ৮১ শ্লোকে এই দুই প্রকার স্বরূপের বর্ণনা আছে।

মায়ের দশবিধ স্বরূপ (সৌম্যরূপ)—

ত্বং শ্রীঃ—মা তুমিই জীবের সৌভাগ্যরাগিণী। যখন কোনো জীব সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, যশঃ, অভ্যুদয় আদি নানাবিধ সৌভাগ্য লাভ করে তখন বুঝতে হবে সে মার শ্রীরূপিণী অঙ্কে আশ্রিতা।

ত্বং ঈশ্বরী—যখন কাউকে ঈশ্বরত্ব-প্রভুত্ব অর্থাৎ শত শত লোকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেখা যায় তখন বুঝতে হবে মা তাঁর ঈশ্বরী মূর্তিতে তাকে অঙ্কে ধারণ করেছেন।

ত্বং হ্রীং—কেহ অসৎ কর্ম করে, নিন্দার ভয়ে তা গোপন করতে চেষ্টা করলে বুঝতে হবে যে সে হ্রীরূপিণী তোমার অঙ্কে অবস্থিত।

ত্বং বুদ্ধি—জীবের মধ্যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা বৃত্তি, যা এই জগৎকে প্রকাশ করছে, তুমিই সেই বুদ্ধিরূপে বিরাজিতা।

বোধলক্ষণা—আবার যখন জগৎবোধ বিলুপ্ত হয়ে যায়, শুদ্ধ বোধমাত্র-রূপে 'আত্মসত্ত্বা' সম্বুদ্ধ থাকে, বোধ ব্যতীত অন্য কোনো লক্ষণ থাকে না, তখন তুমিই হও সেই 'বোধলক্ষণা' মা।

লজ্জা—কোনো নিন্দিত কর্ম অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, সেই লজ্জারূপে প্রতি জীবে মা তুমিই অধিষ্ঠাত্রী থাক।

পুষ্টি—এইভাবে যখন কেউ দৈহিক পুষ্টি লাভ করে, জনসমাজে বলবান বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখনই বুঝতে হবে সে পুষ্টিরূপিণী মার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে আছে।

তুষ্টি—আবার যখন কেউ মনের আনন্দে হেসে-খেলে জীবনযাপন করছে, তার সর্বত্র সন্তোষ, বুঝতে হবে তুষ্টিরূপিণী মা তাকে অঙ্কে ধারণ করে বসে আছেন।

শান্তি—যখন দেখা যায় কেউ আত্মজ্ঞান লাভ করে, জগতের সুখ-দুঃখের অতীত শান্তিময় অবস্থায় উপনীত হয়েছে, তখন বুঝতে হবে শান্তিরূপিণী মা তুমি তাকে বক্ষে ধারণ করে আছ।

ক্ষান্তি—আবার যখন দেখা যায় যে কেহ প্রতিকার করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজ অপকার অম্লান বদনে সহ্য করছে, সেটাই হল ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর তা তখনই সম্ভব যখন সে ক্ষান্তিরূপিণী মায়ের অঙ্কে শায়িত থাকে।

এই সকল মূর্তিতে, সর্বজীবের প্রকৃতিরূপে মা তুমি নিয়ত অবস্থান কর। কিন্তু মা ! মূঢ় জীবগণ ওই সকলকে নিজ নিজ মানসিক বৃত্তি বলে মনে করে তোমাকেই উপেক্ষা করে। আমরা মূঢ় জীব, বুঝতে পারি না, আমাদের এই ভোগবাসনা চরিতার্থের জন্য, আমাদের হাতে ধরা দেওয়ার জন্যই তুমি এইরূপে বহুমূর্তিতে আমাদের মধ্যে এসে আমাদের মধ্যে ওই ওই ভাব ফুটিয়ে তোল।

পূর্ববর্তী মন্ত্রে জীব জগতে 'মা'র—শ্রী, ঈশ্বরী আদি দশবিধা স্বরূপ বর্ণনা করে, ব্রহ্মা বলছেন— হে মাতঃ ! যারা তোমার ওইরূপ ঐশী শক্তিকে মাতৃভাবে, ব্রহ্মভাবে, তোমার অভ্যুদয়রূপে প্রকটিতা এই অনুভব না করে যদি নিজের সামর্থ্য বলে মনে করে, তখন সেই জীবভাব আচ্ছন্ন জীবের প্রতি তুমি দশবিধ সৌম্যা স্বরূপের বদলে উৎপীড়ন স্বরূপ দশপ্রহরণধারিণীরূপে আবির্ভূতা হও (ঘোরারূপ)।

খড়্গিনী—তুমিই যে শ্রীরূপে আস এ বোধ যদি না হয়, তবে তুমি শীঘ্রই

উক্ত সৌভাগ্য সুখকে খড়্গ দ্বারা ছিন্ন করে দাও। যে অহংকারে তোমাকে না দেখে স্বয়ং সৌভাগ্যবান হয়ে বসে, তার মস্তক ছিন্ন করার জন্য তোমার শ্রীমূর্তি খড়্গাধারিণীরূপে প্রকটিত হয়।

শূলিনী— এই রকম যারা প্রভুত্ব লাভ করে তোমার ঈশ্বরীমূর্তির অবজ্ঞা করে, তাদের নিকট তুমি শূলধারিণী রূপে প্রকটিত হও। প্রভুত্ব হতে বিচ্যুতিরূপ শূলাঘাতে তাদের বিদ্ধ কর, তাই তোমার ঈশ্বরীমূর্তি শূলধারিণী।

ঘোরা—যারা অসৎ কর্ম করে নিন্দাভয়ে গোপন করে কিন্তু তোমায় স্মরণ করে না, অচিরাৎ তুমি এক হস্তে নৃমুণ্ডধারিণী ঘোরারূপে আবির্ভূত হও। তাদের সেই অসৎকর্ম জনসমাজে প্রকাশিত করে, তাদের তোমার শরণাগত হতে শিক্ষা দাও।

গদিনী—যারা তোমার কৃপায় বুদ্ধিযুক্ত হয়েও তা তোমার স্বরূপ বলে মনে না করে নিজের বুদ্ধিমাত্র মনে করে, তাদের পুনঃ পুনঃ দৈব-প্রতিকূলতারূপে গদার আঘাতে জর্জরিত করে, তাদের বোধবুদ্ধি তোমার দিকে ফেরাও।

চক্রিণী—যারা তোমার কৃপায় শুদ্ধ বোধের সন্ধান পেয়েও তা তত্ত্বমাত্র ভেবে এই জ্ঞান উপেক্ষা করে, তাদের সংসার চক্রে পরিভ্রমণ নিবৃত্ত হয় না। তোমার বোধলক্ষণা মূর্তি, ওইরূপ অজ্ঞানীদের কাছে চক্রধারিণীরূপে প্রকটিতা হয়।

শঙ্খিনী— যারা অসৎ কর্মে রত হওয়ায় তাদের মধ্যে উৎপন্ন সঙ্কোচ, লজ্জাকে তোমার বিশিষ্ট আবির্ভাব রূপে না দেখে নিজ সৎগুণ বলে মনে করে, তাদের সেই নিন্দিত কর্ম অচিরাৎ শঙ্খনিনাদে সর্বজনবিদিত হয়ে পড়ে। তাই তো মা তুমি লজ্জারূপে শঙ্খিনী।

চাপিণী (পুষ্টি)—যারা নিজ শারীরিক পুষ্টিকে আহার, ওষুধ বা ব্যায়ামের ফল বলে মনে করে, পুষ্টিরূপিণী তোমাকে অনাদর করে, তোমার চাপিণী বা ধনুর্দ্ধারিণী রূপের আবির্ভাব তাই তাদের কাছে দুরারোগ্য রোগে পরিণত হয়।

বাণ (তুষ্টি)—যারা মানসিক তুষ্টিকে তোমারই মূর্তি, এইভাবে না দেখে, তা নিজ অর্জিত বিষয় ভোগের ফলেই হয়েছে এইভাবে দেখে, তারা আকস্মিক বিপৎপাতরূপ বাণবিদ্ধ হয়ে চিরদিনের জন্য ব্যথিত হয়। তাই তোমার তুষ্টমূর্তি বাণধারিণী।

ভূশণ্ডী (শান্তি)—যারা শান্তি লাভ করে, কিন্তু তাতে তোমার অন্তর্নিহিত শান্তিরূপিণী মূর্তি দেখতে পায় না, তারা জ্ঞানসম্পন্ন হলেও তাদের সাংসারিক দুর্ঘটনারূপ লৌহ লগুড় আঘাতজনিত যাতনা সহ্য করতে হয়। তাই তুমি শান্তিরূপে ভূশণ্ডীধারিণী।

পরিঘা (ক্ষমা)—যারা অপরকে ক্ষমা করে কিন্তু তার মধ্যে তোমার ক্ষমাময়ী মূর্তি দেখে না, ক্ষমাকে নিজের গুণ বলে মনে করে, তারা অন্য কর্তৃক অযথা উৎপীড়িত হয় এবং তোমার পরিঘধারিণী-রূপের বিকাশ দেখতে পায়।

এইভাবে যারা সর্বভাবে সর্বতোভাবে তোমায় না দেখে, তাদের যতদিন পর্যন্ত না ওইভাবের স্ফূর্তি হয়, ততদিন তুমি একটা না একটা উৎপীড়ন এনে তাদের শিক্ষা দিয়ে থাক। সন্তানের অজ্ঞান দূর করার জন্য তোমার এই শাসনকর্ত্রী মূর্তি। যারা তোমার শাসন একবারে বুঝতে না পারে, তাদের নিকট বাধ্য হয়ে তোমাকে তোমার আয়ুধধারিণীরূপে পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হতে হয়। সন্তানকে অপূর্ণা দেখে, পূর্ণা মা তোমার তৃপ্তি হয় না ; তাই সন্তানের ইচ্ছার অভ্যন্তর দিয়ে, সন্তানের অভিলাষ পূরণের অন্তঃস্থলে গিয়ে ; তোমার মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছা সবার অলক্ষিতেই পরিচালিত হয়। যতদিন না জীব সর্বভাবে তোমাকে দেখতে পায়, ততদিনই তোমার ইচ্ছা, শাসন আকারে প্রকটিতা হয়। আর যখন জীবের এই অনুভূতি ফিরে আসে, তখন তাদের নিকট তুমি এই সকল ঘোরা মূর্তিতে প্রকটিত না হয়ে, সৌম্যা মূর্তিতে আবির্ভূতা হও।

ব্রহ্মা এই স্তুতিতে তাদের কথাই বলছেন—যারা স্ব স্ব প্রকৃতিকে মায়ের দান বলে মানে, সর্বভাবে সর্বতো মায়ের কর্তৃত্ব দেখে, নিজেকে তাঁরই যন্ত্র বলে মনে করে, তাদেরই নিকট তুমি সৌম্যারূপে প্রকাশিত হও। এ যেন রামপ্রসাদের আর্তির উপলব্ধি—**'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী। আমি রথ তুমি রথী, যেমনি চালাও তেমনি চলি।'**

গীতায়ও ভগবান বলেছেন—**'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥'** (গীতা ১৮।৬১) সেই সব সাধক, যাঁরা এই গীতোক্ত মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন তাদের নিকট তুমি অতি আপনজন রূপে আবির্ভূত হও।

যারা কেবল জ্ঞানদ্বারা বুঝেছে যে—সর্বভাবে একমাত্র তুমিই বিরাজিতা অর্থাৎ যারা বুদ্ধিযোগে প্রথম অধিকারী হয়েছে, তাদের নিকট তুমি **সৌম্যা**।

যারা তোমাকে প্রাণ দিয়ে, সর্বভাবে, আত্ম-প্রাণের উদ্বেলন মাত্র দেখতে পায় তাদের নিকট তুমি '**সৌম্যতরা**'।

আর যারা সর্বতোভাবে তোমাতে মন অর্পণ করতে সমর্থ—অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভাবে শরণাগত তাদের নিকট তুমি '**অশেষ সৌমেভ্যঃ**' অতিসুন্দরী অর্থাৎ 'সৌমতমা' মূর্তিতে প্রকটিতা হও। তোমার শরণাগত ভক্ত, যার চক্ষে তোমার সৌন্দর্যের অনুভূতি হয়েছে, সে কি আর কখনও জগতের অন্য কোনো বিশিষ্ট সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয় ! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত সৌন্দর্যকণা রয়েছে, সকল একত্র করেও যে সেই সৌন্দর্যরাশির তুল্য হয় না, তাই মা ! শরণাগত ভক্তর প্রতি তোমার এইরূপ সৌম্যতমা মূর্তির প্রকাশ।

এই প্রকরণের অন্তিমে ব্রহ্মা বলছেন—'**পরাপরানাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী**'। এখানে পর—ব্রহ্মাদি, অপর—দেব মনুষ্যাদি। অর্থাৎ মা ! তুমি ব্রহ্মা এবং দেব-মনুষ্য এই উভয়েরই আশ্রয়-পূজ্যা, সুতরাং তুমিই সকলের পরমা বা সর্বশ্রেষ্ঠা, তুমিই পরমেশ্বরী। যারা তোমার পূর্বোক্ত ত্রিবিধ সৌম্য মূর্তির দর্শনে ধন্য হয়েছে, যাদের বুদ্ধি, প্রাণ ও মন সম্যক্‌ভাবে মাতৃযুক্ত হয়েছে তারাই দেখতে পায়—ব্রহ্মা হতে কীটাণু পর্যন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমারই সত্তায় সত্তাবান। তাদের নিকটই তুমি পরমেশ্বরী রূপে প্রত্যক্ষ হও। স্ব স্ব প্রকৃতিকে স্বাভিমানবশতঃ 'আমি', 'আমার' না ভেবে 'মা' বলে বুঝতে পারলে, সর্বভাবে মাতৃ-যোগে অভ্যস্থ হলে তখন আর ক্ষুদ্র জীবপ্রকৃতি থাকে না। তখন ওই প্রকৃতিই, জগৎবিধাত্রী দৈবী মহতী প্রকৃতিরূপে উপলব্ধ হয়।

সমস্ত উদ্দেশ্যের মূল কারণরূপা দেবী

ব্রহ্মার শরণাগতি (৮২—৮৪)

পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্‌বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে॥
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা।

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাত্যত্তি যো জগৎ॥
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৮২—৮৪)

সরলার্থ—পর ও অপর—সবের উপরে পরমেশ্বরী তুমিই। সুতরাং তোমার স্তুতি কীভাবে হতে পারে ? যেই ভগবান এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন, সেই ভগবানকেও যখন তুমি নিদ্রাবিষ্ট করে রেখেছ, তখন কে তোমার স্তব করতে সমর্থ ? আমাকে, ভগবান বিষ্ণুকে ও ভগবান রুদ্রকেও তুমিই শরীর গ্রহণ করিয়েছ। (৮২—৮৪)

মূলভাব—এই প্রকরণের প্রথম শ্লোকে ব্রহ্মা বলছেন — মা ! তুমি পরমাত্মারূপে দুরধিগম্যা কিন্তু তুমিই আবার প্রকৃতিরূপে মনুষ্যমাত্রেরই উপলব্ধিযোগ্যা। প্রকৃতিরূপিণী তোমার সেবা করলেই তোমার পরমেশ্বরী মূর্তি প্রকটিত হয়। যখন এ বোধ আসে যে সকলই আমার প্রকৃতি—আমারই আত্মা বা আমি ; স্তব্য, স্তোতা ও স্তুতি, সকলই আমি— তখন আর কে কার স্তব করবে। **'যদা সর্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কং পশ্যেৎ'** অর্থাৎ সর্বত্র আত্মদর্শন হলে কাকেই বা দেখবে, কেনই বা দেখবে। এইরূপ উপলব্ধি উপস্থিত হলে সেই মুহূর্তেই সর্ববিধ ক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে যায়। পূজ্য পূজক ভেদ থাকে না, এক হয়ে যায়। আমিত্বের মহাপ্রসারে জীবভাবের আমিত্ব ডুবে যায়। শুধু এক আনন্দময় সত্তা বিদ্যমান থাকে।

পরবর্তী শ্লোকে ব্রহ্মা বলছেন—হে মা ! যে প্রাণ হতে জগৎ জাত, যে প্রাণে জগৎ বিধৃত এবং যে প্রাণে সমস্ত জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী সেই প্রাণ বা বিষ্ণুশক্তিই যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন। আর তিনিই যখন জগৎ বীজ অর্থাৎ জন্ম-মরণের মূলীভূত সংস্কার পর্যন্ত দূরীভূত করতে বিমুখ, তখন কে আর তোমার স্তব করবে। আমি—ব্রহ্মা, প্রাণের অঙ্কে অবস্থিত মন মাত্র, বিষ্ণু (বা প্রাণের) সহায়তা ব্যতীত তোমার স্তব করার সামর্থ্যই বা কোথায়।

প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে ব্রহ্মা বলছেন—মা ! তুমিই তো জ্ঞান, প্রাণ ও মনরূপে প্রকটিত হয়ে শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা নামে অভিহিত হও। যখন তুমি

জীবভাবাপন্ন হয়ে সংস্কার রূপে আত্মপ্রকাশ করো তখন তোমার নাম হয় মন। এইরূপে প্রতিজীবের হৃদয়ে ব্যষ্টি চৈতন্যরূপে তুমি প্রাণ আর প্রতি জীবে নিয়ত প্রকাশমান বুদ্ধিরূপে তুমি জ্ঞান নামে অভিহিত। প্রতি জীবে অনুভূয়মান এই ব্যষ্টি মন, প্রাণ ও জ্ঞান একটি সমষ্টি বিরাট মন, প্রাণ ও জ্ঞানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদবুদ মাত্র। আর এই সমষ্টি মন, প্রাণ ও জ্ঞানই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে বর্ণিত যা অবশ্যই তোমারই বিশিষ্ট বিকাশমাত্র। এস্থলে উল্লেখ্য যে—ব্রহ্মা স্তব করতে করতে এমন স্তরে পৌঁছেছেন যে সেখানে তিনি সর্বময় মাতৃ-কর্তৃক দর্শন করে, সর্বভাবে মাতৃস্বরূপ উপলব্ধি করে, সর্বত্র মাতৃশক্তি অনুভব করে, ক্রমে স্তুতি থেকেও বিরত হয়েছেন।

আমাদের সাধনার ক্ষেত্রেও এইরূপ হয়। সাধক দ্বৈত বোধ নিয়ে, জীব ও ঈশ্বর ভাব নিয়ে অগ্রসর হয় কিন্তু ক্রমে দ্বৈতানুভূতি বিলোপ পেয়ে আত্মানুভূতিমাত্র বিদ্যমান থাকে।

মধু-কৈটভ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ব্রহ্মার আর্তি (৮৫—৮৭)

কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা॥
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ।
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু॥
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৮৫—৮৭)

সরলার্থ— কাজেই তোমার স্তুতি করার মতো শক্তি কার আছে ? হে দেবি ! তুমি তো নিজের এই উদার প্রভাবের দ্বারাই প্রশংসিত।

এই যে দুই দুর্জয় অসুর মধু ও কৈটভ এদের তুমি মোহগ্রস্ত করে দাও এবং জগদীশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে শীঘ্রই জাগরিত করে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে এই মহাসুরকে বধ করবার জন্য তাঁর প্রবৃত্তি উৎপাদন করো। (৮৫—৮৭)

মূলভাব— স্তুতির অন্তিমে ব্রহ্মা তাঁর প্রার্থনাসূচক স্তবে বলছেন— মা !

এতদিনে বেশ বুঝতে পারছি, তোমার স্তব সাধনা তুমিই করো। তোমার অতি উদার প্রভাব, অলৌকিক মহত্ত্বের গাথা, অনির্বচনীয় মহতী শক্তি, অনন্ত স্নেহের নির্ঝর রহস্য যদি তুমি নিজে না বর্ণনা করো, নিজে নিজেকে প্রকাশিত না করো—নিজ ইচ্ছা করে ধরা না দাও, তবে কারও সাধ্য নেই যে তোমাকে ধরতে বা বুঝতে পারে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূঁ স্বাম্॥

কঠোপনিষদ্(১।২।২৩)

উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন, বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি অথবা বহু শ্রবণ দ্বারাও পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। তিনি যাকে বরণ করেন বা যোগ্য মনে করেন তার নিকটই তিনি প্রকাশিত (অনুভূত) হন।

ব্রহ্মা বিশ্বেশ্বরী স্তুতির শেষে মায়ের কাছে তিনটি প্রার্থনা করেছেন।

প্রথমটি মধু-কৈটভের মোহ সৃষ্টি করো।

দ্বিতীয়টি বিষ্ণুকে জাগরণ করো।

তৃতীয়টি হল জগৎকর্তা বিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ করো যাতে তিনি অসুরদ্বয়কে নিহত করেন।

কার্যত এই তিনটি প্রার্থনা পূরণ না হলে, এই দুর্জয় অসুর বিনাশ কখনই সম্ভব নয় কারণ তিনি 'অসুররূপেও মা' আবার 'মহাদেবীরূপেও মা'। মায়ের এই আসুরী প্রকৃতি যদি স্বেচ্ছায় আত্মনিধন না চায় তবে কারো সাধ্য নাই তাকে নিধন করে।

যোগিগণ যে সমাধি হতে বারংবার উত্থিত হন তার কারণ হল ওই যোগনিদ্রা, এ মধু-কৈটভ। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে মা ও জগৎ— উভয়েই থাকুক। এই যে বহু হওয়ার সাধ, এই যে বহুত্বের ক্রীড়া ইহাই আমাদের উৎপীড়িত করে, আমাদের স্থির হয়ে তোমার সৌম্যমূর্তির জগদাতীত সৌন্দর্য ভোগ করতে দেয় না। কিন্তু মা ! তুমি তো সর্বগ্রাসিনী, সকল একা গ্রাস না করে তোমার তৃপ্তি নেই। তবে তুমি কেন বহুত্বরূপ মধু-কৈটভ (মোহসৃষ্টি) গ্রাস করছ না। ব্রহ্মার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই অসুর-পীড়ন প্রাণে ফুটিয়ে, প্রাণের দ্বারাই অসুর নিধন করাও, সম্যক্‌ভাবে নিজেতে মিলিয়ে নাও। প্রাণশক্তি সম্যক্‌ভাবে

উদ্বুদ্ধ না হলে মাতৃলাভ হয় না। আর ব্রহ্মার তৃতীয় প্রার্থনা, বিষ্ণুকে মধু-কৈটভ বধ করতে প্ররোচিত করো। আর মাতৃ মিলনের অভিলাষ পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হলে তবেই না প্রাণ (বিষ্ণু) জগদ্ভাবকে বিমথিত করতে উদ্যত হন।

দেবীর প্রার্থনা পূরণ (৮৯—১০৪)

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ॥
নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥
উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দনঃ।
একার্ণবেঽহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ॥
মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্যপরাক্রমৌ।
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ॥
সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ॥
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ।
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্॥

শ্রীভগবানুবাচ

ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম॥

ঋষিরুবাচ

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্বমাপোময়ং জগৎ।
বিলোক্য ত্যাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ॥
আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা॥

ঋষিরুবাচ

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা।
কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ॥
এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্।

প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে॥ ঐং ওঁ ॥
(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৮৯—১০৪)

সরলার্থ—ব্রহ্মা যখন মধু আর কৈটভকে বধ করবার উদ্দেশ্যে ভগবান বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা থেকে জাগাবার জন্য তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যোগনিদ্রার এই রকম স্তুতি করলেন, তখন সেই দেবী যোগনিদ্রা ভগবান বিষ্ণুর চোখ, মুখ, নাক, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল থেকে নির্গত হয়ে অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হলেন। যোগনিদ্রা ভেঙে যাওয়ার পর জগন্নাথ ভগবান জনার্দন একীভূত মহাসমুদ্রে অবস্থিত অনন্তশয়ান থেকে জেগে উঠলেন।

গাত্রোত্থান করে তিনি ওই দুই অসুরকে দেখলেন। তারা দুরাত্মা, অতি বলবান ও মহাবিক্রমশালী এবং ক্রোধে আরক্ত নয়নে ব্রহ্মাকে ভক্ষণের উদ্যোগ করছিল।

অতঃপর ভগবান শ্রীহরি শয্যা ছেড়ে উঠে ওই দুই অসুরের সাথে পাঁচ হাজার বছর ধরে বাহুযুদ্ধ করলেন, ওরা দুজনও অত্যন্ত বলদর্পিত হয়েছিল। এদিকে দেবী মহামায়াও তাদের বিমোহিত করে রেখেছিলেন ; ফলে তারা ভগবান বিষ্ণুকে বলল—'আমরা তোমার বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি আমাদের কাছে বর প্রার্থনা করো।'

শ্রীভগবান বললেন—তোমরা দুজনে যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাক, তবে তোমরা আমার হাতে বধ্য হও। ব্যস্, এইই আমার একান্ত অভিপ্রায়। অন্য বরের আর কী প্রয়োজন ?

মেধা ঋষি বললেন—এইভাবে প্রবঞ্চিত হয়ে যখন তারা সমস্ত জগৎ জলমগ্ন দেখল, তখন কমলনয়ন ভগবানকে বলল—পৃথিবীর যে জায়গাটা জলমগ্ন হয়নি যেখানে শুকনো জায়গা আছে, সেইস্থানে আমাদের বধ করো।

মেধা ঋষি বললেন—শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান বিষ্ণু 'তাই হোক' বলে ওদের দুজনের মাথা দুটি নিজের ঊরুর ওপর রেখে চক্র দিয়ে ছেদন করলেন।

এইভাবে এই দেবী মহামায়া ব্রহ্মা-কর্তৃক সংস্তুতা হয়ে স্বয়ং আবির্ভূতা

হয়েছিলেন। আমি আবার তোমাদের কাছে এই দেবীর মহিমা বা আবির্ভাবের বিষয় বর্ণনা করছি, শোনো॥ (৮৯-১০৪)

মূলভাব—ব্রহ্মার কাতর প্রার্থনায় মহামায়া তামসীমূর্তিতে আবির্ভূতা হলেন। মহামায়ার জগৎমুখী বিকাশের নাম 'অপরা প্রকৃতি' এবং পরমাত্মাভিমুখী বিকাশের নাম 'পরা প্রকৃতি'। নিদ্রা, আলস্য, প্রমাহ, মোহ প্রভৃতি অপরা প্রকৃতির বহুগুণের ধর্ম। অপরা প্রকৃতি সর্বনিম্নে আর পরা প্রকৃতির শুরুতে তমোগুণ। আর তার ওপরে অপরা প্রকৃতির সত্ত্বগুণ উভয়ের সন্ধিস্থল। আবার মধু ও কৈটভ সত্ত্বগুণ হতেই সঞ্জাত, তাই তাদের (অর্থাৎ বহুভাবেচ্ছা ও তন্মূলক আনন্দরূপ অসুর ভাবকে) নিধন করতে ব্রহ্মা, মায়ের পরা প্রকৃতিরূপা তামসী মূর্তিরই আবাহন করেছেন আর প্রার্থনা করেছেন সত্ত্বগুণী বিষ্ণুর জাগরণের।

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৮৯)

মধুকৈটভ অতি বলোন্মত্ত অসুর, কারণ **'সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়'** এই যে বহুভাবের ইচ্ছা—সংস্কার, এই ইচ্ছা ব্রহ্ম হতে সঞ্জাত, তাই অতি প্রবল। আর 'বহুভাবে প্রকাশিত আমি আবার এক হব' এই ইচ্ছাটি জীবভাবীয় সংস্কার হতে সঞ্জাত, সুতরাং অতি দুর্বল। দুর্বল কর্তৃক প্রবলের উচ্ছেদ অসম্ভব, তাই মহামায়া মা আমাদের যদি না স্বয়ং আত্মস্বরূপ প্রকটিত করে ওই অসুরদ্বয়কে বিমোহিত করেন তবে এদের নিধন অসম্ভব।

ব্রহ্মার স্তবে বিশেষ পরিতুষ্টা হয়ে মহামায়া মা, বিষ্ণুর যোগনিদ্রা-মূর্তি পরিত্যাগ করলেন। তখন নিদ্রামুক্ত জগন্নাথ জেগে উঠলেন। এখানে দেবতারা স্তুতি করে বলছেন—**'পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ'** (১।৯৪ পূর্বার্ধ) অর্থাৎ জীবের মৌলিক উপাদান-স্বরূপ এই দুই সংস্কার অতি প্রবল ঈশ্বরভাবীয় অবস্থা বিশেষ। সুতরাং জীবকে নিজ শক্তি বলে উহার বিনাশ সাধন করতে হলে 'পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি' অর্থাৎ অতি দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাস ও বৈরাগ্যের শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। পাতঞ্জলযোগেও দীর্ঘকাল সাধনা করে

দৃঢ়ভূমি প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। **'স তু দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য সৎকারাঽঽসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ'** সাধক কখনো সাধনের প্রতি অধৈর্য হবে না, আলস্য দেখাবে না, নিরন্তর সাধনা করবে এবং তবেই আকাঙ্ক্ষিত সাধনভূমি লাভ করবে (যোগ ১।১৪)। সাধক দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে অভ্যাস কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। অভ্যাসকালের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা রাখবে না ও একে আজীবন লালন করবে। পাতঞ্জলযোগ এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও অভ্যাসের অতি মহত্ত্বর কথা বলা হলেও এটা তাঁর কৃপা আকর্ষণের একটি পথ মাত্র। কিন্তু যতদিন মা আমাদের—জীবের মোহনিদ্রা ভাঙিয়ে না দেন, যতদিন প্রবোধরূপে প্রকাশিত না হন, যতদিন না আমাদের আসুরিক সংস্কারসমূহের বিনাশের ইচ্ছা না করেন, ততদিনই জীব জগতের ধুলো গায়ে মেখে, নশ্বর সুখে মুগ্ধ থেকে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে।

আবার জীব যখন সর্বভাব আত্মাতে আর আত্মাতে সর্বভাব দর্শন করে—তখন অজেয় অসুর স্বেচ্ছায় আপন মৃত্যু চেয়ে নেয়।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ (গীতা ৬।২৯)

এই স্থিতি যোগীর তখনই আসে যখন তিনি নিজ স্বরূপকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে নিজ স্বরূপে দর্শন করেন। এইভাবে যোগযুক্ত আত্মার যথার্থ মুমুক্ষুভাব প্রাণে (বিষ্ণু) বিকাশ পেলেই, অসুরের নিকট প্রার্থনা করা যায়—'তোমরা আমার বধ্য হও'। আমি—'অহং' ভাবরূপী আমিত্ব ও বহুত্ব হবে এই সংস্কাররূপী অসুর যে তোমার ইচ্ছাতেই সৃষ্ট হয়েছিল তা যেন আবার মাতৃমূর্তিতে চিরতরে বিলীন হয় এই একমাত্র প্রার্থনা। 'মা'র শরণাগত হলে বন্ধনও সাধন হয়, আসক্তি হয় মোক্ষ আর অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে।

ভগবান বিষ্ণু যাদের বিনাশ করতে উদ্যত সেই অসুরদ্বয় তখন তাঁকে দেখছেন—'ভগবান্ কমলেক্ষণ' বলে অর্থাৎ ভগবান তুমি অতি প্রিয়দর্শন। তাঁরা বিষ্ণুর নিকট যা প্রার্থনা করলেন তা আরো মনোহর। **'আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা'** অর্থাৎ তখন অসুরদ্বয় সর্বসৃষ্টিকেই রসময়

দেখছেন এবং বুঝছেন তাঁরা এই রসসমুদ্রের তরঙ্গমাত্র। বিষ্ণু যখন তাদের ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন তখন তাঁদের আর তরঙ্গরূপে বিকশিত হতে হবে না, একেবারে সমুদ্রেই মিলিয়ে যাবেন। তাই তাঁরা বলছেন **'ন উর্বী (পৃথিবী) সলিলেন পরিপ্লুতা'** অর্থাৎ যেখানে সলিল পরিপ্লুতা পৃথিবী নেই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন সলিল আছে মানে নিরবচ্ছিন্ন রস বা আনন্দ আছে, সেইখানেই তাঁদের নিধন করতে বা আনন্দ সাগরে ডুবিয়ে দিতে। তাঁরা আর বহুরূপে থাকতে চান না, সেই **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'** যেখান থেকে এসেছে সেইখানেই ফিরে যেতে চায়। ধন্য তাঁদের প্রার্থনা।

প্রকরণের অন্তে মেধস ঋষি বর্ণনা করেছেন ভগবান বিষ্ণু কীভাবে মধু-কৈটভ নিহত করছেন ? **'চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ'** (১।১০৩) অর্থাৎ বিষ্ণু মধু-কৈটভের মস্তকদ্বয় স্বীয় জঘন দেশে (ঊরুতে) স্থাপনপূর্বক চক্র দ্বারা তা ছিন্ন করলেন। **'মহীতলং তজঘনে'** অর্থাৎ বিষ্ণুর জঘনই হল মহীতল আর মহামানে ক্ষিতিতত্ত্বই হল জড়ের শেষ পরিণতি যা মনুষ্যদেহ। এই দেহই হল সাধনার ক্ষেত্র। যা ছাড়া জড়-চৈতন্যের ভেদ উপলব্ধি হয় না। এ হতেই ভোগ আর এ হতেই অপবর্গ লাভ হয়। মনুষ্যের কণ্ঠের উপরিভাগ জ্ঞান বা চিৎ ক্ষেত্র আর নিম্নভাগ জড় ক্ষেত্র। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, আস্বাদন, দৃষ্টি ইন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় (স্পর্শ যা অধর-ওষ্ঠেই প্রধানভাবে পরিব্যক্ত) সবই কণ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত।

আর এই চিৎ ও জড়-মিলনের নামই জীব। আর এদের বিচ্ছেদ করাই জীবত্বরূপ—বন্ধন হতে বিমুক্তি।

জড়ের সংমিশ্রণে চৈতন্য তার স্বকীয় শুদ্ধভাবকে আচ্ছাদিত করে, সে জীবভাবে পরিব্যক্ত হয় এবং এই জীবভাব হতে চৈতন্যকে মুক্ত করাই হল সর্ববিধ সাধনার উদ্দেশ্য।

———o———

মহিষতন্ত্রী-স্তুতি (দেবতাগণের স্তব)

(মহিষাসুর বধ—চতুর্থ অধ্যায়)

প্রাক্‌কথন

এই শ্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে আছে মহিষাসুর বধ আখ্যান আর তৎপরে আনন্দোৎফুল্ল ও কৃতজ্ঞ দেবতাদের স্তব 'মহিষতন্ত্রী স্তুতি'। যখন মহিষ অসুরগণের রাজা আর পুরন্দর (ইন্দ্র) দেবতাগণের রাজা তখন দেবাসুর সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল। মহিষাসুর রজোগুণের প্রতীক। গীতায় আছে—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌॥ (গীতা ৩।৩৭)

অর্থাৎ ভগবান বললেন—রজোগুণ হতে উৎপন্ন কামনা ও তার থেকে উদ্ভূত ক্রোধই হল পাপের কারণ। এই রজোগুণ কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং মহাপাপের কারণ। একে নিত্যশত্রু বলে জানবে। তন্ত্রে মানসপূজা বিধানেও কথিত আছে '**ক্রোধঞ্চ মহিষং দদ্যাৎ**' অর্থাৎ ক্রোধকে মহিষরূপে কল্পনা করে দেবীর উদ্দেশে বলিদান করবে। কেবল ক্রোধই নয়, সমগ্র রজোগুণের বহির্মুখী বিকাশসমূহই অসুরভাব। যাবতীয় কামনা, বাসনা এবং গীতোক্ত দম্ভ দর্প অভিমান আদি আসুরীসম্পদ, রজোগুণের মূল বিকাশমাত্র। রজগুণরূপী মহিষাসুর হল এ সকলের অধিপতি।

আবার অন্যদিকে রজোগুণের অন্তর্মুখী বিকাশসমূহই দেবতা। পুরন্দর (ইন্দ্র) ইহার অধিপতি। পুরকে অর্থাৎ নবদ্বারবিশিষ্ট দেহকে যিনি ধ্বংস করেন তিনিই পুরন্দর। এই দেহাত্মবোধ বিলয় করে, দেহত্রয়াতীত পরমসত্তায়, মাতৃ-অঙ্কে মিলিত হওয়ার যে প্রয়াস তাই পুরন্দর নামে অভিহিত। ইনি দেবগণের অধিপতি। সমস্ত দেবশক্তি, যেমন অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, দান, দম, শম, তিতিক্ষা আদি যাবতীয় দেবভাবই পুরন্দরের অনুবর্তী।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যমচরিতে যে সকল অসুরের বর্ণনা আছে তারা হল—**মহিষাসুর** অসুরগণের অধিপতি এবং তার সঙ্গে চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, করাল, উদ্ধত, বাস্কল, তাম্র, অন্ধক, উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য, মহাহনু, বিড়াল, দুর্দ্ধর, দুর্মুখ ও অসিলোমা আদি ষোলোজন প্রধান অসুর হলেন সেনাপতি।

এই ষোলোজন অসুর ষোলোটি রজোগুণের প্রতীক যেমন রজোগুণ, বিক্ষেপ, আবরণ, দর্প, ভয়, দম্ভ, ভোগবিলাস, লোভ, মোহ, ক্রোধ, শারীরিক বল, অভিমান, দেবদৃষ্টি, অক্ষমা, নিষ্ঠুরতা ও দ্বেষ।

রজোগুণের দুই দিক। অন্তর্মুখী চরম পরিণতির নাম পর-বৈরাগ্য বা মোক্ষ। অপরদিকে বহির্মুখী 'মন' বা বিষয়-ক্রিয়াশীলতার' অপর নাম ভোগাশক্তি। পর-বৈরাগ্যের স্বরূপ সর্বস্ব ত্যাগ যেমন দেহ, মন ইন্দ্রিয় আদি সকলই পরিত্যাগ। আর ভোগাসক্তির স্বরূপ হল—সর্বস্ব গ্রহণ। পুরন্দর (ইন্দ্র) চায় মোক্ষ, মহিষ চায় ভোগ। যতদিন মোক্ষ বাসনা প্রকট না হয়ে উঠবে, ততদিন মহিষকর্তৃক পুরন্দর নির্জিত হবেই।

এই স্তুতিটি বর্ণিত হয়েছে চণ্ডীগ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম সাতাশটি শ্লোকে (১—২৭)। কাব্যাংশে স্তুতিটি অতি নিরুপম। প্রথম শ্লোকটিতে আছে দেবতাদের কথা যাঁরা দেবীর আরাধনা করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে। দেবতাদের মনের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা কীভাবে তাঁদের সত্তায় ফুটে উঠেছে তা প্রথম মন্ত্রের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। স্তবটিতে স্তুতিরত দেবতাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

(১) **প্রণতিনম্র শিরোধরাংসা** (২) **প্রহর্ষ পুলকোদ্গম চারুদেহাঃ** আর (৩) **বাগ্‌ভিঃ**।

প্রথম স্তবটিতে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক—এই ত্রিবিধ স্তুতিরই বর্ণনা আছে। **প্রণতিনম্র শিরোধরাংসা** অর্থাৎ দেবতারা এইভাবে প্রণত হয়েছেন যে তাঁদের শিরাধরা (গ্রীবা) এবং অংসদ্বয় (স্কন্ধ—বাহুমূল) সম্যক্ অবনত হয়ে পড়েছে ফলে সমস্ত দেহই অবনত দেখাচ্ছে। এই হল কায়িক স্তুতি বা সাষ্টাঙ্গ প্রণতি।

মা হচ্ছেন আমাদের অনন্ত জন্ম-মরণের একমাত্র সাথী। তাঁহার মহতী শক্তির কথা স্মরণ হলেই সন্তানের দেহ অবনত হয়ে পড়ে, শরীর আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে, অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। এই হল মানসিক স্তুতির লক্ষণ—'**প্রহর্ষপুলকোদগম**'।

উচ্চৈঃস্বরে জপ ও মনে মনে স্তব—এ উভয়েই শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাই দেবতারা

বাক্ দ্বারাও মায়ের কীর্তন করছেন, যদিও মা মন ও বাক্যের অগোচরা, তবুও চণ্ডী বলছেন—**বাগভিঃ তুষ্টুবুঃ**। বৈদিক শব্দগুলি যেন প্রাণ দিয়ে গঠিত। কায়, মন, বাক্য তিনটিই যেন এক সুরে বাজে। আধুনিক কালের কৃত স্তোত্রাদি অপেক্ষা ঋষিগণ প্রবর্তিত মন্ত্র বা স্তবের শক্তি তাই অনেক বেশি। ওই প্রণতি, পুলক ও স্তব যত বেশি হৃদয়ে স্ফুরিত হবে তত জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মর অনুশীলন হতে থাকে। আর মায়ের স্বরূপ যত হৃদয়ঙ্গম হবে, মায়ের 'মহত্ত্ব' যত বেশি উপলব্ধি করবে, ততই জীবভাব নত হয়ে আসবে।

এ হল জ্ঞানের ফল, আর এরই বহির্লক্ষণ হল প্রণতি।

আর পরম প্রেমময়ী মায়ের স্বরূপ বুঝতে পারলে, তাঁর প্রতি স্বতঃই 'ভালোবাসার' ভাব সঞ্চিত হয়। এ হল ভক্তি আর এর বহির্লক্ষণ হল—পুলক, অশ্রু, কম্প ইত্যাদি।

এরপর যে পরিমাণে ভক্তিভাব পরিপুষ্ট হতে থাকে সেই পরিমাণে মায়ের প্রীতি সাধনের জন্য বৈধ কর্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় এবং তাই পূজা, জপ, তপ, স্তোত্র, পরোপকার বা বিশ্বহিতে প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পায়।

দেবীর এই স্তুতিটি ৫টি প্রকরণে স্তুত—

জগন্মাতার তত্ত্ব ও মহিমা	২—৪
দেবীর স্বরূপ বর্ণনা	৫—১১
দেবীর বিভূতি বর্ণনা	১২—১৩
দেবীর কৃপা বর্ণনা	১৪—২১
দেবীর প্রতি প্রার্থনা	২২—২৭
দেবীর নিকট দেবতাদের বর প্রার্থনা	৩১—৩৭

জগন্মাতার তত্ত্ব ও মহিমা বর্ণনা (২—৪)

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্‌গমচারুদেহাঃ ॥ ২

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা ।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষি- পূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥ ৩
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥ ৪
(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।২—৪)

সরলার্থ—অতিবলশালী দুরাত্মা মহিষাসুর এবং তার দৈত্যসেনারা দেবী কর্তৃক বিনষ্ট হলে ইন্দ্রাদি দেবতারা সব প্রণামের জন্য গ্রীবা ও স্কন্ধ আনত করে উত্তম বাক্যে দেবীর স্তুতি করতে লাগলেন। সেইসময় তাঁদের সুন্দর অঙ্গ আনন্দের আতিশয্যে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল॥ দেবতারা বললেন—সমস্ত দেবতাদের শক্তিপুঞ্জের ঘনীভূত মূর্তি যে দেবী স্বীয় শক্তিতে সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণ পূজিতা সেই জগদম্বাকে আমরা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি। তিনি আমাদের মঙ্গল করুন ভগবান শেষনাগ, ব্রহ্মা ও শিব যাঁর অনুপম প্রভার ও শক্তির বর্ণনা করতে সক্ষম নন, সেই ভগবতী চণ্ডিকা সমগ্র জগৎ পালন ও অশুভভীতি নাশ করার ইচ্ছা করুন। (৪।২—৪)

মূলভাব—প্রকরণের শুরুতেই দেবতারা মাকে বর্ণনা করেছেন **'ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা'** অর্থাৎ মা! তুমিই আত্মশক্তি দ্বারা এই জগদময় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ। আত্মারূপী মা তুমি যখন শক্তিরূপে প্রকাশিত হও তখনই তো এই জগৎ ফুটে ওঠে। মা! তোমার স্বরূপের কত না বর্ণনা 'আত্মা ও শক্তি' 'আত্মার শক্তি', 'আত্মার সহিত শক্তি', 'যেই আত্মা সেই শক্তি' ইত্যাদি ইত্যাদি। মা ধন্য তোমার লীলা! তুমি নিজেকে ব্যক্ত করতে গিয়ে, আমাদের অজ্ঞানতার ভান দূর করতে গিয়ে কতই না লীলা করছ। কিন্তু মা! তুমি আত্মা, একমাত্র তুমিই তো 'আমি'র যথার্থ স্বরূপ। ওই একটা আমিই প্রতি জীবে, প্রতি

পরমাণুতে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত। ওই এক আমিই তো জীবরূপী বহু আধারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বহু আমির ভান করছি। **ওই সমষ্টি 'আমি'র নাম আত্মা আর বহুর মধ্যে প্রকাশিত হওয়াটাই তাঁর শক্তি**। এর কত নামগত ভেদ। ব্রহ্ম-মায়া, পুরুষ-প্রকৃতি, শিব-দুর্গা, কৃষ্ণ-রাধা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ওই শক্তিমান ও শক্তির (বস্তুতঃ অভিন্ন হলেও) ভেদের উপাচার করা হয়। যতক্ষণ দেহ আছে, জগৎ আছে, সাধনা আছে, ততক্ষণ সব এক অদ্বৈত হলেও দ্বৈতরূপে প্রতীত হয়। সর্বত্রই ওই প্রত্যেক জীবে, প্রত্যেক জীবাণুতে ওই আত্মশক্তি—ওই হর-গৌরী মূর্তি! রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রকাশমান।

দেবতারা স্তুতিতে দেবীকে আরো বলছেন— **'নিঃশেষদেবগণশক্তি-সমূহমূর্ত্যা'**—মা! আত্মশক্তিরূপে তুমি জগৎময় পরিব্যাপ্ত রয়েছ, এ তোমার সাধারণ মূর্তি। এ মূর্তি আমরা দেখেও দেখি না, বুঝেও বুঝতে চাই না। তাই তুমি সন্তান-স্নেহে বিহ্বলা হয়ে, মধ্যে মধ্যে আমাদের মন তোমার দিকে আকর্ষিত করার জন্য, তুমি অসাধারণ মূর্তিতে—স্ব স্ব ইষ্টমূর্তিতে আবির্ভূত হও। তোমার এই এইরূপ দেবগণের শক্তিসমষ্টি দ্বারা বিরচিত। মহিষাসুর-নিধন উদ্দেশ্যে তুমি এইরূপ বিশিষ্ট মূর্তিতেই আত্মপ্রকাশ করেছ।

মানুষের বোধ তিনস্তরে কাজ করে। যতক্ষণ জীবশক্তি বোধ থাকে ততক্ষণ মানুষ অজ্ঞান। অর্জন, রক্ষণ, ব্যয়, ভোগ, পাপ, পুণ্য, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা এ সবই যেন 'আমি করি' এই জীবভাবীয় অভিমানে সমস্ত শক্তিকে আত্মসাৎ করতে প্রয়াস পায়।

তারপর পুনঃ পুনঃ দৈব প্রতিকূলতা আসলে তার সেই অজ্ঞান বা অহংকার চূর্ণ হতে থাকে আর দেবশক্তির ওপর বিশ্বাস আরম্ভ হয়। তখন সে বুঝতে পারে—শক্তি মাত্রই দেবতা। এর নাম জ্ঞান। ইহাই বোধের দ্বিতীয় স্তর। এবং অবশেষে যখন ওই দেবশক্তি সমষ্টিভাবাপন্ন হয়ে অখণ্ডভাবে প্রকাশিত হয়, যখন জীব পূর্ণভাবে আত্মদর্শন করে, আত্মশক্তির সন্ধান পায় তখন সে কী আনন্দ! কী পরিতৃপ্তি! মায়ে আত্মহারা হলে সাধক দেখতে পায় জগদরূপে **'আমিই'** অভিব্যক্ত। ওই চন্দ্র সূর্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী প্রতিনিয়ত আমারই আরতি করছে। আমারই ভয়ে গ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষ হতে বিচ্যুত না হয়ে অনাদিকাল থেকে

বিচরণ করছে। বায়ু আমারই ভয়ে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হচ্ছে। এই সব স্রোতস্বিনী প্রতিদিন আমারই অঙ্গ প্রক্ষালিত করছে। কুসুমরাশি আমারই পূজার জন্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। আমি ছাড়া কোথাও কিছু নেই। সকলই আত্মা। সকলই শক্তি। সকলই মা।

দেবতাদের স্তুতিতে আরো বলছেন— হে অখিল দেব মহর্ষিগণের পূজনীয়া মা ! তোমাকে **'ভক্ত্যা নতাঃ স্মঃ'** অর্থাৎ ভক্তিপূর্বক প্রণাম করছি। কিন্তু ভক্তি ! সে কোথায় পাব মা। সেও তো তুমি। তোমাকে আত্মা বলে বুঝতে না পারলে, আত্মদান না করলে, তুমি তো ভক্তিরূপে প্রকাশ করই না মা। মা ! ভক্তি তো আমাদের নাই। তাই তোমাকে বারংবার প্রণামই জানাই। অর্জুনও গীতায় ভগবানকে স্তুতি করে বলছেন— **'নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভুয়োঽপি নমো নমস্তে'** (গীতা ১১।৩৯)।

শ্লোকটির অন্তিমে দেবতারা বলছেন— **'বিদধাতু শুভানি সা নঃ'** অর্থাৎ আমাদের মঙ্গল বিধান করো। আমার একার নয়, আমাদের সকলের (নঃ), বিশ্বময় সকলেই তোমার মঙ্গল আশীর্বাদ লাভ করুক, বিশ্বের অমঙ্গল দূর হোক।

প্রকরণের পরের শ্লোকে মার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবতাগণ বলছেন —সহস্র শীর্ষ অনন্তদেব, চতুরানন ব্রহ্মা আর পঞ্চানন হরও তোমার অতুলনীয় প্রভাব ও বলের বিষয় বাক্য দ্বারা নির্দেশ করতে পারে না। তোমাতে সম্পূর্ণরূপে না মিলতে পারলে, তোমার মহত্ত্ব কিছুতেই উপলব্ধি হয় না। আবার বাক্য ও মন থাকতে তোমাতে মিলিত হওয়াও যায় না। মা ! তুমি যে মনোবাণীর অগোচর। তুমি কৃপা না করলে আমাদের এই বোধ আসবে কোথা থেকে ?

শ্লোকটির অন্তিমে মা চণ্ডিকাকে এই স্তুতি করে বলা হয়েছে— **'অখিল জগৎ পরিপালনায় অশুভভয়স্য নাশায় চ মতিং করোতু'** অর্থাৎ হে মাতা ! এই অখিলজগৎকে পরিপালন ও অশুভভয় বিনাশের উপযোগিনী বুদ্ধি তুমি কৃপা করে প্রেরণ করো। এখানে অশুভ শব্দের অর্থ মৃত্যু, আর তজ্জন্য যে ভয় তাকেই বলে অশুভ ভয়। এই জগৎ সর্বদা মৃত্যু ভয়ে ভীত। আর আমাদের মৃত্যুভয়ের ভীতির কারণ, আমাদের বুদ্ধি প্রতিনিয়ত বহুত্ব দ্বারা স্পন্দিত। আর

কেবল এরই জন্য আমরা মৃত্যু থেকে মৃত্যুর কবলে আত্মাহুতি দিই। সর্বভূতে যে অমৃতস্বরূপিনী তুমিই আছ, এটা না বুঝে আমরা বহুত্বের দিকে ছুটি আর বার বার মৃত্যুযাতনা ভোগ করি। মা ! এবার আমাদের মতি যেন নিয়ত তোমাতেই থাকে।

দেবীর স্বরূপ বর্ণনা (৫ — ১১)

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥ ৫

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাদ্ভুতানি
সর্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু॥ ৬

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥ ৭

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ॥ ৮

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ-
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥ ৯

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদগীথরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্তা চ র্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী॥ ১০
মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা॥ ১১

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।৫—১১)

সরলার্থ—যিনি স্বয়ংই পুণ্যবানদের গৃহে লক্ষ্মীরূপে, পাপীদের গৃহে দারিদ্র্যরূপে, শুদ্ধ অন্তঃকরণ ব্যক্তিদের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে, সৎব্যক্তিদের মধ্যে শ্রদ্ধারূপে এবং সদ্বংশজাত মানুষদের লজ্জারূপে নিবাস করেন, সেই ভগবতী দুর্গাকে আমরা প্রণাম করি। দেবি ! আপনি এই সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালন করুন॥ ৫ ॥ হে দেবি, আপনার এই অচিন্ত্য রূপ, অসুরবিনাশী অসীম মহাবীর্য এবং সমস্ত সুরাসুরের সমক্ষে সংগ্রামে প্রকাশিত আপনার এই অত্যদ্ভুত আচরণসমূহ আমরা কীভাবে বর্ণনা করব ? ॥ ৬ ॥ আপনি সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ। আপনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা তা সত্ত্বেও বিকারাদি দোষের সাথে আপনার কোনও সংস্পর্শ নেই। ভগবান বিষ্ণু এবং মহাদেবাদি দেবতারাও আপনার অন্ত জানেন না। আপনিই সকলের আশ্রয়, এই সমগ্র জগৎ আপনারই অংশভূত ; কারণ আপনি সকলের আদিভূতা অব্যাকৃতা পরা প্রকৃতি ॥ ৭ ॥ হে দেবি ! যাঁর উচ্চারণে সব রকম যজ্ঞে সমস্ত দেবতারা তৃপ্তিলাভ করেন, সেই স্বাহামন্ত্রও আপনি। এছাড়া পিতৃগণের তুষ্টির কারণও আপনি, সেইজন্যই সকলে আপনাকে স্বধাও বলে থাকে॥ ৮ ॥ হে দেবি ! মোক্ষপ্রাপ্তির যে সাধন, আপনি সেই অচিন্ত্য মহাব্রতস্বরূপা, সমস্ত দোষরহিত, জিতেন্দ্রিয়, তত্ত্বনিষ্ঠ, মোক্ষাভিলাষী মুনিগণ যা অভ্যাস (সাধন) করেন, সেই ভগবতী পরাবিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) আপনিই॥ ৯ ॥ শব্দব্রহ্মরূপা, বিশুদ্ধ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং উদাত্তাদি স্বর ও

মধুর পদোচ্চারণবিশিষ্ট সামবেদেরও আশ্রয়স্বরূপা আপনিই। আপনি দেবী, ত্রয়ী (বেদত্রয়রূপা) ও ভগবতী (ষড়ৈশ্বর্যময়ী)। এই বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রতিপালনের জন্য আপনিই বার্তা (কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্যাদি কৃষিস্বরূপা) রূপে প্রকাশিতা। আপনি সমগ্র বিশ্বের দুঃখহারিণী॥ ১০ ॥ দেবি ! যাঁর কৃপায় সকল শাস্ত্রের সার জানতে পারা যায়, সেই মেধাশক্তি আপনিই। আপনি দুর্গম ভবসাগর পার হবার তরণী, দুর্গাদেবীও আপনিই। কোনো কিছুতেই আপনার আসক্তি নেই। কৈটভারি ভগবান বিষ্ণুর বক্ষনিবাসিনী ভগবতী লক্ষ্মী এবং ভগবান চন্দ্রশেখরের দ্বারা সম্মানিতা গৌরীদেবীও আপনিই॥ ১১ ॥

মূলভাব—দেবতারা এই প্রকরণে দেবীর ২১টি স্বরূপের স্তুতি করেছেন।

শ্রী— মা ! যাঁরা সুকৃতিশালী তাহাদের ভবনে তুমি 'শ্রী' অর্থাৎ নিত্য ঐশ্বর্যরূপে বিরাজিতা। কেবল ধনরত্নাদিকে ঐশ্বর্য বলে না, ইচ্ছার অনভিঘাতই হল যথার্থ ঐশ্বর্য।

অলক্ষ্মী— আবার যারা পাপাত্মা— পাপবুদ্ধি, তাদের হৃদয়ে তুমি 'অলক্ষ্মী'রূপে বিরাজিতা। অলক্ষ্মী হল অনৈশ্বর্য অর্থাৎ ইচ্ছার অভিঘাত, ইচ্ছার প্রাবল্য, নিত্য অসন্তোষ।

বুদ্ধি— তন্ত্রে ঐশ্বর্য-অনৈশ্বর্য, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান আদি আটটি পীঠ-দেবতার পূজা বিধান দেখা যায়। এই আটটিই বুদ্ধির ধর্ম। বুদ্ধি নির্মল হলে ইচ্ছার অনভিঘাত হয়, আর তখনই জীব সুকৃতিশালী হয়, তার শ্রী বা ঐশ্বর্য লাভ হয়। ক্রমে তার বৈরাগ্য, ধর্ম ও জ্ঞান লাভ হয়, জীব মোক্ষ পদবী লাভ করে। মা ! তোমার শ্রীমূর্তির প্রকাশ এই সুকৃতিশালী জনগণের ভবনেই পরিলক্ষিত হয়। আবার যতদিন জীবের বাসনা অপূর্ণ থাকে, ততদিন বুঝতে হবে—বুদ্ধিতে পাপ আছে। আর বুদ্ধি এইভাবে মলিন হলেই তা অলক্ষ্মী বা অনৈশ্বর্যর পীঠস্থান হয় এবং তার থেকেই আসে অধর্ম, অবৈরাগ্য ও অজ্ঞান। পাপ-পুণ্য বিচার এই বুদ্ধি পর্যন্তই থাকে তার ওপরে যায় না। জগতে পাপ-পুণ্য বিচার সবই আপেক্ষিক আর এর প্রধান উদ্দেশ্যই হল আধ্যাত্মিক পথের কণ্টক উন্মোচিত করা।

বুদ্ধির প্রকাশ দ্বিবিধ। এক ইন্দ্রিয় কর্তৃক আহৃত বিষয়ের প্রকাশ আর

অন্যটি পরমাত্মার প্রকাশ। প্রথমটি পাপ আর পরেরটি পুণ্য। বৈষয়িক প্রকাশে বুদ্ধির সঙ্কোচ আর পরমাত্মার প্রকাশে এর প্রসার হয়। বুদ্ধির একদিকে শ্রী আর অন্যদিকে অলক্ষ্মী। একদিকে জ্ঞান, ধর্ম, ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্য অন্যদিকে অজ্ঞান, অধর্ম, অনৈশ্বর্য ও অবৈরাগ্য। মা! এই উভয় রূপেই তুমি বিরাজিতা, আর যারা তা বুঝতে পারে তারাই 'প্রস্ফুটিত বিবেক', তারাই 'কৃতধী'। দেবতারা তাই এই স্থিতধী সাধকের সম্বন্ধে বলেছেন— **'কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ'**, তাই ঋকবেদের গায়ত্রী মন্ত্রের স্তুতিতে আছে **'ধিয়োযোর্ণঃ প্রচোদয়াৎ'** অর্থাৎ ঋষিদের কাতর প্রার্থনা মা ! তুমি বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হও।

শ্রদ্ধা সতাং—যারা সৎ-এর সন্ধান পেয়েছেন, তাঁদের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে, তুমি মা নিত্য অধিষ্ঠিতা। যারা নিয়ত এই পরিবর্তনশীল জগতের বিনশ্বর বস্তুর মধ্যেও এক অখণ্ড অপরিণামী, নিত্য সত্তার সন্ধান পান, তাঁহারাই যথার্থ সজ্জন। কৃতধী হলেই জীব সৎ-এর সন্ধান পায়। যাদের তুমি সৎ করো তাদের হৃদয়ে তুমি শ্রদ্ধারূপে অধিষ্ঠান করে, অসতের পারাপারে নিয়ে যাও।

কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা—সৎকুল সম্ভূত জনগণের হৃদয়ে তুমি লজ্জারূপে অবস্থিতা। 'অকার্যবৈমুখ্যতাই' হল এই লজ্জা। একাধারে এই সজ্জনগণ যাঁরা নিন্দিত কর্ম করতে লজ্জা পান তার কারণ, তুমিই মা তাঁদের হৃদয়ে লজ্জারূপে অধিষ্ঠান করো। আবার অন্যদিকে উচ্চস্তরের সাধকগণ, যাঁরা 'সৎ'-এর সন্ধান পেয়েছেন, এক অখণ্ড সত্তার উপলব্ধি করেছেন তারা তুমি যে যাবতীয় কর্মের অতীত, সর্বত্রং নির্লিপ্তা বুঝে তোমাতে কোনোরূপ কর্তৃত্ব অর্পণ করতে সঙ্কুচিত হন। ইহাই তাঁদের **'অকার্যবৈমুখ্যরূপ লজ্জা'**।

পরিপালয় বিশ্বম্—দেবতারা স্তুতিতে বলছেন, মা ! তুমি বিশ্বকে পরিপালন করো। তুমি গুরুরূপে প্রতি জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে জীবের অজ্ঞান দূর করে দাও। জীব তখন বহুদিনের এই অজ্ঞানকল্পিত দুঃখের পেষণ হতে পরিত্রাণ লাভ করে। এই হল তোমার যথার্থ 'জগৎ-পরিপালন'।

অবশেষে শ্লোকটির অন্তে বলছেন— **'তাং ত্বাং নতাঃ স্ম'** অর্থাৎ তোমাকে আমরা নত হয়ে প্রণাম করছি। তুমি অদৃশ্যা, অগ্রাহ্যা, অস্পৃশ্যা

হলেও আমাদের হৃদয়ে শ্রী, অলক্ষ্মী, বুদ্ধি, লজ্জা ও শ্রদ্ধারূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হও। আবার গুরুরূপে সাক্ষাৎ দৃশ্য হয়ে তুমি আমাদের পালন করো। ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে ভগবান বলেছেন—**'যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতাম - শুভং বিধূন্বন্ আচার্য চৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি'** (ভাগবত ১১।২৯।৬) অর্থাৎ তিনি তাঁর শরণাগত দেহধারীগণের অন্তরের ও বাহিরের সমুদয় অশুভ বিষয় বাসনা দূর করে, বাইরে আচার্যমূর্তিতে উপদেশদানে ও অন্তরে অন্তর্যামীরূপে নিজরূপ প্রকটিত করেন। তাই মা ! শুধু মুখে নয়, কায়মনোবাক্যেও তোমার চরণে সর্বতোভাবে অবনত হচ্ছি।

রূপমচিন্ত্যমেতৎ — মায়ের রূপ অবর্ণনীয় ও অচিন্তনীয়। মা ! যথার্থই তোমার রূপকে আমরা বাক্য দ্বারা বর্ণনা করতে পারি না বা মন দ্বারা ধারণা করতে পারি না—**'যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'** আমরা যাকে রূপ বলি বা বুঝি, তা তো বাস্তবিক রূপ নয়—আকৃতিমাত্র। রূপ এক ব্যতীত দুই নয়। এই বিশ্ব রূপসাগরেই ভাসছে। যে কোনো পদার্থ মা বলে ধরে নিলেই ক্রমে দৃক্ শক্তি উদ্ভাসিত হয়। বিশ্বময় এই যে এক দৃক বা দর্শন শক্তি যে তোমার যথার্থ রূপের স্বরূপ তা ক্রমে বোধ হয়। স্থূলরূপের প্রতি যে পিপাসা, সৌন্দর্যের যে আকাঙ্ক্ষা তা চিরতরে নির্বাপিত হয়।

কিঞ্চাতিবীর্যং —দেবতারা স্তব করে বলছেন—মা ! অগণিত অসুরী বীর্য রূপেও তুমি, আর অসুরবীর্য ক্ষয়কারী রূপেও তুমি। 'ক্ষয়' শব্দর উৎপত্তি 'ক্ষি' ধাতু থেকে যার অর্থ— 'বিনাশ' ও 'নিবাস'। যে বীর্য অসুররূপে আত্মপ্রকাশ করে (অর্থাৎ নিবাস করে) তাও তুমি, আবার যে বীর্য অসুর বিনাশ করে, তাও তুমি। একধারে এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধভাব একমাত্র তোমাতেই সম্ভব। সুর ও অসুর, উভয়েই তোমার তুল্য প্রকাশ। তাই মন্ত্রেও দেখতে পাই **'অসুর দেবগণাকাদিকেষু'**। যখন তুমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি অসুর ভাবরূপে প্রকাশিত হও, তখন নিষ্কাম, অক্রোধ, নির্লোভ প্রভৃতি দেববীর্য নির্জিত হয়ে পড়ে। আবার যখন দেববীর্য প্রবল হয়, তখন অসুরবীর্য স্তিমিত হয়ে যায়। তোমার আরও একটা বীর্যভাব পরিলক্ষিত হয় যা সুরাসুর উভয়েরই অতীত। যেখানে সকল বীর্য পরাভূত, তা অভয়রূপী তোমার

অমৃতময় বীর্য। যার ভয়ে সূর্যের উদয়, যার ভয়ে বায়ুর প্রবাহ, পর্জন্যের বর্ষণ, যার ভয়ে মৃত্যুরও ভীতি উপস্থিত হয়—এ তোমারই বীর্য। তোমার চরণে কোটি প্রণিপাত।

হেতু—মা ! তুমি সমস্ত জগৎ সৃষ্টির হেতু। শুধু আমরা যে জগতে বাস করি তার নয়, সমস্ত জগৎ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড—এই অনাদি সৃষ্টিচক্রের যত কিছু পরিবর্তনশীল পদার্থ আছে, সে সমস্তেরই তুমি একমাত্র হেতু। মা ! তুমিই আত্মা আবার তুমিই আপনাকে বহুধা বিভক্ত করে দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হয়েছ। এই সৃষ্ট জগতের নিমিত্ত কারণও তুমি, আবার উপাদান কারণও তুমি, তাই দেবতাগণ তোমার স্তব করে বলছেন—**'হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি'** অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূপে জগতের সমস্ত উপাদান হচ্ছ তুমি, তাই প্রকৃতিরূপিণী তোমার রক্ত-চরণে অবনত হয়ে শত সহস্র প্রণাম করি।

কিন্তু মা ! তুমি যদি ত্রিগুণা মূর্তিতে জগৎরূপে প্রতিভাত হও তবে জগতে থেকেও আমরা তোমাকে দেখি না কেন, জগতের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও দর্শন হয় না কেন ? দেবতারা তাই স্তুতি করে বলছেন—**'দোষৈর্ন জ্ঞায়সে'** দোষবশতঃ তুমি পরিজ্ঞাত হও না ! দোষ কী ?

প্রথম দোষ—(ক) দেখতে চাই না, দ্বিতীয় দোষ—(খ) সংশয় ও অবিশ্বাস।

কিন্তু মা ! তুমিই তো দোষের সৃষ্টিকর্ত্রী। তুমিই তো নিজের অবয়ব দোষ দিয়ে ঢেকে রেখেছ। তাই তুমি ধরা দিচ্ছ না। কিন্তু দোষকেও যদি মা বলে স্বীকার করি, মায়াকেও যদি মা বলে স্বীকার করি, প্রকৃতিকেও পুরুষ বলে গ্রহণ করি তবে নিশ্চয়ই মা তোমার দোষাবরণ অপসারিত হবে। সর্বরূপেই যে এক তুমি তা জানতে পারলে, আর দোষ কোথায় ? যতক্ষণ দোষকে তোমা হতে ভিন্ন অর্থাৎ তোমার আবরণ রূপে দেখব ততক্ষণই তুমি **'ন জ্ঞায়সে'**। ততক্ষণই তুমি আবৃতা কিন্তু জ্ঞান ও অজ্ঞান সবই তুমি—এই অনুভব করলে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় আর তখনই তুমি জ্ঞানরূপে আত্মপ্রকাশ কর।

দেবতারা আরো বলছেন—**'হরিহরাদিভিরপ্যপারা'** অর্থাৎ মা ! আমরা কী করে তোমায় জানব ? তুমি যে কেবল আমাদেরই অজ্ঞেয় তা নয়, তুমি তো হরি, হর, ব্রহ্মারও ধ্যানের অগম্যা। মা ! 'আমি' 'বোধ' যতক্ষণ যাবে না,

তুমি আসবে না, আবার 'আমি' গেলেই তুমি আসবে। এই অপার চিৎসমুদ্রে যতক্ষণ বিশিষ্ট 'আমি'টাকে ডুবিয়ে না দেওয়া যায়, ততক্ষণ তুমি কিছুতেই আত্মারূপে প্রকট হও না, তাই তুমি **'হরিহরাদিভিরপ্যপারা'**। তবে তুমি এত দুর্জ্ঞেয়া হলেও আমাদের হতাশ হওয়ার কারণ নেই, কেননা দেবতারা স্তুতিতে বলেছেন—তুমি **'সর্বাশয়া'**, তুমি সকলের আশ্রয়। আমরা তোমায় জানতে বা বুঝতে না পারলেও আমরা সর্বতোভাবে তোমারই আশ্রিত—এইটুকু বুঝলেই আমাদের পর্যাপ্ত লাভ। কিন্তু মা, তুমি যে সর্বাশ্রয়া তা কেমন করে বুঝব। দেবতারা স্তুতিতে বলছেন **'অখিলমিদং জগদংশভূতম্'**। এই জগৎ তোমারই অংশভূত। শ্রুতি বলেছেন—**'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্য অমৃতম্ দিবি'** অর্থাৎ মা! তোমার এক পাদেই এই জগৎ বিধৃত অপর তিন পাদ স্বপ্রকাশ —যেখানে জগৎ নেই। গীতাতেও ভগবান বলেছেন—**'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতো জগৎ'** অর্থাৎ তুমি অংশী আর তোমার একাংশেই জগতের স্থিতি। তাই তুমি মা সর্বাশ্রয়া। আর এই পরিদৃশ্যমান জগতের চঞ্চলতা ও বিনাশশীলতা দেখে কারোর যদি শঙ্কা হয়, মা ! তুমিও চঞ্চলা ও পরিণামশীলা, তাই দেবতাগণ স্তুতি করে বলছেন—**'অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা'** অর্থাৎ মা! তুমি অব্যাকৃতা (অবিকারশীল), তুমি পরমা, তুমিই আদ্যাপ্রকৃতি। তুমি বহুনামে, বহুরূপে ব্যাকৃত (বিশেষরূপে আকারপ্রাপ্ত) হয়েও অব্যাকৃতত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছ। তুমি নির্বিকার নিত্যস্থির। চঞ্চলতা কিংবা পরিণাম তোমাতে নেই।

সাংখ্য যাঁকে **পুরুষ** বলে, বেদান্ত যাঁকে **ব্রহ্ম** বলে, উপনিষদ্ যাকে **পরমাত্মা** বলে, ভক্তিশাস্ত্র যাকে **ভগবান** বলে, তিনিই এই **আদ্যা প্রকৃতি মা**। যখন তুমি সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা জগৎ রূপ ধারণ কর তখন তুমি অনাদ্য প্রতিভাত হলেও স্বরূপত তুমি অব্যাকৃতই থাক। যথার্থই তুমি অঘটন ঘটন পটীয়সী চিন্ময়ী জননী।

পরের শ্লোকে (অষ্টম শ্লোকে) দেবতারা স্বাহা ও স্বধা মন্ত্রে দেবীকে স্তুতি করে বলছেন—মা ! জগতে যারা যথাশাস্ত্র দৈব ও পৈত্র কার্য করে তারাও

পরম শ্রেয়োলাভ করে। **‘স্বাহা’** অর্থাৎ দৈবকার্য ও **‘স্বধা’** অর্থাৎ পিতৃকার্য (শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি) দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণসমূহের অধিষ্ঠাত্রী (চৈতন্যরূপী) দেবতাগণ পরিপুষ্ট ও প্রসন্ন হন। ইহার ফলে দুর্বিজ্ঞেয়া মা তুমিও বিজ্ঞাত হও—প্রকাশিত হও। আবার প্রাণরূপিণী মার উদ্দেশ্যে যদি স্বাহা-স্বধা অর্পণ করা যায়, ইন্দ্রিয়াহৃত বিষয়রূপ যাবতীয় সম্ভার যদি মাতৃ-অনলে আহুতি দেওয়া যায় তবেও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের পরিপুষ্টি লাভ হয় এবং তাঁরা অপরিসীম পরিতৃপ্ত হন। **‘তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ’** তোমার তৃপ্তি হলেই যে ত্রিজগৎ—দেবলোক, পিতৃলোক, ভূলোকের সকলেই তৃপ্ত হয়।

কিন্তু নিত্যতৃপ্তা তুমি, তোমার আবার তৃপ্তিবিধান কী ? তুমিই তো গীতায় বল —**‘পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥’** (গীতা ৯।২৬)। যেন তুমি ফুল, ফল, পাতা, জলের ভিখারি। ওইগুলি না হলে তোমার তৃপ্তি হয় না। এর কারণ তুমি বলে থাক—ওরে মোহমুগ্ধ সন্তান ! দে অর্পণ কর, যা পারিস দিয়ে যা, স্বার্থান্ধ হয়ে নিজের কাছে কিছু রাখিস না। জিনিসের দিকে, পরিণামের দিকে লক্ষ্য রাখিস না, কেবল ভক্তিপূর্ণভাবে দিতে চেষ্টা কর, তাতেই আমার পূর্ণ তৃপ্তি হবে।

একদিন তুমি দুর্যোধনের রাজপ্রাসাদের অভ্যর্থনা ছেড়ে বিদুরের গৃহে শ্রদ্ধাপূর্ণ সামান্য আহারেই সন্তুষ্ট ছিলে, আবার কখনো বা দ্রৌপদীর নিকট শাকান্ন ভিক্ষা করেই পরিতৃপ্ত হয়েছিলে। আমাদের অতৃপ্তি দূর করার জন্য তোমাকেও স্বয়ং অতৃপ্ত মূর্তিতে প্রকটিত হতে হয় আর তুমি জীবের দ্বারে দ্বারে ভক্তি ভিক্ষা করো। মানুষকে বৈধকার্যে— যথা দৈব ও পিতৃকার্যে তুমিই নিযুক্ত করাও যাতে এই স্বাহা-স্বধা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জীব তোমার মুখপানে চায়। তখন সে বুঝতে পারবে তুমি নিত্যতৃপ্তা, নিত্যস্থিতা, নির্বিকল্পা মা। আর তখনই তার কর্ম-সন্ন্যাসের অধিকার আসবে, সে কর্ম নৈষ্কর্ম লাভ করবে, যা তোমার দেব ও পিতৃকার্যের স্বরূপ।

পরের শ্লোকে (নবম শ্লোকে) দেবতাগণ মা কে **‘পরমা বিদ্যারূপিণী’**

দেবী বলে বর্ণনা করছেন। দেবতারা বলছেন, যখন দৈব-পৈত্র কার্যের অনুষ্ঠান করতে করতে জীবের ইন্দ্রিয়বর্গ সুসংযত হয় তখন আর মন বিষয়ের লোভে ধাবিত হয় না, তখনই জীব আত্মলাভের আশায় উদ্বুদ্ধ হয়—একেই বলে মুমুক্ষু অবস্থা। তখনই সে বুঝতে পারে তুমি নিত্যতৃপ্তা, নিত্যস্থিরা, নির্বিকল্পা। তখন কী না হয় **'অভ্যস্যসে'** অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তোমারই অভ্যাস বা ধ্যান করে। তখন তুমি **'অচিন্ত্য মহাব্রত'** স্বরূপে আত্মপ্রকাশ কর। এই অভ্যাস বা ধ্যানরূপ মহাব্রত তো সত্যই অচিন্তনীয় কেননা তুমি তো **'ভাবাতীতং নিরঞ্জনম্'**।

দেবতারা আরো বলছেন—মা ! এই যে সমস্ত দোষ হতে কলুষশূন্য হয়ে মুনিগণ মোক্ষলাভের আশায় তোমার নিত্য ধ্যানে মগ্ন হন, তারও আর একটা নাম হল **'বিদ্যা'**। **'বিদ্যা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'**। যার দ্বারা তোমার অক্ষর পরমাত্মস্বরূপটি অধিগত হয় তাই হল বিদ্যা। মা ! বিদ্যাও তুমি, অবিদ্যাও তুমি। বন্ধনও তুমি, মুক্তিও তুমি। আবার বন্ধন মুক্তির অতীতও তুমি।

দেবতাদের কাতর প্রার্থনা, কবে এ দীন সন্তানগণের হৃদয়ে ভগবতী বিদ্যা স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে এ অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করে দেবে। আমরা তো এখন তোমারই অবিদ্যা মূর্তির কোলে আছি বলেই আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গ সুসংযত নয়। আমরা তোমাকে না দেখে বিষয়ের দিকে চেয়ে থাকি আর তোমার মহাব্রতস্বরূপা মূর্তির আভাসও পাই না। দেবতারা বলছেন— মা ! আর কতদিনে তোমার কৃপা হবে ? কতদিনে আমাদের এই প্রার্থনা তোমার কর্ণে পৌঁছবে।

পরের শ্লোকে (দশম শ্লোকে) মাকে **'শব্দরূপা'** ও **'বার্তা'** বলে স্তুতি করেছেন। দেবতারা দেবীকে যে কেবল মুক্তির হেতুভূতা পরাবিদ্যা বলেই দর্শন করেছেন তা নয়, অপরাবিদ্যাও যে একমাত্র তিনিই, সেই বলেও স্তুতি করেছেন। প্রথমেই বলেছেন 'শব্দাত্মিকা' অর্থাৎ তুমি শব্দস্বরূপা। পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী বাণীরূপে তুমিই প্রতি জীবে আত্মপ্রকাশ কর। শব্দস্বরূপা প্রণবই আদি বাণী বা মূলনাদ ! বেদসমূহ ওই প্রণবেরই বিশেষ

বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। বেদের যে বিভাগ পদের ন্যায় ছন্দোবদ্ধ তা ঋকবেদ, যা সঙ্গীতরূপে রমণীয় সুরতান সহকারে গেয় তা সামবেদ আর যা গদ্যের ন্যায় উচ্চারিত তা যজুঃর্বেদ। এই তোমার মা ত্রয়ীমূর্তি। বেদসমূহ ত্রিগুণাত্মক বলেও এদের বলে ত্রয়ী, আবার ইহারা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মরূপ ত্রিবিধ ভাবের প্রকাশক বলেও এই অপরাবিদ্যাকে বলে ত্রয়ী। দেবতারা বলছেন—মা ! তুমি **'ভবভাবনায়'** অর্থাৎ লোকস্থিতির জন্য এই ত্রয়ীমূর্তিতে বিকশিতা। জীবগণ যাতে উন্মার্গগামী হতে না পারে, উচ্ছৃঙ্খল গতি অবলম্বন না করে সংযত থাকে, সেইজন্য তুমি শাস্ত্রোপদেশরূপে, বেদবিধিরূপে ত্রয়ীমূর্তিতে বিরাজ করছ। তোমার এই ত্রয়ীমূর্তিও মা—অনন্ত ঐশ্বর্যময়ী।

আবার তুমি যে কেবল শাস্ত্রবিধানরূপে জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপে এই সংসার স্থিতি রক্ষা করছ তা নয়, **বার্তারূপেও** তুমি জগতের আর্তি—যাবতীয় দুঃখ দূর করছ। মা ! তুমি যে আমাদের বার্তা, আমাদের জীবিকারূপেও যে তুমি, এই সত্যজ্ঞান হতেও বিচ্যুত বলে আমাদের এই জীবনসঙ্কট কাল উপস্থিত। যারা জীবিকারূপেও তোমার অব্যয় মূর্তির বিকাশ দেখতে পায় তারা কখনই জীবিকার অভাবে কষ্ট পায় না। মহাভারতে বার্তা শব্দের অর্থ অন্যরকম। একবার ছদ্মবেশী ধর্ম, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— বার্তা কী ? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—**'মাসার্তু দর্বী পরিবর্তনেন, সূর্যাগ্নি রাত্রি-দিবেন্ধনেন অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে, ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা।'** অর্থাৎ 'কাল' এই জগৎ সৃষ্টিকে পরিবর্তন করেই চলেছেন। কী করে ? না ঋতুরূপে 'মাস' হল তার দর্বী (হাতা) আর সূর্যরূপে অগ্নি দ্বারা এবং দিন ও রাত্রিরূপ ইন্ধন দ্বারা, এই মহামোহময় সংসাররূপ কটাহে (কড়াইতে)—কাল স্বয়ং ভূতবর্গকে পাক করেন। **ইহাই বার্তা**। তুমি কালরূপে প্রতিনিয়ত এই ভূত সংঘকে পাক করছ। যারা প্রতিনিয়ত এই প্রকাশমান বার্তামূর্তির দিকে লক্ষ রেখে তোমায় ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে, তারা কখনও তোমার এই নিয়ত পরিবর্তনশীলা মূর্তিতে মুগ্ধ (কাতর) হয় না। তুমি তখন যোগক্ষেম বহনকারিণী স্নেহময়ী মাতৃ-মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে তাদের অঙ্কে ধারণ করো।

পরের শ্লোকে (শ্লোক ১১) দেবগণ দেবীকে অভিহিত করছেন—**মেধা,**

দুর্গা, কমলা ও **গৌরী** বলে। পূর্বে বলা হয়েছে—মা ! তুমি বেদরূপিণী। আর এখন বলছেন—**বেদার্থধারণাবতী ধী বা মেধা** (স্মৃতি) তুমি। আমরা যা শিখি বা গ্রহণ করি সেসবই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে করি। যদি এক একটা মৃত্যুর সঙ্গে তা ভুলে যেতাম তবে আমাদের এ বন্ধন কখনও দূর হত না। কিন্তু মা ! তুমি মেধারূপে আমাদের সেই বিন্দু বিন্দু জ্ঞান ধরে রাখ, তাই প্রতি জন্মেই আমাদের জ্ঞান পরিবর্ধিত হয়। এই জীবনে আমরা যে জ্ঞান সঞ্চয় করি, পর জীবনে আমার ঠিক সেই জ্ঞান সঞ্চয় করার জন্য বিশেষ প্রযত্ন প্রয়োগ করতে হয় না। যে শক্তি প্রভাবে আমাদের এই বহুজন্ম সঞ্চিত জ্ঞানরাশি পরিধৃত থাকে, তাহাই মেধা, তাহাই সংস্কার। এই মেধার চরম অবস্থা বা শ্রেষ্ঠস্বরূপ হল 'আমি ব্রহ্ম এই স্মৃতি।' আচার্য শংকরও বলেছেন—'**ব্রহ্মাহমস্মি ইতি স্মৃতিরেব মেধাঃ**'। একদিন আমাদের হৃদয়েও এই মেধারূপে তুমি 'মা' ফুটে উঠবে, আর আমাদের মধ্যে 'আমি ব্রহ্ম' এই ভাব আবির্ভূত হলেই আমরা জীবত্বের দুশ্ছেদ্য বন্ধন দূর করে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হব। তুমি মেধারূপে আত্মপ্রকাশ কর বলেই না আমরা তোমাকে বা নিজের আত্মস্বরূপকে চিনতে পারি। দেবতাগণ তাই বলছেন '**বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা**' অর্থাৎ অখিল শাস্ত্রের সার, যাবতীয় শাস্ত্রের সারমর্ম হল 'আত্মস্বরূপাবগতি'। আর যখন জীব আপনার স্বরূপ বুঝতে পারে তখন মা তুমি '**বিদিতা**' মূর্তিতে আবির্ভূতা হও, তখন শাস্ত্রবাক্য সমূহের আর পরস্পর বিরুদ্ধভাব থাকে না, সকল শাস্ত্রই যে একেরই প্রতিধ্বনি তা খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। বোঝা যায় সকল শাস্ত্রেরই সৃষ্টি তোমাকে জানবার জন্যই। কিন্তু মা ! যতদিন তুমি কৃপা করে স্বয়ং বিদিতারূপে প্রকাশিত না হও ততদিন কোনো শাস্ত্রই তোমাকে প্রকাশ করতে পারে না। আবার যখন তুমি স্বয়ং বিদিতা হও তখন শাস্ত্ররাশিরও প্রয়োজন হয় না। যদিও তুমি বিদিতা স্বরূপে, বোধস্বরূপে প্রতি জীবে বিদ্যমান থাক তথাপি তোমার কৃপা বিনা কেউই তোমাকে জানতে পারে না কারণ তুমি '**দুর্গা**'—দুর্জ্ঞেয়া—দুরধিগম্যা।

দেবতাগণ দেবীকে স্তুতি করে আরো বলেছেন—তুমি '**দুর্গভবসাগর-নৌরসঙ্গা**'। কারণ অন্যভাবে দেখতে গেলে— তুমি মেধারূপে আমাদের

অনেক জন্ম জন্ম সঞ্চিত জ্ঞানরাশি ধরে রাখ বলে সংসারসাগরের তুমিই একমাত্র তরণী। জীবগণ এই মেধারূপ (সংস্কার) নৌকায় আরোহণ করেই **'ব্রহ্মাহংমস্মি'** বলে অনায়াসে এই ভবসাগর পার হয়ে যায়। কিন্তু কর্ণধার না হলে তো এ জগতে তরী চলে না। কিন্তু মা ! তুমি তো আমাদের **'অসঙ্গা তরণী'**। দ্বিতীয় কারও সহায়তার প্রয়োজন হয় না, তরণীও তুমি, পরিচালকও তুমি। আবার যদিও তুমি আমাদের বিন্দু বিন্দু জ্ঞানরাশি মেধারূপে ধরে রেখেছ, আমাদের সৎ-অসৎ যাবতীয় সংস্কারই তোমার সঙ্গে বিজড়িত, কিন্তু এতসবের সংস্পর্শে এসেও তুমি মলিনা হও না। বহুবার বক্ষে ধারণ করেও তোমাকে বহুত্বের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না। তাই দেবগণ তোমাকে বলছেন 'অসঙ্গা'।

শ্লোকের অন্তিমে দেবতাগণ দেবীকে বলছেন মা ! তুমি কৈটভারি বহুত্ব বিনাশকারী বিষ্ণুর হৃদয়বিহারিণী **'শ্রী'**। তুমিই আবার শশিমৌলি মহেশ্বরের অর্ধাঙ্গরূপিণী রূপে **'গৌরী'**। বিষ্ণুত্ব ও শিবত্ব তোমার বিভিন্ন প্রকাশমাত্রা। তুমি একদিকে বিষ্ণু ও শিবের প্রসূতি হয়েও অন্যদিকে তাঁহাদের শক্তি হিসাবে বৈষ্ণবী ও শিবানি-রূপে আত্মপ্রকাশ করে থাক।

এই যে জগৎ-ভাব, এই যে বহুত্ব, এই যে আমাদের জীবত্ব আর এই যে শক্তি মেধারূপে, সংস্কাররূপে আমাদের তোমার কাছে আকর্ষিত করে এসকলই 'বৈষ্ণবীশক্তি' বা 'শ্রী'।

আবার এই শক্তিই যখন অসঙ্গারূপে প্রকাশমান হয়, কোনো ভাবের ধারণকর্ত্রীরূপে প্রকটিত হয় না, তখন সর্বভাবের সংহারক শক্তিরূপে পরিচিত হয়ে তুমি হও 'গৌরী'।

দেবীর বিভূতি বর্ণনা (১২ — ১৩)

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাত্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ॥ ১২

দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন॥ ১৩
(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।১২—১৩)

সরলার্থ— আপনার মৃদু হাস্যময়, নির্মল, পূর্ণচন্দ্রবিম্ব অনুকারিণী এবং উত্তম স্বর্ণপ্রভাতুল্য মনোহর কান্তিতে কমনীয় মুখমণ্ডল দেখেও মহিষাসুর ক্রুদ্ধ হয়ে সহসা সেই বদনমণ্ডলের ওপর প্রহার করেছিল, এটা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। আপনার সেই মুখ যখন ক্রোধে আরক্ত হয়ে উদীয়মান চন্দ্রের মতো রক্তিম দ্যুতিবিশিষ্ট ভ্রূকুটিভীষণ হয়েছিল, তখন সেই মুখ দেখেও যে মহিষাসুর তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেনি, এটা ওই আশ্চর্যের চেয়েও বেশি আশ্চর্য ; কারণ ক্রুদ্ধ যমরাজকে দেখে কে জীবিত থাকতে পারে ? (১২—১৩)

মূলভাব— এই প্রকরণে দেবতারা দেবীর ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে তাঁর লীলার প্রকাশ বর্ণনা করেছেন।

দেবতারা বলছেন মা ! তোমার শ্রীমুখমণ্ডলের কান্তিতে ত্রিজগৎ মুগ্ধ হয় আবার সেই জীবই অতিশয় অকিঞ্চিতকর রূপরসাদির বাসনায় কিরূপে আসক্ত হয় ! সাধকের আত্মস্বরূপ এক একবার যৎ কিঞ্চিৎ উপলব্ধিযোগ্য হলেও রজোগুণের বিক্ষোভজনিত চিত্তচাঞ্চল্য তোমার অনুপম সুষমাময় পরমাত্মস্বরূপকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই হল মহিষাসুরের দেবীকে প্রহারের প্রয়াস। কিন্তু এ জগতে যা কিছু আছে সবই তোমার সৌন্দর্যে আচ্ছাদিত, প্রতি অবয়বে উদ্ভাসিত, এই সত্য জ্ঞান এই সরল উপলব্ধি যতদিন না আমাদের প্রাণে পরিপূর্ণ হয়, ততদিন আমরা তোমার অতুলনীয় সৌন্দর্যের সন্ধান পাব কী প্রকারে !

পরের ত্রয়োদশ শ্লোকে দেবতাগণ বলছেন—মা ! তোমার যখন কোপ প্রকাশ হয়—যখন তুমি প্রলয়ংকরী মূর্তিতে দাঁড়াও তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যান, আর মহিষাসুর তো তুচ্ছ। মা ! তোমার ভ্রূকুটি করাল

মুখ দেখে মহিষাসুর কেন যে তক্ষুনি প্রাণত্যাগ করেনি, সেটাই আশ্চর্য। উপমা দিয়ে দেবতারা বলছেন—**'উদ্যৎ-শশাঙ্কসদৃশাচ্ছবি'** অর্থাৎ পূর্ণ চন্দ্রর যখন উদয় হয়, তখন যেমন রাতের অন্ধকার দূর হয়ে যায়, সেইরকম তোমার প্রলয় করাল মুখকান্তি নিরীক্ষণ করলে অজ্ঞান-অন্ধকার ও দ্বৈতভাব সম্যক্ দূর হয়ে যায়। কিন্তু মহিষাসুর কীভাবে তোমার করাল-মুখচ্ছবি দেখেও জীবিত থাকল, যুদ্ধ করল, আবার সিংহ, গজ, অর্ধনিষ্ক্রান্ত পুরুষ প্রভৃতি নানা মূর্তিতে তোমায় আক্রমণ করতে লাগল, এ বিস্ময়করই বটে।

মহিষাসুর নিধনের ব্যাপারে এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে দেবতারা বলছেন —**'কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন'** অহো প্রকুপিত অন্তককে দর্শন করলে কে জীবিত থাকতে পারে ? মা ! এ তোমার অনির্বচনীয় লীলা। আমরা যাকে নিতান্ত অসম্ভব ঘটনা বলে মনে করি, অঘটনপটীয়সী তোমার ইচ্ছায় তা অতি সহজেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

ঋষি অরবিন্দ বলতেন—What is magic to us is logic to God.

যাই হোক, মা ! আমরা তোমার সর্বশক্তিমত্তার কর্তৃত্বে বিশ্বাস করতে পারি না, কারণ আমাদের অহং কর্তৃত্বের মিথ্যা অভিমানই আমাদের তোমার থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে দেবতাগণ স্তুতি করে বলছেন—মা ! তুমি পরমা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পর নামে অভিহিত হন। তাঁরাও তোমা হতে জাত, তোমাতেই স্থিত, তাই তুমি পরমা। তোমার প্রসন্নতা ও ক্রোধ দুটোই জীবের প্রতি সমান মঙ্গলদায়ক। তুমি প্রসন্না হলে—জীবের ঐহিক, পারত্রিক সর্ববিধ মঙ্গললাভ হয়। আর তুমি কুপিতা হলে কী হয়—দেবতারা বলছেন—**'বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি'**। অর্থাৎ জীবের সমস্ত কুল নাশ হয়। আমরা জীবেরা কত জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভবসাগর পার হতে পারি না, কুলে কুলে বিচরণ করি— রূপরসাদি বিষয় ভোগ করেই এই জীবন অতিবাহিত করি। আমরা এই দুঃখমিশ্রিত সুখের হাত থেকে চিরতরে পরিত্রাণ লাভ করি। তাই তোমার প্রসন্নতা ও ক্রোধ দুইই আমাদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক। জানি, তুমি কুপিতা হলে আমাদের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়—রোগ,

শোক, অপমান, অত্যাচার, অভাব, উৎপীড়ন চারধার থেকে আমাদের আক্রমণ করতে থাকে, আর তখনই তো তুমি জীব হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে মহিষাসুরের বিপুল বাহিনীর ন্যায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অকিঞ্চিৎকর বিষয়রূপের আকর্ষণস্বরূপ কুলকে, উন্মূলিত করে দাও।

আসলে যারা নিজেকে সন্তান ভাবে, তারা মায়ের কোপে বা প্রসন্নতায় তুল্যভাবে মাতৃস্নেহই দেখতে পায়। আর যদি বুঝতাম—তুমি ছাড়া আমাদের আর কোনও আশ্রয় আছে তাহলে বরং তোমার ক্রোধময়ী মূর্তি দেখে ভীতচিত্তে অন্য আশ্রয়ের দিকে ছুটে যেতাম— কিন্তু আশ্রয় তো একটাই, একমাত্র তুমিই। জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ক্রোধ-প্রসন্নতা যাই আসুক না কেন, যখন সর্বাবস্থায় তুমিই আমার একান্ত আশ্রয়, তখন আর তোমার ক্রোধময়ী মূর্তি দেখে কেন ভীত, পশ্চাৎপদ হব।

ওগো অকুলের তরণী মা ! এসো তোমার স্নেহময় অঙ্কে ঝাঁপিয়ে পড়ি। যমুনাতটের কদম্বমূলে দাঁড়িয়ে তুমিই না একদিন তোমার মোহন মুরলীধ্বনিতে গোপিনীগণের কুল ছাড়িয়ে তোমার দিকে আকৃষ্ট করে তোমার কৃষ্ণ নাম সার্থক করেছিলে। এবার আবার একবার এসো মা ! এই যুগসন্ধির মহাক্ষণে তুমি স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে এসো, আমাদের ভুল ভাঙিয়ে দাও, কুল ছাড়িয়ে দাও, তোমার অকুল স্নেহময় বক্ষে স্থান দাও।

দেবীর কৃপা বর্ণনা (১৪—২১)

দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য॥ ১৪ ॥
তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না॥ ১৫ ॥

ধর্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্মাণ্য-
ত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন॥ ১৬ ॥
দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদাঽর্দ্রচিত্তা॥ ১৭ ॥
এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্বন্তু নাম নরকায় চিরায়পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি॥ ১৮ ॥
দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী॥ ১৯ ॥
খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ॥ ২০ ॥
দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্॥ ২১

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।১৪—২১)

সরলার্থ—দেবি! আপনি প্রসন্না হোন। পরমাত্মস্বরূপা আপনি প্রসন্না হলে জগতের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং ক্রোধান্বিতা হলে তৎক্ষণাৎই সকল কুল আপনি নাশ

করেন, এতো আমরা সদ্যই বুঝতে পেরেছি ; কারণ মহিষাসুরের এই বিশাল অসুরকুল মুহূর্তের মধ্যে আপনার ক্রোধে বিনষ্ট হয়ে গেল॥ ১৪ ॥ সদা অভীষ্টপ্রদায়িনী আপনি যাদের ওপর প্রসন্না হন, তারা সর্বত্র সম্মানিত, তাদের ধন, যশ বৃদ্ধি পায়, তাদের ধর্ম-কর্ম কখনও হ্রাস পায় না এবং তারা আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্যাদিসহ নিরাপদে থাকে এবং তারাই ধন্য বলে গণ্য হয়॥ ১৫ ॥ দেবি ! আপনারই অনুগ্রহে পুণ্যবান ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহিত সব রকম ধর্মানুকূল কর্ম সম্পাদন করে এবং তার ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় ; অতএব আপনিই ত্রিলোকে মনোবাঞ্ছা পূরণকারীফলদায়িনী॥ ১৬॥ মা দুর্গে ! সঙ্কটকালে আপনাকে স্মরণ করলে আপনি সকলের ভয় দূর করেন এবং বিবেকী পুরুষ দ্বারা চিন্তন করলে আপনি তাদের শুভবুদ্ধি প্রদান করেন। দুঃখ, দারিদ্র্য ও ভয়হারিণী হে দেবি ! আপনি ছাড়া অন্য আর কে আছে যে সকলের মঙ্গলের জন্য সদাই দয়ার্দ্র থাকে ? ॥ ১৭ ॥ দেবি ! এই অসুরদের বধ করলে জগৎ শান্তিলাভ করবে এবং এই অসুরেরা চিরকালের জন্য নরকভোগজনক পাপকর্ম করতে থাকলেও এখন এই সম্মুখ সমরে মৃত্যুলাভ করে এদের স্বর্গপ্রাপ্তি হবে—এই মনে করে নিশ্চয়ই আপনি শত্রুদের বধ করেছেন ॥ ১৮ ॥ আপনি অসুরদের ওপর শস্ত্রপাত কেন করেন, দৃষ্টিপাতমাত্রই আপনি সমগ্র অসুরদের সংহার কেন করেন না ? এর এক গূঢ় কারণ আছে। এই অসুররাও আপনার নিক্ষিপ্ত শস্ত্রপ্রহারে পবিত্র হয়ে যেন উত্তমলোক পায়, তাদের প্রতি আপনার এ এক বিশিষ্ট রকম উদার অনুগ্রহ ॥ ১৯॥ হে দেবি ! খড়্গের তেজরাশির ভয়ংকর দীপ্তিতে এবং আপনার ত্রিশূলের অগ্রভাগের থেকে নির্গত ঘনীভূত জ্যোতিঃপুঞ্জের তেজে অসুরদের চোখ যে নষ্ট হয়ে যায়নি তার কারণ, এই যে তারা সেইসময় আপনার মনোহর জ্যোতির্ময় মুখচন্দ্রিমা দর্শন করছিল ॥ ২০ ॥ দেবি ! আপনার শীল অর্থাৎ স্বভাবই হচ্ছে দুরাচারীদের দুষ্টপ্রবৃত্তি দমন করা। আপনার রূপ অচিন্তিনীয় ও অতুলনীয় ; আপনার শক্তি ও পরাক্রম দৈত্যদেরও বিনাশক, যারা দেবতাদের শৌর্যবীর্যকেও নষ্ট করে দিয়েছিল। শত্রুদের প্রতি একমাত্র আপনিই এইরকম দয়া প্রদর্শন করেন ॥ ২১

মূলভাব — এই প্রকরণের ৮টি শ্লোকে দেবতারা দেবীর কৃপা বর্ণনা করেছেন। মায়ের কৃপা তিন ভাবে আসে আর সেই তিনটি ভাব এখানে বর্ণিত হয়েছে। **প্রসন্নতাপূর্বক** (শ্লোক ১৪—১৬), **কুপিতপূর্বক** (শ্লোক ১৭—১৯) ও **সমত্বপূর্বক** (শ্লোক ২০—২১)।

প্রসন্নতাপূর্বক (১৪-১৬)—মা! যারা তোমাকে নিত্যতৃপ্তা, নিত্যপ্রসন্নময়ী জননী বলে বুঝেছে, যারা সুখ-দুঃখ, অভ্যুদয়, অধঃপতন সর্বাবস্থায় নিজেদের মাতৃ-অঙ্কস্থিত পুত্ররূপে দেখে, তারাই জগতে দেবোচিত সম্মান লাভ করে। যদিও তারা জাগতিক সুখ, সমৃদ্ধি, ভোগ, ঐশ্বর্য, যশ, সম্মান আদিকে অতি তুচ্ছ বলে বোধ করে তথাপি তুমি তাদের নিকট ওইরূপ অভ্যুদয়দায়িনী মূর্তিতেই আবির্ভূতা হও।

আখ্যান—বালক ধ্রুব পিতার দুর্ব্যবহারে আর বিমাতার দুঃসহ বাক্যে ব্যথিত হয়ে সকামভাবে অত্যুৎকৃষ্ট পার্থিব পদ লাভের জন্য সংকল্প করে শ্রীভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভের প্রভাবে, বালক ধ্রুবর মনে ভক্তির বীজ এমনভাবে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল যে তাঁর মান-অভিমান বলে কিছুই রইল না, ভগবৎ শ্রীপাদপদ্ম একমাত্র সারবস্তু বলে জ্ঞান হল। কিন্তু শ্রীভগবান ধ্রুবর পূর্বাপর সমস্ত মনোভাবই অবগত আছেন তাই তিনি ধ্রুবকে কাম্যফল ও পারমার্থিক ফল উভয় ফলই প্রদান করেন। কর্মজনিত সৃষ্ট পাপ ও পুণ্যর ভোগ (ক্ষয়) না হলে জীবভাবের নিবৃত্তি ও পরমভাবের প্রাপ্তি হয় না। এক্ষেত্রে ধ্রুব যে উৎকৃষ্ট পদ (রাজ্যলাভ) কামনায় সাধনা শুরু করেছিলেন এবং তজ্জন্য যে কাম্যফল সৃষ্টি করেছেন তা তো তাঁকে ভোগ করেই নিজ অদৃষ্ট নিজে নষ্ট করতে হবে। তাই ভগবান ধ্রুবকে বর দিলেন যে ধ্রুব ছত্রিশ হাজার বছর পিতৃদত্ত রাজত্ব ভোগ করবেন। রাজ্যশাসন কালে তিনি বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান (ত্যাগমূলক কর্ম) করবেন এবং অবশেষে এক অবিনশ্বর লোক (ধ্রুবলোক) লাভ করবেন যা বৈকুণ্ঠের মতো নিত্য আনন্দলোক।

এইভাবে শ্রীভগবান ধ্রুবর পূর্বাপর অবস্থা বুঝে তাঁকে এমন বর দিলেন যাতে তাঁর কাম্য উচ্চপদ ভোগও হয় আবার ভক্তর পরমার্থ যে ভগবৎ পাদপদ্ম

সেবা, তাও লাভ করা যায়।

ধ্রুবর তপস্যা সমাপ্ত হয়েছে, প্রভুর দর্শন লাভ হয়েছে, ভগবান প্রার্থিত বরদানও করেছেন, অতঃপর ধ্রুব পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু **'নাতি-প্রীতোঽভ্যগাৎ পুরম্'** (ভাগবত ৪।৯।২৭) অর্থাৎ ধ্রুব বরলাভ করে ফিরলেন বটে কিন্তু মনে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ছিলেন। কারণ তিনি এখন আত্মনির্বেদ। তাই তাঁর মনে হতে লাগল যে, হায় ! হায় ! আমি এত অসৎ যে, দেবর্ষি নারদের সারগর্ভ উপদেশও বোধ হয় প্রতিপালন করিনি। শ্রীভগবান সংসার-বন্ধন নাশ করতে সমর্থ অথচ আমি এমন হতভাগ্য যে তাঁর নিকট অসার বস্তুর প্রার্থনায় রত ছিলাম। **'ময়ৈতৎ প্রার্থিতং ব্যর্থং চিকিৎসেব গতায়ুষি'** (ভাগবত ৪।৯।৩৪)। আমার প্রার্থনা মৃতের চিকিৎসার ন্যায় ব্যর্থ। যাই হোক ধ্রুব ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করে পার্থিব ও পারমার্থিক উভয় ফলই লাভ করে অবশেষে ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হলেন। মা ! তোমার ওইরূপ সাধকের অর্থাৎ যারা নিজেদের তোমার শরণাগত বলে মনে করে তাদের কখনই **'ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ'** অর্থাৎ তাদের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ লাভের পথ কখনো অবসন্ন হয় না। তারা এই জগতে থেকেই এই চতুর্বর্গ লাভ করে থাকে।

আর যারা তোমার ধর্মময়ী মূর্তির সেবা না করে, কেবল অর্থ ও কামের সেবা করে, তারা পুনঃপুনঃ দুঃখ-তাপে জর্জরিত হয়ে থাকে। এ জগৎ আনন্দময় বুঝতে হলে সর্বাগ্রে ধর্মের সেবা করতে হয়। জীব যে পরিমাণ ধর্মপরায়ণ হয়, সে সেই পরিমাণে চিত্তপ্রসাদ লাভ করে। চিত্ত প্রসন্ন হলে অভাববোধ দূর হয়। আর অভাববোধ না থাকলে অর্থেরও অভাব হয় না এবং ধর্মানুমোদিত কামনা পূরণেরও কোনো ব্যাঘাত হয় না। আর এই কামনা পূর্ণ হলেই জীব নিষ্কাম হয়, তখন মোক্ষরূপিণী মা স্বয়ং এসে কল্পিত বন্ধন ছিন্ন করে জীবসন্তানকে অমৃতের স্বাদ ভোগ করান।

দেবতারা পঞ্চদশ শ্লোকে বলছেন—মা ! তুমি যখন অভ্যুদয়দায়িনী মূর্তিতে কাউকে অঙ্কে ধারণ করে রাখ তখন তাদের **'নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা'** (৪।১৫) অর্থাৎ তাদের ভৃত্য, পুত্র, পত্নী, পরিজনবর্গ সকলেই শিষ্ট, সুস্থ ও সাধু চরিত্র হয়ে থাকে। আবার আধ্যাত্মিক দিক থেকে দেখতে গেলে সেইসব সাধকদের

বিবেক (আত্মজ), বিজিত ইন্দ্রিয় (ভৃত্য) ও আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি (পত্নী) মাতৃ-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকে।

গীতাতেও তুমি বলেছ—**'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ'** (গীতা ৫।১৯) অর্থাৎ সেই সব সাধক যারা সমত্বে স্থিত তারা ইহলোক ও পরলোক—উভয়লোকই জয় করতে সমর্থ হয়। দেবতারাও তাই ঐরূপ শ্লোক উক্ত সমত্বে স্থিত তোমার এইসব প্রিয়তম সন্তানগণকে **'ধন্যাস্ত এব'** বলে ধন্য ধন্য করছেন। বলেছেন একমাত্র ধর্মের সেবা করলেই সাধক অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের অধিকারী হয়।

পূর্বমন্ত্রে বলা হয়েছে **'ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ'** অর্থাৎ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি কখনো চতুর্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয় না আর বর্তমান ষোড়শ শ্লোকে বলছেন কিরূপে সেই ধর্মপরায়ণ হবে অর্থাৎ ধর্মে সেবা করতে হয়। **'প্রতিদিনং সকালানি কর্মাণি অত্যাদৃতঃ ধর্ম্যাণি করোতি এবঞ্চ সুকৃতী ভবতি'** (শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।১৬)। অর্থাৎ প্রতিদিন সকল কর্মই অতিশয় আদরের সঙ্গে ধর্মময় অনুষ্ঠানরূপে করতে হয়। আর এরকম করতে পারলেই মানুষ সুকৃতিশালী হয়, তা স্বর্গ ও মোক্ষ উভয়ই লাভ হয়।

সাধারণত কর্ম তিন প্রকারের হয়—(১) **ধর্ম কর্ম**—যেমন সন্ধ্যা, বন্দনাদি শাস্ত্র কর্ম ; (২) **অধর্ম কর্ম**—যেমন হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি নিন্দিত কর্ম ও (৩) **সাধারণ কর্ম**—যেমন আহার-নিদ্রা-অর্থোপার্জন ইত্যাদি। এতে ধর্মও নেই, অধর্মও নেই। আসলে কর্ম কিন্তু এক প্রকারই মাত্র। গীতায় ভগবান বলছেন—**'বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্। পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥'** (গীতা ১৮।৩৮) অর্থাৎ সকল কর্মই ধর্মরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে, অতিশয় আদরের সঙ্গে (**অত্যাদৃতঃ**) করতে হবে, অশ্রদ্ধায় করলে হবে না, বিষয়াসক্তের মতো করলে হবে না।

কী করলে সকল কর্মই ধর্ম হতে পারে ? এর উত্তর হল সকল কর্মে মাতৃ-কর্তৃত্বের দর্শনে। মাতৃযুক্ত হয়ে কর্ম অনুষ্ঠানের নামই ধর্ম কর্ম। এ যেন গীতার **'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্'** মন্ত্রের সাধনময় অবস্থা। অহংবুদ্ধিতে কর্মের অনুষ্ঠান করে, তারপর তা ঈশ্বরার্পণ করা কনিষ্ঠ অধিকারীর কার্য। অনুষ্ঠান কালেই

কর্মগুলিকে যথাসম্ভব মাতৃ-যুক্ত ভাবে করতে হবে। যে কোনো কার্যের আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত মাতৃ-কর্তৃত্ব দর্শনই যথার্থ ধর্ম কর্ম। মা ! বিশ্বময় তোমার এক বিরাট কর্তৃত্ব বা ক্রিয়াশক্তি রয়েছে যা আমাদের বিষয় ইন্দ্রিয় সংযোগের মধ্যে দিয়ে সর্বদা প্রকাশ পাচ্ছে। এই ভাবরূপ জ্ঞান কিছুদিন অনুশীলন করলেই তা প্রকৃতিগত হয়ে যাবে। তখন আর চেষ্টা করে প্রতিটি কার্যের ভেতর মাতৃ-কর্তৃত্ব দেখার প্রয়াস করতে হবে না। সর্বত্র মাতৃ-কর্তৃত্ব দর্শনে সিদ্ধ সাধকের যাবতীয় কর্মই ধর্মময় হয়ে যায়। আহার-বিহারাদি দৈনন্দিন ব্যবহারিক কর্মগুলোও যদি এইরূপ মাতৃ-যুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হয় তবে তাও ধর্ম কর্মরূপে পরিণত হয় এবং তাও যথার্থ সুকৃতি। মা ! তুমি জীবকে ইহলোকে সুকৃতি, পরলোকে স্বর্গভোগ এবং সেই সুকৃতিধারী জীবকেই আবার ইহ-পরলোকের অতীত মোক্ষফল প্রদান করে তাকে ধন্য করো।

পক্ষান্তরে জীব যদি মাতৃযোগশূন্য, মাতৃ-কর্তৃত্ব দর্শনশূন্য ব্রত, নিয়ম, উপবাসাদিও করে, তবে সে কর্মগুলি ধর্ম কর্ম আকারে দৃষ্ট হলেও তা বাস্তবিক ধর্ম কর্ম নয়। আবার জীব যদি স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান করে তবে তা পরলোকে স্বর্গ অর্থাৎ সুখময় ক্ষেত্রলাভেই নিঃশেষিত হয়, মোক্ষলাভ হয় না।

দেবতারা এই স্তুতিতে আরো বলছেন **'লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন'** অর্থাৎ তিনলোকেই কল্যাণদায়িনী রূপে তুমি ত্রিবিধ ফলের বিধান কর। 'ফলদা' শব্দর অর্থ যেমন 'ফলদায়িনী' তেমনি আবার 'দো' ধাতুর প্রয়োগে নিষ্পন্ন হলে হয় 'ফলনাশিনী' অর্থাৎ যাবতীয় কর্মফল যিনি খণ্ডন করতেও সমর্থা। যতদিন জীব অহংবুদ্ধিতে সাধারণ ভাবে কর্ম করে, ততদিন তুমি ফলদায়িনী মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে জীবের অর্জিত সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, স্বর্গ-নরকরূপ ফল প্রদান কর। আবার যখন জীব সমস্ত অহংবোধকে তোমার রাতুল চরণে অর্পণ করে, বিশ্বময় বিরাট কর্তৃত্বময়ী মহাশক্তিরূপিণী তোমার কর্মযন্ত্ররূপে কর্মানুষ্ঠান করে, তখন তুমি 'ফলনাশিনী' মূর্তিতে প্রকটিত হয়ে, জীবের যাবতীয় কর্মফল জ্ঞানাগ্নিপ্রভাবে সমূলে ভস্মীভূত করে তাকে মোক্ষফলের অধিকারী কর।

প্রকরণের প্রথম দুটি শ্লোকে দেবতাগণ সুকৃতিকারীদের প্রতি দেবীর কৃপার কথা বলেছেন আর তৃতীয় শ্লোকে (১৭) বলছেন সংসার জ্বালায় হতোদ্যম জীবের প্রতি তাঁর কৃপার কথা। দেবগণ বলছেন—মা ! যখন তোমার প্রিয় সন্তান জীব দুর্গমে পতিত হয়, দুঃখ সংকটে পড়ে তার থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় দেখতে পায় না, ভয়ে সন্ত্রাসে জীব একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন যেন কোন অজ্ঞেয় মহতী শক্তির দিকে তার দৃষ্টি পড়ে। সেই দুর্গম সময়, মা ! জীব তোমার শরণ নিতে বাধ্য হয়— তোমায় স্মরণ করে। শ্লোকটিতে তাই উক্ত হয়েছে— **'দুর্গে স্মৃতা'**। জগতের চোখে যা দুঃসময়, জীবের পক্ষে কিন্তু তা যথার্থই সুসময়। বহু পুণ্যফলে জীব তোমাকে স্মরণ করার শুভ অবসর পেয়েছে। তোমাকে স্মরণ করলে—যথার্থভাবে স্মরণ করলে, অচিরে বিপদ ভয় দূর হয়।

যাই হোক জীব বিপদে পড়লে তোমাকে ডাকার শিক্ষা লাভ করে আর ক্রমাগত এই অভ্যাসের ফলে স্বস্থ অবস্থাতেও তোমায় ডাকতে পারে। যতদিন না জীব মাতৃ-কৃপায় বিশ্বাসবান হয় ততদিন কিছুতেই স্বস্থ হতে পারে না, আর স্বস্থ না হলে অস্বস্তি তো ভোগ করতেই হয়। আরে, 'স্ব'-এর সন্ধান না পেলে কি স্বস্থ হওয়া যায় ? 'স্ব' যে আমাদের মা। যাই হোক তোমাকে বিপদের সময় যথার্থ স্মরণ করতে পারলে বিপদ দূর হয়ে যায় কিন্তু ডাকাটি থেকে যায়। জীবের তখন কোনো বিপদ নেই, অন্য কোনো কামনা-বাসনাও নেই তবু ডাকে। অভ্যাস বশে ডাকে, প্রাণের তাড়নায় ডাকে। মা ! তখন তুমি কী কর ? **'স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি'** অর্থাৎ স্বস্থ অবস্থায় তোমাকে স্মরণ করলে, তুমি অতীব শুভা মতি প্রদান কর। বুদ্ধিসত্ত্বের নির্মলতাই শুভা মতি। আমরা সচরাচর যে বুদ্ধি নিয়ে জগতে বিচরণ করি, ব্যবহারিক জীবনযাপন করি,তা অবিশুদ্ধ বা অশুভ মতি। কিন্তু মা ! কামনাহীন সন্তান যখন তোমায় বারংবার ডাকে, স্মরণ করে তখন তোমারই কৃপায় তার বুদ্ধির মলিনতা দূর হয়—বুদ্ধিসত্ত্ব নির্মল হয়। আর এই শুভমতি লাভ হলে জীব তোমার স্বরূপের আভাস পেয়ে ধন্য হয়। তার জন্মমরণ মোহ চিরদিনের তরে দূর হয়। মা ! তোমার মতো জীবের সকল রকম উপকার করা, দয়ার্দ্রচিত্তা হওয়া,

স্নেহবিগলিত হৃদয়া আর কে আছে। দেবতারা তাই শ্লোকটির অন্তে স্তুতিপূর্বক দেবীকে বলছেন—**'দারিদ্র্য-দুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা'** অর্থাৎ মাতঃ ! তুমি দারিদ্রহারিণি, দুঃখবিনাশিণী, ভয়নাশিণী।

দারিদ্র্য হচ্ছে অভাববোধ। আর অভাববোধ হলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী আর দুঃখ হতেই ভয় উৎপন্ন হয়। দারিদ্র্য, দুঃখ আর ভয় যেন তিনটি পরস্পরের সহচররূপে অবস্থিত। চিত্তে একটা না একটা অভাববোধ লেগেই আছে। আর এই অভাববোধ বা দারিদ্র্য দূর করার জন্যই জগৎময় এই কোলাহল, এই ছোটাছুটি। অভাববোধ যত বাড়ছে ভোগের অভাব কিন্তু ততটা নয়। আসলে কোন্ বস্তু পেলে যে এই দারিদ্র বা অভাববোধ দূর হবে তা বলে দেবে 'বুদ্ধি'। কিন্তু যতদিন বুদ্ধি অশুভ থাকে, মলিন থাকে, ততদিন জীব সেই সর্ববিধ অভাবনাশক বস্তুর স্বরূপ অবগত হতে পারে না। তাই শুভামতির অত্যন্ত প্রয়োজন। গীতায় তাই তুমি বলেছ—**'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥'** (গীতা ৩।২২) অর্থাৎ যাঁকে লাভ করলে আর কোনো লাভই অধিক বলে মনে হয় না, যাহাতে অবস্থান করলে, দুঃসহ দুঃখ উপস্থিত হলেও বিচলিত হতে হয় না, সেই যে পরমানন্দময় নিত্যবস্তু , যা পেলে দারিদ্র্য, দুঃখ ও ভয় চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়, তার সন্ধান কে দেবে ? দেবে ওই শুভামতি—ওই নির্মল বুদ্ধিসত্ত্ব। উপনিষদের ভাষায় একে বলে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত হলেই জীব পরমাত্মস্বরূপের উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। তখন যাবতীয় অভাব, দুঃখ এবং ভয় দূর হয়ে যায়।

কুপিতাপূর্বক (১৭-১৯)—প্রকরণের প্রথম অংশে দেবতাগণ সুকৃতিকারীদের প্রতি ভগবৎকৃপা বর্ণনা করে বর্তমান অংশে অসুরগণের প্রতি দেবীর কৃপা বর্ণনা করেছেন। মা ! তোমার চিত্ত যদি দয়ার্দ্র হয়, তবে এই অসুরকুল নিহত করলে কেন ? দেবতারা অষ্টাদশ শ্লোকে স্তুতিচ্ছলে তিনটি কারণ বলেছেন।

প্রথমতঃ—দেবতারা বলছেন—**'জগদুপৈতি সুখম্'** অসুরগণ নিহত হলে, জগৎ শান্তি লাভ করে। স্থূলভাবে দেখতে গেলে, অসুরকুল নিহত হলে

জগতের যাবতীয় অত্যাচারের উপশান্ত হয়। সূক্ষ্মভাবে দেখলে যাবতীয় বাসনাগুলিকে বৃদ্ধির অবসর না দিয়ে তাঁদের প্রলয়াভিমুখী করতে পারলে যথার্থ শান্তির সন্ধান পায়। কারণ কামনা চরিতার্থতায় যে সুখলাভ হয়, কামনার বিনাশে তার চেয়ে শতগুণে বেশি সুখ লাভ হয়। তাই যদি জগৎকে বা স্বয়ংকে সুখী করতে হয় তবে নিশ্চয়ই অসুরকুলকে বা বাসনারাশিকে ধ্বংস করতেই হবে।

দ্বিতীয়তঃ—'নরকায় চিরায় পাপম্ ন কুর্বন্ত' অর্থাৎ অসুরবৃন্দ বা আমাদের বাসনাময় চিত্ত যেন প্রতিনিয়ত বাসনার চরিতার্থতা সম্পাদনা করতে করতে চিরকালের জন্য নরক ভোগ না করে। নর যেখানে অতি সংকীর্ণ, তাকেই নরক বলে। ছোট ছোট বিষয়ে, ছোট ছোট কামনা নিয়ে, মানুষ এমন মুগ্ধ থাকে যে যথার্থ সুখের সন্ধানই পায় না, তাই এদের সম্মুখ সংগ্রামে নিহত করা অবশ্যই কর্তব্য। এটিই হল অসুর নিধনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

তৃতীয়তঃ—দেবতাগণ বলছেন **'দিবং প্রযান্তু অহিতান্ বিনিহংসি দেবী'** অর্থাৎ আনন্দময়ী মা আমার, তুমি যখন সম্মুখে দাঁড়াও তখন যাবতীয় অসুরভাবই বিনষ্ট হয়ে যায় (অহিতান বিনিহংসি)। এতে আমাদের পরম মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়, স্বর্গের পথ খুলে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে যদি যথার্থ নিধন বলে কিছু থাকত, যদি অনুপকার, নিষ্ঠুরতা বলে কিছু থাকত তবে তোমাতে উপকার-অনুপকার বা দয়া-নিষ্ঠুরতারূপ দুটি ধর্ম দেখতে পেতাম। কিন্তু যখন তোমার প্রত্যেক ইচ্ছাই মঙ্গলপ্রসূ, প্রত্যেক কার্যই মঙ্গলময় তখন অমঙ্গল বা নিষ্ঠুরতা বলে কিছু থাকতে পারে না।

মা ! তুমি দয়া করে আমাদের এ ভেদজ্ঞান দূর করে দাও, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে একমাত্র তুমি ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। যাতে আমাদের বোধ হয় যে ধ্বংস এবং সৃষ্টি এ উভয়ই তোমার তুল্য—আনন্দলীলা, দয়া আর নিষ্ঠুরতা তোমারই এক প্রকাশ। আবার কেউ যদি ভাবে যে মা ! তুমি তো সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ংকারী মহাশক্তি, তোমার ইচ্ছামাত্রেই অসুর বিনষ্ট হতে পারে, তবে শত্রুগণের প্রতি এই অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ কেন ? দেবতারা তাই উনিশতম

শ্লোকে বলছেন—**'ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী'**। অর্থাৎ এর মধ্যেও তোমার 'সাধ্বী মতি'—মঙ্গলময়ী ইচ্ছা নিহিত রয়েছে। তোমার স্বহস্ত নিক্ষিপ্ত অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অসুররা পবিত্র হবে, নিষ্পাপ হবে, উৎকৃষ্ট লোকে গমন করবে—তোমাতে মিলিয়ে যাবে, এই উদার ও সাধ্বীমতি নিয়েই তো তোমার সংগ্রামলীলা। যাকে আমরা নিষ্ঠুরতা মনে করি তা করুণার আবেশ মাত্র।

সেইরকম ব্যষ্টি জীবের ক্ষেত্রেও যখন তুমি তাদের আসুরিক বৃত্তিনিচয়কে শস্ত্রপূত করো, তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনারাশিকে একটু একটু করে তোমার অভিমুখে আকর্ষণ করো, তখন চিত্তের বৃত্তিগুলোও জড়ত্বের মোহ কাটিয়ে একটু একটু করে তোমার বোধময় সত্তার সন্ধান পায়, আর তখনই তো তারা স্বর্গীয় সুখ ভোগ করতে থাকে। তাই দেবতারা ঊনবিংশ শ্লোকে বিনম্র কণ্ঠে বলছেন—**'লোকান্ প্রযান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ'** অর্থাৎ মা ! আমাদের বহির্মুখ বৃত্তিগুলিকে এইরকম বিন্দু বিন্দু আনন্দরস ভোগ করিয়ে, ক্রমে ক্রমে তোমাতে সম্যকভাবে মিলিয়ে দাও। তুমি মা তখন একমেবাদ্বিতীয়ম রূপে বিরাজ করো।

সমত্বপূর্বক (২০-২১)—প্রকরণটির প্রথম অংশে সাধক, পরেরটিতে অসুরের প্রতি মার কৃপা বর্ণনা করে, তৃতীয় অংশে বা শেষ দুটি শ্লোকে এই জীবজগৎ সর্বভূতে যে তাঁরই অংশ, এই সর্বভূতে তাঁর সমত্ব, এই সর্বভূতে তাঁর কৃপা বর্ণনা করেছেন।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখতে গেলে মনে হয়, এই মহিষাসুর যুদ্ধে দেবীর খড়্গ প্রভাসমূহের বিস্ফুরণে আর শূলাগ্রভাগসমূহের কান্তি দর্শনেও কেন অসুরগণের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়নি ? দেবতাগণ এই প্রশ্নের উত্তরে বিংশ শ্লোকে স্তুতি করে বলছেন—**'অংশুমদিন্দুখণ্ড যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং'** অর্থাৎ মা ! অসুরগণ তোমার সমুজ্জ্বল মুখচন্দ্র দেখতে পেয়েছিল বলেই তাদের দৃষ্টি বিলয়প্রাপ্ত হয়নি। তাৎপর্য হল, আসুরিক দৃষ্টি থাকলেও তোমার স্নেহকরুণা রূপের বদন-সৌন্দর্য দেখার সৌভাগ্যলাভ সকলেরই হতে পারে। অতি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচিত্তে তোমার ভজনা করতে পারে। গীতায়ও তাই তুমি বলেছ—**'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ**

সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ' (গীতা ৯।৩০)। অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমার ভজনা করে তবে তাকে সাধু বলে জানবে। আবার অন্য দৃষ্টিতে দেখতে গেলে 'অংশমদিন্দু' মানে চন্দ্রের কিরণ, কিন্তু আসলে সেটি সূর্যেরই কিরণ। চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত হয়ে সূর্যকিরণই চন্দ্রকিরণ রূপে দৃষ্ট হয়। সেইরকম যা আমরা আসুরিক ভাব বলে মনে করি তাও মা তোমারই সত্তায় সত্তাবান, তোমারই প্রকাশে প্রকাশিত, তা ভিন্ন তাদের আর কোনো পৃথক সত্তা নেই। আর যারা এ রহস্য অনুভব করতে পারে, তাদের আসুরিক দৃষ্টি বিলয় হওয়া বা না হওয়া উভয় তুল্য হয়ে থাকে। তুমিই তো মা সুর ও অসুর উভয় রূপে প্রকাশিত, কিন্তু আমরা তোমায় দেখে, ওই আকার দেখে মুগ্ধ (মোহগ্রস্ত) হই বলে প্রবঞ্চিত হই। কল্যাণীয়া মা ! তুমি আমাদের এই মোহদৃষ্টি দূর করো, কল্যাণ দৃষ্টি উন্মেষিত করো।

পরের একবিংশ শ্লোকে দেবতারা বলছেন— মা ! চিত্তের বৃত্তিসমূহ যতদিন অসৎ (নশ্বর) বস্তুতে আসক্ত থাকে, ততদিনই তারা দুর্বৃত্ত। আর এই দুর্বৃত্তদিগকে সম্যক্ প্রশমিত করাই তোমার কার্য। মা ! গীতায়ও তুমি বলেছ—**'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'** (গীতা ৪।৮)—দুষ্কৃতীদের বিনাশ করাই তোমার কার্য। কিন্তু কিরূপে ইহা নিষ্পন্ন হয় ? মা ! তোমার রূপ, বীর্য আর দয়াই হল এই দুষ্প্রবৃত্তি দমনের মূল। শ্রীশ্রীচণ্ডীর একুশতম শ্লোকে দেবগণ এটি বর্ণনা করেছেন।

রূপ—দেবতারা বলছেন **'রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যম্ অতুল্যমন্যৈঃ'** অর্থাৎ তোমার রূপ দেখলেই দুর্বৃত্ত ভাব প্রশমতি হয়।

চিন্তা—এটি হল চিত্তর বৃত্তি। কিন্তু তোমার রূপ অচিন্ত্যনীয়। তোমার রূপ যখন প্রকাশিত হয়, তখন চিত্ত বলে কিছু থাকে না, থাকতে পারে না, সুতরাং চিন্তাও থাকে না। তাই মা, দুর্বৃত্তদিগের বৃত্তপ্রশমন অনায়াসেই হয়ে যায়।

বীর্য— এর পরে দেবগণ স্তুতি করেছেন **'বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেব পরাক্রমাণাং'** অর্থাৎ মা আমার, যারা তোমার রূপহীন রূপের ধারণা করতে অসমর্থ তাদের জন্য বলা হয়েছে যে তোমার বীর্যও দুর্বৃত্তদিগের বৃত্ত প্রশমনে

সমর্থ। যে আসুরিক বৃত্তি দেবভাবগুলিকে নির্বীর্য করে দেয়, তাদের সেই শক্তিকে একমাত্র তুমিই বিনষ্ট করতে সমর্থ। তোমার যে বীর্য, যে মহতী শক্তি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কার্য অনায়াসে সম্পন্ন করে থাকে (জন্মাদ্যস্য যতঃ—ব্রহ্মসূত্র), সেই অমিত বীর্যের প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করলেও চিত্তবৃত্তি বিনা প্রযত্নে নিরুদ্ধ হয়ে যায়।

দয়া—আর যারা তোমার এই লীলাময়ী মহতী বীর্য শক্তিরও অনুধাবনে অক্ষম তাদের জন্য দেবতারা বলছেন—**'বৈরম্বপি প্রকৃটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম'** অর্থাৎ মা, তোমার অতুলনীয় দয়াই তাদের একমাত্র সম্বল মা ! জগৎময় তোমার যে অসীম দয়া ছড়ানো আছে, এই নিয়ত প্রত্যক্ষ, অতিশয় প্রকটিত, তোমার এই ভাব, তা সরল প্রাণে, সত্যজ্ঞানে একবার তোমার সম্মুখে মা বলে দাঁড়ালে আপন চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে যায়—অসুর ভাব বিলয়প্রাপ্ত হয়। মা ! আমরা তোমার কনিষ্ঠ অধিকারী তাই আমাদের পক্ষে তোমার তৃতীয় উপদেশই একান্ত উপযোগী। আমরা তোমার কৃপার ভিখারি। বিশ্বময় তোমার দয়াময়ী মূর্তি প্রকটিত রয়েছে। একদিন তুমি নিশ্চয়ই আমাদের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, একদিন নিশ্চয়ই তোমার দয়া উপলব্ধি করতে পারব। সেদিন আমাদের দুর্বৃত্ত ভাবও প্রশমিত হবে।

প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে দেবতারা তাই দেবীকে স্তুতি করে বলছেন—মা, তুমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী মহাশক্তি, তোমার পরাক্রমের তুলনা নেই। কিন্তু তোমার এই পরাক্রম জগতে যারা পরাক্রান্ত বলে পরিচিত তাদের ন্যায় নয়। জগতে পরাক্রান্তরা সাধারণত তাদের পরাক্রম দুর্বলের প্রতিই নিষ্ঠুরভাবে প্রযুক্ত করে থাকে। কিন্তু মা ! তোমার পরাক্রম ঠিক তার বিপরীত। বৈরীদলের প্রতি অসীম করুণাই তোমার পরাক্রমের স্বভাব। দেবি ! তোমার রূপও অতুলনীয় কেননা ভয়জনক ও মনোহরত্ব এই পরস্পরের বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় একমাত্র তোমার রূপেই বিদ্যমান। জগতে কোথাও এইরকম পরস্পর বিরোধী ধর্মের সম্মীলন সম্ভব হয় না। আমরা জগতে রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, উৎপীড়ন, সমর ইত্যাদি নিষ্ঠুরতা দেখি তাই অনেকসময় তোমার মধ্যে নিষ্ঠুরতাই দেখতে পাই। কিন্তু সাধনার উচ্চে উঠে সাধক তোমার চিত্তে কৃপা ও

সমর নিষ্ঠুরতা উভয় দেখে ধন্য হয়। তুমি যে সমর নিষ্ঠুরতার কঠোর আবরণে নিজেকে লুকিয়ে রেখে, জীব সন্তানদের প্রতি অসীম করুণাধারাই বর্ষণ করে থাক, তা তারা সর্বদা প্রত্যক্ষ করে এবং সকল অবস্থার মধ্যে দিয়েই, একমাত্র তোমার কৃপারূপ অনাবিল আনন্দরস পান করতে থাকে।

দেবীর প্রতি প্রার্থনা (২২—২৭)

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥ ২২ ॥
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে॥ ২৩ ॥
শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥ ২৪ ॥
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥ ২৫ ॥
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥ ২৬ ॥
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ॥ ২৭ ॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।২২—২৭)

সরলার্থ— হে বরদে দেবি ! আপনার এই শৌর্যবীর্যের তুলনা আর কার সঙ্গে হতে পারে ? আবার শত্রুদের ভীতি উৎপাদনকারী এবং এত মনোরম এই সৌন্দর্যই বা কার আছে ? হৃদয়ে কৃপা এবং যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা এই দুইয়ের একত্র অবস্থিতি এই ত্রিলোকে কেবল আপনার মধ্যেই দেখা গেছে॥ ২২ ॥

মাতঃ ! শত্রুদের বিনাশ করে আপনি এই ত্রিভুবন রক্ষা করেছেন। ওই শত্রুরাও আপনার হাতে নিহত হয়ে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছে এবং উন্মুক্ত অসুরদের ভয়ের থেকেও আমাদের বাঁচিয়েছেন, আপনাকে প্রণাম ॥ ২৩ ॥ দেবি ! আপনি শূল দিয়ে আমাদের রক্ষা করুন। অম্বিকে ! আপনি খড়্গ দিয়েও আমাদের রক্ষা করুন এবং ঘণ্টাধ্বনি ও ধনুকের টঙ্কার দিয়েও আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৪ ॥ হে চণ্ডিকে ! পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে আমাদের রক্ষা করুন এবং হে ঈশ্বরি ! ত্রিশূলের সঞ্চালন দ্বারা উত্তর দিকেও আমাদের রক্ষা করুন ।। ২৫ ॥ ত্রিলোকে আপনার যে সকল সুন্দর ও ভয়ংকর মূর্তি বিরাজিত, সেই সব দিয়েও আপনি আমাদের তথা এই ভূলোককে রক্ষা করুন ॥ ২৬ ॥ হে অম্বিকে ! আপনার করপল্লবে শোভিত খড়্গ, শূল ও গদা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, সে সবগুলি দিয়ে আপনি সর্বদিকে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৭ ॥ মেধা ঋষি বললেন—॥ ২৮ ॥

মূলভাব—এই প্রকরণের ৭টি শ্লোকে দেবতারা দেবীকে তিনভাবে প্রণতি জানিয়েছেন—মনোবাসনা পূর্ণ করার ইচ্ছা (২২—২৩), ভবিষ্যতে রক্ষার আর্তি (২৪—২৬) এবং দেবীকে অর্চনা (২৭)।

দেবতাদের মনোবাসনা পূর্ণ করা— দেবতারা স্তুতিতে বলছেন—মা ! ত্রিলোকের শান্তি, আমাদের অসুরভীতি মোচন আর অসুরদের স্বর্গপ্রদান তোমার এই কার্য দ্বারা আমরা কৃতার্থ। মা, তোমার দয়ার এ তো বাহ্যফল। কিন্তু প্রতি জীবের মধ্যে অসুরভীতি বিমোচন করে তুমি সত্যি তোমার দয়াময়ী নাম সার্থক কর। আমরা বহু জন্মের কামক্রোধাদির অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আমাদেরই সঞ্চিত সংস্কাররূপ অসুরগণের উৎপীড়নে (আসুরী ভাবে) উৎপীড়িত হচ্ছিলাম। মা তুমি স্বয়ং অসিহস্তে আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়ে সেই সংস্কাররূপ অসুরকুলকে নির্মূল করেছ। প্রাণের সঙ্কীর্ণতা দূর করেছ। মা ! আমাদের আর দেওয়ার কী আছে। শুধু আমাদের প্রণাম নাও।

দেবতাদের ভবিষ্যতে রক্ষার আর্তি—দেবতারা বলছেন—মা ! যেদিকে দৃষ্টিপাত করি সেদিকেই দেখি ঘন জড়ত্বের দুশ্ছেদ্য মূর্তি। দয়া করে জড়ত্বরূপ মহা অসুরের হাত হতে আমাদের পরিত্রাণ করো। উদ্ধার করো যেন আমরা

বিষয়বোধ, বিষয়ভোগ রূপ ত্রিতাপ বিষে দগ্ধ না হই। যেন পার্থিব ভোগ ঐশ্বর্য, অপার্থিব সিদ্ধি শক্তি বা স্বর্গাদি সুখও আমাদের মুগ্ধ করতে না পারে। মা ! আমরা এই জগতে তোমার দ্বিবিধ প্রকাশ দেখতে পাই। **'সৌম্যানি যানি রূপাণি........যানি চাত্যন্তঘোরাণি'**(৪।২৬)। একরূপে তুমি সৌম্যা অন্যরূপে তুমি ঘোরা।

যখন পার্থিব বা অপার্থিব সর্ববিধ সুখসম্ভার নিয়ে তুমি সৌম্যমূর্তিতে আমাদের সম্মুখে থাক, তখন যেন আমরা সুখের মোহ তোমার স্নেহের পরশে তোমাকেই বিস্মৃত না হই। সর্ববিধ সুখরূপে তুমিই যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হও একথা যেন আমরা কখনও না ভুলি। আবার যখন দুঃখ দুর্দৈবের অমানিশা উপস্থিত হয়, যখন রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে, লাঞ্ছনায়, মৃত্যুভয়ে আমরা উৎপীড়িত থাকি, তখন যেন বুঝতে পারি— মা, তুমিই ঘোরারূপে, মৃত্যুরূপে এসে আমাদের যেন কোলে করে বসে আছ। সে সময়ও যেন আমরা তোমার ভীতপ্রদায়িনী মূর্তি দেখে ভীতসন্ত্রস্ত না হই, অবসাদগ্রস্ত না হয়ে পড়ি, তোমার প্রতি যেন অটুট বিশ্বাস থাকে কেননা এ জীবনচক্র সুখ-দুঃখের পরিবর্তন নিয়ে নিয়ত পরিবর্তনশীল। মা ! এই সৌম্যা ও ঘোরা মূর্তিরূপে এসব তোমারই প্রকাশ। এই উভয় মূর্তিতেই তুমি আমাদের প্রতি বরদায়িনী হও, আমাদের রক্ষা করো। কেবল আমাদেরই নয়—**'তথাভুবম্'** এই বিশ্ববাসী যেখানে যত জীব আছে সবাইকে রক্ষা করো।

দেবতাদের অর্চনা— হে সর্বায়ুধধারিণী মা ! তোমার যত প্রকার আয়ুধ আছে যেমন খড়্গ, শূল, গদা, ঘণ্টাধ্বনি এই সকলই প্রয়োগ করো, সর্বদিক থেকে আমাদের রক্ষা করো। এই যে সর্বভাব, এই যে বহুভাব, বহুত্বভাব—এ সব হতে আমাদের সবাইকে রক্ষা করো। একমাত্র তুমিই সর্বভাবে অভিব্যক্ত, তদব্যতীত সর্ব বা বহু বলে আর কিছু নেই—এই সত্যে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করো। জগৎ হতে দুঃখ-ভয় চিরতরে মুছে থাক।

দেবতাগণ এই ভাবে স্তুতি করে ভক্তির সহিত ধূপ ও পুষ্পাদিসহ ভক্তিনম্র চিত্তে দেবীর পূজায় প্রণত হলেন **'প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্'**। পূজা করতে পারলেই, প্রণত হতে পারলেই মা আমার প্রসন্না হন।

দেবী অতঃপর বরদানে প্রবৃত্ত হলে, দেবগণ বলছেন — আমাদের আর কোনো কিছুই চাওয়ার নেই। তবে আমাদের এই দুটি প্রার্থনা পূরণ করো।

বর প্রার্থনা (৩১—৩৭)

দেব্যুবাচ॥ ৩১ ॥

ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্॥ ৩২

দেবা ঊচুঃ॥ ৩৩ ॥

ভগবত্যা কৃতং সর্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে॥ ৩৪
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ।
যদি চাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি॥ ৩৫
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ।
যশ্চ মর্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে॥ ৩৬
তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্।
বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্বদাম্বিকে॥ ৩৭

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।৩১—৩৭)

সরলার্থ—দেবী বললেন—॥ ৩১ ॥ হে দেবগণ! তোমরা সকলে আমার নিকট হতে তোমাদের অভিলষিত বর প্রার্থনা করো ॥ ৩২ ॥

দেবগণ বললেন—॥ ৩৩ ॥ হে দেবি ভগবতি! আপনি আমাদের সব ইচ্ছাই পূর্ণ করে দিয়েছেন, এখন আর কিছুই বাকি নেই॥ ৩৪ ॥ কারণ দেবশত্রু এই মহিষাসুর বধ হয়ে গেছে। হে মহেশ্বরি! তবুও যদি আপনি আমাদের বর দিতে ইচ্ছা করেন ॥ ৩৫ ॥ তাহলে আমরা যখনই আপনাকে স্মরণ করব, আপনি তখনই আবির্ভূতা হয়ে আমাদের মহাসংকট থেকে পরিত্রাণ করবেন, আপনি আমাদের এই বর দিন তথা হে অমলাননা দেবি অম্বিকে! যে মানুষ এই স্তোত্র দ্বারা আপনার স্তব করবে, বিত্ত, সমৃদ্ধি ও বৈভব দানের সাথে সাথেই তার ধনসম্পদ ও স্ত্রী-পুত্রাদি বৃদ্ধির জন্য আপনি সর্বদাই আমাদের প্রতি প্রসন্না থাকুন ॥ ৩৬-৩৭ ॥

মূলভাব — সাধক যখন মাকে দেখতে পায়, তখন আনন্দে বিস্ময়ে আনন্দহারা দিশাহারা হয়ে পড়ে। প্রথম দর্শন মাত্রেই সাধকের সকল অভাববোধের বিস্মৃতি ঘটে, কারণ মা যে পূর্ণতমা। কিন্তু মা যখন অপ্রকট হতে থাকেন, তখন সে ভাব অন্তর্হিত হতে থাকে আর চকিতের ন্যায় অভাবের মূর্তি ফুটে ওঠে, আর এই অভাববোধ হওয়ার নাম 'বরপ্রার্থনা'।

দেবতারা এখানে দুটি প্রার্থনা করেছেন—

প্রথম প্রার্থনা—দেবতারা বলছেন '**সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ**' অর্থাৎ আমরা যেন সতত তোমাকে স্মরণ করতে পারি আর তার ফলে আমাদের পরমাপদসমূহ যেন দূরীভূত হয়। 'পরমাপদ' শব্দর অর্থ পরমের আপদ অর্থাৎ আমাদের পরমস্বরূপে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে যাহা অন্তরায় তাই পরমাপদ ! 'আমি সর্বদা পরমাত্মরূপে অবস্থান করব' এই ব্রাহ্মিস্থিতির প্রতিকূল যত বাধাবিঘ্ন আছে সবই 'পরমাপদ'। এককথায় মাকে ভুলে থাকাই পরমাপদ। মা ! তুমি এত নিকটে, এত প্রত্যক্ষ তবু আমরা তোমাকে ভুলে জগতের ধুলো নিয়েই চরিতার্থ হই। আমাদের পক্ষে এর চেয়ে বিপদ আর কী হতে পারে ? তাই প্রার্থনা যেন পুনঃ পুনঃ তোমায় স্মরণ করতে পারি—আর তার ফলে আত্ম-স্বরূপ পাওয়ার বিঘ্ন যেন দূর হয়।

দ্বিতীয় প্রার্থনা — দেবতারা বলছেন '**বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্বদাম্বিকে**'। মাগো ! যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাক, তবে সেই প্রসন্নতার ফল এই বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক। জগতে যারা সাধারণের চক্ষুতে দুরাচার বলে পরিচিত তারাও এইরকম স্তবস্তুতির সাহায্যে তোমার নিত্যপ্রসন্নতা উপলব্ধি করতে সমর্থ হোক। যদিও জীব-জগৎ মরণধর্মশীল, তাও তোমারই কৃপায় তারাও অমরত্বের আস্বাদ লাভ করুক। তুমি এমনি করেই প্রতি জীবহৃদয়ে ভোগ-মোক্ষ-বিধায়িনী নিত্যপ্রসন্না অম্বিকা মূর্তিতে আবির্ভূত হও। তোমার চরণে সকাতরে প্রণত হয়ে প্রার্থনা করি—মাগো ! সকলের মঙ্গল হোক, বিশ্বের মঙ্গল হোক।

———o———

বিষ্ণুমায়া-স্তুতি

পঞ্চম অধ্যায় (৮—৮২)

প্রাক্‌কথন

শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের তৃতীয় স্তুতিটি আছে উত্তরচরিতের পঞ্চম অধ্যায়ের নয় থেকে বিরাশি পর্যন্ত চুয়াত্তরটি শ্লোক নিয়ে। স্তুতিটিতে দেবগণ কর্তৃক শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধের জন্য দেবীর প্রতি প্রার্থনা করা হয়েছে। পূর্বে মধু-কৈটভ বধ প্রসঙ্গে ব্রহ্মাস্তোত্র এবং মহিষাসুর বধাবসানে শক্রাদিস্তোত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু এই উভয় স্তোত্র অপেক্ষা বিষ্ণুমায়া স্তুতির বিশেষত্ব অনেক বেশি। পূর্ব পূর্ব স্তোত্রদ্বয়ে মাতৃ-মহত্ত্ব, মাতৃ-করুণা, মায়ের সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। আর এই স্তোত্রটি প্রণতি প্রধান। এখানে মাকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভ্রান্তি প্রভৃতি সর্বভাবের মধ্যে দর্শন ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করা হয়েছে। যে পরিমাণে জ্ঞানের বিকাশ হতে থাকে, সেই পরিমাণেই জীব বুঝতে পারে যে, 'আমি' একটা দুরপনেয় অজ্ঞানমাত্র। তখন সাধক আমিত্বকে তাঁহার চরণে অবনত করতে চেষ্টা করে। এইভাবে যে সাধক জ্ঞানের যত উচ্চস্তরে আরোহণ করে, ততই অবনত হয়ে পড়ে।

জ্ঞান হওয়া মানেই অজ্ঞানতা যে কত বেশি ছিল বুঝতে পারা। অজ্ঞানতার স্বরূপ বুঝতে পারলে জ্ঞানের চরণে অবনত হতে আর কোনো সঙ্কোচ বা দ্বিধা উপস্থিত হয় না। দেবতাগণ তাই পুনঃ পুনঃ প্রণাম করে তাঁদের অভীষ্ট লাভের পথ সুগম করে তুলেছেন। শুম্ভবধের অবসানে আমরা যে 'নারায়ণী স্তুতি' পাই তাও প্রণতি প্রধান। প্রণতিই সাধনার রহস্য। ভক্তিপূর্বক প্রণত হতে পারলেই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর হয়। আমরা দেহাত্মবোধ বিশিষ্ট-ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম কীটাণু, কিন্তু আমাদের মস্তক কিছুতেই অবনত হতে চায় না। এই 'আমিটা' যদি ঈশ্বরীয় চরণতলে অবনত হয়ে পড়ে তাহলে যে ঈশ্বরীয় গৌরব লাভ হয় তা বুঝি না বলেই আমাদের এই দুর্দশা। এখনও এদেশের ব্রাহ্মণগণকে স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুরা দর্শনমাত্র মস্তক অবনত করে প্রণাম করে কেন? কারণ একদিন এই ব্রাহ্মণই তার আমিত্বকে বিশ্বেশরীর চরণতলে যথার্থ

নত করতে পেরেছিল তাই তার বংশধরগণ এখনও সমগ্র হিন্দুজাতির নিকট প্রণম্য।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তর চরিত্রে মায়ের আখ্যান বা 'শুম্ভবধ' যা অতিশয় গহন ও তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ। উচ্চাধিকারী ব্যতীত, নির্মল বুদ্ধি ব্যতীত এ রহস্যে প্রবেশ করা দুরূহ। গুরুকৃপা, শাস্ত্রকৃপা আর আত্মকৃপা—এই ত্রিবিধ কৃপা ব্যতীত কেউই এই মোক্ষরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। আর এই ত্রিবিধ কৃপারূপে মা একমাত্র তুমিই আবির্ভূত হও। তুমিই গুরু, তুমিই শাস্ত্র আবার তুমিই কৃপা। মা! তুমিই সন্তানবৎসলা। তুমিই আমাদের দুর্গম পরমাত্মতত্ত্বে উপনীত করো। যতদিন না তুমি জীবকে বিশিষ্টভাবে শাস্ত্রবাক্যসমূহের চৈতন্যময়ত্ব উপলব্ধি করার যোগ্যতা প্রদান কর, ততদিন বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও জীবের অজ্ঞানতা দূর হয় না।

উত্তর চরিত্রে আছে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ আখ্যান। শুম্ভ হল অস্মিতা। অস্মিতা কী? অস্মি শব্দের উত্তর ভাবার্থে তা প্রত্যয় যুক্ত হলে অস্মিতা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। আমি, আমি ভাবটির নামই অস্মিতা। এই বিচিত্র বিশ্ব, স্ত্রী-পুত্রাদি সংস্কার, যশ মান, স্থূল, সূক্ষ্ম দেহ সবই অস্মিতায় অবস্থিত। জীব যা কিছু করে, যা কিছু ভাবে, তার প্রত্যেকটির সঙ্গে এই আমি ভাব একান্ত বিজড়িত। এ দেহাত্মবোধের আমি নয়, এ হল 'বিজ্ঞানময় কোষের' (বুদ্ধির) আমি। পাতঞ্জলদর্শনে আছে—দৃকশক্তি পুরুষ এবং দর্শন শক্তি বুদ্ধি। এই উভয়ের অভিন্নতা প্রতীতির নামই অস্মিতা। ইহাই হল দেবীমাহাত্ম্যের ভাষায় মহাশুর শুম্ভ। বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং মন—এ সকলই বুদ্ধিতে গিয়ে পরিসমাপ্ত হয়।

নিশুম্ভ হল মমতা। 'আমার আমার' ভাবটির নাম মমতা। অস্মিতা যেমন 'অহং'-এর সূক্ষ্মতম অবস্থা, মমতা তেমন অহং-এর সূক্ষ্মতম ভাববিশেষ। ইহারা পরস্পর সহোদর। যেখানে অস্মিতা সেখানেই মমতা। তাই শুম্ভ ও নিশুম্ভ উভয়ের একত্র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তর চরিতের প্রথম শ্লোকেই (পঞ্চম অধ্যায়) তাই মেধস ঋষি বলছেন—

'শচীপতেঃ ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ' (চণ্ডী ৫।১)

এখানে 'শচীপতেঃ' অর্থ মায়া উপহিত চৈতন্য—গীতার অক্ষর পুরুষ। শুম্ভ ও

নিশুম্ভ উভয়েই অসুর অর্থাৎ সুর বিরোধী। ইহারা **'মদবলাশ্রয়াৎ'** মদ ও বলের সাহায্যে শচীপতির ত্রিলোক এবং যজ্ঞভার হরণ করেছে।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণাত্মক ত্রিলোকের যথার্থ অধিপতি এই শচীপতি আর এখানে শচী অর্থ মায়া আর তাঁর পতি হল মায়োপহিত চৈতন্য, অস্মিতা নয়। অস্মিতা হল বুদ্ধিতত্ত্ব এবং ইহা জড় বা মায়িক আর চৈতন্যের সত্তাতেই এর সত্তা, নাহলে এর পৃথক সত্তাই নেই। তবে অস্মিতা (আমি, আমি ভাব) হল অসুর ভাব, তাই সে আপনাকে সর্বময় কর্তারূপে দেখতে চায়। এই আমারও যে একজন প্রকাশক আছে তা সে কিছুতেই ভাবতে পারে না। আবার কেবল ইহাই নয়, সে যজ্ঞভাগও অপহরণ করে থাকে। এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডে যজ্ঞাগারে প্রতিনিয়ত কর্মরূপে যা কিছু অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই সমস্ত কর্ম, এবং তার ফল সে আপনাতেই দর্শন করে। 'আমি' যথার্থভাবে বললে যে পরমাত্মা বোঝা যায়, তাকে পরিত্যাগ করে, অস্মিতাই (আমি আমি ভাব) আত্মরূপে প্রতিভাত হতে থাকে। এই হল শুম্ভাসুরের যথার্থ রহস্য।

পূর্ব পূর্ব চরিতে মধুকৈটভ ও মহিষাসুর প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে। যতক্ষণ সাধক মধুকৈটভ ও মহিষাসুররূপী কামনা, বাসনা, কাম, ক্রোধাদি রিপুদের অত্যাচার দূর করার সাধনার ব্যস্ত থাকে ততদিন তার স্বরূপের দিকে তাকাবার অবসর থাকে না বা সামর্থ্যও থাকে না। কিন্তু যখন মায়ের কৃপায়, শ্রীগুরুর অহৈতুক আশীর্বাদে সাধক বহিঃশত্রুর (স্থূল ইন্দ্রিয়াদির) অত্যাচার প্রশমিত করতে সমর্থ হয়, তখনই তার স্বরূপের দিকে তাকাবার সামর্থ্য আসে। সাধনের উচ্চস্তরে আরোহণ করে সাধক বুঝতে পারে এতদিন সে যে অসুরভাব কর্তৃক উৎপীড়িত হচ্ছিল তা তো ছিল অতি স্থূল, কিন্তু এখন আরো সূক্ষ্মতর উপদ্রবের কবলে পড়েছে, এ হল বুদ্ধি বা অস্মিতার অত্যাচার।

এতদিন বুদ্ধি বা বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে সাধনা চলছিল। প্রথমে স্থূলদেহ, তারপর ইন্দ্রিয়বর্গ ও পরে মনের গণ্ডি পার করে এসে সাধক বুদ্ধিক্ষেত্রে এসে দাঁড়ায়। এখানে এসে সাধক দেখে এই বুদ্ধিও আমিত্ব দোষে দুষ্ট। আর এই বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থিত বুদ্ধির আমিত্ব—মহান, বিশাল প্রায় ঈশ্বরতুল্য। এঁকে বিতাড়িত করা অতীব দুঃসাধ্য। সাধক এতদিন বুঝে এসেছে

যে সে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর বা চিৎশক্তির আশ্রয়ে অবস্থিত আর এখন অনুভব করে সে আসলে বুদ্ধিরূপী জড় আমিত্বের আশ্রয়েই প্রতিভাত হচ্ছে। এ সূক্ষ্ম আমিত্ব বড় ভয়ানক জিনিষ। এ যেন **'মরিয়াও মরে না এ কেমন বৈরী'**।

সাধক সাধন জীবনের প্রথমেই জেনেছে যে 'আমি আমি' ভাব না গেলে মা আসেন না। আর সাধন জীবনের অন্তিমে এসে সাধক উপলব্ধি করে যে এই 'মা'ই তো দুর্জয় দৈত্য মহিষাসুরের হাত থেকে পূর্বে রক্ষা করেছেন, তাই এবারও এই অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাঁরই শরণাগত হলে, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের এই শুম্ভাসুররূপী অস্মিতার ('আমি' ভাবের) হাত থেকে পরিত্রাণ করবেন। দেবতাগণের যে **'বিষ্ণুমায়া স্তুতি'** তা এই উপলব্ধি থেকে স্তুত যে আমরা যদি মাকে সকল শক্তির প্রকাশের মধ্যে অনুভব করি, প্রণত হই, মা বলে কেঁদে উঠি তবে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের মায়ারূপী অসুরের অস্মিতার আবরণ থেকে মুক্ত করবেন।

স্তুতিটি তিন প্রকরণে স্তুত—

দেবীকে প্রণতি	৮—১৩
দেবীর বিভূতিকে প্রণতি	১৪—৭৬
দেবীর প্রতি প্রণাম ও প্রার্থনা	৭৭—৮৩

দেবীকে প্রণতি (৮—১৩)

দেবা উচুঃ ॥ ৮ ॥

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥ ৯ ॥
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ॥ ১০ ॥
কল্যাণ্যৈ প্রণতাং বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ।
নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ॥ ১১ ॥

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥ ১২ ॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥ ১৩

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।৮—১৩)

সরলার্থ—দেবগণ বললেন—॥ ৮ ॥ দেবীকে প্রণাম, মহাদেবী শিবাকে সর্বদা প্রণাম। (সৃষ্টিশক্তিরূপিণী) প্রকৃতিকে প্রণাম এবং (স্থিতিশক্তিরূপিণী) ভদ্রাকে প্রণাম। আমরা স্থিরচিত্তে জগদম্বাকে প্রণাম করি॥ ৯ ॥ রৌদ্রাকে (সংহারশক্তিকে) প্রণাম। নিত্যা, গৌরী এবং জগদ্ধাত্রীকে বারংবার প্রণাম। জ্যোৎস্নাময়ী চন্দ্ররূপিণী এবং সুখস্বরূপা দেবীকে সতত প্রণাম॥ ১০ ॥ শরণাগতের কল্যাণকারিণী, বৃদ্ধি এবং সিদ্ধিরূপা দেবীকে আমরা বারংবার প্রণাম করি। নৈর্ঋতী (রাক্ষসগণের লক্ষ্মী), রাজাদের লক্ষ্মী তথা শর্বাণী (শিবপত্নী) স্বরূপা জগদম্বা আপনাকে বার বার প্রণাম॥ ১১ ॥ দুর্গা (দুরধিগম্যা), দুর্গপারা (দুস্তর ভবসাগরতারিণী), সারা (সকলের সারভূতা), সর্বকারিণী, খ্যাতি, কৃষ্ণা ও ধূম্রাদেবীকে সর্বদা প্রণাম॥ ১২ ॥ বিদ্যারূপে অতিসৌম্যা এবং অবিদ্যারূপে অতিরুদ্রারূপা দেবীকে প্রণাম, বারংবার প্রণাম। জগতের আশ্রয়রূপিণী কৃতি (ক্রিয়ারূপা) দেবীকে বারংবার প্রণাম ॥ ১৩

এই প্রকরণের ছয়টি শ্লোকের প্রতিটি শ্লোকে দেবতাগণ মাকে বারংবার 'নমঃ' বলে স্তব করেছেন, আমিত্ব বোধকে সর্বতোভাবে বিনত করেছেন। আমাদের দেহাত্মবোধের গর্বিত মস্তক কিছুতেই অবনত হয় না। কিন্তু আমিত্বের উন্নত শির অবনত করার পক্ষে প্রণামের চেয়ে আর সহজ উপায় নেই। আর প্রকৃষ্টরূপে অবনত হওয়ার নামই প্রণাম। 'আমি' বলে যে অজ্ঞানের বোঝা নিয়ে আমরা জ্ঞানের গর্বে মাথা উন্নত করি, ওই অজ্ঞানের ভাবকে, আমিত্ব বোধকে—প্রকৃত জ্ঞানের সমীপে সম্যক্ অবনত করার নামই যথার্থ প্রণাম। যে ব্যক্তি তার ওই অজ্ঞানতাকে জ্ঞানময় সর্বনিয়ন্তার পদতলে অবনত করতে না পারে, তার প্রণাম প্রণামই হয় না। গীতায় তাই ভগবান বলেছেন—**'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'** (গীতা ৪।৩৪) অর্থাৎ

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই ত্রিবিধ উপায়ের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট হতে তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করতে হয়।

প্রকরণটির দুটি ভাগ। প্রথম ভাগের দুটি শ্লোকে আছে উত্তরণ ও অবরোহণের পথে ভগবৎ আরাধনা (৭-৮) আর দ্বিতীয় ভাগে আছে অনির্বচনীয়া মা ! তোমাতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের যুগপৎ অবস্থানের স্তুতি (৯-১১)।

উত্তরণ ও অবরোহণ দৃষ্টিতে স্তুতি (৭—৮)

স্থূল সৃষ্টি থেকে সূক্ষ্মে উত্তরণ—

নমো দেব্যৈ—দেবীকে প্রণাম। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়লীলায় নিরতা, যিনি জীব-জগদাকারে বিশ্বমূর্তিতে সতত প্রকাশিতা, সেই নিত্যা স্বপ্রকাশরূপা মায়ের স্থূলমূর্তিতে প্রণাম।

মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ—প্রকট বিশ্বমূর্তি অপেক্ষা যাহা সূক্ষ্ম, যে অনির্দেশ্য, সূক্ষ্ম মহতী শক্তিতে এই জগৎ বিধৃত, প্রকাশিত ও অবস্থিত, সেই শিবা (মঙ্গলময়ী) মহাদেবীকে সতত প্রণাম। জীব যা কিছু পূজা-অনুষ্ঠান করে তা এই মহতী শক্তির পূজাই হয়ে থাকে।

নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ— পূর্বোক্ত স্থূল সূক্ষ্মের যিনি কারণ, সেই মূল প্রকৃতিরূপিণী জননীই ভদ্রা-সন্তানের মঙ্গলবিধায়িনী। স্থূল-সূক্ষ্মের অতীত ভদ্রা প্রকৃতিকে সতত প্রণাম করা যায় না, কারণ ইনি অব্যক্ত, কদাচিৎ কোনো ভাগ্যবান সাধক সন্ধান পেয়ে তাঁর চরণে প্রণিপাত করতে পারেন।

নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্— ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে সম্যক্ নিয়মিত অর্থাৎ সংযত করে যিনি তৎপদগম্য—বাক্য মনের অগোচর রূপে বিরাজমান, তাঁকে প্রণাম করি। তাঁকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, মনের দ্বারা ধারণা করা যায় না, বুদ্ধির দ্বারাও পরিগ্রহ করা যায় না—সেই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবের অতীত মাকে, সেই অজ্ঞেয়া 'জ্ঞা' স্বরূপা নিত্যসত্যস্বরূপা জননীকে প্রণাম।

এইরূপে দেবতারা **'নমো দেব্যৈ'** বলে মায়ের স্থূল মূর্তিকে, **'মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ'** বলে মায়ের সূক্ষ্ম স্বরূপকে **'নমঃ প্রকৃতৈ ভদ্রায়ৈ'** বলে কারণরূপিণী মাকে, এবং **'নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্'** বাক্যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণাতীত নির্গুণস্বরূপাকে প্রণাম করলেন। এই নিরঞ্জন সত্তাকে প্রণাম করতে

হলে ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়মিত সংযত করতে হয় বলে মন্ত্রে **'নিয়তাঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকরণের পরের শ্লোকে দেবতাগণ মার নিরঞ্জনক্ষেত্র থেকে আবার জগদ্‌ভবে অবতরণের স্তুতি করেছেন—গুণাতীত স্বরূপ থেকে গুণময়ী ভাবে।

রৌদ্রায়ৈ নমো— গুণাতীত রূপের থেকে জগদ্‌ভাবে উত্তরণের সময় প্রথমেই মনে পড়ে মায়ের রৌদ্রা বা সংহারিণী তামসী মূর্তির কথা, কারণ ওই সংহারিণী শক্তিকেই আশ্রয় করে জগদাতীত সত্তায় উপনীত হতে হয়। তাই দেবতারা এই শ্লোকের প্রথমেই 'রৌদ্রায়ৈ নমঃ' বলে প্রলয়কারিণী রুদ্রশক্তিকে প্রণাম করেছেন।

নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্রৈ নমো নমঃ—এই প্রলয়ের অন্তরালে যা উপলব্ধি হয় তা নিত্য। তার হ্রাস-বৃদ্ধি ক্ষয়-উদয় কিছুই নেই। আর এই নিত্যবস্তুতে সত্ত্বগুণের অবভাস হতে থাকে। সে রূপটি অতীব রমণীয়, তাই দেবতারা মাকে **গৌরী** বলে সম্বোধন করেছেন। তারপরেই তাঁর সর্বজগৎ বিধৃতি ভাবটি ফুটে ওঠে ; তাই মা এখানে ধাত্রীরূপে প্রণম্য। এইভাবে ধাত্রী পর্যন্ত মাকে প্রণাম করে দেবতারা মাকে বলেছেন—**'জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ'** অর্থাৎ 'জ্যোৎস্না' ও 'ইন্দুরূপিণী' মাকে প্রণাম করা হয়েছে। এখানে ইন্দু হল মন (বা বিষয়সমূহ) ও জ্যোৎস্না হল তাঁর ব্যাপ্তি অর্থাৎ উদ্ভাসিত বিষয়সমূহের মধ্যে মাকে ব্যাপ্তরূপে দর্শন করেন।

এইভাবে যাঁরা সর্বত্র সর্বভাবের ভেতর দিয়ে উদ্ভাসিত মাকে প্রণাম করতে বা দর্শন করতে সমর্থ হন, তাঁরা কী জগদ্‌ভাবে, কী জগদাতীত ভাবে, সর্বত্রই অখণ্ড সুখময় সত্তার সন্ধান পান। অতঃপর অন্তরে-বাহিরে, ব্যক্ত-অব্যক্তে স্থূলে-সূক্ষ্মে সর্বত্র সেই এক আনন্দময় সত্তা প্রত্যক্ষ করেন এবং **'সুখায়ৈ সততং নমঃ'** বলে ধন্য হন। দেবতাগণ স্বর্গভ্রষ্ট পরাজিত হৃতসর্বস্ব, তবু বলছেন **'সুখায়ৈ সততং নমঃ'**।

সাধক যখন সর্বত্র সুখ স্বরূপাকে দেখবে তখন জগতের কামিনীকাঞ্চন তো দূরের কথা ধূলিমুষ্টি সম্ভোগেও সুখ। ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হলেও **'সুখায়ৈ সততং নমঃ'** আবার ব্রহ্মাণ্ডের কর্তৃত্ব পেলেও বলে **'সুখায়ৈ সততং নমঃ'**।

কারণ সুখ ভিন্ন কিছু নেই, যা অসুখ বলে মনে হয় তখন তাও সুখ বিশেষ।

দ্বিতীয় ভাগ

সকল বিরুদ্ধ ধর্মর মিলনক্ষেত্র রূপে মায়ের স্তুতি (৯—১১)

কল্যাণ্যৈ বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ নমো নমঃ—কল্যাণী অর্থাৎ মঙ্গলদায়িনী। সুখময়ী মাকে একবার সর্বমঙ্গলদায়িনী ভেবে প্রণাম করতে পারলে আর অকল্যাণ বলে কিছু থাকে না। তখন সাধক যে দিকে তাকায় কেবল কল্যাণমাত্রই দেখতে পায়। যাঁর নিকট কল্যাণী মূর্তিতে তুমি নিত্য প্রকটিতা, তাঁর বৃদ্ধি অর্থাৎ অভ্যুদয় এবং সিদ্ধি অর্থাৎ সফলতা—অভীষ্টপূরণ অবশ্যম্ভাবী। এইভাবে কী সংসারক্ষেত্র, কী সাধনরাজ্য তার সর্বত্রই বৃদ্ধি ও সিদ্ধিরূপে মাতৃ প্রকাশ হয়ে থাকে।

নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ—কিন্তু যখন সাধারণ মানুষের অভ্যুদয় হয় বা অভীষ্ট সিদ্ধ হতে থাকে, তখন তারা লক্ষ করতে পারে না যে মা-ই এই বৃদ্ধি সিদ্ধি রূপে আবির্ভূত হয়ে আছেন। আর তখনই তাদের অভ্যুদয়াদি অচিরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মা তখন তুমি সন্তানকে জ্ঞানালোক প্রদান করার জন্য ধীরে ধীরে সন্তানের নিকট প্রতিকূল শাসনময়ী মূর্তিতে আবির্ভূত হতে থাক। তখন মায়ের নাম নৈর্ঋতী বা রাক্ষসী। মা যখন তুমি সন্তানকে রাক্ষসী প্রকৃতিরূপে কোলে নিয়ে বসে থাক, তখন তাদের কার্যপ্রণালী আচার-ব্যবহার রাক্ষসোচিত হতে থাকে। রাক্ষসীমূর্তি মায়ের অঙ্কে অবস্থিত হলে তার স্থূল বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না।

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনানি সমানি চৈতানি নৃণাং পশূনাম্।
জ্ঞানং নরানামধিকো বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

(চাণক্যনীতি ১৭।১৭)

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন আদি পশু-বৃত্তির অনুশীলন করেই তারা পরম তৃপ্তি লাভ করে।

গীতায়ও ভগবান বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

(গীতা ৯।১১)

অর্থাৎ মনুষ্যদেহ আশ্রিত আমাকে যারা অবজ্ঞা করে, তারা রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি ধারণ করে। তাই আমরা দেখি একদিকে যেমন মায়ের কল্যাণ মূর্তি প্রকটিত হয়ে মানুষকে বৃদ্ধি-সিদ্ধি প্রদান করে, অন্যদিকে আবার মনুষ্যমধ্যে স্বার্থ ও অহং ভাব প্রবল হলে 'মা'ই নৈর্ঋতি মূর্তিতে প্রকটিত হয়ে মানুষের মধ্যে রাক্ষসীরূপ প্রকটিত করেন। এই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের যুগপৎ অবস্থান তোমাতেই সম্ভব। মা তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ভূভৃতাং **লক্ষ্ম্যৈ**—এখানে ভূ শব্দের অর্থ ক্ষিতি তত্ত্ব (শরীর) আর ভৃৎ-শব্দের অর্থ ধারণকারী অর্থাৎ ভূভৃৎ শব্দের অর্থ 'জড় দেহাভিমানী জীব' এবং তাদের লক্ষ্মী অর্থাৎ তদধিষ্ঠাত্রী চৈতন্য। লক্ষ্মী অর্থ শোভা আর চিদবস্তুই তো যথার্থ শোভা। তাৎপর্য এই যে, মা ! তুমি জড়ত্বাভিমানী জীবগণের নিকট চৈতন্যরূপে, প্রাণরূপে, লক্ষ্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করে থাক। মাগো, ইহাই তোমার ভূভৃৎলক্ষ্মী মূর্তি।

শর্বাণ্যৈ— আবার শর্বাণী বা প্রলয়ের দেবতা শিবের শক্তিরূপেও তুমি সকলকে প্রলয় কবলে গ্রহণ করে থাক। একরূপে তুমি ভূভৃত লক্ষ্মী অর্থাৎ জীব চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে কত শত জন্ম পরিগ্রহণ কর, আবার শর্বাণীরূপে সকলকে মৃত্যুর করাল কবলে প্রেরণ করো।

মা এইরূপ একদিকে কল্যাণী মূর্তিরূপে তুমি, বৃদ্ধি-সিদ্ধিদায়িনী আবার অন্যদিকে নৈর্ঋতি মূর্তিরূপে তোমার জন্মমৃত্যুরূপ সংসার ধর্মরূপিণী মূর্তি। তোমার এই একান্ত পরস্পর বিরুদ্ধ মূর্তিদের প্রণাম।

পরের শ্লোকে দেবতারা বলছেন—মা তুমি দুর্গা অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বস্বরূপা। তোমার প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি হয় না।

দুর্গপারায়ৈ—আবার তুমি দুর্গপারা অর্থাৎ এই দুর্গরূপ সংসার তুমিই পার করিয়ে থাক। যতদিন সর্বভাবাতীতা তোমাকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করা না যায়, ততদিন দুর্গম সংসার হতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

সারায়ৈ—তুমি মা সারা, স্থিরাংশরূপিণী। এত বড় চঞ্চল জগৎ যে স্থির সত্তায় প্রতিষ্ঠিত তাও তুমি অর্থাৎ তুমি নিত্যা, সচ্চিদানন্দরূপিণী।

সর্বকারিণ্যৈ— মা, তুমি সর্বকারিণী অর্থাৎ এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-

প্রলয়রূপ সর্বভাবের কারণও তুমি কেননা তুমিই এসব প্রকাশ করে থাক।

খ্যাত্যৈ—যশ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত খ্যাতি শব্দের আর একটি অর্থ হয় —'বিবেক খ্যাতি'। প্রকৃতি-পুরুষ বা জড়-চৈতন্যর পৃথকত্ব বিষয়ক যে সুদৃঢ় প্রতীতি, তাকেই সাংখ্য-দর্শনে বিবেকখ্যাতি বলে। মা! এই খ্যাতিরূপেও তুমি আত্মপ্রকাশ কর। এই প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্বের যথার্থ উপলব্ধিরূপ যার নাম বিবেকখ্যাতিরূপিণীও তুমি। তোমাকে প্রণাম।

তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ—আবার এই খ্যাতির বিপরীত অজ্ঞানময়ী কৃষ্ণামূর্তিও তুমি। যেখানে কোনোরূপ বোধের বিকাশ হয় না, শত সাধনাতেও অনুভব ফুটে ওঠে না, কেবলানন্দ স্বরূপ আত্মবোধ প্রকটিত হয় না, সেখানেও তুমিই **অজ্ঞানময়ী কৃষ্ণামূর্তিতে** বিরাজ কর। মা ! তোমার অজ্ঞানময়ী কৃষ্ণামূর্তিকে প্রণাম।

আবার এই উভয় মূর্তির মধ্যবর্তী অর্থাৎ খ্যাতি ও কৃষ্ণামূর্তির অন্তরালবর্তী আর এক মূর্তি আছে যিনি হলেন ধূম্রামূর্তি।

এই **ধূম্রামূর্তিতে** জ্ঞানের ঈষৎ আভাসযুক্ত অজ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়। তখন দেখা যায় তোমার কোনো কোনো সন্তান বেদশাস্ত্র স্বরূপ ব্যাখ্যানে পটু, সগুণ-নির্গুণ তত্ত্ব বিশ্লেষণে দক্ষ আবার কেহ কেহ মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়নে পটু, কিন্তু তোমার আনন্দময় স্বরূপের অনুভব থেকে একান্ত বঞ্চিত। তখন বোঝা যায় মা, তুমি ধূম্রামূর্তিতে তাদের অঙ্কে ধারণ করে রেখেছ। তোমার এই অপূর্ব ধূম্রামূর্তিকে প্রণাম।

এই প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে দেবতারা স্তুতি করছেন—

অতি সৌম্যা—মা ! একদিকে তুমি অতি সৌম্যা—স্নেহময়ী আনন্দময়ী দয়াময়ী মাতৃ-মূর্তি, অন্যদিকে তুমি আবার অতি রৌদ্রা।

অতি রৌদ্রা—অর্থাৎ ভয়ংকরী কৃষ্ণামূর্তিতে নিত্য প্রকটিতা। মা ! এই পরিদৃশ্যমান জগতেও এই উভয়বিধ মূর্তির লীলা প্রায়শই দেখতে পাই।

একদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী জলপ্লাবনরূপে তোমার অতি রৌদ্রা মূর্তিতে তোমারই সন্তানগণ অবর্ণনীয় কষ্ট পায় আবার অন্যদিকে দয়ারূপে সহস্র সহস্র জীব হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে তুমি অতি সৌম্যা মাতৃমূর্তিতে সাহায্যের সম্ভার বহন

কর। সন্তানের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে—একদিকে যেমন শাসনদণ্ডরূপে প্রকাশিত হও, অন্যদিকে আবার ব্যথাহারিণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে সন্তানের অশ্রু সহস্তে মুছিয়ে দাও। তবে কান্নার ভেতর আনন্দকে বুঝতে হলে 'যোগচক্ষু' বা 'মাতৃকৃপার' আবশ্যকতা থাকে। মায়ের সৌম্যা, রৌদ্র ও ভাবাতীত স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম করানোর উদ্দেশ্যে শ্লোকের অপর অংশে উদ্ধৃত হয়েছে—

'নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ' এখানে প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ হল আশ্রয় আর জগৎপ্রতিষ্ঠা হল জগতের আশ্রয়। অর্থাৎ জগতের নিমিত্ত ও উপাদানরূপ যে আনন্দময় চৈতন্য সত্তা আছে, তাঁহাকে প্রণাম করতে হয়, বুঝতে হয়, উপলব্ধি করতে হয়। তারপর কৃতিদেবীকে অর্থাৎ যে ক্রিয়াশক্তি অখণ্ড আনন্দ বস্তুকে এই খণ্ড জগদাকারে আকারিত করেছে তাঁকেও প্রণাম করতে হয়। আমরাও যেন 'নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ' বলে অভিন্ন 'নিমিত্তোপাদান' কারণরূপিণী মা এবং **'দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ'** বলে সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলংকারীরূপী মহতী ক্রিয়াশক্তি 'কৃতিদেবীর' চরণে ভুয়ো ভুয়ঃ প্রণাম করি।

দেবীর বিভূতিকে প্রণতি (১৪—৭৬)

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ (১৪) নমস্তস্যৈ (১৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৬ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ (১৭) নমস্তস্যৈ (১৮) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৯ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২০) নমস্তস্যৈ (২১) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২২ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৩) নমস্তস্যৈ (২৪) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৫ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৬) নমস্তস্যৈ (২৭) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৮ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ (২৯) নমস্তস্যৈ (৩০) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৩১ ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩২) নমস্তস্যৈ (৩৩) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৩৪ ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩৫) নমস্তস্যৈ (৩৬) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৩৭ ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩৮) নমস্তস্যৈ (৩৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৪০ ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪১) নমস্তস্যৈ (৪২) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৪৩ ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪৪) নমস্তস্যৈ (৪৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৪৬ ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪৭) নমস্তস্যৈ (৪৮) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৪৯ ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫০) নমস্তস্যৈ (৫১) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৫২ ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৩) নমস্তস্যৈ (৫৪) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৫৫ ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৬) নমস্তস্যৈ (৫৭) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৫৮ ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৯) নমস্তস্যৈ (৬০) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৬১ ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬২) নমস্তস্যৈ (৬৩) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৬৪ ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬৫) নমস্তস্যৈ (৬৬) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৬৭ ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ (৬৮) নমস্তস্যৈ (৬৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৭০॥
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৭১) নমস্তস্যৈ (৭২) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৭৩॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৭৪) নমস্তস্যৈ (৭৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৭৬

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।১৪—৭৬)

সরলার্থ—যে দেবী সব প্রাণীদের মধ্যে বিষ্ণুমায়া নামে কথিতা হন, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ১৪-১৬ ॥ যে দেবী সব প্রাণীর মধ্যে চেতনা নামে অভিহিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ১৭-১৯ ॥ যে দেবী সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার ॥ ২০-২২ ॥ যে দেবী সর্বভূতে নিদ্রারূপে বিরাজিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ২৩-২৫ ॥ যে দেবী প্রাণীদের মধ্যে ক্ষুধারূপে অবস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ২৬-২৮ ॥ যে দেবী সর্বভূতে ছায়ারূপে বিরাজমানা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বারংবার নমস্কার॥ ২৯-৩১ ॥ যে দেবী সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৩২-৩৪ ॥ যে দেবী সর্বভূতে তৃষ্ণারূপে স্থিতা আছেন, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৩৫-৩৭ ॥ যে দেবী সব প্রাণীদের মধ্যে ক্ষান্তি (ক্ষমা) রূপে অবস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৩৮-৪০॥ যে দেবী সব প্রাণীদের মধ্যে জাতিরূপে সংস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৪১-৪৩ ॥ যে দেবী সর্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৪৪-৪৬ ॥ যে দেবী সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শান্তিরূপে রয়েছেন, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৪৭-৪৯ ॥ যে দেবী সর্বভূতে শ্রদ্ধারূপে বর্তমান রয়েছেন, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে

বার বার নমস্কার॥ ৫০-৫২ ॥ যে দেবী সর্ব জীবে কান্তিরূপে বিরাজ করছেন, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৫৩-৫৫ ॥ যে দেবী সর্বভূতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৫৬-৫৮ ॥ যে দেবী সব প্রাণীর মধ্যে বৃত্তিরূপে স্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৫৯-৬১ ॥ যে দেবী সর্বভূতে স্মৃতিরূপে বর্তমান, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৬২-৬৪ ॥ যে দেবী সমস্ত প্রাণীর মধ্যে দয়ারূপে বিরাজিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৬৫-৬৭ ॥ যে দেবী সমস্ত জীবের মধ্যে তুষ্টিরূপে সংস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৬৮-৭০ ॥ যে দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৭১-৭৩ ॥ যে দেবী সর্বজীবে ভ্রান্তিরূপে বর্তমান, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৭৪-৭৬ ॥

মূলভাব—এই প্রকরণের ২৩টি মন্ত্রে দেবতারা দেবীর ২৩টি বিভূতির বর্ণনা করেছেন।

এই প্রকরণের শ্লোকগুলি প্রতিটি মন্ত্রেই তিনবার করে 'নমস্তস্যৈ' শব্দ আছে। এতদ্ভিন্ন নমো নমঃ পদ প্রতি মন্ত্রের অন্তিমে আছে। প্রথম 'নমস্তস্যৈ' মায়ের আধিভৌতিক স্থূলরূপটি অবলম্বন করে বিহিত হয়েছে। প্রণামটি কায়িক ও বাচনিকরূপে স্থূলেই অভিব্যক্ত। দ্বিতীয় 'নমস্তস্যৈ' মায়ের সূক্ষ্ম স্বরূপ লক্ষ্য করে উক্ত হয়েছে। এই সূক্ষ্ম চৈতন্য-শক্তিই নাম ও আকারবিশিষ্ট হয়ে স্থূল ভাবে অভিব্যক্ত হয়। ইহাকে মানসিক প্রণাম বলে। তৃতীয় নমস্তস্যৈ কারণ-স্বরূপের প্রণাম। যে আদি কারণ থেকে সূক্ষ্ম ও স্থূল—উভয়েই অভিব্যক্ত হয় তাকে উপলক্ষ করেই এই প্রণাম যা কারণ শরীরেই হয়। চতুর্থ প্রণাম হল 'নমো নমঃ'। এই প্রণাম স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের অতীত, বিশুদ্ধ বোধময় ক্ষেত্র বা পরম প্রিয়তম পরমাত্মায়ই প্রকটিত হয়। প্রথম হতেই শরণাগত ভাবের সাধক এই অদ্বৈত ক্ষেত্রেও 'নমো নমঃ' বলে এবং শুধু শরণাগত ভাবের সাহায্যেই পরমাস্পদ পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় আত্মহারা হয়ে যান, মিলিয়ে

যান। ইহাই তুরীয় অবস্থা বা চতুর্থ প্রণাম।

বিষ্ণুমায়েতি—বিষ্ণুমায়া হলেন জগদ্ব্যাপিনী মহতী স্থিতিশক্তি, মহতী চিতিশক্তি। দেবীর যে অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, আনন্দময় স্বরূপের কথা শাস্ত্রে বলেছে, তিনি যখন সর্বভূতাকারে আকরিত হন, সর্বভূতরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, ঈক্ষণ করেন, অনুভব করেন তখনই তিনি বিষ্ণুমায়া নামে অভিহিত হন।

চেতনেত্যভিধীয়তে—মা তোমার চেতনা শক্তি, স্থূলে নামরূপ আকারে, সূক্ষ্মে প্রাণশক্তিরূপে এবং কারণরূপে অব্যক্ত বীজরূপে অবস্থিত। তোমারই স্থূলাভিমানী চৈতন্য বিশ্ব, সূক্ষ্মাভিমানী চৈতন্য তৈজস এবং কারণাভিমানী চৈতন্য প্রাজ্ঞনামে অভিহিত।

বুদ্ধিরূপেণ—মা ! তুমি বুদ্ধিরূপিণী। ব্যষ্টি বুদ্ধিরূপে প্রতি জীবে, সমষ্টি বুদ্ধিরূপে মহত্তত্ত্বরূপে এবং বুদ্ধির বীজরূপে অব্যক্তক্ষেত্রে তুমি অবস্থিত। ব্রাহ্মণগণ '**ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ**' বলে যে ধীকে লাভ করার জন্য ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী মন্ত্রে প্রার্থনা করেন, তা শ্রদ্ধাভরে করতে পারলে—যে মহতী বুদ্ধিতে আমাদের ব্যষ্টি বুদ্ধি অবস্থিত তাঁর অর্থাৎ মহদাত্মার সন্ধান পাওয়া যায়।

নিদ্রারূপেণ—মা তুমি নিদ্রারূপিণী। আমরা যখন এই দুঃখময় ত্রিতাপময় জগতে বিচরণ করতে করতে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ি, তখনই তুমি নিদ্রামূর্তিতে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধর। আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাপার এবং অন্তঃকরণ বৃত্তি যখন সম্যক্ নিরুদ্ধ থাকে, তখন জ্ঞানময়ী মা তুমি 'কিছুই জানি না' রূপ অজ্ঞানটিকে ধরে থাক।

ক্ষুধারূপেণ— মা ! তুমি ক্ষুধারূপে—ভোজনেচ্ছারূপে সর্বভূতে বিদ্যমান। আমাদের পঞ্চকোষের প্রতিটি কোষেই বুভুক্ষা বা আহারের ইচ্ছা বর্তমান। স্থূল শরীর বা **অন্নময় কোষের** আহার অন্ন, **প্রাণময় কোষের** আহার জীবনীশক্তি, **মনোময় কোষের** আহার চিন্তা, **বিজ্ঞানময় কোষের** আহার জ্ঞান আর **আনন্দময় কোষের** আহার প্রীতি, আনন্দ ইত্যাদি। কত জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমরা এই জগৎ ভোগ করে আসছি, আর এই পথে আসতে

হয় কত শোক দুঃখ, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। তবু তো আমাদের বিষয় ক্ষুধা যায় না। কিন্তু মা—যে তোমার এই ক্ষুধা মূর্তির চরণে সত্য সত্যই প্রণত হতে পারে, তার ভবক্ষুধা তুমি চিরতরে দূর করে দাও। মা ! আমার প্রণাম গ্রহণ করে আমাদের বিষয় ক্ষুধানল চিরতরে নির্বাপিত করে দাও, মা !

ছায়ারূপেণ—মা তুমি ছায়ারূপিণী। এখানে ছায়া শব্দের অর্থ জীবভাব। উপনিষদ্ বলছেন— **'ছায়াতপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি'**, আচার্য শংকরও ছায়া শব্দের অর্থ জীবাত্মা করেছেন। সাধারণ ছায়া যেমন প্রকাশের আবরক হয়, সেইরকম 'জীবচ্ছায়া'ও পরমাত্মস্বরূপের আবরক হয়। এই আবরণ দূর করার জন্যই এত প্রণাম, এত শরণাগত ভাব। প্রণাম করতে করতে মিথ্যাভিমান 'আমি ভাব' দূর হয়। আর অভিমান দূর হলেই ছায়াকে অর্থাৎ জীবভাবকে আর একটা পৃথক সত্তা বলে মনে হয় না। প্রতিবিম্বের কোনো পৃথক স্বতন্ত্রতা নেই, বিম্বের সত্তায়ই যে প্রতিবিম্বের সত্তা, এটি তখনই ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা যায়। একমাত্র আত্মাই আছেন এ উপলব্ধির সব চেয়ে সহজ উপায় 'সর্বভূতে ছায়াদর্শন' (ভগবৎ প্রতিবিম্ব) দর্শন করা। যাঁদের বুদ্ধিতত্ত্ব সম্যক্ উন্মেষিত হয়েছে তাঁরা এই জীবজগৎকে তাঁর যথার্থ ছায়ারূপে প্রত্যক্ষ করেন। গীতায় ভগবান বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (গীতা ১৮।৬১)

অর্থাৎ 'ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করে জীবগণকে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত করেন'। জীব যে ছায়ামাত্র (ভগবৎ প্রতিবিম্ব) ভগবদ্বাক্য দ্বারা এ বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। সাধক রামপ্রসাদও গেয়েছেন—

'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমি ঘর তুমি ঘরণী
আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।'

তাহলে এখন বিচার্য যে জীব যদি ঈশ্বরের প্রতিবিম্বই হয়, জীবানুষ্ঠিত কর্মসমূহ ঈশ্বর-কর্তৃকই সম্যক্ভাবে নিয়মিত হয়, তবে তো আর ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য বলে কোনো বিচার থাকতে পারে না। এটা ঠিক, কারোর যদি সত্যি

নিজেকে পরমেশ্বরের ছায়ামাত্র বলে উপলব্ধি হয় তবে তাঁর পাপ পুণ্য বলে কিছু থাকে না। কিন্তু এইরকম দর্শন বা অনুভূতি লাভের পূর্বে অর্থাৎ অহং কর্তৃত্বাভিমান বিদ্যমান থাকাকালে ধর্মাধর্মের বিচার থাকবেই।

আসলে তুমিই আমাদের বিম্ব, আবার তুমিই প্রতিবিম্ব। তুমিই পরমাত্মারূপে বিম্ব হয়েও বুদ্ধিতে চিচ্ছায়াসম্পাত দ্বারা স্বয়ং জীব বা ছায়া হয়ে বসেছ। তাই দেবতাগণের ন্যায় আমরাও তোমার ছায়াস্বরূপটিকে প্রণাম করি।

শক্তিরূপেণ—মা ! তুমি এক অদ্বিতীয়া মহাশক্তি। এ দৃশ্য জগতে সর্বভূতে যে শক্তির খেলা দেখি যেমন দৃকশক্তি, শ্রবণশক্তি ইত্যাদির কোনোটিই কিন্তু পৃথক নয়, একই মহতী শক্তি বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়ে বিভিন্ন কার্য সম্পাদিত করছে মাত্র। এই দুরধিগম্য মহাশক্তি সিন্ধুরই এক একটি তরঙ্গ, বিভিন্ন জীবজগৎ আকারে ফুটে উঠছে আবার ক্ষণকাল পরেই মিলিয়ে যাচ্ছে। তোমার এই ঈশ্বরী শক্তিমূর্তির চরণে আমরা একান্ত প্রণত হচ্ছি। হে মহাশক্তি ! তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করো।

তৃষ্ণারূপেণ—মা ! তৃষ্ণা-পিপাসারূপে তুমিই সর্বভূতে প্রকাশিতা। তবে তুমি যে কেবল জলপানেচ্ছারূপিণী তৃষ্ণা তা নয়, একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষারূপেও বুকের ভেতর তুমি তো সদাজাগ্রত রয়েছ। কত জন্ম ধরে জীব তোমার এই তৃষ্ণামূর্তিকে পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা করে চলেছে কিন্তু পারেনি। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য পেলেও যে এ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু এ তৃষ্ণাও যে তুমি, জীব তা বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন তোমার কৃপায় বুঝতে পারি, এই তৃষ্ণারূপে, আকুল আকাঙ্ক্ষারূপে, তোমারি প্রকাশ, তখন তোমায় মা নমস্তস্যৈ বলে প্রণাম করি। মাকে বলি, মা তুমি আমাদের নিকট আর বিষয় তৃষ্ণামূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করো না। রসময়ী মা তুমি কেবল তোমাকে লাভ করার প্রবল পিপাসারূপেই প্রকাশিত হও, আমাদের ধন্য করো।

ক্ষান্তিরূপেণ — মা তুমি 'ক্ষমারূপে' প্রতি জীবের হৃদয়ে অল্পবিস্তর পরিমাণে অধিষ্ঠিতা। অন্য কর্তৃক উৎপীড়িত হয়ে, তার প্রতিকার করার সামর্থ্য থাকলে সেই অপকার নীরবে সহ্য করার ক্ষমতাই ক্ষমা। যে প্রবৃত্তির উদয় হলে আমাদের চিত্তে এইপ্রকার পরোপকার সহিষ্ণুতা ফুটে ওঠে, তাহাই

তোমার ক্ষমা মূর্তি। মা, তোমার এই ব্যষ্টি ক্ষমামূর্তিকে প্রণাম। আবার মা, এই বিশ্বব্যাপিনী ক্ষমামূর্তিও তোমার। তোমাকে কত অবহেলা করেছি, এখনও করছি, তোমার সত্য আদেশ, তোমার অব্যক্ত স্নেহাশীর্বাদ কত উপেক্ষা করেছি— কিন্তু মা ! তুমি তো একদিনের তরেও আমাদের প্রতি বিরক্তির কটাক্ষপাত করোনি। মা ! তুমি চিরহাস্যময়ী, চিরক্ষমাময়ী সর্বদাই আমাদের বুকে তুলে নিয়েছ। তোমার এই সমষ্টি ক্ষমাময়ী মূর্তিকে অসংখ্য প্রণাম।

জাতিরূপেণ— মা ! তুমি নিত্যা হয়েও বহু পদার্থে ব্যক্ত আর এইতো তোমার জাতিমূর্তি। জন্ম হতেই জাতির অভিব্যক্তি। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি জাতিরূপে, অথবা মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, পশুত্ব প্রভৃতি জাতিরূপে তুমি সমস্ত জীবকে অঙ্কে ধারণ করে আছ। মা, তুমি নিত্যা, তোমার এই জাতিমূর্তিও নিত্যই। তোমার এই ব্যষ্টি জাতিমূর্তিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

লজ্জারূপেণ—মা ! তুমি প্রতি জীবহৃদয়ে লজ্জামূর্তিতে আত্মপ্রকাশ কর বলেই তোমার সন্তানগণ প্রায়শই নিন্দিত কার্য থেকে বিরত থাকে। যদি জীবহৃদয়ে তোমার এই লজ্জামূর্তির অভিব্যক্তি না থাকত তাহলে জগৎ যথার্থই পশুরাজ্যে পরিণত হত। একদিকে যেমন তুমি অতুলনীয়া ক্ষমামূর্তিতে জীবকে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ দিয়েছ, অন্যদিকে তেমনি লজ্জামূর্তিতে উচ্ছৃঙ্খলতা হতে সংযত করে রেখেছ। ধন্য তোমার কৃপা। মা তুমি স্বয়ং লজ্জারূপিণী। কিন্তু তোমার সন্তান তোমার কাছে আসতে, প্রাণের গোপন কথা বলতে কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না, এই তোমার বিশেষত্ব। যেখানে লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, সংযম নেই, স্বেচ্ছাচারিতা নেই, যার সত্তায় এই সকলের সত্তা সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তত্ত্বরূপিণী মা তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

শান্তিরূপেণ—মানুষ বিষয় সংগ্রহ ও সম্ভোগজনিত চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে দিয়ে যে কণামাত্র শান্তির আশা করে, সেই শান্তিমূর্তি মা তোমারই । কিন্তু মা তুমি দয়া করে সবাইকে বুঝিয়ে দাও যে, শান্তির আশায় বাইরে ছুটে বেড়ানোর দরকার হয় না, শান্তি আছে অন্তরে। যতদিন না বিষয়-ভোগের আসক্তি বিদূরিত হয়, ততদিন তোমার এই অনির্বচনীয় কেবল শান্তিমূর্তির সন্ধানই পাওয়া যায় না।

শ্রদ্ধারূপেণ—শ্রদ্ধা শব্দটি 'শ্রঃ' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়। 'সত্যম্ নিয়তে শ্রদ্ধা' অর্থাৎ যে ধৃতি বা দৃঢ়তা নিয়ত সত্যকে ধারণ করে রাখে, তাহাই শ্রদ্ধা শব্দবাচ্য। তাই গীতা বলছেন—**যঃ যৎ শ্রদ্ধঃ স এব সঃ** (গীতা ১৭।৩) অর্থাৎ পুরুষ শ্রদ্ধাময় আর যার যেমন শ্রদ্ধা সেটিই তার স্বরূপ। মা ! যাদের তুমি এই কল্পিত মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত কর, তাদের হৃদয়েই তুমি সর্বপ্রথম শ্রদ্ধামূর্তির আবির্ভাব করে থাক। তখন তাহাদের গুরুবাক্যে, বেদান্তবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, সত্য প্রতিষ্ঠাই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়। এই সব বহির্লক্ষণ দেখেই আমরা বুঝতে পারি—মা, ওই সব জীবের মূর্তিতে তুমি প্রকটিত হয়েছ। গীতায় ভগবান বলেছেন— **'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'** (গীতা ৪।৩৯)। শ্রদ্ধা আত্মস্বরূপ জ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থা। যতদিন না শ্রদ্ধা লাভ হয়, ততদিন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের আশা বৃথা। শ্রদ্ধা ও নিশ্চয়জ্ঞান প্রায় একই কথা, সংশয় থাকতে নিশ্চয়জ্ঞান হয় না। তাই বুঝতে হয় যে যতদিন সংশয় থাকে, ততদিন মা আমার শ্রদ্ধামূর্তিতে প্রকাশিত হন না। আবার শ্রদ্ধা একবার লাভ হলে তা নষ্ট হয় না। সাধারণত মনে হয় আমরা কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করি, আসলে কিন্তু তা নয়, শ্রদ্ধা হল জ্ঞানেরই একটি অপূর্ব অবস্থা, উহা সত্যরূপে, নিঃসংশয়রূপে প্রকাশ পায়। যত কিছু সাধন-ভজন তা এই শ্রদ্ধা লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। যাঁর শ্রদ্ধালাভ হয়েছে তিনি ধন্য। মা তোমার ব্যষ্টি শ্রদ্ধামূর্তিকে প্রণাম।

কান্তিরূপেণ—মা ! কান্তি বা সৌন্দর্যরূপে তুমি, সর্ববস্তুতে নিত্য উদ্ভাসিতা। যতদিন তুমি জীবদেহে চেতনারূপে অধিষ্ঠিত থাক ততদিন তোমার কান্তিমূর্তি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। কেবল প্রাণিদেহ নয়, বৃক্ষ, লতা, পর্বত, নদনদী, গ্রহ-নক্ষত্র সর্বত্রই তোমার এই বিশিষ্ট কান্তিমূর্তির বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। মা ! তোমার এই ব্যষ্টি কান্তিরূপিণীকে প্রণাম। যে রূপ দেখে ব্রজাঙ্গনা আত্মহারা হয়ে ছুটত, যে রূপ দেখে গাভীগণ অর্ধভুক্ত তৃণ পরিত্যাগ করে তোমার পানে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকত, যে রূপ দেখে জড় যমুনার প্রাণময়ী উজান বয়ে যেত এ সেই রূপ।

গোপিগণ গোপিগীতায় বলছেন—

অটতি যদ্ভবান্ অহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥

(ভাগবত ১০।৩১।১৫)

হে কৃষ্ণ ! দিবাভাগে যখন তুমি বিপিনে ভ্রমণ কর, তখন হাস্যামৃত মাধুরীময় তোমার সুন্দর মুখমণ্ডল আমাদের চক্ষুগোচর হয় না সেইসময় এক ত্রুটি (ক্ষণার্ধকাল)ও যুগের মতো মনে হয়। আবার সায়ংকালে যখন তোমার কমল বদন আমাদের দৃষ্ট হয় তখন আমাদের নয়নের নিমেষই যুগান্তরের ন্যায় আমাদের মনকে বিরহসন্তাপে ব্যথিত করে। নয়নের পক্ষ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাকেও জড় বুদ্ধি বলে মনে হয়। সেই মনপ্রাণহরা রূপ, সেই কমনীয় কান্তি যার নেত্রপথে একবার নিপতিত হয়, এ সংসার-ব্রহ্মাণ্ডের আর এমন কিছুই নেই যা তাকে সেই লোভনীয় কান্তির স্মৃতি থেকে বিচ্যুত করতে পারে।

মা, সেই বিশ্বব্যাপিনী অনন্ত সৌন্দর্যময়ী তোমার কান্তিমূর্তিকে প্রণাম।

লক্ষ্মীরূপেণ—লক্ষ্মী শব্দের অর্থ প্রাণ (বা বিষ্ণু)। জীবদেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণই সে লক্ষ্মী বা শ্রীযুক্ত হয়ে থাকে। লক্ষ্মী শব্দের অর্থ শোভা-সম্পৎ সৌন্দর্য, যাহা কিছুই বলা হোক না কেন, প্রাণই ওই সকলের আধার। মা ! সর্বভূতে প্রাণরূপে লক্ষ্মীমূর্তিতে তুমিই বিরাজ কর। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও এই মূর্তি আমাদের নিয়তই অনুভবযোগ্য হয়ে থাকে। এই যে প্রতি জীবনের নিয়ত অনুভবযোগ্য প্রাণস্বরূপ সে তো তুমিই। মা ! ইহাই মা তোমার ব্যষ্টি লক্ষ্মীমূর্তি, তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম।

আবার বিশ্বব্যাপী মহাপ্রাণরূপেও তুমি অবস্থিত। মায়ের সমষ্টি প্রাণময়ী মাতৃমূর্তিকে উপলব্ধি করলে, অনুভব হয় যে সেই একই প্রাণসমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গগুলি জীবরূপে ফুটে উঠছে। সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে 'নমস্তস্যৈ' বলে প্রণাম করে যেন আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রাণটিকে ওই মহাপ্রাণসমুদ্রে ঢেলে দিয়ে জীবত্বের অবসান ঘটাই।

বৃত্তিরূপেণ—বৃত্তি শব্দের অর্থ জীবিকা অথবা চিত্তবৃত্তি। চৈতন্য যখন

কোনো কিছু আশ্রয় করে ব্যক্তভাবাপন্ন হন তখন তিনি বৃত্তি নামে অভিহিত হন। মা আমরা প্রতিনিয়ত তোমার বৃত্তিস্বরূপটি উপলব্ধি করে থাকি। কী ইন্দ্রিয়বৃত্তি, কী অন্তঃকরণবৃত্তি, সর্বরূপেই তুমি নিয়ত প্রকাশিত। ব্যষ্টি-বৃত্তিরূপিনী মা তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করো।

স্মৃতিরূপেণ— মা ! বৃত্তির পরেই তোমার স্মৃতিমূর্তিটি উদ্ভাসিত হয়। প্রথমে বৃত্তিরূপে যে ভাবটি প্রকাশিত হয় পরে তাহাই সংস্কাররূপে চিত্তে ফুটে। এই সংস্কার ভাবটিই যখন আবার চিত্তক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে তখনই তা স্মৃতিনামে অভিহিত হয়। মা স্মৃতিরূপেই তো তুমি জন্ম-জন্মান্তর সঞ্চিত বিন্দু বিন্দু জ্ঞানসমষ্টিকে ধরে রেখেছ। এক একটা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যদি সেই জন্মের লব্ধজ্ঞানগুলি হারিয়ে যেত, তবে আর আমাদের পূর্ণ জ্ঞান লাভের আশাই থাকত না। কিন্তু মা আমার ! তুমি প্রতি জীবের হৃদয়ে স্মৃতিরূপিণী হয়ে নিত্য বিদ্যমান থেকে, জন্মের পর জন্ম ধরে তুমি আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানরাশি সংস্কার রূপে সঞ্চয় করে রাখ। এর ফলেই তো আমরা একদিন 'অহং ব্রহ্মাস্মি'রূপ চরম স্মৃতিতে উপনীত হই। স্মৃতিরূপিণী মা তোমায় প্রণাম।

দয়ারূপেণী—জীবের দুঃখ দর্শন করলে, সেই দুঃখ দূর করার জন্য যে ইচ্ছা জাগে, মা তাই তো তোমার দয়ামূর্তি। প্রত্যেক জীবহৃদয়েই অল্পাধিক পরিমাণে তোমার এই ব্যষ্টি দয়ামূর্তির বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যখন কোনো দুঃখী, আতুর, আর্তকে দেখি, তখন কখনো কখনো আমাদের হৃদয়ে দয়াবৃত্তির আবির্ভাব হয়। মা ! তুমিই আমাদের হৃদয়ে দয়া মূর্তিতে আবির্ভূত হও। দাতা যদি এই ভাব ঠিক ঠিক অনুভব করেন এবং নমস্তস্যৈ বলে তাঁকে প্রণাম করেন, তবে কী করে তিনি দরিদ্র বা আতুরের ওপর কৃতজ্ঞ না হয়ে থাকতে পারেন ? এই কৃতজ্ঞতার প্রতিদানস্বরূপ তিনি যা কিছু প্রদান করুন না কেন তা অকিঞ্চিৎকরই হয়। এই পার্থিব দানের ফলে গ্রহীতা যত না উপকৃত হন, দাতা তদপেক্ষা সহস্রগুণ বেশি উপকৃত হন। দয়া সাত্ত্বিকী বৃত্তি। এই বৃত্তি যত বেশি অনুশীলন করা যায় মানুষ ততই বেশি সুখী হয়। যে ব্যক্তি আমাদের এই সাত্ত্বিকী বৃত্তির অনুশীলনের সুযোগ দেয়, সে যত দীনদরিদ্রই হোক না কেন, আমরা যে তাঁর কাছে অবশ্যই বিশেষভাবে উপকৃত সে বিষয়ে কোনো

সংশয়ই নেই। মা তুমি স্বয়ং দরিদ্রমূর্তি পরিগ্রহ করে উপস্থিত হয়ে কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা কর, আবার অন্যদিকে তুমিই আমাদের হৃদয়ে দয়ামূর্তিতে আবির্ভূত হও। আমরা বিষয় চিন্তায় ব্যস্ত থাকি, কিন্তু মুহূর্তমধ্যে যখন কোনো আর্তব্যক্তি বা জীব তোমার দয়ারূপিণী মাতৃমূর্তি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত করায়, তখন আমরা তার কাছে কতটাই না ঋণী হই। এই ভাব নিয়ে দান করতে পারলেই দানের সার্থকতা। যখনই কারোর অন্তরে পরের দুঃখ দূর করার ইচ্ছা জাগে তখন ইচ্ছাটিকে কখনই যেন নিজ চিত্তের সামান্য বৃত্তিমাত্র বলে উপেক্ষা করা না হয়, অনুভব করতে হবে এ যেন মায়েরই আবির্ভাব। দয়ারূপিণী মায়ের চরণে অসংখ্য প্রণাম।

তুষ্টিরূপেণ —মা তুমি তুষ্টিরূপিণী। ইষ্ট-প্রাপ্তি বা অনিষ্ট-নিবৃত্তিতে আমাদের অন্তঃকরণে যে ভাবের উদয় হয়, তাই আমাদের তুষ্টি মূর্তি। তুষ্টি বা সন্তুষ্টির কথা সর্বশাস্ত্রেই বলা হয়েছে। গীতায় ভগবান বলেছেন **'সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।'** (গীতা ১২।১৪) অর্থাৎ সদা সন্তুষ্ট ও আমাতে মন বুদ্ধি অর্পিত ভক্তই আমার প্রিয়। ভাগবতেও ভগবান বলেছেন—**'সদা সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ'** (ভাগবত ৭।১৫।১৭) যিনি সদাই সন্তুষ্ট তার সর্বদিকই সুখময়। কিন্তু এ জগতে প্রায় সর্বত্রই একটা তুষ্টির অভাব দেখা যায় তার একমাত্র কারণ—**প্রারব্ধ কর্মের ফল অপেক্ষা বেশি বা অন্যরূপ ফল লাভের ইচ্ছা এবং যখন যে ফল লাভ হওয়ার কথা তার আগেই সেই ফল লাভের জন্য ব্যাকুলতা**। আমরা ভুলে যাই যে, অবশ্যম্ভাবী প্রারব্ধে যা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট আছে তার অন্যথা হয় না আর যে ফল পাওয়ার জন্য যে সময়টা উদ্দিষ্ট তার পূর্বে তা কিছুতেই পাওয়া যায় না। তাই দেবতারা বলছেন—মা ! আমাদের দুরাশাজনিত অতৃপ্তি দূর করে তুমি আমাদের হৃদয়ে তৃপ্তিরূপে ফুটে ওঠো।

মাতৃরূপেণ— মাতৃরূপিণী মা ! তোমাকে প্রণাম। তুমি সকল জীবকে বীজরূপে গর্ভে ধারণ করে থাক। তারপর তাকে ব্যক্ত করার জন্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ কর। তখন 'জীব' নামে একটা পৃথক সত্তা পরিলক্ষিত হয়। অসংখ্য জন্মমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তুমি জীবের মিথ্যা আমিত্বের, কল্পিত অভাব-আকাঙ্ক্ষা

পূরণ করে থাক। কিন্তু যখন জীব ক্রমে মাতৃ-সত্তায় বিশ্বাসবান হয়, যখন সে আপন কর্তৃত্ব ভুলে সর্বতোভাবে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তুমি তাকে আপনাতে মিলিয়ে নাও। আবার যতদিন জীব নিজেকে একটি পৃথক জীবরূপে মনে করে, যতদিন সে সর্বত্বে বহুত্বে মুগ্ধ থাকে, তখনও সে মায়ের কোলে পরম নিভৃত আশ্রয়ে থাকে। চণ্ডীতে দেবতারা তাই বলছেন—দেবি ! তুমিই আমাদের আত্মা (মা) রূপে স্থিত। আর গীতায় আশ্বাসবাণী **'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্'** (গীতা ৯।৩০)। মা ! জীব তোমাকে নিজের বলে বুঝুক আর নাই বুঝুক তারা নিরন্তর তোমার আশ্রয়েই থাকে। দেবতারা তাই বলছেন—তোমার মাতৃমূর্তির সম্যক্ অভিব্যক্তি দেখে, তোমার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

ভ্রান্তিরূপেণ—বেদ উপনিষদে কথিত এই সত্য ভাষ্যটি এ মন্ত্রে পরিষ্কার রূপে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। দেবতারা বলছেন মা ! তুমি ভ্রান্তিরূপে সর্বজীবে অবস্থান কর। ন্যায়ের সেই প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তটির মতো, যেখানে 'রজ্জুতে সর্প ভ্রমের' ন্যায় নির্গুণ নিরুপাধি ব্রহ্মে জগৎরূপী ভ্রান্তি দৃষ্ট হয়। আসলে ব্রহ্ম, জগৎ ও ভ্রান্তি সবই তো তুমি। যতদিন জগৎ আছে, দেহ আছে ততদিন মা তোমার এই ভ্রান্তি তো থাকবেই কেননা ভ্রান্তি না হলে জগৎ-খেলাই থাকে না। জ্ঞানময়ী মা তুমি তো ভ্রান্তিময়ী হয়েই এই অচিন্ত্যনীয় জগৎলীলা সম্পাদনা করেছ। আমরা যে দিন-রাত তোমাকে ভুলে, নিজেকে (স্বয়ংকে) ভুলে, বিনশ্বর (শরীর) বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকি, এই যে ভুল, এই যে ভ্রান্তি তাও তো তুমি। যতদিন তুমি ভ্রান্তি রূপে আমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে থাকবে, ততদিন কারো সাধ্য নেই তোমার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে। আবার যেদিন তুমি আত্মস্বরূপটি প্রকটিত করবে সেদিন তোমার এই ভ্রান্তিমূর্তিই আমাদের জগৎজ্ঞান—ভেদজ্ঞান ভুলিয়ে দেবে।

বেদান্তমতে ভ্রম দু'প্রকারের। **সংবাদী** ও **বিসংবাদী**। যে ভ্রম অভিলষিত বস্তুলাভে ব্যাঘাত করে না তাকে বলে সংবাদী ভ্রম। যেমন মণিপ্রভা দেখে যদি কারোর মণিভ্রম হয় এবং সে যদি মণিভ্রমে সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হয় তবে এটি ভ্রান্তি হলেও সে মণি লাভ করবে। এই হল 'সংবাদী-ভ্রম'। আবার যদি

কারোর জবাপুষ্পে পদ্মরাগমণির ভ্রম হয় এবং সে সেদিকে অগ্রসর হয় তবে তার পদ্মরাগমণি নয়, জবা পুষ্পই লাভ হয়। ইহা বিসংবাদী ভ্রম। এই জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন যদিও ভ্রম, তবু এই ভ্রমই জীবকে ব্রহ্মত্বে উপনীত করায়, কেননা ইহা সংবাদী ভ্রম। ভ্রান্তিরূপিণী মা ! তোমার চরণে প্রণত হতে পারলেই আমাদের এই ভ্রান্তি দূর হবে। আমরা যে সর্বাবস্থায় নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত আত্মা তখন তা বুঝতে পারব। তোমার ব্যষ্টিরূপকে আমাদের প্রণাম।

দেবীর প্রতি প্রণাম ও প্রার্থনা (শ্লোক ৭৭—৮২)

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥ ৭৭ ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ (৭৮) নমস্তস্যৈ (৭৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৮০ ॥

স্তুতা সুরৈঃ পূর্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥ ৮১ ॥
যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ॥ ৮২ ॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।৭৭—৮২)

সরলার্থ— সমস্ত জীবগণের ইন্দ্রিয়াদিবর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে এবং সর্বজীবের মধ্যে ব্যাপ্তা, সেই বিশ্বব্যাপিকা দেবীকে বার বার নমস্কার॥ ৭৭ ॥ যে দেবী চিৎশক্তিরূপে এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে স্থিতা আছেন, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৭৮-৮০ ॥ পূর্বকালে মহিষাসুর বধরূপ অভীষ্ট ফল প্রাপ্তিতে দেবতারা যাঁর স্তুতি করেছিলেন এবং

দেবরাজ ইন্দ্র বহুদিন পর্যন্ত যাঁকে পূজা করেছিলেন, সেই মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল করুন আর সমস্ত বিপদ নাশ করুন ॥ ৮১ ॥ বলদর্পী দৈত্যদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে আমরা সব দেবতারা যে পরমেশ্বরীকে সম্প্রতি স্তব করছি এবং যাঁকে ভক্তিবিনম্র দেহে স্মরণ করলে তৎক্ষণাৎই সমস্ত বিপদ বিনাশ করে দেন, সেই দেবী জগদম্বা আমাদের সংকটসমূহ নাশ করুন ॥ ৮২ ॥ মেধা ঋষি বললেন—॥ ৮৩ ॥

মূলভাব — সরলার্থ — ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষুঃ—দেবগণ স্তুতিতে বলছেন—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ ও ভূতসমূহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে একমাত্র মায়েরই প্রকাশ । দশ ইন্দ্রিয় ও চার অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণ এইরূপ—

শ্রোত্রের দিক, **ত্বক্** এর বায়ু, **চক্ষুর** সূর্য, **রসনার** বরুণ, **ঘ্রাণের** অশ্বিনীকুমার, **বাক্যের** অগ্নি, **পাণির** ইন্দ্র, **পাদের** বিষ্ণু, **পায়ুর** মৈত্র, **উপস্থের** প্রজাপতি, **মনের** চন্দ্র, **বুদ্ধির** অচ্যুত, **অহংকারের** চতুর্মুখ ব্রহ্মা ও **চিত্তের** শঙ্কর। এই চৈতন্যশক্তি যদিও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় এবং ক্ষিতি আদি পঞ্চভূতরূপে প্রকাশ পায় এবং বিভিন্ন নামে অভিহিত হয় তবু এসকল তোমারই এক অখণ্ড চৈতন্যসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। ইহাই মায়ের ব্যাপ্তিমূর্তি, চিন্ময়ীমূর্তি। মা ! এই বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকে তোমার মহতী ঈশ্বরী ব্যাপ্তিমূর্তি দেখতে পাই। মা তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম।

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ — দেবতারা পূর্বশ্লোকে চেতনরূপ মাকে প্রণাম করে বর্তমান শ্লোকে নির্গুণ চৈতন্যরূপী মাকে প্রণাম করেছেন। চিতি শব্দের অর্থ সাংখ্যের পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম, উপনিষদের ব্রহ্ম ও দেবতাদের স্তুত চণ্ডীতে মা। ব্রহ্ম নির্গুণ অবস্থাতেও স্বপ্রকাশ অর্থাৎ আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন বা আত্মরস উপভোগ করেন। ইহাও শক্তি ভিন্ন আর কিছু নয়। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন বস্তু। জগৎ এক শক্তিমাত্র। নাম, আকার ও ব্যবহারগত অনন্ত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, প্রকৃত চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ইহাকে এক শক্তি ব্যতীত কিছুই দেখেন না।

দেবতারা প্রকরণটির অন্তিম দুই শ্লোকে বলছেন—**'যা চ স্মৃতাঃ তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ সর্বাপদঃ'** অর্থাৎ যাঁকে স্মরণ করলে তৎক্ষণাৎ যিনি আমাদের সর্ব

আপদ থেকে দূর করেন তিনিই হলেন আমাদের সর্বশক্তিময়ী মা। মন্ত্রটিতে দেবগণ আরো বলেছেন— **'ভক্তি-বিনম্র-মূর্তিভিঃ'** অর্থাৎ এই যে দেবীকে স্মরণ, এই যে ভক্তির প্রভাব এর ফলে যেন তার মূর্তিটি (দেহটি) নত হয়ে পড়ে ; আমিত্ববোধটি সম্যক্ অবনত হয়। যে পরিণামে আমিত্ব বোধ বিনম্র হবে, দেহাত্মবোধ শিথিল হবে, সেই পরিণামে মা আমার ঈশা অর্থাৎ ঈশ্বরী মূর্তিতে প্রকটিতা হবেন। ওই ভক্তি-বিনম্র মূর্তিতে প্রণামের ফলেই জীব-ভাবীয় আমিত্ব ক্ষীণ হয় আর ঈশ্বর-ভাবীয় আমিত্বর বিকাশ হয়। অবশ্য সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে স্মরণ করতে পারলেই অল্পাধিক পরিমাণে ঐশী শক্তি জীবশরীরে সংক্রামিত হয়। তার ফলেই জীবের সকল বিপদ কেটে যায়।

দেবগণ মন্ত্রটিতে **'সর্বাপদঃ'** শব্দটিও বলেছেন। অর্থাৎ সর্বই হল আপদ, অর্থাৎ যতক্ষণ সর্বত্বের-বহুত্বের প্রতীতি আছে, ততক্ষণই সাধক আপদগ্রস্ত। এই সর্বরূপ আপদ হতে মুক্ত হওয়ার জন্যই সকলের ভক্তি-বিনম্র-মূর্তিতে ঈশ্বরীয়চরণে সম্যক্ প্রণত হওয়া একান্ত আবশ্যক। গীতায়ও স্বয়ং ভগবান সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে এক অখণ্ড শক্তির (মাম্) শরণাগত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গীতা ১৮।৬৬)

ভগবান বলেছেন— যদি কেউ সকল ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে তবে আমিই তাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করি।

—o—

নারায়ণী স্তুতি

(একাদশ অধ্যায়, শ্লোক ২—৭৬)

প্রাক্‌কথন

শুম্ভের পতনে দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, চন্দ্র, সূর্য সকলেই আনন্দিত। সকলেই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী চৈতন্যরূপী দেবতাবৃন্দের আর উদ্বিগ্নতা নেই, ইন্দ্রিয়গণ প্রশান্ত হয়েছে। চৈতন্যরাজ্য অক্ষুণ্ণ। দেবতাগণের যজ্ঞভাগ অপহৃত হওয়ার আশঙ্কা নেই, তাই তাঁরা হর্ষ-নির্ভর-মানস হলেন, পুণ্য বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। আত্মসাক্ষাৎকারের পর সত্য সত্যই বায়ুমণ্ডলকে পবিত্র ও আনন্দময় বলে মনে হতে থাকে। সত্যদর্শী ঋষিগণ সেই অবস্থাকে বলেছেন 'মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'।

শুম্ভ হল 'অস্মিতা' অর্থাৎ 'আমি', 'আমি' ভাব আর নিশুম্ভ হল মমতা অর্থাৎ 'আমার' 'আমার' ভাব। এখন শুম্ভ-নিশুম্ভ নিহত হয়েছে সুতরাং হোমাগ্নি সকলও শান্তভাবে প্রজ্বলিত হতে থাকল। হোমাগ্নি শরীরস্থ তেজতত্ত্ব। ইতিপূর্বে তা নানারূপ উৎপাত সূচনা করত, এখন শান্তভাব ধারণ করেছে। আমিত্ব নেই, তাই উচ্ছৃঙ্খলতাও নেই। পূর্বে এই বিশ্বযজ্ঞ, এই কর্মযজ্ঞ অহংকর্তৃত্বরূপ বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সুতরাং সবই ছিল অশান্ত ও উৎপাৎসূচক। এখন আত্মস্বরূপ উদ্ভাসিত হওয়ায়, সকলই ব্রহ্মযজ্ঞে পরিণত হয়েছে। এখন কর্মমাত্রই **'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্'** (গীতা ৪।২৪) রূপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখন হব্য হোতা অগ্নি হোম এবং তার ফল সকলই ব্রহ্মময়—সকলই আত্মময়, সুতরাং কর্মযজ্ঞরূপ অনুষ্ঠানগুলি এখন আর অশান্তভাবে সম্পন্ন হয় না। সর্বত্রই আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি হতে থাকে।

এ যেন অভিন্ন, পূর্ণ অথচ চিরনবীন। বৈষ্ণবের ভাবে বলতে গেলে—**'এ যেন নিত্যবৃন্দাবনে নব ঘনশ্যাম'**। এ আনন্দই সাংখ্যের পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম, উপনিষদের আত্মা, গীতার শ্রীকৃষ্ণ আর চণ্ডীর স্বয়ং মা।

দেবতারা বিশিষ্ট চৈতন্য হয়েও এখন অভ্রান্ত চৈতন্যর সঙ্গে একান্ত, তাই তারা আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হচ্ছেন। তাই দেবতাদের মুখমণ্ডলে হর্ষোৎফুল্ল ভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁরা দেবীর স্তুতিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

যদিও ইন্দ্রই প্রধান দেবতা তথাপি এ স্থলে বহ্নিপুরোগমস্ত্রম্ অর্থাৎ অগ্নিদেবকেই পুরোগামী করে দেবতারা তাঁর স্তুতি করছেন। অগ্নি বাগিন্দ্রিয়র অধিপতি, তাই বাগাধিষ্ঠিত চৈতন্যকে অগ্রগামী করতে পারলেই স্তবাদি কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে। যাই হোক, দেবতাদের স্তোত্রধ্বনি দিক্‌সমূহকে পবিত্র করে দিল, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, দেবতাগণ ভক্তিবিনম্র মূর্তিতে কাত্যায়নীর স্তব করতে লাগলেন। কাত্যায়নী-জগদীশ্বরী, ব্রহ্মবিদ পুরুষগণের একান্ত আশ্রয়নীয় বলেই মা, কাত্যায়নী বলে অভিহিত হন।

স্তবটি শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে স্তুত আর স্তুতিটি **'নারায়ণী স্তুতি'** বলে অভিহিত। স্তুতিটি চৌত্রিশটি মন্ত্রযুক্ত এবং ভাবগাম্ভীর্যে ও ভক্তিমাধুর্যে অতুলনীয়।

স্তোত্রটি ছয়টি প্রকরণে বর্ণিত হয়েছে—

দেবীর বিভূতি বর্ণনা	২—৭
দেবীর প্রতি প্রণতি	৮—১২
অষ্ট মাতৃকার প্রতি প্রণতি	১৩—২১
দেবীর প্রতি পুনঃ প্রণতি	২২—৩২
দেবতাদের বর প্রার্থনা	৩৩—৩৫
দেবতাদের পুনঃ বর প্রার্থনা	৩৬, ৩৯

দেবীর বিভূতি বর্ণনা (২ — ৭)

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলাভাদ্
বিকাসিবক্ত্রাব্জবিকাসিতাশাঃ ॥ ২ ॥

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥ ৩ ॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে॥ ৪ ॥
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥ ৫ ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥ ৬ ॥
সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥ ৭ ॥
(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।২—৭)

সরলার্থ—দেবী কর্তৃক মহাসুর শুম্ভ নিহত হলে ইন্দ্রাদি দেবতারা অগ্নিকে পুরোভাগে রেখে সেই কাত্যায়নী দেবীকে স্তুতি করতে লাগলেন। তাঁদের মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ায় তাঁদের মুখপদ্ম আনন্দে উজ্জ্বল এবং তার প্রকাশে চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল ॥ ২ ॥ দেবতারা স্তুতিতে বললেন —হে শরণাগতের দুঃখহারিণী দেবি ! আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। হে নিখিল বিশ্বজননী ! আপনি প্রসন্না হউন। হে বিশ্বেশ্বরি ! বিশ্বকে রক্ষা করুন। হে দেবি ! আপনি চরাচর জগতের অধীশ্বরী॥ ৩ ॥ আপনি এই জগতের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপা ; কারণ, আপনিই পৃথিবীরূপে বিরাজিতা। হে দেবি ! আপনার

শক্তি অলঙ্ঘনীয়। আপনি জলরূপে অবস্থিতা হয়ে এই জগৎকে তৃপ্ত করছেন॥ ৪ ॥ আপনি অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবীশক্তি (বিষ্ণুর জগৎপালিনী শক্তি)। আপনি এই বিশ্বের আদিকারণ মায়াশক্তি। হে দেবি ! (এই মায়াশক্তি দিয়ে) আপনি সমগ্র জগৎকে মোহিত করে রেখেছেন। আপনি প্রসন্না হলে এই পৃথিবীতে আপনি মোক্ষপ্রদান করেন॥ ৫ ॥ হে দেবি ! সমস্ত বিদ্যাই আপনার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ। সংসারে সমস্ত নারীই আপনারই মূর্তি। হে জগদম্বিকে ! একমাত্র আপনিই এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করে রেখেছেন। আপনার স্তুতি কি দিয়ে হতে পারে ? আপনি স্বয়ংই তো স্তুতির বিষয়ে মুখ্য ও গৌণ উক্তিসমূহ॥ ৬ ॥ আপনিই যখন সর্বস্বরূপা, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদানকারিণী দেবী, তখন এই রূপেই আপনার স্তুতি করা হয়। আপনাকে স্তুতি করার জন্য এর চেয়ে উপযোগী আর কোন শ্রেষ্ঠ বাক্য হতে পারে ? ॥ ৭ ॥

মূলভাব—মা ! তুমি প্রপন্নজনের আর্তি হরণ করে থাক। যারা তোমাকে একান্ত আশ্রয় করে তোমার অভয় চরণে শরণ নেয়, তারা যত দুরাচারীই হোক, যত মূঢ়ই হোক, তুমি তাদের সর্ববিধ আর্তি, কাতরতা, দীনতা দূর কর। কিন্তু যতক্ষণ আমরা জগতের মধ্যে তোমার বহুভাবে আত্মপ্রকাশ দেখতে পাই, ততক্ষণ তোমার প্রসন্নতা কীভাবে প্রকাশ পাবে, তুমি কৃপা করে প্রসন্ন হও মা। একবার অনুভব করাও—'আমি বহু নয়, আমি এক'। তোমার আশীর্বাদপূত এই একটি বাণী অনুভব করলেই আমাদের জীবন ধন্য হয়, অনাদি জন্মের জীবত্ব-বন্ধন খুলে যায়। মা ! তুমি বিশ্বেশ্বরী, এ বিশ্বে তোমার সত্তা অনুভব করতে না পেরে, তোমার প্রসন্নতা অনুভব করতে না পেরে, জীব বহির্মুখে ধাবিত হচ্ছে। দেবি ! তুমি জীবের এই বহির্মুখী তীব্রগতি স্তিমিত করে এ বিশ্বকে বাঁচাও। প্রতি জীবে শুম্ভবধ করে ধ্বংসের মুখ থেকে এ বিশ্বকে রক্ষা করো। তোমার জগৎকে তুমি না রক্ষা করলে আর কে রক্ষা করবে ?

চতুর্থ শ্লোকে দেবতারা বলছেন মা, তুমি **আধারভূতা জগতস্তমেকা** অর্থাৎ আধার-শক্তিরূপিণী জগদ্ধাত্রী, তা তোমার মহীমূর্তি দেখেই আমরা কিছুটা বুঝতে পারি। তুমিই মহীরূপে (মৃত্তিকারূপে) সমস্ত পদার্থকে মায়ের মতোই বুকে ধরে রেখেছ কোন সে অনাদি কাল থেকে। তুমিই আবার জলময়ী মূর্তিতে

সকল জীবকেই আপ্যায়িত করছ, স্নিগ্ধ করছ। শষ্যাদি রূপে ক্ষুধানিবৃত্তি, জলরূপে তৃষ্ণা নিবারণ করে প্রতিনিয়ত মাতৃত্বের পরিচয় দিচ্ছ। জগৎকে ধারণ-পোষণ করে তুমি যে অতুলনীয় প্রভাবের পরিচয় দিয়েছ, তোমার সেই বীর্য প্রভাবকে ঈশ্বরাদিও লঙ্ঘন করতে সমর্থ হন না। মা ! এই জন্যই তুমি অলঙ্ঘবীর্যা।

পরের পঞ্চম শ্লোকে দেবতারা বলছেন—মা ! তুমি বৈষ্ণবীশক্তি, সর্বব্যাপিনী জগৎপালনকারিণী মহতী স্থিতিশক্তি। এ বিশ্বের প্রতি পরমাণুতেই তুমি অবস্থিত। তুমি অনন্তবীর্যা। তোমার বীর্য-বৈভবের সীমা নেই। আবার তুমি যে শুধু ব্যক্ত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবীশক্তি নামে অভিহিতা হও তা নয়, তুমি এই বিশ্বের বীজরূপে, এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের আদি কারণ, পরমা রূপেও অবস্থিতা। সাংখ্য শাস্ত্রে তোমার এই পরমা স্বরূপটিকেই মূল প্রকৃতি বলেছে। সৃষ্টিপ্রপঞ্চরূপে তুমি **মায়া** আর সৃষ্টির অব্যক্ত বীজরূপে তুমি **পরমা**। মা ! তোমার দ্বিবিধস্বরূপে তোমার দু'প্রকার কার্য দেখি। যখন মায়ামূর্তিতে প্রকটিত হয়ে তুমি ব্যক্তপ্রপঞ্চরূপে আত্মপ্রকাশ কর তখন **'সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ'** আর যখন পরমা মূর্তিতে প্রকট হও তখন তুমি **'ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ'**। এক মূর্তিতে 'ভোগবতী' আর অন্য মূর্তিতে তুমি 'মোক্ষদায়িনী'।

মায়া স্বরূপে তুমি সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ কর—স্বকীয় স্বরূপ উপলব্ধি করতে দাও না। যারা তোমার রূপ-রসাদির কিংবা কাম-কাঞ্চনাদির মোহে মুগ্ধ তারা তো প্রত্যক্ষভাবেই তোমা কর্তৃক সম্মোহিত। আর যারা তোমার শরণাগত না হয়ে নানারূপ সাধনার অনুষ্ঠান করে, তারাও সিদ্ধি, শক্তি, যশ, প্রতিষ্ঠার কোনো না কোনো একটা নিয়েই মুগ্ধ থাকে। তারা কেউই তোমাকে কিছুতেই চাইতে পারে না। মা ! তুমি তো বিষয়ের সাজে, কাম কাঞ্চনের সাজে এসে আমাদের প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করছ— 'আর এটা অনুভব করলেই' তুমি প্রসন্না হও আর তখন তোমার মোহিনী মূর্তি অপসারিত হয়ে নিত্যা প্রসন্না মূর্তি উদ্ভাসিত হয়। তুমিই তখন পরমা প্রকৃতিরূপে জননীরূপে স্নেহের জীবকে মুক্তিমন্দিরে নিয়ে যাও। তাই দেবতারা তোমার বিশ্বমোহিনী মূর্তি দেখে

বলেছেন— **'সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ'** আবার মোক্ষদায়িনী প্রসন্নমূর্তি দেখে **'ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ'** বলে তোমারই চরণে প্রণিপাত করছেন। মা, তুমি প্রসন্না হও।

পূর্ব মন্ত্রে বলা হয়েছে—মায়ের প্রসন্নতা লাভ হলেই সাধকের মুক্তিমার্গ উন্মুক্ত হয়। আর মা যখন প্রসন্ন হন তখন সাধক এ জগৎকে কিরূপে দর্শন করেন তাই উক্ত হয়েছে বর্তমান মন্ত্রে (ষষ্ঠ শ্লোকে)। উপনিষদ্ বলছে **'যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে সা বিদ্যা'** অর্থাৎ যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাই বিদ্যা। কিন্তু বর্তমান মন্ত্রে দেবতারা স্তুতি করে বলছেন—**'জগৎসু সমস্তা বিদ্যাঃ'** (চণ্ডী ১১।৬) অর্থাৎ অনন্ত জগতে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে সমস্তই বিদ্যা। যারা যথার্থ মুমুক্ষু, যাদের তোমার প্রসন্ন মূর্তি দর্শনের সৌভাগ্যলাভ হয়েছে তারা সর্বত্রই তোমার বিদ্যাস্বরূপটিই দেখতে পায়। তবে সমস্তই যদি বিদ্যা হয় তবে শাস্ত্র অবিদ্যা শব্দে কাকে নির্দেশ করে ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দেবতারা বলেছেন **'তব দেবী ভেদাঃ'** অর্থাৎ যাঁরা জগৎকে দেবীর থেকে ভিন্ন দেখেন তা অবিদ্যারই নামান্তর মাত্র, তবে দেবতাদের কাছে যা অবিদ্যা তা বিদ্যারূপিণী মা তোমারই ভেদ মাত্র—তোমার বিভিন্ন মূর্তি মাত্র। একা অদ্বিতীয়া সর্বভেদরহিতা তুমিই বিভিন্ন মূর্তিতে বহুমূর্তিতে সমস্তরূপে জগৎরূপে নিত্য অবস্থিতা। এ জগৎ তোমারই স্বগতভেদ। তাই দেবতাদিগের নিকট সমস্তই বিদ্যারূপে উদ্ভাসিত, তাঁরা অবিদ্যায়ও বিদ্যাবিরোধী কিছুই দেখতে পান না।

সিদ্ধ সাধক আর কী দর্শন করেন ? দেবতারা বলছেন **'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ'** অর্থাৎ সমস্তরূপে, জগৎরূপে যা প্রতীত হয় সে-সমস্তই স্ত্রী মানে তাঁরই শক্তি মাত্র। বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র তুমিই পরমপুরুষ আর জগৎরূপে যা দৃষ্টিগোচর হয় সে-সকলই তোমার প্রকৃতি, তোমার শক্তি, তোমার ইচ্ছা, তোমার ব্যবহার। যেমন শক্তি শক্তিমানের সঙ্গে অভিন্ন, সেইরকম প্রকৃতিরূপী জগৎ সেই পরমপুরুষের সঙ্গে সর্বতোভাবে আলিঙ্গিত। বৈষ্ণবের ভাষায় ইহাই রাধাকৃষ্ণের মিলন।

দেবগণ বলছেন— সমস্তরূপে যা কিছু প্রতীতিগোচর হয় তাহা সকলা

অর্থাৎ তোমারই কলা বা অংশের সঙ্গে নিত্য বিদ্যমান। মা ! যারা এই জগৎকে জগৎরূপে না দেখে বিদ্যারূপে দেখে বা যারা এ সমস্তকে তোমারই ভেদরূপে, তোমার প্রকৃতিরূপে, তোমার কলারূপে দেখে থাকে, তাদের নিকটই তুমি প্রসন্ন মূর্তিতে উদ্ভাসিত হও। তাঁরা স্তুতি করেন **'ত্বয়ৈকয়া পুরিতমম্বয়ৈতৎ'** অর্থাৎ মা ! তোমা কর্তৃকই এ সমগ্র বিশ্ব পরিপূর্ণ।

এইরূপ স্তব করতে করতে দেবতারা বিশ্বময় মাতৃমূর্তি দর্শন করতে লাগলেন। তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা শ্লোকের অন্তে বলছেন—**'কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তি'**। বাক্যটির তিনটি ভাগ **'কা তে স্তুতি'** অর্থাৎ মা ! তোমার আবার কী স্তুতি করব ? সবই তো তুমি, তুমি ছাড়া যে আর কিছুই নেই। তুমি আবার **'স্তবপারা'** অর্থাৎ স্তবেরও পরে অবস্থিতা। স্তুতির দ্বারা তোমার গুণ বর্ণনা করা যায় না কেননা তুমি তাদেরও অনেক ওপরে।

আবার তুমি **'পরোক্তিঃ'** অর্থাৎ বাক্যেরও পরপারে অবস্থিতা, **'অবাঙ-মানস গোচরা'**। যে দিক দিয়েই চাই বাক্য দ্বারা তোমার স্তুতি নিতান্তই অসম্ভব। মনুষ্যের পক্ষে আরোপিত গুণবর্ণনার নাম স্তুতি। কিন্তু তোমায় আরোপিত গুণের বর্ণনা কিরূপে সম্ভব। আবার দেবতাদের পক্ষে স্বরূপ বর্ণনাই স্তুতি (**দেবতানাং স্বরূপ কথনং স্তুতি**) কিন্তু তোমার সম্বন্ধে তাও অসম্ভব, কেননা তোমার স্বরূপ কেউ জানে না, জানতে পারে না, তোমার স্বরূপবেত্তা আর দ্বিতীয় কেহ নেই। সুতরাং তোমার সম্বন্ধে যা কিছু বলব বা স্তুতি করব তা কখনই 'পরমোক্তি' বা যথার্থ বাক্যযুক্ত হতে পারে না।

দেবীর প্রতি প্রণতি (৮—১২)

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৮ ॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৯ ॥
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১০ ॥

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১১ ॥
শরণাগতদীনার্ত-পরিত্রাণপরায়ণে ।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১২ ॥
(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৮—১২)

সরলার্থ— সমস্ত মানুষের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা এবং স্বর্গ ও মোক্ষদায়িনী নারায়ণী দেবী, আপনাকে নমস্কার॥ ৮ ॥ কলা, কাষ্ঠাদিরূপে ক্রমশঃ পরিণাম (অবস্থা পরিবর্তন)-দায়িনী এবং জগতের সংহারসমর্থা শক্তিরূপিণী নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম ॥ ৯ ॥ নারায়ণি ! আপনি সর্বমঙ্গলদায়িনী মঙ্গলময়ী। কল্যাণদায়িনী শিবা। সমস্ত প্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধিদায়িনী, শরণাগতবৎসলা, ত্রিনয়নী গৌরী আপনি, আপনাকে প্রণাম॥ ১০ ॥ আপনি সৃষ্টি, পালন ও সংহারের শক্তিভূতা, সনাতনী দেবী, সর্বগুণের আধার এবং সর্বগুণময়ী, নারায়ণি ! আপনাকে প্রণাম ॥ ১১ ॥ শরণাগত দীন এবং আর্তগণের পরিত্রাণপরায়ণা এবং সকলের পীড়ানাশিনী দেবী নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম ॥ ১২

সরলার্থ—এই প্রকরণের পাঁচটি শ্লোকে দেবতারা দেবীকে নানাভাবে প্রণতি জানিয়েছেন।

বুদ্ধি — দেবতারা বলছেন—মা ! তুমি সর্বজীবের অন্তরে বুদ্ধিরূপে অবস্থিত। তোমাকে বুদ্ধিরূপে পাওয়ার জন্যই ব্রাহ্মণরা ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক **'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'** বলে তোমার নিকট ধী ভিক্ষা করে। এই বুদ্ধি যখন সত্ত্বগুণ প্রধান হয়—নির্মল হয় তখন এর এক দিকে 'স্বর্গ' অর্থাৎ জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য এবং অন্যদিকে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তিস্বরূপটি উদ্ভাসিত হয়। জীবন্মুক্ত সাধকগণ এই বুদ্ধিতে অবস্থান করেন এবং একদিকে স্বর্গভোগ আর অন্যদিকে জগদাতীত সত্তা অপবর্গের আভাস পান। তাই তুমি বুদ্ধিরূপে **'স্বর্গাপবর্গদায়িনী'** মা।

কাল—মা, তুমি কালমূর্তিতে নিয়ত বিশ্বের পরিবর্তন সাধন করে চলেছ। কলা, কাষ্ঠা আদি সেই কালের কল্পিত বিভাগ। কেবল পরিবর্তনই নয় কালরূপে

তুমি বিশ্বের উপরতি অর্থাৎ প্রলয় সাধন করে থাক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি ঈশ্বরগণেরও তুমি প্রলয়কারিণী। তোমার কাছে তো বিশ্বের উপরতিও তুচ্ছ। তুমি অসীমশক্তিসম্পন্না হয়েও প্রতি নরে নারায়ণী মূর্তিতে অবস্থান কর। তাই তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

মঙ্গলকারিণী—আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধির নাম মঙ্গল আর সকলের যা মঙ্গলকারী তা হল মঙ্গল্য। আর এ জগতে যত কিছু মঙ্গল আছে তাদেরও যিনি মঙ্গল বিধান করেন তিনিই 'সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যা'। লৌকিক মঙ্গল্য আটটি—**ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন, হিরণ্য, সর্পিঃ, আদিত্য, অপ এবং রাম** ; এই অষ্টবিধ মঙ্গলই সর্বমঙ্গল শব্দের অর্থ। আর মা আমার, এই সকলেরও মঙ্গলবিধানকারিণী। জীব যখন তোমাকে এইভাবে সর্বাবস্থায় মঙ্গলদায়িনী বলে বুঝতে পারে, তখনই সর্বাভীষ্ট-সাধিকারূপে তোমার প্রকাশ হয়, জীবের অভীষ্টসিদ্ধি হয়। জীব তখন পূর্ণকাম হয়ে তোমাতে মিলিয়ে যায়। মা ! তুমিই শরণ্য জীবের একান্ত আশ্রয় স্থল। হে ত্রম্বকে ! ত্রিনয়নে ! চন্দ্র, সূর্য, অগ্নিরূপ ত্রিনেত্র নিয়ে আর স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই ত্রিবিধ প্রকাশ নিয়ে তুমিই তো মা বিরাজ কর। মা ! তুমি গৌরী, অতি মনোহর, অতি সুন্দরী আর অতি সৌম্যা। তুমি নারায়ণী তোমাকে প্রণাম।

শক্তিই যে তোমার স্বরূপ তা তোমার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়মূর্তি দেখলে অনায়াসে বুঝতে পারি। তোমাকে ধরার বা বোঝার যদি কিছু থাকে তাহলে তোমার এই ত্রিবিধ প্রকাশেই অনুমিত হয় যে তুমি অব্যক্তস্বরূপা হয়েও কিরূপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়মূর্তিতে সর্বত্র উদ্ভাসিত। এই ত্রিশক্তি বাস্তবে তিনটি বিভিন্ন শক্তি নয়, এক মহতী চিতিশক্তির ত্রিবিধ স্পন্দন মাত্র। তোমার এই অব্যক্ত শক্তিস্বরূপটি কীভাবে ব্যক্ত ভাবাপন্ন হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে দেবতাগণ বলছেন—তুমি **গুণাশ্রয়া** তুমি **গুণময়ী**। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণকে আশ্রয় করেই তোমার ত্রিবিধ স্পন্দন। গুণত্রয় যখন তোমার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয় তখন তুমিই স্বয়ং গুণময়ী হয়ে নারায়ণী মূর্তিতে আমাদের অঙ্কে ধারণ কর।

এই প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে দেবতাগণ বলছেন—'**শরণাগতদীনার্ত পরিত্রাণপরায়ণে সর্বস্যার্তিহরে দেবী......**' অর্থাৎ সাধন পথের প্রথম সোপান শরণাগতি তারপর দৈন্য ও অতঃপর আর্তি। মা ! যেদিন জীব তোমার

চরণে **শরণাগত** হয়, তোমার অভাবে **দীন** ও তোমার বিরহে **আর্ত** হতে পারে, সেই দিনই তোমার পূর্বোক্ত ত্রিশক্তিময়ী স্বরূপটির উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। আর সেদিন তুমিও মা সত্য সত্যই পরিত্রাণপরায়ণ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে জীবের সকল **আর্তি** দূর করে দাও। মা ! তোমার চরণে শরণাগত হতে পারলেই জীব তোমার প্রথম শক্তির অর্থাৎ সত্ত্বগুণময় স্বরূপটি অবধারণ করতে পারে।

তারপর আসে জীবের **দীনতা**। অনন্ত ঐশ্বর্যময়ী কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী তোমার লীলাবিলাস দর্শন করলেই জীবের স্বকীয় দীনতা সম্যক্‌রূপে ফুটে ওঠে। দীনতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করার সামর্থ্য আসলে তা মাতৃ-ঐশ্বর্যবোধ অনুভব করায়। মাতৃ-ঐশ্বর্যের অনুভূতিতে আত্ম-দীনতাই হল হেতু।

তারপর আসে **আর্তি**। তোমার নিরবচ্ছিন্ন রূপটি উপলব্ধি করতে হলে জীবকে আর্ত হতে হয়। এ জগতে কোনো বস্তুতেই আনন্দভাব নেই, আনন্দের খনি হলে একমাত্র তুমি, এ বুঝতে পারার বহির্লক্ষণই হল জীবের আর্তভাব। আবার ওইরূপ আর্তভাব জাগ্রত হলেই জীব তোমার আনন্দময়ী স্বরূপটি লাভ করে ধন্য হয়, নিরানন্দের পারে চলে যায়। হে নারায়ণি, হে আর্তহারিণি তোমাকে প্রণাম। তুমি আমাদের প্রথমে শরণাগত, দীন ও আর্ত করে নাও তারপরে সত্যে, প্রাণে, আনন্দে প্রতিষ্ঠা করো। আমাদের প্রণাম সার্থক হোক। যতদিন পর্যন্ত না আমাদের মধ্যে ওই তিনটি লক্ষণ প্রকাশ না পাবে, ততদিন পর্যন্ত তোমার পরিত্রাণপরায়ণ মূর্তি দর্শনের আশা নেই।

অষ্ট মাতৃকার প্রতি প্রণতি (১৩—২১)

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণী।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৩ ॥
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৪ ॥
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৫ ॥

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে ।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৬ ॥
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৭ ॥
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৮ ॥
কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে। ১৯ ॥
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২০ ॥
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২১ ॥
(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।১৩—২১)

সরলার্থ—হে নারায়ণি ! আপনি ব্রহ্মাণীর রূপ ধারণ করে হংসযুক্ত বিমানে অবস্থিতা হয়ে কুশ দ্বারা জল সিঞ্চন করেন, আপনাকে প্রণাম॥ ১৩ ॥ মাহেশ্বরীরূপে ত্রিশূল, অর্ধচন্দ্র এবং সর্পধারিণী এবং মহাবৃষভের পিঠে বসা নায়ায়ণী দেবী, আপনাকে প্রণাম॥ ১৪ ॥ ময়ূর ও কুক্কুটবেষ্টিতা ও মহাশক্তিধারিণী কৌমারী শক্তিরূপিণী, অপাপবিদ্ধা নারায়ণি ! আপনাকে প্রণাম ॥ ১৫ ॥ শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গধনু নামক উত্তম আয়ুধধারিণী বৈষ্ণবী শক্তিরূপা নারায়ণি ! আপনাকে প্রণাম॥ ১৭ ॥ ভয়ংকর নৃসিংহরূপে দৈত্যবিনাশে উদ্যতা এবং ত্রিভুবন রক্ষাপরায়ণা নারায়ণি ! আপনাকে প্রণাম ॥ ১৮ ॥ শিরে মুকুটযুক্তা, হাতে মহাবজ্রধারিণী, সহস্রনয়নশোভিতা, বৃত্রাসুরনাশিনী ইন্দ্রশক্তি-স্বরূপা নারায়ণী, দেবি ! আপনাকে প্রণাম ॥ ১৯ ॥ শিবদূতীরূপে বিশাল অসুরসেনা সংহারকারিণী, ভয়ঙ্কর মূর্তিধারিণী তথা বিকট গর্জনকারিণী নারায়ণি ! আপনাকে প্রণাম ॥ ২০ ॥ বিকটদন্তবিশিষ্টা ভীষণবদনা, গলায় মুণ্ডমালাবিভূষিতা, মুণ্ডাসুরমর্দিনী, চামুণ্ডারূপা নারায়ণি ! আপনাকে প্রণাম ॥ ২১ ॥

মূলভাব—চণ্ডীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আছে মহিষাসুর বধ বর্ণনা। এই পর্বে দেবীর আবির্ভাবকালে দেবগণ তাঁদের নিজ তেজ ও অস্ত্র দ্বারা তাঁকে অর্চনা করেছেন। এই অধ্যায়ের সাতটি শ্লোকে (১২—১৮) দেবতাদের সেই তেজ অর্পণের বর্ণনা আছে—'অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেব শরীরজম্........ততং সমস্ত দেবনাং তেজোরাশি সমুদ্‌ভবাম্'। আর পরবর্তী এগারোটি শ্লোকে দেবতাদের দেবীকে তাঁদের আয়ুধ ও ভূষণ অর্পণের কথা বলা হয়েছে।

স্তুতির বর্তমান প্রকরণটি পঞ্চম থেকে একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত শুম্ভ-নিশুম্ভ নিহত অন্তে স্তুত। এখানে দেবতাদের দেবীর প্রতি অর্পিত শক্তি পুনরায় নিষ্ক্রমণ হতে দেখা গেছে। এক চৈতন্যময়ী মহাশক্তির বিভিন্ন প্রবাহই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব জগতে ব্যষ্টিরূপে আমাদের অনুভবযোগ্য দর্শন, স্পর্শন, মনন আদি শক্তিরূপে প্রকাশ পান। আমাদের নিত্য অনুভবযোগ্য বিভিন্ন শক্তিগুলি যতক্ষণ না এই মহতী মাতৃ-শক্তির বিভিন্ন বিলাসরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, ততক্ষণ সমগ্র বিশ্বের শক্তিপ্রবাহও যে সেই একই অভিন্ন চৈতন্য শক্তিরূপিণী তা কিছুতেই বোধগম্য হয় না। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা করেও **'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি'** বা সমস্ত শক্তির চালিকা একটিই মূলশক্তি তা প্রমাণ করে যেতে পারেননি। যাইহোক স্বকীয় শক্তির বিশিষ্টতাকে তাঁর শক্তির অনন্ততার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলেই শক্তির ক্ষুদ্রতা ও বিশিষ্টতা দূর হয়। সে অবস্থায় জীব ঈশ্বরভাবে অনুপ্রাণিত হতে থাকে।

দেবতাগণও এই ভাবে ভাবিত হয়ে তাঁরা তাঁদের দেবীদত্ত দেবশক্তি ভাব পুনঃপ্রকাশ করে দেবীমূর্তির সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। শুম্ভ আসুরিক শক্তি অস্মিতার অর্থাৎ 'আমি'রূপ অহংকারের প্রতীক। এই অস্মিতার স্বভাবই এই যে, নিজেকেই মহান্‌রূপে, ঈশ্বররূপে দেখতে চায়। তাই দেবীর নিকট এত দৈবী শক্তির আবির্ভাব দেখে শুম্ভ বলছে—

বলাবলেপাদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী॥ (চণ্ডী ১০।৩)

হে দুর্গে ! তুমি বলগর্বে অতিশয় উদ্ধত। তুমি অতিমানিনী (গর্বিতা) হয়েও অপরের বল আশ্রয় করে যুদ্ধ করছ। দেবী প্রত্যুত্তরে বলছেন —'**একৈবাহং জগত্যত্র........বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ**' অর্থাৎ এই জগৎকে, এই বহুত্বকে 'মদ্‌বিভূতি' বলে জানবে। আর জানবে আমারই ইচ্ছায় ইহা বহুরূপে অভিব্যক্ত। আবার যখন আমি একত্বাভিলাষী হব, তখন আর বহু বলে কিছু থাকবে না। সকল ভেদ আমাতেই বিলীন হয়ে যাবে। ইহাই সত্যজ্ঞান। কিন্তু এই সত্যজ্ঞান কোনো শাস্ত্রজ্ঞান অধ্যয়ন বা কঠোর সাধনা দ্বারা লব্ধ নয়। মা স্বয়ং যতদিন স্বকীয় পরিচয় প্রদান না করেন, ততদিন কারও সাধ্য নেই মায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। মাকে পেতে হলে মায়ের স্বরূপ বুঝতে হলে, মাকে বরণ করতে হয়, মার চরণে আত্মনিবেদন করতে হয়। কন্যা যেমন বরকে বরণ করে, সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে, ঠিক তেমনভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়, তবেই মা আমার স্বকীয় স্বরূপটি উদ্ভাসিত করেন। গীতায় ভগবান বলেছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্‌॥ (গীতা ১৮।৬২)

হে অর্জুন ! তুমি সর্বতোভাবে সেই পরমেশ্বরেরই শরণাগত হও। তাঁর কৃপাতেই পরম শান্তি ও সনাতন ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উপনিষদেও বলা হয়েছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূঁ স্বাম্‌॥
(কঠ. ১।২।২৩)

উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, মনের ধারণা দ্বারা বা বহু লোকের নিকট শ্রবণ দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায় না। এই আত্মা যাঁকে বরণ করেন (যোগ্য মনে করেন) তিনিই তাঁকে পান। তাঁহারই নিকট এই আত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন।

দেবীর প্রকাশিত অষ্ট শক্তি অষ্ট মাতৃকা—

ব্রহ্মাণী—ব্রহ্মাণী—সৃষ্টিশক্তি। অখণ্ড চৈতন্যসমুদ্রের মধ্যে যে ক্রিয়াশক্তি

প্রকাশ পায়, তার নামই ব্রহ্মাণী। তিনি হংসবাহনযুক্তা এবং অক্ষসূত ও কমণ্ডুলধারিণী। জীবকে আশ্রয় করেই সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ। জীব যদি না থাকে, তবে সৃষ্টিশক্তি যে আছে, তা বোঝার উপায় থাকে না। তাই সৃষ্টিরূপিণী ব্রহ্মাণীর বাহন হল জীবরূপী হংস।

অক্ষসূত্র হল বর্ণমালা। এই বিশ্ব কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দদ্বারাই গঠিত (শব্দব্রহ্মা) আর পঞ্চাশত বর্ণমালাই হল ব্রহ্মাণীর অক্ষমালা।

আর ব্রহ্মাণীর হাতে আছে কমণ্ডলু যা সৃষ্টির বীজাধার বা বিরাট কর্মাশয়। পূর্ব পূর্ব কল্পের সৃষ্টির বীজ অনুসারে পুনরায় অভিনব সৃষ্টির সংস্কার এতে নিহিত। একাদশ অধ্যায়ে দেবতারা তাই দেবীকে স্তুতি করে বলছেন— **'কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি'** অর্থাৎ হে ব্রহ্মাণীরূপিণী দেবি ! তুমি কমণ্ডলুস্ত কুশপূত বারি ক্ষরণ করো। এর অর্থ তুমি যখন যে জীবকে যে কর্মের সম্মুখীন কর, সেই জীব তখন সেই কর্মে অভিমান করে। তোমার কৌশাম্ভক্ষরণ ব্যতীত জীবের কর্ম পিপাসার নিবৃত্তি হয় না।

মাহেশ্বরী— মাহেশ্বরী— লয়শক্তি। অখণ্ড চৈতন্য সমুদ্রের যে অংশে প্রলয়ভাব প্রকাশ পায় সেই চৈতন্যাংশের নাম মহেশ্বর। ইনি বৃষারূঢ়া। বৃষ শব্দের অর্থ হল ধর্ম। ধর্মকে আশ্রয় করেই জ্ঞানশক্তি পরিচালিত হয়। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পরিচালন রূপ ধর্ম যথারীতি অর্জিত না হলে জ্ঞানশক্তির বিকাশ হয় না। মাহেশ্বরীরূপে তুমি হস্তে ত্রিপুটি জ্ঞানরূপ (জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা) ত্রিশূল, মনোরূপ চন্দ্র এবং কুলকুণ্ডলিনীরূপ অহি বা সর্প ধারণ করে মহাবৃষভে আরোহণপূর্বক আবির্ভূত হও।

কৌমারী—কৌমারী—অসুর বিজয়িনী কার্তিকেয় শক্তি। ইনি দেবসৈন্য পরিচালিকা শক্তি, যা আসুরিক বৃত্তি নিচয়ের দমনকল্পে দেবশক্তিসমূহ পরিচালনা করেন। ইঁহার বাহন সর্পভোজী বিহঙ্গম ময়ূর। সর্প-কুটিলগতি, যেমন সাধারণের ইন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহ বিষয়াভিমুখে বিসর্পিতভাবে পরিচালিত হয়। আবার এই সাধারণ জীবই যখন এই জটিল ইন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহকে বিলয় করার মতো বল বা সামর্থ্য অর্জন করে, তখন সে হয় ময়ূরধর্মী কোমারী শক্তির বাহন। মা, স্বয়ং অনঘা অর্থাৎ অঘ-রহিতা, পাপ-রহিতা। তোমার দর্শনে জীব

অনঘ অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়। ভেদজ্ঞানই অঘ, দ্বৈতপ্রতীতিই যথার্থ পাপ। মা! তোমার দর্শনে জীবের দ্বৈত প্রতীতির বিলয় হয়, জীব ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করে।

বৈষ্ণবী—এরপর পরবর্তী তিনটি মন্ত্রে বিষ্ণুরূপিণী মায়ের তিন বিশেষ অভিব্যক্তির বর্ণনা আছে। বৈষ্ণবী রূপে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ছাড়াও শার্ঙ্গধনু ও খড়্গাধারিণী। **শার্ঙ্গ** অর্থাৎ ধনু বা প্রণব, **খড়্গ** অর্থাৎ দ্বৈত-প্রতীতি-বিলয়কারক জ্ঞান এবং **বিষ্ণু** অর্থে ব্যাপকতা বোধক। যে সর্বব্যাপী অখণ্ড জ্ঞানের উদয়ে দ্বৈত প্রতীতি লোপ পায়, সেই অখণ্ড জ্ঞানই বিষ্ণু হস্তস্থিত খড়্গ। গরুড় বিষ্ণুর বাহন। বেদই বিষ্ণুর অর্থাৎ ভগবানের স্থিতি বা পালিকা শক্তির পরিচালক। তাই বেদসমূহই গরুড়। মা! এই বিষ্ণুশক্তিরূপে তুমি এই স্নেহময় প্রণবাকর্ষণে আমাদের দিন দিন মোক্ষাভিমুখী করে চলেছ। তোমাকে শত কোটি প্রণাম।

বারাহী—ইনিও বিষ্ণুর অন্যতম শক্তিবিশেষ। বরাহ শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ হচ্ছে—এক কল্প পরিমিত কাল (বর-শ্রেষ্ঠ বা আত্মা আর তাঁকে যিনি আহনন অর্থাৎ আবৃত করেন তিনি বরাহ)। আত্মায় সর্বপ্রথম কালসত্তাই পরিকল্পিত হয় তাই কালই আত্মার সর্বপ্রথম আবরণ। বর্তমান কল্পের নাম শ্বেতবারাহকল্প যার সুদীর্ঘকাল অতীত হওয়ার পরে আমাদের এই বসুন্ধরার সৃষ্টি। পুরাণকারগণ তাই বলেছেন প্রলয়পয়োধি জল হতে নির্গত বসুন্ধরা বরাহের দন্তে অর্থাৎ সুবিশাল অবয়বের একদেশে অবস্থিত। যদি বারাহী শক্তিরূপিণী মা এই অব্যক্ত বিশ্ববীজকে ব্যক্ত অবস্থায় আনয়ন না করতেন, তবে এই বসুন্ধরা, এই চরাচর, কতকাল যে অজ্ঞান তিমিরে সুষুপ্ত থাকত, তা কে নির্ণয় করতে পারে ? জীবসমূহ যে কাম কর্মময় এই স্থূলভাবকে অবলম্বন করেই তো জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মঙ্গলের দিকে—মোক্ষের দিকে অগ্রসর হয় এ তোমারই কৃপা।

নারসিংহী—নারসিংহী— ইনিও বিষ্ণুর অন্যতম শক্তিবিশেষ। নৃসিংহস্বরূপ জ্ঞান। নৃ শব্দের অর্থ মানুষ এবং সিংহ শব্দ শ্রেষ্ঠার্থবাচক। আত্মস্বরূপবিষয়ক জ্ঞানের উদয় হলেই মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। ইনি হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেছিলেন। হিরণ্য শব্দের অর্থ আত্মা। যে হিরণ্যকে

বা পরমাত্মাকে কশিত মানে নিগৃহীত করে অর্থাৎ যার বিষয়াভিমান অত্যন্ত প্রকটিত সে-ই হল হিরণ্যকশিপু। এই হিরণ্যকশিপু হল অসুরভাব, যা একমাত্র আত্মস্বরূপ জ্ঞানই বিনাশ করতে সমর্থ।

হিরণ্যকশিপুর সন্তান প্রহ্লাদ আনন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান। একটু একটু করে যতই তার প্রকাশ হতে থাকে, অজ্ঞান ততই তাকে বিনষ্ট করার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু ক্রমে যখন জলে স্থলে অনলে অনিলে গগনে সর্বত্র প্রহ্লাদের হরিদর্শনরূপ সত্যজ্ঞান মূর্ত হয় তখন জীবের জড়বুদ্ধিরূপ স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ করে নৃসিংহমূর্তির আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয় এবং ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়, মানে হিরণ্যকশিপু নিহত হয়।

ইন্দ্রাণী—ইন্দ্র দেবাধিপতি। তাঁর শক্তি ইন্দ্রাণী। মা, নির্মল 'জ্ঞানরত্ন'স্বরূপ কিরীট তোমার ইন্দ্রাণী রূপের শিরোভূষণ, তাই তুমি কিরীটিনী।

আবার তুমিই মহাবজ্রধারিণী। শ্রুতিও বলেছেন—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ॥

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। (কঠ. ২।৩।৩)

তাঁরই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, তাঁরই ভয়ে সূর্য উত্তাপ দেয়, তাঁরই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম (যম) ধাবমান হয় অর্থাৎ স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয়। দেবী তুমি নয়নোজ্জ্বলা। অসংখ্য তোমার নেত্র, তুমি মা বিশ্বতচক্ষু। প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণুটি পর্যন্ত তোমার সে চক্ষুতে সে দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত, কোথাও তোমার অগোচর কিছু নাই। মা ! তুমি আবার ইন্দ্রাণীরূপে বৃত্ত-প্রাণহারিণীও বটে। অনাত্মবোধরূপী বৃত্তাসুর তোমারই বজ্রপ্রহারে নিহত। ব্রাহ্মণের অস্থি দ্বারা নির্মিত তোমার এই বজ্র। ব্রাহ্মণই মূর্তিমান ব্রহ্ম-জগতের একমাত্র ধর্তা। তাদের শরীরের ক্ষুদ্রতম অংশটিও ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত বিশুদ্ধ। তাঁদের ভৌতিক দেহের অস্থি পর্যন্ত অসুর বিনাশে সমর্থ—নিরন্তর জগতের মঙ্গল সাধনে রত।

শিবদূতী—মা তুমি শিবদূতী। শুম্ভবধের প্রাক্কালে তুমি মহাদেবকে দূতরূপে নিযুক্ত করে, জগতে শিবদূতী নামে খ্যাত হয়েছ। তোমার ঘোরা মূর্তি দর্শনে ও ভয়ংকর নাদ শ্রবণে অসুর ভাবসমূহ অচিরে বিলয়প্রাপ্ত হয়।

চামুণ্ডা—মা ! তুমি চণ্ডমুণ্ডর নিধনকারিণী চামুণ্ডা। তোমার দ্রংষ্টাকরালা মুখমণ্ডলে দ্বৈত প্রতীতিরূপ দৈত্যকুল প্রবিষ্ট হয়ে, সাধকদের অদ্বয় জ্ঞান প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। পঞ্চাশৎবর্ণরূপ পঞ্চাশ নর শিরোমালা তোমার কণ্ঠদেশে বিলম্বিত।

মা ! তুমি এইরূপে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী আদি অষ্টশক্তিরূপে প্রকাশ পেয়ে আমাদের ঘৃণা, লজ্জা আদি অষ্টপাশরূপী অসুরকুলকে বিলয় করে দাও। আবার অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষাকেও বিমর্দিত করে, সুদুর্লভ ঈশ্বরত্ব-লাভের প্রলোভনকে বিদুরিত করে, আমাদের অদ্বয়তত্ত্বে বিশুদ্ধ বোধস্বরূপে উপনীত করাও। মা ! তোমার এই অষ্টবিধ শক্তি প্রকাশ জীবত্বের অষ্টপাশ ছিন্ন করে, ঈশ্বরত্বের অষ্ট ঐশ্বর্যকে তৃণীকৃত করে, আমাদের মুক্তির পথ খুলে দেয়। মা ! তুমি প্রতি নরে এইরূপ স্নেহময়ী জননীরূপে আত্মপ্রকাশ করো।

দেবীর প্রতি পুনঃ প্রণতি (২২—৩২)

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টিস্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২২ ॥
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২৩ ॥
সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥ ২৪ ॥
এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্বভীতিভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥ ২৫ ॥
জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥ ২৬ ॥
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য যা জগৎ।
সা ঘন্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ কসুতানিব॥ ২৭ ॥
অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্॥ ২৮ ॥

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥ ২৯ ॥
এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাঽঽত্মমূর্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা॥ ৩০ ॥
বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥ ৩১ ॥
রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥ ৩২ ॥
(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।২২—৩২)

সরলার্থ—লক্ষ্মী, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, স্বধা, ধ্রুবা, মহারাত্রি তথা মহা-অবিদ্যারূপা নারায়ণি! আপনাকে প্রণাম ॥ ২২ ॥ মেধা, সরস্বতী, বরা (শ্রেষ্ঠা), ভূতি (ঐশ্বর্যরূপা), বাভ্রবী (রাজসী অথবা পার্বতী), তামসী (মহাকালী), নিয়তা (সংযমপরায়ণা) তথা ঈশা (সর্বেশ্বরী) রূপিণী নারায়ণি! আপনাকে প্রণাম ॥ ২৩ ॥ সর্বস্বরূপা, সর্বেশ্বরী তথা সর্বশক্তিময়ী দিব্যরূপা দুর্গে দেবি! সকল আপদ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আপনাকে প্রণাম॥ ২৪ ॥ হে কাত্যায়নি! এই ত্রিলোচনবিভূষিতা আপনার সৌম্যবদন সব রকম উপদ্রব থেকে আমাদের রক্ষা করুক। আপনাকে প্রণাম॥ ২৫ ॥ ভদ্রকালি! জ্বালাসমূহ করাল, অত্যন্ত ভয়ংকর এবং সমস্ত অসুরগণকে বধকারী আপনার এই ত্রিশূল ভয় হতে আমাদের রক্ষা করুক। আপনাকে

নমস্কার॥ ২৬ ॥ দেবি ! যে ঘণ্টাধ্বনিতে সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত থেকে দৈত্যদের তেজ হরণ করে, আপনার সেই ঘণ্টা, মা ! যেমন ছেলেকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন—সেইরকম আমাদের সকল পাপ থেকে রক্ষা করুক॥ ২৭ ॥ চণ্ডিকে, আপনার হাতের উজ্জ্বল খড়্গ, যে খড়্গ অসুরের রক্তসিক্ত ও মেদলিপ্ত, সেই খড়্গ আমাদের মঙ্গল করুক। আমরা আপনাকে প্রণাম করি॥ ২৮ ॥ হে দেবি ! আপনি তুষ্ট হলে সকল রকম রোগ বিনাশ করেন এবং কুপিত হলে মনোবাঞ্ছিত সকল কামনা নাশ করেন। আপনাকে যারা আশ্রয় করেছে তাদের বিপত্তি কখনও আসেই না। আপনার চরণাশ্রিত মানুষ অন্যেরও আশ্রয়যোগ্য হয়॥ ২৯ ॥ দেবি ! অম্বিকে ! আপনি স্বীয় স্বরূপকে বহু প্রকারে প্রকট করে নানা রূপ ধারণ করে এই যে এখানে ধর্মদ্রোহী মহাসুরদের বিনাশ সাধন করলেন, এইসব আপনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কে করতে পারে ? ॥ ৩০ ॥ সমস্ত বিদ্যা, জ্ঞানপ্রকাশক ধর্মশাস্ত্রসমূহ তথা আদিবাক্যসমূহে (বেদে) একমাত্র আপনি ছাড়া আর কার বর্ণনা আছে ? আপনি ছাড়া দ্বিতীয় এমন কোন্ শক্তি আছে যে এই বিশ্বের অজ্ঞানময় ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ মমতারূপী সংসারগর্তে মানুষকে নিরন্তর ভ্রমণ করাতে পারে ? ॥ ৩১ ॥ যেখানে রাক্ষস, যেখানে ভয়ংকর বিষধর সর্প, যেখানে শত্রু, যেখানে দস্যুদল এবং যেখানে দাবানল, সেখানে আর সমুদ্রমধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে থেকে আপনি বিশ্বকে রক্ষা করে থাকেন ॥ ৩২

মূলভাব—দেবতাগণ অষ্টমাতৃকার স্তুতি করে এই প্রকরণটির এগারোটি শ্লোকে দেবীকে পুনঃপ্রণতি জানাচ্ছেন। প্রকরণের প্রথম চার শ্লোকে দেবীর ২০টি স্বরূপ বিভূতি, পরের তিনটি শ্লোকে দেবীর হস্তে ধৃত অস্ত্রের নিকট মঙ্গল কামনা এবং পরের চার শ্লোকে দেবীর স্বরূপ পুনঃবর্ণনা করেছেন।

স্বরূপ বিভূতি—(শ্লোক ২২—২৫)

লক্ষ্মীঃ—মা, তুমি লক্ষ্মী—প্রাণরূপিণী সৌন্দর্যরূপিণী সম্পদরূপিণী।

মহাবিদ্যাঃ—তুমি কালী তারাদি দশমহাবিদ্যা বা মহতী ব্রহ্মবিদ্যা।

শ্রদ্ধাঃ—তুমি সত্যনিষ্ঠা, গুরুবেদান্তবাক্যে দৃঢ়প্রত্যয়রূপা শ্রদ্ধা।

পুষ্টিঃ—তুমি পঞ্চকোষের পরিপূর্ণতারূপিণী পুষ্টি।

স্বধাঃ—তুমি শ্রাদ্ধাদি পিতৃকৃত্যরূপা স্বধা।

ধ্রুবাঃ—তুমি নিশ্চলা।

মহারাত্রিঃ—তুমি প্রলয়রূপা অজ্ঞানরূপা।

মহা-অবিদ্যাঃ—তুমি অনাত্ম প্রত্যয়রূপা।

মেধাঃ—তুমি ধারণাবতী বুদ্ধি, ব্রহ্মবিদ্যাধারণের সামর্থ্যরূপা।

সরস্বতী—বিশুদ্ধজ্ঞানরূপা ব্রহ্মবিদ্যা।

বরাঃ—তুমি শ্রেষ্ঠ বরপ্রদা।

ভূতিঃ—তুমি সত্ত্বগুণ স্বরূপা।

বাভ্রবী—তুমি রজোগুণস্বরূপা।

তামসী—তুমি তমোগুণস্বরূপা।

নিয়তা—তুমি নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপা।

ঈশা— তুমি ঈশ্বরী, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী হয়েও তুমি প্রতিটি নরে বিশিষ্টভাবে নারায়ণ মূর্তিতে বিরাজিতা।

সর্বরূপা—মা! এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ (সর্ব), যাতে প্রতিনিয়ত আমরা বহুত্বের বা সর্বত্বের অনুভব করি, সে সকলই তোমার প্রথম স্বরূপ—তোমার স্থূল দেহ। যে সাধক তোমার সর্বস্বরূপ (দৃশ্যমান জগৎকে) তোমারই **স্থূলরূপে** দেখতে পায় তার নিকট তুমি তোমার দ্বিতীয় স্বরূপ সর্বেশ্বরী প্রকাশ কর।

সর্বেশ্বরী—এই দ্বিতীয় স্বরূপে তুমি তাদের নিকট এই সর্বের অর্থাৎ এই বহুত্বের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী ঈশ্বরীরূপে আত্মপ্রকাশ কর। ইহাই তোমার **সূক্ষ্ম** শরীর।

সর্বশক্তি সমন্বিতঃ—যে সাধক তোমার ঈশ্বরী-মূর্তির সাক্ষাৎলাভ করে, সে জীবত্বের—ক্ষুদ্রত্বের, মোহ হতে পরিত্রাণ পায়। তখন তুমি তোমার তৃতীয় মূর্তি সর্বশক্তি-সমন্বিত স্বরূপটি উদ্ভাষিত কর। ইহা তোমার **কারণ শরীর,** উহাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিরঞ্জনরূপে অভিহিত। গীতায়ও তাই ভগবান তাঁর এই তিন স্বরূপকে ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তমরূপে উল্লেখ করেছেন—

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ (গীতা ১৫।১৮)

শ্রুতিও বলছেন—

'ক্ষরং ত্ববিদ্যা হি অমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ'

(শ্বে. শ্বঃ ৫।১)

অর্থাৎ বিনাশশীল ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতি অবিদ্যা তথা একে যে ভোগ করে সেই অমৃতস্বরূপ অবিনাশী জীবাত্মাই বিদ্যা এবং এ দুটিকে (ক্ষর ও অক্ষর) এক ঈশ্বর তাঁর শাসনে রাখেন—**পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ**। যাই হোক, মা তুমি ত্রিবিধ রূপেই সৎ। দেবগণ স্তুতি করে বলছেন—**'ভয়েভ্যোস্ত্রাহি নো দেবী'** তুমি আমাদের ভয় হতে পরিত্রাণ করো। এ আমার একার প্রার্থনা নয়—**'নঃ'** অর্থাৎ আমাদের সকলের ভয় দূর করো মা! জন্ম-মৃত্যুক্লিষ্ট অল্পজ্ঞ সংসার ভয়ে ভীত নিরাশ্রয় জীবগণের ভয় হরণ করতে একমাত্র তুমিই সমর্থা। মা! ত্রিলোক প্রকাশক ত্রিকালদর্শী নয়নত্রয়ভূষিত সর্বমনোহর তোমার মুখমণ্ডল আমাদের সর্বভূত হতে রক্ষা করুক। অর্থাৎ মা! তুমি আমাদের অজ্ঞানতা দূর করে দাও যাতে উপলব্ধী হয় যে একমাত্র আনন্দ বস্তু তুমিই যে সর্বরূপে (জগৎরূপে) প্রকটিতা।

পরবর্তী তিনটি মন্ত্রে (শ্লোক ২৬-২৮) মায়ের হস্তস্থিত তিনটি অস্ত্র যেমন **ত্রিশূলের**—ত্রিপুটি জ্ঞান, **ঘণ্টাধ্বনির**—অনাহত নাদ এবং **খড়্গার**—অনাত্ম-প্রতীতি-বিলয়কারক প্রজ্ঞার নিকট ইন্দ্রাদি দেবগণ পরিত্রাণ ও মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেছেন। দেবগণ স্তুতিতে বলছেন—মা! তুমি স্বয়ং আমাদের রক্ষা করেছ, তোমার অস্ত্রশস্ত্রও যেন আমাদের পুত্রের ন্যায় রক্ষা করে। এই অস্ত্রসমূহই পূর্বে অসুরসমূহকে বিনষ্ট করেছে, এখনও যেন সমস্ত প্রারব্ধ ক্ষয় হওয়া পর্যন্ত ঠিক সেইভাবে আমাদের অসুরের অত্যাচার (আসুরিক ভাব) থেকে রক্ষা করে। মা! এই নিবেদন জানিয়ে আমরা তোমায় প্রণাম করি—**'চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্'**।

এরপর পরবর্তী চারটি (শ্লোক ২৯—৩২) মন্ত্রে দেবীর পুনঃপ্রণতি করা হয়েছে। দেবতারা বলছেন মা! তোমার তুষ্টি ও রুষ্টি উভয় ভাবই সবার পক্ষে মঙ্গলদায়ক। যখন তোমার তুষ্টি হয় অর্থাৎ নিত্যপ্রসন্না মা, যখন তোমার নিত্য প্রসন্নতা আমাদের উপলব্ধি হয় তখন আমরা আমাদের ত্রিবিধ

শরীরের অশেষরোগ থেকে মুক্ত হই। এই ব্যাধির স্বরূপ হল— **স্থূলশরীর ব্যাধি**—আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি। **সূক্ষ্মশরীর ব্যাধি**—মানসিক রোগ। **কারণ শরীর ব্যাধি**—অজ্ঞানতা—আত্মবিস্মৃতিই ইহার স্বরূপ। সত্য সত্যই মানুষ যখন ভগবৎ প্রসন্নতা উপলব্ধি করতে পারে, বুঝতে পারে, তখন তার সর্ব বিষয়ে শুভ হয়—অভ্যুদয় উপস্থিত হয়।

আবার মা ! তুমি রুষ্ট হলে জীবের সকল কামনা সকল অভীষ্ট দূর হয়ে যায়। বর্তমান কাম্য বস্তু হল 'কামনা' আর ভবিষ্যৎ কাম্যবস্তু হল 'অভীষ্ট'। মানুষ যখন সর্ববিষয়ে তোমার অপ্রসন্নতা লক্ষ করে—তোমার রোষরক্তনয়ন দেখে ভীত হয়, তখন তার যাবতীয় কাম্য ও অভীষ্ট সত্য সত্যই বিনষ্ট হয়, আর বুঝি তখনই আমরা যথার্থ মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হই। রুষ্টা মূর্তিতে আমাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের কামনা বিদূরিত না করলে আমরা মহামঙ্গল স্বরূপ হিরণ্ময় মন্দিরের সন্ধান পেতাম না। মা ! তোমার তোষ ও রোষ উভয়েই আমাদের মঙ্গলদায়ক। তোমার তুষ্টিতে অভীষ্টলাভ ও রুষ্টিতে অভীষ্টনাশ, উভয় পক্ষেই জীবের মঙ্গল। তুমি এই দ্বিবিধভাবে আত্মপ্রকাশ কর বলেই সৃষ্টির এই বৈচিত্র্য, এত মাধুর্য। দেবগণ মন্ত্রটি শেষ করেছে দেবীর প্রতি আত্মসমর্পণের অমৃতময় বাণী বলে—

'ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং। ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥'

অর্থাৎ তোমার শরণাগত হলে জীবের আর কোনো বিপদ থাকে না উপরন্তু তারা অপরের আশ্রয়দাতা হন।

দেবতাগণ স্তুতি করে বলছেন—মা ! তুমি অদ্বিতীয়া বিশুদ্ধরূপা হয়েও বহুরূপে আত্মপ্রকাশ কর — ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, কৌমারী প্রভৃতি বহুমূর্তিতে প্রকটিত হয়ে, ধর্মবিরোধী অসুরভাবসমূহকে বিনষ্ট করে থাক। আমরা আমাদের বুদ্ধির মাপকাঠি দ্বারা তোমাতে একত্ব ও বহুত্বের সমন্বয় করতে যাই বলে তা পারি না। বাস্তবিক তুমি এক হয়েও বহুরূপে বিরাজিতা। দেবতারা বলছেন—**'কান্যা'** অর্থাৎ 'অন্যা কা' মানে অন্য আর কে আছে ? কেহই নাই। **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'** ইহাই সত্য। একরূপেও তুমি আবার বহুরূপেও তুমি।

স্তুতির শেষে দেবতাগণ বলছেন—**'অনেকৈরূপৈঃ আত্মমূর্তিং বহুধা কৃত্বা'** অর্থাৎ এক আত্মমূর্তি তুমি অনেক রূপে প্রকাশিত হও। আত্মারূপে তুমি একা অদ্বিতীয়া, ঈশ্বররূপে তুমি স্বগতভেদময়ী বহুরূপা।

মা ! এই বিশ্বকে বিদ্যা-অবিদ্যারূপে ঊর্ধ্ব-অধঃরূপে তুমিই পরিভ্রমণ করাও। একদিকে বিদ্যা— যেমন ব্রহ্মবিদ্যা ও তৎসাধনভূত শাস্ত্রসমূহ এবং দীপসদৃশ আপ্তবাক্যসমূহ যেমন বেদ-উপনিষদ্। অন্যদিকে অবিদ্যা—মমত্বরূপ মহান্ধকারময় গর্ত বা পূর্ণ অজ্ঞান। দেবতারা তাই বলছেন—**'কা ত্বদন্যা'** অর্থাৎ তুমি ছাড়া আর কে আছে ? দেবতারা বলছেন—**'বিভ্রাময়তি'** অর্থাৎ যেন স্বয়ং বিভ্রান্ত হয়ে আত্মরূপ বিস্মৃত হয়ে বহুরূপে আত্মপ্রকাশ কর। আবার বিবেকের দীপ জ্বালিয়ে নিজেকে অন্বেষণ কর। নিত্যজ্ঞানময়ী মা তোমার এ লীলা বড়ই বিচিত্র।

মা যে কেবল এই বিশ্বে বিভ্রম সৃষ্টি করেন তা নয়, একে যথাযোগ্য রক্ষাও করেন। তুমি **রাক্ষসরূপী** বিষয়ের প্রলোভন, উগ্রবিষ **সর্পরূপী** দ্বেষ, হিংসা আদি, **অরিরূপ** কাম ক্রোধাদি, **দস্যুবলরূপী** দম্ভ দর্প অভিমান, **দাবানলরূপী** শোক দুঃখাদি এবং দুস্তর **সমুদ্ররূপী** সংসার— যেখানে রক্ষা করার আর কেউ নেই। যেখানে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর করাল ছায়া— যেখানে অজ্ঞানতার পূর্ণ আবরণ, সেখানেও তো মা তুমি পরিপালিনী মূর্তিতে স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিতে প্রকটিত হয়ে স্নেহের সন্তান জীববৃন্দকে রক্ষা করে থাক, বিশ্বকে রক্ষা কর। আবার যারা পূর্বোক্তরূপ বিপদে পতিত হয়, বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তারাও তোমার স্নেহময় অঙ্কে চিররক্ষিত থাকে। দেবগণ বলেছেন **'তত্র স্থিতা ত্বং'** অর্থাৎ সেই বিপদসংকুল স্থানে তুমিই একমাত্র অবস্থিতা থাক। তাই জীবরূপা স্নেহের সন্তানরা যদি বিপদে পড়ে তবে তারা সাধারণের দৃষ্টিতে বিনষ্ট হলেও তাদের কিছুমাত্র হানি হয় না বরং তারা তোমারই শান্তিময় কোলে স্থান পায়। মা সর্বত্রই রক্ষাকর্ত্রী জননী। স্তুতিতে তাই বলা হয়েছে **'পরিপাসি বিশ্বম্'** অর্থাৎ রক্ষা বা বিনাশ উভয় স্থলেই তুমি বিশ্বকে রক্ষা করছ।

দেবতাদের বর প্রার্থনা (৩৩—৩৫)

বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥ ৩৩ ॥
দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
র্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্বজগতাং প্রশমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥ ৩৪ ॥
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥ ৩৫ ॥
(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৩৩—৩৫)

সরলার্থ—হে বিশ্বেশ্বরি ! আপনি বিশ্বকে পালন করেন, আপনি বিশ্বরূপা, তাই আপনি সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করেন। আপনি ভগবান বিশ্বনাথেরও বন্দনীয়া। যাঁরা ভক্তিভরে আপনাকে প্রণাম করেন, তাঁরা বিশ্বের আশ্রয়স্থল হন॥ ৩৩॥ দেবি ! আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। এখন যেভাবে অসুরদের বধ করে আপনি দ্রুত আমাদের রক্ষা করলেন, সেইভাবে ভবিষ্যতেও সর্বদাই আমাদের শত্রুভয় থেকে রক্ষা করুন। আপনি সমগ্র জগতের পাপ নাশ করুন এবং উৎপাত ও পাপের ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি ব্যাপক উপদ্রব শীঘ্র নাশ করুন॥ ৩৪ ॥ হে জগতের দুঃখনাশিনী দেবি ! আমরা আপনার চরণে প্রণত ; আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। ত্রিভুবনবাসীর আরাধ্যা পরমেশ্বরি ! আপনি আমাদের বরদান করুন ॥ ৩৫ ॥

মূলভাব—এই প্রকরণটির ভাব দেবতাগণের সার্বিক সমর্পণের, শরণাগতির। দেবগণ বলছেন—হে মাতঃ ! তুমি প্রসন্না হও। তুমি **'পরিপালয় নোহরিভীতে'** অর্থাৎ আবহমান কাল হতে তুমি আমাদের (**নঃ**)—এই বহু

আমির, এই অজ্ঞানকল্পিত আমিগুলির যে অরিভীতি—শত্রুভয় আছে অর্থাৎ কামাদিরিপু কর্তৃক আচ্ছন্ন ভাব আছে তা দূর করো, আমাদের পরিপালন করো।

দেবগণ আবার বলছেন—**‘পাপানি সর্বজগতাং প্রশমং নয়াশু’** অর্থাৎ সর্বজগতে পাপ নামক যে সংস্কার আছে তা আশু প্রশমিত করো। কিন্তু জীবের এ পাপবোধ হয় কেন ? জীবের ‘আমি’ বোধ হয় কর্তা সেজে কর্ম করে, তাই কর্মফলরূপ পাপ আমির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। কিন্তু ভগবান তুমিই তো গীতায় এর নিরসনের উপায় বলে দিয়েছ—**‘মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে’**। অর্থাৎ যে তোমার শরণাগত সেই এই মায়ার কবল থেকে মুক্ত হয়, তাদের কর্তৃত্বজ্ঞান তিরোহিত হয়। সুতরাং পাপ বলে, কর্মফল বলে আর কিছুই থাকে না। এই যে অহংবোধ, এই হল পাপ আর এই অহংবোধ দূর করার প্রচেষ্টাই হল সাধনা আর এটা মা তোমার কৃপাসাপেক্ষ। অহংবোধে উদ্বুদ্ধ বহির্মুখ জীব বিবিধ উপসর্গে নিপতিত হয়। দেবতারা তাই বলছেন —**‘উৎপাতপাক-জনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্’**। মা ! তুমি জগতের এই পাপ দূর করো, এই উপসর্গ প্রশমিত করো।

মা তুমি স্বপ্রকাশরূপিণী। তুমিই বিশ্বের যাবতীয় আর্তি হরণ করে থাক। তোমাকে লাভ করলেই জীবের সকল আর্তি দূর হয়, কারণ প্রণত জনগণের প্রতি প্রসন্ন হওয়াই তোমার স্বভাব। দেবতারা স্তুতি করে বলছেন—মা আমরাও তোমার চরণে প্রণত—প্রকৃষ্টরূপে নত হয়েছি, আমাদের আমিত্বের উচ্চশির তোমার চরণে অবনত হয়েছে। তুমিই অবনত করিয়েছ— এবার মা তুমি **‘প্রসীদ’**, তোমাকে প্রসন্ন হতেই হবে। মা ! ত্রিলোকবাসী সুর-নর-গন্ধর্ব সকলেই তোমার স্তব করে থাকে তাই তুমি **‘ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে’**। তুমি সকলকেই বরদান কর তাই তুমি **‘লোকানাং বরদা ভব’**। তাই তুমি বরদায়িনী মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে দাঁড়াও, সত্যের আলোকে আমাদের উদ্ভাসিত কর।

দেবতাদের পুনঃ প্রার্থনা (শ্লোক ৩৯)

দেব্যুবাচ॥ ৩৮॥

সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্‌বৈরিবিনাশনম্॥ ৩৯ ॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৩৯)

সরলার্থ— হে সর্বেশ্বরি ! আপনি এইভাবে ত্রিভুবনের সমস্ত বিঘ্নের প্রশমন করুন এবং (ভবিষ্যতেও) আমাদের শত্রুকুল নাশ করবেন ॥ ৩৯ ॥

মূলভাব— দেবগণের এই স্তুতির ফলে, মা আমার বিশেষভাবে প্রসন্ন হয়ে, বরদায়িনীরূপে আবির্ভূত হয়ে বর প্রদানে উদ্যত হলেন। সাধক যখন জগদাত্মায় একীভূত হয়ে যায়, তখন জগতের মঙ্গল সাধনাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য থাকে না। তাই নিষ্কাম সাধকগণের তপস্যার ফলে জগতের সকলেরই অল্পাধিক লাভ হয়ে থাকে, বিশ্বমঙ্গল সাধিত হয়। দেবগণ তাই প্রার্থনা করছেন—মা ! আমাদের চাইবার মতো কিছুই নেই, তুমি কৃপা করে ত্রিলোকের সর্ববাধা (বহুত্ব ভাব) দূর করো। সর্ব (জগৎ) যে বাস্তবিক বাধা নয়, সর্বরূপে যে তুমিই বিরাজিত, এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলেই, জীব তোমার সর্বাতীত স্বরূপটির উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। তোমার সত্তায় বিশ্বাস হলেই, এই সর্ববাধা প্রশমিত হয়। জগৎ যথার্থ কল্যাণ লাভ করে।

দেবতাদের বর প্রার্থনা ও দেবীর বর প্রদান (শ্লোক ৫৪, ৫৫)

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি॥ ৫৪ ॥
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥ ৫৫ ॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫৪-৫৫)

সরলার্থ—দেবী প্রসন্ন হয়ে বললেন—তথাস্তু ! আমি আশ্বাস দিচ্ছি যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাববশত এই প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হবে তখনই আমি আবির্ভূতা হয়ে শত্রুনাশ করব।

মূলভাব—এই শ্লোকটিই দেবী বাক্যের উপসংহার। গীতাতেও শ্রীভগবান এই কথাই পুনঃপুনঃ বলেছেন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(গীতা ৪।৭-৮)

অর্থাৎ হে অর্জুন! যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ সাকাররূপে এই জগতে প্রকটিত হই ॥ ৭

যুগে যুগে আমার অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সাধুদের রক্ষা, পাপীদের বিনাশ এবং ধর্মস্থাপন॥ ৮

ভগবানের এই দৃঢ় আশ্বাসন যে যতরকম বাধাই আসুক না কেন, মা স্বয়ংই তা দূর করে দেন, অতীতেও করেছেন, বর্তমানেও করছেন আবার ভবিষ্যতেও করবেন।

সাধকের তাই একমাত্র কর্তব্য যেন আমরা 'শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে '**সর্বস্যার্তিহরে দেবী নারায়ণি নমোঽস্তু তে**' এইভাবে মাতৃচরণে শরণাগত হই।

মা তখন আমাদের সর্ববিধ অসুররূপী সাধনের বিঘ্ন থেকে রক্ষা করে আনন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন।

মা এ স্থলে '**অবতীর্যাহং**' বলে অবতারতত্ত্বের আভাস দিয়েছেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে মহর্ষি মেধস মহারাজ পুনঃ অবতার তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১২।৩৬)

অর্থাৎ হে রাজন্! সেই ভগবতী দেবী নিত্যা হয়েও পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়ে জগৎ পরিপালন করেন। এখানে পরিপালনের অর্থ হচ্ছে তিনি জগতে অবতীর্ণ হয়ে অজ্ঞানরূপ অরিকুল (শত্রু) সংক্ষয় করে যাবেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, যদি সাধকের সত্যি মুমুক্ষুতা আসে, প্রেমের পিপাসা জাগে তবে তার হৃদয়ে মা প্রথমেই অবতারের প্রতি অবিচল বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করান। আর যদি কারো অবতারের লীলায় দৃঢ় বিশ্বাস হয়—অহৈতুক ভক্তি হয়, তবে তার শ্রেয়োলাভ নিশ্চিত। আবার শ্রেয়োলাভ যদি নিশ্চিত হয় তবে ভগবান দেখা দেন না কেন ? কেন দেন না, তা মেধস ঋষি পরের শ্লোকে বলেছেন—

'সাহযাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি' (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১২।৩৭)

অর্থাৎ মা যাচিতা হলেই তুষ্ট হয়ে জ্ঞানৈশ্বর্য প্রদান করেন। তাহলে কি আমরা মাকে চাই না ? ঠিক তাই, আমরা মাকে সঠিকভাবে চাই না এমনকি সেটি বুঝতেও পারি না।

যখন শুধু মায়ের জন্য মাকে চাইতে পারবো, ভগবানের জন্যই ভগবানের শরণাগত হবো, তখনই ভগবৎ কৃপায় প্রকৃত প্রেমলাভ হবে, তাঁর দর্শন পাবো।

এই হল সুরথ রাজার প্রতি মহর্ষি মেধসের উপদেশ।

———○———

ভাগবত

ব্রহ্মার স্তুতি (সৃষ্টির প্রারম্ভে)

(৩য় স্কন্ধ, ৮ম-৯ম অধ্যায়)

প্রাক্‌কথন

বিশ্বের সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি, অনন্ত—একবার সৃষ্টি তারপর প্রলয়, আবার সৃষ্টি, আবার প্রলয়। এই প্রবাহ আবহমান কাল হতে চলে আসছে—এর আদি নেই অন্ত নেই। তবে 'সৃষ্টির প্রারম্ভ' কথাটির অর্থ হল, পূর্ব সৃষ্টির নাশ অর্থাৎ লয় হওয়ার পর যে সৃষ্টি হয়, তারই প্রথম অবস্থা।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগ নিয়ে এক চতুর্যুগ আর এই সহস্র চতুর্যুগের আবর্তনে এককল্প হয়, তা হল ব্রহ্মার একদিন, আর এই এক দিনই সৃষ্টি প্রপঞ্চের কাল (ইউনিট)।

এই দিনের যখন অবসানের সময় হয় তখন ভগবান সৃষ্টি প্রপঞ্চের সকল বস্তুকে সৃষ্টির বিলোমক্রমে (অর্থাৎ কার্যগুলিকে ক্রমে কারণের মধ্যে লয় করে) সমস্ত প্রকৃতিতে লয় করেন। তারপর এই প্রকৃতিও সমস্ত জীবের লিঙ্গশরীর (বা সূক্ষ্মশরীর) সংকর্ষণে লীন হয়ে যায়। তখন প্রাকৃত আর কোনো বস্তুই থাকে না। কেবল অপ্রাকৃত নিত্য-সিদ্ধ বৈকুণ্ঠাদি ধাম ও সেই আনন্দধামে লীলাময়রূপে সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ শ্রীভগবান ও তাঁর নিত্য পার্ষদগণ অবস্থান করেন। পঞ্চভূতময় বিশ্ব তখন জলময় (শক্তিতে পূর্ণ) আর সেই জলরাশির মধ্যে কেবল সংকর্ষণের অবস্থান। এই অবস্থাটিই অনন্ত শয্যাশায়ী অবস্থা, আর এই অবস্থাই শ্রীভগবানের যোগনিদ্রায় অধিষ্ঠান। এইভাবে সংকর্ষণরূপে যোগনিদ্রায় বিশ্রামে থাকার কালও ব্রাহ্ম পরিমিত এককল্প।

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্‌ব্রহ্মণো বিদুঃ। রাত্রিং যুগসহস্রান্তাঃ॥

(গীতা ৮।১৭)

কালশক্তির অনুসারেই রাত্রির অবসানে দিন বা দিনের অবসানে রাত্রি আরম্ভ হয়। আর এইভাবে দিন-রাত্রি ও সৃষ্টি-প্রলয়ের ধারা বয়ে চলছে। এ

সবই কালশক্তির প্রভাবে সর্বদাই প্রকটিত হতে থাকে, তাই ভাগবতে বলা হয়েছে **'কালাত্মিকাং শক্তিমুদীরয়ানঃ'**। সংকর্ষণের যোগনিদ্রার অবসান সময়, আগত রাত্রি শেষ হল, আবার দিন আসল, অমোঘ কালশক্তি তখন ভগবানে লয়প্রাপ্ত জীব শক্তিতে কর্মের সাড়া জাগিয়ে দিল। ভগবান যোগনিদ্রা সম্বরণ করে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। এই ইক্ষণের বশেই **'সদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি'** (ছাঃ ৬।২।৩) অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্য দূরীভূত হয়ে রজোগুণের প্রবলতায় প্রকৃতির কার্যন্মুখতা উপস্থিত হয়। তখন লয়প্রাপ্ত জীব ও অন্যান্য সূক্ষ্মপদার্থসকল রজোগুণের প্রেরণায় আত্মপ্রকাশের জন্য 'পদ্মমুকুলরূপে' শ্রীভগবানের নাভিপথে নির্গত হয়। এই পদ্মটি সাধারণ পদ্মের মতো নয়, সংকর্ষণে লীন সমস্ত সূক্ষ্মপদার্থই এই পদ্মরূপে উদ্ভূত হয়। ব্রহ্মার তিনটি অবস্থা—সূক্ষ্ম অবস্থায় তিনি **'হিরণ্যগর্ভ'**, স্থূল অবস্থায় তিনি **'বৈরাজ'** এবং সৃষ্টিকর্তা অবস্থায় তিনি **'চতুর্মুখ'**। অর্থাৎ সূক্ষ্ম অবস্থায় হিরণ্যগর্ভরূপে গর্ভোদকশায়ী শ্রীভগবানের অভ্যন্তরে লীন হয়ে থাকেন। কালক্রমে যখন প্রকৃতির গুণবিক্ষোভে তিনি স্থূল পদ্মরূপে অভিব্যক্ত হন, তখন তিনি বৈরাজ। আর ওই পদ্ম হতে স্বয়ম্ভু বেদময় ব্রহ্মার উদ্ভব। তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করায় চারিটি মুখপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর 'চতুর্মুখ' অবস্থা। এই অবস্থায় তিনি সৃষ্টি বিস্তারে ব্যাপৃত হন। কিন্তু শ্রীভগবানের অনুগ্রহদত্ত শক্তি না হলে জগতে কারোর কোনো ক্ষমতা থাকে না। ব্রহ্মা যদিও সৃষ্টিনৈপুণ্যে অনাদিকল্প হতে সম্যক্ অভ্যস্ত, তাহলেও যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বহির্মুখ চিত্তকে সংযত করে ভগবানের প্রতি নিবিষ্ট না হন, স্বাভিমান যতক্ষণ বিদুরিত না হয়, ততক্ষণ তাঁকে মোহাচ্ছন্ন থাকতে হয়। সাধন দ্বারা শ্রীভগবানের কৃপাভাজন হলে মোহ দূর হয় আর সমস্ত নৈপুণ্য আবার পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, এ সকলই ব্রহ্মার অবস্থার বর্ণনায় বোঝা যায়।

ব্রহ্মা যখন পদ্ম হতে উদ্ভূত হলেন, তখন তিনি নিজের সত্তা বা এই পদ্মের সত্তা বা এটি কীভাবে এবং কোথা থেকে সংঘটিত হয়েছে, এমনকি স্বয়ং তিনি কে, তা পর্যন্ত বুঝতে পারলেন না। ব্রহ্মা মনে মনে ভাবলেন, এটা

যখন পদ্ম, তখন অবশ্যই এঁর মূল আছে। এই মূলটি খুঁজে পেলেই পদ্মর তথ্য নিরূপিত হতে পারে আর নিজের রহস্যও কিছুটা জানা যেতে পারে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ব্রহ্মা সেই পদ্মটির নালামধ্যস্থিত সূক্ষ্ম ছিদ্র অবলম্বন করে জলের তলায় গমন করলেন কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও মূল খুঁজে পেলেন না। এইভাবে শত বৎসর কেটে গেল, ব্রহ্মা নিজের বা পদ্মের রহস্য বোঝবার কোনো সূত্র খুঁজে পেলেন না, হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। তখন তাঁর মনের মধ্যে ভগবদ্ভাব জেগে উঠল এবং তিনি পুনরায় স্বস্থানে অর্থাৎ সেই পদ্মাসনে উপবেশন করে ধীরে ধীরে প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ নিবারণপূর্বক তন্ময়চিত্তে শ্রীভগবানের ধ্যান করতে লাগলেন।

যে কোনো বিষয়ে ধ্যান করলে অর্থাৎ চিন্তা যতই ঘনীভূত হয়ে উঠবে, অন্য বিষয়ের প্রতি অন্তঃকরণের বিক্ষেপ ততই কমে আসবে। আর ধ্যানের গভীর প্রগাঢ়তা জন্মালে, তখন তো আর অন্য কোনো বিষয় অন্তঃকরণে প্রতিভাত হয়ই না, কেবল সেই ধ্যেয় পদার্থই হৃদয়ে বিরাজ করতে থাকে, ইহাই যোগের চরম অবস্থা। এইরূপ যোগসিদ্ধি বা যোগজশক্তি লাভ করলে আরাধ্য বস্তুর অপরোক্ষ অনুভূতি অর্থাৎ সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।

ব্রহ্মারও এইভাবে দৈবী শতবৎসরব্যাপী সমাধির ফলে তাঁর যোগজ দৃষ্টি ফুটে উঠল, আর তিনি কিরীট কুন্তলধারী শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, বনমালাবিভূষিত **'সহস্রশীর্ষা পুরুষ'** হৃদয় মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন।

ব্রহ্মা আরো দেখলেন, এই পুরুষের নাভিটি সরোবরের ন্যায় শোভা পাচ্ছে, তাহা হতে একটি **'পদ্ম'** প্রকাশ পাচ্ছে এবং সেই পদ্মে তিনি স্বয়ং বিরাজমান। তিনি আরো দেখলেন নিচে চতুর্দিকব্যাপী **জল**, প্রলয়কালীন **বায়ু** ও ওপরে **আকাশ**।

ব্রহ্মা বহুকাল ধ্যান করে অনন্তশয্যাশায়ী শ্রীভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎ করেছেন, কিন্তু উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় ব্যতীত সৃষ্টির উপযোগী অন্য কিছুই দেখতে পেলেন না। ব্রহ্মার রজোগুণস্বভাব, তিনি সৃষ্টির জন্য সদাই উৎসুক, তাই এই অবস্থায় তিনি ভগবানের স্তব করতে শুরু করলেন।

———o———

ব্রহ্মার স্তুতি
(তৃতীয় স্কন্ধ, নবম অধ্যায়)
(শ্লোক ১—৪৩)

ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক থেকে তেতাল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত ব্রহ্মার স্তুতির বর্ণনা আছে পাঁচটি স্তবকে এবং অবশেষে আছে ভগবানের আশীর্বাণী।

ভগবানের স্বরূপশক্তির স্তব	শ্লোক ১—৪
ভগবানের মায়াশক্তির স্তব	শ্লোক ৫—১১
ভগবানের কৃপাশক্তির স্তব	শ্লোক ১২—২১
ভগবানের নিকট ব্রহ্মার প্রার্থনা	শ্লোক ২২—২৮
ভগবানের আশীর্বাদ	শ্লোক ২৯—৪৩

ভগবানের স্বরূপশক্তির স্তব (শ্লোক ১-৪)

জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্।
নান্যত্ত্বদস্তি ভগবন্নপি তন্ন শুদ্ধং
মায়াগুণব্যতিকরাদ্ যদুরুর্বিভাসি॥ ১

রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন
শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায়।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং
যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্॥ ২

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥ ৩

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্ ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥ ৪

সরলার্থ—ব্রহ্মা বললেন—হে প্রভু ! দীর্ঘকাল তপস্যার ফলে আজ তোমাকে জানতে পারলাম। হায় ! দেহীগণের কী দুর্ভাগ্য যে ভগবানের তত্ত্ব তারা জানতে পারে না। জগতে তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই। যা কিছু জাগতিক পদার্থের প্রতীতি হয় তাও স্বরূপত সত্য নয়, কারণ মায়ার ত্রিগুণের বৈষম্যবশত তুমিই বহুরূপে প্রকাশ পেয়ে থাক॥ ১ ॥ হে দেব ! তোমার স্বীয় চৈতন্যশক্তি সর্বদাই প্রকাশিত থাকার ফলে অজ্ঞান সর্বদাই তোমার থেকে দূরে থাকে। তোমার এই যে রূপ, যার নাভিকমল থেকে আমি প্রকাশিত হয়েছি, এই রূপটি তোমার অসংখ্য অবতারের মূল কারণ। তোমার এই রূপ আমার মতো ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য তুমি প্রথমে প্রকাশ করেছ॥ ২ ॥ হে পরমাত্মন্ ! তোমার যে আনন্দময়, ভেদরহিত, অখণ্ড তেজোময় স্বরূপ সেটি তোমার এই রূপের থেকে কোনো রকমেই আমি ভিন্ন মনে করতে পারি না। সুতরাং বিশ্বসৃষ্টিকারী হয়েও যা বিশ্বাতীত তোমার সেই অদ্বিতীয় রূপের আমি শরণ গ্রহণ করছি। তোমার এই রূপই সমস্ত ভূত এবং ইন্দ্রিয়াদিরও অধিষ্ঠান॥ ৩ ॥ হে ভুবনমঙ্গল ! আমি তোমার উপাসক, আমার মঙ্গলের জন্যই আমার ধ্যানের মধ্যে তুমি তোমার এই রূপ প্রকাশ করেছ। পাপাত্মা বিষয়াসক্ত জীবই এই রূপের অনাদর করে। আমি তোমার এই রূপের পায়ে বার বার প্রণাম জানাচ্ছি॥ ৪ ॥

মূলভাব—ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্ ! 'জগতে তোমা হতে ভিন্ন যা কিছু আছে সকলই মায়িক, তাদের পারমার্থিক সত্তা নেই। তুমি একমাত্র পারমার্থ সৎ আর যদি জীবরা তোমাকেই জানতে না পারে তবে তার অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে ! হে ভগবান ! বহুকাল আরাধনার পরে তোমার এই স্বরূপ দেখতে পেয়ে আমি কৃতকৃতার্থ হলাম। তুমি মঙ্গলময়, তাই আমি তোমার যে মূর্তির নাভিপদ্ম হতে উদ্ভূত হয়েছি সেই স্বরূপটি তোমার নিত্যানন্দময়

মায়াতীত স্বরূপ থেকে ভিন্ন নয়। আমি তোমার এই স্বরূপকেই একান্ত অনুগত ভাবে নমস্কার করি।' শ্রীভগবানের নানাপ্রকার স্বরূপ পরিগ্রহ নানা কারণে ও নানাভাবে সম্ভব হয়ে থাকে। অধিক কী— সকল জীবই সোপাধিক ঈশ্বর, যেহেতু তা মায়া বা অবিদ্যাযুক্ত অবস্থার ফল। কিন্তু ব্রহ্মার ধ্যানকালে যে মূর্তি জাগরিত হয়েছে তা মায়া সম্পাদিত নয়, স্বতঃসিদ্ধ নিত্য। তিনি ভগবানের চতুর্ব্যূহের অন্যতম সংকর্ষণ। তাই ব্রহ্মা তাঁকে স্তুতিতে বলেছেন—**'তদ্বৈদম্ ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়'** অর্থাৎ তোমার স্বরূপই সেই নিত্যানন্দময় স্বরূপ।

ভগবানের মায়াশক্তির স্তব (শ্লোক ৫-১১)

যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোশগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্॥ ৫

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ ৬

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্বাশুভোপশমনাদ্‌বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ॥ ৭

ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্যমানাঃ
শীতোষ্ণবাতবর্ষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুত রুষা চ সুদুর্ভরেণ
সম্পশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে॥ ৮

যাবৎ পৃথক্‌ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।

তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত
ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা॥ ৯
অহ্ন্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুস্মৎ প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥ ১০
ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্‌ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ১১

সরলার্থ—হে প্রভু ! যারা বেদরূপ বায়ু কর্তৃক প্রবাহিত তোমার চরণকমলের গন্ধকে নিজেদের কর্ণপুটে গ্রহণ করে, তুমি সেই ভক্তগণের হৃদয়কমল থেকে কখনো অপসৃত হও না। কারণ পরাভক্তিরূপ সুতো দিয়ে তোমার পাদপদ্মকে তারা বেঁধে রাখে॥ ৫ ॥ অন্যদিকে জীবগণ যে পর্যন্ত তোমার অভয়প্রদ চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ না করে, সেই পর্যন্তই জীবের ধন, জন, গেহ ইত্যাদির নিমিত্ত ভয়, শোক, লালসা, দীনতা ও লোভাতিশয্য প্রভৃতি তাদের পীড়িত করে আবার 'আমি', 'আমার' এই ভাবনার দুরাগ্রহ যা সর্বদুঃখের মূলকারণ—তা তাদের বদ্ধ করে রাখে॥ ৬ ॥ সেইজন্য যে সকল ব্যক্তি সবরকম অমঙ্গল বিনাশক তোমার লীলাদির শ্রবণ, দর্শন ও কীর্তনাদি প্রসঙ্গ থেকে বিমুখ থাকে এবং ক্ষণিক সুখভোগের জন্য ব্যাকুল হয়ে লোভাভিভূতচিত্তে সর্বদা অমঙ্গলজনক কুকর্ম সকল করে বেড়ায়, সেই দুর্ভাগাদের বুদ্ধি দৈবই হরণ করে নিয়েছে॥ ৭ ॥ হে অচ্যুত, হে উরুক্রম ! এই সব জীব ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, কফ, শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষণ প্রভৃতির দ্বারা এবং পরস্পর একে অপর কর্তৃক ব্যথিত তথা অতিশয় তীব্র কামনানল এবং দুঃসহ ক্রোধের দ্বারা বার বার পীড়িত হচ্ছে দেখে আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে॥ ৮ ॥ হে প্রভু ! যতকাল জীব ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপী মায়ার বিভ্রমে নিজেকে তোমার থেকে পৃথক মনে করে ততকাল তার এই সংসার চক্র থেকে

নিবৃত্তি হয় না। যদিও এটা মিথ্যা তবুও কর্মের ফল ভোগের ক্ষেত্র হওয়ার দরুন তার নানাবিধ-দুঃখপ্রাপ্তি অবশ্যই হয়॥ ৯ ॥ হে দেব ! অন্যের কথা আর কী—মুনিগণ পর্যন্ত যদি তোমার কথাপ্রসঙ্গে বিমুখ থাকেন তাহলে তাঁদেরও সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় এবং সেই সংসার জীবনে দিবাকালে তাঁদের ইন্দ্রিয়সমূহ নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় নানাবিধ চিন্তাবশত ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়। প্রতিকূল দৈবের বশে তাঁদের সমস্ত উদ্যোগেই বিঘ্ন ঘটে বলে তাঁরা অশেষ ক্লেশ ভোগ করে থাকেন॥ ১০ ॥ হে নাথ ! **তোমার পথের নিশ্চিত সন্ধান কেবলমাত্র তোমার গুণকীর্তন শ্রবণেই জানতে পারা যায়**। ভক্তগণের ভক্তিযোগ দ্বারা পরিশুদ্ধ হৃদয়ে তুমি নিশ্চয়ই অবস্থান করে থাক। হে পুণ্যশ্লোক প্রভু ! তোমার ভক্তগণ যেই যেই ভাবনায় তোমার ধ্যান করে, সেই সব সাধু ভক্তদের অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য তুমি সেই সেই রূপই প্রকটিত করে থাক॥ ১১ ॥

মূলভাব—ব্রহ্মা সর্বকারণ শ্রীভগবানের স্তবপ্রসঙ্গে ভক্তিপথের উৎকর্ষ প্রতিপাদনের জন্য বলেছেন—

ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং।
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎস্বপুংসাম্॥ (ভাগবত ৩।৯।৫)

অর্থাৎ ভগবান তুমি একমাত্র ভক্তির বাধ্য, ভক্তির আকর্ষণে এতই আকৃষ্ট হও যে, ভক্তের হৃদয় হতে তুমি ক্ষণকালও বিচ্যুত হতে পারে না। পক্ষান্তরে ভক্তিহীনদের কিছুতেই উদ্ধার নেই, অশেষ সংসার ক্লেশেরও পার নাই। যত দিন জীব শ্রীভগবানের অভয়চরণে আত্মসমর্পণ না করে, 'আমি-আমার' এই বৃথা অভিমানে মত্ত থাকে, ততদিন পর্যন্ত রোগ, শোক, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ, কাম-ক্রোধাদি রিপু সকলই তাকে আক্রমণ করতে থাকবে। এর থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। তাঁকে পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে ব্রহ্মা তাই স্তুতিতে বলছেন—পরমভক্তি দ্বারা তাঁর শ্রীচরণ এমনভাবে লাভ করতে হবে যে যেন তিনি আর তাকে ছেড়ে না যান। শ্রীভগবান নিজমুখে ভগবদ্‌গীতাতেও বলেছেন—'**ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুংচ পরন্তপ**' (১১।৫৪)। অর্থাৎ 'হে অর্জুন ! একমাত্র ভক্তি দ্বারাই

সাধক এই বিশ্বরূপময় আমাকে জানতে, দেখতে ও আমার মধ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

ব্রহ্মার স্তুতিতে এইরূপে ভক্তিহীন মুনিগণের পর্যন্ত অগতি আর ভক্তিমানের উত্তম গতি বর্ণিত হয়েছে। যারা নিজ নিজ কর্তৃত্বাভিমানবশত নিজ ভোগসুখাদি কামনায় মত্ত হয়ে ভগবানের প্রতি শরণাগতিবিহীন, সেইরূপ কোনো ব্যক্তির প্রতি—এমনকি সেইভাবের কোনো দেবতার প্রতিও ভগবানের অনুগ্রহ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় না।

ভগবানের কৃপাশক্তির স্তব (শ্লোক ১২-২১)

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈ-
রারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদি বদ্ধকামৈঃ।
যৎ সর্বভূতদয়য়াসদলভ্যয়ৈকো
নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা॥ ১২

পুংসামতো বিবিধকর্মভিরধ্বরাদ্যৈ-
র্দানেন চোগ্রতপসা পরিচর্যয়া চ।
আরাধনং ভগবতস্তব সৎক্রিয়ার্থো
ধর্মোঽর্পিতঃ কর্হিচিদ্ম্রিয়তে ন যত্র॥ ১৩

শশ্বৎ স্বরূপমহসৈব নিপীতভেদ-
মোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরস্মৈ।
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলা-
রাসায় তে নম ইদং চকৃমেশ্বরায়॥ ১৪

যস্যাবতারগুণকর্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তে নৈকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥ ১৫

যো বা অহং চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ং চ
স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতব আত্মমূলম্।

ভিত্ত্বা ত্রিপাদ্ ববৃদ্ধ এক উরুপ্ররোহ-

স্তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনদ্রুমায়॥ ১৬

লোকো বিকর্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ

কর্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চনে স্বে।

যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং

সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ॥ ১৭

যস্মাদ্ বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্ধধিষ্ণ্য-

মধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ।

তেপে তপো বহুসবোঽবরুরুৎসমান-

স্তস্মৈ নমো ভগবতেঽখিমখায় তুভ্যম্॥ ১৮

তির্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনি-

ষ্বাত্মেচ্ছয়াত্মকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ।

রেমে নিরস্তরতিরপ্যববরুদ্ধদেহ-

স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়॥ ১৯

যোঽবিদ্যয়ানুপহতোঽপি দশার্ধবৃত্ত্যা

নিদ্রামুবাহ জঠরীকৃতলোকযাত্রঃ।

অন্তর্জলেঽহিকশিপুস্পর্শানুকূলাং

ভীমোর্মিমালিনি জনস্য সুখং বিবৃণ্বন্॥ ২০

যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাসমীড্য

লোকত্রয়োপকরণো যদনুগ্রহেণ।

তস্মৈ নমস্ত উদরস্থভবায় যোগ-

নিদ্রাবসানবিকসন্নলিনেক্ষণায়॥ ২১

সরলার্থ—হে ভগবন্ ! তুমি একম্ অদ্বিতীয়ম্ এবং সমস্ত প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থিত তাদের পরম হিতকারী অন্তরাত্মা। সর্বভূতে দয়া করলে তুমি যে রকম অতিপ্রসন্ন হও, হৃদয়ে কামনাপোষণকারী দেবতাগণকর্তৃক নানাবিধ উপচারের দ্বারা পূজিত হয়েও তুমি সে রকম প্রসন্ন হও না। কিন্তু সেই সর্বভূতে দয়া অসৎ পুরুষদের পক্ষে অত্যন্তই দুর্লভ॥ ১২ ॥ যে সব কর্মের ফল

তোমাকে অর্পণ করা হয়, সেগুলি অবিনাশী—অক্ষয় হয়ে যায়। সুতরাং নানাবিধ কর্ম—যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রতচর্যাদি দ্বারা তোমার প্রসন্নতা লাভ করাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মফল, কারণ তুমি তুষ্ট হলে আর এমন কোন্ ফল আছে যা দুর্লভ ! ॥ ১৩ ॥ তুমি তোমার স্বরূপ প্রকাশের দ্বারাই জীবের ভেদ ভ্রমরূপ অন্ধকার নাশ করে থাক, তুমিই জ্ঞানের অধিষ্ঠান সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ; আমি তোমাকে প্রণাম করছি। বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত যে মায়ার লীলা হয়, সে সবই তোমার খেলা ; তাই তোমাকে বারংবার প্রণাম॥ ১৪ ॥ যে সব মানুষ প্রাণত্যাগকালে বিবশ (অসাড়) হয়েও তোমার অবতার, গুণ ও কর্মের পরিচায়ক তোমার দেবকীনন্দন, জনার্দন, কংসনিকন্দন প্রভৃতি নামসমূহ কেবলমাত্র উচ্চারণও করে তারা বহু-জন্মার্জিত পাপ থেকে সদ্যমুক্ত হয়ে মায়াদি আবরণরহিত নিত্যমুক্ত-সচ্চিদানন্দময় ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই ভগবান, আমি সেই তোমার শরণাপন্ন হলাম॥ ১৫ ॥ হে ভগবান ! এই বিশ্ববৃক্ষরূপে তুমিই বিরাজমান। তুমিই তোমার মূলা-প্রকৃতিকে আশ্রয় করে সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের জন্য, রজোগুণযুক্ত আমি ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণযুক্ত স্বয়ং বিষ্ণু ও তমোগুণযুক্ত মহেশ্বরের রূপ গ্রহণ করে তিনটি প্রধান বৃক্ষশাখায় বিভক্ত হয়েছ এবং পরে আবার প্রজাপতি এবং মনু ইত্যাদি শাখা-প্রশাখারূপে অভিব্যক্ত হয়ে নিজেকে বিবিধভাবে বিস্তার করেছ। আমি তোমাকে প্রণাম করছি॥ ১৬ ॥ হে ভগবান ! তুমি নিজেই তোমার আরাধনাদির লোক-কল্যাণকারী স্বধর্মের উপদেশ প্রদান করেছ, কিন্তু যারা এদিকে উদাসীন হয়ে সর্বদা বিপরীত (নিষিদ্ধ) কর্মে লিপ্ত থাকে, সেই সকল প্রমাদগ্রস্ত জীবের জীবনের আশাকে অতিশীঘ্র ছেদনকারী অমিত মহাবলশালী কালও তোমারই রূপ ; আমি সেই রূপে তোমাকে প্রণাম করি॥ ১৭ ॥ যদিও দ্বিপরার্ধকাল স্থায়ী ও সর্বলোক-বন্দনীয় সত্যলোকে আমি অবস্থান করি, তবুও সেই কাল রূপকে আমিও ভয় পাই। তার থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যই আমি বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানসহ দীর্ঘকাল তপস্যা করেছি। তুমিই অধিযজ্ঞরূপে আমার এই তপস্যার সাক্ষী, তোমাকে আমার প্রণাম॥ ১৮ ॥ তুমি পূর্ণকাম, তোমার কোনো বিষয়সুখের আকাঙ্ক্ষাও নেই, তবুও তুমি তোমার নিজসৃষ্ট ধর্মমর্যাদা

রক্ষার উদ্দেশ্যে পশু-পক্ষী, মনুষ্য ও দেবতা ইত্যাদি জীবযোনিতে স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করে বিবিধ লীলানুষ্ঠান করে থাক ; সেই পুরুষোত্তম ভগবান— তোমাকে আমার প্রণাম॥ ১৯ ॥ হে প্রভু ! তুমি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ বৃত্তির কোনোটার দ্বারাই অভিভূত নও, তবুও তুমি সমস্ত বিশ্বসংসার তোমার উদরে লীন করে ভয়ংকর তরঙ্গসংকুল বিক্ষুব্ধ প্রলয়জলধির মধ্যে অনন্তবিগ্রহের কোমল শয্যার ওপরে শায়িত রয়েছ, এ সবই কেবল পূর্বকল্পের কর্মপরম্পরায় ক্লান্ত জীবকে বিশ্রাম-সুখ প্রদানের নিমিত্ত॥ ২০ ॥ তোমার নাভিকমলরূপ ভবন থেকে আমি উদ্ভূত হয়েছি। এই সমগ্র বিশ্ব তোমার উদরে বিলীন হয়ে অবস্থিত রয়েছে। তোমার কৃপাতেই আমি ত্রিলোকসৃষ্টিরূপ মঙ্গলকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি। এখন যোগনিদ্রা অবসানের ফলে তোমার নেত্রকমল উন্মীলিত হচ্ছে, তোমাকে আমার প্রণাম॥ ২১

মূলভাব—ভক্তি শব্দের অর্থ ভজনা করা আর ভক্তের স্বভাবই হল **শ্রীভগবানের তৃপ্তি সাধনা**। ভক্তের লক্ষ্যই হল—**'ময়া যদেতৎ কর্মকৃতং তৎ সর্বং ভগবদচ্চরণে সমার্পিততমস্তু'** অর্থাৎ আমি যা কিছু করলাম সকলই ভগবানের চরণে সমর্পণ করলাম, ইহার দোষ-গুণ ফলাফল আমি কিছুই জানি না, কিছুই প্রার্থনা করি না, তাঁর উদ্দেশে করলাম, সব তিনিই বুঝবেন। এইরূপ ভাবের নিষ্কাম নির্ভররূপ দৃঢ় ভক্তিভাব, আন্তরিকভাব প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তাঁর কর্মানুষ্ঠান সার্থক হয়। তখন এই ভাবে সে যাই করুক না কেন, তাতেই শ্রীভগবানের তৃপ্তি সাধিত হয়।

শ্রীভগবান মদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও বলেছেন—

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বানো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌॥ (গীতা ১৮।৫৬)

অর্থাৎ আমার প্রতি নির্ভর করে কোনো কার্য করলে আমার অনুগ্রহে তাতেই নিত্য অব্যয় পদ প্রাপ্ত হবে।

অতএব যাগ-যজ্ঞ, তপস্যা, দান প্রভৃতি যে কোনো কর্মই তাঁর প্রতি ভক্তি সহকারে করা হোক না কেন, শ্রীভগবানের তৃপ্তি সাধনই যেন সকল কর্মের ফল হয়—**'তস্মিন্‌ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট'** অর্থাৎ তাঁর তৃপ্তিতেই জগৎ তৃপ্ত হয়ে থাকে।

ব্রহ্মা শ্রীভগবানের সৃষ্টিময়ীরূপ, কালরূপ ও প্রলয় রূপের স্তুতি করেছেন। আবার তাঁর স্বরূপশক্তি, নাম, মাহাত্ম্য ও গুণাবতার প্রভৃতিরও স্তুতি করেছেন। অনন্তশক্তি সম্পন্ন শ্রীভগবান প্রয়োজনভেদে তাঁর এইরূপ পৃথক পৃথক শক্তি প্রকটন করে পৃথক পৃথক কার্য সাধন করে থাকেন।

জ্ঞানমার্গী — জ্ঞানমার্গী সাধকগণ শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তি দ্বারাই আকর্ষিত হন কেননা, তাঁর স্বরূপশক্তির প্রভাবে লোকের অবিদ্যা বা ভেদবুদ্ধি দূর হয়। জ্ঞানরূপী যোগিগণ তাঁর এই চৈতন্যময় স্বরূপকেই উপাস্যরূপে ধ্যান ধারণা করে সকল প্রকার মোহ অতিক্রম করে **'সোঽহংরূপে'** জীব—ব্রহ্মের ঐক্যরূপ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

ভক্তিমার্গী—ভক্তিপথাবলম্বী সাধকগণ শুধু তাঁর স্বরূপশক্তি কেন— তাঁর যে কোনো শক্তিময় অবস্থা বা তাঁর নাম, রূপ, লীলা, রহস্য প্রভৃতি তদীয় যে কোনও বস্তুতেই অনুরক্ত হয়ে সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করে কৃতার্থতা লাভ করেন। ব্রহ্মা এখানে স্তুতি দ্বারা ভগবানের নামের মহিমা বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানী বা অজ্ঞানী ভক্ত বা অভক্ত, যে কেহ যে কোনো অবস্থায় তাঁহার নাম শ্রবণ বা কীর্তন করলে, নামের গুণে তার জন্মজন্মান্তরীয় সকল পাপ দূর হয়ে যায় ও ভক্তির ভাব ফুটে ওঠে। শ্রীভগবানের বিশ্বরূপত্ব বর্ণনা করে ব্রহ্মা বলছেন **'তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনদ্রুমায়'** (ভাগবত ৩।৯।১৬)—অর্থাৎ একটি মাত্র বীজ যেমন মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি সহকারী শক্তিসংযোগে অঙ্কুররূপে আত্মপ্রকাশ করে স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখাদিরূপে বহুলবিস্তার প্রাপ্ত হয়ে থাকে তেমনি একমাত্র শ্রীভগবান তাঁর নিজশক্তি, রূপ প্রভৃতি সহযোগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি তিন স্কন্ধ, মরীচি, মনু প্রভৃতি বহুল শাখা-প্রশাখা বিস্তারপূর্বক এই বিপুল বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন।

ভগবানের অপার কৃপাশক্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা স্তুতিতে বলছেন —ভগবান তুমি অনন্তশক্তিসম্পন্ন কোনও সুখ থেকে বঞ্চিত নও, নিত্যানন্দ স্বরূপ হওয়ায় নিত্য পূর্ণ আনন্দ অনুভব করে থাক, তোমার কোনো অতৃপ্ত ভোগবাসনা থাকতে পারে না তা সত্ত্বেও তুমি দেব, মনুষ্য এমনকি পশ্বাদি তির্যক যোনিতেও প্রকাশমান। এটা শুধুমাত্র তোমার ভক্তের প্রতি অসীম করুণা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু নয়।

ব্রহ্মার ভগবানের নিকট প্রার্থনা (শ্লোক ২২-২৮)

সোঽয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা
সত্ত্বেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন।
তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদ্ যথাহং
স্রক্ষ্যামি পূর্ববদিদং প্রণতপ্রিয়োঽসৌ॥ ২২

এষ প্রপন্নবরদো রময়াঽত্মশক্ত্যা
যদ্‌যৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো
যুঞ্জীত কর্মশমলং চ যথা বিজহ্যাম্॥ ২৩

নাভিহ্রদাদিহ সতোঽম্ভসি যস্য পুংসো
বিজ্ঞানশক্তিরহমাসমনন্তশক্তেঃ।
রূপং বিচিত্রমিদমস্য বিবৃণ্বতো মে
মা রীরিষীষ্ট নিগমস্য গিরাং বিসর্গঃ॥ ২৪

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥ ২৫

স্বসম্ভবং নিশাম্যৈবং তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
যাবন্মনোবচঃ স্তুত্বা বিররাম স খিন্নবৎ॥ ২৬
অথাভিপ্রেতমন্বীক্ষ্য ব্রহ্মণো মধুসূদনঃ।
বিষণ্ণচেতসং তেন কল্পব্যতিকরাম্ভসা॥ ২৭
লোকসংস্থানবিজ্ঞান আত্মনঃ পরিখিদ্যতঃ।
তমাহাগাধয়া বাচা কশ্মলং শময়ন্নিব॥ ২৮

সরলার্থ— তুমি সর্বলোকের একমাত্র সুহৃৎ ও আত্মা তথা শরণাগত-বৎসল। যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য দিয়ে তুমি বিশ্বকে আনন্দিত কর, তার সাথে আমার

প্রজ্ঞাকে যুক্ত করে দাও—যাতে পূর্ব পূর্ব কল্পের মতো আবার বিশ্ব সৃষ্টি করতে সমর্থ হই॥ ২২ ॥ তুমি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। স্বীয় শক্তি লক্ষ্মীদেবীর সাথে অনেক গুণময় অবতারসহ যে সব বিচিত্র লীলার বিস্তার তুমি করবে আমার এই বিশ্বরচনা সেসবেরই অন্যতম। সুতরাং এই রচনার সময় তুমি আমার চিত্তে সেই কর্মশক্তি ও প্রেরণা দাও যাতে সৃষ্টিরচনার ব্যাপারে আমি অহংকাররূপ দোষ থেকে দূরে থাকতে পারি (অর্থাৎ সৃষ্টি রচনার অহংকার যেন আমাকে পেয়ে না বসে)॥ ২৩ ॥ হে প্রভু! কারণসলিলে শায়িত অনন্তশক্তি পরমপুরুষ ভগবান তোমার নাভিপদ্ম থেকে আমি সমুৎপন্ন হয়েছি এবং আমি তোমারই বিজ্ঞানশক্তি ; সুতরাং এই সংসারের বিচিত্র রূপ বিস্তারের সময় তোমার অনুগ্রহে বেদবাক্যসমূহের উচ্চারণশক্তি আমার যেন লোপ না পায়॥ ২৪ ॥ তুমি অপার করুণাময় পুরাণপুরুষ। গভীর প্রেমযুক্ত হাস্যের সঙ্গে তুমি তোমার নয়নকমলদুটি কৃপা করে উন্মীলিত করো এবং শেষশয্যার থেকে গাত্রোত্থান করে বিশ্বের উদ্ভবের জন্য তোমার সুমধুর বাক্যের দ্বারা আমার বিষাদ দূর করো॥ ২৫ ॥ মৈত্রেয় মুনি বললেন—হে বিদুর! এই রকম তপস্যা, উপাসনা ও সমাধির দ্বারা নিজের উৎপত্তির হেতু-ভূত শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ করে এবং মন ও বাক্যের সামর্থ্যানুযায়ী তাঁর স্তব করে ব্রহ্মা যেন কিঞ্চিৎ অবসন্ন হয়েই নিবৃত্ত হলেন॥ ২৬ ॥ শ্রীমধুসূদনভগবান দেখলেন যে ওই প্রলয়জলরাশি দেখে ব্রহ্মা খুব চিন্তিত হয়েছেন এবং বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে কোনো স্থিরনিশ্চয় না হওয়াতে খুব বিষণ্ণ অবস্থায় রয়েছেন, তাই তিনি তাঁর মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পেরে গম্ভীর বাক্যে তাঁর মোহ নিবারণ করে বলতে লাগলেন॥ ২৭-২৮

মূলভাব—সৃষ্টির প্রারম্ভে, কালের প্রভাবে **'স পদ্মকোষঃ সহসোদতিষ্ঠৎ'** (ভা. ৩।৮।১৪) শ্রীভগবানের নাভি হতে অর্থাৎ পদ্মমুকুলাকার ব্রহ্মা উদিত হলেন।

মৈত্রেয় মুনি বলছেন **'তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা স্বয়ম্ভুবং'** (ভাগবত ৩।৮।১৫) অর্থাৎ ব্রহ্মা স্বতঃসিদ্ধ বেদসম্পন্ন ও স্বয়ম্ভু। তবুও তিনি তাঁর সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে জানতে না পেরে ভগবৎ ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে শত বৎসরব্যাপী

সমাধিতে প্রবিষ্ট হলেন তখন তার যোগজ দৃষ্টি ফুটে উঠল — '**স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েহবভাতমপশ্যাতাপশ্যাতে**' (ভাগবত ৩।৮।২২) অর্থাৎ তখন তিনি নিজের হৃদয় মধ্যেই সমস্ত কিছু এবং **স্বয়ংকে** সুপ্রকাশিতরূপে দেখতে পেলেন।

এইভাবে জীবসৃষ্টিন্মুখ ব্রহ্মা হৃদয়মধ্যে আত্মসাক্ষাৎকার ও সম্মুখে শ্রীভগবানের দেবদুর্লভ, কৌস্তুভশোভিত, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বনমালাবিভূষিত, অনন্তশয্যায় শায়িত শ্রীহরির 'সহস্রশীর্ষ পুরুষ' রূপ দর্শন করলেন। কিন্তু জল, বায়ু ও আকাশ এই ভূতত্রয় ছাড়া সৃষ্টির আর কোনো প্রকরণই তাঁর দৃষ্টিগোচর হল না। তখন ব্যাকুল ব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তবে প্রবৃত্ত হলেন। ব্রহ্মা তাঁর স্তুতিতে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি, কালশক্তি ও অপার কৃপাশক্তির বর্ণনা করে শেষে বলছেন—

তস্মৈ নমস্ত উদরস্তভবায় যোগনিদ্রাবসানবিকসন্নলিনেক্ষণায়।

(ভাগবত ৩।৯।২১)

হে প্রভু ! তুমি সমস্ত লোক আত্মসাৎ করে যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলে, সম্প্রতি ওই নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তুমি তোমার পদ্মতুল্য নয়ন উন্মীলিত করছ। হে প্রভু ! তোমায় নমস্কার করি।

স্তবের অন্তে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করছেন—হে সর্বান্তর্যামী বিশ্ববন্ধু শ্রীভগবান ! যে সকল জ্ঞান ও ঐশ্বর্য বলে তুমি বিশ্বের শান্তিসাধন করে থাক, সেই সকল জ্ঞান-ঐশ্বর্যাদি আমাতে যোজন করো। সৃষ্টি করতে হলে আমায় ভাল-মন্দ সকলই সৃষ্টি করতে হবে, তন্মধ্যে মন্দ সৃষ্টির অপরাধে আমি যেন অপরাধী না হই। আমার মুখ হতে বেদ উচ্চারিত হয়, সুতরাং তার গৌরব যেন একেবারে লুপ্ত না হয়ে যায়।

উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎপুরুষঃ পুরাণঃ॥ (ভাগবত ৩।৯।২৫)

হে প্রভু অনন্তশয্যা থেকে গাত্রোত্থান করে তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করো ও সুমধুর উপদেশবাক্য প্রয়োগ করে আমায় কৃতকৃতার্থ করো।

ভগবানের আশীর্বাদ (শ্লোক ২৯-৪৩)

মা বেদগর্ভ গাস্তন্দ্রীং সর্গ উদ্যমমাবহ।
তন্ময়াহপাদিতং হ্যগ্রে যন্মাং প্রার্থয়তে ভবান্॥ ২৯
ভূয়স্ত্বং তপ আতিষ্ঠ বিদ্যাং চৈব মদাশ্রয়াম্।
তাভ্যামন্তর্হৃদি ব্রহ্মন্ লোকান্ দ্রক্ষ্যস্যপাবৃতান্॥ ৩০
তত আত্মনি লোকে চ ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ।
দ্রষ্টাসি মাং ততং ব্রহ্মন্ময়ি লোকাংস্ত্বমাত্মনঃ॥ ৩১
যদা তু সর্বভূতেষু দারুষ্বগ্নিমিব স্থিতম্।
প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহ্যাত্তর্হ্যেব কশ্মলম্॥ ৩২
যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ।
স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি॥ ৩৩
নানাকর্মবিতানেন প্রজা বহ্বীঃ সিসৃক্ষতঃ।
নাত্মাবসীদত্যস্মিংস্তে বর্ষীয়ান্মদনুগ্রহঃ॥ ৩৪
ঋষিমাদ্যং ন বধ্নাতি পাপীয়াংস্ত্বাং রজোগুণঃ।
যন্মনো ময়ি নির্বদ্ধং প্রজাঃ সংসৃজতোহপি তে॥ ৩৫
জ্ঞাতোহহং ভবতা ত্বদ্য দুর্বিজ্ঞেয়োহপি দেহিনাম্।
যন্মাং ত্বং মন্যসেহযুক্তং ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মভিঃ॥ ৩৬
তুভ্যং মদ্‌বিচিকিৎসায়ামাত্মা মে দর্শিতোহবহিঃ।
নালেন সলিলে মূলং পুষ্করস্য বিচিন্বতঃ॥ ৩৭
যচ্চকর্থাঙ্গ মৎস্তোত্রং মৎকথাভ্যুদয়াঙ্কিতম্।
যদ্বা তপসি তে নিষ্ঠা স এষ মদনুগ্রহঃ॥ ৩৮
প্রীতোহহমস্তু ভদ্রং তে লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া।
যদস্তৌষীর্গুণময়ং নির্গুণং মানুবর্ণয়ন্॥ ৩৯
য এতেন পুমান্নিত্যং স্তুত্বা স্তোত্রেণ মাং ভজেৎ।
তস্যাশু সম্প্রসীদেয়ং সর্বকামবরেশ্বরঃ॥ ৪০

পূর্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃসমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্॥ ৪১
অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্যাদ্দেহাদের্যৎকৃতে প্রিয়ঃ॥ ৪২
সর্ববেদময়েনেদমাত্মনাত্মাত্মযোনিনা।
প্রজাঃ সৃজ যথাপূর্বং যাশ্চ ময্যনুশেরতে॥ ৪৩

সরলার্থ—শ্রীভগবান বললেন—হে বেদগর্ভ ! তুমি বিষাদগ্রস্ত হয়ে আলস্যের বশীভূত হয়ো না, সৃষ্টিরচনার ব্যাপারে তৎপর হও। তুমি আমার কাছে যে সকল জ্ঞান ঐশ্বর্যাদি প্রার্থনা করেছ সে সব আমি আগেই পূরণ করে রেখেছি॥ ২৯ ॥ তুমি আবার একবার তপস্যা ও আমার মন্ত্রোপাসনাদির অনুষ্ঠান করো। সেই তপস্যা ও উপাসনা দ্বারা তুমি নিজের হৃদয়মধ্যে সকল লোককে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত দেখতে পাবে॥ ৩০ ॥ তারপর ভক্তিযুক্ত ও সমাহিতচিত্ত হয়ে সমগ্র লোকে এবং তোমার নিজের মধ্যে আমাকে পরিব্যাপ্ত দেখতে পাবে এবং আমার মধ্যে সমগ্র লোক ও নিজেকেও দেখতে পাবে॥ ৩১ ॥ কাঠের মধ্যে যেমন অগ্নি আছে সেইরকমই প্রত্যেক জীবের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে আমি আছি। জীব যখন এইভাবে আমাকে উপলব্ধি করতে পারে সে তখন অজ্ঞানরূপ মল থেকে মুক্ত হয়ে যায়॥ ৩২ ॥ জীব যখন নিজেকে ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও অন্তঃকরণ বিরহিত বলে বুঝতে পারে এবং স্বরূপত আমার থেকে অভিন্ন অনুভব করে তখনই সে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়॥ ৩৩ ॥ হে ব্রহ্মা ! বহুবিধ কর্ম সংস্কার অনুসারে নানাবিধ জীব সৃষ্টি করতে তুমি অভিলাষ করেছ কিন্তু এতে তোমার চিত্ত মোহিত হচ্ছে না। এর কারণ তোমার প্রতি আমার অতিশয় অনুরাগ॥ ৩৪ ॥ তুমি সর্বপ্রথম আদি মন্ত্রদ্রষ্টা, প্রজাসৃষ্টিকালেও তোমার মন আমাতেই নিবদ্ধ থাকে, ফলে চিত্ত-বিক্ষোভকারী পাপময় রজোগুণ তোমাকে অভিভূত করতে পারে না॥ ৩৫ ॥ তুমি আমাকে তোমার পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয়, ত্রিগুণ গুণ এবং অন্তঃকরণের

ঊর্ধ্বে বলে বুঝেছ ; এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে যদিও দেহধারী জীবের কাছে আমি দুর্জ্ঞেয়, তবুও তুমি আমাকে জ্ঞাত হয়েছ॥ ৩৬ ॥ 'আমার মূল কোথাও আছে কি না' এই সন্দেহের বশে তুমি যখন পদ্মনালের ভেতর দিয়ে জলের মধ্যে তার মূল খুঁজছিলে, তখন আমিই আমার এই স্বরূপ তোমার হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশ করেছিলাম॥ ৩৭ ॥ হে প্রিয় ব্রহ্মা ! তুমি আমার মহিমাদ্যোতক মঙ্গলময় কথা দ্বারা আমার যে স্তব করেছ এবং তপস্যায় তোমার এই যে একাগ্রতা, এ সবই আমার অনুগ্রহের ফল॥ ৩৮ ॥ লোকসৃষ্টির ইচ্ছায় তুমি আমার যে স্তব করেছ সগুণরূপে প্রতীত হলেও তুমি সেই স্তবে নির্গুণরূপে আমাকে বর্ণনা করেছ। এর জন্য আমি অতীব প্রীত হয়েছি ; তোমার কল্যাণ হোক॥ ৩৯ ॥ আমি সকলের কামনা ও মনোরথ পূর্ণ করতে সমর্থ। যে পুরুষ তোমা কর্তৃক কীর্তিত এই স্তোত্রের দ্বারা প্রতিদিন আমার স্তুতি করবে, তার প্রতি আমি অচিরেই প্রসন্ন হব॥ ৪০ ॥ বাপী, কূপ ও তড়াগাদি খননরূপ পূর্তকর্ম, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা মানুষ যে পরমকল্যাণ লাভ করে, আমার প্রীতিই সেই পরমার্থফল, তত্ত্ববেত্তাগণের এই অভিমত॥ ৪১ ॥ হে বিধাতা ! আমি আত্মাসমূহেরও আত্মা অর্থাৎ নিরুপাধিক পরমাত্মস্বরূপ তথা সমস্ত সোপাধিক জীবগণের আত্মস্বরূপ এবং স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয়জনেরও আমিই প্রিয়তম। দেহাদিও আমার জন্যই প্রিয় রূপে জ্ঞান হয়। সুতরাং আমাতেই জীবের অনুরাগ করা কর্তব্য॥ ৪২ ॥ হে ব্রহ্মা ! এই ত্রিলোক তথা যে সকল প্রজা আমাতে বিলীন রয়েছে, তাদের পূর্বকল্পের সংস্কার অনুসারে আমার থেকে উৎপন্ন করে নিজ সর্ববেদময় স্বরূপে স্বয়ংই সৃষ্টি করো॥ ৪৩

মূলভাব—শ্রীভগবান বললেন—হে ব্রহ্মন্ ! তুমি হতাশ হয়ো না, উৎসাহ সহকারে কর্মে ব্রতী হও, সৃষ্টির জন্য জ্ঞান, ঐশ্বর্য আদি মদীয় সকল শক্তি তোমাতেই সঞ্চারিত হয়েছে। তুমি আবার একাগ্রচিত্ত হও, তাহলে নিজ হৃদয় মধ্যেই সৃষ্টির ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ লক্ষ করবে। আর তুমি আরো দেখবে

যে, আমি সর্বব্যাপীরূপে অবস্থান করি এবং সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাতে অবস্থান করে। আমার সঙ্গে বিশ্বজগতের যে এইরূপ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত সম্বন্ধ তা জানতে পারলে আর কোনো মোহ্ অবশেষ থাকবে না।

ভগবান বলছেন—

দ্রষ্টাসি মাং ততং ব্রহ্মন্ ময়ি লোকাংস্তমাত্মনঃ। (ভাগবত ৩।৯।৩১)

ভগবান ব্রহ্মাকে আরো বলছেন যে কারোর মধ্যে এই ভাব অনুভব হলে তখন নিজের মধ্যেই বিশ্বের আদর্শ নিয়ে আমাকে প্রত্যক্ষ করবে। এইরূপে অন্তর্দৃষ্টিতে আদর্শের সন্ধান পেলেই তখন সৃষ্টির জন্য আর কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে না। সৃষ্টিক্রিয়া রজোগুণের কার্য এবং ব্রহ্মা যদিও সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত তবুও তাঁর অন্তঃকরণ সর্বদা ভগবানে অর্পিত অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান বর্জিত এবং ভগবানে নির্ভরশীল, তাই রজোগুণ কখনো তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে না।

শ্রীভগবানের অনুগ্রহদত্ত শক্তি না পেলে জগতে কারোর কোনো ক্ষমতাই থাকে না। ব্রহ্মা যদিও সৃষ্টি নৈপুণ্যে অনাদিকল্প হতেই সম্যক্ অভ্যস্ত, তথাপি যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বহির্মুখ চিত্তকে সংযত করে শ্রীভগবানের প্রতি নিবিষ্ট না হন, স্বাভিমান যতক্ষণ বিদূরিত না হয়, ততক্ষণ তাঁকেও মোহাচ্ছন্ন থাকতে হয়। তাই সৃষ্টির প্রারম্ভেও ব্রহ্মার তম-রজ-সত্ত্বাদির মোহ উৎপাদন হয়েছিল। ভাগবত বলছেন—**'নাত্মানমঙ্গবা-বিদদাদিদেবঃ'** (ভাগবত ৩।৮।১৭)—অর্থাৎ ঊর্ধ্বে উত্থিত ওই পদ্মে নিজেকে অবস্থিত দেখে তিনি পদ্মের বা নিজের তথ্য কিছুই বুঝতে পারলেন না। এই প্রকার মোহ তমোগুণের কার্য। পদ্ম হতে উদ্ভূত ব্রহ্মার এই প্রকার মোহ উপস্থিত হলেও ব্রহ্মা ভগবানের স্তুতিতে প্রবিষ্ট হলে অতি অল্পকাল মধ্যেই ব্রহ্মার নিজ জ্ঞানবলে তাহা অপসারিত হয়। তখন রজোগুণের আধিক্যে ব্রহ্মা বলছেন—

'তেনৈব মে দৃহমনুস্পৃশতাদ্ যথাহং স্রক্ষ্যামি পূর্ববদিদং প্রণত-প্রিয়োঽসৌ।।' (ভাগবত ৩।৯।২২)

হে ভগবন্! আমায় সেই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য যোজনা করো যাতে আমি পূর্ব পূর্ব

কল্পের ন্যায় আবার বিশ্বসৃষ্টি করতে সক্ষম হই। তুমি প্রণতের প্রতি কৃপাশীল তাই আমি প্রণত হয়ে তোমার কৃপা প্রার্থনা করি।

আবার সত্ত্বগুণের আধিক্যে ব্রহ্মা বলছেন—**'চেতো যুঞ্জীত কর্মশমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্'** (ভাগবত ৩।৯।২৩) অর্থাৎ হে ভগবন্, আমার চিত্তকে কর্মশক্তিযুক্ত করো এবং অনুগ্রহ করো যাতে আমাকে কর্মজনিত পাপাদি বন্ধন ভোগ করতে না হয়।

শ্রীভগবান প্রার্থনা পূরণ করে বলছেন **'যন্মনো ময়ি নির্বদ্ধং প্রজাঃ সংসৃজতোঽপি তে'** (ভাগবত ৩।৯।৩৫)। রজোগুণ তোমাকে পাপবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না, কেননা তোমার নির্ভরশীলতায় আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি, সুতরাং আমারই অনুগ্রহে তুমি ওই বন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

ভগবান আরো বলছেন, হে ব্রহ্মা ! তুমি আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছ কিন্তু আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তোমার প্রতি সে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছি। তুমি যখন অগাধ জলরাশির মধ্যে তোমার জন্মক্ষেত্র পদ্মটির মূল অনুসন্ধান করে বিফল মনোরথ হয়ে সমাধিস্থ হয়েছিলে তখন তোমার হৃদয়মধ্যে আমার যে দিব্যমূর্তি উদ্ভাষিত হয়েছিল এবং তুমি যে আমার লীলা মহিমাদি অপূর্ব মঙ্গলময় স্তব দ্বারা বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছ, এ সকলই আমারই অনুগ্রহে। যারা সাধনভজন উপেক্ষা করে উচ্ছৃঙ্খল কর্মের ফলে আমার অনুগ্রহে বঞ্চিত থাকে, তাদের পক্ষে আমার মূর্তিদর্শন তো দূরের কথা, আমার নামলীলাদি, মহিমা-কীর্তন, শ্রবণ বা স্তব করা কিংবা আমার উদ্দেশে স্তব করা, এ সকলই দুর্ঘট।

ভগবান আরো বলছেন, তিনি সাধারণের ন্যায় ত্রিগুণের আয়ত্ত নন কারণ আলোক সামান্য অনন্তগুণ তাঁতে বিদ্যমান আর সেই গুণেরই বর্ণনা ব্রহ্মা করেছেন, তাই ভগবান তাঁর প্রতি অতিশয় প্রীত। যে কোনও সাধক শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ অনুশীলনে রত হলে তিনি তাঁরই হয়ে থাকেন। তাই ভগবান বলছেন—**'স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি'**

(ভাগবত ৩।৯।৩৩) অর্থাৎ আমার সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখলে তাঁর মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

আবার ভক্তিপথের পথিক সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর— যে স্তরের ভক্তই হোক না কেন, ভক্তির মহিমায় চিত্তবৃত্তি সেই উপাস্যের প্রতি তন্ময় হয়ে উঠলে তখন আর তার অন্তঃকরণ ভৌতিক জগতের কোনো বস্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকে না। সমস্ত বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্যুত হয়ে সেটি একমাত্র ইষ্টদেবের সেবায় নিযুক্ত হয়। এইরূপ ভজনের ফলে বাঞ্ছিতরূপে শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে জীব পরমানন্দ লাভ করে।

যে কোনো উপায়ে শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদনই জীবের পরম পুরুষার্থ —**কেনোপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ**। দান, তপস্যা, যজ্ঞ, যোগ, সমাধি—এ সকলই করতে হবে ভগবৎ প্রীত্যার্থে আর এই নশ্বর মায়িক বস্তুর মধ্য দিয়ে সেই সচ্চিদানন্দ মায়াতীত শ্রীভগবানের প্রীতিসাধনই হল চরম লক্ষ। তাই ভগবান বলছেন—**'রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতি-স্তত্ত্ববিদন্মতম্'** (ভাগবত ৩।৯।৪১) অর্থাৎ আমার প্রীতিসাধনই তত্ত্বজ্ঞদিগের মতে নিঃশ্রেয়স। সুতরাং ব্রহ্মা যখন সেই শ্রীভগবানের পরমপ্রীতি সম্পাদন করেছেন, তখন আর তাঁর কীসের অভাব ? তাই ভগবান উপসংহারে বলছেন—**'প্রজাঃ সৃজ যথাপূর্বং যাশ্চ ময্যনুশেরতে'**। (ভাগবত ৩।৯।৪৩) অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্ ! তুমি স্বয়ংই বিশ্বসৃষ্টি কর, অন্য কিছুর জন্যই তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। বিশ্বজগতের অধিপতি ভগবান পদ্মনাভ, সৃষ্টিকারী ব্রহ্মার নিকট এইভাবে জগৎ প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়ে তাঁর নারায়ণ স্বরূপে অন্তর্হিত হলেন।

———o———

চতুঃসনের আখ্যান ও স্তুতি—তৃতীয় স্কন্ধ

(৩য় স্কন্ধ, ১৫-১৬ অধ্যায় শ্লোক ১৬-২৬)

প্রাক্‌কথন

সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারজন জগৎ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মার মন হতে উৎপন্ন হয়েও বাল্যাকালাবধি বৈরাগ্যবশত সংসারধর্ম গ্রহণ না করে পরম ভক্তিভাবিত চিত্তে নানা স্থানে পর্যটন করতে লাগলেন। একবার চতুঃসন বৈকুণ্ঠে গমন করেন। সেখানে বৈকুণ্ঠের অনুপম সৌন্দর্য এবং অতুলনীয় শোভা ও মহিমা দর্শন করতে করতে তাঁরা ভগবৎ নিবাসে উপস্থিত হলেন। সনকাদি ঋষিগণ পরপর ছয়টি কক্ষ অতিক্রম করে সপ্তম কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে দুজন দ্বারপাল দেবতাকে দেখতে পেলেন। কিন্তু মুনিগণ অতি সরল পবিত্র চিত্ত, তাই কোনোরূপ দ্বিধা না করেই নিঃসঙ্কোচে দ্বারপথে প্রবিষ্ট হয়ে অগ্রসর হলেন। তখন দ্বারপাল দুজন চক্ষু রক্তবর্ণ করে, নিতান্ত অবজ্ঞাভরে হস্তস্থিত বেত্রের সাহায্যে তাঁহাদিগকে বাধা দিলেন।

মুনিগণ পরমভক্ত ও অতিশয় জ্ঞানী তাই এই 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা' গুণে অবিচলিত থেকেও দ্বারপালগণকে বললেন।

কো বা ইহৈত্য ভগবৎপরিচর্যয়োচ্চৈস্তদ্ধর্মিণাং নিবসতাং বিষমঃ স্বভাবঃ।

(ভাগবত ৩।১৫।৩২)

অর্থাৎ তোমরা ভগবানের একান্ত সেবাগুণে এই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েছ, তাই তোমাদের ভগবানের মতোই সমদর্শী হওয়া উচিত। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এক বিষমভাবের প্রকাশ দেখছি কেন ! আত্মপর ভেদজ্ঞান করা ধীরজনের কর্তব্য নয়। তোমরা যে অপরাধ করেছ তা অমার্জনীয় হলেও আমরা তোমাদের অনিষ্ট করতে চাই না। তোমরা ভগবানের ভৃত্য তাই যাতে ভৃত্যভাবের উপযুক্ত গতি হয় সেইপ্রকার দণ্ডবিধানের কথা চিন্তা করছি। এই প্রকার চিন্তা করে মুনিগণ বললেন—

লোকানিতো ব্রজতমন্তরভাবদৃষ্ট্যা পাপীয়সস্ত্রয় ইমে রিপবোঽস্য যত্র।

(ভাগবত ৩।১৫।৩৪)

এই আত্মপর ভেদজ্ঞানের ফলে তোমরা এই বৈকুণ্ঠলোক হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ অপ্রকৃষ্ট জন্ম লাভ করবে এবং ইহজন্মের এই কাম, ক্রোধ, লোভ রিপুত্রয় প্রবলভাবে তোমাদের অনুসরণ করবে।

সেই দুই দ্বারপাল মুনিদিগের এইরূপ বাক্য শুনে তাঁরা মনে মনে বিবেচনা করলেন এই ভয়ংকর ব্রহ্মশাপ অস্ত্রসমূহ দ্বারা প্রতিহত করা যায় না—

ন ব্রহ্মদণ্ডদগ্ধস্য ন ভূতভয়দস্য চ।
নারকাশ্চানুগৃহ্ণন্তি যাং যাং যোনিমসৌ গতঃ॥

—যারা ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হয় এবং যারা প্রাণিগণের পীড়ন করে, তারা যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক, কেহই—এমনকি নরকের কীটগুলিও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে না। তাই তারা সেই মুনিগণের চরণ ধারণ করে ভূতলে পতিত হলেন। জয় ও বিজয় নামে সেই দ্বারপালদ্বয় বলতে লাগলেন— **'মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎস্মৃতিঘ্নো মোহো ভবেদিহ তু নৌ ব্রজতোরধোঽধঃ॥'** (ভাগবত ৩।১৫।৩৬)। পাপীর প্রতি যাহা সমুচিত, আপনারা সেইরূপ দণ্ডই বিধান করেছেন। ওই দণ্ডই আমাদের হোক, কেননা আমরা ভগবানের অভিপ্রায় না বুঝে যে অপরাধ করেছি তা ওই দণ্ডভোগে ক্ষয়িত হবে। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা এই যে কৃতকর্মের ফলে অধম যোনিতে আমাদের জন্মগ্রহণ অবশ্যই করতে হবে, তবুও যদি আমাদের এই অধঃপতন দেখে আপনারা বিন্দুমাত্র কৃপা অনুভব করেন তবে যেন আমাদের এই অধম যোনিতেও শ্রীভগবানের স্মৃতিলোপকারী মোহ এসে অভিভূত না করে।

জয় ও বিজয় এইভাবে মিনতি করছেন, এমন সময় সর্বান্তর্যামী শ্রীভগবান তাঁর অতিমধুর মূর্তি প্রকটন করে সেই দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন। কিরীট কুণ্ডলধারী, বনমালা-পরিশোভিত, কৌস্তুভ-ভূষিত গরুড় স্কন্ধোপরি সমাসীন হস্ত, লক্ষ্মীসমলংকৃত সেই ধ্যানগম্য মূর্তি সম্মুখে দেখে সনকাদি মুনিগণ অতৃপ্তনয়নে দর্শন করতে লাগলেন ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে অবনত মস্তকে প্রণাম করলেন।

সনকাদি মুনিগণ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হলে তাদের যে অপার্থিব

আনন্দ জন্মেছিল তার নিকট সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দও অকিঞ্চিৎকর। শ্রীভগবানের মুখখানি অতিসুন্দর ও স্মিত হাস্য শোভিত। মুনিগণ ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে তাঁর সুহাসরঞ্জিতাধর মুখপদ্মের দর্শন করে কৃতার্থ হলেন, আবার অধোদৃষ্টিতে তাঁর অপূর্ব চরণযুগল দর্শন করলেন, শ্রীভগবানের নখগুলি পদ্মরাগমণির ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। ভক্তির প্রবলতায় অতঃপর মুনিগণ শুধুই বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীচরণযুগল নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তখন আর অন্য অঙ্গের দিকে লক্ষ্যই রইল না শুধু শ্রীগোবিন্দের চরণযুগলই একমাত্র সারৎসার বলে মনে করতে লাগলেন (**লব্ধাশিষঃ**) এবং অনন্য দৃষ্টিতে কেবল তাই দর্শন করে কৃতার্থ হতে লাগলেন।

অতঃপর মুনিগণ তাঁর সর্বাঙ্গ ধ্যান করতে প্রবৃত্ত হয়ে নারায়ণকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করে বলছেন—হে প্রভু ! আমরা ব্রহ্মার নিকট তোমার যে রহস্য অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব শুনেছি তাই আমাদের ধারণাপথে বদ্ধমূল ছিল। সম্প্রতি নিতান্ত সৌভাগ্যের ফলে ভগবৎস্বরূপ প্রকটিত করে দৃষ্টিপথে উপনীত হওয়ায় বেশ বুঝতে পারছি, তুমি আমাদের সেই পরমপদার্থ পরমাত্মা। তুমিই সকল প্রকার যোগসাধনার চরম উৎকৃষ্ট ফল। কিন্তু যতদিন প্রাণে ভক্তির ভাব বদ্ধমূল না হয় ততদিন কোনো সাধনাতেই তোমার এই মনোহর মূর্তি দর্শন সম্ভবপর নয়। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যগুণে চিত্তক্ষেত্রে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয়েছে তাই আমাদের ধারণাবদ্ধ ভগবৎস্বরূপের এতদিনে দর্শন পেয়েছি, নয়ন পরিতৃপ্ত হয়েছে। হে প্রভো তোমার পাদপদ্মে শতকোটি প্রণাম। হে পরমেশ্বর ! আজ আমরা বড় অপরাধ করেছি, তোমার দ্বাররক্ষী ভৃত্যদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছি, এই পাপে যদি আমাদের নরক ভোগও করতে হয়, তাতেও দুঃখ নেই, শুধু এইটুকু মাত্র মিনতি যে আমাদের কায়, মন, বাক্য সর্বদাই যেন তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকতে পারে। আমরা ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার করেছি, কিন্তু নরকে থেকেও যেন তোমার ভজনানন্দের অধিকারচ্যুত না হই, এই আমাদের প্রার্থনা আমরা আর অন্য কিছু চাই না।

সনকাদি মুনিগণের প্রার্থনার উত্তরে শ্রীভগবান ব্রাহ্মণ জাতির অসাধারণ

গৌরব কীর্তন করে নিজ ভৃত্যদ্বয়ের অপরাধ স্বীকারপূর্বক তাদের জন্য কৃপা প্রার্থনা করেছেন।

শ্রীভগবান বলছেন—

তদ্বপ্রসাদয়াম্যদ্য ব্রহ্ম দৈবং পরং হি মে।
তদ্বীত্যাত্মকৃতং মন্যে যৎ স্বপুম্ভিরসকৃতাঃ॥

(ভাগবত ৩।১৬।৪)

আমার কাছে ব্রাহ্মণ পরম দেবতাস্বরূপ, আমার অনুচরগণ তোমাদিগকে যে অপমানিত করেছে, তাও আমি আত্মকৃত অপরাধ বলেই মনে করি, তাই তোমাদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করি। ব্রাহ্মণদের কী অসীম মহিমা, কী অপরিসীম গৌরব, তা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। আমি যে বিশ্বনিয়ন্তা আর সর্বসম্পদের আশ্রয়স্থান লক্ষ্মীদেবীর যে আমার প্রতি আনুগত্য এ সকলই ব্রাহ্মণ জাতির অনুগ্রহে। আর **'তৎ সেবয়া চরণপদ্ম পবিত্ররেণুং'** (ভাগবত ৩।১৬।৭) অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ আমাকে ভক্তি করেন, চরণ অর্চনা করেন, তাতেই আমার পদধূলি এত পবিত্র, লক্ষ্মী আমার চির অনুরাগিনী। আমি যজ্ঞেশ্বর, সমস্ত যজ্ঞে যা কিছু অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, তা আমি পেয়ে থাকি ও সানন্দে ভক্ষণ করি কিন্তু ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্তভাবে আহার করলে সেই আহারে আমার যে তৃপ্তি হয় তা আর অন্য কিছুতে হয় না। আমি সর্বভূতের অন্তর্যামী ও সর্বত্রব্যাপী এটা সত্য, কিন্তু তার মধ্যে— **'যে মে তনুর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্মদীয়া ভুতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা'** (ভাগবত ৩।১৬।১০) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও সহায়হীন প্রাণী, এরাই আমার প্রধান অধিষ্ঠান স্থান।

যারা পাপের ফলে মোহগ্রস্ত হয়ে এদের সাধারণ দৃষ্টিতে দেখে, ধর্মরাজ যমও তাদের কঠোর দণ্ডবিধান করেন। অধিক আর কী, ব্রাহ্মণ জাতির মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে আমি তাদের পদধূলি মস্তকে ধারণ করি। ভৃগুমুনি পদাঘাত করেছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তাই তাঁর পদধূলি মাথায় রেখে আমি তখন থেকে সেই পদচিহ্ন বক্ষস্থলে ধারণ করে আছি। সেই অতুল গৌরবময় ব্রাহ্মণজাতি, তাদের মধ্যেও তোমরা মহাপ্রাজ্ঞ, সাধনসিদ্ধ মহর্ষি, তোমাদের প্রতি আমার মনোবৃত্তি কীরূপ এই ভৃত্যদ্বয় তার কিছুমাত্রও অবগত নয়। এরা না বুঝে

অপরাধ করেছে, এদের জন্য তোমাদের নিকট অনুগত ভিক্ষা করছি যে তোমরা এইটুকু অনুগ্রহ কর যাতে এদের প্রতি তোমাদের বিহিত দণ্ড অল্পদিনের মধ্যেই ভোগ করে এরা অচিরে আমার নিকট ফিরে আসে। শ্রীভগবানের এই বাক্য শুনে মুনিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন—

'প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টাঃ কুপিতত্বচঃ' (ভাগবত ৩।১৬।১৫)

তাঁরা রোমাঞ্চিত শরীরে কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন—

সনৎকুমারগণের স্তুতি

ষোড়শ অধ্যায় (১৬—২৫)

ন বয়ং ভগবন্ বিদ্মস্তব দেব চিকীর্ষিতম্।
কৃতো মেঽনুগ্রহশ্চেতি যদধ্যক্ষঃ প্রভাষসে॥ ১৬
ব্রহ্মণ্যস্য পরং দৈবং ব্রাহ্মণাঃ কিল তে প্রভো।
বিপ্রাণাং দেবদেবানাং ভগবানাত্মদৈবতম্॥ ১৭
ত্বত্তঃ সনাতনো ধর্মো রক্ষ্যতে তনুভিস্তব।
ধর্মস্য পরমো গুহ্যো নির্বিকারো ভবান্মতঃ॥ ১৮
তরন্তি হ্যঞ্জসা মৃত্যুং নিবৃত্তা যদনুগ্রহাৎ।
যোগিনঃ ন ভবান্ কিংস্বিদনুগৃহ্যেত যৎপরৈঃ॥ ১৯
যং বৈ বিভূতিরুপযাত্যনুবেলমন্যৈ-
রর্থার্থিভিঃ স্বশিরসা ধৃতপাদরেণুঃ।
ধন্যার্পিতাঙ্ঘ্রি তুলসীনবদামধাম্নো
লোকং মধুব্রতপতেরিব কাময়ানা॥ ২০
যস্তাং বিবিক্তচরিতৈরনুবর্তমানাং
নাত্যাদ্রিয়ৎ পরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ।
স ত্বং দ্বিজানুপথপুণ্যরজঃ পুনীতঃ
শ্রীবৎসলক্ষ্ম কিমগা ভগভাজনস্ত্বম্॥ ২১
ধর্মস্য তে ভগবতস্ত্রিযুগ ত্রিভিঃ স্বৈঃ
পদ্ভিশ্চরাচরমিদং দ্বিজদেবতার্থম্।

নূনং ভৃতং তদভিঘাতি রজস্তমশ্চ
সত্ত্বেন নো বরদয়া তনু বা নিরস্য॥ ২২
ন ত্বং দ্বিজোত্তমকুলং যদিহাত্মগোপং
গোপ্তা বৃষস্ত্বর্হণেন সসূনৃতেন।
তর্হ্যেব নঙ্‌ক্ষ্যতি শিবস্তব দেব পন্থা
লোকোঽগ্রহীষ্যদৃষভস্য হি তৎ প্রমাণম্॥ ২৩
তত্তেঽনভীষ্টমিব সত্ত্বনিধের্বিধিৎসোঃ
ক্ষেমং জনায় নিজশক্তিভিরুদ্‌ধৃতারেঃ।
নৈতাবতা ত্র্যধিপতের্বত বিশ্বভর্তু-
স্তেজঃ ক্ষতং তব নতস্য স তে বিনোদঃ॥ ২৪
যং বানয়োর্দমমধীশ ভবান্ বিধত্তে
বৃত্তিং নু বা তদনুমন্মহি নির্ব্যলীকম্।
অস্মাসু বা য উচিতো ধ্রিয়তাং স দণ্ডো
যেঽনাগসৌ বয়মযুঙ্‌ক্ষ্মহি কিল্বিষেণ॥ ২৫

সরলার্থ—মুনিগণ বললেন—হে স্বপ্রকাশ ! হে ভগবন্ ! তুমি সর্বেশ্বর হয়েও যে বলছ 'তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ যে কেবল এটুকুই কৃপা করো' ইত্যাদি—এর দ্বারা তুমি কী বলতে চেয়েছ—আমরা সেটা বুঝতে পারছি না॥ ১৬ ॥ হে প্রভু ! তুমি ব্রাহ্মণদের পরম হিতকারী এর ফলে তুমি এই লোকশিক্ষাই দিচ্ছ যে ব্রাহ্মণ তোমার পূজনীয়। আসলে তো ব্রাহ্মণ তথা দেবতাদেরও দেবতা ব্রহ্মাদিরও তুমিই আত্মা ও আরাধ্যদেব॥ ১৭ ॥ সনাতন ধর্মের উৎপত্তিও তোমার থেকেই হয়েছে, তুমিই অবতাররূপ গ্রহণ করে বার বার সনাতন ধর্ম রক্ষা করছ। নির্বিকারস্বরূপ তুমিই ধর্মের গুহ্য রহস্য—শাস্ত্র তো একথাই বলে॥ ১৮ ॥ তোমার কৃপায় নিবৃত্তিপরায়ণ যোগিগণ সহজেই মৃত্যুরূপ সংসার সাগর পার হয়ে যান ; তাহলে অন্যেরা তোমাকে কৃপা করবে এ কথার অর্থ কী ?॥ ১৯ ॥ হে ভগবান ! অর্থার্থী পুরুষ যাঁর চরণরজ সর্বদা মস্তকে ধারণ করে সেই লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর তোমার সেবায় ব্যাপৃত থাকেন। মনে হয়, ভাগ্যবান ভক্তগণ তোমার শ্রীচরণে যে তুলসীমঞ্জরীর মালা অর্পণ

করে সেই তুলসীমঞ্জরীর গন্ধে তার চারদিকে গুঞ্জনকারী ভ্রমরকুলের যেমন তোমার পাদপদ্মে স্থানলাভ হয় সেইরকমই লক্ষ্মীদেবীও তোমার শ্রীচরণই তাঁর বাসস্থানের জন্য কামনা করছেন॥ ২০ ॥ কিন্তু কমলা তাঁর পবিত্র সেবা দ্বারা নিরন্তর তোমার আরাধনা করা সত্ত্বেও তুমি তাঁর প্রতি সেরকম আদর প্রকাশ কর না, কারণ ভগবদ্ভক্তজনের প্রতিই তোমার সম্যক সমাদর। তুমি স্বয়ংই সমস্ত ভজনীয় গুণসমূহের আশ্রয় ; যত্র-তত্র ভ্রমণকারী বিপ্রগণের পবিত্র পদধূলি অথবা শ্রীবৎসচিহ্ন কি তোমাকে পবিত্র করতে পারে ? অথবা এর দ্বারা কি তোমার কোনো শোভা বৃদ্ধি হতে পারে ? ॥ ২১ ॥ হে ভগবান ! তুমি সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—তিন যুগে তুমি প্রত্যক্ষরূপে বিদ্যমান থাক তথা ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের জন্য তপ, শৌচ ও দয়া—এই তিন পাদ দ্বারা চরাচর বিশ্ব রক্ষা করছ। এখন তুমি তোমার শুদ্ধসত্ত্বময় বরদ মূর্তিতে আমাদের ধর্মবিরোধী রজঃ ও তমোগুণ দূরীভূত করো॥ ২২ ॥ হে দেব ! এই ব্রাহ্মণগণ তোমার দ্বারা অবশ্যই রক্ষণীয়। সাক্ষাৎ ধর্মরূপী হয়েও যদি প্রিয়বাক্য ও পূজা-অর্চনাদি দ্বারা এই ব্রাহ্মণদের রক্ষা না কর তাহলে তোমার এই মঙ্গলময় বেদমার্গই বিনষ্ট হয়ে যায় ; কারণ লোকসমূহ তো সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের আচরণকেই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করে॥ ২৩ ॥ হে প্রভু ! তুমি সত্ত্বমূর্তিস্বরূপ এবং সর্বজীবের মঙ্গলবিধানই তোমার অভিলাষ। সেই জন্যই তুমি নিজ শক্তিস্বরূপ রাজা প্রভৃতিদের দ্বারা ধর্মবিরোধীদের সংহার কর ; কারণ বেদমার্গের বিনাশ তোমার কখনই অভীষ্ট নয়। তুমি ত্রিলোকের নাথ এবং জগৎ পরিপালক হয়েও ব্রাহ্মণদের প্রতি যে নতিস্বীকার কর তাতে তোমার প্রভাবের কোনো হ্রাস হয় না ; এ তো শুধু তোমার লীলাবিলাস মাত্র॥ ২৪ ॥ হে সর্বেশ্বর ! এই দ্বারপালদের তুমি যেমন উচিত মনে কর তেমন শাস্তিই দাও, অথবা পুরস্কার হিসেবে এদের জীবিকাবৃদ্ধি করে দাও—আমরা অকুণ্ঠভাবে তার সমর্থন করছি। অথবা এই নিরপরাধ ভৃত্যদের আমরা যে অভিশাপ দিয়েছি সেইজন্য আমাদের উচিত শাস্তিবিধান কর ; আমরা তাও সানন্দে গ্রহণ করব॥ ২৫ ॥

মূলভাব — হে ভগবন্ ! তুমি বলেছ **'সোঽহং ভবন্ত উপলব্ধ সুতীর্থ**

কীর্তি' (ভাগবত ৩।১৬।৬) অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের গুণেই তুমি পবিত্র কীর্তি লাভ করেছ। আবার বলেছ **'যৎ সেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুং'** (ভাগবত ৩।১৬।৭) অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সেবাগুণেই তোমার চরণধূলি পবিত্র হয়েছে।

হে প্রভো! তোমার এই গৌরবশালী গম্ভীর বাক্যসমূহের তাৎপর্য আমরা ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারছি না। অন্য দেবতাদের কাছে ব্রাহ্মণ পুজ্য হলেও তুমি যে সর্বদেবশিরোমণি, সর্বান্তর্যামী, পরমাত্মারূপী। সুতরাং তোমার কাছে আমরা **'ব্রহ্ম দৈবং পরং হি মে'** অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ আমার পরম দেবতা' এই কথা শুনে বিহ্বল হয়ে পড়েছি। হয়তো বা লোকশিক্ষার জন্য বা উত্তম আদর্শ রাখার জন্য তুমি এইরূপ বিনয়, ভক্তি প্রভৃতি সদগুণ সহকারে ব্রাহ্মণদের গৌরব কীর্তন করেছ। শুধু বাক্য প্রয়োগই নয় কার্যতও আমাদের প্রতি যথেষ্ট নম্রতা প্রকাশ করেছ। হে ভগবন্! তুমি ত্রিলোকপুজ্য, পুরুষোত্তম, তোমার আদর্শ সর্বলোকেরই অনুকরণীয়। এইজন্যই বোধহয় বেদরক্ষক ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি, নম্রতা প্রভৃতি স্বয়ং প্রদর্শনপূর্বক ধর্মরক্ষার পথ পরিষ্কার করেছ। এর দ্বারা তোমার মহিমা বৃদ্ধি পাওয়া ভিন্ন অণুমাত্র হ্রাস পায় না।

হে প্রভো! তোমার ভৃত্যের প্রতি অভিশাপ প্রদান করে আমরা যে অপরাধ করেছি তাতে তুমি আমাদের সমুচিত দণ্ড দাও, অথবা তোমার ভৃত্যদ্বয়ের দণ্ড অন্যথা করো, তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাই আমরা শিরোধার্য করছি।

ভগবানের আশ্বাসন (শ্লোক ২৬)

এতৌ সুরেতর গতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ
সংরম্ভসম্ভৃতসমাধ্যনুবদ্ধযোগৌ।
ভূয়ঃ সকাশমুপযাস্যত আশু যো বঃ
শাপো ময়ৈব নিমিতস্তদবেত বিপ্রাঃ॥ ২৬

শ্রীভগবান বললেন—হে মুনিগণ! তোমরা এদের যে শাপ দিয়েছ—তা আমিই আগের থেকে বিধান করে রেখেছি। এখন এরা অবিলম্বে অসুর যোনিতে জন্ম নেবে এবং সেখানে ক্রোধের আবেশে বর্ধিত একাগ্রতার ফলে সুদৃঢ় যোগসম্পন্ন হয়ে আবার শীঘ্রই আমার কাছে ফিরে

আসবে॥ ২৬ ॥

মূলভাব—শ্রীভগবান বললেন—'**বঃ শাপো ময়ৈব নিমিতস্তদবেত ক্ষিপ্রাঃ**' (ভাগবত ৩।১৬।২৬)। হে মুনিগণ ! তোমরা যে শাপপ্রদান করেছিলে তা আমারই রচিত বলে জানবে। তারপর জয়-বিজয়রূপী দ্বারপালদ্বয়কে বলছেন—'**ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতং তু মে**' (ভাগবত ৩।১৬।২৯), আমি যদিও ব্রহ্মতেজ প্রতিরোধ করতে পারি, কিন্তু এক্ষেত্রে তা ইচ্ছা করি না। কারণ তোমাদের প্রতি ব্রাহ্মণগণের ওইরূপ তেজ প্রকাশ আমার অভিপ্রেতই হয়েছে। তোমরা অচিরেই অসুরযোনি প্রাপ্ত হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার প্রতি শত্রুতার প্রাবল্যে ও ক্রোধাতিশয্যের ফলে তোমাদের মন সর্বদাই আমার বিষয়ে ভাবনাপরায়ণ হবে এবং তোমাদের এই একনিষ্ঠ ভাবনার ফলে শীঘ্রই তোমরা আবার আমার নিকট ফিরে আসবে। অতএব তোমরা এবার আশ্বস্ত হও।

শ্রীভগবানের এইরূপ আশ্বাস বাক্যে মুনিগণ স্থিরচিত্ত হয়ে শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন এবং বিদায় প্রার্থনা করলেন। ভগবান তাঁদের যাওয়ার অনুমতি দিলেন। অতঃপর শ্রীভগবান জয়-বিজয়কে বললেন—যাও, তোমরা ব্রহ্মশাপ অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করো, আমি আশীর্বাদ করছি তোমাদের মঙ্গল হবে। অতঃপর জয়-বিজয় নামক শ্রেষ্ঠ দেবতাদ্বয় অলঙ্ঘনীয় ব্রহ্মশাপের প্রভাবে বৈকুণ্ঠলোকেই নিতান্ত ম্লানমূর্তি ও গর্বশূন্য হলেন। এরপর—

তদা বৈকুণ্ঠধিষণাত্তয়োর্নিপতমানয়োঃ।
হাহাকারো মহানাসীদ্বিমানাগ্র্যেষু পুত্রকাঃ॥ (ভাগবত ৩।১৬।৩২)

যখন সেই দ্বারপালদ্বয় বৈকুণ্ঠলোক হতে পতিত হলেন তখন বৈকুণ্ঠলোকাদিতে হাহাকার ধ্বনি উঠল। শ্রীভগবানের প্রধান ভৃত্যদ্বয়ই অতি প্রদীপ্ত কাশ্যপ বীর্যকে আশ্রয় করে দিতির গর্ভে প্রবিষ্টপূর্বক নিজ নিজ সৃষ্টির উপাদানরূপে গ্রহণ করলেন। এই দুই দ্বারপাল দিতির গর্ভে যুগপৎ প্রবেশ করে অসুরভাবাপন্ন হয়েছিলেন এবং তারই প্রভাবে দেবতাদের তেজ পরাভূত হয়। এইভাবে এই দুইজনই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে সৃষ্ট আদি দৈত্যের

সৃষ্ট হয়েছিল।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে—জয় ও বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল, এটা অবশ্যই তাঁদের অসাধারণ সুকৃতির ফল। কিন্তু অমন সুকৃতিশালী ব্যক্তির আবার হঠাৎ ব্রাহ্মণের অপমানে প্রবৃত্তি হল কেন ? শ্রীভগবানের পার্ষদ হয়েও কেন তাঁদের ভাগ্যে ব্রহ্মশাপ নিপতিত হল। আবার সনক আদি মুনি চতুষ্টয় আত্মরাম, জীবন্মুক্ত ঋষি, তাঁরা সশরীরে বৈকুণ্ঠধামে গমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তবে তাঁদেরই বা এইরূপ অভিশাপ দানে প্রবৃত্তি হল কেন ? অন্যদিকে, শ্রীবৈকুণ্ঠ শ্রীভগবানের নিত্যানন্দময় ধাম—**'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'** অর্থাৎ সেখানে গেলে আর ফিরতে হয় না বা পুনর্জন্ম হয় না সেই আমার পরমধাম—শ্রীভগবান গীতায় নিজমুখে একথা বলেছেন। তাহলে বৈকুণ্ঠধামের পার্ষদ জয় ও বিজয় কিরূপে অসুরযোনি প্রাপ্ত হলেন ?

এখানে ভগবানের বাক্যের তাৎপর্য বুঝলেই এই সংশয়ের নিরসন হবে। শ্রীভগবান বলেছেন যে, সনকাদি মুনিগণ যে অভিশাপ দিয়েছেন—'তোমরা অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করবে' এ অভিশাপ তাঁর নিজেরই বিধান বলে ভগবান উল্লেখ করেছেন। এর তাৎপর্য এই যে, শ্রীভগবানের বিশেষ বৃত্তি যেমন সিসৃক্ষা, সঞ্জিহীর্ষা যেমন কাল অনুসারে প্রকটিত হয়, সেইরকম কদাচিৎ কালক্রমে তাঁর যুযুৎসা অর্থাৎ যুদ্ধ করার ইচ্ছাবৃত্তিও প্রকটিত হয়। কিন্তু অন্য সকলে অল্পবল আর বৈকুণ্ঠবাসিগণ সমবল হলেও কেহই বিরুদ্ধপক্ষীয় নহেন, তাই যুযুৎসা পূরণের উপায় কী ?

তখন সেই অচিন্ত্য মহিমময় শ্রীভগবান স্থির করলেন যে—এই দ্বারপাল-দ্বয় অসীম বলশালী, অথচ তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ভক্ত, এদেরকেই প্রতিপক্ষ করে তাঁর যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা মেটাবেন। ইহারা যেহেতু শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্ত তাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণে এঁরা অতীব আনন্দই লাভ করবেন।

এইরূপ মনে মনে স্থির করে তাঁর ইচ্ছাশক্তির অসীম প্রভাবে ভগবান এই সকল সংঘটিত করেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন—**'মতং তু মে'** অর্থাৎ এই ব্রহ্মদণ্ড ভোগ আমার অভিপ্রেতেই হয়েছে। ভগবান তাঁর দ্বারপালদের বলেছেন **'মা ভৈষ্ঠ'** অর্থাৎ তোমরা ভীত হয়ো না, আবার বলেছেন **'শম অস্তু'**

অর্থাৎ তোমাদের মঙ্গল হোক।

বিশ্বপ্রপঞ্চের সকলকে নিয়েই লীলাময়ের অবিরাম লীলা চলছে, তার ওপর ভক্তকে নিয়ে তাঁর যে সকল লীলা সংঘটিত হয়, তা অতি অপূর্ব, অতি মধুর।

জয় ও বিজয়ের যে এইভাবে দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু হিসেবে জন্মগ্রহণ তা ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে ব্রহ্মা মধুর ভাবে কীর্তন করেছেন। পরিশেষে তিনি দেবগণকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে যে, শ্রীভগবানের এই সকল লীলা-রহস্য তাঁরই ইচ্ছায় সাধিত হচ্ছে, তাই তাতে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

———o———

ধ্রুবর উপাখ্যান ও স্তুতি

চতুর্থ স্কন্ধ (অষ্টম-দ্বাদশ অধ্যায়)

প্রাক্‌কথন

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার স্তুতি, তারপরে ব্রহ্মার মানসপুত্র চতুঃসন-এর স্তুতি এবং চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ বর্ণনা প্রসঙ্গে ধ্রুব চরিত্র বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীমৈত্রেয়মুনি বলছেন—

অথাতঃ কীর্তয়ে বংশং পুণ্যকীর্তেঃ কুরূদ্বহ।
স্বায়ম্ভুবস্যাপি মনোর্হরেরংশাংশজন্মনঃ॥

(ভাগবত ৪।৮।৬)

হে বিদুর ! স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র-বংশ বর্ণনা করছি। যেহেতু শ্রীভগবানের অংশরূপ ব্রহ্মার থেকে অর্থাৎ দেহার্ধ থেকে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। এরূপ মনুর কীর্তি অতি পবিত্র।

মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। আর উত্তানপাদের দুই পুত্র ধ্রুব ও উত্তম। একবার ধ্রুব পিতার কোলে ওঠার চেষ্টা করলে তাঁর সতীনমাতা সুরুচি এসে বললেন —'**তপসাঽঽরাধ্য পুরুষং তস্যৈবানুগ্রহেণ মে**' (ভাগবত ৪।৮।১৩) অর্থাৎ তপস্যাপূর্বক ভগবানকে সন্তুষ্ট করে আমার গর্ভে পুত্র হয়ে আসলে তবেই তুমি রাজানুগ্রহ পাবে। ধ্রুবর মাতা সুনীতিও সুরুচির এই কথা শুনে দুঃখিত মনে ধ্রুবকে বললেন— '**অনন্যভাবে নিজধর্মভাবিতে মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পূরুষম্**' (ভাগবত ৪।৮।২২)। অর্থাৎ হে বৎস ! অন্য ভাবনা ত্যাগ করে নিজ ধর্ম দ্বারা মন নির্মল করে ভগবানকে ভজনা করো, তাহলে তোমার মনস্কামনা পূরণ হবে। মাতার এই বাক্য শুনে ধ্রুব নিজেই নিজ মন সংযত করে গৃহ হতে বহির্গত হলেন।

নারদ মুনি ধ্রুবের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বিস্মিত হয়ে ভাবছেন—'**অহো তেজঃ ক্ষত্রিয়াণাং মানভঙ্গমমৃষ্যতাম্ বালোঽপ্যয়ং হৃদা ধত্তে যৎ সমাতুর-সদ্বচঃ॥**' (ভাগবত ৪।৮।২৬) অহো ! ক্ষত্রিয়দিগের কী প্রভাব ! ইহারা

কিছুমাত্র অপমান সহ্য করতে পারে না। ধ্রুব বালক হলেও বিমাতার দুর্বাক্য সমস্তই অন্তরে ধারণ করে আছে আর তপস্যার জন্য উপস্থিত হয়েছে।

দেবর্ষি নারদ ধ্রুব সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁর পবিত্র হস্ত ধ্রুবর মস্তকে স্পর্শ করে বলছেন—ধ্রব তুমি বালক, সুকুমার বয়সেই বিমাতার দুর্বাক্যে ব্যথিত হয়ে অভিমানবশত শ্রীভগবানের আরাধনার জন্য গৃহের বাহির হয়েছ। অভিমানবশত এইরূপ আবেগ পূর্বে দেখতে পাওয়া গেলেও তা কিন্তু স্থায়ী হয় না। লোকে নিজ কর্ম দ্বারাই ফলের মূল সৃষ্টি করে, মোহের বশে বৃথা দোষ দেওয়া হয় মাত্র। বিভিন্ন প্রকার কর্ম সম্পাদনকারীদের ভগবানই ফল প্রদান করেন, লৌকিক ব্যাপারগুলি উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং কর্মানুসারে যখন যার যেমন অবস্থা উপস্থিত হয় তাতেই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

এইরকম বুঝে যে সন্তুষ্ট থাকতে পারে, তাকে আর সংসার মোহ আচ্ছন্ন করতে পারে না। তাই অন্যের প্রতি অভিমানবশত তার দোষ চিন্তা করে বৃথা দুঃখ বহন করো না, নিবৃত্ত হও, তুমি যে ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছ, তা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার, কত মুনিগণ যুগযুগান্তর ধরেও কত কঠোর সাধনা করে তাঁর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। তোমার এই বয়সে এই সাধনা তো অত্যন্ত সুকঠিন, সুতরাং এখন বৃথা চেষ্টা করো না। যদি তোমার ইচ্ছে থাকে তবে পরিণত বয়সে করো।

ধ্রুব কিন্তু এই বাক্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তেজস্বিতায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ, তাই ইষ্টসিদ্ধির পথকে নারদ অতি দুর্গম বলে বোঝালেও ধ্রুব তাতে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। অথচ নারদের উপদেশ গ্রাহ্য না করায় নারদ যদি অন্য কিছু ভাবেন, তাই অতি শিষ্টতার সঙ্গে ধ্রুব বললেন—

তথাপি মেঽবিনীতস্য ক্ষাত্ত্রং ঘোরমুপেয়ুষঃ।
সুরুচ্যা দুর্বচোবাণৈর্ন ভিন্নে শ্রয়তে হৃদি॥
পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধু বর্ত্ম মে।
ব্রূহ্যস্মৎ পিতৃভির্ব্রহ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্॥

(ভাগবত ৪।৮।৩৬-৩৭)

আপনার উপদেশ যদিও উপাদেয় তাহলেও আমার অদম্য ক্ষত্রিয়

স্বভাববশত আমি উদ্ধত, আবার বিমাতার দুর্বাক্য বাণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে তাই তা আপনার উপদেশ হৃদয় গ্রহণ করতে পারছে না। হে দেবর্ষি! আমার পূর্বপুরুষ বা অন্য কোনো ব্যক্তি যা কখনো লাভ করেনি, ত্রিভুবন মধ্যে এইরূপ সর্বোৎকৃষ্ট পদ লাভ করতে আমি অভিলাষী। আপনি দয়া করে আমাকে এইরূপ উপদেশ দান করুন।

ধ্রুবর এই বাক্য শুনে দেবর্ষি নারদ তাঁকে দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত হরিনাম '**ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়**' জপ করতে বললেন। তিনি আরও বললেন, শিলাদি নির্মিত প্রতিমা পেলে তাতে অথবা তদ্‌ভাবে মৃত্তিকা বা জলাদিতে শ্রীভগবানের অর্চনা করবে। এইভাবে ক্রমশ মন সম্যক্ একাগ্র হবে ও বাক্য সংযত হবে এবং পরিমিত ফলমূলাদি ভক্ষণশীল হয়ে শান্ত মুনি হতে পারবে। নারদ এইভাবে ধ্রুবকে বাহ্যপূজা ও মানসপূজা প্রভৃতি সকল প্রকার উপাসনা শিক্ষা দিলেন।

নারদ মহারাজ আরো উপদেশ দিলেন যে, সাধনপথের প্রধান সহায় হল চিত্তশুদ্ধি। অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে এই চিত্তশুদ্ধির জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি বিহিত হয়েছে। এই সকল উপায় বড় সহজসাধ্য নয়, জন্মান্তরীণ সাধনবল না থাকলে কোনোটাই আয়ত্তে আসে না। এইজন্য বাহ্যপূজা অর্থাৎ আরাধ্য দেবতার প্রতিমা সামনে রেখে পত্র, পুষ্প, জল আদি সুলভ উপচারে পূজা অভ্যাস করতে হয়। যেমন লোকে কোনো কার্যই প্রথম হতে অভ্যস্ত থাকে না, নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করতে করতে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সাধনার পথও সেইরূপ।

প্রথমতঃ এই প্রকার বাহ্যপূজা করতে করতে ক্রমশ শ্রীভগবানের অনুগ্রহে ওই প্রতিমাদির মধ্যেই সেই আরাধ্য দেবতাকে চিন্তা করার অভ্যাস হয়, আর এই অভ্যাসের দৃঢ়তার পরে প্রতিমাদি অবলম্বন ব্যতিরেকে মানসপূজার অধিকার জন্মে। এইরূপে ক্রমশ মনের সকল অনর্থ দূর হয়ে প্রগাঢ় তন্ময়তা অর্থাৎ সমাধি জন্মে থাকে। তাই সাধকের পক্ষে বাহ্য উপচারে প্রতিমাদির পূজা করা বিশেষ উপযোগী।

ভক্তপ্রবর নারদের ধ্রুবর প্রতি যে উপদেশ তা অসীম দয়া প্রকাশক।

উপদেশের অন্তে নারদ বলছেন—

বিরক্তশ্চেন্দ্রিয়রতৌ ভক্তিযোগেন ভূয়সা।
তং নিরন্তরভাবেন ভজেতাদ্ধা বিমুক্তয়ে॥

(ভাগবত ৪।৮।৬১)

অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের দিকেই অধিকাংশর লক্ষ। শ্রীভগবানের আরাধনায় সে সকল ফলসিদ্ধি তো অল্প কথা, যদি বিমুক্তি অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রকার মুক্তিও কাম্য হয়, তবে সেই মুক্তিলাভ করতে হলেও প্রবল ভক্তিযোগে তাঁকে ভজনা করতে হয়। শ্রীভগবানে অবিচ্ছিন্ন ভজনানন্দই ভক্তের পরমার্থ অর্থাৎ বিশিষ্ট মুক্তি। দেবর্ষি নারদের উপদেশে ধ্রুব মধুবনে গিয়ে স্নান করে অতি পবিত্রভাবে সেই রাত্রিতে উপবাস থাকলেন।

'সমাহিতঃ পর্যচরদৃষ্যাদেশেন পূরুষম্' (ভাগবত ৪।৮।৭১)

অতঃপর ধ্রুব একাগ্রমনে ভগবান পুরুষোত্তমের আরাধনা করতে আরম্ভ করলেন। ধ্রুব কঠোর তপস্যায় রত হলে ভগবান মনে করলেন যে তার কাম্যফল প্রদানে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করার কারণ নেই। এইরূপ বিবেচনা করে তিনি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক ধ্রুবের নিকট আগমন করলেন। তখন ধ্রুবর পূর্ণ সমাধি অবস্থা, বাহ্যিক বিষয়ের কিছুমাত্র অনুভূতি নেই, হৃদপদ্মের মধ্যস্থলে একমাত্র সেই পরমারাধ্য শ্রীভগবানের মধুর মূর্তিই অন্তর্দৃষ্টিতে বিরাজ করছেন। ভগবান তখন স্থূলভাবে ভক্তর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাকে লৌকিক দর্শন-স্পর্শনাদির দ্বারা কৃতার্থ করার জন্য ক্ষণিকের জন্য তার অন্তর থেকে অন্তর্হিত হলেন। তখন ধ্রুবর অন্তর্দৃষ্টি লক্ষহারা হল আর অমনি চিত্তর সমাধি ভঙ্গ হল। ধ্রুব চক্ষু মেললেন, **'দৃগ্‌ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্ভকশ্চুম্বন্নিবাস্যেন ভুজৈরিবাশ্লিষন্'** (ভাগবত ৪।৯।৩)। এবং দেখলেন সম্মুখে ঠিক সেই অবস্থায় (অর্থাৎ হৃদপদ্মে যেরূপে ভগবান বিরাজ করছিলেন সেইরকম অবস্থায়) শ্রীভগবান বিরাজ করছেন। ধ্রুব ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হয়ে তাঁর বন্দনা করলেন, নয়নযুগল দ্বারা শ্রীভগবানকে এরূপ আগ্রহে দেখতে লাগলেন, যেন তাঁকে পান করবেন! প্রণামকালে মুখ দ্বারা যেন তাঁর চরণে চুম্বন করলেন আর বাহু দ্বারা বেষ্টনে পুনঃ পুনঃ তাঁহার পাদপদ্ম

আলিঙ্গন করতে লাগলেন। ধ্রুবর তখন ইচ্ছা হল শ্রীভগবানের স্তুতি করবেন। কিন্তু কী করে স্তুতিবাদ করতে হয় তা তাঁর অজ্ঞাত। শ্রীভগবান অন্তর্যামী, সবই বুঝলেন এবং তখন তিনি **'কৃতাঞ্জলিং ব্রহ্মময়েন কম্বুনা পস্পর্শ বালং কৃপয়া কপোলে'** (ভাগবত ৪।৯।৪) অর্থাৎ তিনি কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান বালকের প্রতি দয়া করে স্বীয় বেদময় শঙ্খ দ্বারা (যা জ্ঞানের প্রতীক) তাঁর গণ্ডস্থলে স্পর্শ করলেন। শঙ্খ স্পর্শমাত্রেই বালক ধ্রুব তৎক্ষণাৎ ভগবৎকৃপা সম্পাদিত হয়ে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান লাভ করলেন আর ধীরভাবে অমোঘ কীর্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন।

ধ্রুবর স্তুতি (চতুর্থ স্কন্ধ, নবম অধ্যায়)

ধ্রুবর শ্রীহরির স্তুতি ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের বারোটি শ্লোকে (৬-১৭) বর্ণিত হয়েছে। ভগবৎ স্তুতি তিনটি প্রকরণে বিভক্ত—

ভগবৎ স্বরূপ বর্ণনা	৬—৯
ভক্তসঙ্গ মহিমা বর্ণনা	১০—১২
ভগবৎ উপলব্ধি বর্ণনা	১৩—১৭
ভগবানের বরদান	১৯—২৫

ভগবৎ স্বরূপ বর্ণনা (শ্লোক ৬—৯)

যোহন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥ ৬ ॥

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদগুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্ বিভাসি॥ ৭ ॥

ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট বিশ্বং
সুপ্তপ্রবুদ্ধ ইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ।
তস্যাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলং
বিস্মর্যতে কৃতবিদা কথমার্তবন্ধো॥ ৮ ॥
নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।
অর্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎ স্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাম্॥ ৯

সরলার্থ—ধ্রুব বললেন—প্রভু ! আপনি সর্বশক্তিমান, আপনিই আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়ে নিজ তেজে (চিৎ-শক্তির প্রভাবে) আমার সুপ্তিমগ্ন বাণীকে সঞ্জীবিত (দিব্য) করে তুলেছেন এবং আমার হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয় ও প্রাণসমূহকে সচেতন (দিব্য) করেছেন, সেই অন্তর্যামী পুরুষোত্তম ভগবান আপনাকে আমি প্রণাম করি॥ ৬ ॥ ভগবান ! আপনি স্বরূপত এক, তথাপি আপনি আপনার অনন্ত গুণময়ী মায়াশক্তির সাহায্যে মহদাদি এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে স্বয়ং অন্তর্যামীরূপে তারই মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন। আবার মায়ার অসৎ-গুণ যে ইন্দ্রিয়াদি, সেগুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে স্থিত হয়ে 'অনেক'-রূপে প্রতিভাত হয়ে থাকেন, যেমন অগ্নি এক হলেও বিভিন্ন কাষ্ঠে প্রজ্বলিত হয়ে বহুরূপে প্রকাশিত হন॥ ৭ ॥ হে নাথ ! সৃষ্টির প্রারম্ভে আপনার শরণাপন্ন হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আপনারই প্রদত্ত জ্ঞানের প্রভাবে সুপ্তোত্থিতের মতো এই বিশ্বকে দর্শন করেন। হে আর্তজনবান্ধব ! আপনার চরণতল মুক্তপুরুষগণেরও একমাত্র আশ্রয়, (প্রাণ তথা ইন্দ্রিয়াদির সজীবতা-সঞ্চারকারীরূপে আপনার দ্বারাই সর্বভূতের যাবতীয় অভীষ্ট সম্পাদিত হয়, এই বোধসম্পন্ন হয়) কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আপনার পদমূল কীরূপেই বা বিস্মৃত হতে পারে ? ॥ ৮ ॥ প্রভু ! এই শবতুল্য মনুষ্যদেহ দ্বারা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত যে স্থূল ভোগসুখ সম্পাদিত হয় সে তো নরকেও পাওয়া যায়। সেই বিষয়সুখের জন্য লালায়িত যে সকল ব্যক্তি জন্ম-মরণবন্ধন ছেদনকারী বাঞ্ছাকল্পতরু আপনাকে (কেবলমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তি ভিন্ন) অন্য

উদ্দেশ্যে উপাসনা করে তাদের বুদ্ধি অবশ্যই আপনার মায়াশক্তির প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে॥ ৯

মূলভাব—ধ্রুবের সমাধি ভঙ্গ হলে তিনি চক্ষু মেলে দেখলেন সম্মুখে শ্রীভগবানের সেই অপূর্ব ধ্যানলব্ধ মূর্তিখানি বিরাজমান। দেখে ধ্রুবর প্রাণ জুড়িয়ে গেল, মন আনন্দে অধীর হয়ে উঠল, সমস্ত অঙ্গ দ্বারা তাঁর সেবা করতে ইচ্ছে হল। ধ্রুব তখন ভগবানের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন ও আকুলপ্রাণে ভগবানের মুখপানে চেয়ে রইলেন। কিন্তু স্তব করতে হলে যে সুবিশুদ্ধ ভাষায়, সুসম্বন্ধ বাক্য প্রয়োগ করতে হয়, বালক ধ্রুব সে বিষয় অনভিজ্ঞ। কিন্তু অন্তর্যামী ভগবানের হস্তস্থিত বেদস্বরূপ শঙ্খের স্পর্শেই ধ্রুবর সমুচিত বাকশক্তি প্রকাশ পেল। তাই প্রথম দুই শ্লোকে ধ্রুব শ্রীভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক স্তুতি করছেন। যদিও বাক্ প্রভৃতির এক একটি ইন্দ্রিয়র এক একজন অধিপতি আছেন—তাহলে ধ্রুব কেন তাঁর ইন্দ্রিয়শক্তি উদ্দীপনায় ঈশ্বরের স্তুতি করলেন ? এর কারণ ধ্রুব অনুভব করছেন যে এক ভগবানই সমস্ত জীবের অভ্যন্তরে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়র বিভিন্ন প্রকার বিষয় গ্রহণ করার উপযোগী শক্তি সম্পাদন করে থাকেন। বিভিন্ন অধিদেবতারূপে একই ভগবানের প্রকাশ হয়ে থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থে ভগবান 'আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চার প্রকার ভক্তের কথা বলেছেন। এখানেও ধ্রুব আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী এই ত্রিবিধ ভক্তের অবস্থা তাঁর স্তুতির তৃতীয় শ্লোকে (৮) এবং অর্থার্থী অর্থাৎ সকাম ভক্তের কথা স্তুতির চতুর্থ শ্লোকে (৯) বর্ণনা করেছেন। এর তাৎপর্য এই যে অন্য ত্রিবিধ ভক্ত অপেক্ষা অর্থার্থী বা সকাম ভক্ত অধম, যেহেতু যত উৎকৃষ্ট সুখ সমৃদ্ধিই কারো কাম্য হউক না কেন, যে সুখ বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়র সম্বন্ধ দ্বারা উৎপত্তিশীল হয়, তবে তা নশ্বর। আর নশ্বর সুখই যদি ভোগ করতে হয় তবে সাধনা করে কী ফল ? তাই ধ্রুব বলছেন—হে প্রভু ! আমি যে পিত্রাদি রাজ্য অপেক্ষাও, সর্বলোকের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট পদ অধিকার করব এইপ্রকার কামনালব্ধ হয়ে আপনার আরাধনা করেছি তা নিতান্তই অধমের মতো কার্য হয়েছে।

ভক্তসঙ্গ মহিমা বর্ণনা (শ্লোক ১০—১২)

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিং অন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥ ১০
ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥ ১১ ॥
তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥ ১২ ॥

সরলার্থ— নাথ ! আপনার চরণকমল ধ্যান অথবা আপনার ভক্তজনের পবিত্র চরিত্র শ্রবণে (অথবা, আপনার ভক্তজনের মুখে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণে) দেহীগণের যে পরম আনন্দ লাভ হয়, আত্মানন্দরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও সেরূপ হয় না। সুতরাং (স্বর্গাদি বিষয়-সুখ ভোগের নির্দিষ্ট সময় সীমা অতিক্রান্ত হলে) কালের তরবারির আঘাতে খণ্ডিত স্বর্গীয় বিমান থেকে ভ্রষ্ট পতনশীল (বিষয়সুখাভিলাষী) ব্যক্তিগণের যে সেই অতুলনীয় সুখাস্বাদ হতেই পারে না তা বলাই বাহুল্য॥ ১০ ॥ হে অনন্তস্বরূপ ! আপনার প্রতি যাঁদের ভক্তি সতত প্রবাহিত, সেই নিষ্কলুষচিত্ত ভক্ত মহাত্মাগণের সঙ্গ যেন আমি লাভ করি, তাঁদের সকাশে তাহলে আপনার গুণগান, আপনার লীলাকথারূপ অমৃতপানে মত্ত হয়ে আমি বহু দুঃখ-বিপদে পরিপূর্ণ এই ভয়ংকর সংসার সাগর অনায়াসেই পার হয়ে যাব॥ ১১ ॥ হে পদ্মনাভ প্রভু ! যাঁদের চিত্ত (ভ্রমর) আপনার চরণকমলের সুগন্ধে লুব্ধ (অতএব নিয়তই তারই প্রতি ধাবিত), সেইসকল মহাপুরুষগণের সঙ্গ যাঁরা করে থাকেন তাঁরা নিজেদের এই একান্ত প্রিয় শরীর এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত পুত্র, মিত্র, গৃহ, বিত্ত বা পত্নী ইত্যাদি

বিষয়ের কথা আর চিন্তাও করেন না॥ ১২

মূলভাব—ধ্রুব প্রথম প্রকরণে এইভাবে কাম্যফলের প্রতি নিজ আত্মগ্লানি প্রকাশ করার পরে দ্বিতীয় প্রকরণে তাঁর নিজ গুরু দেবর্ষি নারদের কথা মনে পড়ে গেল। তখন ধ্রুব ভগবৎ ভক্ত-সঙ্গর মহিমা কীর্তন করলেন। ধ্রুব প্রার্থনা করছেন, প্রভো ! আমি আর কিছুই চাই না, কেবল আপনার ভক্তজনের সঙ্গলাভ কামনা করি। ভক্তসঙ্গে বাস করে যদি অবিরাম আপনার নামলীলাদি কথালাপে তন্ময় থাকতে পারি, তবে এই দুঃখশোকাদি পরিব্যাপ্ত সংসার কোনো প্রকারে আর অভিভূত করতে পারবে না, অনায়াসে এই দুস্তর সংসার সমুদ্র পার হতে পারব।

ভগবৎ উপলব্ধি বর্ণনা (শ্লোক ১৩—১৭)

তির্যঙ্নগদ্বিজসরীসৃপদেবদৈত্য-
মর্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্‌বিশেষম্।
রূপং স্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্যনেকং
নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ॥ ১৩

কল্পান্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্ণন্
শেতে পুমান্ স্বদৃগনন্তসখস্তদঙ্কে।
যন্নাভিসিন্ধুরুহকাঞ্চনলোকপদ্ম-
গর্ভে দ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ॥ ১৪

ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্‌বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে॥ ১৫

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্যা।
তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে॥ ১৬

সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্তেঃ।
অপ্যেবমর্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্॥ ১৭

সরলার্থ— হে জন্মরহিত পরমেশ্বর ! পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, পর্বত, সরীসৃপ-জাতীয় জীব, দেবতা, দৈত্য এবং মানুষ প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ এবং মহত্তত্ত্বাদি বহুবিধ কারণ দ্বারা সম্পাদিত আপনার এই সদসৎ আত্মার স্থূল বিশ্বরূপটিকেই আমি জানি, এর অতীত আপনার পরমস্বরূপ যা বাক্-এরও অগোচর, আমি তার কথা কিছুই জানি না॥ ১৩ ॥ কল্পান্তে যে পরমপুরুষ (আত্মনিবিষ্ট দৃষ্টি অর্থাৎ) যোগনিদ্রামগ্ন হয়ে এই সমগ্র বিশ্বকে নিজের উদরে বিলীন করে কেবল অনন্তদেবের সঙ্গে তাঁর অঙ্কে শয়ন করে থাকেন এবং যাঁর নাভিসমুদ্র থেকে উৎপন্ন সর্বলোকময় সুবর্ণকমলের গর্ভে পরম তেজোময় দেব ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হন, সেই ভগবান আপনাকে আমি প্রণাম করি॥ ১৪ ॥ আপনি আপনার অখণ্ডিত চিৎশক্তিরূপ দৃষ্টি দ্বারা বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন সকল অবস্থার দ্রষ্টা (সাক্ষীস্বরূপ) এবং নিত্যমুক্ত, শুদ্ধসত্ত্বময়, সর্বজ্ঞ, পরমাত্মস্বরূপ, নির্বিকার, আদিপুরুষ, ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন এবং গুণত্রয়ের অধীশ্বর। আপনি জীব অপেক্ষা সর্বপ্রকারেই ভিন্ন। সংসারে স্থিতির জন্য আপনি যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুরূপে বিরাজ করছেন॥ ১৫ ॥ পরস্পর বিরুদ্ধ-বৃত্তিসম্পন্ন বিদ্যা-অবিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ শক্তি ধারাবাহিকরূপে নিরন্তর আপনার থেকে উদ্ভূত (অর্থাৎ আপনার অস্তিত্বে প্রতীয়মান) হয়ে চলেছে। আপনি জগতের কারণ, অখণ্ড, অনাদি, অনন্ত, আনন্দময়, নির্বিকার ব্রহ্মস্বরূপ। আমি আপনার শরণ নিলাম॥ ১৬ ॥ হে ভগবান ! আপনি পরমানন্দমূর্তি, যে ভক্ত সাধকগণ আপনাকে এইরূপ জেনে (অন্যফলের প্রতি) কামনাশূন্য হৃদয়ে নিরন্তর আপনারই ভজনা করেন, তাঁদের কাছে রাজ্যাদি ভোগ্যবস্তু অপেক্ষা আপনার চরণকমল প্রাপ্তিই সকল সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা। এতদ্ সত্ত্বেও কিন্তু হে প্রভু, গাভী যেমন তার নবপ্রসূত বৎসকে নিজ দুগ্ধ পান করায় এবং তাকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করে, ঠিক সেই প্রকারেই ভক্তদের প্রতি করুণা-পরাধীন

আপনি আমার মতো একান্ত দীন এবং সকাম জীবগণেরও কামনা পূর্ণ করে তাদের সংসার ভয় থেকে রক্ষা করে থাকেন॥ ১৭ ॥

মূলভাব—ধ্রুবর স্তুতি অনুধাবন করলে এইরূপ প্রতীত হওয়া খুব দুরূহ যে তাঁর মতো বিবেকীর পক্ষে কীরূপে বিমাতার দুর্বাক্য ও পিতার দুর্ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে অভিমানবশত 'ত্রিভুবনোৎকৃষ্ট পদ' প্রাপ্তির বাসনা জাগা সম্ভব। এইরূপ চিন্তা ধ্রুবর মনেও উদিত হয়েছিল তাই তিনি অকপটে প্রাণের সকল কথা শ্রীভগবানকে জানাচ্ছেন। ধ্রুব বলছেন—হে জন্মাদিরহিত অনাদিপুরুষ! এই বিরাট বিশ্বই কেবল আপনার বলে আমার ধারণা ছিল। অল্প সময় পূর্বেও আমি জানতাম না যে ইহা ভিন্ন আপনার দুটি স্বরূপ আছে ঈশ্বর ও পরমেশ্বররূপে। সকল জীবের প্রকাশমান সত্তারূপে আপনি (জীবাত্মা) ঈশ্বর ও সকলের নিয়ন্তারূপে (পরমাত্মা) আপনি পরমেশ্বর। কিন্তু আমি এই বিশ্বপ্রপঞ্চর মায়াশক্তির প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে এযাবৎকাল অভিমানে পূর্ণ ছিলাম। এখন আপনার অসীম করুণায় বুঝতে পারছি যে এই দিব্যমূর্তি ধারণ করে যে আপনি আমার সম্মুখে বিদ্যমান, সেই আপনিই সমস্ত স্বরূপের মূলাধার, আবার আপনিই প্রলয়কালে এই বিরাট বিশ্ব নিজ মধ্যে লয় করে যোগনিদ্রা অবলম্বনপূর্বক অনন্ত শয্যায় শয়ন করে থাকেন এবং কল্পসৃষ্টির প্রারম্ভে আপনারই নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা উদ্ভূত হন।

তবে শ্রীভগবানের শয়ন ও যোগনিদ্রা অবলম্বনের কথা শুনে যদি কখনো জীব ও শ্রীভগবানের ভেদ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয় সেই জন্য ধ্রুব বহুকথায় তার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। শ্রীভগবান নিত্যমুক্ত স্বভাব আর জীব কত জন্ম-জন্মান্তের সাধনায় যদি তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারে তবেই সে মুক্ত হয়। ভগবান সর্বজ্ঞ আর জীব নিতান্ত অজ্ঞ। জীব মায়াধীন আর ভগবান মায়াধীশ ও ত্রিগুণাত্মিক মায়াশক্তির নিয়ন্তা। এইরূপে বহুভাবে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের ভেদ প্রতিপন্ন করে উপসংহারে ধ্রুব বলছেন—যেহেতু পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান তাই বিদ্যা, অবিদ্যা নিষ্ক্রিয়ত্ব, লীলাময়ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন যাবতীয় শক্তির তিনিই অধিষ্ঠান। লৌকিক হিসাবে যা বিরুদ্ধভাব সে সকল ভাবেরই তাঁর মধ্যে সমাবেশ, এই তাঁর পরমেশ্বরত্ব। সেই সর্বশক্তিমানকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি

কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ?

সেই অনন্তশক্তিশালী পরমেশ্বর থেকে যে যত দূরে সে তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে তত অনভিজ্ঞ। সাধনপথ ধরে যে যত অগ্রসর হবে সে তত তাঁর শক্তি বৈচিত্র্যের সন্ধান পাবে। যদি কেউ সেই পথের শেষ সীমায় পৌঁছয় তবে সে বুঝতে পারে ভগবানের পূর্ণ স্বরূপ কী এবং তাঁর সেবায় কী অসীম আনন্দ। সনকাদি ঋষিগণ যখন বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলেন তখন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করে তা বুঝেছিলেন, তাই সানন্দে বলেছিলেন—

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নঃ স্তা-
চ্চেতোঽলিবদ্যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্যদি হেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ,
পূর্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ॥ (ভাগবত ৩।১৫।৪৯)

অর্থাৎ স্তুতি করে বলছেন — হে প্রভু ! আমাদের চিত্ত যদি তোমার পাদপদ্মে সদা অনুরক্ত থাকে, আমাদের বাক্য যদি তোমার চরণ বন্দনায় শোভমান হয়, কর্ণরন্ধ্র যদি তোমার গুণগাথায় পূর্ণ হয়, তবে আমরা নরকে বাস করতে হলেও তা স্বচ্ছন্দে বরণ করতে পারি।

এইপ্রকারে ধ্রুবও গভীর তত্ত্বপ্রকাশক ভাষায় ও ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে শ্রীভগবানের স্তব করে পরিশেষে প্রার্থনা করছেন— হে নাথ ! যদিও আমি অভিমানে মুগ্ধ হয়ে আপনার পাদপদ্মস্বরূপ পরম পুরুষার্থ না বুঝে সকাম চিত্তে প্রার্থনা করেছি, তথাপি, হে ভগবন্ ! আপনি নিজ বাৎসল্যগুণে আমাকে পরমার্থ ধনে বঞ্চিত করবেন না।

ভগবানের বরপ্রদান ও ধ্রুবর পরমপদ লাভ

(শ্লোক ১৯—২৫)

বেদাহং তে ব্যবসিতং হৃদি রাজন্যবালক।
তৎ প্রযচ্ছামি ভদ্রং তে দুরাপমপি সুব্রত॥ ১৯
নান্যৈরধিষ্ঠিতং ভদ্র যদ্ভ্রাজিষ্ণু ধ্রুবক্ষিতি।
যত্র গ্রহর্ক্ষতারাণাং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্।

মেধ্যাং গোচক্রবৎ স্থাস্নু পরস্তাৎ কল্পবাসিনাম্ ॥ ২০
ধর্মোঽগ্নিঃ কশ্যপঃ শক্রো মুনয়ো যে বনৌকসঃ।
চরন্তি দক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তো যৎ সতারকাঃ॥ ২১
প্রস্থিতে তু বনং পিত্রা দত্ত্বা গাং ধর্মসংশ্রয়ঃ।
ষট্‌ত্রিংশদ্‌বর্ষসাহস্রং রক্ষিতাঽব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২২
ত্বদ্‌ভ্রাতর্যুত্তমে নষ্টে মৃগয়ায়াং তু তন্মনাঃ।
অন্বেষন্তী বনং মাতা দাবাগ্নিং সা প্রবেক্ষ্যতি॥ ২৩
ইষ্ট্বা মাং যজ্ঞহৃদয়ং যজ্ঞৈঃ পুষ্কলদক্ষিণৈঃ।
ভুক্ত্বা চেহাশিষঃ সত্যা অন্তে মাং সংস্মরিষ্যসি॥ ২৪
ততো গন্তাসি মৎস্থানং সর্বলোকনমস্কৃতম্।
উপরিষ্টাদৃষিভ্যস্ত্বং যতো নাবর্ততে যতিঃ॥ ২৫

সরলার্থ—শ্রীভগবান বললেন—শোভনব্রতধারী হে রাজকুমার ! আমি তোমার হৃদয়ের সংকল্প কী, তা জানি। যদিও সেই পদ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন তবুও আমি তোমাকে তা প্রদান করছি। তোমার কল্যাণ হোক॥ ১৯ ॥ যে তেজোময় অবিনশ্বর লোকে আজ পর্যন্ত কেউ অধিষ্ঠিত হতে পারেনি, যার চতুর্দিকে গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কসমূহের জ্যোতিশ্চক্র মেধীর (বন্ধনস্তম্ভের) চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ গবাদি-পশুর মতো নিত্য পরিভ্রমণ করে চলেছে, আবার অবান্তর-কল্প-পর্যন্ত স্থায়ী লোকসমূহের বিনাশ হলেও যা বিদ্যমান থাকে এবং তারকাসমূহের সঙ্গে ধর্ম, অগ্নি, কশ্যপ, শুক্র এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভৃতি প্রধান জ্যোতিষ্কগুলি যাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, আমার সেই (ধ্রুব) লোক আমি তোমার জন্য নির্দিষ্ট করলাম॥ ২০-২১ ॥ ইহলোকে তোমার পিতা তোমার হাতে পৃথিবীর ভার অর্পণ করে (বানপ্রস্থ অবলম্বনে) বনে চলে গেলে তুমি ছত্রিশ হাজার বছর ধর্মপথে থেকে পৃথিবীকে পালন করবে। এই সময়ের মধ্যে তোমার ইন্দ্রিয় শক্তির কোনো হানি ঘটবে না॥ ২২ ॥ ভবিষ্যতে কোনো এক সময় তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং তার মাতা সুরুচি পুত্রস্নেহে ব্যাকুল হৃদয়ে তার অন্বেষণে বনে গিয়ে দাবানলের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে॥ ২৩ ॥ যজ্ঞ আমার অতি প্রিয় মূর্তি। তুমি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বহুসংখ্যক যজ্ঞের দ্বারা আমার অর্চনা করবে এবং তার ফলে ইহলোকে

সর্বপ্রকার সুখ ভোগ করে অন্তকালে আমাকে স্মরণ করবে॥ ২৪ ॥ অনন্তর তুমি সর্বলোকের বন্দনীয়, সপ্তর্ষিগণেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত আমার পরম ধামে গমন করবে, যেখানে গেলে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না॥ ২৫ ॥

মূলভাব—বালক ধ্রুব যদিও পিতার দুর্ব্যবহারে ও বিমাতার দুঃসহ বাক্যে ব্যথিত হয়ে সকামভাবে অর্থাৎ অত্যুৎকৃষ্ট পার্থিব পদ লাভের জন্য সংকল্প করে শ্রীভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কিন্তু দেবর্ষি নারদ স্বয়ং গুরু হয়ে তাঁকে যে সাধনায় দীক্ষিত করেছিলেন, তার মাহাত্ম্যগুণে এবং শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভের প্রভাবে, বালক ধ্রুবের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ভক্তির বীজ এমনভাবে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল যে, তখন তাঁর আর মান, অভিমান বলে কিছুই রইল না, শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র সারবস্তু বলে জ্ঞান হল।

অন্তর্যামী শ্রীভগবান ধ্রুবর পূর্বাপর সমস্ত মনোভাবই অবগত আছেন, সুতরাং এইরূপ ভক্তকে তিনি কিরূপে, তাঁর ভজনানন্দরূপ পরমার্থ ফল থেকে বঞ্চিত করে কেবল কাম্যফল প্রদান করে ক্ষান্ত হবেন ? তা কখনই সম্ভবপর নয়। আবার কেবল পারমার্থিক ফল প্রদান করে তাঁকে কৃতার্থ করবেন, এটিও জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধে হয়।

ভগবান যে গীতায় বলেছেন—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' (গীতা ৪।১১)

ফল কামনা করে (সকাম ভক্তি) কর্ম করলে তদ্দ্বারা অবশ্যই অদৃষ্ট সৃষ্টি হয় এবং এইরূপ কর্ম দ্বারা অর্জিত কর্মফল (তা পুণ্যই হোক বা পাপই হোক) ভোগ করতেই হবে। ভোগ ব্যতীত এই অর্জিত সকাম ফল কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। **'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্প কোটিশতৈরপি'**(মহাভারত)। এইভাবে কর্মজনিত সৃষ্ট পাপ-পুণ্যের ভোগ না হলে জীবভাবের নিবৃত্তি ও পরমভাবের প্রাপ্তি হয় না। লীলাময়ের এই প্রকার নিয়ম-শৃঙ্খলায় জাগতিক লীলা সাধিত হয়। এক্ষেত্রে ধ্রুব যে উৎকৃষ্ট পদ লাভ কামনায় সংকল্প করে সাধনা করেছেন এবং তজ্জন্য যে কাম্যফল বা অদৃষ্ট সৃষ্টি হয়েছে সেই সংকল্পিত পদ ভোগ করেই সেই অদৃষ্ট নষ্ট করতে হবে। অথচ ধ্রুব হলেন পরম ভক্ত, তাই

ভোগের ক্ষেত্রটি এমন মাহাত্ম্যসম্পন্ন হতে হবে যে তার মধ্যে অবস্থিত থেকেও তার মানসিক বৃত্তি কোনভাবেই যেন কাম্যফলের জন্য লালায়িত না হয়ে সর্বদা পরমার্থের প্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। এই প্রকার বিবেচনা করে পরম মঙ্গলময় ভগবান ধ্রুবর জন্য ঐহিক ও পারত্রিক এই উভয় প্রকার ব্যবস্থাই করলেন।

তাই শ্রীভগবান প্রথমেই ধ্রুবকে সম্বোধন করছেন— 'রাজন্য বালক'। অর্থাৎ হে ক্ষত্রিয়কুমার ! এই সম্বোধনের তাৎপর্য এই যে, ক্ষত্রিয়গণ রাজসিক ভাবাপন্ন, সুতরাং মান, ঐশ্বর্যস্পৃহা, উচ্চপদাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি তাদের স্বাভাবিক ধর্ম। অতএব তোমার ন্যায় নিরপরাধ, তেজস্বী, সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির ওই সকল ঐহিক মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক, না হলে লৌকিক দৃষ্টান্তে সতের উপযুক্ত আদর্শ থাকবে কিভাবে ? সেইজন্য তোমার সংকল্প অনুযায়ী তুমি 'ধ্রুবলোক' নামক এক অপূর্ব স্থান প্রাপ্ত হবে। আবার তারও আগে তুমি পিতৃদত্ত রাজ্য প্রাপ্ত হয়ে ছত্রিশ হাজার বৎসর পর্যন্ত তা কর্মক্ষম অবস্থায় ভোগ করবে। আর ধ্রুবর বিমাতার কথা বলতে গিয়ে ভগবান বলছেন—সুরুচি, যে বিনা অপরাধে ঈর্ষাবশত তোমার আর তোমার মার প্রতি নিদারুণ ব্যথা দিয়েছে তিনিও দুর্গতি প্রাপ্ত হবেন। তোমার বৈমাত্রেয় ভাই 'উত্তম' মৃগয়া করতে গিয়ে বিনষ্ট হলে তোমার বিমাতা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে তাকে খুঁজতে গিয়ে দাবানলের মধ্যে পড়ে মারা যাবেন। যদিও এদের এইরূপ শোচনীয় দশা ধ্রুবর বিন্দুমাত্র কাম্য নয়, তথাপি দুষ্টের সমুচিত দণ্ডের প্রদান করাও যে মঙ্গলময়ের বিধান। তাই ভগবান এইরূপ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হলেন। মূল কথা হল, কর্ম অনুসারে শুভাশুভ ফলভোগের উজ্জ্বল আদর্শ যে ধ্রুব ও সুরুচির জীবনে ঘটবে ভগবান তা বুঝিয়ে দিলেন।

অতঃপর পারত্রিক মঙ্গলের কথা বলতে গিয়ে ভগবান বলছেন—

'ইষ্ট্বা মাং যজ্ঞহৃদয়ং যজ্ঞৈঃ পুষ্কলদক্ষিণৈঃ' (ভাগবত ৪।৯।২৪)

হে বৎস ! আমি স্বয়ং যজ্ঞমূর্তি, যজ্ঞ (ত্যাগ) আমার অতি প্রিয় বস্তু, সুতরাং তুমি রাজ্য-শাসনকালে বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার প্রীতিসাধনও করবে। এইভাবে যখন তোমার জীবনে শেষদশা উপস্থিত হবে তখন আবার

আমার কথা তোমার মনে পড়বে। আমি যে 'পরম পুরুষার্থ' এই ভাবনা তোমার মনকে অধিকার করবে এবং তখন ধ্রুবলোকে তোমার গতি হবে। সে স্থান অতি উত্তম, আমি তা নিজের স্থান বলে মনে করি এবং এটি প্রলয়েও নষ্ট হবে না। ধ্রুব শব্দের অর্থ অবিনশ্বর, এইজন্য তাকে 'ধ্রুবলোক' অর্থাৎ অবিনশ্বর ক্ষেত্র বলা যায়। এই স্থানে গমন করলে আর পতনের আশঙ্কা নেই—**'যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'** (গীতা ১৫।৬)। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান ধ্রুবর প্রতি সমধিক প্রীতিবশত যে অনন্য-সুলভ উচ্চপদ নির্দেশ করেছেন সেটি স্বীয় বৈকুণ্ঠধামের ন্যায় নিত্য আনন্দময় ও নিজের লীলাক্ষেত্রস্বরূপ উত্তম স্থান।

বর প্রদানের ফল—যাই হোক, ভগবান শ্রীহরি ধ্রুবকে এইরূপ বরদান করে স্বস্থানে প্রস্থান করলে ধ্রুব আবার পিতৃভবনে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু মৈত্রেয় মুনি বলছেন— **'নাতিপ্রীতোঽভ্যগাৎ পুরম্'** (ভাগবত ৪।৯।২৭) অর্থাৎ ভক্ত ধ্রুব তপস্যায় বরলাভ করে ফিরলেন বটে কিন্তু মনে তত প্রীতি লাভ করলেন না। এখানে মনে হতে পারে যে কত জন্মজন্মান্তরের তপস্যা করেও যা পাওয়া যায় না, ভগবৎ দর্শন লাভ হয় না, ধ্রুবলোকের ন্যায় ভগবৎস্থানও লাভ করা যায় না তাহলে ভক্ত ধ্রুবর প্রীতি না হওয়ার কারণ কী ?

পরবর্তী ছয়টি শ্লোকে (৩০-৩৫) ধ্রুব তাঁর আত্মগ্লানির কথা উল্লেখ করেছেন। ধ্রুব বিমাতার দুর্বাক্যে ব্যথিত হয়ে অভিমানভরে শ্রীভগবানের আরাধনা করতে এসেও সেই ব্যথা ভুলতে পারেননি ; এজন্য তিনি উচ্চতম পদ অভিলাষের জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু যখন নারদের উপদেশে তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন তখন ক্রমশ তাঁর মনের মালিন্য দূর হতে থাকল আর যখন শ্রীভগবানের দর্শন-স্পর্শন প্রাপ্ত হলেন তখন তিনি পূর্ণ বিবেক প্রাপ্ত হলেন। ভক্তির প্রবল তরঙ্গে তাঁর মধ্যে থেকে মান-অভিমান প্রভৃতি আবর্জনা সকল, তৃণের ন্যায় ভেসে গেল— **'ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাম্'**। তখন তিনি পরম ভক্তজনোচিত প্রার্থনাই জানিয়েছেন, কোনো ভোগ্যবস্তুর প্রার্থনা একবারও প্রকাশ করেননি। শ্রীভগবান ধ্রুবর পূর্বাপর সকল অবস্থা বুঝে তাঁকে এমন বর দিলেন যাতে তাঁর

কাম্য যে উচ্চপদ তাও ভোগ করা হবে আবার ভক্তর পরমার্থ যে ভগবৎ পাদপদ্মসেবা, তাও লাভ হবে।

পরমভক্ত ধ্রুব শ্রীভগবানের অসাধারণ প্রীতিপ্রদত্ত এই বরের মর্ম বোঝেননি এমন নয়, কারণ তিনি 'অর্থবিৎ' অর্থাৎ ভগবদ্দর্শন হওয়ার ফলে সার-অসার সমস্ত তত্ত্বই তাঁর জ্ঞানগোচর হয়েছে। তাঁর বর্তমান মানসিক অতৃপ্তির কারণ হল তাঁর আত্মনির্বেদ। প্রথমে তিনি বিমুক্তি অর্থাৎ ভক্তোচিত শ্রীভগবৎ সেবারূপ পরমার্থর দিকে লক্ষ্য করতে পারেননি। অভিমানে মত্ত ও প্রতিহিংসায় উদ্দীপ্ত হয়ে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সর্বান্তর্যামী শ্রীভগবান সবই বুঝেছিলেন, তাই তিনি ধ্রুবকে বরপ্রদানকালে বলছেন—

ত্বদ্‌ভ্রাতর্যুত্তমে নষ্টে মৃগয়ায়াং তু তন্মনাঃ।
অন্বেষন্তী বনং মাতা দাবাগ্নিং সা প্রবেক্ষ্যতি॥

(ভাগবত ৪।৯।২৩)

অর্থাৎ ভক্তকে মনোকষ্ট দেওয়ার অপরাধে ধ্রুবর বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাই-এর বিষম পরিণামের কথা উল্লেখ করেছেন। ভক্ত ধ্রুব তাই তাঁর পূর্বকৃত অভিমানবশত রাজ্যলাভের বাসনা ও সাম্যতার অভাববশত বিমাতার ওপর ক্ষোভের কথা চিন্তা করে নিজ আত্মগ্লানিবশত নিজের ওপর নিজেরই অপ্রীতি জন্মেছে। ধ্রুব ভাবছেন—

অহো বত মমানাত্ম্যং মন্দভাগ্যস্য পশ্যত।
ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্বাযাচে যদন্তবৎ॥

(ভাগবত ৪।৯।৩১)

অর্থাৎ হায় হায় ! আমি এতই অসৎ যে, দেবর্ষি নারদের সারগর্ভ উপদেশ বাক্যগুলি প্রতিপালন করিনি। মনে হয় দেবগণকর্তৃক অধঃপতন যুক্ত হয়ে আমি আমার বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট করে ফেলেছিলাম। শ্রীভগবান সংসারবন্ধন নাশ করতে সর্বসমর্থ অথচ আমি এমন হতভাগ্য যে তাঁর নিকট অসার ভোগবস্তু প্রার্থনা করেছি—**'ময়েতৎ প্রার্থিতং ব্যর্থং চিকিৎসেব গতায়ুষি'** (ভাগবত ৩।৯।৩৪)। আমার প্রার্থনা মৃতের চিকিৎসা করার ন্যায় একান্ত ব্যর্থ।

এইভাবে বিমর্ষ চিত্তে ধ্রুব পিতৃভবন ফিরে আসছেন শুনে রাজা

উত্তানপাদের প্রাণ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণসহ ধ্রুবকে আমন্ত্রণ করার জন্য দ্রুতবেগে রথে গমন করলেন। তাঁর দুই রাণী সুনীতি, সুরুচি এবং উত্তমও তাঁকে অনুসরণ করলেন। কিয়দ্দূর থেকে ধ্রুবকে দেখতে পেয়ে রাজা দ্রুতবেগে রথ থেকে নেমে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। ধ্রুবও পিতা, দুই মাতাকে প্রণাম করলেন। বিমাতা সুরুচি ধ্রুবকে দুই হাত ধরে উঠিয়ে বাষ্প গদগদ কণ্ঠে বললেন—বৎস দীর্ঘজীবী হও। মাত্র ছয়মাস পূর্বে যে সুরুচি ধ্রুবের প্রতি অমানুষিক বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন তাঁর কেন আজ এ পরিবর্তন। কে তাঁর কঠিন প্রাণে এ কোমলতা সৃষ্টি করল। শ্রীমৈত্রেয় মুনি বলছেন—

যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ।
তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্॥

(ভাগবত ৪।৯।৪৭)

অর্থাৎ জল যেমন স্বতঃই নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরকম ভগবান শ্রীহরি মৈত্রী প্রভৃতি গুণে যাঁর প্রতি প্রসন্ন হন, প্রাণিবর্গ সকলেই আপনা হতেই তাঁহার নিকট নত হয়ে থাকে। সুতরাং ধ্রুবের প্রতি প্রসন্ন হয়ে শ্রীভগবান তাঁকে যে মহিমান্বিত করেছেন, সেই মহিমাবশতই সুরুচির এই পরিবর্তন। এইরূপে ধ্রুব ক্রমশ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সকলেই তাঁর গুণগ্রামে মুগ্ধ হলেন। অবশেষে রাজা উত্তানপাদ বৃদ্ধ হলে ধ্রুবর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রস্থান করলেন।

ধ্রুবের রাজত্বকালে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই উত্তমের যক্ষের হাতে মৃত্যু হয়। ক্রুদ্ধ ধ্রুব তখন বহু যক্ষকে বধ করেন। অতঃপর নিজ পিতামহ মনুর উপদেশ অনুসারে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হন। যক্ষদের অধিপতি কুবের বরপ্রদানে উদ্যত হলে ধ্রুবর পূর্ব ভগবৎ স্মৃতি ভাব পূর্ণভাবে ফিরে এল। তিনি বর চাইলেন—

'হরৌ স বব্রেঽচলিতাং স্মৃতিং যয়া তরত্যযত্নেন দুরত্যয়ং তমঃ'।

(ভাগবত ৪।১২।৮)

হে কুবের ! আমাকে এই বরপ্রদান করুন যাতে শ্রীহরির প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে, কারণ তাঁর স্মৃতি দ্বারা দুস্তর সংসার সমুদ্র পার হওয়া যায়।

অতঃপর ধ্রুব ভগবৎ কথা নিরন্তর স্মরণপূর্বক প্রজারঞ্জন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানসহ রাজ্যপালন করতে লাগলেন। ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠান এইভাবে করতে করতে ধ্রুবর পবিত্র অন্তঃকরণে ভক্তিভাব এইরূপ পরিবর্ধিত হয়ে উঠল যে কী অন্তরে কী বাহিরে তাঁর ভগবান ব্যতীত আর কোনো ধারণার বিষয়ই রইল না। ধ্রুব কর্মযোগ সহকারে এইরূপ কর্ম করলেন—

ষট্‌ত্রিংশদ্ বর্ষসাহস্রং শশাস ক্ষিতিমণ্ডলম্।
ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং কুর্বন্নভোগৈরশুভক্ষয়ম্॥

(ভাগবত ৪।১২।১৩)

অর্থাৎ ধ্রুব মহারাজ ছত্রিশ হাজার বৎসর অতি সুষ্ঠুভাবে রাজ্য প্রতিপালন করলেন, যাতে শ্রীভগবান-প্রীতি ভিন্ন অন্য কোনোরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা ছিল না। এর ফলে তাঁর প্রাক্তন শুভাশুভ সকল প্রকার কর্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হল, নতুন কোনো অদৃষ্টও আর আক্রমণ করতে পারল না। মহাত্মা ধ্রুব এই কর্মজীবনে ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গকেই জিতেন্দ্রিয়ভাবে অনাসক্ত-চিত্তে পালন করে কালক্রমে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করলেন। অতঃপর ধ্রুব শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র বদরিকাশ্রমে গমনপূর্বক ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর সাধনকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে—

তস্যাং বিশুদ্ধকরণঃ শিববার্বিগাহ্য
বদ্ধ্বাহসনং জিতমরুন্মনসাহহৃতাক্ষঃ।
স্থূলে দধার ভগবৎপ্রতিরূপ এতদ্
ধ্যায়ংস্তদব্যবহিতো ব্যসৃজৎ সমাধৌ॥

(ভাগবত ৪।১২।১৭)

ধ্রুব অষ্টাঙ্গযোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি বদরিকাশ্রমের বিশুদ্ধ জলে ইন্দ্রিয়বর্গকে বিশুদ্ধ করলেন, আসন রচনাপূর্বক প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুকে সংযত করলেন, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গকে আকর্ষণপূর্বক অন্তর্মুখে নিবিষ্ট করলেন এবং তারপর শ্রীভগবানের বিরাটমূর্তি মনোমধ্যে ধ্যান করতে করতে ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সমাধিতে প্রবিষ্ট হয়ে ধ্যানও পরিত্যাগ করলেন।

শ্লোকটিতে অষ্টাঙ্গ সাধনের বিভিন্ন অঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

শিববার্বিগাহ্য অর্থাৎ পবিত্র জলে স্নান বা নিয়মতৎপরতা এবং **বদ্ধাসনং** অর্থাৎ আসন গ্রহণ করা।

জিতমরুৎ অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুকে বশীভূত করা।

মনসাহৃতাক্ষ অর্থাৎ মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় থেকে আকর্ষণপূর্বক অন্তর্মুখে নিবিষ্ট করা বা প্রত্যাহার।

স্থূলে দধার ভগবৎ প্রতিরূপে অর্থাৎ ভগবানের বিরাটমূর্তি মনের মধ্যে ধারণা করলেন।

ধ্যায়ন্—অর্থাৎ সেই মূর্তিতে ধ্যান করতে করতে ভগবানের সঙ্গে নিজের আর কোনো পার্থক্য রইল না।

সমাধৌ তৎ ব্যসৃজৎ অর্থাৎ সমাধি স্তরে পৌঁছে ধ্রুব মহারাজ সেই স্থূলরূপের ধ্যানও পরিত্যাগ করলেন।

সমাধি দুই প্রকারের হয় সবীজ ও নির্বীজ। যতক্ষণ ধ্যানকর্তা ধ্যান, ধ্যেয় ও নিজের মধ্যে পার্থক্য বোধ দূর করতে পারেন না, ততক্ষণ যে সমাধি তা সবীজ সমাধি ; আর যখন ওই পার্থক্যবোধও থাকে না, কেবল ধ্যেয়পদার্থই ধ্যানে ভাসমান হন তখন যে সমাধি তা নির্বীজ সমাধি। মহর্ষি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে এদের সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নামেও বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ সবীজ সমাধি প্রথমে হয় আর পরে চিত্তের চরম একাগ্রতায় অর্থাৎ সবীজ সমাধির নিরোধপূর্বক যাবতীয় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে যে সমাধি হয় তাই নির্বীজ সমাধি। ধ্রুবেরও যে চরম সমাধি হয়েছিল তা '**তদব্যবহিতো ব্যসৃজৎ সমাধৌ**' এই শ্লোকাংশে বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে সমাধিমগ্ন হওয়ায় একমাত্র শ্রীহরি ভিন্ন আর তাঁর কিছুই জ্ঞানের বিষয় রইল না।

বিক্লিদ্যমানহৃদয়ঃ পুলকাচিতাঙ্গো নাত্মানমস্মরদসাবিতি মুক্তলিঙ্গঃ।

(ভাগবত ৪।১২।১৮)

ভগবান শ্রীহরির প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভক্তিধারায় আপ্লুত হয়ে ধ্রুব মুহুর্মুহুঃ আনন্দাশ্রু প্রবাহে অভিভূত হতে লাগলেন, তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল, চিত্ত দ্রবীভূত হল, দেহাভিমান দূরীভূত হল আর এজন্য 'আমি' বলে চিন্তাও

রইল না।

এই সময় তিনি দেখতে পেলেন আকাশ থেকে একটি দিব্যরথ আস্তে আস্তে তাঁর দিকে নেমে আসছে। এই রথের মধ্যে চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ, কিরীট কুণ্ডলধারী দুইজন দেবতা রয়েছেন। এঁদের দেখেই ধ্রুব বুঝলেন এঁরা ভগবানের প্রধান অনুচর। এঁদের নাম সুনন্দ ও নন্দ। তাঁরা বললেন, মহারাজ ধ্রুব ! আজ বড়ই শুভদিন। আমরা ভগবানের কিঙ্কর, তাঁরই আদেশে আপনাকে শ্রীভগবৎস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। আপনার পূর্বপুরুষ বা অন্যান্য কোনো ব্যক্তিই যে স্থান লাভ করতে সক্ষম হননি, এই রথে আরোহণপূর্বক আপনি সেই ধামে গমন করবেন। মহারাজ ধ্রুব রথটিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক রথে আরোহণ করলেন, এই সময় তাঁর স্বীয় জননী সুনীতির কথা মনে পড়ে গেল। শ্রীভগবানের কিঙ্করদ্বয়ও ভগবানের মতো অন্তর্যামী, তাঁরা তৎক্ষণাৎ ধ্রুবকে সামনের দিকে তাকাতে বললেন আর ধ্রুব দেখলেন তাঁর মাতাও এক তেজ প্রদীপ্ত মূর্তিতে অন্য একটি রথে আগে আগে যাচ্ছেন। ধ্রুবের আর চিন্তা রইল না তিনি রথে আরোহণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এমন সময় ধর্মরাজ যম এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, মহারাজ এই পৃথিবীতে জন্ম নিলে আমাকে অঙ্গীকার না করে কেউ পৃথিবী ত্যাগ করতে পারে না। আপনি বিধাতার এই নিয়ম লঙ্ঘন করবেন না। এই বলে ধর্মরাজ নতমস্তকে অবস্থান করে মহারাজ ধ্রুবকে বললেন, আপনি আপনার উত্তরীয়খানি আমার মস্তকে দিয়ে তার ওপর আপনার পা স্থাপন করে রথে আরোহণ করুন।

'তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্।
মৃত্যোর্মূর্দ্ধি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্॥'

(ভাগবত ৪।১২।৩০)

অর্থাৎ সেই সময় উত্তানপাদনন্দন ধ্রুব মৃত্যুকে উপস্থিত দেখে তার মস্তকে স্বীয় পদদ্বয় স্থাপনপূর্বক সেই উত্তম বিমানে আরোহণ করলেন। চারিদিকে মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি, আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ শুভ সূচনা অনুভব

করতে করতে ধ্রুব ক্রমশ ত্রিভুবন ও সপ্তর্ষিমণ্ডল অতিক্রম করে সেই পরমপবিত্র ভগবদ্ধামে উপস্থিত হলেন।

ইতি উত্তানপদঃ পুত্রো ধ্রুবঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ।
অভূৎ ত্রয়াণাং লোকানাং চূড়ামণিরিবামলঃ॥
(ভাগবত ৪।১২।৩৮)

পরম ভাগবত উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব এইরূপে ত্রিভুবনের নির্মল চূড়ামণিস্বরূপ হয়েছিলেন। শ্রীভক্তপ্রবর ধ্রুবর এই পূতচরিত বর্ণনা করে এই আখ্যানের অন্তে মৈত্রেয় মুনি বলছেন—

জ্ঞানমজ্ঞাততত্ত্বায় যো দদ্যাৎ সৎপথেঽমৃতম্।
কৃপালোর্দীননাথস্য দেবাস্তস্যানুগৃহ্ণতে॥
(ভাগবত ৪।১২।৫০)

যে সাধুপুরুষ ভগবদ্‌ভক্তিতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ধ্রুব চরিতরূপী অমৃততুল্য, সৎপথ-বিষয়ক জ্ঞান দান করেন, সেই অধম তারণ সাধুপুরুষের প্রতি সকল দেবতারাই অনুগ্রহপরায়ণ হয়ে থাকেন।

———o———

পৃথুর আখ্যান ও স্তুতি

চতুর্থ স্কন্ধ (ত্রয়োদশ-ত্রয়োবিংশ অধ্যায়)

প্রাক্‌কথন

মহামুনি মৈত্রেয় ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ে ধ্রুবচরিত্র বর্ণনা করেছেন। ধ্রুব চরিত্রের শেষাংশে মহামুনি মৈত্রেয় বলছেন, ভগবান নারদ ধ্রুবলোকের মহিমা দেখে প্রচেতাদের যজ্ঞে ধ্রুবর এই মহিমাগান করেছিলেন। সেকথা শুনে মহামূর্তি বিদুর মৈত্রেয়কে প্রচেতাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। মৈত্রেয় তখন বলছেন, ধ্রুবর বংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ হচ্ছেন অঙ্গ, তাঁর পুত্র বেন এবং বেনের থেকে পৃথুরাজের উৎপত্তি হয়। আর প্রচেতাগণ হলেন পৃথুরাজের পৌত্রের পৌত্র। পৃথুরাজ হলেন ভগবানের অংশ আর এই পৃথুচরিত্র বহু ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাই মৈত্রেয়

মুনি পরবর্তী এগারোটি অধ্যায়ে (১৩-২৩) এঁর চরিত্রকথা বর্ণনা করেছেন।

ধ্রুবর বংশে রাজর্ষি অঙ্গ অতি সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-ভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর বেন নামে যে পুত্র জন্মেছিল সে ছিল অত্যন্ত দুর্বৃত্ত। তার স্বভাবে বিরক্ত হয়ে মহারাজ অঙ্গ গৃহত্যাগ করেন এবং বেন রাজাও ব্রহ্মশাপে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা অঙ্গ যদিও ইহজন্মে অতিশয় সুকৃতিশালী ছিলেন কিন্তু তাঁর পূর্বে পূর্বে এমন জন্মান্তরীণ সুকৃতি ছিল না যে তিনি উত্তম পুত্র লাভ করেন! ভগবান কারও সাধনা ব্যর্থ করেন না, সকলকেই স্ব স্ব কর্মানুসারে ফল প্রদান করেন, কিন্তু সকল বিষয়ে কেবল এক জন্মের কর্মে পূর্ণফল পাওয়া যায় না, ঐহিক সুকৃতির সঙ্গে উত্তম প্রাক্তনেরও যোগ থাকা চাই। রাজর্ষি অঙ্গর পুত্রের সুখোপযোগী প্রাক্তন অদৃষ্ট ভাল ছিল না। তাই ঐহিক সাধনার ফলে রাজসুখ ও পুত্রলাভ হলেও তা তাঁর সুখের কারণ হল না। পুত্র বেন বাল্যকালাবধি তার মাতামহ—যার অধর্মের অংশে জন্ম, তার অনুগামী হল। রাক্ষসরাজ রাবণও যেমন পুলস্ত্য মুনির বংশধর হলেও **'মাতামহস্য দোষেণ রাক্ষসোঽভূদ্দশানন'**। মাতামহের দোষে দশানন রাক্ষস ভাবাপন্ন হয়েছিল। বেনের অবস্থাও ওইরূপ দাঁড়াল। মাতামহের ধারা হতে অধর্মবৃত্তি এসে তার মধ্যে সংক্রামিত হল। তার স্বভাব এমন দুষ্ট হয়েছিল যে, তার পিতা গৃহত্যাগ করলেন এবং মুনিগণ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে অভিশাপে বিনাশ করতে বাধ্য হলেন। ধর্ম ও অধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, কিরূপ সূত্রে কোথায় কোনটি উপনীত হয়, তা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। আমরা মুগ্ধ মানব, মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করতে আমাদের বুদ্ধি অক্ষম, কিন্তু মহারাজ অঙ্গ পুণ্যবলে চিত্তের নির্মলতা লাভ করেছিলেন ও প্রকৃত পথ বুঝবার মতো শক্তি অর্জন করেছিলেন। তাই প্রথমত পুত্রের অভাবে ও পরে পুত্রের দৌরাত্ম্যে তাঁর ক্ষণিক ব্যাকুলতা আসলেও শ্রীভগবানের কৃপায় অচিরেই তাঁর ব্যাকুলতা কেটে গেল আর সংসারের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয় মধ্যে ফুটে উঠল। তিনি অনায়াসে বুঝতে পারলেন যে—এ সকলই শ্রীভগবানের খেলামাত্র, তিনি কৃপা করে যেভাবে চালাচ্ছেন, তা মঙ্গলেরই জন্য। এইরূপ বিবেকের বশেই মহারাজ অঙ্গ রাজ্য-সম্পদ, পত্নী সকল বিষয় উপেক্ষা করেই গভীর রজনীতে গৃহত্যাগ করে বনে চলে

গেলেন। মন্ত্রী পুরোহিতগণ ব্যাকুল হয়ে মুনিগণের নিকট শরণাপন্ন হয়ে রাজার নিরুদ্দেশ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করলেন।

সর্বদা বিশ্বের মঙ্গল চিন্তা-করা মুনিগণের প্রধান ব্রত। তাই ভৃগু প্রমুখ মুনিগণ অঙ্গর নিরুদ্দেশ শ্রবণ করে ভাবলেন, অবিলম্বে একজন রাজা করা প্রয়োজন, নতুবা রাজ্যরক্ষা করবে কে ? এইরূপ বিবেচনা করে বেনের মাতা সুনীথাকে ডেকে, তাঁর সম্মতি নিয়ে বেনকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। উপদেশ দিলেন— হে বেন ! ধর্ম সন্তুষ্ট হলেই ভগবান সন্তুষ্ট হন আর তিনি সন্তুষ্ট হলে কিসের অভাব ? জগতে কী এমন আছে যা তাঁর কৃপায় সম্ভব না হয়। এইজন্য প্রজাবর্গের ধর্মরক্ষা করা রাজার পরম কর্তব্য। আমরা প্রার্থনা করি, তুমি কখনো কর্তব্য লঙ্ঘন করে প্রজাদের কোনো বিঘ্ন উৎপাদন কোরো না, তাদের ধর্মপথের প্রতিকূল কোনো আচরণ কোরো না, তাহলে সকল দেবতা ও স্বয়ং ভগবানও পরিতুষ্ট হবেন।

'তস্মিংস্তুষ্টে কিমপ্রাপ্যঃ জগতামীশ্বরেশ্বরে' (ভাগবত ৪।১৪।২০)

কিন্তু মুনিগণের শত উপদেশেও বেনের ফলোদয় হল না তিনি শতগুণ ক্রুদ্ধ হয়ে কেবল তাঁদের প্রতিই অত্যন্ত দুর্বাক্য ব্যবহারই করলেন না, ভগবান শ্রীহরির প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করলেন। বেন বললেন, হে ব্রাহ্মণগণ ! মনে রাখবেন রাজাই সকল দেবতার স্বরূপ, আপনারা ভগবানকে ত্যাগ করে আমারই আরাধনা করুন, আমাকেই আরাধ্য মানুন। তখন ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন—

নায়মর্হত্যসদ্‌বৃত্তো নরদেববরাসনম্।
যোঽধিযজ্ঞপতিং বিষ্ণুং বিনিন্দত্যনপত্রপঃ॥

(ভাগবত ৪।১৪।৩২)

যে নির্লজ্জ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির নিন্দা করে, সেই দুর্বৃত্ত বেন রাজসিংহাসন লাভের কখনই উপযুক্ত নয়।

তাঁরা চিন্তা করলেন, এই দুরাত্মা বেশিদিন রাজা থাকলে পাপানলের প্রবলগ্রাসে বিশ্ব ছারখার হয়ে যাবে, সুতরাং একে বিনাশ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তাঁদের প্রচ্ছন্ন ক্রোধানল জেগে উঠল এবং এক প্রচণ্ড হুঙ্কারেই

বেন বিনষ্ট হলেন। এ তো হুঙ্কার নয়, নিয়তিই যেন বেনের মৃত্যুর কারণ হল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলেছেন— **'নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্'** অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোদ্ধারা পূর্ব হতেই নিহত হয়েছে, তুমি কেবল এদের মৃত্যুর কারণে নিমিত্তমাত্র হও।

বেনের মৃত্যুর পর মুনিগণ চিন্তিত হলেন। মহারাজ অঙ্গের আর কোনো বংশধর নেই, অন্য কাকেও রাজা করলে এই পবিত্র বংশ লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই মুনিগণ অঙ্গের বংশ রক্ষা করতে সেই বেনের মৃতদেহ অবলম্বন করে তার উরুদেশ মন্থন করলে বেনের পাপরাশি নিয়ে এক পুত্র জন্ম নেয় যার দ্বারা নিষাদ জাতির উৎপত্তি।

মুনিগণ শ্রীভগবানের সেবায় সমর্পিত প্রাণ তাই তাঁদের সদিচ্ছা যে ভগবান পূরণ করবেন এতে আর সন্দেহ কী ? সুতরাং মুনিরা বেনের হস্তদ্বয় আবার মন্থন করলে লোকরক্ষার জন্য ভগবান স্বয়ং তাঁর অংশে পুরুষরূপে ও লক্ষ্মীর অংশ স্ত্রীরূপে আবির্ভূত হলেন। মুনিগণ পুরুষটির নাম পৃথু ও স্ত্রীটির নাম অর্চি রেখে তাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থির করলেন।

ব্রহ্মা জগদ্গুরুর্দেবৈঃ সহাসৃত্য সুরেশ্বরৈঃ।
বৈন্যস্য দক্ষিণে হস্তে দৃষ্ট্বা চিহ্নং গদাভৃতঃ॥
পাদয়োররবিন্দঞ্চ তং বৈ মেনে হরেঃ কলাম্।
যস্যা প্রতিহতং চক্রমংশঃ স পরমেষ্ঠিনঃ॥

(ভাগবত ৪।১৫।৯-১০)

জগদগুরু ব্রহ্মা তখন দেবগণ ও দেবাধিপতিগণকে সঙ্গে নিয়ে আগমনপূর্বক পৃথুর দক্ষিণ হস্তে শ্রীহরির চক্রাকৃতি সুদর্শন চিহ্ন ও চরণদ্বয়ে পদ্মতুল্য রেখা দেখে সেই যুগলমূর্তি ভগবানেরই প্রত্যক্ষস্বরূপ বলে বুঝলেন। অতঃপর ভৃগু প্রমুখ মুনিগণ কর্তৃক রাজধর্মে দীক্ষিত হয়ে রাজা পৃথু স্বীয় প্রভাবগুণে অগ্নিদেবের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন।

শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতার যেমন—পূর্ণাবতার, অংশাবতার, গুণাবতার ইত্যাদি। যে অবতারে ভগবান স্বীয় সর্বশক্তি প্রকাশ করেন তাই পূর্ণাবতার, যেমন শ্রীকৃষ্ণ। আর যে অবতারে তাঁর আংশিক প্রকাশ তা

অংশাবতার যেমন কপিল, পৃথু ইত্যাদি আর রজ, সত্ত্ব ও তম গুণানুভেদে তাঁর যে প্রকাশ তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপে গুণাবতার ইত্যাদি।

এই অনাদি অনন্ত বিরাট বিশ্বমধ্যে লীলাময় ভগবানের লীলারও ইয়ত্তা নেই, অবতারেরও ইয়ত্তা নেই, যখন যতটুকু আবশ্যক, ভগবান ঠিক ততটুকুই নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। এই অবতার কখনো মনুষ্যভাবে, কখনো দেবরূপে কখনো বা অন্যান্য রূপে হয়ে থাকে। যাই হোক, পৃথুও ভগবানেরই অংশাবতার তাই তাঁর উৎকর্ষতাই বা থাকবে না কেন ? কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও পৃথুর রাজত্বের আরম্ভেই রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় ও অন্নাভাবে কাতর প্রজাগণ তাঁর নিকটে বিলাপ করতে থাকে।

এই অবস্থা দেখে পৃথুর কোমল প্রাণে ভীষণ আঘাত লাগে। তিনি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন যে, পৃথিবী সকল শষ্যের বীজ গ্রাস করেছেন অর্থাৎ বীজগুলির অঙ্কুর উৎপাদিকা শক্তি স্তম্ভিত করে রেখেছেন। এ কথা জানতে পেরে পৃথিবীর প্রতি তাঁর অত্যন্ত ক্রোধ জন্মাল, তিনি ধনুকে বাণ যোজনা করলেন। তখন পৃথিবী ভীতা হয়ে বললেন—'মহারাজ ক্রোধ সংবরণ করুন, আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। শ্রীভগবানের এই বিচিত্র সৃষ্টিরাজ্যে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলময় ফল সিদ্ধির জন্য কতকগুলি উপায় সেই বিশ্বনিয়ন্তাই নির্ধারিত করে রেখেছেন। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ সাধন বলে সেই সকল উপায় অবগত হয়ে শাস্ত্ররূপে তা বিধিবদ্ধ করে রেখেছেন। কিন্তু মহারাজ— **'ভুজ্যমানা ময়া দৃষ্টা অসদ্ভিরধৃতব্রতৈঃ'** অর্থাৎ ব্রহ্মা যে সুজলা শ্যামলা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তা বৈধ আচার-নিয়মহীন জগতের লোকেরাই ভোগ করছে। পৃথিবী দেবী আরো বলেছেন—

অপালিতানাদৃতা চ ভবদ্ভিলোকপালকৈঃ।
চোরাভূতেঽথ লোকেঽহং যজ্ঞার্থেঽগ্রসমৌষধীঃ॥

(ভাগবত ৪।১৮।৭)

অর্থাৎ হে পৃথুরাজ ! আপনারা (অর্থাৎ আপনার পূর্ববর্তী বেনরাজা) রাজ্য পালনে ব্রতী হয়ে আমাকে সম্যক্ পালন ও পোষণ করেননি। সেইজন্য

রাজ্যের প্রায় সকল লোকই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে, যাগ-হোমাদি ধর্মানুষ্ঠান বিলুপ্তপ্রায়। লোকেরা দেবতাদের অনুগ্রহে সম্পদ লাভ করে অথচ কেউই দেবতাদের উদ্দেশে তার কণামাত্রও অর্পণ করে না।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—**'তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ'**, 'দেবতার বস্তু তাকে না দিয়ে যে নিজেই সব ভোগ করে সে চোর'। এইরূপ চোরের সংখ্যাই রাজ্যে অধিক হয়ে উঠেছে। এই সকল কারণে আমি মনে করলাম এর প্রতিকার করা কর্তব্য। তাই আমি সমস্ত ভোগাদির বস্তু গ্রাস করে রেখেছি যাতে এই স্বভাবযুক্ত লোকেদের ভক্ষ্য সংস্থানের অভাব ঘটে ও তাঁরা তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা কর্তব্যপথের অনুসন্ধান করতে বাধ্য হয়। এখন আপনার মতো মহানুভব রাজা যখন রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত তখন অবশ্যই সকল কর্তব্যকর্ম যথাযথভাবে পালিত হবে। **'তত্র দৃষ্টেন যোগেন ভবানাদুমর্হতি'** (ভাগবত ৪।১৮।৮) অতএব আপনি মুনি প্রদর্শিত উপায় দ্বারা আবার আমা হতে তা পাওয়ার চেষ্টা করুন।

তখন মহারাজ পৃথু এবং ত্বদীয় মতানুসরণকারী মুনি, দেবতা, অসুর সকলেই সমুচিত উপায় অবলম্বন করে আবশ্যকীয় ফল প্রাপ্ত করতে লাগলেন। ইহাই পৃথিবীর দোহন বলে কথিত। অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির মুনিগণ বাক্য, মন ও শ্রবণেন্দ্রিয় সংযমে বেদ বিহিত কর্ম প্রকটিত করলেন। আবার দেবগণও বীর্য, ওজঃ ও বল সংযত করে অমৃত প্রকটিত করলেন। এইভাবে রাজা পৃথুর রাজত্বকালে ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণী ভগবৎ প্রেরণায় কার্য করে পৃথিবীর সুষ্ঠু স্বাভাবিক নিয়ম প্রবর্তন করলেন। তাই ভগবান এই স্কন্ধে নিজেই বলেছেন—

যঃ স্বধর্মেণ মাং নিত্যং নিরাশীঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ভজতে শনকৈস্তস্য মনো রাজন্ প্রসীদতি॥

(ভাগবত ৪।২০।৯)

যে ব্যক্তি সর্বদা শ্রদ্ধাসহকারে ও নিষ্কামভাবে স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমের অনুরূপ কর্ম দ্বারা আমার ভজনা করে তার অন্তঃকরণে ক্রমশ বিবেক প্রস্ফুটিত

হয় এবং দেহ ও আত্মার বিভেদ জাগ্রত হয়।

এইরূপে সৃষ্টিচক্র স্থিতিশীল করে মহারাজ পৃথু ব্রহ্মাবর্তে শত অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হলেন।

যত্র যজ্ঞপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
অন্বভূয়ত সর্বাত্মা সর্বলোকগুরুঃ প্রভুঃ॥

(ভাগবত ৪।১৯।৩)

সর্বান্তর্যামী সর্বলোকপূজ্য জগৎকর্তা ভগবান শ্রীহরি সেই যজ্ঞে সাক্ষাৎ বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু যখন পৃথু শত যজ্ঞ সম্পন্ন করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন দেবরাজ ইন্দ্র ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁর 'শতক্রতু' (শত যজ্ঞকারী) নামের খ্যাতিও বোধহয় পৃথু লাভ করে বসবেন এবং হয়তো তাঁর অপূর্ব পূর্ণপ্রভাবে স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য লাভ করে নেবেন। তাই ইন্দ্র অত্যন্ত ঈর্ষাপরবশ হয়ে যজ্ঞ অশ্বটি অপহরণ করে নিলেন। কিন্তু যজ্ঞীয় ব্রাহ্মণগণ ও রাজপুত্র অপহরণকারী ইন্দ্রকে চিনে ফেললেন ও তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ব্রহ্মার অনুরোধে পৃথুরাজ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও ভগবানের নির্দেশে **'স্পৃশন্তং পাদয়োঃ প্রেম্ণা ব্রীড়িতং স্বেন কর্মনা'**। (ভাগবত ৪।১০।১৮) অর্থাৎ অশ্বহরণরূপ স্বীয় কার্যে লজ্জিত হয়ে পৃথুর পদদ্বয় ধারণ করলেন।

শ্রীভগবানও পৃথুকে বহুবিধ উপদেশ দিলেন—

সুধিয়ঃ সাধবো লোকে নরদেব নরোত্তমাঃ।
নাভিদ্রুহ্যন্তি ভূতেভ্যো যর্হি নাত্মা কলেবরম্॥

(ভাগবত ৪।২০।৩)

হে রাজন্ ! জগতে যাঁরা সুবুদ্ধিসম্পন্ন সদনুষ্ঠানপরায়ণ উত্তম শ্রেণীর ব্যক্তি, তাঁরা 'দেহ যে আত্মা নয়, তা অবগত হন। সুতরাং বৃথা মোহে তাঁরা কোনো প্রাণীর অনিষ্ট করেন না।'

ভগবান আরো বলছেন যে—সুখ, সম্মান, যশ, প্রতিপত্তি অথবা দুঃখ

অপমান, অখ্যাতি প্রভৃতি কোনোটিই আত্মার প্রকৃত ধর্ম নয়। এই মায়াময় সংসারে তুচ্ছ জড়দেহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনেই জীবের সুখ-দুঃখাদি ভোগ হয়। আসলে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ হল— নিত্য, মুক্ত, স্বপ্রকাশ, আনন্দময় এবং জড় দেহের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পূর্ণ পৃথকভাব। জ্ঞানী সাধকগণ বিবেক বলে দেহ ও আত্মার পৃথক তথ্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই তাঁরা স্বতঃই সমত্ব ভাবাপন্ন হন।

নাহং মখৈর্বৈ সুলভস্তপোভির্যোগেন বা যৎ সমচিত্তবর্তী।

(ভাগবত ৪।২০।১৬)

যজ্ঞ, তপস্যা অথবা যোগবলেও আমাকে পাওয়া সহজ নয় কিন্তু যাদের অন্তঃকরণ সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, তাদেরই নিকট আমি অবস্থান করি। অপার করুণানিকেতন শ্রীভগবানের এত অসীম করুণা যে তাঁর নির্দিষ্টপথে চললে তিনি এত প্রীত হন যে, অযাচিতভাবে করুণা বিতরণ করেন। পৃথুকে উপদেশ দান করে শ্রীভগবান গমনোদ্যত হলে পৃথু একান্ত ভক্তি সহকারে তাঁর শ্রীচরণে প্রণত হলেন। ভগবানের আর যাওয়া হল না, ভক্তের ভক্তিজোরে আবদ্ধ হয়ে প্রফুল্লনয়নে তিনি চেয়ে রইলেন। এদিকে ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে পৃথুর নেত্রযুগল অশ্রুধারায় প্লাবিত হল, বাষ্পভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল এমনকি ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত করার শক্তিও তাঁর লুপ্ত হয়ে গেল ; ভক্ত ও ভগবান উভয়েই আত্মহারা হয়ে গেলেন। ভগবান তখন—

'পদা স্পৃশন্তং ক্ষিতিমংস উন্নতে বিন্যস্তহস্তাগ্রমুরঙ্গবিদ্বিষঃ ॥'

(ভাগবত ৪।২০।২২)

দেবতাদের চরণ সাধারণত ভূমি স্পর্শ করে না, কিন্তু ভক্ত সঙ্গে ভগবানের আর সে স্বাভাবিক অবস্থা নেই, তিনি ভক্তপ্রবর পৃথুর সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন। তাই তিনি ভূতলে পদ স্পর্শ করে এবং গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে হাত রেখে দণ্ডায়মান হলেন। তখন পৃথু গদগদস্বরে স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন—

পৃথুর স্তুতি

(চতুর্থ স্কন্ধ, বিংশ অধ্যায়, শ্লোক ২১—৩১)

স আদিরাজো রচিতাঞ্জলির্হরিং
বিলোকিতুং নাশকদশ্রুলোচনঃ।
ন কিঞ্চনোবাচ স বাষ্পবিক্লবো
হৃদোপগুহ্যামুমধাদবস্থিতঃ॥ ২১ ॥

অথাবমৃজ্যাশ্রুকলা বিলোকয়ন্-
নতৃপ্তদৃগ্গোচরমাহ পূরুষম্।
পদা স্পৃশন্তং ক্ষিতিমংস উন্নতে
বিন্যস্তহস্তাগ্রমুরঙ্গবিদ্বিষঃ॥ ২২ ॥

বরান্ বিভো ত্বদ্‌বরদেশ্বরাদ্ বুধঃ
কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্।
যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং
তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ॥ ২৩ ॥

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্-
ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥ ২৪ ॥

স উত্তমশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥ ২৫ ॥

যশঃ শিবং সুশ্রব আর্যসঙ্গমে
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্ বিনা পশুং
শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া॥ ২৬ ॥

অথাভজে ত্বাখিলপূরুষোত্তমং
গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ।
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলি-
র্ন স্যাৎ কৃতত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ॥ ২৭ ॥
জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং
স্যাদেব যৎ কর্মণি নঃ সমীহিতম্।
করোষি ফল্গ্বপ্যুরু দীনবৎসলঃ
স্ব এব ধিষ্ণ্যেঽভিরতস্য কিং তয়া॥ ২৮ ॥
ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো
ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং
নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ন বিদ্মহে॥ ২৯ ॥
মন্যে গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং
বরং বৃণীষ্বেতি ভজন্তমাত্থ যৎ।
বাচা নু তন্ত্যা যদি তে জনোঽসিতঃ
কথং পুনঃ কর্ম করোতি মোহিতঃ॥ ৩০ ॥
ত্বন্মায়য়াদ্ধা জন ঈশ খণ্ডিতো
যদন্যদাশাস্তে ঋতাত্মনোঽবুধঃ।
যথা চরেদ্ বালহিতং পিতা স্বয়ং
তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতুম্॥ ৩১ ॥

সরলার্থ—অপর দিকে, বদ্ধাঞ্জলি আদিরাজ পৃথুও নয়নযুগল প্রেমাশ্রুধারায় প্লাবিত হওয়ায় ভগবানকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় কিছু বলতেও পারছিলেন না। তিনি শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন করে নিজের হৃদয়ে ধারণ করলেন ও সেইভাবেই অবস্থান করতে লাগলেন॥ ২১ ॥ অবশেষে পৃথু কোনোক্রমে চক্ষুদ্বয়ের অশ্রুমার্জন করলেন এবং অতৃপ্ত নয়নে ভগবানকে দেখতে লাগলেন। ভগবানের চরণকমল ভূমি স্পর্শ করে রয়েছে, করাগ্র গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে বিন্যস্ত—সেই নয়নলোভন মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে পৃথু

বলতে লাগলেন॥ ২২ ॥ পৃথু বললেন— হে মোক্ষপতি প্রভু ! আপনি ব্রহ্মা প্রভৃতি বরদাতা দেবতাগণকেও বরপ্রদানে সমর্থ। দেহাভিমানী পুরুষরা যা স্পৃহনীয় বলে মনে করে সেইসব বিষয়সুখ, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার কাছে কী করেই বা প্রার্থনা করতে পারে ? নারকীরাও যা লাভ করতে পারে সেইসব (দেহেন্দ্রিয়াদিভোগ্য) তুচ্ছ পদার্থ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি না॥ ২৩ ॥ মহাপুরুষগণের হৃদয়াভ্যন্তর থেকে মুখপথে নিঃসৃত আপনার চরণকমলের মধু (আপনার লীলাগুণগান) যেখানে নেই, তা যদি মোক্ষপদও হয়, তবে তাও আমি চাই না। আপনি বরং আমায় অযুত (অজস্র) কর্ণ প্রদান করুন, যাতে আমি প্রাণ ভরে আপনার লীলাকথা শ্রবণ করতে পারি—এই আমার অভিলষিত বর॥ ২৪ ॥ পুণ্যকীর্তি প্রভু ! সাধুপুরুষদের মুখ থেকে নির্গত আপনার পাদপদ্মমধুকণাবাহী বায়ুও (বহুদূর থেকে আপনার লীলাকথার আভাসমাত্র শ্রবণও)—প্রকৃততত্ত্ব বিস্মৃত হয়ে যারা নিস্ফল কর্মাদিতে রত সেই কুযোগীদেরও পরম বস্তুর স্মৃতি উদিত করে দেয়। আমার অন্য কোনো বরের প্রয়োজন নেই॥ ২৫ ॥ হে শোভনকীর্তিশালী ভগবান ! সাধুসঙ্গে আপনার মঙ্গলময় কীর্তিকথা দৈববশে একবারও যদি কেউ শ্রবণমাত্র করে এবং সে যদি গুণগ্রাহী হয় ও নিতান্ত পশুস্তরে অবস্থিত না হয়—তাহলে সে কি কখনো তার থেকে আর বিরত (তার প্রতি বিমুখ) হতে পারে ? সর্বপুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত আপনার যশোগাথা শ্রবণের বাঞ্ছা করেন॥ ২৬ ॥ এখন আমিও লক্ষ্মীদেবীরই মতো পরম-উৎসুকচিত্তে সর্বগুণধাম পরম-পুরুষোত্তম আপনারই সেবায় নিরত হতে চাই। কিন্তু আপনার চরণেই একতান-চিত্ত আমাদের দুজনের মধ্যে একই প্রভুর সেবায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব থেকে কলহের সৃষ্টি যেন না হয়॥ ২৭ ॥ জগদীশ্বর ! জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর হৃদয়ে আমার প্রতি বিরোধভাব জন্মানোর সম্ভাবনা অবশ্যই আছে, কারণ আপনার সেবায় যেমন তাঁর পরম অনুরাগ, আমিও তারই জন্য লালায়িত। কিন্তু আপনি দীনবৎসল, দীনের সামান্যতম প্রয়াসকেও আপনি বহুল-বিপুলরূপে দেখেন। তাই আমার আশা, আমার ও লক্ষ্মীদেবীর বিরোধেও আপনি আমারই পক্ষপাতী হবেন। আপনি তো আত্মারাম, লক্ষ্মীদেবীতে আপনার প্রয়োজনই বা কী ? ॥ ২৮ ॥ এইজন্যই নিষ্কাম মহাপুরুষগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরেও

আপনার ভজন করে থাকেন। আপনার মধ্যে মায়ার কার্য অহংকারাদি (এবং তজ্জনিত পুত্র-কলত্রাদির প্রতি পক্ষপাত) কিছুমাত্র নেই (সেই হেতু প্রকৃত দীনবাৎসল্য আপনাতেই সম্ভব)। ভগবান ! আপনার চরণকমলের নিরন্তর অনুস্মরণ ব্যতীত মহাপুরুষদের অন্য কোনো প্রয়োজন আছে বলে তো আমি জানি না॥ ২৯ ॥ আমিও বিশেষ কোনো প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা না নিয়েই আপনার ভজনা করি। আপনি যে আমাকে বললেন, 'বর প্রার্থনা করো'—আপনার এই বাণী জগৎ-সংসারের মোহ উৎপাদনকারিণী বলে আমি মনে করি। শুধু তাই নয়, আপনার বেদরূপা বাণীও তো জগৎকে বেঁধেই রেখেছে। যদি সেই বেদ-বাণীরূপ রজ্জু দ্বারা সকল লোক বন্ধনগ্রস্ত না হবে, তাহলে তারা কেনই বা মোহের বশে পুনঃপুনঃ সকাম কর্ম করতে থাকবে ? ॥ ৩০ ॥ প্রভু ! আপনারই মায়ায় মানুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ যে আপনি, সেই আপনার থেকে বিমুখ হয়ে অজ্ঞানের বশবর্তী হওয়ায় স্ত্রী-পুত্রাদির কামনা করে। তবুও পিতা যেমন সন্তানের প্রার্থনার অপেক্ষা না করেই নিজেই তার কল্যাণে নিরত থাকেন, সেই রকম আপনিও আমাদের প্রার্থনার অপেক্ষা না রেখে নিজে থেকেই আমাদের কল্যাণসাধনে যত্নবান হবেন, এমনটিই সঙ্গত॥ ৩১ ॥

মূলভাব—মহারাজ পৃথু স্তব শুরু করে বলছেন—হে প্রভো ! তুমি আমাকে **'বরং বৃণীস্ব'** বলে বর প্রার্থনার আদেশ দিয়েছ কিন্তু আমি কোনো বর চাই না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বৃথা মমতার বশে ও তুচ্ছ কাম্যফলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বর প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু সে তোমারই মায়া।

হে করুণাসিন্ধু ! আমাকে আর সে মায়ার সূত্রে আবদ্ধ কোরো না। ব্রহ্মাদিদেবগণ পর্যন্ত যাঁর আজ্ঞাধীন, জগজ্জননী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত যাঁর শ্রীপাদপদ্ম সেবায় আত্মসমর্পণ করেছেন, সেই পুরুষোত্তম তুমি যখন আমায় কৃপাকটাক্ষ-পাতে অনুগৃহীত করেছ তখন আমি আর কিছু চাই না। তবে এইটুকু প্রার্থনা করি যে—প্রাণভরে তোমার শ্রীপাদপদ্মের স্তুতিগাথা শোনার জন্য যেন আমার অসংখ্য শ্রবণেন্দ্রিয় হয়। মহারাজ পৃথু তাঁর ভগবৎস্তুতিতে বলছেন—হে ভগবন্ ! জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবী সর্বদা অনন্যমনে তোমার চরণ চিন্তাই সার করে থাকেন, আর আমিও তোমার চরণ চিন্তার জন্য লালায়িত,

এতে লক্ষ্মীদেবী আমার প্রতি বিরূপা হবেন না তো ? কিন্তু আমি আমার সাধনার ধন কেন ছাড়ব। মহারাজ পৃথু এইভাবে তাঁর অসাধারণ ভক্তি স্ফুটিত করেছেন। শাস্ত্রে এইরূপ সাধককে 'বীরভক্ত' বলে। কথিত আছে—'**কৃপাং তস্য সমাশ্রিত্য প্রৌঢ়াং নান্যমপেক্ষতে। অতুলাং যো বহন্ কৃষ্ণে প্রীতিঃ বীরং স উচ্যতে॥**' অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতুল প্রীতিবশত চিত্তে তাঁরই কৃপামাত্র ভরসা করে এবং আর কোনও বস্তুর মুখাপেক্ষী হন না তিনিই বীরভক্ত বলে পরিচিত হন। বীরভক্ত পৃথু এইরূপে অনায়াসে সকল বরণীয় বিষয় উপেক্ষা করে কেবল শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতি সংস্থাপন করে স্তবের উপসংহার করেছেন।

ভগবানের বরপ্রদান (শ্লোক ৩২—৩৩)

ইত্যাদিরাজেন নুতঃ স বিশ্বদৃক্
তমাহ রাজন্ ময়ি ভক্তিরস্তু তে।
দিষ্ট্যেদৃশী ধীর্ময়ি তে কৃতা যয়া
মায়াং মদীয়াং তরতি স্ম দুস্ত্যজাম্॥ ৩২
তত্ত্বং কুরু ময়াদিষ্টমপ্রমত্তঃ প্রজাপতে।
মদাদেশকরো লোকঃ সর্বত্রাপ্নোতি শোভনম্॥ ৩৩

সরলার্থ—মৈত্রেয় বললেন—আদিরাজ পৃথু এই প্রকারে স্তুতি করলে সর্বসাক্ষী ভগবান শ্রীহরি তাঁকে বললেন, 'রাজন্ ! আমার প্রতি তোমার ভক্তি হোক। অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, তোমার চিত্ত আমাতে এইভাবে আসক্ত হয়েছে। এইরূপ হলেই মানুষ, আমার পরম দুস্ত্যজ মায়া, যাকে পরিত্যাগ করা বা যার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অতীব সুকঠিন—তাকে অতিক্রম করে যেতে সমর্থ হয়। হে প্রজাপালক মহারাজ ! তুমি এখন অপ্রমত্তভাবে আমার আদেশ অনুযায়ী (প্রজাপালনাদি-রাজকার্য) আচরণ করো। যে আমার আদেশ পালন করে, সর্বত্রই তার মঙ্গল হয়।'॥ ৩২-৩৩ ॥

মূলভাব—পৃথুর স্তবে ভগবান পরমপ্রীত হয়েছেন ও বুঝেছেন যে পৃথু প্রকৃতই কামনাপথ অতিক্রম করেছেন। জাগতিক কোনও ভোগ-বস্তুর

প্রলোভনই তাঁকে বিচলিত করতে পারবে না। যে ভক্তি-ধন ভক্তের পরম-পুরুষার্থ তা পূর্ণমাত্রায় অর্পণ করবার ইনিই উপযুক্ত পাত্র। এইরূপ বিবেচনায় ভগবান শ্রীহরি পৃথুর ভক্তি বাসনাময় বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট প্রশংসা করে শ্লোকটির প্রথমার্ধে বলছেন—**'ময়ি ভক্তিরস্তু তে'** (ভাগবত ৪।২০।৩২) অর্থাৎ আমার প্রতি তোমার পরমভক্তি উৎপন্ন হোক। আবার জাগতিক কল্যাণ কামনায় বলছেন—

দৃষ্ট্যেদৃশী ধীর্ময়ি তে কৃতা যয়া।
মায়াং মদীয়াং তরতি স্ম দুস্ত্যজাম্॥

(ভাগবত ৪।২০।৩২)

হে রাজন্! নিতান্ত সৌভাগ্যবশতই তুমি আমার প্রতি এইরূপ বুদ্ধিভাব ধারণ করেছ। এইপ্রকার বুদ্ধিবলেই জ্ঞানিগণ আমার দুস্তর মায়া অতিক্রম করেন।

ভগবান আরো বলছেন যে, তুমি অবহিত চিত্তে আমার আদেশ পালন করো। কারণ—

'মদাদেশকরো লোকঃ সর্বত্রাপ্নোতি শোভনম্'।

(ভাগবত ৪।২০।৩৩)

যে ব্যক্তি আমার আদেশ অনুযায়ী কার্য করে সে সকল বিষয়েই মঙ্গল প্রাপ্ত হয়।

লীলাময়ের লীলারহস্য অতি অদ্ভুত। কোন প্রণালীতে যে তিনি জগতের কল্যাণসাধন করছেন তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। বেনের রাজত্বকালে পৃথিবীতে যে পাপভাব সংক্রামিত হয়েছিল তা অপনোদন করতে হলে পৃথুর ন্যায় মহাপুরুষের প্রয়োজন। সুতরাং পৃথু যতই নিষ্কাম হোন না কেন যাতে তাঁর রাজ্যপালনে উপেক্ষা ভাব না আসে এবং তিনি অধিকারানুরূপ কর্তব্যপালনে ব্রতী হন অর্থাৎ **'শ্রেয়ঃ প্রজাপালনমেব রাজ্ঞঃ'** (ভাগবত ৪।২০।১৪) ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য অনুযায়ী কর্ম করেন, ভগবান তাঁকে সেইরূপ উপদেশ দান করলেন।

মঙ্গলময় ভগবান জগতের হিতার্থে এইভাবে মহারাজ পৃথুকে রাজ্যের

পালক নিযুক্ত করে প্রস্থান করলেন। অন্যান্য যতপ্রকার লোকপালগণই সেই যজ্ঞক্ষেত্রে এসেছিলেন, সকলেই পৃথু কর্তৃক সম্যক্ পূজিত হয়ে স্ব স্ব স্থানে চলে গেলেন এবং পৃথুও স্ব-রাজপুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন।

———০———

প্রচেতাদের নিকট রুদ্রর ভগবৎ স্তুতি

(চতুর্থ স্কন্ধ, চত্বারবিংশ অধ্যায়)

প্রাক্কথন

ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টম-দ্বাদশ অধ্যায়ে ধ্রুব মহারাজ চরিত ও স্তুতি, ত্রয়োদশ-ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে পৃথুর চরিত ও স্তুতি বর্ণনা করে এখন চব্বিশতম অধ্যায়ে পৃথুর চতুর্থ অধস্তন পুরুষ প্রচেতাদের চরিত ও রুদ্র কর্তৃক তাঁদের নিকট ভগবদ্স্তুতি বর্ণনা করা হয়েছে।

সৃষ্ট্যাদৌ ব্রহ্মণা সৃষ্ট্বা পুত্রেভ্যঃ প্রোক্তম ইষ্টদম্।
স্তোত্রং প্রাহ প্রচেতোভ্যঃ কৃপয়া ভগবান্ শিবঃ॥

(শ্রীধরস্বামী টীকা)

পৃথুর পৌত্র প্রাচীনবর্হি পৃথুর ন্যায় ক্রিয়াকান্ত, যাগ-যজ্ঞাদি ও যোগকার্যে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। পৃথিবীর এমন স্থান ছিল না যেখানে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেননি। তাঁহার পুত্ররাই প্রচেতা নামে অভিধেয়।

প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রাঃ শতদ্রুত্যাং দশাভবন্।
তুল্যনামব্রতাঃ সর্বে ধর্মস্নাতাঃ প্রচেতসঃ॥

(ভাগবত ৪।২৪।১৩)

শতদ্রুতির গর্ভে প্রাচীনবর্হির দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই তুল্য নাম ও ব্রতধারী, ধর্মস্নাত এবং প্রচেতা এই সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েছিলেন। প্রাচীনবর্হি তাঁদের প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে আদেশ করলে তাঁরা তদ্‌যোগ্য শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সমুদ্রে প্রবেশপূর্বক দশ সহস্র বছর কঠোর তপস্যা করে শ্রীভগবানের উপাসনা করেন। পথে মহাদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ হয়।

যদুক্তং পথি দৃষ্টেন গিরিশেন প্রসীদতা।
তদ্ধ্যায়ন্তো জপন্তশ্চ পূজয়ন্তশ্চ সংযতাঃ॥
(ভাগবত ৪।২৪।১৫)

প্রচেতাগণকে মহাদেব শঙ্কর অনুগ্রহপূর্বক যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই তত্ত্বই তাঁরা অন্তরে ধারণা করে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠানপূর্বক কঠোর তপশ্চর্যা করেছিলেন।

মহাদেব বলছেন—হে প্রচেতাগণ! তোমাদের মহত্ত্ব ও সদ্‌ভিপ্রায় জানতে পেরে আমি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য উপস্থিত হয়েছি, কারণ তোমাদের সদভিপ্রায় থাকলেও কীভাবে আত্মসদভিপ্রায় পূরণ করবে সে সম্বন্ধে তোমাদের সম্যক্ ধারণা নেই। আমি যেমন উপদেশ দান করব, স্তুতি করব, তদনুসারে আরাধনা করলেই তোমরা নিজ অভিপ্রায় অনায়াসে পূরণ করতে পারবে।

তোমরা যেরকম উদার হৃদয় এবং **'ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে'** (ভাগবত ৪।২৪।২৮) অর্থাৎ তোমরা যেহেতু পরম ভাগবত আর পরম পুরুষ বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করছো তাই তোমাদের অপেক্ষা আমার আর কে প্রিয়তর ব্যক্তি আছে! শ্রীভগবানের পবিত্র মঙ্গলময় স্তোত্র জপ করে তাঁর আরাধনা করতে হবে। তাতে সর্বপ্রকার মঙ্গল, এমনকি মোক্ষ পর্যন্ত অনায়াসে সম্পন্ন হয়ে থাকে। রাজপুত্রগণ শিবের এইরূপ দয়াপূর্ণ সানুগ্রহ বাক্য শ্রবণ করে, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হলেন আর নারায়ণপরায়ণ ভগবান শঙ্কর তাঁর ভগবৎস্তুতি শুরু করলেন।

রুদ্রর ভগবৎস্তুতি

(৪র্থ স্কন্ধ ২৪ অধ্যায়, শ্লোক ৩৩-৬৮)

ভগবান রুদ্র বাসুদেবের স্তবে প্রবৃত্ত হয়ে চতুর্থ স্কন্ধের ছত্রিশটি শ্লোকের পাঁচটি স্তবকে ভগবানের স্তুতি করেছেন।

ভগবৎ প্রণাম	শ্লোক ৩৩-৩৬
ভগবানের সর্বময়ত্ব	শ্লোক ৩৭-৪৩

ভগবৎ প্রণাম (শ্লোক ৩৩—৩৬)

জিতং ত আত্মবিদ্ধুর্যস্বস্তয়ে স্বস্তিরস্তু মে।
ভবতা রাধসা রাদ্ধং সর্বস্মৈ আত্মনে নমঃ॥ ৩৩
নমঃ পঙ্কজনাভায় ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মনে।
বাসুদেবায় শান্তায় কূটস্থায় স্বরোচিষে॥ ৩৪
সঙ্কর্ষণায় সূক্ষ্মায় দুরন্তায়ান্তকায় চ।
নমো বিশ্বপ্রবোধায় প্রদ্যুম্নায়ান্তরাত্মনে॥ ৩৫
নমো নমোঽনিরুদ্ধায় হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মনে।
নমঃ পরমহংসায় পূর্ণায় নিভৃতাত্মনে॥ ৩৬

সরলার্থ— ভগবান রুদ্রদেব স্তুতি করতে লাগলেন—হে ভগবান ! জয় হোক তোমার ! তোমার জয়ধ্বনি (উৎকর্ষ-খ্যাপন) তো তুচ্ছ চাটুবাদ নয়, আত্মজ্ঞানীদেরও যাঁরা শিরোমণিস্বরূপ, এ তো তাঁদেরও পরম স্বস্তির, স্বাত্মানন্দবোধের উদ্বোধক, এতে আমারও কল্যাণ হোক ! আনন্দস্বরূপ তুমি নিত্যই আনন্দরসে মগ্ন হয়েই রয়েছ (তোমার জয়গান তাই তোমার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর, ভক্তদেরই তা নব-নব মাধুর্য আস্বাদনের হেতু)। সর্বস্বরূপ তুমি, আত্মস্বরূপ তুমি—তোমাকে নমস্কার॥ ৩৩ ॥ তুমি পদ্মনাভ (সর্বলোকের আদিকারণ), ভূতসূক্ষ্ম (শব্দাদি তন্মাত্র) এবং ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্তা, শান্ত, একরস এবং স্বয়ংপ্রকাশ বাসুদেব (চিত্তের অধিষ্ঠাতা)—তোমাকে নমস্কার॥ ৩৪ ॥ তুমিই সূক্ষ্ম (অব্যক্ত), অনন্ত এবং মুখাগ্নি দ্বারা সমগ্র জগতের সংহার-কর্তা, অহংকারের অধিষ্ঠাতা সংকর্ষণ, আবার তুমিই জগতের প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদ্ভবস্থান বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন—তোমাকে নমস্কার॥ ৩৫ ॥ তুমিই ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপতি মনের অধিষ্ঠাতা ভগবান অনিরুদ্ধ—বারবার তোমাকে

নমস্কার। তুমিই নিজ তেজে জগৎকে ব্যাপ্ত করে সূর্যরূপে অবস্থিত, পূর্ণস্বরূপ তুমি, তাই তোমার ক্ষয়-বৃদ্ধি কিছুই নেই—তোমাকে নমস্কার॥ ৩৬

মূলভাব—হে ভগবন্! তুমি নিজেকে বাসুদেব ব্যূহ, সংকর্ষণ ব্যূহ, প্রদ্যুম্ন ব্যূহ ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ আদি চার ভাগে বিভক্ত করেছ। তার মধ্যে বাসুদেব ব্যূহ পরমাত্মা, সংকর্ষণ ব্যূহ জীব, প্রদ্যুম্ন ব্যূহ মন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ অহংকার। এদের মধ্যে অবার বাসুদেবই পরা প্রকৃতি এবং সংকর্ষণাদি অপর ব্যূহ কার্য। ভগবান বাসুদেব পরিপূর্ণ ষড়গুণশালী যেমন **জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজঃ** এই তাঁর ষড়গুণ।

জ্ঞান—চেতনা-চেতনাত্মক প্রপঞ্চকে সামান্য ও বিশেষ রূপে জানাকেই বলে জ্ঞান।

শক্তি—জগতের প্রকৃতি ভাবই তাঁর শক্তি।

বল—জগৎ সৃষ্টিকার্যে ভগবানের অনায়াস ও পরিশ্রমের অভাব হল বল।

ঐশ্বর্য—ভগবানের অপ্রতিহতেচ্ছত্বই হল তাঁর ঐশ্বর্য।

বীর্য—জগৎ তাঁর প্রকৃতি হলেও তিনি বিকারশূন্য, ইহাই তাঁর বীর্য।

তেজঃ—জগতের সৃষ্টিবিষয়ে তাঁর পরাপেক্ষশূন্যতা ও অভিভবকারিণী শক্তিই তাঁর তেজ।

এই জ্ঞানবলের উন্মেষে সংকর্ষণ, বীর্য ও ঐশ্বর্যর উন্মেষে প্রদুম্ন এবং শক্তি ও তেজের উন্মেষে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হন। শ্রীরুদ্র তাঁর স্তুতিতে ভগবানের এই রূপের বর্ণনা করে প্রণাম করছেন।

শ্রীরুদ্র তাঁর স্তুতিতে বলছেন—হে বাসুদেব ! তুমি চিত্তের অধিষ্ঠাতা, আমার চিত্তকে শমগুণে বলীয়ান করো যাতে কোনও রূপ বিকার উৎপন্ন না হয়। তুমি স্বপ্রকাশ, নিজ অলৌকিক প্রকাশগুণে আমার চিত্তকে প্রকাশিত করে তোমার ভক্তিতে উন্মুখ করে দাও।

হে সংকর্ষণ ! তুমি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা, যা দেহ-গেহাদি বিষয়ে নিরন্তর উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রবৃত্ত হচ্ছে, তার বন্ধন ছেদন করে ভক্তিবিষয়ে নিয়োজিত করো।

হে প্রদুম্ন ! তুমি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা, আমার বুদ্ধিকে অসদ্‌বিষয় হতে

প্রতিনিবৃত্ত করে এইরূপ প্রবুদ্ধ করো যাতে আমার বুদ্ধি ভক্তিবিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করে অলৌকিক আত্মানন্দ লাভে সমর্থ হয়।

হে ভগবন্! তুমি অন্তরিন্দ্রিয় মনের অধিষ্ঠাতা। আমার মনকে অন্য বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত করে তোমার ভক্তিতে অনুরক্ত করো। তুমি পরিচালিত না করলে তোমার আদেশবাহী মন কখনই বিষয় হতে প্রতিনিবৃত্ত হতে পারে না, তাই যদি কেবল তুমি মনকে ভক্তিপথে চালিত করো তবেই তা ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে পরমার্থ তত্ত্বলাভে সমর্থ হবে।

হে ভগবন্! তুমি সূর্যরূপী, তাই সমস্ত তেজের তুমিই আধার, **'যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'**। আমার চক্ষুকে তোমার শ্রীমূর্তি দর্শনে সামর্থ্য প্রদান করো। তুমি পূর্ণ তেজোময়, তুমি ক্ষয়বৃদ্ধিশূন্য। হে ভগবন্! আমাতে তোমার তেজের অংশমাত্র প্রদান করে কৃতার্থ করো, আর ক্ষয়বৃদ্ধিশূন্য মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার যোগ্যতা প্রদান করো।

শ্রীরুদ্র স্তুতি করে বলছেন—হে ভগবন্! হে পদ্মনাভ! সকল ইন্দ্রিয়-ব্যাপার তোমার বিষয়েই প্রবৃত্ত হলে ভক্তির পরাকাষ্ঠা সম্পন্ন হয়, অতএব কৃপাপূর্বক আমার জড় ইন্দ্রিয় সমুদায়কে তোমার বিষয়ে ব্যাপৃত করো, যাতে আমার ভক্তির মঙ্গলময় পরিণতি হয়।

ভগবানের সর্বময়ত্ব (শ্লোক ৩৭—৪৩)

স্বর্গাপবর্গদ্বারায় নিত্যং শুচিষদে নমঃ।
নমো হিরণ্যবীর্যায় চাতুর্হোত্রায় তন্তবে॥ ৩৭
নম উর্জ ইষে ত্রয্যাঃ পতয়ে যজ্ঞরেতসে।
তৃপ্তিদায় চ জীবানাং নমঃ সর্বরসাত্মনে॥ ৩৮
সর্বসত্ত্বাত্মদেহায় বিশেষায় স্থবীয়সে।
নমস্ত্রৈলোক্যপালায় সহওজোবলায় চ॥ ৩৯
অর্থলিঙ্গায় নভসে নমোঽন্তর্বহিরাত্মনে।
নমঃ পুণ্যায় লোকায় অমুষ্মৈ ভূরিবর্চসে॥ ৪০

প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় পিতৃদেবায় কর্মণে।
নমোঽধর্মবিপাকায় মৃত্যবে দুঃখদায় চ॥ ৪১
নমস্ত আশিষামীশ মনবে কারণাত্মনে।
নমো ধর্মায় বৃহতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
পুরুষায় পুরাণায় সাংখ্যযোগেশ্বরায় চ॥ ৪২
শক্তিত্রয়সমেতায় মীঢুষেঽহংকৃতাত্মনে।
চেতআকৃতিরূপায় নমো বাচোবিভূতয়ে॥ ৪৩ ॥

মূলভাব—তুমি স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বারস্বরূপ, পবিত্র হৃদয়ে তোমার বাস—তোমাকে নমস্কার। তুমিই চাতুর্হোত্র-কর্মের সাধন তথা বিস্তারকারী হিরণ্যবীর্য অগ্নি—তোমাকে নমস্কার॥ ৩৭ ॥ তুমিই পিতৃগণ এবং দেবগণের পুষ্টি-বিধানকারী অন্নস্বরূপ সোম, তুমি বেদ-ত্রয়ীর অধিষ্ঠাতা—তোমাকে নমস্কার। তুমি সমস্ত প্রাণীর তৃপ্তিদাতা সর্বরসস্বরূপ (জল)—তোমাকে নমস্কার॥ ৩৮ ॥ তুমি সর্বপ্রাণীর দেহ, পৃথিবী এবং বিরাটস্বরূপ তথা ত্রিভুবনের পালক—মানসিক, ঐন্দ্রিয়িক (ইন্দ্রিয়গত) এবং শারীরিক শক্তিস্বরূপ-বায়ু (প্রাণ)—তোমাকে নমস্কার॥ ৩৯ ॥ তুমিই নিজ শব্দ-গুণের দ্বারা অর্থসমূহের প্রতিপাদক এবং আভ্যন্তর ও বাহ্যরূপ ভেদব্যবহারের আলম্বন-ভূত আকাশ (স্বরূপত এক হওয়া সত্ত্বেও 'অন্তরাকাশ', 'বহিরাকাশ'রূপ-ভিন্নোক্তির আশ্রয়)। তুমিই মহাপুণ্যফলে লভ্য জ্যোতির্ময় বৈকুণ্ঠাদি লোক—তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার॥ ৪০ ॥ তুমিই পিতৃলোক-প্রাপ্তির হেতুভূত প্রবৃত্তিমূলক কর্ম, আবার তুমিই দেবলোক-প্রাপ্তিরও হেতুস্বরূপ নিবৃত্তিমূলক কর্ম। তুমি অধর্মের ফলস্বরূপ দুঃখদাতা মৃত্যু—তোমাকে নমস্কার॥ ৪১ ॥ প্রভু! তুমিই পুরাণপুরুষ, সাংখ্য ও যোগের অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তুমি সর্বকামনা-পূরণকারী, সাক্ষাৎ মন্ত্রমূর্তি, মহান ধর্মস্বরূপ, তোমার জ্ঞানশক্তি নিত্য অকুণ্ঠিত—তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার॥ ৪২ ॥ তুমিই কর্তা, করণ এবং কর্ম—এই শক্তিত্রয়ের একমাত্র আশ্রয়, তুমি অহংকারের অধিষ্ঠাতা রুদ্রদেব ; তুমিই জ্ঞান এবং ক্রিয়াস্বরূপ, তোমার থেকেই পরা, পশ্যন্তী,

মধ্যমা এবং বৈখরী—এই চতুঃর্বিধ বাক্যের অভিব্যক্তি ঘটে—তোমাকে নমস্কার॥ ৪৩ ॥

সরলার্থ—হে ভগবন্ ! তুমি কৃপাপরবশ হলে ভক্ত স্বর্গ ও অপবর্গ সকলই লাভ করে থাকে। যে ব্যক্তি তোমার প্রতি সকামভাবে ভক্তিস্থাপন করে শাস্ত্রানুমোদিত কর্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি স্বর্গ পর্যন্ত কাম্যসুখের অধিকারী হয়ে থাকে এবং যে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান করে সে মোক্ষের অধিকারী হয়। তোমাকে পরিত্যাগ করে জীব স্বর্গ বা অপবর্গ কিছুই লাভ করতে পারে না। হে ভগবন্ ! তুমি পৃথিব্যাত্মক এবং পৃথিবীরূপে বর্তমান থেকে, যেমন জীবের ঘ্রানেন্দ্রিয়কে সৌরভে প্রবর্তিত কর, সেইরকম আমারও ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তোমার অলৌকিক সৌরভের অনুভবে প্রবর্তিত করে এবং মদীয় দেহকে তোমার শ্রীচরণে পরিচর্যাদির বিষয়ে নিযুক্ত করো।

হে ভগবন্ ! তুমি প্রাণবায়ুরূপে বর্তমান থেকে সমস্ত ত্রিভুবনের জীবনকে রক্ষা করো। একমাত্র তুমি জীবের জীবনশক্তি। আবার তোমার সাহায্যেই ত্বগিন্দ্রিয়র স্পর্শের উপলব্ধি হয়ে থাকে। তুমিই বায়ুরূপে ত্বগিন্দ্রিয়র অধিষ্ঠাতা তাই আমার শরীরবায়ু যাতে পরিশুদ্ধ করে সেইমতো তোমার ভজন বিষয়ে নির্বিঘ্নতা সম্পাদন করো।

হে ভগবন্ ! তুমি নভঃস্বরূপে শব্দোৎপত্তির উপাদান কারণ। তোমা হতে শব্দ উৎপন্ন হয়ে নিজ নিজ অর্থ প্রতিপাদন করে, অতএব তুমি নভোরূপে বর্তমান থেকে শব্দ উৎপাদন দ্বারা আমার নিকট তোমার নিজ নাম, মন্ত্র ও ভক্তিলাভের তত্ত্ব প্রকাশ করো।

হে ভগবন্ ! তুমি বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থান কর, অতএব বৈকুণ্ঠলোকই তোমার স্বরূপ। তুমি পিতৃলোকপ্রাপ্তি ও দেবলোকপ্রাপ্তিরও কারণস্বরূপ।

হে ভগবন্ ! তুমিই সৎ ও অসৎ সকল কর্মেরই ফলদাতা। কর্ম অচেতন, ফলে ফলদানে অসমর্থ। এইজন্য দুষ্কৃত হতে দুঃখ ও সুকৃত হতে সুখ, আবার কোনো দুষ্কৃত হতে কঠোর দুঃখ, কোনো দুষ্কৃত হতে স্বল্প দুঃখ, কোনো সুকৃত হতে অধিক সুখ আর কোনো সুকৃত হতে অল্প সুখ প্রাপ্ত হয়। আর এমন পাপ বা পুণ্য আছে যার ফল অচিরকাল মধ্যে উৎপন্ন হয় আবার এমন পাপ ও পুণ্য

আছে যার ফল বহুকালাতিক্রমে হয়ে থাকে। অচেতন কর্ম কখনই এইভাবে যথাসময় ফল প্রদানে সমর্থ হয় না। হে ভগবন্ ! ধর্মাধর্মের তুমিই একমাত্র পরিচালক।

হে ভগবন্ ! তুমি পুরাণ পুরুষ, তোমা হতে কেহই পূর্ববর্তী নয়, শাস্ত্রে তোমার কালও নির্দেশ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মাদি তোমার নিকট বেদ প্রাপ্ত হয়েছেন, অতএব তুমি তাঁদেরও গুরু। ভগবান পতঞ্জলি বলেছেন— **'স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ'** ব্রহ্মাদি দেবগণেরও নির্দিষ্ট কাল আছে, কিন্তু তুমি অনবিচ্ছিন্ন স্বরূপ।

হে সর্বজ্ঞ বিশ্বনিয়ন্তা। তুমি করুণার প্রতিভূ, জ্ঞানশক্তির প্রতিভূ। তুমি ব্রহ্মরূপে বেদের স্রষ্টা ও রুদ্ররূপে সংহারকারী। হে ব্রহ্মরূপিন্ ! তুমি অহংকাররূপে বর্তমান থেকে আমার অহংকারকে মথিত করো, বুদ্ধি ও প্রাণবৃত্তিকে তোমার ভক্তির প্রতি উন্মুখ করে দাও। তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।

ভগবানের অনন্তরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষা (শ্লোক ৪৪—৫২)

দর্শনং নো দিদৃক্ষূণাং দেহি ভাগবতার্চিতম্।
রূপং প্রিয়তমং স্বানাং সর্বেন্দ্রিয়গুণাঞ্জনম্॥ ৪৪
স্নিগ্ধপ্রাবৃড়্ঘনশ্যামং সর্বসৌন্দর্যসংগ্রহম্।
চার্বায়তচতুর্বাহু সুজাতরুচিরাননম্॥ ৪৫
পদ্মকোশপলাশাক্ষং সুন্দরভ্রু সুনাসিকম্।
সুদ্বিজং সুকপোলাস্যং সমকর্ণবিভূষণম্॥ ৪৬
প্রীতিপ্রহসিতাপাঙ্গমলকৈরুপশোভিতম্ ।
লসৎপঙ্কজ-কিঞ্জল্ক-দুকূলং মৃষ্টকুণ্ডলম্॥ ৪৭
স্ফুরৎকিরীট-বলয়-হার-নূপুর-মেখলম্ ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-মালা-মণ্যুত্তমর্দ্ধিমৎ ॥ ৪৮
সিংহস্কন্ধত্বিষো বিভ্রৎসৌভগগ্রীবকৌস্তুভম্।
শ্রিয়ানপায়িন্যাক্ষিপ্তনিকষাশ্মোরসোল্লসৎ॥ ৪৯

পূররেচকসংবিগ্নবলিবল্গুদলোদরম্ ।
প্রতিসংক্রাময়দ্ বিশ্বং নাভ্যাবর্তগভীরয়া॥ ৫০
শ্যামশ্রোণ্যধিরোচিষ্ণুদুকূলস্বর্ণমেখলম্ ।
সমাচার্বঙ্ঘ্রিজঙ্ঘোরুনিম্নজানুসুদর্শনম্ ॥ ৫১
পদা শরৎপদ্মপলাশরোচিষা
নখদ্যুভির্নোহন্তরঘং বিধুন্বতা।
প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্তসাধবসং
পদং গুরো মার্গগুরুস্তমোজুষাম্॥ ৫২

সরলার্থ—প্রভু ! আমরা তোমার দর্শনাভিলাষী ; তোমার যেরূপ ভক্তরা আরাধনা করেন, তোমার নিজ-জনেদের একান্ত প্রিয়, মাধুর্যগুণে নিখিল ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিসাধক (অথবা সর্বেন্দ্রিয়-গুণসমন্বিত) সর্বসৌন্দর্য যেন একীভূত হয়ে মূর্তি ধরেছে সেইরূপে সেই অনুপম রূপ আমাদের দর্শন করাও॥ ৪৪ ॥ দেহগাত্রের বর্ণ বর্ষাকালের নবীন মেঘের মতো স্নিগ্ধ শ্যামল, মনোহর সুদীর্ঘ চারবাহু, লাবণ্যময় মুখমণ্ডল, পদ্মের মধ্যভাগের দল-সদৃশ চক্ষু, শোভন ভ্রূ, মনোজ্ঞ নাসিকা, শোভন দন্ত পঙ্‌ক্তি, মনোরম গণ্ডদেশ, সমানাকার সুগঠিত কর্ণযুগল—সবই শোভার আধার॥ ৪৫-৪৬ ॥ প্রীতিহাস্য মধুর অপাঙ্গদৃষ্টি, কুটিল-কৃষ্ণ কেশরাজি, পদ্ম-পরাগের মতো উজ্জ্বল পীতবসন, দীপ্তিমান কুণ্ডল, উজ্জ্বল মুকুট, কঙ্কণ, হার, নূপুর, মেখলা প্রভৃতি অলংকার, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বনমালা ও বহুমূল্য মণিসমূহের শোভায় সম্পন্ন সেই রূপ॥ ৪৭-৪৮ ॥ সিংহের মতো দৃঢ় শক্তিশালী স্কন্ধে সেই মূর্তির অলংকারের দীপ্তিচ্ছটা, গ্রীবাদেশে কৌস্তুভমণির অমল কান্তি, লক্ষ্মীদেবীর নিত্য-নিবাসের সমুজ্জ্বল শ্রীবৎস চিহ্ন সমন্বিত শ্যামবর্ণ বক্ষদেশ যার কাছে স্বর্ণরেখাযুক্ত নিকষপ্রস্তরও লজ্জা পায়॥ ৪৯ ॥ মনোহরণ সেই মূর্তির ত্রিবলিরেখাযুক্ত অশ্বত্থপত্র-সদৃশ উদরের সৌন্দর্য শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের ফলে চঞ্চল রূপ যেন আরও মনোহারী, আবর্তের (ঘূর্ণী) মতো গভীর সুবর্তুল নাভি যেন নিজের থেকে উৎপন্ন বিশ্বকে পুনরায় নিজের ভিতরে প্রত্যাকর্ষণে উদ্যত॥ ৫০ ॥ সেই দিব্য বিগ্রহের শ্যাম কটিদেশে পীতাম্বর এবং সুবর্ণ মেখলার দ্যুতি যেন অধিকতর উজ্জ্বল, চরণ, জঙ্ঘা, ঊরু, নিম্নজানু—প্রভৃতি

অঙ্গের যথাযথ আকার ও সুষমা তাকে মাধুর্যে মণ্ডিত করে তুলেছে॥ ৫১ ॥ তার চরণদ্বয়ে শরৎ-পদ্মদলের কান্তি, জীবসমুদয়ের মানস-অন্ধকার-বিদূরণকারী তার নখজ্যোতি—বর্ণনাতীত সেই রূপের দর্শনতৃষায় কাতর আমরা ! ভক্তজনের ভয়হারী পরমাশ্রয়স্বরূপ তোমার সেই অপরূপ রূপ আমাদের দেখাও। আমাদের দৃষ্টি তো অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আমাদের পথপ্রদর্শক তুমি, আমাদের গুরু, জগতের গুরু । আমাদের দয়া করে পথ দেখাও, প্রভু॥ ৫২ ॥

মূলভাব—আগের স্তবে শ্রীরুদ্রদেব ভগবানের সর্বময়ত্ব সূচনা করে বর্তমান শ্লোকসমূহে তাঁর অভিষ্ট রূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে প্রার্থনা করছেন। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের বিশুদ্ধি না হলে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার অসম্ভব। তাই পূর্বের শ্লোকে ভগবানের স্বরূপপূর্বক প্রণতি দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের বিশুদ্ধি সম্পাদনের প্রার্থনা করে এখন বলছেন—হে ভগবন্ ! তোমার প্রণতি দ্বারা আমি **'দর্শনং নো দিদৃক্ষূনাং দেহি ভগবতার্চিতম্'** (ভাগবত ৪।২৪।৪৪) আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করেছি, এখন তোমার দর্শন কামনা করছি, আমাদের দর্শন দাও।

হে ভগবন্ ! তোমার যে রূপ আমার সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সাধনে সক্ষম, আমাকে সেই রূপ দেখাও। তোমার যে রূপের প্রভায় ভক্তের চক্ষু তৃপ্তিলাভ করে, যে রূপে ভক্তের মন-প্রাণ শীতল হয়, যার স্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয় আনন্দ সাগরে মগ্ন হয়, যে রূপের কথা শুনে শ্রবণেন্দ্রিয় স্বর্গীয় সুখ অনুভব করে, যে রূপের অলৌকিক সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়, যে রূপের স্বাদ অনুভব করে রসনা পরিতৃপ্ত হয়, যার স্মরণে মনের প্রফুল্লতা জন্মে, কর্মেন্দ্রিয়গুলি যৎসম্বন্ধীয় কার্য সম্পাদন করে অমৃত সরোবরে মগ্ন হয়—তোমার সেই রূপই আমি দেখতে চাই, আমাকে সেই রূপই দেখাও।

হে ভগবন্ ! তোমার সুন্দর নেত্র, ভ্রূ, নাসিকা, দন্তপঙ্ক্তি, সুগন্ধযুক্ত বদন ও সম প্রমাণ কর্ণ দ্বারা যে রূপ শোভা পায়, যার বামভাগে প্রেয়সী রাধাশক্তি বর্তমান থাকায় বামনেত্রের প্রান্তভাগ মধুর হাস্যযুক্ত, পীতবসন সমন্বিত সুদীপ্তকুন্তল ভূষিত, তোমার সেই মূর্তি আমাকে দেখাও।

শ্রীরুদ্র স্তবে আবার বলছেন—**'পদা শরৎ পদ্ম পলাশরোচিষা নখদ্যুভির্নোঽন্তরঘং বিধুন্বতা'** (ভাগবত ৪।২৪।৫২) অর্থাৎ আমি তোমার সর্বাঙ্গের অপরূপ লাবণ্যর চেয়ে তোমার অদৃষ্টপূর্বক চরণতল দেখতে বেশি দর্শনাকাঙ্ক্ষী। মহাযোগপীঠে বর্তমান তোমার চরণদ্বয় যদি সমগ্রভাবে দেখা সম্ভবপর নয়, তথাপি যদি তুমি একটি চরণ দ্বারা পৃথিবী আশ্রয় করে দাঁড়াও ও অন্য চরণ বক্রভাবে তদুপরি তুলে দাঁড়াও, তবে আমি তোমার চরণের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশচিহ্ন দর্শন করে ধন্য হই। হে ভগবন্ ! যেন তোমাকে দেখবার ও অন্তরে অনুভব করার সামর্থ্য থেকে আমি বঞ্চিত না হই। হে ভগবন্ ! তুমি গুরুরূপে বর্তমান থেকে জীবকে সদুপদেশ দান করো এবং অজ্ঞানান্ধকার দূর করে তাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে থাক। অতএব আমাকে গুরুরূপে ভক্তিমার্গের উপদেশ প্রদান করে কৃতার্থ করো, আমি যেন বিমল ভক্তিতত্ত্ব লাভ করে পরমার্থলাভে সমর্থ হতে পারি।

ভক্ত ও ভক্তির মহিমা স্তবন (শ্লোক ৫৩—৬১)

এতদ্‌রূপমনুধ্যেয়-মাত্মশুদ্ধিমভীপ্সতাম্ ।
যদ্ভক্তিযোগোঽভয়দঃ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্॥ ৫৩
ভবান্ ভক্তিমতা লভ্যো দুর্লভঃ সর্বদেহিনাম্।
স্বারাজ্যস্যাপ্যভিমত একান্তেনাত্মবিদগতিঃ॥ ৫৪
তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ॥ ৫৫
যত্র নির্বিষ্টশরণং কৃতান্তো নাভিমন্যতে।
বিশ্বং বিধ্বংসয়ন্ বীর্য শৌর্যবিস্ফূর্জিতভ্রুবা॥ ৫৬
ক্ষণার্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ৫৭
অথানঘাঙ্‌ঘ্রেস্তব কীর্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্‌মনাম্ ।
ভূতেম্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব॥ ৫৮

ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং
তমোগুহায়াং চ বিশুদ্ধমাবিশৎ।
যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা
মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্॥ ৫৯

যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বস্মিন্নবভাতি যৎ।
তৎ ত্বং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্॥ ৬০

যো মায়য়েদং পুরুরূপয়াসৃজদ্
বিভর্তি ভূয়ঃ ক্ষপয়ত্যবিক্রিয়ঃ।
যদ্ভেদবুদ্ধিঃ সদিবাত্মদুঃস্থয়া
তমাত্মতন্ত্রং ভগবন্ প্রতীমহি॥ ৬১

সরলার্থ—চিত্তশুদ্ধির অভিলাষী ব্যক্তির এই রূপের নিরন্তর অনুধ্যান করা উচিত। স্বধর্ম পালনকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে এই রূপের প্রতি ভক্তিভাব সর্বথা অভয়প্রদ॥ ৫৩ ॥ স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রও তোমাকে লাভ করতে চান, বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানীদেরও তুমিই একমাত্র গতি। দেহধারীগণের পক্ষে তুমি একান্ত দুর্লভ, কেবলমাত্র ভক্তিমান পুরুষই তোমাকে লাভ করতে পারে॥ ৫৪ ॥ তোমার প্রসন্নতা সম্পাদন ভক্তি ভিন্ন অন্য যে কোনো উপায়েই দুঃসাধ্য। সুতরাং সাধুপুরুষগণেরও দুষ্প্রাপ্য সেই একনিষ্ঠ ভক্তিযোগের দ্বারা তোমার আরাধনা করে তোমার চরণতল ভিন্ন অপর কিছু কেই বা প্রার্থনা করবে ?॥ ৫৫ ॥ মৃত্যুর দেবতা মহাকাল ভ্রূক্ষেপমাত্রে সমগ্র জগতের ধ্বংসসাধন করেন, তাঁর সেই কুটিল ভ্রূভঙ্গীতে প্রকাশিত হয় (প্রাণকে নির্জিত করার) অদম্য শক্তি ও উৎসাহ। সেই মৃত্যুও কিন্তু তোমার চরণাশ্রিত ব্যক্তির উপর নিজের অধিকার আছে বলে মনে করে না॥ ৫৬ ॥ ভগবানের চরণে শরণাপন্ন সেইরূপ প্রেমিক ভক্তের ক্ষণার্ধের সঙ্গও আমি স্বর্গ বা মোক্ষের সঙ্গে সমতুল্য বলে মনে করি না, মর্ত্যলোকের তুচ্ছ ভোগের আর কথা কী॥ ৫৭ ॥ প্রভু ! তোমার চরণ জীবের নিখিল-পাপহারী। আমাদের প্রার্থনা শুধু এই যে, যাঁরা তোমার কীর্তি এবং তীর্থে (গঙ্গা) আন্তরিক এবং বাহ্য স্নানের দ্বারা নিজেদের মানসিক এবং শারীরিক সমস্ত পাপ ধৌত করে ফেলেছেন তথা

যাঁরা জীবে দয়া, রাগ-দ্বেষরহিত চিত্ত এবং সরলতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন—তোমার সেই ভক্তগণের সঙ্গ যেন আমরা সর্বদা লাভ করি। আমাদের পক্ষে তা-ই হবে তোমার পরম অনুগ্রহ॥ ৫৮ ॥ যে সাধকগণের চিত্ত ভক্তিযোগের দ্বারা অনুগৃহীত (ভক্তিপথের সাধনে প্রবৃত্তিও কৃপাবশেই ঘটে থাকে) এবং বিশুদ্ধ হওয়ার ফলে বাহ্য বিষয়ের আকর্ষণে বিভ্রান্ত হয় না এবং অজ্ঞানান্ধকারের গভীরেও নিমগ্ন হয় না, সেই মনস্বীগণ অনতিকালের মধ্যেই নিজেদের অন্তঃকরণে তোমার স্বরূপের দর্শন লাভ করে থাকেন॥ ৫৯ ॥ যাতে (অধ্যারোপিত হয়ে) এই বিশ্ব জগৎ প্রতীয়মান হচ্ছে এবং যা এই সমগ্র বিশ্বে প্রকাশিত, সেই আকাশের সমান বিস্তৃত এবং পরম প্রকাশময় ব্রহ্মতত্ত্ব তুমিই॥ ৬০ ॥ ভগবান, তোমার বহুরূপধারিণী মায়ার দ্বারা তুমি এমনভাবে এই জগতের রচনা, পালন এবং সংহার করে থাক, যেন এটি কোনো সদ্‌বস্তু। কিন্তু এর ফলে তোমার মধ্যে কোনোরকম বিকার জন্মায় না। মায়ার কারণে অপর সকলের মধ্যে ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হলেও তোমার উপরে সে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় না। তোমাকেই আমরা একমাত্র স্বাধীন, পরম-স্বতন্ত্র বলে জানি॥ ৬১

মূলভাব—শ্রীরুদ্র ভগবৎ প্রসঙ্গে বলছেন—কেহ কেহ বলেন এই রূপ দর্শন কেবল ধ্যানেরই যোগ্য, প্রত্যক্ষত প্রাপ্য নহে, কিন্তু আসলে যিনি শ্রীভক্তিবিষয়ে অত্যন্ত উৎকর্ষতা লাভ করেছেন ও বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করে অসাধারণ আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করেছেন, সেই ব্যক্তিই উক্ত রূপ সাক্ষাৎ করে থাকেন।

শ্রীরুদ্র বলছেন—

'ভবান্ ভক্তিমতা লভ্যো দুর্লভঃ সর্বদেহিনাম্' (ভাগবত ৪।২৪।৫৪)

তুমি জীবন্মুক্ত সাধকদের পর্যন্ত দুর্লভ কিন্তু তোমার একান্ত জনেরাই তোমাকে লাভ করে থাকে। ব্রহ্মাদি ঐশ্বর্যশালী দেবগণ পর্যন্ত এই রূপের দর্শন কামনা করে থাকেন। কারণ এমন কোনো বিজ্ঞব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় না যিনি শ্রীভগবানের পাদমূল ত্যাগ করে বহির্বিষয়ে রত থাকতে পারেন ! তিনি আবার বলছেন—**'যত্র নির্বিষ্টমরণং কৃতান্তো নাভিমন্যতে'** (ভাগবত ৪।২৪।৫৬)।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত না হয়ে শ্রীভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করে, তাঁর উপর সর্ববিধ্বংসী কৃতান্তেরও আধিপত্য থাকে না।

শ্রীরুদ্র ভক্ত প্রসঙ্গে বলছেন, শ্রীভগবান কেন, ভগবদ্ ভক্তের সঙ্গও মহাফলদায়ী

ক্ষণার্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

(ভাগবত ৪।২৪।৫৭)

অর্থাৎ শ্রীভগবানকে আশ্রয় তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি ভগবানের ভক্তকেও আশ্রয় করে, তারও অসাধারণ সামর্থ্য আবির্ভূত হয়ে থাকে। ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গ এইরূপ বিচিত্র শক্তিজনক যে তার সঙ্গে স্বর্গ ও অপবর্গেরও তুলনা হয় না, লৌকিক বিনশ্বর স্বভাব রাজৈশ্বর্যাদির তো কথাই নেই। আবার ভগবানের ভক্তগণের এই সঙ্গ শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত হতে পারে না। অতএব শ্রীভগবানের আরাধনা করতে গিয়ে তাঁর নিকট কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তসঙ্গই কামনা করবে। তাহলে শ্রীভগবান পরিতুষ্ট হয়ে নিজ ভক্তগণের সঙ্গে মিলনে সাহায্য করবেন এবং তখনই ভগবানের ভক্তির আনন্দ অনুভূত হয়।

আবার বাহ্যবস্তুতে চিত্তবিক্ষেপ সম্বন্ধে বলছেন—

ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশৎ।

(ভাগবত ৪।২৪।৫৯)

অর্থাৎ বাহ্যাবস্থার দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ ও সুপ্তাবস্থা শ্রীভগবানের দর্শনলাভের মহাশত্রু। যে ব্যক্তির চিত্ত নিরন্তর বাহ্যবস্তুতে আসক্ত (রজভাব) বা যার চিত্ত জড়ভাবে ক্রিয়াবিমুখতা (তমোভাব) অবলম্বন করে, তার চিত্ত কখনই ভগবানের দর্শনলাভ করতে পারে না। তাই ভক্তিযোগের মার্গ অনুগমন করে চিত্তকে বহির্বিষয় হতে প্রত্যাহৃত করতে হয় যাতে চিত্ত থেকে জড়ভাব বিদূরিত হয় এইভাবে রজ ও তমোভাব পরিত্যাগ করে ও সত্ত্বাশ্রয় অবলম্বন করে নিরন্তর ভগবানের লীলা মনন করলেই চিত্তে শ্রীভগবানের আলোকসামান্য রূপলাবণ্যাদিযুক্ত সুমধুর পবিত্র মূর্তির সাক্ষাৎলাভ হয়।

তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে প্রণাম (শ্লোক ৬২—৬৮)

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ
শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং
বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ॥ ৬২

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তি-
স্তয়া রজঃসত্ত্বতমো বিভিদ্যতে।
মহানহং খং মরুদগ্নিবার্ধরাঃ
সুরর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ॥ ৬৩

সৃষ্টং স্বশক্ত্যেদমনুপ্রবিষ্ট-
শ্চতুর্বিধং পুরমাত্মাংশকেন।
অথো বিদুস্তং পুরুষং সন্তমন্ত-
র্ভুঙ্‌ক্তে হৃষীকৈর্মধু সারঘং যঃ॥ ৬৪

স এষ লোকানতিচণ্ডবেগো
বিকর্ষসি ত্বং খলু কালয়ানঃ।
ভূতানি ভূতৈরনুমেয়তত্ত্বো
ঘনাবলীর্বায়ুরিবাবিষহ্যঃ॥ ৬৫

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া
প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে
ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ॥ ৬৬

কস্ত্বৎপদাব্জং বিজহাতি পণ্ডিতো
যস্তেঽবমানব্যয়মানকেতনঃ।
বিশঙ্কয়াস্মদ্‌গুরুরর্চতি স্ম যদ্
বিনোপপত্তিং মনবশ্চতুর্দশ॥ ৬৭

অথ ত্বমসি নো ব্রহ্মন্ পরমাত্মন্ বিপশ্চিতাম্।
বিশ্বং রুদ্রভয়ধ্বস্তমকুতশ্চিত্তয়া গতিঃ॥ ৬৮

সরলার্থ—পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের নিয়ন্তারূপে তোমার স্বরূপ উপলক্ষিত হয়ে থাকে। যে কর্মযোগিগণ সিদ্ধিলাভের জন্য বহুপ্রকার ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তোমার এই সগুণ, সাকার স্বরূপের সশ্রদ্ধ সম্যক আরাধনা করেন, তাঁরাই বেদ ও শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত মর্মজ্ঞ॥ ৬২ ॥ প্রভু ! তুমিই অদ্বিতীয় আদিপুরুষ। সৃষ্টির পূর্বে তোমার মায়াশক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরে সেই মায়ারই দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের ভেদ বা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভাব সম্পাদিত হয় এবং তারপরে সেই গুণসমূহ থেকেই মহত্তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, দেবতা, ঋষি এবং সর্বপ্রাণী সমন্বিত এই জগতের উৎপত্তি হয়॥ ৬৩ ॥ তুমি নিজের মায়াশক্তি দ্বারা সৃষ্ট এই জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ ভেদে চতুর্বিধ শরীরে অংশরূপে অনুপ্রবিষ্ট হও এবং মধুমক্ষিকারা যেমন মধুচক্র রচনা করে তার মধ্যে নিজেদের সংগৃহীত মধু নিজেরাই আস্বাদন করে, সেই রকমেই তোমার সেই অংশ সেই সব শরীরে অবস্থান করে ইন্দ্রিয় দ্বারা এই তুচ্ছ বিষয়সমূহ ভোগ করে। তোমার সেই অংশকেই 'পুরুষ' বা 'জীব' নামে অভিহিত করা হয়॥ ৬৪ ॥ প্রভু, তোমার তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে হয় না, অনুমানের সাহায্যে হয়। প্রলয়কাল উপস্থিত হলে কালস্বরূপ তুমি নিজের প্রচণ্ড অসহনীয় বেগে পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহের একটিকে অপরটির দ্বারা বিচলিত করে সমগ্র লোককে সংহার করে থাক—যেমন বায়ু নিজের অসহ্য প্রচণ্ড বেগে মেঘের দ্বারা মেঘকে আহত করে ছিন্নভিন্ন করে দেয়॥ ৬৫ ॥ ইতিকর্তব্য-চিন্তায় ('এই রূপে এই কাজ করতে হবে' ইত্যাদি চিন্তা) নিতান্ত প্রমত্ত জীব অতিরিক্ত লোভ এবং বিষয়ের লালসার বশবর্তী হয়ে জীবন কাটায়, কিন্তু কালরূপী তুমি তাকে ভুলো না ; ক্ষুধার্ত সাপ যেমন ইঁদুরকে মুহূর্তে গিলে ফেলে সেইরকম তুমিও বিষয় চিন্তাপরায়ণ মানুষকে সহসাই গ্রাস করে থাক॥ ৬৬ ॥ তোমার প্রতি অবহেলায় (ঔদাসীন্যে, স্মরণ-বন্দনাদিরহিতভাবে) শরীরধারণ বা জীবনযাপন বৃথা—এই বোধ যার জন্মায়, সে-ই প্রকৃতপক্ষে বিদ্বান ; সে কি

আর তোমার চরণকমলের আশ্রয় ত্যাগ করে ? মহাকালের শঙ্কাবশেই তো স্বয়ং লোকগুরু ভগবান ব্রহ্মাও স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনুসহ স্বাভাবিক (নির্বিচার) পরম শ্রদ্ধায় তোমার পাদপদ্মের অর্চনা করেন॥ ৬৭ ॥ মহাকালরূপী রুদ্রদেবের ভয়ে তো বিশ্বজগৎ-ই ব্যাকুল ! সুতরাং হে ব্রহ্মস্বরূপ, হে পরমাত্মন্ ! যাদের এই জ্ঞান জন্মেছে যে, (তুমি বিনা পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই) সেই তুমিই আমাদের একমাত্র অভয় আশ্রয়, অকুতোভয় গতি॥ ৬৮ ॥

মূলভাব—ব্রহ্মই একমাত্র জ্যোতির্ময়, তাঁহারই দীপ্তিতে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রদীপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জগৎকে উদ্ভাসিত করে—**'তস্য ভাসা সর্বমিদম্ বিভাতি'**। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যখন সেই ব্রহ্মপদার্থের আনন্দময় স্বরূপের উপলব্ধি করতে পারেন, তখন তাঁর নিকট সমস্ত জগৎ বিলীন হয়ে যায় এবং তখন তিনি সোহহং রূপে অবস্থিত হয়ে পরমানন্দসাগরে মগ্ন হন। ওই ব্রহ্ম স্বয়ং নির্বিকার হলেও মায়ার অলৌকিক মাহাত্মে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করে থাকেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু সংকর্ষণ রূপ তাঁরই বিভূতি। মায়ার প্রভাবে জীব সুখ-দুঃখাদি বিচিত্র ভাবের অনুভব করে থাকে। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় যখন তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষে জীব মায়ামুক্ত হয় তখন আর তার জীবের প্রতি রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, সুখ-দুঃখাদি বিচিত্র ভাব থাকে না—তখন শ্রীভগবানের ভেদহীন মূর্তি তার সর্বত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু যাঁরা অজ্ঞ, শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধিতে অসমর্থ, তাদেরই নিকট ভগবান বিভিন্ন আকারে প্রতীত হয়ে থাকেন।

শ্রীরুদ্র শ্রীভগবানকে কালরূপেও স্তব করেছেন। শ্রীভগবান কালরূপী, তিনি সমস্ত জগৎকে যথাসময় বিনষ্ট করে থাকেন। তাঁর এই কালরূপ ভগবৎ বিমুখ বিষয়াসক্ত প্রমত্ত ব্যক্তিকেই আক্রমণ করে।

'বিশ্বং রুদ্রভয়ধ্বস্তমকুতশ্চিন্তয়া গতিঃ' (ভাগবত ৪।২৪।৬৮)

হে ভগবন্ ! সমগ্র বিশ্বর মূঢ় যারা ভগবানের চরণাশ্রয় ত্যাগ করে তারাই কালভয়ে বিব্রত, আর আমরা যারা তোমার চরণাশ্রিত তাদের তো তুমিই আমাদের অকুতোভয় আশ্রয়।

শ্রীরুদ্র এইভাবে শ্রীভগবানের বহুরূপের স্তুতি করে রাজকুমার প্রচেতাদের বলছেন—

ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ।
স্বধর্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়াঃ॥
(ভাগবত ৪।২৪।৬৯)

তোমরা নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান করে শ্রীভগবানে চিত্ত সমর্পণপূর্বক বিশুদ্ধ ভক্তি সহকারে শ্রীভগবানের এই স্তোত্র জপ করবে। যে পুরুষ একাগ্রচিত্তে অবহিতভাবে বাসুদেবপরায়ণ হয়ে নিরন্তর এই স্তোত্র জপ করে সে অচিরাৎ শ্রেয় লাভ করে। এই স্তোত্র পুরাকালে ব্রহ্মার কথিত তাই এটি জপ করলে তোমাদের অভীষ্ট অবশ্যই পূর্ণ হবে।

এইরূপে ভগবান রুদ্র প্রচেতাদিগকে যে উপদেশ দেওয়ার জন্য এসেছিলেন তা সমাপ্ত হলে রুদ্রের উপদেশে পরম পরিতুষ্ট হয়ে স্বীয় কার্যের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী মনে করে প্রচেতাগণ ভগবান রুদ্রের যথাযোগ্য অর্চনা করলেন। অতঃপর ভগবান রুদ্রদেব অন্তর্হিত হলেন। প্রচেতাগণ ভগবান রুদ্রের উপদেশক্রমে বহুকাল যাবৎ জলে থেকে তপস্যা করলেন।

———○———

প্রহ্লাদের আখ্যান ও স্তুতি

(সপ্তম স্কন্ধ, ১—১০ অধ্যায়)

প্রাক্কথন

প্রাককথন—প্রহ্লাদ চরিত শ্রীমদভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের প্রথম থেকে দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়গুলিতে আছে কাশ্যপ-দিতির বংশবর্ণনা, হিরণ্যকশিপুকে ব্রহ্মার বরপ্রদান, প্রহ্লাদের জন্ম ও হরিতে তাঁর স্বভাবজ প্রেম, হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ ও প্রহ্লাদের উপর অত্যাচার, বিষ্ণু কর্তৃক দেবতাদের আশ্বাসন ও নৃসিংহ অবতাররূপে হিরণ্যকশিপু বধ এবং অবশেষে প্রহ্লাদের বিষ্ণুস্তুতি দ্বারা তাঁকে শান্ত করা এবং বিষ্ণুর বরপ্রদান।

দানব-দলন কী বিষ্ণুর বৈষম্য—পূর্ব স্কন্ধে (ষষ্ঠ স্কন্ধ অষ্টাদশাধ্যায়ে)

শ্রীশুকদেব বলেছিলেন **'হতপুত্রা দিতিঃ শক্র পার্ষ্ণিগ্রাহেণ বিষ্ণুনা'** অর্থাৎ ইন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকরূপে এবং তৎপক্ষপাতী হয়ে ভগবান বিষ্ণু কশ্যপপত্নী দিতির গর্ভজাত দৈত্যগণকে বধ করেছিলেন। এই কথা শুনে পরীক্ষিত বললেন—হে ভগবন্! আপনি সর্বতত্ত্বদর্শী মহর্ষি, তাই আপনি আমার একটি সংশয় ছিন্ন করুন।

সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্‌ব্রহ্মন্ ভূতানাং ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রস্যার্থে কথং দৈত্যানবধীদ্বিষমৌ যথা ॥

(ভাগবত ৭।১।১)

হে ব্রহ্মন্! ভগবান স্বয়ং সকল প্রাণীর পক্ষেই তুল্য, প্রিয় ও সুহৃৎ, তবে তিনি বৈষম্যযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় ইন্দ্রের জন্য দিতির পুত্রগণকে বধ করলেন কেন?

ভগবান শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে পরম আপ্যায়িত হয়ে বললেন—তুমি যে প্রশ্ন করেছ তা বাস্তবিকই উত্তম প্রশ্ন। শ্রীভগবানের চরিত্র অতি দুর্জ্ঞেয়, উহার বৈচিত্র্যে সকলেই মুগ্ধ। নারদাদি ঋষি—যাঁরা ভগবানের চির-সহচর তাঁরা সকলেই ভগবানের এই মাহাত্ম্যকে ভগবদ্ভক্তিবর্ধক ও পরম পবিত্র বলে কীর্তন করে থাকেন। মায়া নামে ভগবানের যে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি আছে, সেই মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা। এই মায়াই ভগবানের সৃষ্ট জগতের পরিচালিকা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এ হল প্রকৃতিরই গুণ, আত্মার নয়। জীবের দেহে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি সর্বদা সমভাবে অবস্থান করে না। এক একটি গুণের আধিক্য ও ন্যূনতাবশত এক এক জাতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়। যখন সত্ত্বগুণ প্রবলভাব ধারণ করে তখন তা হতে সত্ত্বগুণ প্রধান দেবদেহ সৃষ্ট হয় আর যখন রজোগুণ প্রবল হয় তখন অপর দুই গুণ ন্যূনতা হেতু অসুর দেহের সৃষ্টি হয়। আবার যখন তমোগুণ প্রবল হয় তখন যক্ষ-রাক্ষসাদি দেহের আবির্ভাব হয়। এইভাবে জীব দেহে অবস্থিত গুণের মধ্যে যখন দেবদেহের সত্ত্বগুণ অপেক্ষা অসুরদেহের রজোগুণ প্রবল হয় তখন বোধ হয় যে ভগবান অসুরদেহে আবিষ্ট হয়ে দেবদেহকে পরাস্ত করছেন। আবার অসুরদেহের রজোগুণ অপেক্ষা যখন দেবগণের সত্ত্বগুণ

প্রবলতা ধারণ করে, তখন যেন ভগবান ওই দেবদেহে অধিষ্ঠিত থেকে অসুরগণকে পরাভূত করেন। এই যে দেব-অসুর দেহের জয়-পরাজয় তাতে তাদের নিজেদের কোনো স্বাতন্ত্র্য নাই, গুণের হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারেই তা হয়ে থাকে। এই **গুণের পরিবর্তন আবার কালানুসারেই হয়ে থাকে** যার ফলে এই পরস্পর বাধ্য-বাধক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইহা যেমন গুণকৃত তেমন কালকৃতও।

ভগবান কালেরও অধীন নন, গুণেরও অধীন নন। তবে ভগবান যে সত্ত্বাদিগুণে অধিষ্ঠান করে, তাদের বৃদ্ধিসাধনপূর্বক অপরের বাধক বলে প্রতীত হন এর তাৎপর্য হল এই যে, কালও তাঁর কার্য আবার গুণও তাঁর কার্য, আর কার্যের ধর্ম কারণে উপচরিত হয়ে থাকে বলে কালের ক্রিয়া আর গুণের ক্রিয়াই ভগবানে আরোপিত হয় মাত্র। এইভাবে যখন কালপ্রভাবে জীবের শরীরের ভোগের সময় আসে তখন তার মধ্যে রজঃগুণ বৃদ্ধি হয়। আবার যখন এই বিচিত্র দেহাদিতে ভগবানের ক্রীড়া করার সময় জাগ্রত হয়, তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় এবং অবশেষে যখন শরীরের সংহারের সময় উপস্থিত হয় তখন তমোগুণের বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এইরূপে সত্ত্বাদিগুণের আধিক্য ও ন্যূনতাবশত এই শরীরেই ভগবৎ অধিষ্ঠানের আধিক্য ও ন্যূনতা প্রতীত হয়। তবে আত্মা যে দেবাদিদেহে অধিষ্ঠিত থাকেন, ওই দেবাদিদেহ হতে তাঁকে কখনই পৃথকরূপে ধারণা করা যায় না, দেহ হতে তা অভেদই মনে হয়। মায়ামুগ্ধ জীব শতচেষ্টা করেও উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। কিন্তু যাঁরা পরতত্ত্ব অবগত হয়েছেন, আত্মতত্ত্বের সন্ধান লাভ করে, অঘটন-ঘটন পটীয়সী ঈশ্বরশক্তি মায়ার অমোঘ বন্ধনপাশ ছিন্ন করতে পেরেছেন, কেবল তাঁরাই আত্মাকে দেবাদিদেহ হতে পৃথক বলে বুঝতে পারেন। এই কারণেই আত্মা যে দেবাদিদেহে অধিষ্ঠান করে সকল কার্যাবলীর সহায়তা করেন— এই কথা বলা হয়। আসলে কালের ক্রিয়াই ভগবানে আরোপিত হয় মাত্র। গীতায়ও ভগবান বলেছেন—'**যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্। যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥**' (গীতা ১৫।১১)। অর্থাৎ যত্নশীল যোগিগণই নিজেদের হৃদয়ে অবস্থিত এই

আত্মাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারেন। কিন্তু যাদের হৃদয় শুদ্ধ হয়নি এইরূপ অজ্ঞানিগণ যত্ন করলেও এই আত্মাকে শরীরে অবস্থিত বলে জানতে পারেন না।

শ্রীশুকদেব এইরূপ তত্ত্বকথা বর্ণনা করে বলছেন যে তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠিরও মহতপা তত্ত্বদর্শী ঋষি নারদকে, সমদর্শী ভগবানের দৈত্যবধ প্রসঙ্গে তাঁর ঐরূপ সংশয় প্রকাশ করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে চেদিরাজ শিশুপাল উপস্থিত ছিলেন। তিনি চিরকালই কৃষ্ণবিদ্বেষী আর এই যজ্ঞে কৃষ্ণর প্রতি দুর্বাক্য ও বহু নিন্দাবাদ করলে, তিনি বিষ্ণুচক্রে নিহত হয়ে সর্বসমক্ষে ভগবানে লীন হয়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভগবানের নিন্দা করেও শিশুপাল ভগবৎ-সাযুজ্য লাভ করলেন অথচ রাজা বেন ভগবানের নিন্দা করায় মুনিগণ তাঁকে নরকে পতিত করেছিলেন।

তখন নারদ মুনি ভগবৎ-সাযুজ্যের তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন।

কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।

আবেশ্য তদঘং হিত্যা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥ (ভাগবত ৭।১।২৯)

ভক্তি ব্যতীতও **কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহ** এই পঞ্চ সম্বন্ধের একটি দ্বারাও ভগবান বাসুদেবে একান্তভাবে চিত্তসন্নিবেশ করতে পারলে ভগবান তার রাগদ্বেষাদিজনিত পাতক দূর করে তাকে তাঁর নিজ গতি বা তাঁর সাযুজ্য-লাভ করান।

নারদ ভগবৎ-সাযুজ্য লাভের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত করে বলছেন—

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।

সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥

(ভাগবত ৭।১।৩০)

হে রাজন্! গোপীগণ কামহেতু, কংস ভয়হেতু, শিশুপাল আদি রাজগণ দ্বেষহেতু, তোমরা ও যাদবগণ সম্বন্ধ হেতু এবং আমরা ভক্তিহেতু তাঁর গতি প্রাপ্ত হয়েছি।

নারদ আরো বলেছেন যে সকল ব্যক্তি ভক্তি বা স্নেহাদি অবলম্বন করে ভগবানের ধ্যানে নিবিষ্ট হন তাঁদের অপেক্ষা যাঁরা ভয় বা বিদ্বেষবুদ্ধিতে

শ্রীভগবানের ধ্যান করে থাকে বা ভগবান হতে অনিষ্ট আশঙ্কায় তাঁর নিরন্তর চিন্তায় মগ্ন হন, তাঁরা শয়নে স্বপনে নিদ্রায় বা জাগরণে তাঁর দিকে চিত্ত সমর্পণ করে আত্মরক্ষার্থে প্রবৃত্ত হন, তাই তাঁরা বিশিষ্ট রূপে ভগবানে তন্ময়তা লাভ করে থাকেন। কিন্তু ভক্তিযোগে সাধারণত ঠিক ওইরকম ধ্যানের নিরন্তরতা দেখা যায় না, কেননা ভক্তিযোগের সাধকদের অনেকের মধ্যেই দেহাবেশ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। তাই দেখা যায় যে, ভক্তিযোগ অপেক্ষা বিদ্বেষ বুদ্ধিতে শ্রীভগবানে অধিক তন্ময়তা লাভ হয়ে থাকে। আর এই তন্ময়তা প্রাপ্ত মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি নিয়েই যখন সে শ্রীভগবানের হস্তে জীবলীলার অবসান হয় তখন সে ভগবৎ-সাযুজ্যই প্রাপ্ত হয়। যেমন কংসর অন্তিম সময়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলছেন—

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্যটন্ মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ॥

(ভাগবত ১০।২।২৪)

অর্থাৎ দ্বেষভাবের প্রাবল্যে কংস শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে স্থিতিতে বা গতিতে সর্বদাই সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী শ্রীভগবানের কথা চিন্তা করতে করতে জগৎ হরিময় দেখতে লাগলেন।

অতএব কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ বা ভক্তি যে কোনো ভাবেই হোক না কেন ভগবানে মন সমর্পণ করবে— **'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ'** (ভাগবত ৭।১।৩১)। বেন রাজা প্রসঙ্গে নারদ বললেন, দেখো যুধিষ্ঠির! বেন রাজা যে ভগবানের নিন্দা করেছিলেন তা আত্মগরিমার ফলে, তাঁর মধ্যে এই পঞ্চভাবের কোনো ভাব ছিল না তাই তিনি নরকে পতিত হয়েছিলেন। কিন্তু শিশুপাল আদি রাজা এই পঞ্চবিধ মানসিক ভাববিশেষের মধ্যে দ্বেষ ভাবের এত প্রাবল্য ছিল এবং এর দ্বারা এত তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে জীবনের প্রতি ক্ষণে কৃষ্ণ সম্বন্ধে বিরূপ চিন্তা করতেন, তাই কৃষ্ণর হাতে নিহত হয়ে তিনি ভগবৎ-সাযুজ্য লাভ করেন। অতএব যে ব্যক্তি উত্তম ভগবদ্‌গতি কামনা করবে সে এই পঞ্চভাবের মধ্যে যেকোনো একটি ভাব নিয়ে তন্ময় হবে আর সেই তন্ময়তার ফলেই তার ঐহিক ও পারত্রিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে এবং

উৎকৃষ্ট ভগবৎপদ স্বেচ্ছায় এসে তাকে বরণ করবে।

নারদ এই পঞ্চভাবে তন্ময়তার কথা বলে, পরে সাবধান করে বলছেন কাম, দ্বেষ বা ভয় আসন্ন কলিযুগের জন্য নয়। কলিযুগে স্নেহ ও ভক্তি দ্বারাই ভগবান সেব্য। নারদ যুধিষ্ঠিরকে আরো বলছেন— শিশুপাল ও দন্তবক্র সাধারণ ব্যক্তি নয়। জন্মান্তরে ওরা জয় ও বিজয় নামে বৈকুণ্ঠে ভগবানের দ্বারপাল ছিল। তারা ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি দ্বারা অভিশাপ প্রাপ্ত হয়ে ক্রমে সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং দ্বাপরে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছে। এই জন্মে দন্তবক্র ও শিশুপাল কখনো ভগবানের প্রশংসা করেনি বরং চিরকালই তাঁর নিন্দা করেছে আর এর ফলে যে পাপ জন্মেছে তা কিভাবে ক্ষালন হল সে কথা বলতে গিয়ে নারদ বলছেন—ভগবান **'হতারিগতিদায়ক'** অর্থাৎ তিনি শত্রুকেও নিহত করে তাকে মুক্তি দান করেন। আবার শিশুপাল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নারদ বলছেন **'কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ'** (ভাগবত ৭।১।৪৬) অর্থাৎ ভগবানের নিন্দাদি করে তাঁর যে পাতক উৎপন্ন হয়েছিল তা শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক চক্রস্পর্শেই তিরোহিত হয়েছিল। তাই এরূপ কোনো পাপই শিশুপাল আদির উৎকৃষ্ট গতি রোধ করতে পারেনি। কিন্তু বেন রাজার ওইরকম কোনো কারণ না থাকায় তাঁর নরকে গতি হয়েছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন বললেন হে ভগবন নারদ! আপনার বাক্যে আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি কিন্তু আমাকে বলুন কেনই বা হিরণ্যকশিপু তাঁর পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি এত বিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলেন আর কি করেই বা অসুরপুত্র প্রহ্লাদের ভগবানের প্রতি এরূপ অসাধারণ প্রেমলাভ হয়েছিল।

দেবর্ষি নারদ তখন নবম অধ্যায় অবধি প্রহ্লাদচরিত এবং দশম অধ্যায়ে প্রহ্লাদের ভগবৎস্তুতি বর্ণনা করেছেন।

হিরণ্যাক্ষ বধ— বৈকুণ্ঠে ভগবান বিষ্ণুর জয় ও বিজয় নামক দ্বারপালদ্বয় সনক-সনন্দাদি মহর্ষিগণের শাপে বৈকুণ্ঠ থেকে পতিত হয়ে পৃথিবীতে অসুররূপী, হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপর তারা উৎকট শৌর্য সহকারে দেবতা ও মানুষের ওপর অত্যাচার শুরু করল। ভগবান

তখন সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ রক্ষা ও পরিবৃদ্ধির জন্য বরাহ অবতার ধারণ করে হিরণ্যাক্ষকে নাশ করেন। ভাইয়ের মৃত্যুতে হিরণ্যকশিপু অধীর হয়ে হরিকে ভ্রাতৃহন্তা জেনে তাঁর প্রতি এমন বিদ্বেষপ্রাপ্ত হলেন যে কেউ হরির নাম উচ্চারণ করলেও হিরণ্যকশিপু ক্ষিপ্ত হয়ে পড়তেন। অথচ হিরণ্যকশিপু শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন তাই হিরণ্যাক্ষর মৃত্যুর পর তিনি বাড়ির সবাইকে আত্মার অবিনশ্বরত্ব বোঝালেন। তিনি বললেন— সকল প্রাণীই নিজকৃত কর্মানুসারে কালে উৎপন্ন হয় ও কাল সমাপ্ত হলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আত্মা ওই দেহের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত হলেও দেহ হতে পৃথক এবং দেহের ধর্ম যেমন জরা-ব্যাধি-মরণাদি জাগতিক বস্তুর দ্বারা তা কখনো বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয় না। স্বপ্ন যেমন মিথ্যা বিষয় নিয়েই উৎপন্ন হয়, জাগতিক বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও সেইরকম। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ ও তার সমস্ত বস্তু যা জীব আমি-আমি বা আমার-আমার বোধে আপন করে নেয় তা সর্বৈব মিথ্যা, কখনই সত্য নয় অর্থাৎ মরণশীল। অতঃপর যমরাজের উপদেশ বর্ণনা করে বললেন—

অথ নিত্যমনিত্যং বা নেহ শোচন্তি তদ্বিদঃ।
নান্যথা শক্যতে কর্তুং স্বভাবঃ শোচতামিতি॥ (ভাগবত ৭।২।৪৯)

অর্থাৎ যাঁরা এই বস্তু নিত্য এবং এই বস্তু অনিত্য—এ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরা কখনই অবিনশ্বর আত্মা বা অনিত্য দেহাদির জন্য শোক করেন না। আর যারা শোক করে তারা মায়াপ্রভাবে আচ্ছন্ন, তাই তাদের শোক করার স্বভাবের পরিবর্তন করা কিছুতেই সহজ নয়।

কিন্তু হিরণ্যকশিপু শাস্ত্র জানলেও তাঁর হরিভক্তি ছিল না, তার ওপর হিরণ্যাক্ষের ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হওয়ার পরে তিনি আরো হরি-বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েন। তার শাস্ত্রজ্ঞান যেন 'বিষ কুম্ভ পয়োমুখম্' অর্থাৎ বিষকুম্ভের মুখে দুধের মতো শোভা পেত। তিনি সমস্ত অসুরকুলকে ডেকে বললেন দেখো ওই হীনচেতা বিষ্ণুর সাহায্যেই দেবগণ বলদৃপ্ত হয়েছে তাই সকলে ওই হরির বিধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হও। দেখো তপঃ, যজ্ঞ প্রভৃতিই হরির মূলস্বরূপ, তাই এগুলোকে বিনাস করতে পারলেই হরিকে দুর্বল করা যাবে। তাই তোমরা

'সৃদয়ধ্বং তপোযজ্ঞস্বাধ্যায়ব্রতদানিনঃ' (ভাগবত ৭।২।১০)। অর্থাৎ পৃথিবীতে গিয়ে তপস্যা, যজ্ঞ, বেদাদি, অধ্যয়ন, ব্রত ও দানকারীদের শীঘ্রই বিনাশ করো।

হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যা ও রক্ষার বরলাভ—

এইভাবে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু উপদেশ-বাক্যে মাতা দিতি ও হিরণ্যাক্ষর স্ত্রী আদিদের শান্ত করে ও তার অনুচরদের দেব-দ্বিজনাশের আদেশ দিয়ে, কঠোর তপস্যা ও বরলাভে প্রবৃত্ত হলেন। এ যেন **'পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং'** নীতি প্রকাশ। শত্রুর প্রতি বিরোধবুদ্ধি ত্যাগ না করে বরং প্রতিশোধ নেওয়ার জ্বলন্ত ইচ্ছায় তিনি কঠোর তপপ্রভাবে অসাধারণ শক্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করলেন **'হিরণ্যকশিপূ রাজন্নজেয়মজরামরম্। আত্মান মপ্রতিদ্বন্দমেকরাজং ব্যধিৎসত॥'** (ভাগবত ৭।৩।১) অর্থাৎ নিজেকে অজেয়, অমর, অজর (জরাবিহীন), অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা হওয়ার জন্য ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করলেন। যেহেতু 'অমর বরদান' কল্পান্তে বিনাশশীল ব্রহ্মারও সাধ্যাতীত তাই চতুর হিরণ্যকশিপু দুটি বর চাইলেন—

১) ব্রহ্মার সৃষ্ট কোনো প্রাণী থেকে যেন তার মৃত্যু না হয়, আবার ঘরে-বাইরে, দিনে-রাত্রিতে বা ভূমিতে-শূন্যেও যেন মৃত্যু না হয়।

২) লোকপালদের সমস্ত প্রভাব এবং তপস্যা ও যোগবলে প্রাপ্ত সকল অনিমাদি, অষ্টৈশ্বর্যও যেন নিয়ত তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্মার বরে বলদৃপ্ত হয়ে হিরণ্যকশিপু লোকপালগণের প্রতি আধিপত্য বিস্তার করে ত্রিজগতে অত্যাচারে প্রবৃত্ত হলেন।

নারায়ণের দেবতাদের প্রতি অভয়দান—

হিরণ্যকশিপুর ক্রূর শাসনে ভয়-ভীত হয়ে এবং কারও নিকট প্রতিকারের কোনো আশা না দেখে লোকপালগণ নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন। দেবতাদের কাতর ক্রন্দনে মেঘগম্ভীর আকাশবাণী হল—হে দেবশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা ভীত হয়ো না। এই দৈত্য কুলাধমের দৌরাত্ম্য আমি জানি, তার শাস্তি আমি শীঘ্রই প্রদান করব। দেখো যে দেবতায়, বেদে, বিপ্রে, সাধুতে, ধর্মে আর আমাতে বিদ্বেষ পোষণ করে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তবে হিরণ্যকশিপুর বিনাশ আমি

তখনই করব যখন—

নির্বৈরায় প্রশান্তায় স্বসুতায় মহাত্মনে।

প্রহ্লাদায় যদা দ্রুহ্যেদ্ধনিষ্যেঽপি বরোর্জিতম্।। (ভাগবত ৭।৪।২৮)

অর্থাৎ যখন হিরণ্যকশিপু নিজপুত্র শত্রুশূন্য প্রশান্ত মহাত্মা প্রহ্লাদকে দ্বেষ করতে থাকবে আর তখনই ওই বরমত্ত দৈত্যবরকে আমি বধ করব।

ভগবান হরির এই আশ্বাসবাক্য শুনে, দেবগণ আশ্বস্ত হয়ে পুনঃপুনঃ প্রণাম করে নিরুদ্বেগে প্রস্থান করলেন।

যথাকালে দৈত্যপতির চারটি পুত্র জন্মাল। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রহ্লাদ সর্বগুণসম্পন্ন।

ব্রহ্মণ্যঃ শীলসম্পন্নঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

আত্মবৎ সর্বভূতানামেকঃ প্রিয়সুহৃত্তমঃ।। (ভাগবত ৭।৪।৩১)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত চরিত্রসম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় সকল প্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সকলের প্রিয় সুহৃৎ এবং বিবিধ গুণাবলী ভূষিত।

তদুপরি প্রহ্লাদ অসাধারণ বিষ্ণুভক্তরূপে পরিগণিত হলেন, এমনকি নারদও তাঁকে বৈষ্ণব বলে বিশেষ মান্য করতেন। ক্রমে প্রহ্লাদ বিষ্ণুর আরাধনায় এত তন্ময় থাকতেন যে, চতুর্দিকে সাধুসমাজে প্রহ্লাদের যশোগান হতে লাগল আর এইভাবে প্রহ্লাদ একজন জগৎপুজ্য বৈষ্ণব হলেন। এদিকে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ নিধন বৃত্তান্ত স্মরণে বিশেষভাবে বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষ করছেন আর অন্যদিকে নিজপুত্র প্রহ্লাদই বিষ্ণুর পরম ভক্ত। তাই প্রহ্লাদ নিজপুত্র হলেও বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুভক্ত নিজপুত্রের প্রতিও দ্বেষ আরম্ভ করলেন।

প্রহ্লাদের ভক্তি ও হিরণ্যকশিপু

প্রহ্লাদ তখন শিশু। হিরণ্যকশিপু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের পুত্রদ্বয় ষণ্ড ও অমর্ককে প্রহ্লাদের নীতিশাস্ত্র শিক্ষায় নিযুক্ত করলেন। কিন্তু দৈত্যরাজের আদিষ্ট ষণ্ড-অমর্ক আত্মপর-ভেদাত্মক দণ্ড, নীতি প্রভৃতি জাগতিক শিক্ষা প্রহ্লাদের হৃদয় স্পর্শ করল না। প্রহ্লাদের জাগতিক শিক্ষায় অনীহা আর হরির প্রতি অত্যধিক প্রীতি দেখে ষণ্ড ও অমর্ক জিজ্ঞাসা করলেন, প্রহ্লাদ ! আমরা

তোমায় তো হরিভক্তি শিক্ষা দিইনি, কেবল জাগতিক শিক্ষাই দিয়েছি, তবে তুমি এই শিক্ষা পেলে কোথা থেকে। প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন—যাঁর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে জীব আপন-পর প্রভৃতি প্রতিকূল পথের পথিক হয়, আবার যাঁর অনুকূল দৃষ্টিতে জীবের আত্ম-পররূপ পশুবুদ্ধি বিনাশ হয়, সেই মায়াধীশ পরমপুরুষ হরির চরণে কোটি কোটি প্রণাম। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ঋষিগণ পর্যন্তও যে পরমাত্মার প্রকাশ পান না, সেই পরমাত্মাই আমার ওইরূপ বুদ্ধি জন্মিয়েছেন।

যয়া ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।

তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া॥ (ভাগবত ৭।৫।১৪)

চুম্বকের দ্বারা লোহা যেমন আকৃষ্ট হয় সেইরকম চক্রপানি বিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমেই আমারও চিত্ত স্বয়ংই তাঁর দিকে সদাই আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

এই কথা শুনে তাঁর গুরুদেবরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে পুনরায় ধর্ম-অর্থ-কাম প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করালেন এবং তৎপরে প্রহ্লাদকে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে উপস্থিত করলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের শিরশ্চুম্বনপূর্বক তাঁকে আপন ক্রোড়ে বসিয়ে বললেন— বৎস ! এতদিন পর্যন্ত গুরুগৃহে যা শিখেছ তার মধ্যে যা ভালো, তার কিছু কিছু অংশ বলো।

প্রহ্লাদ বললেন—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

(ভাগবত ৭।৫।২৩-২৪)

অর্থাৎ বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ, নাম সংকীর্তন, বিষ্ণুর লীলা স্মরণ,পাদসেবা, পূজা, স্তোত্রপাঠ, দাস্যভাবে কর্মসমর্পণ, সখ্যভাবে তাঁতে বিশ্বাস এবং তাঁকে দেহ সমর্পণ— এই নয় প্রকার লক্ষণযুক্ত ভগবদ্বিষয়িনী চেষ্টার নামই ভক্তি। আর এই নবলক্ষণাত্মক ভক্তি, সাধকের নিজ স্বার্থ, ধর্ম ও অর্থ প্রভৃতি পুরুষার্থের উদ্দেশ্যে অর্পিত না হয়ে কেবল বিষ্ণু প্রীত্যার্থেই হওয়া

উচিত আর তাকেই আমি উত্তম অধ্যয়ন বলে মনে করি। এর ব্যতিক্রম হলে ভক্তির পরিপক্কতা আসে না। কারণ '**ভক্তিমুক্তি আদি বাঞ্ছা মনে যদি রয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥**' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

প্রহ্লাদ-বর্ণিত নববিধা ভক্তির মধ্যে যদিও কায়মনোবাক্যে যেকোনো একটি অঙ্গের সাধন করলেই ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়, কিন্তু তাহলেও ভক্তি অঙ্গসমূহের নয়টা ক্রম আছে এবং অন্তকরণ শুদ্ধির জন্য সকল ভক্তসাধকের প্রথমেই নাম শ্রবণ অত্যাবশ্যক।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম কভু সাধ্য নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করায় উদয়॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আবার নববিধা ভক্তির শেষ অবস্থা আত্মসমর্পণ। ভাব পরিপক্ক হয়ে ভক্তি সাধনের এই চরম অবস্থায় সাধকের নিজ দেহের যাবতীয় জাগতিক প্রচেষ্টার অবসান হয়। সাধকভক্ত তখন সর্বত্যাগিনী ব্রজগোপিনীর ন্যায় নিজ দেহ-গেহ সাধ্য-সাধন সবকিছু শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করে বলেন হে প্রভু ! দেহদৈহিকাদি আমার যা কিছু আছে সবই তোমার পায়ে সঁপে দিলাম, আমার নিজের বলে কিছু রইল না, সবই তোমার—

দেই তুলসী তিল, এ দেহ সমর্পিলু
দয়া জনি ন ছোড়বি মোয়॥

এইভাবে ভক্তসাধক শ্রীভগবানে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেন। গবাদি পশু বিক্রীত হওয়ার পর সেই বিক্রীত পশুর ভরণপোষণ ও জীবন রক্ষার জন্য যেমন বিক্রেতার আর কোনো চিন্তা বা দায় থাকে না, সেইরকম ভক্তসাধকও আত্মসমর্পণের পর নিজ দেহ ও তার রক্ষণ হতে সম্পূর্ণ বিরত হন। এই হল আত্মনিবেদন বা শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণের পরিপূর্ণ রূপ।

পূর্বে বলা হয়েছে, প্রহ্লাদ কথিত নববিধা ভক্তির মধ্যে কায়মনোবাক্যে যে কোনো একটি অঙ্গের সাধন করলেই জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। যেমন—হরিকথা শ্রবণ করে শ্রীপরীক্ষিৎ, হরিকথা কীর্তন করে শ্রীশুকদেব, হরিস্মরণ করে শ্রীপ্রহ্লাদ, হরির পাদসেবন করে লক্ষ্মীদেবী, হরির অর্চনা করে পৃথু মহারাজ, হরির বন্দনা করে অক্রূর, হরির দাস্য ভক্তি করে শ্রীহনুমান,

হরিকে সখ্যভাবে সেবা করে অর্জুন এবং হরির প্রতি সর্বস্ব নিবেদন করে শ্রীবলি — এঁরা প্রত্যেকেই নবধা ভক্তির এক এক প্রকার অঙ্গ সাধনেই সর্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা প্রাপ্ত হয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন।

বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু নিজপুত্র মুখ হতে বিষ্ণুর গুণগান শুনে ক্রোধে অধীর হয়ে গুরুপুত্রদের দোষারোপ করতে লাগলেন।

তখন ষণ্ড-অমর্ক বললেন—

ন মৎপ্রণীতং ন পরপ্রণীতং .... নৈসর্গিকীয়ং মতিরস্য..........

অর্থাৎ হে রাজা ! আপনার পুত্র এই শিক্ষা আমার বা অন্য কারো কাছ থেকে পায়নি, এ ওর স্বভাবজাত জন্মগত বুদ্ধি। হিরণ্যকশিপু তখন প্রহ্লাদকে আবার জিজ্ঞাসা করায় প্রহ্লাদ তাঁর এই সংস্কারের হেতু বললেন—

নৈষং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীৎ যাবৎ॥

(ভাগবত ৭।৫।৩২)

'হে পিতা ! যে পর্যন্ত বিষয়স্পৃহাশূন্য উদারচেতাঃ মহত্তম ব্যক্তিগণের চরণরেণু দ্বারা অভিষিক্ত না হওয়া যায়, সে পর্যন্ত গুরুপদেশেই হোক বা বেদসিদ্ধ কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানই হোক, মানবের মতি সংসার দুঃখনাশক শ্রীনারায়ণের চরণকমল স্পর্শ করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণরূপ পরপারে যাওয়ার একমাত্র তরণীই সাধুসঙ্গ। মহৎকৃপা লাভে বঞ্চিত কেউই কৃষ্ণভক্তি শিখাতে পারে না বা ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেবল নিজ চেষ্টাতেও উহা সম্ভব নয়।' শ্রুতিও তাই বলেছে—**'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য'**।

দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের এই বাক্য শুনে অতিশয় ক্রোধান্বিত হল ও তার পুত্রস্নেহ বিস্মৃত হয়ে অসুর ভাব উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। সে তখন প্রহ্লাদকে সজোরে কোল থেকে ভূমিতলে ফেলে দিল। রাজার আদেশে তখন বিকটমূর্তি ঘাতকগণ তাঁকে নিয়ে নানাবিধ উপায় যেমন খড়্গ, শূল, বিষ, অগ্নি আদি দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করল কিন্তু সবই বিফলে গেল। এমনকি প্রহ্লাদের সামান্য ব্যথা পর্যন্ত লাগল না। হিরণ্যকশিপু তখন ভীত ও উদ্বিগ্ন হলেন

এবং ষণ্ড ও অমর্কের কথা অনুসারে তাঁকে পুনরায় গুরুগৃহে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করল।

প্রহ্লাদ ও অসুরপুত্র সংবাদ

গুরুগৃহে গুরুপুত্রগণ পুনর্বার যথোচিত যত্নে প্রহ্লাদকে পূর্বশিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হলেন কিন্তু শিশু প্রহ্লাদ তা গ্রহণ করলেন না। একদিন গুরুপুত্রগণ (ষণ্ড ও অমর্ক) গৃহকর্মের কারণে স্থানান্তরিক হলে প্রহ্লাদ অন্যান্য অসুরপুত্রগণকে খেলার জন্য আহ্বান করে বিষ্ণুভক্তির কথা বোঝালেন। ভক্ত প্রেমিকগণের নিয়মই তাই। দেবর্ষি নারদ যে হরিনাম-সুধারস স্বয়ং পান করে পরিতৃপ্ত এবং সেই রস পরিবেশনার জন্য যুগে যুগে সকল দেশে, সকল যোনিতে পাত্রের অনুসন্ধান করে বেড়ান। তিনি ক্ষত্রিয়কুল শিরোমণি ধ্রুবকেও গুরুরূপে নামসুধা প্রদান করেছেন আবার প্রহ্লাদকেও অসুর বলে অবহেলা না করে তার মধ্যে ভগবৎ ভক্তির বীজ বপন করেছেন। প্রহ্লাদও তখন নারদোপদিষ্ট হয়ে তাঁর বয়স্যগণের মধ্যে ভক্তির ধারা ছড়াতে সমুৎসুক। তিনি সহপাঠীদের বললেন — হে ভাইগণ ! আমরা বালক বলে যে ভগবানের নিষ্কিঞ্চন প্রেমের অধিকারী নই তা কিন্তু নয়—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্।। (ভাগবত ৭।৬।১)

প্রহ্লাদ আরো বললেন, প্রকৃতপক্ষে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণই বাল্যকালে ভাগবৎ ধর্ম আচরণ করবেন, কেননা মনুষ্যজন্ম দুর্লভ ও সার্থক হলেও সেই জন্ম অনিশ্চিত, চুরাশি লক্ষ যোনির মধ্যে আবার কবে আসবে তার ঠিক নেই। তাই জন্মান্তরে গোবিন্দ ভজনা করব বলে কখনো অপেক্ষা করবে না। আবার এ জন্মেও কখনো পরে গোবিন্দভজনা করব বলে অপেক্ষা করবে না, কারণ—

শিশুকালে কৃষ্ণভজে
কৃষ্ণ পাওয়ার আশে।
যৌবনেতে কৃষ্ণ ভজে
কৃষ্ণ আসে কি না আসে।
বৃদ্ধকালে কৃষ্ণ ভজে
যমের তরাসে।।

দেখ ভাইরা ! বিষ্ণুর আরাধনায় বাল্য বা বার্ধকাদি কিছুর অপেক্ষা নেই। একজন পুরুষের পরমায়ু একশো বছর। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ এর অর্ধেক ঘুমিয়েই কাটায়, বাল্য ও কৈশোরে ক্রীড়াদিতে কুড়ি বছর নষ্ট করে এবং বার্ধক্যে জরাবশত আরো কুড়ি বছর ব্যর্থ হয়। অবশিষ্ট অল্পসময় যা থাকে তাও দুর্দমনীয় কামনার বশে গৃহাসক্তিতেই ব্যয়িত হয়। তবে সিদ্ধিলাভের উপায় কী ?

প্রহ্লাদ বলছেন—

ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ॥

(ভাগবত ৭।৬।১৮)

অর্থাৎ বিষয়াবিষ্ট চিত্ত দানবগণের সংশ্রব দূর হতেই পরিত্যাগ করে, মুক্তসঙ্গ নারদাদি অভিলষিত নারায়ণের চরণসেবায় রত হও। নারায়ণের চরণে শরণাগতিই বিবেকিগণের অভিলষিত অপবর্গ।

আর শ্রীগোবিন্দসেবায় বালক, যুবা, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই সমান অধিকার, কেননা শ্রীগোবিন্দ সকলকেই সমভাবে কৃপা করেন। শরণাগত-পালক শ্রীবিষ্ণুরই নাম, সুতরাং কোনোভাবে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে শরণাপন্ন হলে তাঁর কৃপালাভে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। তাই দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ হল—

তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্।
ভাবমাসুরমুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ॥ (ভাগবত ৭।৬।২৪)

অর্থাৎ আসুর বুদ্ধি পরিত্যাগ করো, সর্ব প্রাণীতে বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ-পূর্বক মিত্রতা স্থাপন করো এবং সকলের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে পরদুঃখ দূর করার চেষ্টা করো। মৈত্রী ও দয়াপরবশ হলে পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণু তখনই প্রীত হন। আর শ্রীবিষ্ণু তুষ্ট হলে কী না হয় ? সংসারে কিছুই অলভ্য থাকে না আর রুষ্ট হলেই সবই অলভ্য।

রিপুর্মিত্রং বিষং পথ্যমসত্যং সত্যতাং ব্রজেৎ।
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশ বিপরীতে বিপর্যয়ঃ॥

অর্থাৎ নারায়ণ প্রসন্ন হলে শত্রুও মিত্র হয়, বিষও পথ্য হয়, অসত্য সত্যে পরিণত হয় আর তার বিপরীত হলে বিপর্যয়।

শ্রীপ্রহ্লাদ তাঁর পূর্বসিদ্ধান্তকে নারদের উপদেশ বলে জানালে, দৈত্যপুত্রগণ প্রশ্ন করল, আমাদের তো তোমার এই দুই গুরুপুত্রদ্বয় ছাড়া আর অন্য কোনো গুরুর সংবাদ জানা নেই। তুমি তো আমাদের মতোই শিশু এবং অন্তঃপুরচারী, তাই নারদের উপদেশ লাভের অবসরই বা তোমার কীভাবে হল ?

প্রহ্লাদের পূর্ববৃত্তান্ত কথন—

অসুর বালকগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রহ্লাদ নিজ জন্মবৃত্তান্ত ও নারদ কথিত তত্ত্বোপদেশ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু তপস্যার্থে মন্দার পর্বতে গমন করলে সুযোগ বুঝে দেবতাগণ দৈত্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন এবং দৈত্যগণকে পরাভূত করে ইন্দ্র প্রহ্লাদের মাতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে স্বস্থানে চললেন। এমন সময় নারদ এসে ইন্দ্রকে বললেন, হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী গর্ভবতী এবং নিরপরাধী, এর গর্ভে যে শিশু আছে সে তোমার অবধ্য, কারণ **'অনন্ত প্রিয়ভক্ত্যেনাং পরিক্রম্য দিবং যয়ৌ'** (ভাগবত ৭।৭।১১)। অর্থাৎ এই শিশু দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করলেও ভবিষ্যতে নিজগুণে ভগবদ্ভক্ত হবেন কারণ ইনি সাক্ষাৎ অনন্তর অনুচর। ইন্দ্র মহর্ষি নারদের বাক্যর সম্মান রক্ষা করলেন এবং প্রহ্লাদকে বিষ্ণুভক্ত মেনে নিয়ে তাঁর মাতাকে প্রদক্ষিণ করে নিজ নিকেতন স্বর্গপুরে চলে গেলেন।

ঋষি তখন প্রহ্লাদের মাকে নিজের আশ্রমে নিয়ে রাখলেন এবং তাঁর মাতাও ঋষিবরের পরিচর্যা করতে লাগলেন। পরম কারুণিক দেবর্ষি নারদ, মাতার পরিচর্যায় প্রীত হয়ে গর্ভস্থ প্রহ্লাদের উদ্দেশে তাঁর মাতাকে নির্মল ধর্মতত্ত্ব ও জ্ঞানের উপদেশ দেন। নারদের এই উপদেশ ক্রমে মা ভুলে গেলেও ঋষির অনুগ্রহে প্রহ্লাদের সবই স্মরণে ও মননে রইল। প্রহ্লাদ নারদ সাংখ্যতত্ত্বের দশটি শ্লোক (শ্লোক ১৮-২৭) বর্ণনা করে দৈত্যবালকদের বলছেন, যে উপদেশে শ্রীগোবিন্দের চরণে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য রতি জন্মে তাই শ্রীগোবিন্দ-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই রতি লাভের উপায় ও লক্ষণ প্রহ্লাদ পরবর্তী ৬টি

শ্লোকে (ভাগবত ৭।৭।৩০-৩৫) বর্ণনা করেছেন—

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্বলাভার্পনেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্তনৈর্গুণকর্মণাম্।
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হনাদিভিঃ॥
হরিঃ সর্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ॥
এবং নির্জিতষড়বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ॥

(ভাগবত ৭।৭।৩০-৩৩)

অর্থাৎ গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি, সকল লব্ধ দ্রব্য ভগবদুদ্দেশে অর্পণ, সাধু ভক্তগণের সঙ্গ, ঈশ্বরের আরাধনা, শ্রদ্ধাপূর্বক হরির গুণ ও আচরিত কর্মের শ্রবণ ও কীর্তন, শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম চিন্তন, শ্রীবিষ্ণু মূর্তির দর্শন, পূজন ও বন্দন এবং সকল প্রাণীতেই হরি বিরাজিত এই ভাব মনে রেখে সকল প্রাণীকে উত্তমরূপে পূজা করা—এই নয় প্রকার সাধন সম্পাদন করতে পারলে ঈশ্বরে রতি জন্মায় যার অপেক্ষা অন্য কিছু কাম্য মানবজীবনে থাকতে পারে না। এই রতিলাভ হলেই ভগবানে চিত্ত সমর্পণের ক্ষমতালাভ হয়।

রতির লক্ষণ—শ্রীভগবানে রতিলাভ বর্ণনা করে প্রহ্লাদ পরবর্তীতে শ্রীভগবানে রতিপ্রাপ্ত সাধকের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন—

নিশম্য কর্মানি গুণানতুল্যান্ বীর্যানি লীলাতনুভিঃ কৃতানি।
যদাতিহর্ষোৎ পুলকাশ্রুগদগদং প্রোৎকণ্ঠ উদগায়তি রৌতি নৃত্যতি॥
যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্কচিদ্ধসত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্।
মুহুঃ শ্বসন ব্যক্তি হরে জগৎপতে নারায়নেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ॥

(ভাগবত ৭।৭।৩৪-৩৫)

অর্থাৎ শ্রীভগবান তাঁর লৌকিক লীলায় রাম, কৃষ্ণ আদি মূর্তি পরিগ্রহ করে অসুর মারণ, ভূভারহরণ অথবা পূর্ব পূর্ব জন্মের ভক্তইচ্ছা পূরণের জন্য বিবিধ লীলা করে থাকেন। সাধনার উচ্চস্তরে রতিপ্রাপ্ত সাধক এই লীলা শ্রবণ করলে

তার হর্ষ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি উপস্থিত হয়, সে গ্রহগ্রস্তর ন্যায় উচ্চস্বরে গান, রোদন প্রভৃতি করতে থাকে এবং তন্ময়তা হেতু অনবরত নৃত্য করে ও তার মধ্যে মূর্ছাদি রূপ নানা সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পায়। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে ভক্ত যখন এ জাতীয় অবস্থা লাভ করে, তখন সে সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত হয়, এবং এই মহতী ভক্তির আশ্রয় করে বন্ধনের মূলীভূত কারণ অবিদ্যার মস্তকে পদাঘাত করে শ্রীনারায়ণকে লাভ করতে সমর্থ হয়।

কৃষ্ণকৃপা সর্বজনসাধ্য

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকদের আরো বললেন—ভাইরা ! এই ভক্তি আমাদের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। ভক্তির উপাদান সংগ্রহ করতে হয় না, ইহা নিজ শরীরেই আছে। মনই ভগবদ্ভক্তি লাভের পরম উপাদান, তাই মনে মনে সদা শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা করো। আর শ্রীকৃষ্ণর কৃপা সুর-অসুর, মনুষ্য-পশু, আভিজাত্য কিছুর বিচার করে না। তিনি জাতিবিশেষে সেব্য নন, তিনি একমাত্র নির্মল চিত্তেরই উপাস্য। প্রহ্লাদ উদাহরণ দিয়ে বলছেন—

দৈতেয়া যক্ষরক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ।
মগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ॥

(ভাগবত ৭।৭।৫৪)

অর্থাৎ তৃণাবর্ত্ত আদি অসুর, শঙ্খচূড় প্রভৃতি যক্ষ, বিভীষণাদি রাক্ষস, পুতনাদি স্ত্রী, চানুর আদি শূদ্র, যমলার্জুন আদি বন্য তরু, জটায়ু, বক প্রভৃতি পক্ষী, কেশী ও মারীচ আদি মৃগও মনের গুণে কৃষ্ণকৃপা লাভ করেছেন। দেখো দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, এমনকি স্থাবর জঙ্গম কেউই কৃষ্ণ-কৃপালাভে বঞ্চিত হয় না। তবে শ্রীভগবান একমাত্র নিষ্কাম ভক্তিতে যেরকম প্রীত হন, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, ব্রত প্রভৃতি কিছুতেই সেরকম প্রীত হন না।

প্রহ্লাদ তাঁর সাথী দৈত্যবালকদের এইভাবে হরিভজনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে বলছেন—'**একান্ত ভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্**' (ভাগবত ৭।৭।৫৫) অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দে একান্ত ভক্তি অর্জন করলে স্থাবর-জঙ্গম সকলই হরিময় হয়ে যায়, তাই হরিভক্তিই মনুষ্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।

হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ ও নৃসিংহ দেবের আবির্ভাব—

প্রহ্লাদের কাছে বিষ্ণুভক্তি-বিষয়ক শিক্ষা পেয়ে দৈত্য বালকেরা ষণ্ড-অমর্ক বর্ণিত আসুরিক নীতিশিক্ষার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। হিরণ্যকশিপুর কাছে এ খবর গেলে, তিনি পুনর্বার প্রহ্লাদকে ডেকে পাঠালেন এবং ক্রোধান্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রহ্লাদ পিতাকে আবার বললেন—**'জহ্যাসুরং ভাবমিমং ত্বমাত্মনঃ, সমং মনো ধৎস্ব ন সন্তি বিদ্বিষঃ'** (ভাগবত ৭।৮।৯)। পিতা, তুমি আসুরভাব পরিত্যাগ করো কেননা বিষ্ণু নয় অসংযত মনই তোমার পরম শত্রু। আর **'তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্'** (ভাগবত ৭।৮।৯) অর্থাৎ সর্বত্র সমদর্শনই শ্রীকৃষ্ণের পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। প্রহ্লাদের মুখে এই বাক্য শুনে ক্রোধান্ধ হয়ে হিরণ্যকশিপু বললেন—ওরে দুর্বিনীত বালক! আমি এখনই তোর শিরশ্ছেদ করব, দেখি তোর হরি কী করে তোকে রক্ষা করে। এই বলে হিরণ্যকশিপু খড়্গ গ্রহণ করে প্রহ্লাদকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তিনি প্রহ্লাদকে বললেন, যদি সত্যিই হরি সবজায়গায় থাকে তবে বল এই স্তম্ভে তোর ভগবান আছে কি না? শ্রীহরির প্রাণপ্রিয় প্রহ্লাদ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, হে অন্তর্যামিন্! হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু! যদি তোমার সেবক বলে আমাকে দেখা দেওয়ার অনুগ্রহ হয় তবে যেন স্তম্ভেই তোমার আবির্ভাব হয়। শ্রীভগবান সকল ইন্দ্রের নিয়ামক, তাই তিনি হিরণ্যকশিপুর হৃদয়কে স্তম্ভের দিকে আকর্ষণ করলেন যাতে তিনি প্রহ্লাদের ইচ্ছা অনুযায়ী স্তম্ভর মধ্যে থেকে প্রকাশিত হতে পারেন। দৈত্যবর গাত্রোত্থান করে স্তম্ভের উপর তীব্র মুষ্ট্যাঘাত করলেন। আর অমনি স্তম্ভ থেকে এক ভীষণ শব্দ উত্থিত হল আর এই ভয়ংকর শব্দে যেন ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। স্বর্গ, মর্ত ও রসাতল টলমল করে উঠল, মনে হল যেন সৃষ্টির আদি কাল থেকে এত বড় ভয়াবহ শব্দ আর কখনো উত্থিত হয়নি। পুত্রবধার্থী খড়গহস্ত হিরণ্যকশিপু সেই শব্দ শ্রবণে স্তব্ধ হয়ে দেখতে পেলেন এক ভয়ানক নৃসিংহমূর্তি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। নরও নয় আবার সিংহও নয় কিন্তু মিলিত নৃসিংহ মূর্তি দেখে দৈত্যরাজ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

শ্রীহরির এই যে স্তম্ভে আত্মপ্রকাশ তা কেবল ভক্তবাক্য সিদ্ধ করার জন্যই

নয়, তাঁর নিজ আশ্বাসবাণী '**কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি**' (গীতা ৯।৩১) অর্থাৎ আমার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না এবং '**তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ**' অর্থাৎ আমার ভক্তকে আমি সংসার সাগরের শত শত বিপদ থেকে উদ্ধার করি—এই বাক্যকেও প্রতিষ্ঠা করার জন্যও বটে।

যাইহোক হিরণ্যকশিপুর কাল পূর্ণ হয়েছে, প্রথম জন্মের শাপমুক্তির সময় উপস্থিত, তাই দৈত্যরাজ আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না, তাঁর কর্মফলজনিত প্রকৃতি দ্বারা চালিত হয়ে তিনি গদাহস্তে নৃসিংহ মূর্তির দিকে ধাবিত হলেন। নৃসিংহদেব তখন দৈত্যবরকে নিজের উরুতে রেখে, সন্ধ্যাকালে, দ্বারদেশে, নিজ নখরাঘাতে তাঁর বক্ষ বিদারণ করলেন। অমনি দেবদুন্দুভি বেজে উঠল, স্বর্গ হতে কুসুম বর্ষণ হতে লাগল। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগ, প্রজাপতি, চারণ, যক্ষ, কিম্পুরুষ, বৈতালিক কিন্নরগণ যুক্তকরে নৃসিংহদেবের অসংখ্য গুণাবলীর স্তব করতে লাগলেন। যদিও ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং গন্ধর্ব ও কিন্নর আদি সকলেই নৃসিংহদেবের স্তব করছিলেন তবে সবাই ভয়ে ভয়ে দূরে দূরেই থাকছিলেন। কারোরই ক্রোধাবেশে দুর্ধর্ষ শ্রীনৃসিংহদেবের কাছে যেতেই সাহস হচ্ছিল না। এমনকি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীও এই অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব মহৎরূপ দেখে ভয়ে কাছে যেতে সাহস করলেন না। তখন ব্রহ্মা গিয়ে প্রহ্লাদকেই বললেন, হে বৎস ! তুমি তোমার পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ নৃসিংহদেবের কোপ প্রশমন করো ও তাঁকে শান্ত করো।

প্রহ্লাদের স্তুতি

(সপ্তম স্কন্ধ, নবম অধ্যায়)

মহাভাগবত বালক প্রহ্লাদ ব্রহ্মবাক্য শিরোধার্য করে ধীরপদে নৃসিংহদেবের নিকটবর্তী হলেন এবং করপুটে ভূমিতে নিপতিত হয়ে প্রণাম করলেন। বালক প্রহ্লাদকে স্বীয় চরণতলে পড়ে থাকতে দেখে শ্রীনৃসিংহ দয়ার্দ্রহৃদয়ে তাঁকে হাত ধরে ওঠালেন। শ্রীনৃসিংহের করস্পর্শে প্রহ্লাদের সমস্ত অমঙ্গল দূর হল এবং মস্তকে করস্পর্শমাত্রেই তাঁর তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হল,

শরীর রোমাঞ্চিত হল আর হৃদয় প্রেমার্দ্র ও চক্ষুযুগল অশ্রুধারায় পূর্ণ হয়ে গেল। তিনি আনন্দচিত্তে শ্রীহরির চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করলেন। প্রহ্লাদ তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি শ্রীহরির চরণকমলে সমর্পণ করে একাগ্রচিত্তে প্রেমগদ্‌গদ স্বরে ভগবানের স্তুতিতে প্রবৃত্ত হলেন।

ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের (৮—৫০ শ্লোক) মোট ৪৩টি শ্লোকে প্রহ্লাদের হরিস্তুতি বর্ণিত হয়েছে। এই স্তুতি আটটি প্রকরণে স্তুত।

অসুরও ভক্তিভাবের অধিকারী	৮—১২
নৃসিংহ অবতারের উগ্ররূপ নয়, সংসার-চক্রই প্রহ্লাদের ভীতির কারণ	১৩—১৬
সেবা ও দাস্যভাবেই ভগবৎকৃপা পাওয়ার পথ	১৭—২৯
জগৎ ও ব্রহ্মার সৃষ্টি	৩০—৩৭
প্রহ্লাদের দীনতা ও কৃপা প্রার্থনা	৩৮—৪৪
ভগবানের মহিমা বর্ণনা ও প্রহ্লাদের দাস্যভাব প্রার্থনা	৪৫—৫০
ভগবানের বরপ্রদান ও প্রহ্লাদের স্তুতি ১০ অধ্যায়	১—২৩

অসুরও ভক্তিভাবের অধিকারী (শ্লোক ৮—১২)

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মুনয়োঽথ সিদ্ধাঃ
সত্ত্বৈকতানমতয়ো বচসাং প্রবাহৈঃ।
নারাধিতুং পুরুগুণৈরধুনাপি পিপ্রুঃ
কিং তোষ্টুমর্হতি স মে হরিরুগ্রজাতেঃ॥ ৮

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্‌গজযূথপায়॥ ৯

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাচ্ছ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ১০

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥ ১১
তস্মাদহং বিগতবিক্লব ঈশ্বরস্য
সর্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামণীষম্।
নীচোঽজয়া গুণবিসর্গমনুপ্রবিষ্টঃ
পূয়েত যেন হি পুমাননুবর্ণিতেন॥ ১২

সরলার্থ—প্রহ্লাদ বললেন—ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি-মুনি এবং সিদ্ধ পুরুষগণের মতি নিরন্তর সত্ত্বগুণে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের অবিরাম স্তুতি এবং বিবিধ গুণাবলীতে তাঁরা আপনাকে এখনও সন্তুষ্ট করতে পারেননি। তমোগুণ প্রধান অসুরকুলে জাত আমার প্রতি কি আপনি প্রসন্ন হবেন ? ॥ ৮ ॥ আমার মনে হয় ধন, কৌলীন্য, রূপ, তপস্যা, বিদ্যা, ওজঃগুণ, তেজ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি এবং যোগ—কোনো কিছুই পরমপুরুষ ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। একমাত্র ভক্তিতেই তিনি তুষ্ট হন, যেমন গজেন্দ্রর প্রতি হয়েছিলেন॥ ৯ ॥ এই দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি পদ্মনাভের চরণকমলের প্রতি বিমুখ হয় তবে তার থেকে সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ যে কিনা তার মন, বচন, কর্ম, ধন, প্রাণ সবকিছুই ভগবানের চরণে সমর্পণ করেছে। সেই চণ্ডাল নিজের বংশকে পবিত্র করে তোলে যা শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানশালী ব্রাহ্মণও করতে সমর্থ হন না॥ ১০ ॥ সর্বশক্তিমান ভগবান নিজের মধ্যেই নিজে পরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র জীবাত্মার পূজা গ্রহণ করার তাঁর কোনো আবশ্যকতাই নেই। তথাপি করুণাপরবশ হয়ে সরল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য তাদের পূজা তিনি গ্রহণ করেন। মুখশ্রী যেমন দর্পণে দৃশ্যমান প্রতিবিম্বটিকেও সুন্দর করে তোলে, তেমনি ভক্ত ভগবানকে যে সম্মান প্রদান করেন সেই মান তিনি নিজেই ফিরে পান॥ ১১ ॥ এইজন্য সর্বথা অযোগ্য এবং অনধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত সংকোচ পরিত্যাগ করে নিজ বুদ্ধি অনুসারে আমি সর্বপ্রকারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছি। এই মহিমা-কীর্তনের এমনই প্রভাব যে অবিদ্যার বশীভূত হয়ে সংসারচক্রে পরিভ্রমণরত জীব তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়॥ ১২ ॥

মূলভাব—শ্রীপ্রহ্লাদ জোড়করে বলতে লাগলেন, হে প্রভো! আমি অতি নীচ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁর গুণবর্ণনে অসমর্থ, যাঁর মহিমা বাক্য মনেরও পথ অতিক্রম করে, স্বয়ং শ্রুতি যাঁর মহিমা কীর্তনের জন্য অগ্রসর হয়ে ভীত ও চকিত ভাবে ফিরে আসে, আমি অসুরমূর্তি হয়ে কোন সাহসে তোমার এই অপার মহিমা স্তব করব। আমি মনে করি অপার ঐশ্বর্য, কৌলীন্য, রূপ, তপস্যা আদি কিছুর দ্বারাই কেউ কৃষ্ণকৃপার অধিকারী হতে পারে না। কেবল ভক্তিই ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরুর প্রীতির নিদান। শ্রীগজেন্দ্র মোক্ষণে বর্ণিত গজেন্দ্রর কুল-শীল, ধন-রত্নাদি কিছুই ছিল না, শুধু ভক্তিবলেই তাঁর প্রতি হরির কৃপা হয়েছিল।

আবার ভক্তিবিনা যে হরিকৃপা সুদূরপরাহত সে বিষয় প্রহ্লাদ বলছেন—

'শ্বপচং বরিষ্ঠম্ মন্যে, তদর্পিত মনোবচনেহিতার্থ-প্রাণং পুনাতি স কুলং' (ভাগবত ৭।৯।১০) অর্থাৎ যদি চণ্ডালও শ্রীহরির চরণে মন, বাক্য, চেষ্টা, প্রয়োজন ও প্রাণ সমর্পণ করেন তবে তিনি হরিভক্তিবিহীন পূর্বোক্ত দ্বাদশ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ সেই চণ্ডালই কুলকে পবিত্র করেন। আর এই ব্রাহ্মণদের গর্বই সার হয়। প্রহ্লাদ বলছেন, তিনি গুরুমুখে এই উপদেশ শুনেছেন বলে অসুরযোনি হলেও ভগবৎ কৃপালাভে অগ্রসর হতে ভীত নন। যেহেতু ভক্তিমাত্রেই ঈশ্বর প্রীত হন তাই তিনি বলছেন—**'ঈশ্বরস্য সর্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামনীষম্, পূয়েত যেন হি পুমাননুবর্ণিতেন'** (ভাগবত ৭।৯।১২) অর্থাৎ আমি নিজ শক্তি অনুসারে সর্বপ্রযত্নে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা করব, কারণ ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে পারলেই জীব অবিদ্যার হাত থেকে নিস্কৃতি লাভ করে শুদ্ধ ও মুক্ত হতে পারে।

নৃসিংহ অবতারের উগ্ররূপ নয়, সংসার-চক্রই প্রহ্লাদের ভীতির কারণ (শ্লোক ১৩—১৬)

সর্বে হ্যমী বিধিকরাস্তব সত্ত্বধাম্নো
ব্রহ্মাদয়ো বয়মিবেশ ন চোদ্বিজন্তঃ।

ক্ষেমায় ভূতয় উতাত্মসুখায় চাস্য
বিক্রীড়িতং ভগবতো রুচিরাবতারৈঃ॥ ১৩
তদ্ যচ্ছ মন্যুমসুরশ্চ হতস্ত্বয়াদ্য
মোদেত সাধুরপি বৃশ্চিকসর্পহত্যা।
লোকাশ্চ নির্বৃতিমিতাঃ প্রতিয়ন্তি সর্বে
রূপং নৃসিংহ বিভয়ায় জনাঃ স্মরন্তি॥ ১৪
নাহং বিভেম্যজিত তেঽতিভয়ানকাস্য-
জিহ্বার্কনেত্রভ্রুকুটীরভসোগ্রদংষ্ট্রাৎ।
আন্ত্রস্রজঃ ক্ষতজকেসরশঙ্কুকর্ণা-
ন্নির্হ্রাদভীতদিগিভাদরিভিন্নখাগ্রাৎ॥ ১৫
ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্র-
সংসারচক্রকদনাদ্ গ্রসতাং প্রণীতঃ।
বদ্ধঃ স্বকর্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদা নু॥ ১৬

সরলার্থ—প্রহ্লাদ বলছেন—হে সত্ত্বগুণাশ্রয় দেব ! ব্রহ্মাদি সকল দেবতা আপনার আজ্ঞাকারী সেবকমাত্র। আমাদের মতো দৈত্যদের ন্যায় তাঁরা আপনার প্রতি দ্বেষ করেন না। আপনি জগতের কল্যাণ এবং অভ্যুদয়ের নিমিত্ত এবং সকলকে আত্মানন্দের আস্বাদ দেওয়ার জন্য আনন্দময় অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করে বিবিধ প্রকার লীলা করেন॥ ১৩ ॥ যে অসুরকে বধ করার জন্য আপনি ক্রোধের আশ্রয় নিয়েছিলেন সে তো মৃত। এখন আপনি আপনার ক্রোধকে প্রশমিত করুন। বিষধর সর্প এবং বৃশ্চিকের মৃত্যুতে সজ্জনবৃন্দ যেমন স্বস্তিলাভ করে তেমনই এই দুরন্ত দৈত্যের সংহারও সকলকে খুশি করেছে। তারা এখন আপনার শান্ত আনন্দময় রূপ দর্শনের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে। ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ যুগে যুগে আপনার এই নৃসিংহ মূর্তি স্মরণ করবে॥ ১৪ ॥ হে দেব ! আপনার ভয়ংকর মুখ, লোল জিহ্বা, সূর্যসমান তেজোদীপ্ত দৃষ্টি, ভয়ানক ভ্রূকুটী, তীক্ষ্ণ করাল দন্তরাজি, গলদেশে অন্ত্রসমূহের মালা, রুধিরলিপ্ত কেশর, শঙ্কুর মতো ঊর্ধ্বোত্থিত কর্ণ, দিগ্‌গজদেরও ভয়-উৎপাদনকারী সিংহনাদ, শত্রুদেহবিদারী আপনার

নখররাজি দেখেও কিন্তু আমি মুহূর্তের জন্যও ভীত হইনি॥ ১৫ ॥ হে দীনবন্ধু ! আমি এই দুঃসহ, উগ্র সংসারচক্রের তীব্র পেষণকেই ভয় করি। আমার কর্মপাশই আমাকে যেন বদ্ধ অবস্থায় ভয়ংকর শ্বাপদসমূহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। প্রভু, আপনি প্রসন্ন হয়ে সকল জীবকুলের একমাত্র আশ্রয় এবং মোক্ষস্বরূপ আপনার ওই পাদপদ্মে কবে আমায় ডেকে নেবেন ॥ ১৬

মূলভাব— হে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি ! আপনি সাধুগণের পরিত্রাণের জন্যই অসুররাজকে বধ করেছেন। হে প্রভু ! আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন। এখন সমস্ত মানবজাতি নিরুদ্বেগে অবস্থান করছে কারণ ভক্তগণ আপনার এই নৃসিংহমূর্তি ভয় নিবৃত্তির জন্যই ভবিষ্যতে সর্বদা স্মরণ করবেন। হে প্রভো ! আপনার মূর্তি কখনই ভীতি উৎপাদনের জন্য নয়। '**ভূতয় উতাত্ম সুখায় চাস্য বিক্রীড়িতং ভগবতো রুচিরাবতারৈ**' (ভাগবত ৭।৯।১৩)। অর্থাৎ ভগবন্ ! আপনার লীলার মনোজ্ঞমূর্তি গ্রহণে যে সমস্ত ক্রীড়া সম্পাদিত হয়, তাহাই এই বিশ্বের মঙ্গল ও আত্মার সুখের হেতু। হে প্রভু '**নাহং বিভেম্যজিত তেঽতি-ভয়ানকাস্য অরিভিন্ন খাগ্রাৎ**' (ভাগবত ৭।৯।১৫)—আমি কিন্তু আপনার অতি ভয়ানক শত্রুবিদারণ নখশ্রেণীবিশিষ্ট নৃসিংহমূর্তি দেখে ভীত নই। আমি আসলে ভীত—'**ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্র, সংসারচক্রকদনাদ্ গ্রসতাং প্রণীতঃ**' (ভাগবত ৭।৯।১৬) প্রিয়ের বিয়োগে ও অপ্রিয়ের সংযোগে যে শোকবহ্নির স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়, জন্মে জন্মে সেই স্ফুলিঙ্গের তীব্রতাপে আমি দাহ্যমান। হে বিপদভঞ্জন !

উগ্রোঽপ্যঽনুগ্র এবাসৌ স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিগ্রহঃ ॥

আপনার এই বিকটমূর্তি আমার নিকট কুসুম কোমল বলে মনে হচ্ছে। আমার একান্ত প্রার্থনা, সংসার মায়াপাশে একান্ত বদ্ধ অবস্থা থেকে কবে আপনার অপবর্গপ্রদ চরণযুগলে আশ্রয় গ্রহণ করব। হে আশ্রয়দাতা ! আমি ভবদাবানলে পরিতাপদগ্ধ, আমায় সকল সন্তাপহারী আপনার দাস্যযোগ প্রদান করে কৃতার্থ করুন।

সেবা ও দাস্যভাবই ভগবৎ কৃপা পাওয়ার পথ
(শ্লোক ১৭—২৯)

যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়বিয়োগসংযোগজন্ম-
শোকাগ্নিনা সকলযোনিষু দহ্যমানঃ।
দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়াহং
ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব দাস্যযোগম্॥ ১৭

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥ ১৮

বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ
নার্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ।
তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট-
স্তাবদ্ বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্॥ ১৯

যস্মিন্যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাদ্
যস্মৈ যথা যদুত যস্ত্বপরঃ পরো বা।
ভাবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্স্বভাবঃ।
সঞ্চোদিতস্তদখিলং ভবতঃ স্বরূপম্॥ ২০

মায়া মনঃ সৃজতি কর্ম্মময়ং বলীয়ঃ
কালেন চোদিতগুণানুমতেন পুংসঃ।
ছন্দোময়ং যদজয়ার্পিতষোড়শারং
সংসারচক্রমজ কোঽতিতরেৎ ত্বদন্যঃ॥ ২১

স ত্বং হি নিত্যবিজিতাত্মগুণঃ স্বধাম্না
কালো বশীকৃতবিসৃজ্যবিসর্গশক্তিঃ।
চক্রে বিসৃষ্টমজয়েশ্বর ষোড়শারে
নিষ্পীড্যমানমুপকর্ষ বিভো প্রপন্নম্॥ ২২

দৃষ্টা ময়া দিবি বিভোঽখিলধিষ্ণ্যপানা-
মায়ুঃ শ্রিয়ো বিভব ইচ্ছতি যাঞ্জনোঽয়ম্।
যেঽস্মৎপিতুঃ কুপিতহাসবিজৃম্ভিতভ্রূ-
বিস্ফূর্জিতেন লুলিতাঃ স তু তে নিরস্তঃ॥ ২৩
তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষো জ্ঞ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মা বিরিঞ্চাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্॥ ২৪
কুত্রাশিষঃ শ্রুতিসুখা মৃগতৃষ্ণিরূপাঃ
ক্কেদং কলেবরমশেষরুজাং বিরোহঃ।
নির্বিদ্যতে ন তু জনো যদপীতি বিদ্বান্
কামানলং মধুলবৈঃ শময়ন্দুরাপৈঃ॥ ২৫
ক্কাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্
জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ক তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন তু ভবস্য ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ॥ ২৬
নৈষা পরাবরমতির্ভবতো ননু স্যা-
জ্জন্তোর্যথাঽত্মসুহৃদো জগতস্তথাপি।
সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্॥ ২৭
এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে
কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্প্রসঙ্গাৎ।
কৃত্বাঽত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবন্ গৃহীতঃ
সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্॥ ২৮
মৎ প্রাণরক্ষণমনন্ত পিতুর্বধশ্চ
মন্যে স্বভৃত্যঋষিবাক্যমৃতং বিধাতুম্।

খড়্গং প্রগৃহ্য যদবোচদসদ্বিধিৎসু-
স্ত্বামীশ্বরো মদপরোঽবতু কং হরামি॥ ২৯

সরলার্থ—হে অনন্ত ! আমি যতবার যে কোনো যোনিতেই জন্মগ্রহণ করেছি ততবারই প্রিয়বিয়োগ এবং অপ্রিয় সংযোগের শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছি। সেই দুঃখ প্রতিষেধক ঔষধও মূর্তিমান দুঃখ ব্যতীত আর কিছু নয়। না জানি কবে থেকে আপন অতিরিক্ত বস্তুকে আত্মা মনে করে দিশাহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি এমন কোনো সাধন মার্গ নির্দেশ করুন যে পথে আপনার প্রতি দাস্য - ভক্তি লাভ করতে পারি॥ ১৭ ॥ প্রভু ! আপনি আমাদের প্রিয়তম হিতৈষী বান্ধব। প্রকৃতপক্ষে আপনিই সকলের পরমারাধ্য। ব্রহ্মাকর্তৃক গীত আপনার লীলাকথা কীর্তন করে আমি বড় সহজপথে আসক্তি প্রভৃতি প্রাকৃত গুণসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে সংসারের দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হয়ে যাব কারণ আপনার চরণ-যুগলনিবাসী ভক্ত পরমহংস মহাপুরুষদের সঙ্গ আমি প্রতিনিয়তই লাভ করব॥ ১৮ ॥ হে ভগবান নৃসিংহ ! ইহলোকে দুঃখী জীবকুলের দুঃখ নিবারণের জন্য যে সব প্রতিধ্বনি নির্দেশ করা হয় সেগুলি কিন্তু আপনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হলে ক্ষণকালের বেশি স্থায়ী হয় না ; যেমন, বাবা-মা নিজের পুত্রকে রক্ষা করতে পারে না, ঔষধ রোগ সারাতে পারে না এবং অকুল পারাবারে ডুবন্ত মানুষকে নৌকাও রক্ষা করতে পারে না॥ ১৯ ॥ সত্ত্বাদিগুণের কারণে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের ব্রহ্মাদি যে সকল শ্রেষ্ঠ এবং কালাদি যে সকল কনিষ্ঠ কর্তা আছেন তাঁরা সকলেই আপনার দ্বারাই চালিত। তাঁরা আপনার প্রেরণাতে যে আধারে স্থিত হয়ে যে নিমিত্তে, যে মৃত্তিকাদি উপকরণে, যে সময়ে, যে সকল সাধনের দ্বারা যে অদৃষ্টাদির সহায়তায়, যে প্রয়োজনে, যে বিধিতে যা কিছু উৎপন্ন করেন বা রূপান্তর ঘটান তা সবই আপনারই স্বরূপ॥ ২০ ॥ পুরুষের অনুমতিতে কাল দ্বারা গুণসমূহের মধ্যে ক্ষোভ উৎপন্ন হওয়ার পর মায়া মনপ্রধান লিঙ্গশরীরের নির্মাণ করে থাকে। সেই লিঙ্গশরীর বলবান, কর্মময় এবং অনেক নামরূপে সুচারুরূপে বিন্যস্ত, ছন্দোময়। সেই অবিদ্যাকল্পিত মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রা—এই ষোড়শ বিকাররূপ অরযুক্ত এই সংসারচক্র। হে অজ ! এমন কোন পুরুষ আছে

যে আপনার প্রতি বিমুখ থেকে এই মনরূপ সংসারচক্রকে অতিক্রম করবে॥ ২১ ॥ হে সর্বশক্তিমান ! মায়া এই ষোড়শ অরযুক্ত সংসারে ফেলে যন্ত্রস্থ ইক্ষুর মতো আমাকে পেষণ করছে। আপনি আপনার চৈতন্য শক্তির দ্বারা বুদ্ধির সমস্ত গুণসমূহকে সর্বদা পরাজিত করেন এবং কালরূপে সকল সাধ্য এবং সাধনকে আপনার অধীনস্থ করে রাখেন। আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে এর থেকে রক্ষা করে আপনার নিকট টেনে নিন॥ ২২ ॥ ভগবান ! যার জন্য সংসারী ব্যক্তি লালায়িত থাকে—স্বর্গে লভ্য সমস্ত লোকপালের সেই আয়ু, ধন এবং ঐশ্বর্য আমার দেখা হয়ে গিয়েছে। যে সময় আমার পিতা ক্ষণিকের জন্য ক্রোধযুক্ত হাসি হাসতেন এবং তাতে তাঁর ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠত তখন স্বর্গের সম্পত্তির কোনো ঠিকানা থাকত না, সবই তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ত। আপনি আমার সেই পিতাকে বধ করেছেন॥ ২৩ ॥ সেই কারণে ব্রহ্মলোকের মতো আয়ু, ধন, ঐশ্বর্য এবং ইন্দ্রিয়ভোগ, যা সাংসারিক মানুষদের আকৃষ্ট করে—তা আমি চাই না, কারণ আমি জানি যে অত্যন্ত শক্তিশালী কালরূপ ধারণ করে আপনি সমস্তই গ্রাস করে রেখেছেন। তাই আমাকে ভৃত্য হিসাবে আপনার অন্যান্য ভৃত্যবৃন্দের সন্নিধানে নিয়ে চলুন॥ ২৪ ॥ বিষয়ভোগের কথা শুনতে অত্যন্ত ভালো লাগলেও বাস্তবে তা তৃষ্ণার্ত হরিণের মরীচিকায় জল পাওয়ার মতো নিতান্তই অসত্য এবং এই ভোগাসক্ত শরীরও হল অনন্ত রোগের উৎসস্থল। সুতরাং এই মিথ্যা বিষয়ভোগ এবং এই রোগযুক্ত শরীর—এই দুই-ই ক্ষণস্থায়ী এবং অসার একথা জেনেও মানুষ এর প্রতি বিরক্ত হয় না। বহু কষ্টে লব্ধ ভোগসমূহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধুবিন্দুর দ্বারা নিজের কামানল নির্বাপিত করার চেষ্টা করে॥ ২৫ ॥ হে প্রভু ! এই তমোগুণী অসুর বংশে রজোগুণ থেকে উৎপন্ন আমিই বা কোথায় আর কোথায় আপনার অপার কৃপা। আমি ধন্য। আপনি আপনার প্রসাদস্বরূপ, সর্বসন্তাপহারী এই করকমল আমার মস্তকোপরি রেখেছেন, যা আপনি কোনোদিন ব্রহ্মা, শংকর এবং লক্ষ্মীর মস্তকেও রাখেননি॥ ২৬ ॥ সংসারী মানুষদের মতো আপনার মধ্যে কোনো ছোট-বড় ভেদভাব নেই, কারণ আপনিই সকলের অকারণ প্রেমিক, সকলের আত্মা। তা সত্ত্বেও সেবা

এবং ভজনার দ্বারাই কল্পবৃক্ষসদৃশ আপনার কৃপা লাভ করা যায়। সেবা অনুসারেই জীবকুলের প্রতি আপনার কৃপার উদয় হয়, সেখানে বংশগত উচ্চতা অথবা নীচতার কোনো স্থান নেই॥ ২৭ ॥ হে ভগবান ! এই সংসার এমনই এক অন্ধকূপ যেখানে কালরূপ সর্প দংশন করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। বিষয়াসক্ত মানুষ সর্বদাই তার মধ্যেই নিমজ্জিত থাকছে। আমিও সঙ্গদোষবশত সে-পথেই যেতে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু ভগবান ! দেবর্ষি নারদ আমাকে আপনজন মনে করে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তবে আমি কেন আপনার ভক্তগণের সেবা করা থেকে বিমুখ হব ? ॥ ২৮ ॥ হে অনন্ত ! যখন অন্যায় কাজ করতে উদ্যত আমার পিতা হাতে খড়্গ নিয়ে বলতে লাগলেন—'যদি আমি ছাড়া কোনো ঈশ্বর থাকে তাহলে তোকে রক্ষা করুক, এখন আমি তোর শিরশ্ছেদ করব', ঠিক সেইসময় আপনি আমার প্রাণরক্ষা করে আমার পিতাকে বধ করেছেন। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আপনি আপনার পরমভক্ত সনকাদি ঋষিদের বচন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই কার্য সম্পন্ন করেছেন॥ ২৯॥

মূলভাব—শ্রীহরির স্তব প্রসঙ্গে ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ বলছেন, হে দেব ! আপনি আমার প্রিয় সুহৃৎ এবং প্রাণের দেবতা। আপনার লীলাকথা কীভাবে অনুশীলন করলে আমি সমস্ত দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ পাব তাই চিন্তা করছি। আমি জানি দাস্য ভাবই আপনার প্রিয়, তাই কিরূপে দাস্য ভাব জাগ্রত করতে হয়, আমাকে উপদেশ দিন। ভগবান ! আপনাতে দাস্যভাব জাগলে আপনার অনুগ্রহেই সৎসঙ্গলাভ হয়, যার থেকে আসে রাগ (আসক্তি)-নিবৃত্তি এবং চিত্ত বীতরাগ হলেই সাধকের ভগবদ্‌গুণবর্ণনে আগ্রহ জাগে। আর প্রভু ! তার ফলে হয় ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি।

প্রহ্লাদ স্তব করছেন—

লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অন্ধঃ তিতর্মী অনুগৃণন্ দুর্গাণি তে পদযুগালয় হংসসঙ্গ॥

(ভাগবত ৭।৯।১৮)

অর্থাৎ আপনার মহিমময়ী লীলাকথা কীর্তন করে আমি সমস্ত দুঃখ তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞানে অতিক্রম করব। হে দেব ! এই মনোময় চক্রের আবর্তন থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় আপনার চরণাশ্রয়। আমি ঐশ্বর্যের অবধি

অবলোকন করেছি। দেখেছি যেসব লোকপালগণ এই জগতের সকল প্রকার আধিপত্যরূপ ঐশ্বর্য ভোগ করতেন, তাঁরাই আবার আমার পিতার ক্রোধপূর্ণ নয়ন ঘূর্ণনে সদা কম্পমান থাকতেন। আবার সেই পরম ঐশ্বর্যশালী পিতাও কিরূপে আপনার কবলগ্রস্ত হলেন। তাই নিবেদন এই যে, আমি ঐশ্বর্যরাশি, অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি, ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব এসব কোনো পদই চাই না—আমাকে শুধু আপনার সেবকরূপে চরণতলে আশ্রয় প্রদান করুন। আপনি শত্রু-মিত্র নিরপেক্ষ, আপনার কাছে সকলেই সমান। তাও আপনার যে ব্যক্তিভেদে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা সাধকের প্রকৃতির তারতম্য অনুসারেই হয়ে থাকে। কল্পতরু বৃক্ষ যেমন সকল কামনা পূরণে সমর্থ হলেও যে যেমন প্রার্থনা করে, সে সেইপ্রকার ফলই পেয়ে থাকে, সেইরকম আপনিও **'সংসেবয়া সুরতরোরিব প্রসাদঃ, সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্'** (ভাগবত ৭।৯।২৭) অর্থাৎ আপনি স্বয়ং ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু হলেও, ভক্তের কর্ম (সেবা) বা কামনা অনুরূপ ফলই প্রদান করেন। প্রভু ! আমি ভোগপ্রবণ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেও আপনার কৃপালাভের ইচ্ছা করছি যা ব্রহ্মাদি দেবতারও দুষ্প্রাপ্য। এ বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে আপনি কৃপা করে আমার মস্তকে যে করপদ্ম অর্পণ করেছেন, তা লক্ষ্মী, শিব বা ব্রহ্মারও বাঞ্ছনীয়।

'যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ'। (ভাগবত ৭।৯।২৬)

নৃসিংহ স্তব প্রসঙ্গে প্রহ্লাদ বলছেন—হে প্রভো ! এই দুরূহ সংসার কূপে পতিত হয়ে আমি যখন কামনা সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম তখন মহর্ষি নারদ কৃপাপূর্বক আমায় নিজ জন মনে করে আমার মধ্যে আপনার প্রতি ভক্তিভাব সঞ্চারিত করলেন। আমার সাধু-ব্রাহ্মণবিদ্বেষী পিতা আমাকে বধ করতে উদ্যত হলে **'স্বভৃত্যঋষিবাক্যমৃতং বিধাতুম্'** (ভাগবত ৭।৯।২৯) অর্থাৎ নিজ ভৃত্য নারদের বাক্য সত্য করার জন্য আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেন। হে ঈশ্বর ! আপনার স্বরূপজ্ঞান হতে যারা বিমুখ, তাদের আপনার এই স্তম্ভ হতে আবির্ভাব কাহিনী বিস্ময়কর মনে হতে পারে, কিন্তু হে প্রভু ! আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, কারণ আপনার লীলা অনন্ত।

জগৎ ও ব্রহ্মার সৃষ্টি (শ্লোক ৩০—৩৭)

একস্ত্বমেব জগদেতদমুষ্য যৎ ত্ব-
মাদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্যসি মধ্যতশ্চ।
সৃষ্ট্বা গুণব্যতিকরং, নিজমায়য়েদং
নানেব তৈরবসিতস্তদনুপ্রবিষ্টঃ॥ ৩০

ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোঽন্যো
মায়া যদাত্মপরবুদ্ধিরিয়ং হ্যপার্থা।
যদ্ যস্য জন্ম নিধনং স্থিতিরীক্ষণং চ,
তদ্ বৈ তদেব বসুকালবদষ্টিতর্বোঃ॥ ৩১

ন্যস্যেদমাত্মনি জগদ্ বিলয়াম্বুমধ্যে
শেষেত্মনা নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
যোগেন মীলিতদৃগাত্মনিপীতনিদ্র-
স্তুর্যে স্থিতো ন তু তমো ন গুণাংশ্চ যুঙ্‌ক্ষে॥ ৩২

তস্যৈব তে বপুরিদং নিজকালশক্ত্যা
সঞ্চোদিতপ্রকৃতিধর্মণ আত্মগূঢ়ম্।
অম্ভস্যনন্তশয়নাদ্ বিরমৎসমাধে-
র্নাভেরভূৎ স্বকণিকাবটন্মহাব্জম্॥ ৩৩

তৎসম্ভবঃ কবিরতোঽন্যদপশ্যমান-
স্ত্বাং বীজমাত্মনি ততং সবহির্বিচিন্ত্য।
নাবিন্দদব্দশতমপ্সু নিমজ্জমানো
জাতেঽঙ্কুরে কথমু হোপলভেত বীজম্॥ ৩৪

স ত্বাত্মযোনিরতিবিস্মিত আস্থিতোঽব্জং
কালেন তীব্রতপসা পরিশুদ্ধভাবঃ।
ত্বামাত্মনীশ ভুবি গন্ধমিবাতিসূক্ষ্মং
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ে বিততং দদর্শ॥ ৩৫

এবং সহস্রবদনাঙ্ঘ্রিশিরঃকরোরু-
নাসাস্যকর্ণনয়নাভরণায়ুধাঢ্যম্।
মায়াময়ং সদুপলক্ষিতসংনিবেশং
দৃষ্টা মহাপুরুষমাপ মুদং বিরিঞ্চঃ॥ ৩৬
তস্মৈ ভবান্ হয়শিরস্তনুবং চ বিভ্রদ্
বেদদ্রুহাবতিবলৌ মধুকৈটভাখ্যৌ।
হত্বাঽনয়চ্ছ্রুতিগণাংশ্চ রজস্তমশ্চ
সত্ত্বং তব প্রিয়তমাং তনুমামনন্তি॥ ৩৭

সরলার্থ—হে ভগবান ! এক আপনিই এই সম্পূর্ণ জগৎ। এর আদিতে আপনিই কারণরূপে ছিলেন অন্তেও আপনিই শেষসীমা রূপে থাকবেন এবং এই দুইয়ের মধ্যেও এই জগতের প্রতীতিরূপে আপনিই রয়েছেন। আপনি আপনার মায়াশক্তি দ্বারা গুণাদির পরিণামস্বরূপ এই জগতের সৃষ্টি করেছেন। যদিও এই সৃষ্টির পূর্বেও আপনি বর্তমান ছিলেন তথাপি এর মধ্যে প্রবেশের লীলা করে (নির্গুণ আপনি) গুণাদি যুক্ত হয়ে **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'** আপনিই বহুরূপে প্রতীত হচ্ছেন॥ ৩০ ॥ হে দেব ! যা কিছু কার্য-কারণরূপে প্রতীত হয় তার সবকিছুই আপনি এবং এতদ্ব্যতীত যা কিছু তাও আপনিই। আপন-পর ভেদভাব কেবল অর্থহীন শব্দের মায়াজাল, কারণ যার থেকে যার জন্ম, স্থিতি, লয় এবং প্রকাশ ঘটে, সেটি স্বরূপত অপরটিই—যেমন বীজ এবং বৃক্ষ কারণ এবং কার্যরূপে ভিন্ন ভিন্ন হলেও গন্ধ-তন্মাত্ররূপে অর্থাৎ ভূত সূক্ষ্মস্তরে দুটিই পৃথ্বীময় হওয়ায় দুইই এক॥ ৩১ ॥ ভগবান ! আপনি এই বিশ্বচরাচরকে আপনার মধ্যে বিলীন করে আত্মানন্দে মগ্ন অবস্থায় নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রলয়পয়োধি জলে শায়িত থাকেন। সেইসময় আপনি স্বয়ংসিদ্ধ যোগবলে বাহ্যদৃষ্টিকে বন্ধ রেখে, নিজ স্বরূপের প্রকাশের মধ্যে নিদ্রাকে বিলীন করে তুরীয় ব্রহ্মপদে অবস্থান করেন। এই অবস্থানকালে আপনি তমোগুণ এবং বিষয়—উভয়ের সঙ্গেই সম্পূর্ণ সম্পর্কবর্জিত অবস্থায় বিরাজ করেন॥ ৩২ ॥ স্বীয় কালশক্তি দ্বারা প্রকৃতির গুণসমূহকে আপনিই প্রেরণ করেন, তাই ব্রহ্মাণ্ড আপনারই শরীর। প্রথমাবস্থায় তা আপনার মধ্যেই লীন ছিল। প্রলয়কালীন জলে

শেষশয্যায় শয়ান আপনি যখন যোগনিদ্রার সমাধি ত্যাগ করেন তখন ক্ষুদ্র বীজ থেকে যেমন বিশাল বটবৃক্ষ মাথা তোলে তেমনই আপনার নাভি থেকে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কমল উত্থিত হল॥ ৩৩ ॥ সেই পদ্মের উপর সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মা প্রকটিত হলেন। তখন তাঁর চতুর্দিকে কমলাসন ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। বীজরূপে ব্যাপ্ত আপনাকে নিজের মধ্যে জানতে না পেরে তিনি আপনাকে নিজের বাইরে অবস্থিত মনে করে জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে একশো বৎসর ধরে অনুসন্ধানে ব্যস্ত রইলেন। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলেন না। অবশ্য তাই স্বাভাবিক, কেননা বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গমের পর সমগ্র বৃক্ষে ব্যাপ্ত সেই বীজের পৃথক অস্তিত্ব কীভাবে পাওয়া যাবে ? ॥ ৩৪ ॥ ভগবান ব্রহ্মা হার মেনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পদ্মের উপরে বসে পড়লেন। বহুকাল তপস্যা করার পর যখন তাঁর হৃদয় শুদ্ধ হল তখন ভূত, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণরূপ স্বশরীরে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত আপনার সূক্ষ্মশরীরকে তিনি অনুভব করলেন—যেমন পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত তার অতি সূক্ষ্ম তন্মাত্রা গন্ধরূপেই অনুভূত হয়॥ ৩৫ ॥ বিরাট পুরুষ সহস্র সহস্র শির, মুখ, হস্ত, পদ, জঙ্ঘা, নাসিকা, কর্ণ, নেত্র, ভূষণাদি এবং আয়ুধসম্পন্ন ছিলেন। চতুর্দশ লোক তাঁর বিভিন্ন অঙ্গরূপে শোভা পাচ্ছিল। ভগবানের সেই লীলাময় মূর্তি দেখে ব্রহ্মার বড় আনন্দ হল॥ ৩৬ ॥ রজোগুণ এবং তমোগুণরূপ মধু এবং কৈটভ নামক অতি বলবান দুই দৈত্য ছিল। তারা যখন বেদকে হরণ করল তখন আপনি হয়গ্রীব অবতার রূপ ধারণ করে সেই দুই দৈত্যকে বধ করে সত্ত্বগুণরূপ চতুর্বেদ ব্রহ্মাকে ফিরিয়ে দিলেন। মহাপুরুষগণ বলেন যে, সেই সত্ত্বগুণই আপনার অত্যন্ত প্রিয় শরীর॥ ৩৭ ॥

মূলভাব—প্রহ্লাদ স্তুতি করে বলছেন—হে পরমেশ ! সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ছিল না কিন্তু আপনি ছিলেন, আবার জগৎ সৃষ্টি হলেও আপনিই সবার মধ্যে নিহিত থাকেন আর মহাপ্রলয়ে জগৎ বিনষ্ট হলেও আপনার অস্তিত্বের অভাব হয় না। জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত—এই অবস্থায় ভগবান কিরূপে বিরাজিত তার বিস্তৃত ব্যাখ্যায় প্রহ্লাদ বলছেন —**'ন্যস্যেদমাত্মনি জগদ্বিলয়াম্বুমধ্যে শেষেহত্মনা'** (ভাগবত ৭।৯।৩২) অর্থাৎ প্রলয়সময় এই পরিদৃশ্যমান জগতকে আত্মাতে লীন করে এবং স্বয়ং প্রলয়পয়োধিজলে অনন্তশয্যায় শায়িত হয়ে, শ্রীভগবান সুখে নিদ্রার আশ্রয়ে নিজ স্বরূপশক্তির সুখ অনুভব করেন।

এই নিদ্রিত কথার অর্থ বাহিরের ব্যাপার হতে বিরত থাকা। প্রহ্লাদ নিদ্রার আশ্রয় সম্বন্ধে বলছেন—**'যোগেনমীলিত দৃগাত্মনিপীতনিদ্রস্তুর্যে'** অর্থাৎ এ নিদ্রা জীবের সাধারণ নিদ্রা নয়, এ হল জাগ্রত, নিদ্রা ও সুষুপ্তাবস্থার অতিরিক্ত এক যোগাবস্থায় অবস্থান।

হে অনন্তদেব ! আপনি অনন্তকাল এই প্রলয় পয়োধিজলে শয়ন করে থাকেন। এই অবস্থায় ভগবান যখন আপনার সৃসৃক্ষা অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির অভিলাষ জাগে তখন তাঁর নিজ কালশক্তির প্রভাবে প্রেরিত সত্ত্বাদি গুণ বিক্ষোভিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর পুনরায় প্রকটিত হয়। হে প্রভু ! আপনার অনন্ত শয্যায় শয়ান অবস্থায় যোগের বিরামে, অতিসূক্ষ্ম বটবীজের থেকে মহাকায় বটবৃক্ষের উৎপন্নের মতো, আপনার নাভির থেকে এক মহাপদ্ম আবির্ভূত হল। এই মহাপদ্ম তারপর বিকশিত হল আর তার মধ্যে থেকে চতুরানন ব্রহ্মা উদ্ভূত হয়ে চারপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ব্রহ্মা ভাবলেন এই মহাপদ্ম কোথা থেকেই বা এল, তিনিই বা কোথায় ছিলেন বা কেমন করে আসলেন, এসব ব্যাপার তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। এর কারণ বীজ থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন হলে বীজ ও অঙ্কুর এক হয়ে যায়, বীজের আর পৃথক সত্তা থাকে না। **'জাতেঽঙ্কুরে কথমহোপলভেত বীজম্।'** সৃষ্টির প্রকল্পেই পরমাত্মা বিষ্ণু কমল যোনিতে লীন তাই ব্রহ্মার সাধ্য কী তাঁকে খুঁজে বের করে। তিনি যদি দয়া করে দেখা দেন তবেই তাঁকে দেখতে পারবেন।

ব্রহ্মা তখন অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হয়ে তত্ত্ব নিরূপণার্থে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। সেই কঠোর তপস্যার ফলে কমলযোনি ব্রহ্মার মনের মালিন্য দূর হল আর তিনি নিজদেহে পরিব্যাপ্তরূপে পরমেশ্বরকে দর্শন করলেন। **'সহস্র-বদনাঙ্ঘ্রি শিরঃ করোরু নাসাস্যকর্ণনয়নাভরণায়ুধাঢ্যম্'** (ভাগবত ৭।৯।৩৬) ব্রহ্মা দেখলেন—এই মূর্তি সহস্র সংখ্যক বদন, চরণ, মস্তক , হস্ত, ঊরু, নাসিকা, কর্ণ এবং চক্ষু তাদের উপযুক্ত আভরণ ও যথাযোগ্য অন্তর্যুক্ত আপনার বিরাট মূর্তি। আর হে প্রভু **'ভবান্ হয়চিরস্তনুবং শি বিভ্রৎ'** অর্থাৎ আপনার এই হয়গ্রীব মূর্তি যা বেদহিংসাপরায়ণ মধু-কৈটভ দৈত্যদের নিধন করে ব্রহ্মার হস্তে বেদ প্রত্যর্পণ করেন আর তা দেখে ব্রহ্মা অত্যন্ত আহ্লাদিত হলেন।

প্রহ্লাদের দীনতা ও কৃপা প্রার্থনা (শ্লোক ৩৮—৪৪)

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ ৩৮

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥ ৩৯

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥ ৪০

এবং স্বকর্মপতিতং ভববৈতরণ্যা-
মন্যোন্যজন্মমরণাশনভীতভীতম্।
পশ্যঞ্জনং স্বপরবিগ্রহবৈরমৈত্রং
হন্তেতি পারচর পীপৃহি মূঢ়মদ্য॥ ৪১

কো ন্বত্র তেঽখিলগুরো ভগবন্ প্রয়াস
উত্তারণেঽস্য ভবসম্ভবলোপহেতোঃ।
মূঢ়েষু বৈ মহদনুগ্রহঃ আর্তবন্ধো
কিং তেন তে প্রিয়জনাননুসেবতাং নঃ॥ ৪২

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা-
স্ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥ ৪৩

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্বিহায় কৃপণান্বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥ ৪৪

সরলার্থ—হে পুরুষোত্তম ! এইভাবে আপনি মনুষ্য, পশু-পক্ষী, ঋষি, দেবতা এবং মৎস্যাদি অবতাররূপে লোকসমূহের পালন এবং বিশ্বদ্রোহিগণের সংহার করেন। এইভাবে অবতার রূপ পরিগ্রহণের মাধ্যমে আপনি যুগে যুগে ধর্মকে রক্ষা করেন। কলিযুগে আপনি নিজেকে গুপ্ত রেখে অবস্থান করছেন সেইজন্য আপনার আরেক নাম 'ত্রিযুগ'॥ ৩৮ ॥

হে বৈকুণ্ঠনাথ ! আমার মন বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত। একেই তো সে নিজেই দুঃশীল তারপর পাপ কামনা দ্বারা জর্জরিত। হর্ষ, শোক, ভয়, লোক-পরলোকের চিন্তা, ধন-পত্নী-পুত্রাদির ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে থাকে— আপনার লীলা কীর্তনের মধ্যে সে কোনো আনন্দ খুঁজে পায় না। এই সকল কারণেই আমি দীনহীন হয়ে আছি, আপনার স্বরূপ চিন্তন কী করে করব ? ॥ ৩৯ ॥ হে অচ্যুত ! জিহ্বা পূর্বে অনাস্বাদিত স্বাদু বস্তুর রসগ্রহণের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। শারীরিক কামনা সুন্দরী স্ত্রীলোকের দিকে ধাবিত হচ্ছে, ত্বক কোমল স্পর্শের প্রতি, উদর ভোজনের প্রতি, কান মধুর গীতের প্রতি, নাসিকা সুগন্ধের প্রতি, চপলনেত্র সৌন্দর্যের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করছে। এসব ব্যতীত কর্মেন্দ্রিয়ও নিজ নিজ বিষয়ে আকৃষ্ট হবার জন্য ব্যাকুল। পত্নীযুক্ত পুরুষকে তার পত্নীরা যেমন নিজ নিজ শয়ন কক্ষের দিকে টানতে থাকে, আমার অবস্থাও ঠিক সেইরকম সঙ্গিন হয়ে উঠেছে॥ ৪০ ॥ এইভাবে জীব নিজের কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসাররূপ বৈতরণীতে নিমজ্জিত হয়ে আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু আবার মৃত্যু থেকে জন্ম এবং এই দুই-এর কর্মভোগ করতে করতে সর্বদা মহাভয়ে ভীত হয়ে থাকছে। আপন-পর ভেদ করতে করতে কারোর সঙ্গে মিত্রতা করছে, তো কারোর সঙ্গে শত্রুতা। আপনি মূর্খ জীবের এই দুর্দশা দেখে করুণায় দ্রবীভূত হোন। হে ভবনদীর কাণ্ডারী ! এই জীবকুলকে আপনি উদ্ধার করুন॥ ৪১ ॥ হে জগদ্গুরু, আপনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা, এই সংসার নদী থেকে জীবকে পার করার আপনি কী উপায় ভেবেছেন ? হে দীননাথ !

সাংসারিক বুদ্ধিহীন সরল ব্যক্তিই মহান পুরুষের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হয়। কিন্তু (আমি তা নই) আমার তার প্রয়োজনও নেই, কারণ আমি আপনার প্রিয়জনের সেবাদাস, তাই সংসার সাগর পার হওয়ার কোনো ভাবনাই আমার নেই॥ ৪২ ॥ হে পরমাত্মস্বরূপ ! এই ভব-বৈতরণী পার হওয়া অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে কঠিন হলেও আমি কিন্তু মুহূর্তের জন্যও চিন্তিত হই না, কারণ আমার মন বৈতরণীতে নয়, স্বর্গীয় অমৃতকেও যা পরাজিত করে পরমামৃতস্বরূপ সেই আপনার লীলা কীর্তনেই মগ্ন থাকে। আপনার গুণগান করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের মায়াময় মিথ্যা সুখ পাওয়ায় জন্য নিজের মাথার ওপর সারা সংসারের ভার বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে আমি সেই সকল মূর্খ প্রাণিগণের জন্য শোক করছি॥ ৪৩ ॥ হে প্রভু ! বড় বড় মুনিঋষিরা নিজের নিজের মুক্তির নিমিত্ত অরণ্যবাসী হয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করেন। অন্যের মুক্তির ব্যাপারে কিন্তু তারা উদাসীনই থাকেন। কিন্তু আমার মনের গতি ভিন্নপ্রকার। আমি এই অবোধ অসহায় দীনহীনদের পরিত্যাগ করে একা মুক্ত হতে চাই না। আর এই বিপথগামী জীবদের উদ্ধার করার জন্য আপনি ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই॥ ৪৪ ॥

মূলভাব—প্রহ্লাদ বলছেন হে জগদগুরো ! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে আপনি নানাবিগ্রহ পরিগ্রহ করে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্মসংস্থাপন করেন। **'ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ'** আর এই ত্রিযুগে যুগানুবৃত্ত ধর্ম প্রতিপালন করেন বলেই আপনি 'ত্রিযুগ' বলে খ্যাত। আমার চিত্ত নিতান্তই বিষয়-চঞ্চল, জিহ্বা রসের জন্য, শিশ্ন কামিনীর জন্য, উদর আহারের জন্য, শ্রবণ শব্দসুখের জন্য, নাসিকা গন্ধের জন্য আর চঞ্চল নয়ন রূপের জন্য সর্বদা ব্যাকুল। এই সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি এইরূপে আমাকে সদাই বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করছে। হে প্রভু ! আমি এইরূপ নিজের কর্মদোষে নিজেই ভব-বৈতরণীতে নিপতিত। আপনি কৃপা করে আমার মতো জন্মমরণ ভীত শরণাগতকে সংসার বৈতরণী পার করান, কারণ আপনি **'পারচর'** (ভাগবত ৭।৯।৪১) অর্থাৎ ভব-বৈতরণী পারের কর্তা। আমি জানি আমার মতো বহুশত পাপীতাপীর সন্তাপ দূর করতে আপনাকে কিছুমাত্র প্রয়াস করতে হবে না, কেননা আপনিই তো বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অতি অনায়াসেই করে

থাকেন। প্রহ্লাদ স্তব করে বলছেন—

মূঢ়েষু বৈ মহদনুগ্রহঃ আর্তবন্ধো, কিং তেন তে প্রিয়জনানুসেবতাং নঃ।
(ভাগবত ৭।৯।৪২)

হে ভগবন্! আপনি আর্তবন্ধো, আমার মতো মূঢ়জনের প্রতি আপনার সততই অসীম অনুগ্রহ। কিন্তু আপনি যদি অনুগ্রহ নাও করেন তাহলেও ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কেননা কোনো মহাভাগ্যের ফলে আমরা আপনার ভক্তগণের সেবক। এই ভক্তজনের সেবা প্রভাবেই আমার ন্যায় মূঢ়জনও পরিত্রাণ পাবে এতে কোনো সংশয় নেই। আবার বলছেন—প্রভু, আমি মূঢ় হলেও তোমার মহিমা কীর্তনরূপ মহামৃতে আমি আমার চিত্ত সমর্পণ করেছি। তাই আমার কোনো চিন্তা নেই। '**দুরত্যয়বৈতরণ্যাঃ নৈবোদ্বিজে ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ**' (ভাগবত ৭।৯।৪৩)। কিন্তু প্রহ্লাদের চিন্তা ও ব্যথা অন্য জায়গায়। '**শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্**' (ভাগবত ৭।৯।৪৩)। অর্থাৎ হে ঈশ্বর ! আমি অনেক সময়েই আপনার অপূর্ব চরিত্র-গুণগাথা কীর্তন করার সুযোগ পাই, কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা আপনার গুণগানে বিমুখ, আমি তাদের কথা ভেবেই ব্যথিত। এই প্রকারের সংসার বদ্ধ, ত্রিতাপদগ্ধ জীব কিছুতেই তৃপ্তি ও শান্তি পেতে পারে না, কারণ তারা স্ত্রী-সম্ভোগজনিত সুখেই তৃপ্ত থাকে। এই শারীরিক সুখ গায়ের চুলকানির মতো আপাত তৃপ্তিকর হলেও তা পরিণামে ক্লেশদায়ক ও বন্ধনকারী। এই প্রসঙ্গে প্রহ্লাদ মুনিদের কথা বলেছেন—

'প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।'
(ভাগবত ৭।৯।৪৪)

অর্থাৎ মুনিগণ যে তাদের উদ্ধার করবেন এমন আশাও সুদূর পরাহত কারণ তাঁরা প্রায়ই নিজ মুক্তিকামনায় নির্জন বনে কঠোর তপস্যায় কালযাপন করেন। জীব কী উপায়ে উদ্ধার পাবে সে চিন্তার অবসরও তাঁদের হয় না।

প্রহ্লাদের দাস্যভাব প্রার্থনা

(শ্লোক ৪৫—৫০)

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিমন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥ ৪৫

মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্ ॥ ৪৬

রূপে ইমে সদসতী তব বেদসৃষ্টে
বীজাঙ্কুরাবিব ন চান্যদরূপকস্য।
যুক্তাঃ সমক্ষমুভয়ত্র বিচিন্বতে ত্বাং
যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ ॥ ৪৭

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিযদম্বুমাত্রাঃ
প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ ।
সর্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্
নান্যৎ ত্বদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্ ॥ ৪৮

নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে
সর্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বা-
মেবং বিমৃশ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ ॥ ৪৯

তৎ তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্মপূজাঃ
কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত ॥ ৫০

সরলার্থ— সংসারে বদ্ধজীব মৈথুনাদিজনিত যে তুচ্ছ সুখভোগ করে তা পরিণামে দুঃখ ছাড়া কিছুই নয়। কেউ যদি দাদের জায়গায় চুলকায় তবে তাৎক্ষণিক একটু আরাম হলেও পরিণামে বিষক্রিয়ার ফলে তা দুঃখদায়ী হয়। অবোধ, অজ্ঞানী কিন্তু বহু দুঃখ ভোগ করেও বিষয় থেকে বিরত হয় না। দাদকে যদি না চুলকানো হয় তবে তা সুখকর পরিণামে যায় (অর্থাৎ সেরে ওঠে)। তেমনই ধীর পুরুষ কামাদিবেগকেও সংযত রেখে তার বিনাশ ঘটাতে সমর্থ হন॥ ৪৫॥ হে পুরুষোত্তম ! মোক্ষের দশ প্রকার সাধন প্রসিদ্ধ। তা হল— মৌন, ব্রহ্মচর্য, শাস্ত্রশ্রবণ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, স্বধর্মপালন, যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জনে অবস্থান করা, জপ এবং সমাধি। কিন্তু অসংযমীর কাছে এগুলি জীবিকা নির্বাহের অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হয়। বকধার্মিকের স্বরূপ যতদিন পর্যন্ত না মানুষের গোচরে আসছে ততদিন পর্যন্ত তারা জীবিকাসাধন করে থাকে আর তা জানাজানি হওয়া মাত্রই সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়॥ ৪৬॥ বেদ, বীজ এবং অঙ্কুরের মতো কার্য ও কারণরূপ আপনার দুই রূপেরই নির্মাণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে আপনি প্রাকৃতিক রূপরহিত কিন্তু এই কার্য এবং কারণরূপ ব্যতীত আপনাকে জানার আর কোনো সাধনমার্গও নেই। কাষ্ঠে গুপ্তভাবে পরিব্যাপ্ত অগ্নিকে যেমন ঘর্ষণের দ্বারা প্রকাশিত করা হয় তেমনই যোগিগণ ভক্তিযোগের সাধনার দ্বারা কার্য ও কারণের মধ্যে আপনার অনুসন্ধান করেন। কারণ প্রকৃতপক্ষে এই দুই রূপ আপনার থেকে পৃথক নয় বরং আপনারই স্বরূপ ॥ ৪৭ ॥ হে অনন্ত, হে প্রভু ! বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী,আকাশ, জল, পঞ্চভূত, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত, অহংকার, সম্পূর্ণ জগৎ, সগুণ এবং নির্গুণ—সব কিছুই কেবল আপনিই। এমনকি মন এবং শব্দের দ্বারা যা কিছু নিরূপিত হয়, তা সবই আপনি ভিন্ন আর কিছু নয়॥ ৪৮ ॥ হে সমগ্র কীর্তির আশ্রয় ভগবান ! এই সত্ত্বাদি গুণ ও তার পরিণাম মহত্তত্ত্বাদি দেবতা, মনুষ্য এবং মন প্রভৃতি কোনো কিছুই আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ নয়, কারণ তারা আদ্যন্তবিশিষ্ট কিন্তু আপনি অনাদি এবং অনন্ত। এরূপ বিচার করে জ্ঞানী ব্যক্তিরা শব্দজালের মায়া থেকে দূরে থাকেন॥ ৪৯ ॥ হে পরমপূজ্যপাদ ! আপনার সেবার ছয় প্রকার পদ্ধতি আছে— নমস্কার, স্তুতি,

সমস্ত কর্মের সমর্পণ, সেবা-পূজা, চরণকমলের সদা চিন্তা এবং নাম-গান শোনা। এই ষড়ঙ্গ সেবা পদ্ধতি ছাড়া আর কীভাবে আপনার শ্রীচরণকমল প্রাপ্ত হওয়া যাবে ? ভক্তিবিনা কীভাবেই বা আপনাকে পেতে পারি ? হে প্রভু, আপনি তো আপনার পরম ভক্তজনের, পরমহংসের সর্বস্ব॥ ৫০ ॥

মূলভাব—মহাত্মা প্রহ্লাদ স্তুতিতে বলছেন, হে ভগবন্ ! আপনার কৃপা ব্যতীত এই অতি দীন হরিভজনবিহীন জনগণের উদ্ধারের অন্য উপায়ই দেখি না। আবার অজিতেন্দ্রিয় বা দাম্ভিক সাধকগণ যদিও অনেক সময় একাদশী আদি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন কিন্তু তার সুফল লাভ করাও সুকঠিন। অনেকে আবার শাস্ত্র অধ্যয়নাদিতেও রত থাকেন কিন্তু এসব কিছুই ভগবানে প্রীতি উৎপাদনে যথেষ্ট নয়। ভক্তিই ভগবানের কৃপালাভের একমাত্র উপায়। পরমহংসগণ এই ভক্তিলাভের উপায় সম্বন্ধে বলেছেন—

নমঃস্তুতিকর্মপূজাঃ কর্মস্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া॥ (ভাগবত ৭।৯।৫০)

অর্থাৎ হে পূজ্যতম ভগবান্ ! আপনাতে প্রণাম, স্তুতি, সর্বকর্ম সমর্পণ, চরণযুগলের স্মৃতি আর গুণ শ্রবণ—এই ষড়ঙ্গবিশিষ্ট সেবা ব্যতীত কী করেই বা ভগবৎ ভক্তিলাভ সম্ভব।

প্রহ্লাদ উপসংহারে বলছেন— হে প্রভু ! আপনি আমাকে ও সকল জীবকেই ভক্তিলাভের উপযুক্ত এবং মূল দাস্যযোগ প্রদান করুন।

ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদের এইরূপ স্তবে প্রীত হয়ে ভগবান বলছেন—

মামপ্রীণত আয়ুস্মন্ দর্শনং দুর্লভং হি মে।
দৃষ্ট্বা মাং ন পুনর্জন্তুরাত্মানাং তপ্তুমর্হতি॥ (ভাগবত ৭।৯।৫৩)

আমাকে প্রীত না করে কোনো লোকই আমার দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। আবার একবার আমার দর্শন হলে জীব শোকে বা মোহে অভিভূত হয় না। এরপর ভগবান প্রহ্লাদকে অভিলষিত বরপ্রদান করতে চাইলেন। কিন্তু ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ শ্রীভগবানের একান্ত ভক্ত হওয়ায় শ্রীভগবান প্রদত্ত লোকলোভনীয় বরও গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন না।

শ্রীভগবানের বরপ্রদান ও প্রহ্লাদের স্তুতি
(১০ অধ্যায় শ্লোক ১—২৩)

ভক্তিযোগস্য তৎ সর্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ।
মন্যমানো হৃষীকেশং স্ময়মান উবাচ হ॥ ১

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাঽসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ।
তৎ সঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥ ২
ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো॥ ৩
নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥ ৪
আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥ ৫
অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বং চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥ ৬
যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥ ৭
ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ আত্মা ধর্মো ধৃতির্মতিঃ।
হ্রীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যং যস্য নশ্যন্তি জন্মনা॥ ৮
বিমুঞ্চতি যদা কামান্মানবো মনসি স্থিতান্।
তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে॥ ৯
ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং পুরুষায় মহাত্মনে।
হরয়েঽদ্ভুতসিংহায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ

নৈকান্তিনো মে ময়ি জাত্বিহাশিষ
আশাসতেঽমুত্র চ যে ভবদ্বিধাঃ।

অথাপি মন্বন্তরমেতদত্র
দৈত্যেশ্বরাণামনুভুঙ্ক্ষ ভোগান্॥ ১১
কথা মদীয়া জুষমাণঃ প্রিয়াস্ত্ব-
মাবেশ্য মামাত্মনি সন্তমেকম্।
সর্বেষু ভূতেষ্বধিযজ্ঞমীশং
যজস্ব যোগেন চ কর্ম হিন্বন্ ॥ ১২
ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং
কলেবরং কালজবেন হিত্বা।
কীর্তিং বিশুদ্ধাং সুরলোকগীতাং
বিতায় মামেষ্যসি মুক্তবন্ধঃ॥ ১৩
য এতৎ কীর্তয়েন্মহ্যং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ।
ত্বাং চ মাং চ স্মরন্ কালে কর্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৪

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

বরং বরস্য এতৎ তে বরদেশান্মহেশ্বরাৎ।
যদনিন্দৎ পিতা মে ত্বামবিদ্বাংস্তেজ ঐশ্বরম্॥ ১৫
বিদ্ধামর্ষাশয়ঃ সাক্ষাৎ সর্বলোকগুরুং প্রভুম্।
ভ্রাতৃহেতি মৃষাদৃষ্টিস্ত্বদ্ভক্তে ময়ি চাঘবান্॥ ১৬
তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত দুরন্তাদ্ দুস্তরাদঘাৎ।
পূতস্তেঽপাঙ্গসংদৃষ্টস্তদা কৃপণবৎসল॥ ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্বৈ কুলপাবনঃ॥ ১৮
যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্ত্যপি কীকটাঃ॥ ১৯
সর্বাত্মনা ন হিংসন্তি ভূতগ্রামেষু কিঞ্চন।
উচ্চাবচেষু দৈত্যেন্দ্র মদ্ভাব বিগতস্পৃহাঃ॥ ২০
ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ।
ভবান্মে খলু ভক্তানাং সর্বেষাং প্রতিরূপধৃক্॥ ২১

কুরু ত্বং প্রেতকৃত্যানি পিতুঃ পূতস্য সর্বশঃ।
মদঙ্গস্পর্শনেনাঙ্গ লোকান্ যাস্যতি সুপ্রজাঃ॥ ২২
পিত্র্যং চ স্থানমাতিষ্ঠ যথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ময্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কর্মাণি মৎপরঃ॥ ২৩

সরলার্থ— নারদ বললেন—প্রহ্লাদ বালক হলেও একথা বুঝলেন যে বর ভিক্ষা করা প্রেম ও ভক্তির পথে বিঘ্নস্বরূপ। তাই ঈষৎ হেসে তিনি ভগবানকে বললেন॥ ১ ॥ প্রহ্লাদ বললেন—হে প্রভু ! আজন্ম আমি বিষয়ভোগাসক্ত। সুতরাং আমাকে বরদানের দ্বারা প্রলোভিত করবেন না। বিষয়ভোগাসক্তিতে ভীত হয়ে এবং তীব্র বেদনা অনুভব করে আমি তার থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনায় আপনার শরণাপন্ন হয়েছি॥ ২ ॥ হে ভগবান ! আমি ভক্তগুণসম্পন্ন কিনা এ জানার জন্য আপনি আপনার ভক্তকে বরদানের প্রতি আকর্ষিত করতে চাইছেন। এই বিষয় ভোগলিপ্সা হৃদয়ের গ্রন্থিকে অত্যন্ত দৃঢ়তর করে বার বার জন্ম-মৃত্যু চক্রে প্রেরণ করে॥ ৩ ॥ হে জগদ্গুরু ! পরম দয়ালু আপনি কেবলমাত্র পরীক্ষার জন্য এইসব বলছেন, তাছাড়া আমি তো কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না (আপনার ভক্তকে ভোগলিপ্সায় নিমজ্জিত হওয়ার বর আপনি কখনো দিতে পারেন না)। যে সেবক কেবলমাত্র নিজের কামনা চরিতার্থ করতে চাইছে, সে সেবক নয়, সেতো কেবলমাত্র দেনা-পাওনার কারবারি বণিক ॥ ৪ ॥ যে নিজের প্রভুর কাছ থেকে আপন কামনা পূরণ করতে চায়, সে নিশ্চয়ই সেবক নয় এবং যে সেবকের নিকট থেকে শুধু সেবা পাওয়ার জন্যই প্রভু হয়ে বসে নিজের কামনা পূরণ করতে চায় সেও যথার্থ প্রভু নয়॥ ৫ ॥ আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত এবং আপনি আমার নিরপেক্ষ প্রভু। প্রয়োজনবশত যেমন রাজা এবং তার সেবকের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক থাকে ওইরকম সম্পর্ক আমার সঙ্গে আপনার নয়॥ ৬ ॥ হে বরদানের শিরোমণি নাথ ! যদি আপনি বরদানে ইচ্ছুক হন তাহলে কোনোভাবে, কখনো যেন আমার হৃদয়ে কামনার বীজ অঙ্কুরিত না হয় এরূপ বরদান করুন॥ ৭ ॥ হৃদয়ে কোনো কিছু কামনা উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, তেজ, স্মৃতি এবং সত্য—সকল কিছুরই বিনাশ ঘটে॥ ৮ ॥ হে কমললোচন ! যখন মানুষ তার মনস্থিত সমস্ত কামনা পরিহার

করে তখনই সে ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়॥ ৯ ॥ হে ভগবান ! আপনাকে প্রণাম । আপনি প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান। আপনি উদারতার শিরোমণি স্বয়ং পরমব্রহ্ম পরমাত্মা। এই অদ্ভুত নৃসিংহরূপধারী শ্রীহরির চরণে আমি বারংবার প্রণাম করি॥ ১০ ॥ ভগবান নৃসিংহদেব বললেন—হে প্রহ্লাদ ! তোমার মতো একান্তভক্ত ইহলোকে অথবা পরলোকে কোনো কিছুরই বিনিময়ে কামনা করে না। তথাপি খুব বেশিদিনের জন্য না হলেও আমার প্রসন্নতার জন্য তুমি এক মন্বন্তর কাল পর্যন্ত ইহলোকে দৈত্যাধিপতিদের ভোগ্য সমস্ত বিষয় গ্রহণে স্বীকৃত হও॥ ১১ ॥ সমস্ত জীবকুলের হৃদয়ে যজ্ঞের উপভোগকারী আমি ঈশ্বররূপে বিরাজিত। তুমি নিজের হৃদয়ে আমাকে দেখতে পাবে এবং তোমার অত্যন্ত প্রিয় আমার লীলাকথা শুনতেও পাবে। সমস্ত কর্মের দ্বারা আমাকে আরাধনা করে প্রারব্ধ কর্মের নাশ করো॥ ১২ ॥ ভোগের দ্বারা পুণ্যকর্মের ফল এবং নিষ্কাম পুণ্যকর্মের দ্বারা পাপ ক্ষয় করে, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, সময়মতো শরীর পরিত্যাগ করে, আমার কাছে চলে আসবে। সুরলোকের বাসিন্দারাও তোমার বিশুদ্ধ কীর্তির মহিমাকীর্তন করবে॥ ১৩ ॥ তোমার কৃত আমার স্তুতির বন্দনাগান ইহলোকে যে মনুষ্য করবে এবং তোমাকে ও আমাকে স্মরণ করবে এই সংসারে সমস্ত বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে॥ ১৪ ॥ প্রহ্লাদ বললেন—হে মহেশ্বর ! আপনি বরদানকারীদের প্রভু। আমি আপনার থেকে আর এক বর প্রার্থনা করি। আমার পিতা চরাচরগুরু আপনার সর্বশক্তিমান অলৌকিক তেজের সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত আপনার নিন্দা করেছেন । 'এই বিষ্ণুই আমার ভাইকে হত্যা করেছে' এরূপ মিথ্যা বুদ্ধিগ্রস্ত হওয়ার ফলে আমার পিতা ক্রোধ সম্বরণ করতে অসমর্থ হয়েছেন। এইজন্য আমি আপনার ভক্ত বলে উনি আমাকে দুঃখ দিয়েছেন॥ ১৫-১৬ ॥ হে দীনবন্ধু ! আপনার দৃষ্টি পড়তেই উনি পবিত্র হয়েছেন। আমার পিতা যে পাপ করেছেন তা শীঘ্রই স্খালন হবার নয়, তবুও আমি এই প্রার্থনাই জানাচ্ছি যে আমার পিতা অনেক দোষের ভাগী হওয়া সত্ত্বেও যেন আপনার দ্বারা হত হয়ে পূত হয়ে যান॥ ১৭ ॥ শ্রীনৃসিংহদেব বললেন—হে নিষ্পাপ প্রহ্লাদ ! তোমার পিতা আপনা থেকেই পবিত্র হয়ে মুক্ত হয়েছেন। এ আর এমনকী, তোমার মতো কুলপবিত্রকারী পুত্র প্রাপ্ত হবার জন্যই পূর্ববর্তী একুশ পুরুষসহ তিনি মুক্ত হতে পারতেন ॥ ১৮ ॥ শান্ত,

সমদর্শী এবং সম্যক্‌ভাবে সদাচার পালনকারী ভক্তবৃন্দ যেখানেই থাকুন না কেন এমনকি কীকটদেশ হলেও তা পবিত্র হয়ে যাবে॥ ১৯ ॥ দৈত্যরাজ ! আমার প্রতি ভক্তিভাবহেতু যার সমস্ত কামনা নষ্ট হয়ে গেছে, সে সর্বত্র আত্মভাবহেতু ছোট বড় যে কোনো প্রাণীকে কোনোরকম কষ্ট পেতে দেয় না॥ ২০ ॥ এই সংসারে যারা তোমাকে অনুকরণ করবে তারাও আমার ভক্তে পরিণত হবে। বৎস ! তুমিই আমার সমস্ত ভক্তকুলের আদর্শস্বরূপ॥ ২১ ॥ যদিও তোমার পিতা আমার অঙ্গস্পর্শে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছেন তথাপি তুমি তাঁর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করো। তোমার মতো পুত্রলাভের জন্যই উনি পরমলোক প্রাপ্ত হবেন॥ ২২ ॥ বৎস ! তুমি, তোমার পিতার শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে, বেদবিদ মুনিদের আজ্ঞানুসারে, আমার শরণে থেকে, আমাতে মন নিবিষ্ট করে, সেবা-বুদ্ধিযুক্ত হয়ে আপন কার্যে প্রবৃত্ত হও॥ ২৩॥

মূলভাব—পূর্বাধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে যে, হিরণ্যকশিপু বধের অন্তে শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদের স্তবে প্রীত হয়ে তাঁকে বর প্রদান করতে উদ্যত হলে প্রহ্লাদ বললেন, প্রভো ! আপনি যে আপনার ব্রহ্মা, শিব বাঞ্ছিত করকমল আমার মস্তকে অর্পণ করেছেন, এ অপেক্ষা বরণীয় সংসারে আর কী হতে পারে ! শিব-বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) বাঞ্ছিত এই করকমল অযাচিতভাবে লাভ করার পরে এমন মূর্খ আমি নয় যে আপনার নিকটে ইন্দ্রত্বাদি সংসারীর বরণীয় বিষয় প্রার্থনা করব ?

'যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিকঃ' (ভাগবত ৭।১০।৪) আপনার প্রীতি লাভ করেও যদি কেউ ভোগবিলাস চরিতার্থ করার বর নেয় তবে সেই প্রার্থনাকারী ভক্ত নয়, সে বণিক। অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা সে বর ক্রয় করে। অতএব হে প্রভো ! আমার কাম্য কোনো বরই নেই, তাই আমি কী বর চাইব। নিষ্কিঞ্চন ভক্তি যাঁরা লাভ করেন তাঁদের সত্য সত্যই কামনার কিছু থাকে না। তাই এইরকম ভাবে ভগবদ্দর্শনের পর ধ্রুব মহারাজও বলেছিলেন—**'স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে'**।

প্রহ্লাদ যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন শ্রীনারদ প্রহ্লাদকে যে অনুগ্রহ করেছিলেন, তারই ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁর এই নিষ্কিঞ্চনী ভক্তি উপার্জিত হয়েছে। সুতরাং প্রহ্লাদ কিছুতেই বর চাইলেন না, বরং অতি নম্রভাবে

নিবেদন করলেন যে, কামনাসিন্ধুর মধ্যেই আমার চিরবসতি, ভোগের চরিতার্থতার মধ্যেই আমার জন্ম, তার যা পরিণতি তাও আমি দেখেছি, তাই আমার প্রার্থনা কামনা-বাসনার বিষয়-রজ্জুতে আর আমাকে বেঁধে রাখবেন না, আমি বণিকের মতো ভক্তির বিনিময়ে বর গ্রহণ করব না। প্রহ্লাদ বলছেন—

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥
বিমুঞ্চতি যদা কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্।
তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে॥

(ভাগবত ৭।১০।৭,৯)

হে দয়াময়! একান্তই যদি আমাকে বর প্রদান করতে ইচ্ছা করেন তবে এই বর দিন যেন আমার হৃদয়ে কামনার বীজ অঙ্কুরিত না হয় আর কর্মফলের ইচ্ছা না জাগে। কামনা অতিশয় অনিষ্টকর যাতে মন, প্রাণ, আত্মা, ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই বিনষ্ট হয়। মানব যখন মনের সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন তখনই তিনি ভগবৎতুল্য ঐশ্বর্যের অধিকারী হন।

প্রহ্লাদ এই বলে ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে ভুয়োভূয়ঃ ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণিপাত করলে শ্রীভগবান প্রহ্লাদের ঐকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মন্বন্তর পরিমিত সময় ঈশ্বরত্ব ভোগ করার বর দিলেন এবং বললেন—

ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং কলেবরং কালজবেন হিত্বা।
কীর্তিং বিশুদ্ধাং সুরলোকগীতাং বিতায় মামেষ্যসি মুক্তবন্ধঃ॥

(ভাগবত ৭।১০।১৩)

প্রহ্লাদ তুমি পুণ্যাচরণ দ্বারা পাপ, ভোগ সুখানুভব দ্বারা পুণ্য এবং কালগতি দ্বারা শরীর পরিত্যাগ করে সর্বদিকে যশ ও কীর্তি প্রতিষ্ঠাপূর্বক এবং সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হবে। আর কেবল তুমিই মুক্ত হবে না, যে ব্যক্তি তোমাকে, আমাকে আর আমার এই চরিতকথা স্মরণ করবে এবং আমার-তোমার কৃত এই স্তুতি কীর্তন করবে সেও প্রারব্ধকর্মর অবসানে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

বিষ্ণুর পরমভক্ত দেবর্ষি নারদও এ স্তবের প্রশংসায় বলেছেন—

য এতৎ পুণ্যমাখ্যানং বিষ্ণোর্বির্যোপবৃংহিতম্।

কীর্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুত্বা কর্মপাশৈর্বিমুচ্যতে॥

(ভাগবত ৭।১০।৪৬)

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর বিচিত্র চরিত্রময় এই পুণ্য আখ্যান শ্রবণ করে অন্যত্র কীর্তন করেন তিনি কর্মপাশ হতে মুক্ত হন।

প্রহ্লাদের যদিও নিজের কোনো কামনা নেই তবু তিনি পিতার মুক্তি কামনা করলেন। তখন শ্রীনৃসিংহ ভগবান বললেন—

ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য গৃহে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ॥
যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ॥
সর্বাত্মনা ন হিংসন্তি ভূতগ্রামেষু কিঞ্চন।
উচ্চাবচেষু দৈত্যেন্দ্র মদ্ভক্তা বিগতস্পৃহাঃ॥

(ভাগবত ৭।১০।১৮-২০)

প্রহ্লাদ যে বংশে তোমার ন্যায় ভক্ত জন্মগ্রহণ করেছে, সেই কুল পবিত্র হয়েছে, একবিংশতি পুরুষের সাথে তোমার পিতাও পবিত্র হয়েছেন। যে যে দেশে এই রকম শমদমাদি গুণশালী, সর্বত্র সমদর্শী, উদার ও সাধু হৃদয় সম্পন্ন আমার ভক্তগণ বাস করেন সেই দেশ তো তাঁর সঙ্গবশেই পবিত্র হয়ে থাকে। বৎস ! আমার ভক্তিবলে যাঁদের বাসনা বিনষ্ট হয়েছে, তাঁরা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কোনও তুচ্ছ প্রাণীর প্রতি ভ্রমেও হিংসা করেন না। ভগবানের আদেশে প্রহ্লাদ পিতার প্রেত-ক্রিয়াদি সম্পাদন করলেন এবং দ্বিজগণ কর্তৃক পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। এইভাবে বিষ্ণুপার্ষদ জয় ও বিজয় বিপ্রশাপে দিতির পুত্ররূপে শত্রুভাবে শ্রীহরিকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন বলে, তিন জন্মে তাঁদের প্রকৃত মুক্তি হল। সত্যযুগে প্রথম হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু রূপে বরাহ ও নৃসিংহ অবতারের হস্তে, ত্রেতায় রাবণ-কুম্ভকর্ণ রূপে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে এবং দ্বাপরে শিশুপাল-দন্তবক্র রূপে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রাণত্যাগ করে, কৃষ্ণপার্ষদ হয়ে কৃষ্ণপদেই লীন হয়ে গেল, তাদের আর পতনের কোনো ভয় থাকল না।

———o———

ভগবানের আবির্ভাব ও ব্রহ্মাদিদেবগণ কর্তৃক ভগবৎ স্তুতি

(দশম স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়)

প্রাক্‌কথন

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে পরমহংস চূড়ামণি শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম থেকে ৯ম স্কন্ধ পর্যন্ত চব্বিশ অবতার, যোগের ক্রমবিকাশ, সমষ্টি ও ব্যষ্টি বিরাড়রূপ বর্ণন, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, নানা ভক্তের চরিতধ্যান বর্ণনা করে পরিশেষে সূর্য ও চন্দ্রবংশ বর্ণনা এবং অবশেষে সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণলীলার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অতঃপর দশম স্কন্ধে শ্রীশুকদেব শুরু করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত লীলার বর্ণনা। স্কন্ধটি নব্বই অধ্যায় সমন্বিত আর এতে আছে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলার সম্যক্ দিগদর্শন।

১-৪ অধ্যায়—ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভূভার হরণার্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

৫-৩৯ অধ্যায়—ব্রজলীলা।

৪০ অধ্যায়—ব্রজলীলার অন্তে যমুনা জল মধ্যে অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ও স্তুতি।

৪১-৫১ অধ্যায়—মথুরালীলা।

৫২-৯০ অধ্যায়—দ্বারকালীলা।

মহারাজ পরীক্ষিতের পিতামহী সুভদ্রা দেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আপন ভগিনী, পিতামহ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা, আরেক পিতামহী দ্রৌপদী তাঁর সারাজীবনে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে নানা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন, এবং তিনি নিজে মাতৃগর্ভেই (উত্তরার) শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছিলেন।

পাণ্ডবকুলের কুলপাবন, জন্ম-জন্মাধীন সংস্কার যে পরীক্ষিতের পেছনে পেছনে ছুটছে, যা তাঁকে পৃথিবীর আধিপত্যের বাসনা বিসর্জন দিয়ে গঙ্গাতীরের আশ্রয় লাভে সমর্থ করিয়েছে, সেই সংস্কারই দশমস্কন্ধে শ্রীভগবানের লীলার প্রারম্ভে তাঁর ভিতরের সুপ্ত প্রেমবীজ মুকুলিত করে তুলল। মহারাজ তাই দশম স্কন্ধের প্রথমেই বলছেন—

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্যয়োঃ।
রাজ্ঞং চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্॥

(ভাগবত ১০।১।১)

অর্থাৎ হে শুকদেব! আপনি চন্দ্র ও সূর্যবংশ বর্ণনা করেছেন এবং ওই রাজগণের পরমাদ্ভুত চরিত্রও বর্ণনা করেছেন। এখন পরম ধর্মশীল যদুর বংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলদেবসহ অবতীর্ণ হয়ে যে পরমাদ্ভুত লীলা করেছেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন।

ভাগবতের দশম স্কন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব তত্ত্বজ্ঞান সহ ভগবানের আবির্ভাব বর্ণনা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণের ফল, শ্রীকৃষ্ণাবতারের কারণ, ব্রহ্মাদি দেবতাদের প্রার্থনা ও ভগবানের আশ্বাস, ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বকথন, ভগবানের আবির্ভাব

শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণের ফল—ভগবানের এই প্রসঙ্গ মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীশুকদেব স্বয়ং বর্ণনা করেছেন।

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানন্তবৌষধাচ্ছোত্রমনোঽভিরামাৎ ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

(ভাগবত ১০।১।৪)

অর্থাৎ **মুক্ত** ব্যক্তি যাকে সর্বসাধনার সার বলে থাকেন এবং নিজেরা নিত্য অনুষ্ঠান করেন, **মুমুক্ষু** ব্যক্তিগণ যাকে সংসার রোগ নিবারণের একমাত্র উপায় বলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যার শ্রবণে **বিষয়াসক্ত** ব্যক্তিরও কর্ণকুহর শীতল হয় এবং অর্থ-জ্ঞান হলে মনে বিশেষ আনন্দ সঞ্চার হয়, সেই ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ-কীর্তনাদি হতে কেবল আত্মঘাতী, আত্মক্লেশী বা ব্যাধপ্রকৃতির জীব ভিন্ন আর কে বিরত হতে পারে?

মুক্ত বা নিবৃত্ত কথার অর্থ হল বাসনামুক্ত জীব—যাদের জন্ম-মরণাদি সংসার ক্লেশ থাকে না, তাই তারা পরমানন্দে শ্রীগোবিন্দ কথাপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করেন। এই মুক্ত জীবের মধ্যে যাঁরা ভক্তি-মিশ্র জ্ঞান বা

যোগসাধনা করে সংসারমুক্ত হন, তাঁরা পরব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করেন। আবার যাঁরা জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তির সাধনা করেন তাঁরা সংসারমুক্ত হয়ে পার্ষদ দেহ লাভ করেন। এঁদের মধ্যে আবার যাঁদের সাধনা করতে করতে সংসার বাসনা নিবৃত্তি হয়ে গিয়ে কিন্তু সাধক দেহ আছে, এতাদৃশ মুক্তের নাম জীবন্মুক্ত। যাঁদের সাধক দেহের অবসানে পার্ষদ দেহ লাভ হয়েছে তাঁরা হলেন মুক্ত। নিবৃতর্ষৈ অর্থে এখানে এই উভয়বিধ মুক্তকে বলা হয়েছে।

এই প্রকার সকল মুক্ত শ্রেষ্ঠ যথা নারদাদি ঋষিগণ এবং মুক্তগণ পরিসেবিত ব্রহ্মা, শিব, অনন্তদেব প্রমুখ অহর্নিশি শ্রীগোবিন্দ গুণানুবাদেই মত্ত থাকেন। তাই দেখা যায় যে ভবসিন্ধু পার হয়ে গেলেও শ্রীগোবিন্দ-গুণ-কথা-সিন্ধু পার হওয়া যায় না।

মুমুক্ষু—আবার রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যখন রোগের যন্ত্রণায় চেতনাশূন্য হয়ে যান, তখন তাঁর আর প্রতিকারের ক্ষমতা থাকে না। কোনও ক্রমে চৈতন্য সঞ্চার হলে তখন তিনি রোগ প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হন। ভবরোগগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থাও ওইরূপ। যখন কোনো মহৎ কৃপাবশত একটু চৈতন্য লাভ করেন, তখন তিনি নিজের অবস্থা বোঝেন এবং ভবরোগ প্রতিকারের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। আর এই প্রকার ভবরোগগ্রস্ত ব্যক্তি— যিনি নিজের ভবরোগ মুক্তির জন্য বদ্ধপরিকর, তাঁরাই হলেন মুমুক্ষু আর সেই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ভবরোগের প্রতিকারের জন্য এই হরিকথা অমৃতরূপ মহৌষধ সেবন করে থাকেন। এ রোগের আর অন্য কোনো ঔষধ নেই। সুতরাং শ্রীগোবিন্দ গুণানুবাদ মুক্ত ও মুমুক্ষু এই দ্বিবিধ জীবেরই পরমোপাদেয়।

বিষয়ী—আবার যাঁরা বিষয়ী, তাঁদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি গ্রহণ করাই হয় জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই বিষয়ীরাও যদি শ্রীকৃষ্ণ লীলাকথা শ্রবণ করেন তবে তাতে আকৃষ্ট হন আর অর্থ-জ্ঞান হলে তো মন তৃপ্তিকর হয়ই, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং বিষয়ীগণও ইহা পরম সমাদরে সেবন করেন।

তাহলে দেখা যায় যে **'নিবৃত্ততর্ষরুপগীয়মানাৎ'**, **'ভবৌষধাৎ'**, **'শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ'** এই বিশেষণে মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী এই ত্রিবিধ

ব্যক্তিকেই শ্রীগোবিন্দকথার অধিকারী বলে বলা হয়েছে।

কর্ম, জ্ঞান ও যোগসাধনে ভক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হল সাধকের নিকট সাধন এবং ভক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি হল সাধকের সাধ্য। কিন্তু শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তনাদি আরম্ভ করলে সাধকের ক্রমশঃ শ্রবণ-কীর্তনাদির আগ্রহ বেড়ে যায় এবং পরিশেষে সে প্রেমে মত্ত হয়ে অহর্নিশি শ্রবণ-কীর্তনে রত হয়। তাই শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধক অবস্থায় সাধন এবং সিদ্ধ অবস্থায় তাই হবে সাধ্য।

তাই চৈতন্যচরিতকার বলেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে হয় সব অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শুদ্র কিবা পুরুষ-নারী॥

কিন্তু শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে আরও একপ্রকার ব্যক্তির কথা বলছেন—পশুঘ্নাত অর্থাৎ পরম দুর্ভাগ্যজনক এইপ্রকার ব্যক্তির কথা যারা আত্মঘাতী বা ব্যাধ প্রকৃতির আর তাই তারা এই পরম মঙ্গলদায়ক শ্রীগোবিন্দলীলামৃত থেকেও বঞ্চিত থাকে। কারণ '**বিষয়াবিষ্ট চিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদুরতঃ**'। যাঁর শ্রীভগবানে আসক্তি আছে তিনি সর্বগুণের আকর আর যাঁর বিষয়ে আসক্তি আছে তিনি সর্ব দোষের আকর।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কাছে বেতালের প্রশ্ন — 'এখানে আছে সেখানে নেই, সেখানে আছে এখানে নেই, এখানেও আছে সেখানেও আছে আর এখানেও নেই সেখানেও নেই' — মহারাজ উত্তরে বলেছেন— '**রাজপুত্র চিরং জীব মা জীব ঋষিপুত্রক, জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মা মর**'। অর্থাৎ রাজপুত্র যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিনই নানাবিধ সুখভোগ করে থাকেন কিন্তু জীবনান্তে সুখভোগের লেশমাত্র নেই। কারণ জীবিতকালে তিনি কোনো সদনুষ্ঠান বা ত্যাগমূলক কর্ম করেননি। তাঁর সুখ পূর্বজন্মকৃত পুণ্যের জন্য এবং ইহকালেই তার সমাপ্তি। ঋষিপুত্র আবার নানাপ্রকার তপস্যাদি করে ইহজীবনের সুখভোগ থেকে বঞ্চিত থাকেন কিন্তু অর্জিত পুণ্যের ফলে তাঁর পরলোকে অক্ষয় সুখভোগ থাকে। তাই ঋষিপুত্রদের মরণেই লাভ আর জীবনে সুখভোগের লেশমাত্রই নাই।

আবার সাধুপ্রকৃতির লোক অর্থাৎ ভগবদভক্তজনেরা শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যাঙ্গের অনুষ্ঠানে পরমানন্দে কালযাপন করেন এবং পরকালেও পার্ষদ-দেহ লাভ করেন, তাই তাঁদের জীবন ও মরণ উভয়ই সুখময়।

কিন্তু ব্যাধপ্রকৃতি জীবগণ ইহকালে সর্বদা হিংসাময় জীবনযাপন করে এবং পরকালেও অনন্ত নরক ভোগ করে, তাই তাদের জীবনে বা মরণে কিছুতেই সুখ নেই। এখানে মহারাজ পরীক্ষিত 'বিনা পশুঘ্নাত' এই অর্থে শ্রীভগবতকথায় আদরবিহীন ব্যক্তিগণকে ব্যাধ বলে অভিহিত করেছেন।

মহারাজ পরীক্ষিত বলছেন—হে গুরো ! জীবমাত্রেরই কৃষ্ণকথায় বিরত হওয়া উচিত নয়। আর বিশেষত আমার তো কিছুতেই ইহা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য নয়, কেননা শ্রীকৃষ্ণ আমার কুলের ঠাকুর, তাঁর কৃপাতেই আমার 'কুল', কূল পেয়েছে না হলে অকূল পাথারে ভাসত।

দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ।

(ভাগবত ১০।১।৫)

পরীক্ষিত বলছেন— শ্রীকৃষ্ণের চরণতরণী আশ্রয় করে আমার পিতা পিতামহ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অমরজয়ী ভীষ্মাদিরূপ তিমিঙ্গিল ব্যাপ্ত দুষ্কর কৌরবসৈন্যসাগর, গোবৎস পদের ন্যায় হেলায় পার হয়েছিলেন।

পরীক্ষিত বলতে চেয়েছেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, জয়দ্রথ প্রমুখ কৌরব সেনানায়কগণ কেহই বীর্য প্রভৃতিতে নগণ্য নহেন। কৌরবপক্ষের মহারথীদের মধ্যে ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু, দ্রোণের কণ্ঠতালু ভেদ করে ব্রহ্মরন্ধ্রভেদে মরণ, কৃপাচার্য অমর, পৃথিবী রথচক্র গ্রাস না করলে কর্ণের মরণ সম্ভাবনা ছিল না, জয়দ্রথর মস্তক যিনি ভূমিতে ফেলবেন তাঁরই মস্তক নিপাতিত হবে এবং অশ্বত্থামা চিরঞ্জীবী আর তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র ও রুদ্রাস্ত্রর বিদ্যা করতলগত। এইরকম কৌরবপক্ষীয় সকল বীরই দুর্জয় ছিলেন তাঁদের কারও মরণ নরলোক সাধারণের ন্যায় ছিল না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আদি সকলেই অতিরথ ছিলেন এবং তাঁরা দুষ্কর কৌরবসৈন্যসাগরে তিমিঙ্গিলের ন্যায় বিচরণ করতেন।

অস্তি মৎস্যস্তিমির্নাম শতযোজন বিস্তৃতঃ।
তিমিঙ্গিল গিলোঽপ্যস্তি তদ্‌গিলোঽপ্যস্তি রাঘবঃ॥

শতযোজন বিস্তৃত মৎস্য বিশেষের নাম তিমি এবং তাকে যে গ্রাস করতে সমর্থ তাকে বলে তিমিঙ্গিল। আর তাকে যিনি শাসন করেন তিনি রাঘব (ভগবান)। এই সংসার সাগর পার হওয়া অতীব দুরূহ কিন্তু আমার পিতামহগণ শ্রীকৃষ্ণচরণ তরণী, শরণাগত ক্ষেপণী ও করুণা অনুকূল বাতাসে নির্ভর করেই এই অপার সংসার-জলধি অক্লেশে অতিক্রম করে গিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়ে ভীষণ ভবসাগরও শুকিয়ে গোবৎসপদতুল্য হয়ে যায়। পরীক্ষিত এখানে শ্রীকৃষ্ণ চরণাশ্রয়কে 'প্লব' বা ভেলা বলেছেন যা আশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত সুলভ। পরীক্ষিত মহারাজ আরও বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ কেবল কেবল আমার কুলের গতি নন, তিনি আমার জীবনদাতাও। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করেন। তখন তার তাপে আমি মাতৃগর্ভে দগ্ধপ্রায় হয়ে যাচ্ছিলাম। সেই সময় করুণাময় শ্রীগোবিন্দ চক্রগদাদি ধারণপূর্বক আমার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে আমার দেহ রক্ষা করেছিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিত নিজের পরিবার ও নিজের প্রসঙ্গ বলে অতঃপর সর্বজীবের প্রতি ভগবানের আচরণ সম্বন্ধে বলছেন—

বীর্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্বহিঃ পূরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতং চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্॥

(ভাগবত ১০।১।৭)

হে গুরু! যিনি সর্বজীবের অন্তরে ও বাহিরে পুরুষ ও কালরূপে অবস্থিত হয়ে অন্তর্দৃষ্টিযুক্ত জীবগণকে মোক্ষ ও বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন জীবগণকে কাল অর্থাৎ যমাদিরূপ দ্বারা সংসার দুঃখ প্রদান করেন। সেই মায়া-মনুষ্য রূপে আবির্ভূত শ্রীগোবিন্দের অমৃতময় লীলাকথা আমাকে বর্ণনা করুন।

এই দুই প্রকার জীবের পার্থক্য এই যে, বহির্মুখ জীবগণের স্বভাবই এই যে তারা অপ্রাকৃত বিষয়কেও প্রাকৃত জগতে টেনে এনে নিজের মতো আস্বাদন করতে চায়। গীতাতেও তাই ভগবান বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

(গীতা ৯।১১)

অর্থাৎ বহির্মুখ ব্যক্তিগণ আমার তত্ত্ব ও লীলারহস্য না জেনে প্রাকৃত বুদ্ধিতে আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে।

অন্তর্মুখী মহারাজ পরীক্ষিত কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ লীলাকথা শ্রবণের বলবতী লালসায় বহু প্রশ্ন করেছেন আর এখন তার উত্তর শুনবার জন্য উদগ্রীব ভাবে শ্রীশুকদেবের মুখপানে তৃষ্ণাতুর চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করেছেন। ভাগবত কথার চারদিন অতীত হয়েছে আর মহারাজ পরীক্ষিতেরও শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণের বাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই তিনি বলছেন—

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজ-চ্যুতং হরিকথামৃতম্॥

(ভাগবত ১০।১।১৩)

হে গুরো ! আমি আপনার বদন-কমল নিঃসৃত হরিকথামৃত পানে রত আছি বলে জলবিন্দু গ্রহণ না করেও দুঃসহ ক্ষুধায় পীড়িত হচ্ছি না। মহারাজ পরীক্ষিতের কথায় বৈষ্ণবচূড়ামণির মুখে হরিকথামৃত শ্রবণের মাহাত্ম্য বেশ বোঝা যায়।

শ্রীশ্রীমন্মমহাপ্রভুও নির্দেশ দিয়েছেন—

ভাগবত পড় গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

মহারাজের আগ্রহাতিশয্য দেখে শ্রীশুকদেব তাই বলছেন—

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা॥

(ভাগবত ১০।১।১৬)

শ্রীগোবিন্দ চরণ নিঃসৃতা গঙ্গা যেমন স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল ত্রিভুবন পবিত্র করে, সেইরকম শ্রীগোবিন্দ লীলার বক্তা, প্রশ্নকর্তা ও শ্রবণকারী — এই তিনজনই কৃতকৃতার্থ হন।

মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রশ্ন করার সময় তাঁকে বলেছেন **'মুনিসত্তম'** (ভাগবত ১০।১।২) আর শ্রীশুকদেবও

শ্রোতা হিসাবে পরমভাগবত পরীক্ষিতকে বলছেন **'রাজর্ষিসত্তম'** (ভাগবত ১০।১।১৫)। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে পরমপ্রীত হয়ে বলছেন— হে রাজর্ষিসত্তম ! তুমি ভগবানের লীলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নিজে কৃতার্থ হয়েছো, বলার সুযোগ দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছো আর সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকেও কৃতার্থ করেছো।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নারদ বসুদেবকে বলেছেন—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেব বিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥

(ভাগবত ১১।২।১২)

অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তজনের আচরিত শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ ধর্মের শ্রবণে, কীর্তনে, ধ্যানে, আদরে ও অনুমোদনে দেবদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী জনগণও সদ্য পবিত্র হয়। হে মহারাজ ! তুমি ধন্য এবং তোমার জন্য আমরাও সবাই ধন্য।

শ্রীকৃষ্ণের অবতারের কারণ—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণ লীলাকথা বলবার উপক্রমে শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্বে জগতের ও ভক্তগণের কী অবস্থা ছিল তা বলা শুরু করলেন।

বেদ-পুরাণাদি প্রতিপাদিত শ্রীভগবদ্ভক্তজনই প্রকৃত ধর্ম। (**ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্ত**) কোনো কোনো সময় জগতের এমন দুর্ভাগ্য এসে উপস্থিত হয় যে সে সময় জীব বেদ-পুরাণাদির অপেক্ষা না করে নিজের মনমতো আচরণকেই ধর্ম বলে বোঝে এবং তারই অনুষ্ঠানে তৎপর হয়। যখন সমাজের অবস্থা এইরকম হয় তখন ভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয়। ভগবান গীতায় বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(গীতা ৪।৭-৮)

হে অর্জুন ! যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান হয়, তখনই আমি আত্মপ্রকাশ করি। প্রকৃত ধর্মনিষ্ঠ সাধুগণের পরিত্রাণ ও ধর্মধ্বজী, স্বেচ্ছাচারী পাষণ্ডগণের বিনাশ নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

দ্বাপরের শেষে পৃথিবী একবার এই অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে অসুর ভাবসম্পন্ন নরপতিগণ তাঁদের দলবলসহ কেবল পররাষ্ট্র লুণ্ঠন, পরপীড়ন, ধার্মিকের অবমাননা, অধর্মের আশ্রয়, স্বার্থপরতা, নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অপরের মহাক্ষতিসাধন প্রভৃতিকে জীবনের ব্রত হিসাবে নিয়েছিল। তাই পৃথিবী এ সকলের ভার বহনে অক্ষম হলে ভগবানের আবির্ভাবের সময় এগিয়ে এল।

ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনা ও ভগবানের আশ্বাস—পৃথিবীর মুখ হতে এইরূপ দুঃখের বার্তা শুনে ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণ শ্রীশংকরসহ পালনকর্তা বিষ্ণুর নিকট পৃথিবীর দুঃসহ দুরাবস্থা জানাবার জন্য ক্ষিরোদসাগরের তীরে উপস্থিত হলেন।

বৃহৎ বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে আছে— **'বিষ্ণুক্ষিরাব্ধিমন্দিরঃ'**। শ্রীবিষ্ণু ক্ষিরোদসাগর মধ্যস্থিত শ্বেতদ্বীপে নিজ মন্দিরে পার্ষদগণ ও লক্ষ্মীসহ বাস করেন। গাভীরূপিণী পৃথিবী, এই ক্ষিরোদসাগর তীরে উপস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণ ও শ্রীশংকরের নিকট অশ্রুমুখে বললেন—

তং সাম্প্রতমিমে দৈত্যাঃ, কালনেমিপুরোগমাঃ।
মর্ত্যলোকং সমাগম্য বাধন্তেঽহর্নিশং প্রজাঃ॥

(বিষ্ণুপরাণ)

কালনেমি নামক অসুর পূর্বে যে হিরণ্যাক্ষের পুত্র ছিল, সম্প্রতি সে উগ্রসেন-পুত্র কংস হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। সে কংসরূপে জন্মগ্রহণ করে প্রজাপীড়ন শুরু করেছে। অরিষ্ট, ধেনুক, প্রলম্ব, কেশী, নরক, শুন্দ, বলিপুত্র বাণ (বাণাসুর) আদি মহাপরাক্রান্ত দৈত্যগণ পৃথিবীর রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে কংসের সঙ্গে প্রজাপীড়নে যোগ দিয়েছে। এই বলদৃপ্ত দৈত্যগণের ভার আমার ওপর পড়েছে। হে পিতামহ ! আমি আর তাদের ভূরিভার সহ্য করতে পারছি না।

পৃথিবীর বক্তব্য এই যে আমি সর্বসংহা, সকল দুঃখ সহ্য করতে পারি। সুমেরু, হিমালয় প্রভৃতি পর্বতের ভারেও আমি ভারবোধ করি না, কিন্তু হরিভজনবিহীন ব্যক্তির ভার আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। হে চতুরানন ! আপনি তো সৃষ্টিকর্তা, আপনি এইরূপ বহির্মুখ জীব সৃষ্টি করে কেন আমাকে দুঃখ প্রদান করছেন।

ব্রহ্মা অতঃপর পুরুষসূক্তে শ্রীবিষ্ণুর বন্দনা করে তাঁদের দুঃখ নিবেদন করলেন—

সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলাম্॥

(যজুর্বেদ ৩১।১)

হে প্রভু তোমার মস্তক অসংখ্য, নেত্র অসংখ্য, পদ অসংখ্য, তুমিই পরমাত্মা। তুমিই সর্বত্র ব্যাপক হয়ে পঞ্চস্থূলভূত ও পঞ্চসূক্ষ্মভূত-এর সাহায্যে জগৎকে ব্যপ্ত করো এবং তা অতিক্রম করেও অবস্থান করো।

অবতারলীলার ক্রম—এই স্থলে ভগবানের অবতারলীলা বোঝার জন্য ক্ষীরোদসাগরে-শায়িত পুরুষের শাস্ত্রোচিত আলোচনা আবশ্যক। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভুবন হল— অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহীতল, পাতল এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জন, মহঃ, তপঃ ও সত্য এবং এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড সমন্বিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডর প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবদিচ্ছায় আকাশমার্গে পরস্পরের আকর্ষণে অবস্থিত। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য করার জন্য প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র আছেন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সত্যলোকে, বিষ্ণু ক্ষিরোদসাগরের শ্বেতদ্বীপে এবং রুদ্র কৈলাসে নিজ নিজ পার্ষদগণসহ অবস্থান করেন।

সমস্তব্রহ্মাণ্ডই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্টি বলে ইহা এই প্রাকৃত। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আবার পরিখার ন্যায় মহাসমুদ্রবেষ্টিত তার নাম 'কারণার্ণব'। এই কারণার্ণবও কেবলমাত্র সাম্যভাবে স্থিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়। আর ইনিই হলেন মূল প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সততই পরিণামশীল এবং এই পরিণামও দ্বিবিধ— সম পরিণাম ও বিষম পরিণাম। আর বিষম

পরিণাম হতেই মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্ট হয়ে ক্রমে ক্রমে স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয়। আর সমপরিণামে কোনো সৃষ্টি হয় না এবং ইহাই সত্ত্ব, রজ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা এবং এই সমপরিণামাবস্থা প্রকৃতিকেই কারণার্ণব বলে। এই সত্ত্ব, রজ, তমগুণের মহাসমুদ্র থেকে বুদ্‌বুদরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় আবার মহাপ্রলয়ে সেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড কারণার্ণবে লীন হয়। এই কারণার্ণবের পরপারে সিদ্ধলোক। আর এই সিদ্ধলোক সৎ চিৎ ও আনন্দময়। জ্ঞানিগণ সিদ্ধলোককেই ব্রহ্মলোক বলেন এবং নির্বাণপ্রাপ্ত বা কৈবল্য সিদ্ধসাধকগণ এই সচ্চিদানন্দে লীন হয়ে যান বলে এর নাম সিদ্ধলোক।

সিদ্ধলোকের পরে আসে পরব্যোম, আর এই পরব্যোম হল ঘনীভূত সচ্চিদানন্দময় অনন্ত বৈকুণ্ঠ। এই সমস্ত বৈকুণ্ঠে ভগবান মৎস্য কূর্মাদি অবতার মূর্তিতে নিজ নিজ পার্ষদগণসহ লীলারসাস্বাদন করে থাকেন। যে সময় ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা বিষ্ণুর দ্বারা পালনকার্য সুচারুভাবে সম্পন্ন না হয় তখন সমস্ত বৈকুণ্ঠস্থ অবতারবৃন্দ ব্রহ্মাণ্ডে এসে ব্রহ্মাণ্ড পালন করে আবার স্বধামে গমন করেন।

সমস্ত বৈকুণ্ঠর উপরিভাগে 'গোলোকধাম'। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গোলোকে গো, গোপ ও গোপীসহ নিত্য লীলারস আস্বাদন করেন। এই গোলোক অধিষ্ঠাতা শ্রীগোবিন্দেরই আবরণ দেবতাস্বরূপ বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্বুহ।

মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কারণার্ণবে ও কারণার্ণব সংকর্ষণে লীন হয়ে যায়, তখন সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কোনো প্রাকৃত পদার্থই থাকে না। সে সময় সিদ্ধলোক, পরব্যোম, অনন্ত বৈকুণ্ঠ এবং গোলকধাম ও সেই ধামস্থ শ্রীভগবান নিজ নিজ পার্ষদসহ নিত্য বিরাজিত থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণও তখন স্ব স্ব সূক্ষ্মবাসনাসহ সংকর্ষণে লীন থাকে। মহাপ্রলয়ের অবসানে যখন শ্রীভগবানের আবার সৃষ্টি করতে ইচ্ছে হয় তখন সংকর্ষণ হতে কারণার্ণব প্রকাশ হয় ও তাতে সংকর্ষণের অংশ **'কারণার্ণবশায়ী'** রূপে প্রবেশ করে প্রকৃতিতে বিষম পরিণাম সংঘটন করেন ও তা হতেই মহত্ত্বতাদিক্রমে স্থূল

ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হয়। এইরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হলে শ্রীভগবানের চতুর্থব্যূহ অনিরুদ্ধ অনন্ত মূর্তিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করেন। এঁরই নাম **'গর্ভোদকশায়ী'**। এই গর্ভোদকশায়ীর অংশ **'ক্ষীরোদশায়ী'** আর এঁরই নাভিকমল হতে ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবদেহ এবং জীবভোগ্য বস্তুসমূহের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন এবং যিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মা জীবদেহ সৃষ্টি করলে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু অনন্তমূর্তিতে অনন্ত জীবের অন্তর্যামীরূপে অনন্ত জীবদেহে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের লয়কর্তা হলেন শ্রীসংকর্ষণ ও সংকর্ষণাংশ।

প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই এইরূপ পৃথিবী প্রভৃতি আছে, ব্রহ্মাদি দেবগণ আছেন, এবং ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুও আছেন। কিন্তু অন্য ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা কিরূপ তা আমাদের জানার উপায় নাই এবং তা কেবল অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি গোবিন্দই জানেন। তবে শ্রীভগবদকৃপায় যাঁরা যোগদৃষ্টি লাভ করেন তাঁরাই অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা উপলব্ধি করতে পারেন। যাইহোক পৃথিবী দৈত্যাভারে আক্রান্ত হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্গবাসী দেবতাগণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের লয়কর্তা শ্রীরুদ্রর সঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হয়ে পুরুষসূক্ত দ্বারা তাঁকে অভিষিক্ত করলেন।

ব্রহ্মা সমাধিযোগে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর আদেশ শ্রবণ করিলেন —হে ব্রহ্মাদি দেবগণ! পৃথিবীর ভার হরণের জন্য তোমরা আমার শরণাপন্ন হয়েছ, কিন্তু এবার পৃথিবীর জন্য আর কোনো চিন্তা করতে হবে না। আমি যাঁর আদেশে এই ব্রহ্মাণ্ড পালনে রত আছি, সেই আমার পরমাংশ স্বয়ং ভগবান গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণ, এবার পৃথিবীর প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেছেন। এবার তিনিই স্বয়ং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করবেন ও সেই মধুর লীলার সঙ্গে পৃথিবীর ভারও হরণ করবেন। তোমরাও শ্রীভগবৎ কৃপায় তাঁর লীলায় সাহায্য করার সুযোগ পাবে।

ভগবানের পার্ষদগণের আবির্ভাবের পূর্বকথন—ব্রহ্মা ও অপর দেবতাদের ক্ষীরোদশায়ী ভগবান বিষ্ণু বলছেন—

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥

(ভাগবত ১০।১।২৩)

অর্থাৎ হে ব্রহ্মা ! সর্বৈশ্বর্যশালী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবগৃহে স্বয়ং অবতীর্ণ হবেন। তোমরা দেবতারা শ্রীগোবিন্দর সেবার্থে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করো এবং শ্রীরাধিকা, শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি তাঁর প্রেয়সীবর্গের সেবা করার জন্য দেবরমণীগণও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

শ্রীভগবান অজ হয়েও যখন ভক্তের মধুর, বাৎসল্য প্রেমাদি রসাস্বাদন করার জন্য জন্মানুকরণ করেন, তখন তাঁর সেই অনুকরণে ভক্ত বা অভক্ত উভয়েই মোহিত হয়ে অনুকরণ বলে বুঝতে পারেন না। আবার ভগবান লীলার্থে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর অচিন্ত্য অনন্ত ঐশ্বর্য ও মাধুর্য তাঁর জন্মের অন্তরালে লুকায় না, তিনি নিজ সর্বৈশ্বর্য, মাধুর্য প্রকাশ করেই নরজগতে নরলীলা করে ব্রহ্মাণ্ড কৃতার্থ করেন।

ব্রহ্মা বললেন—হে দেবগণ ! কেবল তোমরাই নও, লীলায় দেবরমণী-গণেরও ভাগ্যের সীমা নাই। তাঁরাও এবার শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণের সেবার নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন।

গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকা।
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কদাচন॥

(পদ্মপুরাণ)

শ্রীবৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ কেউই সামান্য মানবী নন, তাঁরা দেবাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ, দেবকন্যাগণ ও নিত্যসিদ্ধা গোপীগণই এই লীলার পরিকর। বেদাদি শাস্ত্রগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ শ্রুতিপূর্বা গোপী, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ ঋষিপূর্বা গোপী, দেবকন্যাগণ দেবীপূর্বা গোপী এবং রাধিকা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা গোপী।

ব্রহ্মা বলছেন, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়ব্যূহ সংকর্ষণ সকল লীলাতেই তাঁর সঙ্গে থাকেন আর ভগবানের এই অবতারে তিনি অগ্রজ বলরামরূপে জন্মগ্রহণ

করবেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করেন শ্রীকৃষ্ণের সেবন॥
আপনি করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টি লীলা কার্য করে ধরি চার কায়॥

অনন্তসংহিতা গ্রন্থে আছে—

নিবাস শয্যাসন পাদুকাংশুকোপাধান বর্ষাত পবারণাদিতি।
শরীরভেদৈরবশেষতাং গতৈর্যথোচিতং শেষ ইতিরিতো জনৈঃ॥

অর্থাৎ শ্রীসংকর্ষণ নিবাসস্থান, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, পাদুকা, উপাধান, ছত্র আদি নানা মূর্তি ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের যথাযোগ্য সেবা করেন।

আবার শ্রীভগবানের মায়াশক্তি সম্বন্ধে বলছেন—

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥

(ভাগবত ১০।১।২৫)

যাঁর প্রভাবে অখিল জগৎ মোহিত, সেই সর্বব্যাপিনী ও শ্রীভগবানের সর্বশক্তিযুক্তা মায়াশক্তি এবার শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ও আদেশে, গর্ভ আকর্ষণ ও যশোদা মোহনাদি কার্য করার জন্য যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। এই মায়াশক্তি উন্মুখ মোহিনী ও বিমুখমোহিনী ভেদে দ্বিবিধ 'যোগমায়া' ও 'মহামায়া'।

যোগমায়া শ্রীভগবানের লীলা সহায়ক এবং সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণর লীলাকার্যে সহায়তা করে থাকেন। ভাগবতে রাসলীলা প্রসঙ্গেও আছে—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥

(ভাগবত ১০।৩৩।৩৮)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণীগণসহ রাসবিলাস রজনীযাপন করলেন, কিন্তু সেইজন্য বজ্রবাসিগণ তাঁদের ওপর বিন্দুমাত্র দোষারোপ করেননি। কেননা তাঁরা সকলেই যোগমায়ায় মুগ্ধ হয়ে নিজ নিজ পত্নীগণকে নিজ নিকটস্থ বলে

বুঝেছিলেন। এইভাবে ব্রজবাসিগণ—যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসেন তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ায় মুগ্ধ হন।

আবার মহামায়া সম্বন্ধে নারদ পঞ্চরাত্র বলছেন—

অস্যা আবরিকাশক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগতং সর্বং সর্বে দেহাভিমানিনঃ॥

(নারদ পঞ্চরাত্র)

প্রপঞ্চাধিকারিণী মহামায়া ইঁহারই আবরণী শক্তি, ইনিই শ্রীকৃষ্ণবহির্মুখ জীবগণকে দেহ-গেহাদির মমতা-পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন এবং সেইসব জীবগণকেই মোহিত করে সংসার ভোগ করান। তাঁর প্রাকৃত জগতেই অধিকার, লীলা জগতের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই।

যোগমায়াকে আরো বলা হয়েছে তিনি 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী'। যা কিছুতেই ঘটা সম্ভব নয় তাই করার জন্য যোগমায়ার প্রয়োজন। বহির্মুখ জীবগণকে মোহন করা বা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ভগবন্মুখ জীবগণকে মোহন করা অঘটন নয়। কিন্তু যোগমায়ার কার্য কৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে তাঁকে মোহন করা, তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়—প্রকট লীলা প্রকাশের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভেবে ছিলেন—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিও না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপ গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণ লীলার সৌষ্ঠব সম্পাদনার্থে শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার নিত্য প্রেয়সীগণকে নববধূরূপে প্রকাশ করেছেন।

দেবকীর প্রথম ছয়টি পুত্রনাশ হওয়ার পরে শ্রীভগবান যোগমায়াকে আদেশ করলেন—

গচ্ছ দেবী ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।

রোহিণী বসুদেবস্য ভার্যাঽস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥

(ভাগবত ১০।২।৭)

হে দেবী ! তুমি একবার গো গোপ শোভিত ব্রজে গমন করো। আমার অংশ ও দ্বিতীয় বিগ্রহ সংকর্ষণ এবার দেবকী গর্ভে আগমন করবেন। তুমি তাকে দেবকীগর্ভ থেকে আকর্ষণ করে, তার অন্য স্ত্রী রোহিণী যিনি নন্দালয়ে আছেন, তাঁর গর্ভে স্থাপন করো।

অতঃপর যোগমায়াকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন—

অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্বকামবরেশ্বরীম্।
ধূপোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্ ॥
নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥

(ভাগবত ১০।২।১০-১২)

জগতের সমস্ত জীব তোমার অর্চনা করবে ও তুমি পুত্র বিত্তাদি প্রদান করে তাদের মনোরথ পূর্ণ করবে। উপাসকদের ভাবভেদে, কামনা ভেদে ও তোমার বরদানাদি ভেদে তুমি দুর্গা, ভদ্রকালী, কুমুদা, চণ্ডিকা ইত্যাদি নামে জগতে প্রকাশ পাবে। আবার '**প্রভাব তে করিষ্যামি মৎপ্রভাব সমং ভুবি**' (হরিবংশ)। অর্থাৎ পৃথিবীতে আমার ন্যায় তোমারও প্রভাব বিস্তার হবে।

ভগবানের আবির্ভাব—শ্রীভগবানের আদেশে যোগমায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভে আকর্ষণ করে রোহিণীগর্ভে স্থাপন করলে, ভক্তবৎসল ভগবান আর কালবিলম্ব না করে দেবকীগর্ভে প্রবেশ করলেন। শ্রীভগবানের এই দেবকীগর্ভে প্রবেশ করায় যে কিছু বিশেষত্ব আছে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট সেই নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন।

জীব ও শ্রীভগবানের জন্ম মূঢ় দৃষ্টিতে একরকম বোধ হলেও শাস্ত্রানুসারে বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে এতে বিশেষ পার্থক্য আছে। জীব ও ভগবান

উভয়েই সচ্চিদানন্দ বস্তু, সুতরাং বস্তুগত ভেদ না থাকলেও স্বরূপগত মহান ভেদ আছে। জীব অল্প, ভগবান বিভু ; জীব মায়াধীন ভগবান মায়াধীশ ; জীব কর্মবাধ্য, শ্রী ভগবান কর্মনিয়ন্তা ; জীব দাস, শ্রীভগবান প্রভু ; জীব অংশ, শ্রীভগবান অংশী ; জীব বহু, শ্রীভগবান এক ইত্যাদি।

আবার জীব ও ভগবান উভয়েই জন্মগ্রহণ করেন বটে তবে জীবের জন্ম হয় কর্মফলে এবং ভগবানের জন্ম স্বেচ্ছায়। ভগবান গীতায় বলছেন —**'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া'** (গীতা ৪।৬) অর্থাৎ আমি জন্মরহিত হয়েও নিজ স্বভাব (ভক্তবাৎসল্য)বশতঃ আমার মায়াকে অধীনস্থ করে স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করি।

জীবের জন্ম হয় পিতা-মাতার শুক্র-শোনিত সংযোগে কিন্তু শ্রীভগবানের দেহ এইরূপ নয়, তা সচ্চিদানন্দময় নিত্যবস্তু। **'সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ'** (বরাহপুরাণ) । পরমাত্মা শ্রীভগবানের সমস্ত শ্রীমূর্তিই অনাদি, অনন্ত এবং নিত্য। শ্রীভগবানের মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহাদি নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্তি কারো সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেই আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ মূর্তি পিতামাতার সম্বন্ধ করেই আবির্ভূত হন। এখানে শ্রীশুকদেব ভগবানকে বলেছেন, 'ভগবান বিশ্বাত্মা' আর 'ভক্তানামভয়ঙ্করঃ' অর্থাৎ ভগবান 'সর্বভূতের আত্মা' হলেও 'ভক্তদের ভয়হারী'। অর্থাৎ বসুদেব-দেবকী ও যশোদার বাৎসল্য প্রেমের আকর্ষণে জীবের ন্যায় জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু জীব জন্মগ্রহণ করে কীভাবে ? জীব জন্মগ্রহণের পূর্বে পিতার অন্নে প্রবেশ করে, পিতার অন্ন পরিপাককালে শুক্রে আশ্রয় নেয় এবং অবশেষে মাতৃগর্ভকোষে বড় হয়ে শেষে জীবদেহে ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু ভগবানের আবির্ভাব অন্যভাবে। তিনি এসেছেন—**'আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ'** (ভাগবত ১০।২।১৬)। তিনি প্রথমে বাসুদেবের মনে প্রবেশ করলেন। এইরূপে বাসুদেবের হৃদয়ে শ্রীভগবন্মূর্তির আবির্ভাব হলে তাঁর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্রীভগবত্তেজে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তিনি সূর্যতুল্য তেজশালী হয়ে উঠলেন। কেননা **'যস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি'** অর্থাৎ যাঁর তেজে সর্ব জগৎ ভাস্বর সেই

শ্রীভগবান তাঁর হৃদয়ে তখন সদা জাগরূক। অতঃপর বসুদেবের হৃদয়স্থ বস্তু ক্রমে দেবকীর হৃদয়ও অধিকার করল। শ্রীশুকদেব তাই বলছেন—

'ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।' (ভাগবত ১০।২।১৮) অর্থাৎ তদনন্তর পূর্বদিক যেমন পূর্ণচন্দ্রকে ধারণ করে সুশোভিত হয়, সেইরূপ দেবকীও জগদানন্দকর অচ্যুতকে হৃদয়ে ধারণ করে চতুর্দিক আলোকিত করে পরিশোভিত হলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হলে তখন—

ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রেত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ।
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্॥

(ভাগবত ১০।২।২৫)

শ্রীভগবান দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হলে ব্রহ্মা, শিবাদি দেবগণ কংস-কারাগারে এসে শ্রীগোবিন্দের স্তব করতে লাগলেন। যদিও ব্রহ্মা চতুর্মুখে ও শিব পঞ্চমুখে ও নারদ বীণার তানে সর্বদাই শ্রীগোবিন্দর গুণগান করেন কিন্তু আজ তাঁরা গোবিন্দর নিকটস্থ হয়ে বিশেষরূপে তাঁর গুণগান করবেন বলেই কংস কারাগারে এসেছেন।

ভগবানের আবির্ভাব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক ভগবদ্ স্তুতি
(দশম স্কন্ধ—দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক ২৬-৪১)

দেবতাগণ কর্তৃক শ্রীভগবানের স্তুতি ১৬টি শ্লোকে সাতটি প্রকরণে এইভাবে স্তুত হয়েছে—

ভগবৎ স্বরূপের বর্ণনা	২৬
ভগবৎ-স্বরূপ সংসার বৃক্ষের বর্ণনা	২৭-২৮
শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রিতর অনায়াস সংসারমুক্তি	২৯-৩১
ভক্তিহীন জ্ঞানমার্গীদের পতনের সম্ভাবনা	৩২-৩৩

ভগবৎ স্বরূপের বর্ণনা (শ্লোক ২৬)

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ ২৬

সরলার্থ—'হে প্রভু! আপনি সত্যসংকল্প; সত্যই আপনাকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ সাধন। সৃষ্টির পূর্বাবস্থা, প্রলয়ের পরবর্তী সময় এবং সংসারের স্থিতিকাল—এই ত্রিবিধ অসত্য অবস্থার মধ্যেও আপনি সত্যরূপেই বিরাজমান। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম—এই পাঁচ দৃশ্যমান সত্যের কারণ তথা এগুলির মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিতও আপনি। আপনি এই দৃশ্যমান জগতের পরমার্থস্বরূপ। মধুর সত্য বাক্য এবং সর্বত্র সমদর্শনের প্রবর্তকও আপনি। ভগবন্! আপনিই সত্যস্বরূপ, আমরা আপনার শরণ নিলাম॥ ২৬

মূলভাব—ব্রহ্মাদি দেবগণ ভাবলেন যে, শ্রীভগবানের রূপ বর্ণনা করা কারো সাধ্যায়ত্ত নয়। তবে তাঁর কৃপায় তাঁর অনন্ত গুণের যতটুকু যাঁর বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় তিনি ততটুকুই বর্ণনা করেন এবং ভগবান স্তবরূপে তাই গ্রহণ করেন। তাঁরা আরো ভাবলেন যদি তাঁরা শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তবে শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁরাও শ্রীভগবানের স্বরূপ কীর্তন করার শক্তি লাভ করবেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাই স্তবের প্রারম্ভে আত্মসমর্পণ করে বলছেন **হে গোবিন্দ! 'ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।'** অর্থাৎ আমরা আপনার চরণে শরণাপন্ন হলাম। স্তুতির প্রথম শ্লোকে ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানের অনন্ত স্বরূপ শক্তির আটটি বিশেষণের কীর্তন করতে সমর্থ হয়েছেন।

সত্যব্রতঃ—ক্ষীরোদসাগর তীরে দৈববাণী শ্রবণে ব্রহ্মা জানতে পেরেছিলেন যে, 'স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে আগমনের সংকল্প

করেছেন। এখন ব্রহ্মা আবার জানতে পেরেছেন যে শ্রীভগবান স্বয়ং পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং দেবকীগর্ভে জন্ম নিয়েছেন।' শ্রীভগবানের এই সত্যসংকল্পতা শক্তি অনুভূত হওয়ায় ব্রহ্মা প্রথমেই তাঁকে 'সত্যব্রত' (অর্থাৎ যাঁহার ব্রত বা সংকল্প সত্য) বলে তাঁহার স্বরূপ কীর্তন শুরু করলেন।

রামায়ণে দেখা যায় যে, শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে বলেছেন—**'সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সবভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম'** (বাল্মিকী রামায়ণ ৬।১৮।৩৩)। কোনও ব্যক্তি যদি আমার শরণাপন্ন হয়ে একবার মাত্র 'আমি তোমার হলাম' বলে প্রার্থনা করে, তাহলে আমি চিরকালের মতো তাকে অভয় প্রদান করে থাকি, এই আমার ব্রত।

আবার চৈতন্যচরিতামৃত বলছেন—**'কৃষ্ণ তোমার হই যদি বলে এক বার। ভববন্ধ হতে কৃষ্ণ তারে করে পার'**। এইভাবে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁর মহদ্‌গুণের ইঙ্গিত করছেন।

সত্যপরং—সত্যব্রতরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ কীর্তন করতেই শ্রীভগবানের কৃপায় ব্রহ্মাদি দেবগণের বুদ্ধিতে স্ফূর্তি হল যে, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণই সত্যব্রত শ্রীভগবানকে লাভ করতে পারেন। কেবলমাত্র সত্য আশ্রয় করলেই তাঁর চরণাশ্রয় পাওয়া যায়, তাই তার নাম সত্যপর। পৃথিবী বলেন, আমি 'সর্বংসহা' অর্থাৎ সমস্ত দুঃখই সহ্য করতে পারি, কিন্তু সত্যহীন ব্যক্তির ভার সহ্য করতে পারি না। এইরূপ সত্যনিষ্ঠার জন্যই পৃথিবী সত্যব্রত তাই শ্রীগোবিন্দর চরণপ্রাপ্তির অধিকার পেয়েছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাই ভাবছেন পৃথিবীর এই সত্যনিষ্ঠার সৌভাগ্যবলেই তাঁরাও শ্রীগোবিন্দ লীলার দর্শনে কৃতার্থ হয়েছেন।

ত্রিসত্যং—আকাশ কুসুমাদি বস্তু অসত্য কিন্তু জাগতিক বস্তু সকল সত্য সাধারণত এই হল লোকব্যবহার। শ্রীভগবানের অপার করুণায় প্রকৃত সত্যবস্তুর অনুসন্ধান পেয়ে ব্রহ্মা দেবকীগর্ভগত শ্রীগোবিন্দকে বলছেন —'ত্রিসত্যং'। যে পূর্বে ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকবে, তাই ত্রিসত্য। তাই জাগতিক বস্তু নয়, শ্রীভগবানই ত্রিসত্য।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

(ভাগবত ২।৯।৩২)

শ্রীগোবিন্দ নিজ নাভিকমলে স্থিত ব্রহ্মাকে বলেছেন—অগ্রে আমি ছিলাম আর কোনো বস্তুই ছিল না, বিশ্বসৃষ্টির সময়ও ছিলাম, আবার সৃষ্টির অবসানেও আমি থাকব। একমাত্র তিনিই ত্রিসত্য, এটা তাঁর বাক্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

সত্ত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে সত্যস্য সত্য—ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীভগবানকে বলছেন '**সত্ত্যস্য যোনিং**'। এখানে সত্ত্য অর্থাৎ ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত আর ভগবান হচ্ছেন তার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান। তারপরে দেবতারা বলছেন, '**নিহিতঞ্চ সত্যে**' অর্থাৎ তিনি পঞ্চভূতের অন্তর্যামীরূপেও অবস্থিত। উপনিষদ্ বলছেন, '**তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ**' (তৈত্তিরীয় ২।৬)। শ্রীভগবান জগৎ সৃষ্টি করে অন্তর্যামীরূপে তাতে প্রবেশ করলেন, তদনন্তর সূক্ষ্ম শরীর স্থূলরূপে পরিণত হল।

আবার '**সত্যস্য সত্য**' পদে এই বলা হয়েছে যে, হে প্রভু! মৃত্তিকা যেমন মৃত্তিকাজাত ঘটপটাদির পরমাত্মতত্ত্ব ও ঘটপটাদি বিনষ্ট হলে মৃত্তিকাতেই পরিণত হয়, সেইরকম এই পঞ্চভূতাত্মক জগৎও মহাপ্রলয়ে তোমাতেই পর্যবসিত হয়। ব্রহ্মসূত্রও তাই বলেছেন, '**তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত**' অর্থাৎ তাঁহা হতেই জগতের জন্ম, তিনিই জগতের পালক এবং মহাপ্রলয়ে জগৎ তাঁতেই লীন হয়ে যায়, এই তত্ত্ব জেনে, সর্ববিধ কামনা-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক তাঁর উপাসনা করবে।

ঋত সত্য নেত্রং—শ্রীভগবান ঋত ও সত্যর প্রবর্তক। শ্রীধরস্বামিপাদ এই পদটির ব্যাখ্যা করেছেন—'**ঋতঞ্চ সুনৃতা বাণী সত্যঞ্চ সমদর্শনম্**' অর্থাৎ হে প্রভু! তুমিই প্রিয় বাক্য ও সমদর্শনের প্রবর্তক ও প্রকাশক।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ বলছেন—'**ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি**'

অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে কর্তব্যরূপে নিশ্চিত বিষয়ের নাম ঋত এবং কায় বাক্য দ্বারা তা সম্পাদনই সত্য।

জগৎকে পৃথক বলে না বুঝে যাঁরা তা জগন্নাথের লীলাভূমি বলে মনে করেন, সেই জ্ঞানই অব্যভিচারী বা যথার্থ জ্ঞান এবং ইহাই সমদর্শন। এই প্রকার দৃষ্টি হলে—**'স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি। সর্বত্রই হয় তার নিজ ইষ্টস্ফূর্তি'** (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপে সমস্ত বস্তুকে পৃথক পৃথক না বুঝে সকলের মধ্যে কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্তাই অনুভব করেন। ঋত ও সত্য এই দুটি শ্রীভগবানেরই অধীন, অর্থাৎ তাঁর কৃপা ব্যতীত কেউই তা সাধন করতে পারে না। তাই ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীগোবিন্দকে ঋত ও সত্যের নেত্র অর্থাৎ প্রবর্তক বলেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীভগবানকে 'সত্যব্রত', 'সত্যপর' প্রভৃতি নানা শব্দে নানাভাবে তাঁর সত্য-স্বরূপতা ঘোষণা করে পরিশেষে মনে মনে চিন্তা করলেন যে, শ্রীভগবানের গুণ, মাহাত্ম্য, লীলা, নাম, রূপ প্রভৃতি সমস্তই অনন্ত এবং সমস্তই সত্য, আমরা তার কত বর্ণনা করব। সেইজন্য দেবগণ শ্রীভগবানকে পরিশেষে বলছেন—**'সর্বাত্মকম্'**। অর্থাৎ সত্যস্বরূপ হে ভগবন্! সবই তো তুমি, তাই আমরা তোমার শরণাপন্ন হলাম। উপনিষদও তাই বলছেন—**'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো'** (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩) অর্থাৎ তিনি নিত্যর নিত্য এবং চেতনের চেতন। তাৎপর্য হল শ্রীভগবান সমস্ত সত্য বস্তুর মধ্যেও পরম সত্য। একমাত্র ভগবানই সত্য, তিনি ভিন্ন অন্য সমস্ত বস্তুই মিথ্যা। কিন্তু বহির্মুখ জীবের বুদ্ধিতে শ্রীভগবানের হয়ে এই সত্যতা স্ফূর্তি না হয়ে বস্তুর সত্যতাই স্ফূর্ত হয়। সেইজন্য তারা স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বিষয়, বৈভব ও দেহ-গেহাদিতে আবদ্ধ হয়ে শ্রীগোবিন্দচরণ ভুলে গিয়ে সংসারে আসক্ত হয়। ব্রহ্মাদি দেবগণের এই স্তুতিতে প্রকৃত সত্যসাধনে রত হলে ক্রমে ক্রমে তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে সন্দেহ নেই।

ভগবৎ-স্বরূপ সংসার বৃক্ষের বর্ণনা (শ্লোক ২৭-২৮)

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূল-
শ্চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো
দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ॥ ২৭
ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতি-
স্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং
পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে॥ ২৮

সরলার্থ—এই যে সংসার—এটি এক সনাতন বৃক্ষ। প্রকৃতিই এর এক আশ্রয়। এই বৃক্ষের দুটি ফল—সুখ এবং দুঃখ। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনগুণ এর তিনটি মূল। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ এর চার রসস্বরূপ। একে জানবার পাঁচটি প্রকার—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। এর ছয়টি স্বভাব—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয় এবং বিনাশ। রস, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র—এই সপ্ত ধাতু এই বৃক্ষের ত্বক বা বল্কল। পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার এর আটটি শাখা। মুখ প্রভৃতি নবদ্বার বা নয় ইন্দ্রিয়বিবর এর নয়টি কোটরস্বরূপ। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয়— এই দশ বায়ু এর দশটি পত্র। এই সংসাররূপ বৃক্ষে দুটি পক্ষীর নিবাস—জীব এবং ঈশ্বর॥ ২৭ একমাত্র আপনিই এই সংসারবৃক্ষের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের হেতু। আপনার জগন্মোহিনী মায়ায় যার বুদ্ধি আবৃত হয়নি, সেই বুঝতে পারে—এক আপনিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তারূপে ব্রহ্মা, শিব আদি নানা মূর্তিতে বিরাজিত॥ ২৮

মূলভাব—ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবৎ-কৃপায় অষ্ট বিভূতিরূপী স্বরূপ বর্ণনা করে এখন তাঁর আর এক রূপ—জগৎরূপী সংসার বৃক্ষর স্তুতি করছেন।

একায়নঃ—শ্রীভগবানের অপার কৃপায় ব্রহ্মাদি দেবগণ বুঝতে পেরেছেন যে, দেবকী-গর্ভগত শ্রীভগবানই এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের

মূল। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডর আশ্রয়স্থল হল একটিই আর তা হল তাঁরই আশ্রয়। জগৎ সংসারের প্রকৃতিরূপে বর্ণনা অন্যান্য শাস্ত্রেও আছে —**'উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥'** (গীতা ১৫।১)। অর্থাৎ এই সংসার বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বদিকে ও শাখা অধোভাগে, বেদসমূহ এর পত্র ও ইহাকে যে জানে সেই তত্ত্বজ্ঞ। **'উর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ' সনাতনঃ** (কঠোপনিষদ্ ২।৩।১) অর্থাৎ এই অশ্বত্থবৃক্ষের ঊর্ধ্বভাগে মূল ও অধোভাগে শাখা। **'অহং বৃক্ষস্য রেরিবা'** (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ১।১০।১) অর্থাৎ আমি অন্তর্যামীরূপে সংসার বৃক্ষের নিয়ন্তা।

গীতা, উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত অশ্বত্থবৃক্ষের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব একই। এই সংসারকে আদি বৃক্ষ বলা হয়েছে। আদি বলা হয় এই জন্য যে যেমন খরস্রোতা নদীর গর্ভস্থ জলরাশি সর্বদাই তরতর বেগে প্রবাহিত হলেও কদাপি নদীগর্ভ শূন্য হয় না, সেইরকম সংসারও কালপ্রবাহে সর্বদা চঞ্চলগতি হলেও তা কদাপি শূন্য হয় না ; সুতরাং সংসার অনিত্য হলেও নদীগর্ভস্থ চঞ্চলগতি জলরাশির মতো সর্বদাই অবস্থিত। এইজন্যই গীতায় সংসার বৃক্ষকে 'অব্যয়', কঠোপনিষদে 'সনাতন' এবং শ্রীমদ্ভাগবতে 'আদি' বলা হয়েছে।

আবার সংসারকে বলা হয়েছে কারণ শ্রীগোবিন্দ ভজন দ্বারা উহাকে ছেদন করা যায়। আদি বৃক্ষ কী ? প্রতি জীবের পৃথক পৃথক দেহের নাম **ব্যাষ্টি দেহ** এবং চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড **সমষ্টি দেহ** বা **বিরাড্ দেহ**। ব্যষ্টিদেহ সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ নেই কারণ ইহা প্রত্যেকের অনুভূত। কিন্তু সমষ্টি দেহ অনুভূত না হলেও তা শাস্ত্রানুসারে স্বীকার্য। পাতাল হচ্ছে এই বিরাট্ পুরুষের পাদযুগল, রসাতল চরণের অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ, মহাতল গুল্ফদ্বয়, তলাতল দুই জঙ্ঘা, অতল ও বিতল দুই ঊরু, মহীতল জঘন, মহীতল নাভিদেশ, স্বর্গ বক্ষস্থল, মহালোক গ্রীবা, জনলোক বদন, তপলোক ললাট ও সত্যলোক শীরোদেশ।

জগৎ কারণ প্রকৃতি বা মায়া হল শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ শক্তি। মহাপ্রলয়ে

শ্রীভগবান তাঁহার অন্তরঙ্গ শক্তি বা চিৎশক্তির সাহায্যে নিত্যলীলা আস্বাদন করেন ও মায়াশক্তি তখন তাঁর সংকর্ষণরূপী স্বরূপে লীন থাকেন। শ্রীভগবানের আবার জগৎ সৃষ্টি করতে ইচ্ছে হলে মায়াশক্তি তাঁর হতে পৃথক হয় এবং এই মায়াশক্তির থেকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণের বিকাশ হয় এবং তা ক্রমে ক্রমে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব প্রকৃতিতে পরিণত হয়।

জগৎ সংসার বর্ণনা করে দেবতারা স্তুতি করে বলছেন—'**দ্বিফল-স্ত্রিমূলশ্চতুরসঃ**' অর্থাৎ এই অশ্বত্থ বৃক্ষের দুইটি ফল, তিনটি মূল ও চারটি রস আছে। এই ফল দুটি হল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অথবা সুখ ও দুঃখ এবং তিনটি মূল হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় এবং চারটি রস হল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ আদি চার পুরুষার্থ। সংসারবৃক্ষ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি মূল দ্বারা নিজ আশ্রয়ভূমি অথবা মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধ দৃঢ়বদ্ধ করে। এই তিনটি মূল শিথিল হলে এই সংসারবৃক্ষও ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। আসলে অনাসক্তিরূপ অস্ত্র দ্বারা সংসারবৃক্ষ ছেদন করাই হল সকল সাধনার লক্ষ্য। যতদিন পর্যন্ত সংসারবৃক্ষর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি মূল ছিন্ন না হয়, ততদিন পর্যন্ত সংসারবৃক্ষ এই গুণরূপী তিনটি মূলের যথা—সত্ত্বমূলের **প্রকাশ**, রজমূলের **প্রবৃত্তি** ও তমোমূলের **মোহরস** আকর্ষণ করে তার দ্বারা পরিপুষ্ট হতেই থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোঃগুণরূপী সংসার বৃক্ষের মূলচ্ছেদনই হল সর্ব সাধনার লক্ষ্য।

ব্রহ্মাদি দেবগণ সংসার বৃক্ষকে বলেছেন, 'পঞ্চবিধঃ' অর্থাৎ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। এগুলি হল নাক, চোখ, কান, জিহ্বা ও ত্বক। শেষে বলছেন, সংসার বৃক্ষের স্বভাব ছয়টি যথা শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা এবং পিপাসা। ইহার ত্বক বা ছাল সাতটি যথা রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জা। সংসার বৃক্ষের শাখা হল আটটি, যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম আদি পঞ্চভূত (যার দ্বারা স্থূলশরীর সৃষ্ট হয়) এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার (যার দ্বারা সূক্ষ্মশরীর সৃষ্ট হয়)। শরীরের নয়টি দ্বার যথা—দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসিকা, মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই হল বৃক্ষের কোটর। আর শরীরের পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ উপপ্রাণ যথা প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান এবং নাগ, কুর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় হল সংসার বৃক্ষের পত্র। পত্রই

(প্রাণ) যে বৃক্ষকে (দেহকে) রক্ষা করে এতে কোনো সন্দেহ-ই নেই।

ব্রহ্মাদি দেবগণ ব্যষ্টি-সমষ্টি দেহাত্মক সংসার-বৃক্ষ বর্ণনা করে অবশেষে বলছেন, 'দ্বিখগ' অর্থাৎ এই সংসার-বৃক্ষে 'জীব ও ঈশ্বররূপী দুটি পক্ষী বাস করে'। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বাক্যেও শ্রুতি বলছেন—'**দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে**' (৪।৬) অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই দুই পক্ষী পরস্পর সখ্যভাবে মিলিত হয়ে একই দেহবৃক্ষে বাস করে থাকে। শাখা, পত্র প্রভৃতি বৃক্ষের অঙ্গ তাই তাদের সঙ্গে বৃক্ষের নিত্য সম্বন্ধ। কিন্তু পক্ষীর সঙ্গে বৃক্ষের এরকম কোনো সম্বন্ধ নেই। পক্ষী বৃক্ষে বাস করে মাত্র, ইচ্ছে হলে তারা বৃক্ষ ত্যাগ করে চলে যেতে পারে, তাতে বৃক্ষের কোনো ক্ষতি হয় না আবার বৃক্ষের অপচয়েও পক্ষীদের কোনো ক্ষতি হয় না।

জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে দেহের এইরূপই সম্বন্ধ। অর্থাৎ আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেলে বা দেহের অপচয়ে-উপচয়ে জীবাত্মা বা পরমাত্মার কোনো ক্ষতি হয় না। আবার উপনিষদে বলছে—'**তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি**' (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৪।৬) অর্থাৎ দেহ-বৃক্ষস্থিত জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই পক্ষীদ্বয়ের মধ্যে জীবাত্মা-পক্ষী দেহ-বৃক্ষের সুখ ও দুঃখ—এই দুই ফল খায় এবং দেহ-বৃক্ষে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, সুখ-দুঃখের মোহে পড়ে এ বৃক্ষ ছেড়ে যেতে চায় না। কিন্তু পরমাত্মা-পক্ষী দেহ-বৃক্ষে থাকেন বটে কিন্তু তিনি এই দেহ-বৃক্ষের ফলাস্বাদন করেন না, তিনি কেবলমাত্র জীবাত্মার ফলাস্বাদন কার্য দর্শন করেন।

পরমাত্মার এই ব্যবহারে মনে হয় যে তিনি জীবাত্মার স্বভাবতঃ হিতকারী, অতএব সখা। জীব-পক্ষী দেহ-বৃক্ষের আশ্রয়ে এলে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে আসেন এবং নানাভাবে ইঙ্গিত করে জীবাত্মাকে দেহ-বৃক্ষের ফল আস্বাদন করতে নিষেধ করেন। কিন্তু জীব তাঁর বারণ না শুনে দেহ-বৃক্ষের ফল আস্বাদন করে ও তার মোহে পড়ে যায়। পরমাত্মা পক্ষী জীবাত্মাকে বড়ই ভালোবাসেন বলে তাকে ছেড়ে চলে যান না, বসে জীবাত্মার কীর্তিকলাপ লক্ষ করেন এবং কেমন করে তাকে দেহ-বৃক্ষ ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন এবং নিজ চরণ-কল্পবৃক্ষে স্থান দেবেন সেই প্রচেষ্টাই করেন।

এইভাবে সংসার-বৃক্ষরূপ শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনা করে ব্রহ্মাদি দেবগণ বলছেন— এই পরিদৃশ্যমান সংসারবৃক্ষ আপনার হতেই উৎপন্ন হয়েছে, আপনার কৃপাতেই পালিত হচ্ছে আর প্রলয়ে আপনাতেই লীন হয়। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আদি নানা মূর্তিতে যে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, ধর্মসংস্থাপন এবং ভূভারহরণ প্রভৃতি নানা লীলা করে থাকেন তা নানা পুরাণাদি শাস্ত্র আলোচনা করলে জানা যায়। ব্রহ্মাদি দেবগণ স্তুতিতে বলছেন—'**ত্বং এক এব অস্য প্রসূতিঃ**' (ভাগবত ১০।২।২৮) অর্থাৎ আপনিই এই পরিদৃশ্যমান সংসারবৃক্ষের মূল কারণ। শ্রীভগবানের একত্ব, জড়বিজ্ঞান শাস্ত্রের একত্বের ন্যায় সীমাবদ্ধ একত্ব নয়, তাঁর একত্ব বহুত্বর অধিকারী। সেইজন্য শ্রুতি বলছেন—'**একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ**'। কিন্তু এই প্রতিবিম্বের বহুত্বের দ্বারা শ্রীভগবানের বহুত্বের সঠিক ধারণা হয় না, শ্রীভগবানই ভগবানের দৃষ্টান্ত। শ্রুতি, আপাততঃ কিছু ধারণা হবে বলে দৃষ্টান্ত দিয়ে কিছু প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। শ্রীভগবানের আবার বিশ্বরচনা করতে গেলে উপাদান সংগ্রহ করতে হয় না। তিনিই স্বয়ং উপাদান, তিনি স্বয়ং নির্মাতা। '**তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়**' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬।২।৩) অর্থাৎ শ্রীভগবান জগৎরূপে বহু হতে ইচ্ছে করে নিজের বহিরঙ্গ শক্তিতে ঈক্ষণ করলেন।

'**অবিচিন্ত শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান। স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥**'

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীভগবান কারও অপেক্ষা না রেখে স্বয়ংই বিশ্বসৃষ্টি করেন। শ্রীভগবান স্বীয়শক্তির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টির ক্রম সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে বলছেন—

বিষ্ণুশক্তিং পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা ধর্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরুচ্যতে॥

অর্থাৎ সর্বব্যাপক ভগবানের ত্রিবিধ শক্তি—পরাশক্তি, অপরাশক্তি ও মায়াশক্তি। পরাশক্তিকে বলে অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, অপরাশক্তিকে বলে জীবশক্তি ও মায়াশক্তি হল বহিরঙ্গ শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই হল শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। তাই শ্রীভগবানের মায়াশক্তি ভগবান হতে ভিন্ন নয়। এই

মায়াশক্তি হতেই অনন্তব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ। শ্রীভগবানের জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা হলে তাঁরই মায়াশক্তির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ প্রকাশ হয় এবং এই গুণেরই তারতম্যবশত এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি হয়। শ্রীভগবান সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, ভূভার হরণ, ধর্মসংস্থাপন, ভক্তানুগ্রহ আদি লীলার জন্য নানা মূর্তিতে বিরাজিত হন। শ্রীভগবানের বহুমূর্তি স্বীকারে দোষ নেই কিন্তু তাঁর একত্ব লোপ করাই দোষাবহ। আবার শ্রীভগবানের বহু রূপ অস্বীকার করে কেবল একত্ব স্বীকারেও মহাপরাধ হয় এবং পূর্ণভাবে শ্রীভগবত্ত্ব আস্বাদন করা যায় না।

শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রিতের অনায়াস সংসারমুক্তি (শ্লোক ২৯—৩১)

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা
ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি
সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্॥ ২৯
ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাঽঽবেশিতচেতসৈকে ।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন
কুর্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্॥ ৩০
স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎ পদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥ ৩১

সরলার্থ—আপনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। চরাচর জগতের কল্যাণের জন্যই আপনি বার বার বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন। আপনার সেই সব রূপ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বময় এবং সাধুপুরুষদের সুখাবহ হলেও অধার্মিক দুরাত্মাদের পক্ষে অকল্যাণকর, তাদের পাপের দণ্ডদাতা॥ ২৯ ॥ হে

কমলনয়ন ! হে করুণাঘনদৃষ্টি ! সর্বভূতের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ আপনাতে সমাধিযোগে চিত্ত নিবিষ্ট করে তার সাহায্যে আপনার চরণতরী আশ্রয় করে অতি স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিই ভবসমুদ্রকে গোবৎস-খুরবর্তস্বরূপ বিবেচনা করে অনায়াসে পার হয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে অনাদিকাল থেকেই মহাত্মাগণ তো ভবসমুদ্র উত্তরণের এই উপায়ই অবলম্বন করে এসেছেন, এছাড়া তো দ্বিতীয় কোনো পথ নেই॥ ৩০ ॥ হে পরমপ্রকাশ-স্বরূপ পরমাত্মন্! আপনার ভক্ত-বৃন্দ তো নিখিল জগতের অকপট পরম বান্ধব, যথার্থ হিতৈষী ; এইজন্যই তাঁরা স্বয়ং এই ভয়ংকর দুস্তর সংসার-সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হলেও অন্যদের কথা বিস্মৃত হন না, তাদের কল্যাণের জন্য (শিষ্য পরম্পরাক্রমে সাধন-সম্প্রদায়রূপে) আপনার চরণ-কমল-তরী ইহলোকে স্থাপিত করে যান। বস্তুত এই নিষ্কারণ করুণাপ্রবাহের মূল আপনিই, সজ্জনগণের প্রতি আপনার অসীম কৃপা, তাদের পক্ষে আপনি মূর্তিমান করুণাবিগ্রহ॥ ৩১

মূলভাব—ব্রহ্মাদি দেবগণ কংসকারাগারে এসে ভগবানের স্তবে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ ও সর্বতোভাবে সত্যস্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রকরণে দেবগণ বলছেন, ভগবান তুমি কেবল সত্যস্বরূপ ও অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণই নও, তুমি যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করে ভক্তদের উদ্ধারও করে থাকো।

অবতার মূর্তি নিত্য—স্তুতিচ্ছলে ভগবানের অবতার গ্রহণকে বলা হয়েছে 'বিভর্ষি' অর্থাৎ তিনি অবতাররূপ ধারণ করেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত শ্রীমূর্তিই নিত্য ও শাশ্বতঃ—**'সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরমাত্মনা'** (বরাহপুরাণ)।

শ্রীশ্রীচণ্ডীও বলছেন —**'দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥'**(শ্রীচণ্ডী ১।৬৫)। শ্রীভগবান দেবগণের কার্যসিদ্ধি (অসুর মারণাদি) করবার জন্য যখন তাঁর নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্তি প্রকাশ করেন, তখন তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ মনে করেন তিনি উৎপন্ন হলেন (জন্মগ্রহণ করলেন)। শাস্ত্র সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই উভয়রূপেই শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। শ্রীভগবানের এই উভয় রূপই সত্য। **'যা যা শ্রুতিজল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষম্'** (হরশীর্ষপঞ্চরাত্রং)

অর্থাৎ যে যে শ্রুতি শ্রীভগবানকে নির্বিশেষ বলে কীর্তন করেছেন, সেই সেই শ্রুতিই আবার শ্রীভগবানকে সবিশেষ অর্থাৎ রূপগুণাদিযুক্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলে ঘোষণা করেছেন।

অবতার মূর্তি সচ্চিদানন্দময়— তবে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তি যে জীবদেহের ন্যায় প্রাকৃত নয়— এই তত্ত্বটি ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁকে **'সত্ত্বোপপন্নানি'** বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর অবতাররূপে শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়, বিজ্ঞানঘন ও আনন্দময়। আবার ভক্তপ্রসঙ্গে বলছেন—**'সতাং সুখাবহানি'** ও **'খলানাম সতামভদ্রানি'** অর্থাৎ তাঁর নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্তি তাঁর চরণাশ্রিত ভক্তগণের আনন্দ-বর্ধন করেন এবং ধর্মমর্যাদালঙ্ঘনকারী খলগণকে বিনাশ করে থাকেন।

গীতাতেও শ্রীভগবান বলেছেন —**'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।'** (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৪।৮)

শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত মায়া সমুদ্রের পরপারে বৈকুণ্ঠাদি ধামে সর্বদাই লীলাময়রূপে বিরাজিত থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডের কোনো জীবের— এমনকি ব্রহ্মাদিদেরও সে ধামে গমনের অধিকার নেই। জগতের ভক্তগণ যখন লীলাময় শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হয়ে তাঁরই নাম-রূপ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্তনে রত হন, তখনই তিনি তাদের অভয়দানের জন্য ছুটে আসেন এবং এবারও সেইজন্য তিনি দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন।

লীলাধ্যানই প্রেমভক্তি প্রদায়িনী —শ্রীভগবান যখন কৃপাপূর্বক তাঁর নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্তি জগতে প্রকাশ করেন, জগতে লীলা করেন তখন তাঁর সাক্ষাৎ দর্শনে জগতের জীবগণ কৃতার্থ হন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সৌভাগ্য তো চিরস্থায়ী হয় না। শ্রীভগবান বহুকাল পরে অল্পদিনের জন্য একবার মাত্র তাঁর পদকমল মরজগতে অর্পণ করেন। **'ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করে প্রকট বিহার।।'** (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। যে সমস্ত ভাগ্যবান জীব সেই সময় জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শনাদি করেই কেবল কৃতার্থ হন না সে সময়ের শ্রীকৃষ্ণ হস্তে হত অসুরগণ পর্যন্ত মোক্ষলাভ করেন। শ্রীভগবানের এই প্রকটলীলার কথা আলোচনা করলে মনে হয় হায় ! হায় !

আমাদের তো তখন জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়নি, এখন আমাদের কী গতি হবে ?

'তখন না হইল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম, বৃথা মাত্র বহি দেহভার'

(নরোত্তম দাস)

কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীভগবানের প্রকট লীলাকালে না জন্মানো হতাশ জীবগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলছেন — আপনার প্রকট লীলার সময় আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করে সে সময়ের ভাগ্যবান জীবগণ কৃতার্থ হন এবং অন্য সময়ে আপনারই শ্রীমূর্তির লীলা ধ্যান করে জগতের জীবগণ এই ভবসিন্ধু অতিক্রম করেন। এই শ্লোকে ব্রহ্মাদি দেবগণ বলেছেন শ্রীভগবান কেবলমাত্র অসুরমারণ ভূভারহরণাদি কার্যের জন্যই অবতীর্ণ হন না, নিজ ভক্তগণকে মোক্ষ প্রদান ও প্রেম বিতরণও তাঁর অবতারের কারণ।

শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—**'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'** (গীতা ১৮।৫৪)। শ্রীভগবানের অপার করুণায় সাধক যখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন তখন তিনি শোকাদির অতীত হয়ে সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ করেন। এটিই মোক্ষাবস্থা। শ্রীভগবান সাধকগণকে সাধারণত মোক্ষাবস্থাই প্রদান করেন কিন্তু যাঁদের তাঁর চরণ সেবনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থাকে তাঁরাই প্রেমভক্তির অধিকারী হন। এই প্রেমভক্তির সাধন প্রসঙ্গে শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহুতিকে বলছেন—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।১৩)

আমার চরণ সেবনের আকাঙ্ক্ষা যাঁদের আছে, তাঁদের সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব (কৈবল্য) এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও তাঁরা তাতে সন্তুষ্ট হন না, তাঁরা কেবল আমার সেবাই প্রার্থনা করেন।

এই প্রকার ভক্তের বন্ধন কিংবা মুক্তির দিকে দৃষ্টি থাকে না। বিদ্যাপতি বলছেন—

কিয়ে মানুষ পশু পাখী যে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥

এখানে স্তুতিতে দেবগণ সেই ভক্তরা কিভাবে ভগবৎ-শরণ লাভ করেন সেই প্রসঙ্গে বলছেন—**'সমাধিনা আবেশিতচেতসা একে'** অর্থাৎ তাঁরাই মুখ্য সাধক যাঁদের চিত্ত পরিপূর্ণভাবে অর্থাৎ একাগ্রভাবে তোমাতেই সমর্পিত।

পাতঞ্জলদর্শনে সমাধির সংজ্ঞা হল—**'তদা দ্রষ্টুং স্বরূপেঽবস্থানম্'** অর্থাৎ আত্মার স্বরূপে অবস্থান যাকে বলে নির্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। পাতঞ্জলদর্শন মতে সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প সমাধিযুক্ত সাধকের নিম্নস্তরের চিত্তের বৃত্তি থাকে, যদিও তা সাংসারিক জীবের মতো কলুষিত বৃত্তি নয়, তা অতি স্বচ্ছ ও আত্মানুসন্ধান রত। কিন্তু শ্রীগোবিন্দভক্ত চূড়ামণিদের প্রেমভাবিত চিত্তবৃত্তিতে কেবল শ্রীগোবিন্দ মাধুর্যই অনুভূত হয় তাই এই ভাবসমাধি যোগিগণের সবিকল্প-নির্বিকল্প সমাধি হতেও পৃথক , তা হতে অতি উচ্চ।

শরণাগতি— কিন্তু ভগবানে প্রেমভক্তি, ভাবসমাধি আসে কী ভাবে ? ব্রহ্মাদি দেবগণ বলছেন, **'তৎপাদপ্রোতেন মহৎকৃতেন'**। ভবসমুদ্র অপার অসীম। এই সমুদ্রের একধারে মায়ামোহ, অপর পারে সচ্চিদানন্দ। মায়ামোহের সংসারে কামনা-বাসনার কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে কোনো কোনো ভাগ্যবান ভক্তর ভবসমুদ্র পার হতে ইচ্ছা হয়। আর এদের মধ্যে জ্ঞানমার্গ অবলম্বী কেউ কেউ সমুদ্রে সাঁতার দিতে শুরু করে এবং নিজ শক্তি বলে কিছু সাধক ভবসমুদ্র পার হয়েও যান। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিমান তারা সাঁতার দিয়ে নিজে নিজে ভবসমুদ্র পারের প্রয়াস ত্যাগ করে, শ্রীগোবিন্দ চরণাশ্রিত নৌকার (যার কর্ণধার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ) অন্বেষণ করেন, কিন্তু ইহা অতি বিরল—

যততামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিস্বপি মহামুনে॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্ত॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভবসমুদ্র পার হতে হলে শ্রীগোবিন্দচরণ-তরণীই একমাত্র অবলম্বন

এবং যাঁরা শ্রীগোবিন্দচরণ-তরণীই একমাত্র আশ্রয় করেন তাঁরাই হলেন প্রকৃত বুদ্ধিমান।

তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলছেন—

ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
দৃঢ় ভক্তিযোগে সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥

আর শ্রীগোবিন্দচরণতরণী আশ্রয় করলে কী হয়, না মহৎকৃতেন অর্থাৎ মহৎ-এর আশীর্বাদে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপনি॥

শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ, গুণ, মাহাত্ম্য সর্বই দুর্জ্ঞেয়। তিনি নিজে না বোঝালে আত্মশক্তিতে তা বোঝবার কারোর সাধ্য নাই। তিনি যাকে কৃপা করেন তাকে **মহৎ দ্বারা কৃপা** করে নিজতত্ত্ব বুঝিয়ে দেন।

দৈন্যভাব— স্তুতির শ্লোকটির শেষ অংশে দেবগণ বলছেন— **'কুর্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিং'** অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দচরণ আশ্রিতের কাছে ভবসমুদ্রও গোষ্পদতুল্য হয়ে যায়। এখানে দেবগণ ভগবৎ-আশ্রিতজনের নিকট ভবসমুদ্র তুচ্ছ না বলে গোবৎসপদ ন্যায় বলেছেন তার কারণ অতি গূঢ়। যাঁরা শ্রীগোবিন্দ চরণাশ্রয়ে ভবসমুদ্র পার হন, তাঁদের ভগবৎ-চরণ ছাড়াও আরো একটি মহাসম্পত্তি লাভ হয়, তা হল 'দৈন্য'। এই সম্পত্তি শ্রীগোবিন্দ ভক্ত ব্যতীত যোগী, জ্ঞানী, কর্মী, ধ্যানী, তপস্বী কারও নেই। অন্যদিকে ভক্তি সাধনায় সিদ্ধি যত নিকটে আসে দৈন্যও তত বর্ধিত হয়।

ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে বলছেন—

নৈতন্মনস্তব কথাসু বৈকুণ্ঠনাথ, সংপ্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্তং তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥

(ভাগবত ৭।৯।৩৯)

হে বৈকুণ্ঠনাথ! আমার অশেষ জন্ম সঞ্চিত পাপদুষ্ট, বিষণ্ণমলিন, চঞ্চল, কামাসক্ত, হর্ষ, শোক, কামনাদি প্রপীড়িত মন তোমার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। হায়! এই মলিন চিত্তে তোমার লীলাদি কীভাবে স্মরণ করব!

শ্রীনৃসিংহদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করে এবং তাঁর অফুরন্ত প্রস্রবনে বিধৌত হয়েও ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদের কী দৈন্য ! শ্রীগোবিন্দচরণ আশ্রয় করলে ভবসমুদ্র গোষ্পদ তুল্য হয়, এর মর্ম এই যে যাঁরা শ্রীগোবিন্দচরণ আশ্রয় করেন তাঁদের সংসার নিবৃত্তি হয়ে গেলেও 'আমি সংসারী কীট' এই অভিমান থাকে। এই অভিমানকেই ব্রহ্মাদি দেবগণ গোষ্পদ বলেছেন। গোষ্পদের জল অতি পবিত্র ও তার স্পর্শে পাতক নাশ হয়। সংসারমুক্ত শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রিত ভক্তর নিজেকে সংসারী ভেবে যে দৈন্য প্রকাশ, তাও পরম পবিত্র ও তার দর্শন-স্পর্শনেও জীবের অশেষ পাতক নষ্ট হয়। প্রহ্লাদ প্রভৃতির দৈন্যবার্তা আলোচনা করলে কোনো ভক্তই আর অভিমান-মহাপাপে লিপ্ত হবেন না।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও তাই বলেছেন **'নাই কৃষ্ণ প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন'** তাঁর এই দৈন্যের পরাকাষ্ঠাই ভক্তিপথের সাধকের জীবনের পাথেয়। শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন মূর্তি, প্রেয়সীশিরোমণি শ্রীমতী রাধিকাও শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর বিলাপ করেছেন—

'মোরা গ্রাম্য গোপবালিকা, সহজ পশুপালিকা,
হাম কি হওব শ্যাম সুখভোগ্যা'।

শ্রীগোবিন্দচরণই ভবসমুদ্রের তরণী—এখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ **'ভবাব্ধিং গোবৎসপদং কুর্বন্তি'** এই বলে এই পরম তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন।

উনত্রিশতম শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রকট লীলার সময় সাক্ষাৎ দর্শনাদিতে জীবের কৃতার্থতা বর্ণনা করে, ত্রিংশ শ্লোকে শ্রীভগবানের অপ্রকট কালেও যে জীব তার চরণ ভজন, স্মরণে কৃতার্থ হয় সে সিদ্ধান্তই স্থাপন করেছেন। আর এই প্রকরণের শেষে একত্রিংশ শ্লোকে শ্রীভগবানের চরণতরণী পাওয়ার কথা বলেছেন। ভবনদীর পারাপার সাধারণ নদী পারাপারের মতো নয়। শ্রীগোবিন্দচরণতরণী ভিন্ন এই নদী পার হওয়ার আর অন্য উপায় নেই। হয়তো মনে হতে পারে যে যেহেতু যাঁরা মুক্ত তাঁরা ভবনদী পার হয়ে ওপারে চলে গিয়ে তাই সেই তরণী তাঁদের সঙ্গেই গিয়েছে, এপারের বদ্ধ সংসারিক জীবের সে তরণীর নাগাল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু

এখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁদের স্তুতিতে জীবগণকে আশ্বস্ত করে বলছেন —শ্রীগোবিন্দচরণতরণী আশ্রয় করে ভক্তচূড়ামণিগণ ভবনদীর ওপারে গিয়েছেন বটে কিন্তু সেই তরণী সঙ্গে নিয়ে যাননি, এপারের জীবগণের জন্য তরণীর ব্যবস্থা করেই গিয়েছেন। জীব অভিমানের গৃহ ছেড়ে নদীর কূলে আসলেই সে তরণী খুঁজতে হবে না, আপনিই নয়নগোচর হবে কারণ তিনি 'দ্যুমন' অর্থাৎ স্বপ্রকাশ।

দেবতারা আরো বলছেন যে, ভবসমুদ্র অন্যর পক্ষে পার হওয়া 'সুদুস্তরং' ও 'ভীমং' অর্থাৎ দুষ্কর এবং ভয়ানক। এ সবই কিন্তু ততক্ষণই যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ হয় ! আর যদি তাঁর চরণাশ্রয় লাভ হয় তবে ইহা তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র। ব্রহ্মা-মোহন স্তুতিতে তাই ব্রহ্মা বলছেন—

তাবদ্ রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥

(শ্রীভাগবত ১০।১৪।৩৬)

ব্রহ্মা গোবৎসচারণপরায়ণ শ্রীনন্দনন্দনকে বলছেন—হে শ্রীকৃষ্ণ ! যতদিন পর্যন্ত না জীব তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে ততদিন পর্যন্ত কামনা-বাসনাদি প্রভৃতি চোরের মতো তার সম্পত্তি হরণ করে, ততদিন গৃহ কারাগৃহের ন্যায় তাকে আবদ্ধ রাখে, আর ততদিন পর্যন্ত মোহ তাদের পদের শৃঙ্খল। কিন্তু তোমার চরণাশ্রয় করলেই সবই বিপরীত হয়ে যায়, তখন বিষয়-রাগ তোমার চরণানুরাগে পরিণত হয়, গৃহ তোমার মন্দির হয়ে যায় আর প্রেম তোমার প্রেমান্ধতায় পরিণত হয়।

ব্রহ্মাদি দেবগণ বলছেন, আপনার চরণাশ্রিত ভক্তরা **'স্বয়ং ভবার্ণবং সমুতীর্য'** অর্থাৎ নিজেরা ভবসমুদ্র পার হয়ে **'ভবৎ পদাম্ভোরুহনাবম্ অত্র তে নিধায় যাতাঃ'** আপনার চরণতরণীখানি তীরেই রেখে যান। এই শরণাগতি রূপ চরণতরণীখানি একদিনে লাভ হয় না। শ্রীগোবিন্দভজন করতে করতে ক্রমে শরণাগতি লাভ হয়। পূর্ববর্তী ভক্তচূড়ামণিগণ তীব্রভাবে ভজন করে যে

শরণাগতি লাভ করেছেন তা তাঁরা পরবর্তী সাধকগণের হিতার্থে শিষ্য-প্রশিষ্যাদি পরম্পরা ক্রমে জগতে রেখে যান। এরই নাম সম্প্রদায় প্রবর্তন। শ্রীগোবিন্দ ভক্তচূড়ামণিগণ নিজে কৃতার্থ হয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন না, আর যেহেতু সংসারাসক্ত জীবের প্রতি তাঁদের অসীম করুণা, তাই তাঁরা নিজের আচরিত ভজন প্রণালী সম্প্রদায় মারফত জগতে রেখে যান। ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস আদি সকলেই এইভাবে জগতের উপর কৃপা করেছেন ; কেননা বিষয়াসক্ত মলিন বুদ্ধিতে কারো পক্ষে শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রয়ের পথ আবিষ্কার করা সম্ভবপর নয়। তাই পদ্মপুরাণ বলছেন— **'সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ। অতৌ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥ শ্রী-রুদ্র-ব্রহ্ম-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥'**

অর্থাৎ কলির জীবকে পরম্পরাগতভাবে বিশুদ্ধ পথ দেখাবার জন্য ভগবানের শক্তি **'শ্রী'**, বিশ্বসংহারকর্তা **'রুদ্র'**, বিশ্বস্রষ্টা **ব্রহ্মা** এবং ভগবানের আবেশ অবতার ও ব্রহ্মার মানসপুত্র চতুঃসন (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎ কুমার) যাঁরা শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ, এই চারজন সম্প্রদায়াচার্য হবেন এবং তাঁদের কৃপায় চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় হবে।

রামানুজং শ্রীঃ শ্রীচক্রে নিম্বাদিত্য চতুঃসনঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো মাধ্বাচার্যং চতুর্মুখঃ॥

অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী রামানুজকে, চতুঃসন নিম্বার্ককে, শ্রীরুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে ও ব্রহ্মা মাধ্বাচার্যকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রয়ের পথ দেখিয়েছেন। উপরোক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়াও ভক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ধ্যান, ন্যাস, তপস্যা প্রভৃতি বহু পথ অন্যান্য আচার্যগণ প্রকাশ করেছেন। তবে শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রয়ের পথপ্রদর্শন — শ্রীগোবিন্দ চরণাশ্রিত ভক্তচূড়ামণিগণেরই অনুগ্রহের দান। তাই যদি কোনো জীবের শ্রীগোবিন্দচরণ ইষ্ট বলে বোধ হয় তবে ভজনপথে অগ্রসর হয়ে শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রয় করে কৃতার্থ হবে।

ভক্তিহীন জ্ঞানমার্গীদের পতনের সম্ভাবনা
(শ্লোক ৩২—৩৩)

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৩২
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥ ৩৩

সরলার্থ—হে পদ্মপলাশলোচন, অপর যে সকল ব্যক্তি আপনার চরণকমলের আশ্রয় না নিয়ে নিজেদের মুক্তপুরুষ বলে মিথ্যা গর্বে মত্ত হয়ে থাকে, আপনার প্রতি ভক্তির অভাববশত যাদের বুদ্ধিই প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ হয়নি, তারা যদি বহুবিধ কষ্টসাধ্য তপস্যা তথা কৃচ্ছ্রসাধনাদি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উচ্চস্তরেও আরোহণ করে, তথাপি তাদের সেই উন্নতি স্থায়ী হয় না, অনতিবিলম্বেই তাদের পতন হয়॥ ৩২ ॥ কিন্তু, হে মাধব, যারা এই ধরনের কোনো অভিমানের বশবর্তী না হয়ে, কেবলমাত্র আপনার প্রতি অনুরাগবদ্ধ হয়ে আপনারজন হয়ে যায়, তাদের কখনোই আর সাধনপথ থেকে পতন বা বিচ্যুতি ঘটে না, কারণ তাদের আপনিই সর্বতোভাবে রক্ষা করে থাকেন। আর তারই ফলে, হে প্রভু, সমস্ত বাধা-বিপদ তুচ্ছ করে, যেন বিঘ্নসৃষ্টিকারী শক্তির সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের মাথায় পা রেখে, তাদের পদদলিত করে তারা নির্ভয়ে বিচরণ করে॥ ৩৩

মূলকথা—পূর্ব প্রকরণে ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীগোবিন্দ চরণাশ্রয়ের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন আর বর্তমান প্রকরণে বলছেন যে, ভক্তিহীন সাধক যদি স্বশক্তির আশ্রয়ে এবং জ্ঞান-যোগাদির তীব্র সাধনায় নিজেকে সংসার-মুক্ত

বলে মনে করে, তবে সেই অভিমানে তার পতন অনিবার্য। এখানে স্তুতিতে সেই অভিমানী জ্ঞানমার্গী সাধকদের দুটি শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে **'বিমুক্তমানিন্'** অর্থাৎ যারা অভিমানবশত জড়দেহ হতে চিৎস্বরূপ আত্মাকে কথঞ্চিত পৃথক বলে বুঝতে পেরে নিজেকে সংসারমুক্ত মনে করে কিন্তু তাদের সংসার মুক্তির পক্ষে এই জ্ঞানটুকু পর্যাপ্ত নয়। আবার এই অভিমানীদের সম্বন্ধে আরো বলা হয়েছে **'ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ'** অর্থাৎ তারা শ্রীভগবানকে সর্বেশ্বর বলে বুঝতে পারে না তাই তাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ নয়। তারা **'অহং ব্রহ্মাস্মি'** ইত্যাদি শ্রুতি, পুরাণাদির বাক্য অবলম্বন করলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের শাস্ত্রের প্রতিপাদিত প্রকৃত তত্ত্বের অনুভব হয়নি। কেননা **'যত্র তস্য সর্বমাত্মৈবাভূতং তৎ কেন কং পশ্যেৎ'** অর্থাৎ যখন সর্বত্র ব্রহ্ম অনুভূত হয় আর কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কিই বা দেখবে ! সে ভাব ভাষায় ব্যক্ত করার বা 'আমি ব্রহ্ম' বলে অভিমান করারও বস্তু নয়। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলছেন—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তিদশা পাইনু বলি মানে।
বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নয় কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

আর শ্রীগোবিন্দের চরণে শরণাপন্ন হওয়াও সবার ভাগ্যে ঘটে না। তাই গীতায় ভগবান বলেছেন—

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

(গীতা ৭।১৯)

অর্থাৎ বহুজন্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শ্রীভগবান হতে কোনো পৃথক বস্তু নেই, জ্ঞানবান জীবের এই জ্ঞান লাভ হয় আর তখন সে আমার শরণাপন্ন হয়।

এই প্রকার অভিমানীদের সম্পর্কে দেবগণ শ্লোকটির অন্তে বলছেন, **'পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুস্মদঙ্ঘ্রয়ঃ'** অর্থাৎ তারা ভগবান ও তাঁর ভক্তদের অনাদর করে বহুজন্মের তপস্যালব্ধ জীবন্মুক্তি পথ থেকে ভ্রষ্ট হন। যদি সত্যিকারের প্রেমভক্তি লাভ করতে হয় তাহলে কেবল ভগবান নয় তাঁর ভক্তকেও

সমানভাবে শ্রদ্ধা করতে হবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলছেন—

সাধুসঙ্গ বিনা কোন কর্ম সিদ্ধ নয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহে সংসার না যায় ক্ষয়॥

প্রহ্লাদ মহারাজও তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

(ভাগবত ৭।৫।৩২)

অর্থাৎ হে পিতা ! শ্রীগোবিন্দচরণে মতি হলে সর্ববিধ অনর্থ দূর হয়ে যায়, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সর্ববিধ বাসনারহিত ভক্তচূড়ামণিগণের চরণাশ্রয় না পাওয়া যায়, ততদিন কারও মতি শ্রীগোবিন্দচরণ স্পর্শ করতে পারে না। ভক্তিহীন সাধকের পতনই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য। জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি—এই তিনটিই পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের সাধন[১]। কিন্তু জ্ঞান ও যোগ-সাধনা বহু বিঘ্ন সংকুল এবং এই দুই সাধনের সিদ্ধিলাভও সকলের ভাগ্যে ঘটে না, অনেককেই সাধনভ্রষ্ট হতে হয়। গীতাতে ভগবান বলেছেন—'**শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে**' (গীতা ৬।৪১) অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট সাধক সদাচারসম্পন্ন ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রকরণটির অন্তিম শ্লোকে ব্রহ্মাদি দেবগণ '**তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্**' শ্রীগোবিন্দ-চরণাশ্রয়ের এই অপূর্ব মহিমা কীর্তন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলছেন—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

(ভাগবত ১১।২০।৩১)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন হে উদ্ধব ! ভক্তিযোগ ভিন্ন অন্য সমস্ত সাধনই ভক্তিসাপেক্ষ কিন্তু কেবল ভক্তিযোগ নিরপেক্ষ। সুতরাং তোমার একান্ত ভক্তেরই জ্ঞান বা বৈরাগ্য কিছুই শ্রেয়সাধন নয়, একমাত্র ভক্তিই তাদের

---

[১]জ্ঞানযোগ ভক্তি সাধনার বশে। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

পরমপুরুষার্থ লাভের উপায়।

জ্ঞানমার্গের সাধকগণ সাধনাবস্থা হতেই **'সোঽহং'** অর্থাৎ 'আমিই সেই' এই প্রকার ধ্যানপরায়ণ হন এবং সিদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভক্তিমার্গের সাধকগণ সাধন থেকে সিদ্ধাবস্থা পর্যন্ত 'আমি তোমারই' এই প্রকার অভিমান রাখেন। যোগী, জ্ঞানী কেহই 'আমি তোমার' এই অভিমান রাখেন না, তাঁদের অভেদ ভাবই লক্ষ্য। কিন্তু ভক্তের কাছে **'ভক্তির্ভগবত সেবা মুক্তিস্তৎপদলঙ্ঘনং'** (পদাবলী)। শ্রীগোবিন্দ চরণার-বিন্দ সেবার ইচ্ছাই ভক্তি আর সেই সেবার্থ তাঁর চরণপ্রাপ্তির নামই মুক্তি। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলছেন—**'কৃষ্ণ দাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু'**। আর তাই ভগবান উদ্ধবকে বলেছেন—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।।

(ভাগবত ১১।৫।৩৮)

যারা সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে একান্তভাবে শ্রীগোবিন্দ-চরণাশ্রয় করেছেন, তাঁদের যদি কোনো অজ্ঞানকৃত পাপও উপস্থিত হয়, তাহলে তাঁদের হৃদয়স্থিত হরিই সব পাপ দূর করে দেন। অবশ্য হরিচরণাশ্রিত ব্যক্তির মতি কখনো হরিচরণ ছাড়া পাপে বা পুণ্যে যায় না।

তাই চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন—

বিধি ধর্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন।।
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে করেন শুদ্ধ না করান প্রায়শ্চিত্ত।।

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীগোবিন্দভক্তগণের কোনোভাবে ভজনে বিঘ্ন জন্মালে তাঁদের দৈন্য ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায় এবং তাতে তাঁরা অধিকতর কৃপালাভে কৃতার্থ হন। গন্ধর্বরাজ চিত্রকেতুর অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ, রাজর্ষি ভরতের মৃগদেহ প্রাপ্তি প্রভৃতির আলোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে শ্রীগোবিন্দচরণ-ভক্তের কোনো ক্রমে

পতন হলেও তাঁরা কদাপি ভক্তিপথ থেকে বিচ্যুত হন না, তাঁদের পতনেও শ্রীগোবিন্দচরণ সম্বন্ধ লোপ হয় না।

গীতাতেও শ্রীভগবান বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

(গীতা ৯।১০)

যে ভক্ত প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাদের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করি যাতে তারা আমার শরণাপন্ন হতে পারে। ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপে শ্রীগোবিন্দচরণ আশ্রয়ের এই অনির্বচনীয় মহিমা কীর্তন করে জানিয়েছেন যে ইহাই জীবের একমাত্র কর্তব্যকর্ম।

ভগবানের মঙ্গলময় মূর্তি (শ্লোক ৩৪—৩৭)

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥ ৩৪

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্
বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥ ৩৫

ন নামরূপে গুণজন্মকর্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি॥ ৩৬

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়ো-
রাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে॥ ৩৭

সরলার্থ— আপনি জগৎ পালনের নিমিত্ত সকল জীবের জন্য পরম মঙ্গলময় বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সচ্চিদানন্দঘন দিব্য কল্যাণবিগ্রহ ধারণ করেন। আপনার এই রূপ-প্রকাশের ফলেই আপনার ভক্তগণ বেদ, কর্মকাণ্ড, অষ্টাঙ্গযোগ, তপস্যা এবং সমাধির দ্বারা আপনার আরাধনা করে থাকেন ; অন্যথায় কোনো অবলম্বন ব্যতিরেকে তারা কীভাবে কীসের আরাধনা করতে সমর্থ হতেন ? ৩৪ ॥ হে বিধাতা ! আপনার এই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় নিজ রূপ প্রকাশিত না হলে অজ্ঞান এবং তার থেকে উৎপন্ন ভেদভাবের নাশক অপরোক্ষ জ্ঞানও হতে পারত না। জগতে দৃশ্যমান গুণত্রয় আপনারই এবং আপনার দ্বারাই এরা প্রকাশিত হচ্ছে—এ কথা সত্য। কিন্তু এই গুণগুলির প্রকাশক (সাত্ত্বিকাদি) বৃত্তিসমূহের দ্বারা আপনার স্বরূপের অনুমানই মাত্র হতে পারে, প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় না। (আপনার স্বরূপের সাক্ষাৎকার কেবলমাত্র আপনার এই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দিব্য-বিগ্রহের সেবার দ্বারা আপনারই কৃপায় হয়ে থাকে) ॥ ৩৫ ॥ মন এবং বাক্যের দ্বারা আপনার স্বরূপের অনুমানমাত্র হতে পারে, কারণ আপনি তাদের অধিগম্য নন বরং তাদের সাক্ষী। এইজন্যই গুণ, জন্ম ও কর্মের দ্বারা আপনার নাম এবং রূপের নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তথাপি, হে প্রভু, আপনার ভক্তগণ তো উপাসনা আদি ক্রিয়া-যোগসমূহের দ্বারা আপনার সাক্ষাৎকার করেই থাকেন ॥ ৩৬ ॥ যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গলময় নাম ও রূপসমূহের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং ধ্যান করেন আর আপনার চরণকমলের সেবায় নিজের চিত্তকে সর্বদা নিবিষ্ট রাখেন, এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় না ॥ ৩৭ ॥

মূলভাব—ভগবানের অবতার মূর্তি স্বপ্রকাশিকা—ব্রহ্মাদি দেবগণ পূর্ব পূর্ব প্রকরণে 'বিভর্ষি রূপাণি' প্রভৃতি শ্লোকে বলেছেন যে শ্রীভগবান জগতের জীবগণকে কৃতার্থ করার জন্য তাঁর নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্তি জগতে প্রকাশ করেন। তার পরের প্রকরণে তাঁর চরণাশ্রয়ের মাহাত্ম্য ও চরণসেবনের অনাদরের দোষ প্রকাশ করেছেন। আর বর্তমান প্রকরণে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁর কৃপায় তাঁরই নিত্যসিদ্ধ মঙ্গলময় শ্রীমূর্তির স্বরূপ, তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশের পথে ফিরে এসেছেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ দেবকী গর্ভগত শ্রীগোবিন্দকে বলছেন—'**ভবান্ স্থিতৌ বিশুদ্ধং সত্ত্বং বপুঃ শ্রয়তে**' অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি জগৎ পালনের নিমিত্ত নিজ বিশুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীমূর্তি প্রকাশ করুন। শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশিকা শক্তির নাম বিশুদ্ধসত্ত্ব। তাঁকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না '**ন পশ্যতি রূপমস্য**'। জাগতিক চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতির আলোক সে রূপাবলোকনে কিছুই সাহায্য করতে পারে না।

'**ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকাম্, নেমা বিদ্যুতো ভ্রান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং ; তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।**' অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, তারকা, বিদ্যুত, অগ্নি প্রভৃতি জাগতিক বস্তু প্রকাশে সহায়তা করে সত্য, কিন্তু শ্রীগোবিন্দের রূপ প্রকাশে কেউই সমর্থ নয়। শ্রীগোবিন্দের চরণ-নখের জ্যোতিতেই চন্দ্র-সূর্য জ্যোতিস্মান্। তাঁর কৃপা না হলে, কোটি চন্দ্র সূর্যালোকে কোটি নয়ন মেলে দেখলেও তাঁকে দেখা যায় না।

দেবগণ আরো বলছেন — শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ '**শরীরিণাং শ্রেয় উপায়ম্**' অর্থাৎ যে যে লীলার জন্য শ্রীভগবান যে যে শ্রীমূর্তি ধারণ করেন তাঁর সেই সেই মূর্তি জগতের মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ নিকেতন। শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রিত ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎ সেই আনন্দময়ের চরণপ্রান্ত থেকে তরঙ্গায়িত আনন্দসিন্ধু আস্বাদন করেন, সাযুজ্য প্রাপ্ত জীবগণ সেই আনন্দেই লীন হয়ে যান, আর বিষয়ী মুগ্ধ জীবগণ ভ্রান্তিবশত এবং তাদের অনাদি ভোগবাসনা বশে সাক্ষাৎ সেই আনন্দ গ্রহণ করতে না পেরে শব্দস্পর্শাদি বিষয় হতে সেই আনন্দের প্রতিবিম্ব মাত্র গ্রহণ করেন। শ্রীভগবান জগতে তাঁর শ্রীমূর্তি প্রকাশ করলে সকলের সকল মোহই কেটে যায় আর পরিপূর্ণ আনন্দের বাসনায় আনন্দময়ের চরণে শরণাপন্ন হয়।

শ্রীভগবান তাঁর নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্তি প্রকাশ না করলে কেউই তাঁর কোনোরূপ অর্চনা করতেও সমর্থ হয় না। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মাদি দেবগণ স্তুতিতে বলছেন—'**বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভিস্তবার্হণং যেন সমীহতে**' (ভাগবত ১০।২।৩৪)। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হ্যস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রমস্থ ব্যক্তিদের বেদপাঠ, ক্রিয়াযোগ, তপস্যা এবং সমাধি এই চারটি

অবশ্য প্রতিপালনীয় ধর্ম। কিন্তু এই চারবর্ণাশ্রমীও কেবলমাত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম যাজনেই কৃতার্থ হতে পারেন না, তার সঙ্গে শ্রীগোবিন্দভজনেরও বিশেষ আবশ্যকতা আছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলছেন—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারনম্॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

অর্থাৎ বর্ণাশ্রম আচরণপরায়ণ ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দভজনশীল হলে তবেই শ্রীগোবিন্দ প্রীত হন—এছাড়া আর কিছুই তাঁর প্রীতির হেতু নয়। চার বর্ণাশ্রমীর শ্রীগোবিন্দভজনই হল মুখ্য কর্তব্য এবং বর্ণাশ্রমাচারও তারই অঙ্গ। শ্রীভগবান তাঁর শ্রীমূর্তি প্রকাশ না করলে তাঁর চরণার্চন সিদ্ধ হয় না। এইজন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ বলছেন— আপনার শ্রীবিগ্রহ জগজ্জীবের সর্ব কর্মফলদাতা। কর্মীর কর্মফল প্রাপ্তি, জ্ঞানীর ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ এবং যোগীর পরমাত্ম সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে কিন্তু ভক্তির সাহায্য না পেলে কারও কোনও সাধনায়ই ফলপ্রসূ হয় না —'**সর্বাসামেব সিদ্ধিনাং মূলং তচ্চরনার্চনম্**'। সুতরাং ভগবান তাঁর নিত্যসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বময় মূর্তি জগতে প্রকাশ না করলে, তাঁর চরণার্চন করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয় আর সেইজন্যই পরম কৃপাময় ভগবান তাঁর নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ জগতে প্রকাশ করেন।

ভগবানের অবতার মূর্তিই প্রত্যক্ষ পরতত্ত্ব প্রদানকারী—যদি সংশয় হয় যে মুক্তির সাধন কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারাই সম্ভব হয় যেমন শ্রুতি বলেছেন —'**ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়**' (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮)। তাহলে 'ভক্তিই একমাত্র মুক্তির হেতু' এই কথার হেতু কী? এই সন্দেহ নিরসন করার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ '**সত্ত্বং ন চেদ্ধাতঃ**' (শ্লোক ৩৫) ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করেছেন। দেবগণ বলতে চেয়েছেন শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশ পরমানন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ব্যতীত কারও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রুতির প্রতিপাদ্য এই যে, এই পরতত্ত্ব জ্ঞান, যে-সে পরতত্ত্বজ্ঞান নয়; কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ পরতত্ত্ব জ্ঞানেই জীবের সংসার মুক্তি হয়। পরতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞানই জীবের সংসার বন্ধনের হেতু, আর পরতত্ত্ব বিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান

ব্যতীত কিছুতেই এই অজ্ঞান দূর হতে পারে না।

শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশ, চক্ষুঃ কর্ণ আদি ইন্দ্রিয়-প্রকাশ্য নহে অথবা সুখ-দুঃখাদির ন্যায় মনোবেদ্যও নয়, তা স্বপ্রকাশ। তিনি তাঁর স্বপ্রকাশিকা শক্তিতেই তাঁর চরণাশ্রিত ভক্তজনের প্রত্যক্ষ হন। ব্রহ্মাদি দেবগণ আগেও শ্রীভগবানের আবির্ভাবের প্রার্থনায় বলেছেন—'**তৎ ভাবযোগ-পরিভাবিতহৃৎস্যরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্। যদ্ধিয়া উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়**' (ভাগবত ৩।৯।১১) অর্থাৎ হে ভগবন্ ! ভক্তের ভক্তি-মকরন্দ পরিপূর্ণ হৃদয়কমলে আপনি বাস করে থাকেন, বেদাদি শাস্ত্রে এই তত্ত্বই নির্দেশ করে। আপনার প্রেমবান ভক্তগণ যে ভাবেই আপনাকে ভাবে, আপনি সেই ভাবে সেই মূর্তি প্রকাশ করে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। আর এই মনোবাসনা কীভাবে পূর্ণ হয় সে বিষয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ বলছেন— '**বিজ্ঞানমবিজ্ঞানভিদপমার্জনম্**'। এখানে 'অজ্ঞানভিৎ' কথাটির অর্থ হল 'অজ্ঞাননাশক'। আর অজ্ঞান পদটি হল 'ভেদজনক'। বিষ্ণুপুরাণ বলছেন—'**তদ্ভাবভাবনাপন্নস্ততোহসৌ পরমাত্মনা। ভবতাবেদী ভেদশ্চ তস্যা জ্ঞানকৃতো ভবেৎ॥**' (বিষ্ণুপুরাণ) অর্থাৎ সেই পরমাত্মার ভাবনায় নিমগ্ন জীব পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হয়, তাঁর অজ্ঞান নিবন্ধনেই এই ভেদজ্ঞান হয়ে থাকে। এই বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে বোঝা যায় যে পরমাত্মা-বিষয়ক অজ্ঞানতাই পরমাত্মার সঙ্গে জীবের ভেদবুদ্ধির জনক, অজ্ঞান নিবৃত্তিতেই এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। বৈষ্ণবভাষ্য অনুসারে পরমাত্মা-বিষয়ক অজ্ঞানতা হল শ্রীভগবদ্-বৈমুখ্য, যা থেকেই জীবের মায়াকল্পিত সংসারে আসক্তি হয় আর তখনই জীব মায়াসৃষ্ট দেহ-গেহাদিতে 'আমি', 'আমার' ভাবে আবিষ্ট হয়ে সংসারে-দুঃখ ভোগ করে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলছেন—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া পিশাচী তাহারে বান্ধিল॥

আর শ্রীগোবিন্দভজনে ভগবদ্-বৈমুখ্য দূর হলে সংসারাসক্তি কেটে যায়—জীব কৃতার্থ হয়। তাই ব্রহ্মাদি দেবগণও বিজ্ঞানকেই (প্রত্যক্ষ পরতত্ত্ব

সাক্ষাৎকার) অজ্ঞান-নিবর্তক বলে অভিহিত করেছেন। তাই শ্লোকার্ধের শেষ অংশে দেবগণ বলছেন— **'গুণপ্রকশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য যেন বা গুণঃ।'** অর্থাৎ জ্ঞানাদি প্রকাশে বা জ্ঞানাশ্রয়ে যে আত্মজ্ঞান হয় তা প্রত্যক্ষ নয়, সে জ্ঞান অনুমান মাত্র।

গীতায় আছে **'সত্ত্বাং সঞ্জায়তে জ্ঞানম্'** (গীতা ১৪।১৭) অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হতে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হয়। এর থেকে মনে হতে পারে যে শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞানও সত্ত্বগুণ হতে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সত্ত্বগুণে প্রাকৃত বস্তুর জ্ঞান হতে পারে কিন্তু শ্রীভগবদ্‌স্বরূপ তত্ত্বাদি জ্ঞান কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকাশে শ্রীভগবৎস্বরূপের পরোক্ষ জ্ঞান হতে পারে কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধই নেই। বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন—

সত্তাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন প্রাকৃত গুণের সঙ্গে শ্রীভগবানের কোনোই সম্বন্ধ নেই। তিনি সর্ববিধ শুদ্ধতম বস্তুর মধ্যেও পবিত্রতম। (এখানে পবিত্র শব্দটির অর্থ হল প্রাকৃত গুণের সহিত সম্বন্ধরহিত)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলছেন—

এ সবার দর্শনাদ্যে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতির মর্মার্থ এই যে হে ভগবন্ ! আপনার অসীম কৃপায় যে সত্ত্বগুণে আপনার স্বরূপ আমরা জানতে পেরেছি তা যদি আপনার বিশুদ্ধ সত্ত্ব (স্বরূপ শক্তি) না হয়ে প্রাকৃত সত্ত্ব (মায়িক শক্তি) হত, তাহলে তার দ্বারা কিছুতেই আপনার স্বরূপ জানা যেত না বা সংসার-হেতু অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হত না।

ঈশ উপনিষদেও এইভাবে বলা হয়েছে—

'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে' (ঈশ ১১) অর্থাৎ এই শ্রুতিবাক্যেও অবিদ্যা শব্দের অর্থ ধরা হয়েছে প্রাকৃত সত্ত্ব ও বিদ্যা শব্দ বিশুদ্ধ সত্ত্বর পরিচায়ক।

অবতারের নামরূপ তাঁর থেকে পৃথক নয়—যদিও ভগবানের অবতারের নাম, রূপ আদি তাঁর থেকে পৃথক নয় তবু ভগবানের লীলা সবই অপ্রাকৃত হওয়ায় তা মানুষের অজ্ঞেয়। ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রকরণটির শেষে ভগবানের দুর্জ্ঞেয়ত্ব এবং তাঁরই কৃপায় তাঁর তত্ত্বজ্ঞানের উপায় বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী শ্লোকে (৩৬) ব্রহ্মাদি দেবগণ বলছেন— শ্রীভগবান তাঁর নিত্যশুদ্ধ শ্রীমূর্তি প্রকাশ করলে তাঁর নাম এবং রূপও জগতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁর শ্রীমূর্তি অনন্ত এবং অচিন্ত্য সুতরাং তা মন ও বাক্যের অগোচর। শ্রুতিও তাই ভর্ৎসনা করে বলছেন—**'বিজ্ঞাতরমরে কেন বিজানীয়াৎ'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৫।১৫) ওরে ভ্রান্ত! জ্ঞাতাকে তুমি কী প্রকারে জানবে? ব্রহ্মাও বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে সাক্ষাৎ দর্শন করে বলছেন— **'জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো। মনসো বপুষো বাচো বৈভবং ভব গোচরঃ'** (ভাগবত ১০।১৪।৩৮) হে ভগবন্! কোন পণ্ডিতাভিমানী যদি আপনার তত্ত্ব জেনে থাকে বলে মনে করে তাহলে সে জানুক, আমার তাতে কিছু বক্তব্য নেই, কিন্তু হে প্রভো! আমি জানি আপনার স্বরূপ বৈভব আমার কায়, মনঃ এবং বাক্যের অগোচর। গীতাতেও ভগবান বলেছেন **'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ'** (গীতা ৪।৯) অর্থাৎ আমার জন্ম ও কর্ম প্রাকৃত জীবের ন্যায় মনে হলেও, তা অপ্রাকৃত।

আসলে ভগবান হলেন প্রাকৃত সমস্ত বিপরীতের সমন্বয়, তিনি অণু হতে ক্ষুদ্র, মহৎ হতেও মহান (**অনোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্**), তিনি জন্মরহিত হয়েও পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন (**অজায়মানো বহুধা বিজায়তে**)। শ্রীভগবানের নাভিকমল হতে ব্রহ্মার জন্ম হয় আবার ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হতে শ্রীভগবান বরাহ মূর্তিতে অবতীর্ণ হন। শ্রীভগবানের লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি আবার তিনি ব্যষ্টিরূপে সমস্ত জীবে বিরাজমান হন। শ্রীভগবান তাই ভক্তচূড়ামণি মুচুকুন্দকে বলছেন—

জন্মকর্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ।
ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি॥

(ভাগবত ১০।৫১।৩৭)

আমার জন্ম, লীলা ও নাম অনন্ত তাই আমিও তা সংখ্যায় গণনা করতে অক্ষম।

আবার প্রাকৃত বস্তুর গুণ, কর্ম, নামাদি সেই সেই প্রাকৃত বস্তু হতে পৃথক হয় কিন্তু শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম, নামাদি অপ্রাকৃত ও শ্রীভগবানের স্বরূপ হতে পৃথক নয়। পদ্মপুরাণ বলছেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণং শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণনাম, চিন্তামণি, চৈতন্যরসমূর্তি—এ সকল পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত কৃষ্ণেরই স্বরূপ। সুতরাং কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কোনোই ভেদ নেই। তাই শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁর নাম-গুণাদিও সচ্চিদানন্দ এবং জড়বুদ্ধির অগোচর।

ব্রহ্মাদি দেবগণ তাই পরের শ্লোকার্ধে (৩৬) বলছেন— **'ন নামরূপে গুণকর্ম-জন্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ'** অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তি প্রকাশ হলে তাঁর রূপ, গুণ, লীলাদিও প্রকাশ পায় কিন্তু তাতেও শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বানুভব হয় না। কারণ তিনি হলেন **'মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো'** অর্থাৎ শ্রীভগবান মন বাক্যের অগোচর। তাহলে জীবগণের সংসার মুক্তির উপায় কী ? ব্রহ্মাদি দেবগণ তাই আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলছেন—শ্রীভগবানের তত্ত্ব সর্বদা অজ্ঞেয় হলেও জীবের সংসার মোচনের পথ অবরুদ্ধ নয়, কারণ শ্রীভগবান তাঁর স্বরূপের অজ্ঞেয়তার মধ্যেও জীবের সংসার মুক্তির জন্য কৃপার কপাট খুলে রেখেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ বললেন—**'দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি'** অর্থাৎ যদিও আপনার তত্ত্ব সর্বদা অজ্ঞেয়, তথাপি আপনার ভক্তগণ **'ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্তি'** (আপনার লীলার শ্রবণ, আপনার নাম কীর্তনাদি দ্বারা) ভক্তিযোগে আপনার সাক্ষাৎলাভ করেন।

গীতায়ও ভগবান বলেছেন—**'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চামি তত্ত্বতঃ'** হে অর্জুন ! আমার ভক্তগণ ভক্তিযোগে আমাকে সর্বপ্রকারে জানতে পারেন এবং আমার তত্ত্বানুভব করতে পারেন।

শ্রীভগবান অভক্তের অভিমান-বিজড়িত বুদ্ধির অজ্ঞেয় হলেও তিনি ভক্তের ভক্তি-পরিভাবিত বুদ্ধির গোচর। অভিমানের ঘনান্ধকারে শ্রীভগবানের

স্বরূপ অদৃশ্য হলেও ভক্তের ভাবদর্পণে তাহা চির-পরিস্ফুট। শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি শ্রবণ, কীর্তন, তাঁর চরণার্চণ, 'আমি তাঁহার দাস' ইত্যাদি চিন্তা এইরূপ ভক্ত্যাঙ্গ যাজনে 'জীবের সংসার নিবৃত্তি' এবং 'শ্রীভগবানের স্বরূপানুভূতি' হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অজামিল উপাখ্যানে যমদূতদের শ্রীভগবান মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বিষ্ণুদূতগণ বলছেন—

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্‌ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥
সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥

(ভাগবত ৬।২।৯-১০)

অর্থাৎ পরদ্রব্যাপহারী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহত্যাকারী, বিমাতা, গুরুপত্নী হরণকারী, স্ত্রী-হত্যা, রাজহত্যা, মিত্রহত্যা ও গোহত্যাকারী প্রভৃতি যে কোনো প্রকার মহাপাপীই হোক না কেন, এর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হল শ্রীভগবানের নাম কীর্তন। কেননা যাঁর মুখে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারিত হয়, শ্রীভগবান তাঁকে নিজের বলে মনে করেন এবং সর্বদা তাঁকে সর্ববিধ বিপদ হতে রক্ষা করেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ তাই বলছেন—**'ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে'** (ভাগবত ১০।২।৩৭) অর্থাৎ আপনার শ্রীপাদ সেবনকারী ভক্তরা অচিরাৎ মুক্তিলাভ করে। তবে ভক্তিসাধনার প্রারম্ভেই কারও সংসার-ভোগ নিবৃত্তি হয় না। সংসার-সাগরে পতিত হয়েও কেউ যদি শ্রীগোবিন্দনাম-কীর্তনাদি করতে থাকে, তা হলেই তার সংসার নিবৃত্তি হয়। শ্রবণ-কীর্তনাদি যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠানেই প্রেম লাভ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলছেন—

সাধু সঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥

সকল সাধন সার এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অথচ দেখা যায় বহুতর নাম-কীর্তন করেও এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রবণ করেও প্রেমলাভ করা তো দূরের কথা, সামান্য দেহ দৈহাদিক বস্তুতেও অনেকের আসক্তিনাশ হতে দেখা যায় না। এর কারণরূপে বলা যায়, অনাদি সঞ্চিত নানা অপরাধের ফলে প্রেমপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা ঘটে ও নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তনাদি করতে করতে সেই অপরাধ দূর হয়ে গেলে তবেই ভক্তির ফল—প্রেম প্রকাশ পায়। কিন্তু অপরাধের তারতম্যবশত কারও বহুদিনে, কারও বা অল্পদিনে নিরন্তর নাম-কীর্তনে সেই অপরাধ মোচন হয়। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলছেন—

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করয়ে প্রকাশ॥
প্রেমের উদয় হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গলদশ্রুধার॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লহে বহু বারা।
তবু যদি প্রেম নহে—নহে অশ্রুধারা॥
তবে জানি অপরাধ আছয় প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাঁহ না অঙ্কুর॥

———○———

ভগবানের অবতারের কারণ বর্ণনা এবং প্রণাম ও দেবগণের প্রস্থান (শ্লোক ৩৮-৪১)

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো
ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎ পদকৈঃ সুশোভনৈ-
র্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাং চ তবানুকম্পিতাম্॥ ৩৮

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া
কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি॥ ৩৯

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনং চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদুত্তম বন্দনং তে॥ ৪০

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমা-
নংশেন সাক্ষাদ্ ভগবান্ ভবায় নঃ।
মা ভূদ্ ভয়ং ভোজপতের্মুমূর্ষো-
র্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ॥ ৪১

সরলার্থ—সর্বদুঃখহারী হে ভগবন্! আপনিই সকলের প্রভু। এই পৃথিবী যা প্রকৃতপক্ষে আপনারই চরণকমলস্বরূপ, তার মহাসৌভাগ্যবশে তারই বুকে এখন আপনি অবতীর্ণ হওয়ায় তার ভার অপনীত হল। আমাদেরও সৌভাগ্যের অন্ত নেই, কারণ আমরা এবার এই পৃথিবীর মাটিকে আপনার (ধ্বজ-ব্রজাঙ্কুশাদি) মঙ্গললক্ষণযুক্ত পদচিহ্নে অঙ্কিত দেখব এবং সেই সঙ্গে স্বর্গলোককেও আপনার করুণালাভে ধন্য হতে দেখব॥ ৩৮ ॥ হে প্রভু, আপনি জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও আপনার এরূপ জন্মপরিগ্রহের কারণ একমাত্র লীলা-বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নয় বলেই আমরা মনে করি, কারণ আপনি

সকলের অভয় আশ্রয়, দ্বৈতভাব লেশবর্জিত সর্বাধিষ্ঠানস্বরূপ এবং এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় অবিদ্যার প্রভাবে আপনাতে আরোপিত হয় মাত্র ॥ ৩৯ ॥ প্রভু ! আপনি পূর্বেও বহুবার মৎস্য, হয়গ্রীব, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য (রাম), বিপ্র (পরশুরাম), বিবুধ (বামন) প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের তথা ত্রিভুবনের রক্ষাবিধান করেছেন, সেইরূপ এইবারও আপনি পৃথিবীর ভার হরণ করুন। হে যদুকুলতিলক, আপনাকে প্রণাম॥ ৪০ ॥ (দেবকীকে সম্বোধন করে) হে মাতঃ ! অশেষ সৌভাগ্যবশে আমাদের সকলের কল্যাণের জন্য সাক্ষাৎ পরমপুরুষ শ্রীভগবান সর্বকলায় পরিপূর্ণরূপে আপনার গর্ভে আগমন করেছেন। আপনি কংসের ভয়ে বিচলিত হবেন না। তার মৃত্যু সন্নিকট। আপনার এই পুত্র যদুবংশীয়দের রক্ষা করবে॥ ৪১ ॥

মূলভাব—অবতারগ্রহণ ব্রহ্মাণ্ডের কৃতার্থতার জন্যই—ব্রহ্মাদি দেবগণ পূর্ব পূর্ব শ্লোকে ভক্তিমাহাত্ম্য বর্ণনা করে বর্তমান প্রকরণে শ্রীভগবানের অবতরণে ব্রহ্মাণ্ডের কৃতার্থতা বর্ণনা করে বলছেন—

'ঈশিতুঃ তব জন্মনা ভবতঃ পদঃ ভুবঃ ভার অপনীতঃ' হে সর্বদুঃখহর ! হে হরে ! আপনি দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, এতেই আপনার চরণরূপা পৃথিবীর ভার দূর হয়েছে। শ্রীভগবান ঈশিতা অর্থাৎ সর্বেশ্বর ! প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্তই তাঁর বশীভূত। তাঁর ইচ্ছাতেই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকা, নক্ষত্রাদি নিজ নিজ কক্ষপথে অবস্থান করে জগৎকার্য পরিচালনা করে। তাঁর ইচ্ছাতেই নদ-নদী প্রবাহিত, তাঁরই ইচ্ছাতেই ভূধররাজি অচল অবস্থায় স্থিত, আর তাঁরই ইচ্ছায় অসুরগণ পৃথিবীতে নানা অত্যাচার করে পৃথিবীর ভার-স্বরূপ হয়েছেন। আবার তাঁর ইচ্ছাতেই পৃথিবীর ভার অপনোদন হতে পারে। কেবল পৃথিবীর ভার হরণই নয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ বলছেন— **'দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈর্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্'** (ভাগবত ১০।২।৩৮) অর্থাৎ আমরা আপনার পরম সুন্দর চরণ-চিহ্নে পরমানুগৃহীত পৃথিবী এবং স্বর্গকে দেখে কৃতার্থ হব। আবার শ্রীভগবান পৃথিবীতে লীলা করে অপ্রকট হলেও তাঁর সেই লীলাকথা শ্রবণ-কীর্তনাদি করে পরবর্তীকালের

জীবগণও কৃতকৃতার্থ হবেন।

লীলাবতারের কারণ—কিন্তু তিনি এইরূপ লীলা করেন কেন ? তিনি আপ্তকাম, সুতরাং তাঁর কোনও প্রয়োজন সম্ভবপর নয়। ব্রহ্মসূত্র বলেছেন—**'লোকবত্তুলীলা কৈবল্যং'** (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৪) অর্থাৎ শ্রীভগবানের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও তিনি জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি লীলা করে থাকেন।

শ্রীভগবানের সকল লীলা দুইভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে। শ্রীভগবান তাঁর নিত্যধামে নিত্যপার্ষদ গো, গোপ, গোপী প্রভৃতি নিয়ে তাঁর স্বরূপ শক্তির সাহায্যে নিত্য-লীলা-রসাস্বাদন করেন, তাঁর এ লীলার সঙ্গে জগতের তাঁর কৃত লীলার কোনো সম্বন্ধই নেই, এ অপ্রকট লীলা তাঁর প্রপঞ্চাতীত ধামেই হয়ে থাকে।

আবার মধ্যে মধ্যে জগতের জীবকে কৃতার্থ করার জন্য তাঁর এই লীলা ব্রহ্মাণ্ডেও করেন। এই লীলা তাঁর শক্তি আশ্রয় করেই প্রকটিত হয়। শ্রীভগবানের এই দ্বিবিধ লীলার মধ্যে মায়াশক্তি সহকৃত কৃষ্ণলীলাকে বলে বহিরঙ্গা লীলা ও স্বরূপ শক্তি সহকৃত লীলাকে বলে অন্তরঙ্গ লীলা।

শ্রীভগবান জন্মরহিত হয়েও যে স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন, এটি তাঁর অচিন্ত্য শক্তির বলেই হয়। ইহা যে শ্রীভগবানের লীলা ব্যতীত আর কিছু নয় তা জানাবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ বলেছেন—**'তব ভবস্য কারণং বিনোদং বিনা না তর্কয়ামহে'** অর্থাৎ আপনার জন্মের লীলা ব্যতীত যে কোনো কারণ আছে, তা আমরা কোনো তর্ক-যুক্তিতেই বুঝতে পারি না। শ্রীভগবান স্বয়ং 'অভব' অর্থাৎ জন্মরহিত। যাঁর চরণে শরণাগত হলে জীবেরও বন্ধন মোচন হয়ে যায় তাঁর কোনো প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই জগতে আগমন সম্ভব নহে। ব্রহ্মাদি দেবগণ আরো বলেছেন —**'ভবনিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি'** (ভাগবত ১০।২।৩৯)। তিনি অভয়াশ্রয়, নিত্যমুক্ত। তাঁর জন্মের কোনো কারণ তো নেইই, বরঞ্চ তাঁর স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব(অবিদ্যা)বশতই জীবের জন্ম-মরণাদি ঘটে থাকে যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁরাও জন্ম-মরণমুক্ত।

অনাদি বহির্মুখতাবশত বিভু চৈতন্য-শ্রীভগবানের সম্বন্ধ ভুলে অল্প

চৈতন্য-জীব পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর কবলগ্রস্ত হয়। আর এই অনাদি বহির্মুখতাই জন্ম-মৃত্যুর হেতু। শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনানুষ্ঠানে জীবের বহির্মুখতার নিবৃত্তি হলেই, জীব জন্ম-মৃত্যুর অতীত হয়ে যায়। সুতরাং যে ভগবানের চরণাশ্রয়ে জীবেরও জন্ম-মৃত্যু নিবারণ হয়, স্বয়ং তাঁর যে জন্ম-মৃত্যু নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি (মায়া) হতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় প্রভৃতি হয়ে থাকে। পৃথিবীর ভার হরণ পৃথিবী পালনেরই অন্তর্গত, সুতরাং সে জন্য স্বয়ং ভগবানের জগতে অবতীর্ণ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন—

স্বয়ং ভগবানের কার্য নহে ভূভারহরণ।
স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন॥

এই প্রকরণের পরের শ্লোকে ব্রহ্মাদি দেবগণ বলছেন— '**যথাধুনেশ ভাবং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে**।' অর্থাৎ হে ভগবন্ ! আমরা আর অধিক কী বলব, আপনি অন্তর্যামীরূপে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে হৃদয়ের সর্ববিধ ভাবই জানিতেছেন। আপনি সর্বজীবের হিতকারী। জীব তার দুঃখকাহিনী আপনাকে জানাক বা না জানাক, আপনিই তার কল্যাণার্থে যখন যা প্রয়োজন হয়, তখনই তাই করে থাকেন। হে ভগবন্ ! আমাদের আর কিছু বক্তব্য নেই। আপনার চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম। আপনি কৃপা করে অসুরগণ হতে আমাদের মুক্ত করুন, নচেৎ বারে বারে অসুরদের অত্যাচার আর সহ্য হয় না।

অন্তিমে দেবগণ শ্রীদেবকীকে বললেন—মাতঃ ! আমাদের কৃতার্থ করার জন্যই স্বয়ং ভগবান্ আপনার গর্ভগত হয়েছেন। অতএব মুমূর্ষু কংসকে আর কিছুমাত্র ভয় নেই, আপনার পুত্র ত্রিজগৎ পালন করবেন। অবশেষে '**বন্দং তে যদুত্তম**' বলে এবং কৃষ্ণকে পুনঃ বন্দনা করে দেবগণ ব্রহ্মা ও রুদ্রকে অগ্রে রেখে স্বর্গে গমন করলেন।

'ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দিবম্'।

———○———

যমলার্জুন বৃক্ষ উৎপাটন এবং নলকুবর ও মণিগ্রীবের শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি

(দশম স্কন্ধ, দশম অধ্যায়)

প্রাক্‌কথন

কৈলাশপতি রুদ্রের কিঙ্কর কুবেরের পুত্র হল নলকুবের ও মণিগ্রীব। তারা নবযৌবন, পিতৃধনের গৌরব, রুদ্রকিঙ্করতাজনিত প্রভুত্ব ও বিবেকহীনতার ফলে উদ্দাম হয়ে বিচরণ করতেন। ধনগর্ব ও প্রভুত্বগর্ব দ্বারা তারা কৈলাসকে তাদের বিলাস কাননরূপে পরিগণিত করার চেষ্টা করতেন। একদিন কুবেরের গুণধর পুত্রদ্বয় বারুণী মদিরা (অসীম মাদকতাসম্পন্ন মদিরা, দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে উদ্ভূত) পানে উন্মত্ত হয়ে স্বর্গীয় অপ্সরাগণের সঙ্গে পুষ্পকাননে বিচরণ করতে করতে কৈলাসগঙ্গায় জলবিহার করতে প্রবেশ করলেন। সেই সময় দেবর্ষি নারদ হরিলীলা গান করতে করতে আত্মহারা হয়ে গঙ্গাতীর ধরে ওই পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। নারদের কণ্ঠে হরিধ্বনি শ্রবণ করে সঙ্গিনী অপ্সরাগণ ভয়ে ভীত এবং অবগুণ্ঠনাবৃত হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। কিন্তু কুমারদ্বয় এসবে বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে উদ্দাম জলক্রীড়ারত অবস্থাতেই এবং বিবস্ত্র বেশে, জলতীরে উঠে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে চিৎকার করে অপ্সরাগণকে আহ্বান করতে লাগলেন।

নারদ ঋষি দেখলেন, শিবভক্ত চূড়ামণি কুবেরের পুত্রদ্বয় তাদের ধনমদের মত্ততার সঙ্গে মদিরাপানের মত্ততা মিলিয়ে এক মহামত্তরূপে সমস্ত বিবেক হারিয়ে পশুরও অধম হয়ে পড়েছে। তারা দেবযোনিজাত হয়েও দেবোচিত ব্যবহার হতে চ্যুত হয়ে পড়েছে। নারদ বুঝলেন একমাত্র ধনগর্বই তাদের এই পতনের মূল কারণ আর এই ধনগর্বই তাদের মদিরাপান, স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি আর মহাদেব অবমাননা ইত্যাদি বহুবিধ পাপকার্যে প্রবৃত্তি জাগিয়েছে।

ভক্তচূড়ামণিগণের হৃদয় স্বভাবতই পরানুগ্রহকাতর। তাঁরা কাউকে দণ্ড দিয়ে, কাউকেও বা ভালোবেসে অনুগ্রহ সঞ্চার করে থাকেন। তাই কুবের পুত্রদ্বয়ের এই দুর্নীতিপরায়ণতা ও দুর্ব্যবহার দেখে পরমভাগবত নারদঋষির

হৃদয়ে ক্রোধ বা ক্ষোভ কিছুরই সঞ্চার হল না। ভক্তহৃদয়ে জাগতিক সম্মান বা অপমানের লেশগন্ধও স্পর্শ করতে পারে না, তাঁরা সর্বদাই জীবের হিতাচারণের জন্য ব্যাকুল থাকেন।

কুবের পুত্রদ্বয় বহির্মুখ শিরোমণি হয়ে পড়েছে দেখে নারদের অনুগ্রহকাতর হৃদয় অনুগ্রহের প্রেরণায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, তিনি কেমন করে অনুগ্রহ করবেন সেই চিন্তা করতে লাগলেন। এই প্রসঙ্গে নারদ ঋষি ধনমদের দোষ-কীর্তন সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলেছেন তা বিষয়-আকৃষ্ট জীবের পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী স্বরূপ। পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব তাই দেবর্ষি নারদের এই চিন্তা মহারাজ পরীক্ষিতের রাজসভায় বর্ণনা করে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন।

ঐশ্বর্যমদে পতন—ধনমদ, সৎকুলে-জন্মজনিত মদ আর বিদ্যামদ ভেদে মদ ত্রিবিধ '**বিদ্যামদো ধনমদস্তথা চাভিজনো মদঃ। মদ এতৈরলিপ্তানাং ত এব চ সতাং দমাঃ॥**' (বৈষ্ণবতোষণী) অর্থাৎ বিদ্যা, ধন বা উচ্চকুলে জন্ম—ত্রিবিধ-ভাবে এই মদ সঞ্চার হয়ে থাকে। আর কোনো ব্যক্তি যদি এই ত্রিবিধ মদে লিপ্ত না হয় তবে তা 'দমরূপে' আত্মপ্রকাশ করে।

দম শব্দের অর্থ 'ইন্দ্রিয় সংযম' ('**শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযম**')। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান উদ্ধবকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে—আমাতে বুদ্ধি স্থাপনের নাম 'শম' আর বিষয় হতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহর নাম 'দম'। এই ত্রিবিধ মদের মধ্যে 'ধনমদই' প্রধান। ধনমদ যেভাবে জীবের অনিষ্ট করে, সেরকম আর কোনো মদই পারে না। জগতে যতকিছু কুকর্ম সাধিত হয় তা সমস্তই একমাত্র ধনগর্বের পরিণাম। ধনহীন ব্যক্তির যদি কোনো কুপ্রবৃত্তিও থাকে তাহলেও তা ধনাভাবে ফলবতী হতে পারে না। কিন্তু ধনগর্বিত ব্যক্তির শত সহস্র সৎপ্রবৃত্তি থাকলেও তা ক্রমশ কুপ্রবৃত্তি ও কুক্রিয়ায় পরিণত হয়ে যায়। ধনগর্বের মতো মানবের আর দ্বিতীয় শত্রু নেই। কেননা ধনমদে অন্ধ হয়ে তারা দেহের অভিমানকেই জীবনের সার-সর্বস্ব বলে মনে করে।

দারিদ্র্যতাই ভবভয় ভঞ্জন—

ধনগর্বীদের কথা বলে, দেবর্ষি নারদ এরপর বলছেন দারিদ্র্যের মতো মানবের অকৃত্রিম বন্ধু আর কিছু নেই।

অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনম্।
আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে॥

(ভাগবত ১০।১০।১৩)

দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াঽপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ॥

(ভাগবত ১০।১০।১৫)

অর্থাৎ একমাত্র দরিদ্রতাই ধনমদান্ধ দুরাত্মা ব্যক্তিগণের অন্ধতা নিবারক মহৌষধ। এ সংসারে দরিদ্র ব্যক্তির কোনো প্রকার অহংকারই থাকে না। তাদের বিদ্যামদ বা কুলমদও জন্মাতে পারে না। তারা দারিদ্র্যবশত নিজের ও স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণের জন্য যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তাতেই তাদের শ্রেষ্ঠ তপস্যা হয়ে যায়। যে অভিমান বর্জনের জন্য সাধকের তীব্র তপশ্চারণ করতে হয়, দরিদ্রের সেই অভিমান আপনা-আপনিই নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং তপস্বিগণের বহু ক্লেশসাধ্য তপস্যার ফলে অর্জিত অভিমান-বর্জন দরিদ্রগণ অনায়াসেই লাভ করতে পারে। তাই ধনগর্বের দোষ আর দরিদ্রতার মহদ্গুণ বিচার করলে মনে হয়, জগতে যারা দরিদ্র তারা পরমসুখী, নিষ্পাপ ও ভগবানের কৃপার পাত্র।

তাই ভগবান বলেছেন—

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥

(ভাগবত ১০।৮৮।৮)

অর্থাৎ আমি যাকে কৃপা করি, ক্রমে ক্রমে তার ধন হরণ করে তাকে দরিদ্র করে দিই। তারপর স্বজনগণ স্বতঃই ধনবিহীন ও দুঃখপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে থাকে। (এইরূপে আমার ভক্তের ভজনবাধা যেমন ধন, সম্পদ, প্রতিপত্তি, স্বজনে আসক্তিরূপ বাধা দূর হয়)।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্ত এই মহাবাক্যের দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে দরিদ্রতাই ভগবানের অনুগ্রহ গ্রহণের উপযুক্ত ভিক্ষাপাত্র। আর দারিদ্রতা কেবল 'অভিমান বর্জন'রূপেই ভগবৎকৃপা বহন করে না, তা সাক্ষাৎ 'মহৎকৃপা'রূপেও ভগবৎ কৃপা নিয়ে আসে।

দেবর্ষি নারদ সেই ইঙ্গিত করে বলেছেন—

দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
সদ্ভিঃ ক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরদ্বিশুদ্ধ্যতি॥
সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিনাম্।
উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ॥

(ভাগবত ১০।১০।১৭-১৮)

অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তিগণ সমদর্শী সাধুগণের সঙ্গলাভ করতে পারে। আর এই সৎসঙ্গবশত তাদের সর্ববিধ বিষয়তৃষ্ণা নিবারিত হয় আর অল্পকাল মধ্যেই তারা বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে ওঠে। অন্যপক্ষে আবার সর্বত্র সমজ্ঞানসম্পন্ন গোবিন্দচরণাভিলাষী নিষ্কাম ভক্তদের ওই প্রকার ধনগর্বিত, পরম বহির্মুখ, নানা অসৎসঙ্গরত ও সর্বদা বর্জনীয় (উপেক্ষণীয়) ব্যক্তির সঙ্গের কিই বা প্রয়োজন থাকতে পারে। তাই ধনগর্বিত লোকেরা কখনোই সত্যিকারের সাধুসঙ্গ লাভ করেন না। কিন্তু যেসব সাধুবেশধারী ঐকান্তিক ভক্ত নয়, যারা সাধুর ভাব বা আচার গ্রহণ করতে পারেনি অথচ বিষয়ভোগে রত ব্যক্তিদের সঙ্গ করে, তারা বিষয়ীদের বিষয়কূপ থেকে উদ্ধার তো করতে পারেই না, প্রত্যুত নিজেরাই বিষয়কূপে পতিত হয়। এই সমস্ত পতিত সাধুগণ কখনই দরিদ্রের ঘরে পদার্পণ করেন না কেননা ধনীগৃহে গমন ও বিশাল-বিশাল রাশির দানগ্রহণ ব্যতীত তাদের পক্ষে বিরাট বিরাট মঠ বা আখড়া চালান বা চিত্তাকর্ষক কার্যানুষ্ঠান করা কখনই সম্ভবপর নয়। সেইজন্য ধনমত্ত বিষয়ী ভোগীদের ভাগ্যে এইরূপ পতিত সাধুসঙ্গ প্রায়শই জুটে যায়। কিন্তু যে সব সাধুসঙ্গ করলে প্রকৃত সাধনপথের নির্দেশ পাওয়া যায় ও চিত্তশুদ্ধি ঘটে, সেই আড়ম্বরবিহীন নিষ্কিঞ্চন সাধুগণকে কখনই বিষয়াসক্ত মদগর্বীদের মনে ধরে না তাই ওইরূপ সাধুদের সঙ্গে তাদের মিলনও হয় না। অবশ্য যদি কখনো ধনবান

ব্যক্তিরও শ্রীগোবিন্দচরণ ভজন-বাসনা জেগে ওঠে তবে তাঁরা নিষ্কিঞ্চন, নিরপেক্ষ ও সাধনানুষ্ঠানরত সাধুগণের সঙ্গলাভের জন্য অক্লেশে বিষয়সম্পত্তি পরিত্যাগ করেন তাহলে তখনই তাঁরা মহৎকৃপা লাভ করেন।

পাঁচশো বছর পূর্বে রাজমন্ত্রী রূপ ও সনাতন, রাজপুত্র রঘুনাথ দাস ও নরোত্তম দাস এইরূপে বিষয়ভোগ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের জীবন ছিল—

এক এক বৃক্ষতলে একদিন বাস। কভু চানা চর্বণ কভু উপবাস॥

(শ্রীশ্রীচতন্যচরিতামৃত)

এঁরা এইপ্রকার মহাব্রত অবলম্বন করে প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। যাইহোক সাধনানুষ্ঠানরত ও আড়ম্বরবিহীন সাধুগণের দৃষ্টিতে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য থাকে না।

মহান্ত স্বভাব হয় তারিতে পামর। নিজ কার্য নাহি তবু যান পর ঘর॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

কিন্তু ধনী ব্যক্তিদের এমনই দুর্ভাগ্য যে উপেক্ষাবশতঃ তারা এই অতি উচ্চমার্গের সাধুসঙ্গলাভে বঞ্চিত হন। কিন্তু অভিমানশূন্য দরিদ্রগণ তাঁদের দরিদ্রতার কারণেই এই সমস্ত সাধুদের সঙ্গলাভ করেন এবং ক্রমে তাঁদের অন্তরের সঞ্চিত অর্থ-লালসা এবং ধনীর অনুকরণে জাত ভোগবাসনা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয়। অতএব ধনান্ধতাই জীবের মহাশত্রু এবং দরিদ্রতাই তাদের অকৃত্রিম বন্ধু।

এত সব কথা বিবেচনা করে দেবর্ষি নারদ 'নলকুবর' ও 'মণিগ্রীব' ভ্রাতাদ্বয়ের ধনমদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে কৃতসংকল্প হলেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ভক্তগণের স্বভাবই এই যে তাঁরা কারও দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, কিংবা কারও দোষ গ্রহণ করেন না যেহেতু তাঁরা স্বভাবতঃই অদোষদর্শী। কিন্তু যদি কখনো এই মহাত্মাগণের কারো দোষের প্রতি লক্ষ্য হয় তবে তা আর দোষ থাকে না, কেননা সেই ভক্তচূড়ামণিগণ শাপ প্রদান করেই হোক বা অনুগ্রহ করেই হোক তাদের সেই দোষ-ক্ষালন করে থাকেন।

নারদ ঋষি মনে করলেন যে নলকুবর ও মণিগ্রীবের ধনমদমত্তা চরমে

উঠেছে, তাতে তাদের বৃক্ষজনিত দরিদ্রতা ভিন্ন সংশোধনের আর কোনো উপায় দেখি না। আবার যদি দণ্ডভোগের সময় তাদের অপরাধের কথা মনে না থাকে তাহলে অপরাধীর স্বভাব সংশোধন হয় না।

এই চিন্তা করে নারদ ঋষি তাঁদের শাপ প্রদান করলেন—

অতোঽর্হতঃ স্থাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ।
স্মৃতিঃ স্যান্মৎ প্রসাদেন তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ॥
বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধা দিব্যশরচ্ছতে।
বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তি ভবিষ্যতঃ॥

(শ্রীভাগবত ১০।১০।২১-২২)

অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ বললেন—ইহারা নিজ কর্মদোষে আমার শাপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হোক। এই প্রকার দণ্ডভোগ করলে এদের ধনমদ হবে না। এরা বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হলেও আমার অনুগ্রহে এদের এই জন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত সর্বদাই স্মরণে থাকবে। আর এইভাবে দেবপরিমাণ শত বৎসর অতীত হলে এরা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করবে এবং পুনরায় দেবদেহ লাভ করে শ্রীগোবিন্দচরণে ভক্তি লাভে রত হবে।

এই অভিশাপ প্রদানপূর্বক পরম ভাগবতোত্তম দেবর্ষি নারদ বদরিকাশ্রমে চলে গেলেন এবং নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে কুবেরের পুত্রদ্বয় তদবধি দুটি অর্জুন বৃক্ষরূপে বৃন্দাবনে (নন্দগোপ প্রাঙ্গণে) অবস্থান করতে লাগলেন।

যথা সময়ে অষ্টবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হল বৃন্দাবনে। একদিন মাতা যশোদার দামবন্ধনের সময় শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন—

দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ।
তৎ তথা সাধয়িস্যামি যদ্ গীতং তন্মহাত্মনা॥

(ভাগবত ১০।১০।২৫)

অর্থাৎ ভগবান ভাবছেন—দেবর্ষি নারদ আমার প্রিয়তম ভক্ত। অতএব তিনি যেভাবে ভেবেছেন, যা বলেছেন সেইভাবেই এই বৃক্ষরূপী কুবের পুত্রদ্বয়কে বৃক্ষত্ব হতে মুক্ত করে পরম ভক্তিমানরূপে পরিণত করব।

মা যশোদার বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ দামোদর একটি ভারী উদূখলের সঙ্গে আবদ্ধ। তিনি হামাগুড়ি দিয়ে দেবপরিমাণে শতবৎসরের প্রাচীন অর্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে উদূখলটি অর্জুনগাছের কাণ্ডে আটকে গেল। শ্রীকৃষ্ণ এগোবার জন্য ততোধিক বলপ্রয়োগ করলে বৃক্ষদ্বয় মড় মড় করে সবলে উৎপাটিত হয়ে পড়ে গেল।

তখন কী হল, এই দুই অর্জুন-বৃক্ষের মধ্যে থেকে দশদিক আলোকিত করে নলকুবর ও মণিগ্রীব নির্গত হয়ে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হলেন। তাদের যে সমস্ত দুর্বাসনা, কুপ্রবৃত্তি ছিল তা নারদের শাপেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর জন্মান্তরীণ কুকর্মের স্মৃতিও মহাঅনুতাপ বহ্নিতে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শনে ও তাঁর চরণে শরণাগতির ফলে নলকুবের ও মণিগ্রীবের হৃদয় একেবারে পরমপবিত্র হয়ে গেল। তাঁরা কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণকৃপা সমুখিত চিত্তে, প্রেমে বিভোর হয়ে কৃষ্ণের মহিমা গানে প্রবৃত্ত সম্বন্ধিত হলেন।

নলকুবর ও মণিগ্রীবের শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি
দশম স্কন্ধ, দশম অধ্যায় (২৯—৪২)

কুবের পুত্রদ্বয়ের স্তুতি তিন প্রকরণে বিভক্ত—

ভগবানের মহিমা কীর্তন	শ্লোক ২৯-৩৪
ভগবানের দাস্যভাব লাভের জন্য আকুতি	শ্লোক ৩৫-৩৮
ভগবানের বরপ্রদান	শ্লোক ৩৯-৪২

ভগবানের মহিমা কীর্তন (২৯—৩৪)

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণো বিদুঃ॥ ২৯
ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ৩০
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।

ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ॥ ৩১
গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
কোন্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্‌সিদ্ধং গুণসংশ্রিতঃ॥ ৩২

তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ॥ ৩৩
যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসংগতৈঃ ॥ ৩৪

সরলার্থ—কুবের পুত্রদ্বয় স্তুতি করে বলছেন—হে কৃষ্ণ, সর্বভূতের, সর্বলোকের অনিবার্য আকর্ষণ কর্তা হে পরমযোগী ভগবান ! আপনি প্রকৃতির অতীত আদিপুরুষ, পুরুষোত্তম। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ জানেন যে, এই ব্যক্ত এবং অব্যক্তস্বরূপ সমগ্র জগৎ আপনারই রূপ॥ ২৯ ॥ সকল প্রাণীর দেহ, প্রাণ, অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের অধিপতি আপনিই, আপনিই সর্বশক্তিমান কাল, সর্বব্যাপক অবিনাশী পরমেশ্বর॥ ৩০ ॥ আপনিই মহত্তত্ত্ব, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণাত্মিকা পরম সূক্ষ্ম প্রকৃতিও আপনিই। সকল প্রকার স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের কর্ম, ভাব, ধর্ম এবং সত্তার জ্ঞাতা, সর্বসাক্ষী পরমাত্মাও আপনি॥ ৩১ ॥ প্রকৃতির গুণ এবং বিকারসমূহ যেগুলিকে তাদের বৃত্তির দ্বারা গ্রহণ (জ্ঞানের বিষয়ীভূত) করা যায় তাদের দ্বারা আপনি গৃহীত হন না। স্থূল অথবা সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা আবৃত (অর্থাৎ শরীরধারী) এমন কোন্ পুরুষ আছে, যে আপনাকে জানতে পারে ? কারণ আপনি তো তাদের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, অনাদি স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব-স্বরূপ॥ ৩২ ॥ সর্বপ্রপঞ্চের বিধাতা ভগবান বাসুদেবকে আমরা প্রণাম করি। প্রভু, আপনি আপনার থেকেই প্রকাশিত গুণসমূহের দ্বারা নিজের মহিমা আবৃত করে রেখেছেন। পরব্রহ্মস্বরূপ হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ! আপনাকে পুনরায় নমস্কার॥ ৩৩ ॥ প্রভু, আপনার প্রাকৃত শরীর থাকা সম্ভবই নয়। তথাপি যখন সাধারণ শরীরধারীদের পক্ষে অসম্ভব এবং সর্বদা অতুলনীয় কোনো মহাপরাক্রম একটি শরীরকে আশ্রয় করে আপনি প্রকাশিত হন, তখন তার দ্বারাই সেই শরীরে আপনার

অবতারত্বের সূচনা লাভ করা যায় (জানা যায় যে, সেই শরীরকে আশ্রয় করে আপনিই অবতীর্ণ)॥ ৩৪ ॥

মূলভাব—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট নলকুবর ও মণিগ্রীবের স্তুতি বর্ণনা প্রসঙ্গে '**কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্**' বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে দুবার 'কৃষ্ণ' বলার অর্থ শ্রীশুকদেব তাদের অনন্ত বারের কৃষ্ণ নামের ইঙ্গিত করেছেন। কৃষ্ণ নামে বিভোর হয়ে ক্রমে কুমারদ্বয় যখন প্রকৃতিস্থ হলেন তখন তাঁরা ভগবানের মহিমা প্রসঙ্গে বলছেন— ভগবান '**ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ**' অর্থাৎ আপনি সকলের 'আদি', আপনি অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি-নিকেতন।

শ্রীধরস্বামী উদ্ধৃত সাত্বত সংহিতায় আছে—

বিষ্ণোস্তু ত্রীনি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্ব মহতঃ শ্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং তন্তসংস্থিত॥
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাতা প্রমুচ্যতে।

অর্থাৎ ভগবান ত্রিবিধ পুরুষরূপে প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্যরূপ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়ে জগতের সৃজন ও পালন করে থাকেন। প্রথম পুরুষাবতার রূপে প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টি করেন—'**তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়ং**'। দ্বিতীয় অবতাররূপে প্রকৃতিসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি সম্পাদন করেন—'**তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ**'। তৃতীয় অবতাররূপে প্রতি জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে তাদের সর্বইন্দ্রিয় শক্তি পরিচালনা করেন—'**ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি**' (গীতা ১৮।৬১)।

হে ভগবন্! এই সমস্ত পুরুষাবতারগণ আপনারই অংশ, তাই আপনিই অবতারী, আপনিই পরঃপুরুষঃ অর্থাৎ পুরুষোত্তম। বেদার্থতত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ আপনাকেই জগতের একমাত্র মূলস্বরূপ রূপে প্রতিপাদন করেন। যমলার্জুনরূপী কুবের পুত্রদ্বয়ও ভগবানকে স্তুতি করে বলছেন—**ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং**। এখানে ব্যক্ত মানে স্থূল জগৎ আর অব্যক্ত মানে জগতের কারণ পঞ্চভূত, তার কারণ পঞ্চতন্মাত্র, তার কারণ মহত্তত্ত্ব আর তার কারণ এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি—কুবের পুত্রদ্বয় হাতজোড় করে বলছেন—হে ভগবন্! এ সমস্তই আপনার রূপ। আপনারই বহিরঙ্গা। প্রকৃতিরূপী মহাশক্তি

আপনাতেই বিলীনা থাকে আর যখন আপনি জগৎ রচনা করতে ইচ্ছা করেন, তখন আপনি তাতে দৃষ্টিপাত করলেই তা হতে ক্রমে ক্রমে মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে জগতের সৃষ্টি হয়। অতএব আপনিই হলেন জগতের মূল কারণ, আপনিই আদি।

যদি বলা হয় শাস্ত্রমতে **কাল** সব কার্যের নিমিত্ত, ত্রিবিধগুণময়ী **প্রকৃতি** সর্ব কার্যের উপাদান আর **পুরুষ** সর্বকার্যের নিয়ন্তা তবে ভগবানের কর্তৃত্ব কীভাবে সাধিত হয় ? তা খণ্ডন করার জন্য নলকুবর ও মণিগ্রীব বলেছেন— **'ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ'** (ভাগবত ১০।১০।৩০) অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধ কালের নিমিত্ততা, প্রকৃতির উপাদানতা এবং পুরুষের নিয়ন্তত্ব অস্বীকার না করেও বলা যায় কাল, প্রকৃতি ও স্বরূপ কেহই ভগবানের স্বরূপের বাইরে নয়। শ্রীভগবানের লীলা বা চেষ্টাই কাল। আর ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিও শ্রীভগবানের অংশবিশেষ। গীতাতেও শ্রীভগবান বলেছেন— **ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা॥** (গীতা ৭।৪) অর্থাৎ এই অষ্টবিধ প্রকৃতি তাঁরই অংশ। আবার তিনিই সকল পুরে অবস্থিত বলে তাঁকেই সকল শাস্ত্রে পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপে শ্রীভগবান কাল, প্রকৃতি ও পুরুষ এই তিনেরই অধ্যক্ষ অর্থাৎ নিয়ন্তা। শ্রীভগবানের অপার কৃপায় কুবের পুত্রদ্বয়ের হৃদয়ে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য মহৈশ্বর্য স্ফুরিত হয়ে বাক্যরূপে প্রকাশিত হল।

কিন্তু যদি এই সন্দেহ আসে যে, শ্রীভগবানই সর্বস্বরূপ— আকাশ, বাতাস, সাগর, ভূধর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ তাঁরই রূপ, স্ত্রী পুত্র পরিজন বিষয় বুদ্ধি দেহ গেহাদিও তাঁহারই মূর্তি, তবে তাদের সেবাতেই ভগবৎ-সেবা হয়, তাদের দেখলেই ভগবানকে দর্শন হয়, তবে আর সাধনার প্রয়োজন কী ? এই ভ্রান্ত ধারণা করার জন্য নলকুবর ও মণিগ্রীব **'গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো'** প্রভৃতি শ্লোকের অবতারণা করে বলেছেন—জগৎ যে শ্রীভগবানের রূপ তাতে কোনো সন্দেহই নেই, কিন্তু জগৎ দেখলেই ভগবানকে দেখা হয় না। জাগতিক জ্ঞানসম্পন্ন বহির্মুখ চূড়ামণিগণ ভগবানের রূপ দেখছি বলে জগৎ দেখে না —তারা শ্রীভগবানকে ভুলে, মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, অভিমান মত্ত হয়ে,

আত্মসেবার অনুকূল রূপেই জগৎ দেখে। শ্রীভগবান জগতের প্রতি বস্তুতে ছড়িয়ে বসে থাকলেও বহির্মুখ জীব সে দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত।

কঠোপনিষদে আছে—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎপরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ (কঠ ২।১।১)

অর্থাৎ শ্রীভগবান বহির্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়শক্তি বাইরের দিকেই রেখেছেন, সেইজন্য তারা বাইরের বস্তুই দেখে থাকে অন্তরের খবর পায় না। কিন্তু যারা শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হয়, শ্রীভগবান তাঁদের দৃষ্টি বহির্দৃষ্টি থেকে ফিরিয়ে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেন, তাতে তারা বাহিরের কথা ভুলে অন্তরে তাঁর রূপ দেখে কৃতার্থ হয়। কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধের সময়েও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—'**ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুসা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥**' অর্থাৎ হে অর্জুন! তোমার যে চক্ষু আছে তার দ্বারা তুমি আমাকে পাবে না। আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করছি, তার দ্বারা তুমি আমার বিরাট রূপ দর্শন করো।

কার্যকারণাত্মক জগৎ তাঁরই লীলা, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি, সর্বান্তর্যামী পুরুষ তাঁরই অংশ। তিনি জগতের সর্বত্র ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত—যা দেখা যায়, যা শোনা যায় বা যা অনুভব করা যায়, সর্বত্রই তাঁর সত্তা। তিনি নানাভাবে নানারূপে সর্বত্র অবস্থিত। কিন্তু জীবগণ তাঁকে দেখতে পায় না আর যা দেখে তা তিনি নন। জগৎ তাঁর রূপ হলেও, জগৎকে দেখলেই তাঁকে দেখা যায় না। তিনি জগৎরূপে সর্বদৃশ্য হলেও স্বরূপে অদৃশ্য। শ্রীভগবানের জগৎরূপ ও স্বরূপ উভয়ই মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্ত— উভয় জীবেরই অজ্ঞেয়। আবার শ্রুতিও বলেছেন — '**তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।**'[১] অর্থাৎ তাঁকে জানতে পারলেই সংসারমুক্তি হয়, এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। এইভাবে শাস্ত্র একদিকে বলছে ভগবানকে জানা যায় না আবার অন্যদিকে বলছে তাঁকে না জানলে সংসার মোচন হয় না।

---

[১](শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্৩।৮)

তাহলে সংসার বন্ধন মোচনের উপায় কী ? পরের শ্লোকে কুমারদ্বয় **'তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে'** বলে এই সন্দেহের মীমাংসা করেছেন। এই শ্লোকের বক্তব্য এই যে, কেউ কখনো আত্মশক্তিতে শ্রীভগবানের স্বরূপ জানতে পারে না। শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হলে তবে তাঁরই কৃপাশক্তিতে তাঁর স্বরূপ-জ্ঞানের স্বতঃপ্রকাশ হতে পারে। শ্লোকটির পরের অংশে তাঁরা বলছেন, ভগবান আপনি **'আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্নমহিমা'** অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছায় নিজের বহিরঙ্গাশক্তি মায়াকে নিজ হতে পৃথক করে এবং তার সত্তাদি ত্রিগুণ বিভাগে নিজেকে আচ্ছন্ন করে মায়ামুগ্ধ জীবের অদৃশ্যরূপে অবস্থান করেন। আবার কখনো আপনি আপনার ভক্তবাৎসল্য, প্রেমাধীনতা প্রভৃতি গুণে নিজেকে আচ্ছন্ন করে প্রেমবান ভক্তের প্রেমানুরূপে অবস্থান করেন।

সুতরাং আপনার স্বরূপানুসন্ধানের প্রয়াসের কোনো ফল নেই। আপনার চরণে শরণাগতিই একমাত্র গতি। আর আমরা এই শরণাগতি লাভের আশায় আপনার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করছি।

শ্রীভগবানকে জানা না গেলে নলকুবর ও মণিগ্রীব যশোদানন্দনকে ভগবান বলে চিনলেন কেমন করে ? তাই পরের চৌত্রিশতম শ্লোকে **'যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে'** প্রভৃতিতে শ্রীভগবানকে চিনবার উপায় নির্দেশ করেছেন।

শ্রীভগবান অশরীরী হলেও তাঁর মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি শ্রীবিগ্রহ দেখলে বা এই সমস্ত শ্রীবিগ্রহর কথা শুনলে সাধারণ শরীরীর সঙ্গে তাঁর কী যে পার্থক্য আছে তা বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে কিছুতেই ধারণা করা যায় না। এইভাবে শ্রীভগবান বহির্মুখ জীবের নিকট আত্মগোপন করতে পারলেও **'লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তগণ স্থানে'**। তাঁর চরণাশ্রিত ভক্তগণ তাঁর অবতারের অলৌকিক মহাপ্রভাব দেখেই তাঁকে ভগবান বলে চিনতে পারেন ও তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়েন। মায়ামুগ্ধ জীবের দৃষ্টিতে কিন্তু এই সমস্ত বিশেষত্ব স্থান পায় না। তারা শ্রীভগবানের অবতারে অলৌকিকতার দিকে দৃষ্টিপাত না করে লৌকিকতার অনুকরণ ধরে বৃথা টানাটানি করে নিজেকে নরকের দ্বারে ঠেলে দেন।

ভগবানের দাস্যভাব লাভের জন্য আকুতি
(৩৫—৩৮)

স ভবান্ সর্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ।
অবতীর্ণোঽংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্॥ ৩৫
নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বমঙ্গল।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ॥ ৩৬
অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচরকিঙ্করৌ।
দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ॥ ৩৭
বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥ ৩৮

সরলার্থ — প্রভু, সকলের সর্বমনোবাঞ্ছাপূরণকারী সেই আপনিই সম্প্রতি সর্বলোকের অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের জন্য সর্বশক্তিসমন্বিতরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ৩৫ ॥ পরম-কল্যাণ (সাধ্য) স্বরূপ! আপনাকে নমস্কার। পরমমঙ্গল (সাধন) স্বরূপ! আপনাকে নমস্কার। পরম শান্ত, সকলের হৃদয়ে বিরাজমান যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার॥ ৩৬ ॥ হে অনন্ত, আমরা আপনার দাসানুদাস। আপনি দয়া করে এই স্বীকৃতিটুকুই আমাদের দিন। আমাদের মতো দুরাচারে মত্ত পুরুষাধমদেরও যে আপনার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হল, তা একমাত্র পরমভাগবত দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহে॥ ৩৭ ॥ প্রভু! আমাদের বাণী আপনার গুণানুকীর্তনে, আমাদের কর্ণ আপনার কথা শ্রবণে, আমাদের হস্ত আপনার সেবা-কার্যে, আমাদের মন আপনার চরণ কমলের স্মরণে, আমাদের মস্তক আপনার নিবাসস্থান এই সর্বজগতের প্রতি প্রণতি নিবেদনে, আমাদের নয়ন আপনার প্রত্যক্ষ শরীর স্বরূপ সাধুপুরুষগণের দর্শনে সদাসর্বদা নিরত থাকুক॥ ৩৮ ॥

মূলভাব—নলকুবর ও মণিগ্রীব ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব শ্লোকে শ্রীভগবানের স্বরূপ ও

মহিমা বর্ণনা করতে সচেষ্ট হয়ে বর্তমান প্রকরণে ভগবানের কৃপা, তাঁর ভক্তের অনুগ্রহ বর্ণনা করে তাঁদের সাধনার পথে উত্তরণের প্রার্থনা করেছেন।

হে ভগবন্! আপনার ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমাধীনতার কোনো তুলনা নেই। যদিও আপনার মৎস্য কূর্মাদি লীলাবিগ্রহ প্রকাশ ভক্তবাৎসল্যেরই পরিচায়ক কিন্তু এবার অসুরমারণ, ভূভারহরণ ও ধর্মসংস্থাপনাদি লীলা আপনার অংশাবির্ভাব দ্বারা সম্পন্ন হবে না বলে আপনি পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য ও পূর্ণ মাধুর্য সম্ভার নিয়ে স্বয়ংরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ভূভার হরণ কার্য হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজে প্রেম দিতে।।

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

যেমন মেঘবর্ষণ হলে ভূতলের শীতলতা লাভের সাথে সাথে অনেক জীবও শীতল হয় এবং তাদের পিপাসা নিবৃত্তি হয়, সেইরকম তাঁর ব্রজলীলায় ব্রজপার্ষদের সেবাগ্রহণ করে ভগবান লীলামৃত বর্ষণ করলেও, তার সঙ্গে সঙ্গে জগতের ত্রিতাপদগ্ধ জীবগণও শীতল হয়ে যায় এবং তাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ হয়। আপনার লীলাগাথা ভক্তগণ কর্তৃক কীর্তিত হলে অনেকদিন পর্যন্তই তা ত্রিতাপ দগ্ধ জীবগণকে শীতল করে। আবার আপনার লীলাবিগ্রহ সেবা করেও অনেক জীবের মঙ্গললাভ হয়। এবার জগতের জীবের পরম সৌভাগ্য যে আপনি স্বয়ং পূর্ণ অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়ে লীলা প্রকাশ করেছেন, ফলে জীব অপ্রত্যাশিত মঙ্গললাভ করে কৃতার্থ হবে।

কৃষ্ণ অবতারের কথা বর্ণনা করতে করতে কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমাধীনতা স্ফূর্তি হওয়ায় নলকুবর ও মণিগ্রীব ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে মুহুর্মুহু প্রণাম করে বলতে লাগলেন—

'নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বমঙ্গল।' (ভাগবত ১০।১০।৩৬)

আপনি স্বয়ং পরম কল্যাণ স্বরূপ। আপনার মৎস্য কূর্মাদি অংশাবির্ভাবে অসুরগণের বিনাশসাধন হয়, সাধুগণ পরিচালিত হন, পৃথিবী ভারমুক্ত হয়, জগতে ধর্মের সংস্থাপন হয়। এতে জীবের কল্যাণ হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এবার আপনার এই স্বয়ংরূপ আবির্ভাবে অসুর মারণের তো কথাই

নেই—জগৎ এবার প্রেমলাভ করেও ধন্য হবে। প্রেমেই জীবের পরম কল্যাণ, কেননা আপনি প্রেমেরই ঘনীভূত মূর্তি আর প্রেমেই আপনাকে পাওয়া যায়। আপনার এই অবতার বিশ্বের মঙ্গল-বিধাতা। এই অবতারে অসুরগণ পর্যন্ত সাযুজ্য লাভ করে কৃতার্থ হবে। আপনি বাল্যলীলায় পুতনা রাক্ষসীকে পর্যন্ত মাতৃগতি প্রদান করেছেন। এইরূপ সুরাসুর নির্বিশেষে সকলকে মঙ্গল বিতরণ করাই আপনার এই অবতারের উদ্দেশ্য। আপনার অন্য অবতারে অসুরগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয় আর সাধুগণ পরিত্রাণ লাভ করেন কিন্তু এই অবতারে অসুরগণের দেহ নাশ হলেও তাঁদের আত্মার সদ্‌গতি লাভ হবে। আপনার চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম।

এইভাবে ভগবদ্‌কৃপা বর্ণনা করে, নলকুবর ও মণিগ্রীব অতি লজ্জিতভাবে কৃষ্ণকে বলছেন, আমাদের আত্মপরিচয় দেওয়ার কিছুই নেই। আমাদের দেবদেহে পৃথিবীর ভূমি স্পর্শ করারও অধিকার নাই—**'ন দেবা ভুবং স্পৃশন্তি'**। কিন্তু দেবর্ষি নারদের মহৎ কৃপায়, তাঁর শাপরূপ অনুগ্রহে আমরা বৃক্ষরূপে শতবর্ষ ব্রজভূমিতে বাস করবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমাদের একমাত্র পরিচয়— **'অনুজানীহি নৌ ভূমন্‌। তবানুচর কিঙ্করৌ'** (ভাগবত ১০।১০।৩৭) আমরা আপনার অনুচর (পার্ষদ) দেবর্ষি নারদের দাসানুদাস। শুনেছি আপনার ভক্ত যার ওপর কৃপা কটাক্ষ করে, আপনি তাকে চরণে স্থান দিতেও কুণ্ঠিত হন না। আপনার লীলাভূমির ধূলিকণা স্পর্শ করার অধিকারও আমাদের মতো মহা অপরাধীর নেই। আপনার ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহে আমরা কিছুদিনের জন্য বৃক্ষরূপে ব্রজভূমিতে বাস করে কৃতার্থ হয়েছি ও আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে ধন্য হয়েছি। আমাদের যদি কোনো প্রকার সেবাকার্যের কৃপাদেশ করেন, তবে আমরা কৃতার্থ হব আর আপনার আদেশ পালন করে স্বস্থানে গমন করব।

কোনোপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদেশ পাওয়ার জন্য নলকুবর ও মণিগ্রীব নানাভাবে প্রার্থনা করলেন কিন্তু যশোদানন্দন কোনো উত্তরই দিলেন না। তখন তাঁরা চিন্তা করলেন যে আমাদের এই দেবদেহ সাক্ষাৎ সেবাধিকার পাওয়ার যোগ্য নয়। শ্রদ্ধাভক্তি-যাজন করে যদি সাক্ষাৎ সেবার উপযুক্ত গোপ-গোপীর

সিদ্ধ দেহ পাই, তাহলে তখনই সেবার জন্য কৃপাদেশ পেতে পারি। অযোগ্য প্রার্থনায় কখনই ফলোদয় হয় না। অতঃপর তাঁরা শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা সাধন যাজনের প্রার্থনা করে প্রকরণের, অন্তিম শ্লোকে বলেছেন—

'বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং................দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥' (ভাগবত ১০।১০।৩৮)

ষড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সাধন ভক্তির ছয়টি যাজন এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাগিন্দ্রিয়—আমাদের বাক্ জন্মে-জন্মে নানাবিধ বৃথা বাক্য ব্যয়ে কাল কাটিয়েছে। এবার যেন আমাদের বাগিন্দ্রিয় আর বৃথা গ্রাম্যবার্তায় কালক্ষেপ না করে। আপনার নাম, গুণ, লীলাকথা ভিন্ন অন্য সকল কথাই গ্রাম্যবার্তা বা অসৎবার্তা। আমাদের বাগিন্দ্রিয় যেন এবার থেকে আপনার নাম, গুণলীলা ও কথা-কীর্তনেই নিযুক্ত থাকে।

শ্রবণেন্দ্রিয়—আপনি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়েছেন যাতে আমরা আপনার নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথা শ্রবণ করতে পারি, কিন্তু আমরা তা কোনোদিন শুনিনি। শ্রবণেন্দ্রিয় পেয়েও আমরা আপনার কথা শ্রবণ না করে কত জন্ম যে বৃথা কাটিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। হে ভগবন্ ! এবার যেন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়প্রাপ্তি ব্যর্থ না হয়। আমরা যেন নিরন্তর আপনার কথা শোনার জন্যই শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিযুক্ত রাখতে পারি।

হস্ত— আপনি আমাদের যে হস্ত দিয়েছেন তার দ্বারা আমরা কত ছবি এঁকে, বাদ্য বাজিয়ে, প্রাকৃত বিলাসোপযোগী কার্য করে সময় নষ্ট করে থাকি, কিন্তু আপনার সেবার্থে কখনো পুষ্পচয়ন করে, মন্দির মার্জনা করে বা সংকীর্তনে হাততালি দিয়ে পবিত্র কাজ করিনি। হে সর্বেশ্বর ! এবার থেকে যেন আমাদের হস্ত সর্বদা আপনার সেবাকার্যেই নিযুক্ত থাকে।

মন— আপনি আপনার রাতুল চরণের স্মৃতি জাগিয়ে রাখার জন্যও অন্যান্য দশ ইন্দ্রিয়কে সংযত করে আপনার সেবায় নিযুক্ত করার জন্য মনকে তাদের অধ্যক্ষ করেছেন। কিন্তু আমাদের কী দুর্ভাগ্য ! আমরা কোনোদিনই আমাদের মনে আপনার স্মৃতির স্থান দিইনি। যদিও বা কখনো অযাচিতভাবে

আপনার স্মৃতি মনে আসতে চায়, তখন নানাবিধ বিষয়-বাসনা দিয়ে মনের কপাট বন্ধ করে দিই। এইভাবে জন্মে জন্মে নানাবিধ দুর্বৃত্তাচরণ করে আপনার চরণ ভুলে সংসারপথে বিচরণ করছি। হে দয়াময় ! এমন করে আর কত জন্ম ব্যর্থ হয়ে যাবে ! এবার থেকে প্রভু আমাদের মন বিষয়ের পথে পরিচালিত না হয়ে, নিরন্তর যেন আপনারই চরণতলে মগ্ন থাকে।

মস্তক—হে ভগবন্ ! আপনি মস্তককে জীবের উত্তমাঙ্গ করেছেন এবং তাকে দেহের সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপন করেছেন। সেই মস্তক যদি উচ্চতার অভিমান ভুলে নিরন্তর আপনার চরণোদ্দেশে নত হয়ে থাকে, তাহলে আর জীবের প্রতি পদে পদে অভিমানের দণ্ড ভোগ করতে হয় না। কিন্তু হায় ! আমাদের অভিমানের উচ্চশির কখনও নত হতে চায় না। হে সর্বশক্তিমান ! আপনি এবার আমাদের উচ্চশির নত করে দিন, আমাদের অভিমানের বোঝা ধুলায় মিশিয়ে দিন। নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে আমরা অনেক ব্যক্তির কাছে প্রয়োজনে মাথা নত করি বটে, কিন্তু কখনো তাদের মধ্যেও আপনাকে দর্শন করি না, আমরা কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই মাথা নত করি। হে প্রভু ! কৃপা করো যেন জগতের প্রতি বস্তু, প্রতি ব্যক্তির মধ্যেই আপনার অধিষ্ঠান বলে অনুভব করে, আপনার উদ্দেশে প্রণাম করে জীবন ধন্য করতে পারি।

নয়ন—হে ভগবন্ ! মন্দিরে মন্দিরে আপনার শ্রীমূর্তি দেখে কৃতার্থ হব, ভক্তগণ আপনার সেবা করছে দেখে আমরাও আপনার সেবায় প্রবৃত্ত হব, জগতের বৈচিত্র্য দেখে, জগৎস্রষ্টাকে দেখার জন্য লালায়িত হব, এই সমস্ত কারণেই আপনি আমাদের নয়ন দিয়েছেন। কিন্তু হায় ! নয়ন এসব দেখেও দেখে না। নলকুবর ও মণিগ্রীব তাই বললেন—হে ভগবন্ ! আমাদের দৃষ্টি যেন জাগতিক দৃশ্য দেখেই দর্শনের চরিতার্থতা সম্পাদন না করে। আমাদের নয়ন যেন আপনার শ্রীবিগ্রহ ও সেবকগণকে দেখে ধন্য হয়। জগৎ আপনারই রূপ আর শ্রীবিগ্রহের মধ্যে আপনিই বিদ্যমান, এইভাবে সর্বভাবের মধ্যেই আপনিই অন্তর্নিহিত, এই রূপ দেখার জন্য যেন নয়ন সমুৎসুক থাকে, এই

আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

ভগবানের বরপ্রদান (৩৯—৪২)

ইত্থং সংকীর্তিতস্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ।
দাম্না চোলূখলে বদ্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহ্যকৌ॥ ৩৯
জ্ঞাতং মম পুরৈবৈতদৃষিণা করুণাত্মনা।
যচ্ছ্রীমদান্ধয়োর্বাগ্‌ভির্বিভ্রংশোঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥ ৪০
সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্ বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা॥ ৪১
তদ্ গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকূবর সাদনম্।
সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভবঃ॥ ৪২
(ভাগবত ১০।১০।৩৯-৪২)

সরলার্থ—শ্রীশুকদেব বললেন—নলকূবর এবং মণিগ্রীব এইভাবে তাঁর স্তুতি করলে সৌন্দর্য-মাধুর্য নিধি গোকুলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুদ্বারা উদূখলে বদ্ধ অবস্থায়ই হাসতে হাসতে তাদের এই কথা বললেন—॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবান বললেন—আমি পূর্ব হতেই এ কথা জানি যে, তোমরা দুজন ঐশ্বর্যমদে অন্ধ হলে পরে পরম কারুণিক দেবর্ষি নারদ অভিশাপের ছলে তোমাদের সেই অবস্থা থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে অনুগ্রহই প্রকাশ করেছিলেন॥ ৪০ ॥ সূর্যোদয় হলে যেমন মানুষের চোখের সামনে অন্ধকারের আবরণ থাকতে পারে না, ঠিক সেইরকমই একান্তভাবে মদ্‌গতচিত্ত সর্বত্র সমভাববিশিষ্ট সাধুদের দর্শনের ফলেও জীবের বন্ধন থাকতেই পারে না॥ ৪১ ॥ সুতরাং, হে নলকূবর এবং মণিগ্রীব ! তোমরা সর্বথা মৎপরায়ণ হয়ে নিজ লোকে প্রস্থান করো। সংসার চক্র থেকে উদ্ধারকারী আমার প্রতি অনন্য ভক্তিভাব যা তোমাদের অভীপ্সিত ছিল—তা তোমাদের লাভ হয়েছে॥ ৪২ ॥

মূলভাব—নলকুবর ও মণিগ্রীব যশোদানন্দনের স্বরূপ, ঐশ্বর্য ও মহিমাদি বর্ণনা করে অশেষ স্তুতি করলেন ও পরিশেষে 'বাণী গুণানুকথনে' প্রভৃতি

শ্লোকে নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তনাদি-সাধন যাজনের শক্তি ও প্রবৃত্তি লাভের জন্য বর প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাঁরা শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা সাধনভক্তির মধ্যে তাঁদের আয়ত্ত সাপেক্ষ ছয় প্রকার ভক্তি-যাজনের প্রার্থনাই করলেন ও দুঃসাধ্য বোধে অবশিষ্ট তিন অঙ্গ দৈন্যবশতঃ প্রার্থনা করলেন না। 'বাণীগুণানুকথনে' ইত্যাদি শ্লোকে কেবল ছয় ভক্ত্যঙ্গ যাজনের যেমন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, পাদসেবন ও বন্দন আদির অধিকারের প্রার্থনা করা হয়েছে। নববিধা ভক্তির অন্য তিন অঙ্গ যথা দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই তিন ভক্ত্যাঙ্গ যা ইচ্ছাপূর্বক যাজন করা যায় না তা প্রার্থনা করা হয়নি, কেননা এই তিন ভক্ত্যাঙ্গ শ্রবণ কীর্তনাদি করতে করতে শক্তিলাভ করলে তবেই এতে অধিকার জন্মায়। তাই মহাপ্রভু বলেছেন—

অধিকারী নহে ধর্ম চাহে আচরিতে।
অচিরে বিনাশ পায় দেখিতে দেখিতে॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

দেবর্ষি নারদের অপার কৃপায় নলকুবর ও মণিগ্রীব প্রকৃতপক্ষেই ভক্তি-পথের পথিক হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সেই অতি সুউচ্চ মহৎভাব 'দীনতার' আবির্ভাব হয়েছে। আর তাই তাঁরা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণচরণে সদৈন্য অধিকারানুরূপ সাধনানুষ্ঠানের কথা নিবেদন করেছেন।

নলকুবর ও মণিগ্রীব প্রথমতঃ 'তবানুচরকিঙ্করৌ' অর্থাৎ আপনার পার্ষদের দাস বলে নিজ আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করায় শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রীত হয়ে হাসিমাখা মুখে তাঁদের আশ্বাস প্রদান করলেন। কুমারদ্বয়কে কৃপার বাণী শোনাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মূর্ত্ত্যান্তর প্রকাশ করেননি, তিনি দুই জানু ও বামহস্তে দেহভার অর্পণ করে, ডানহস্ত উত্তোলন করেই হাসি মুখে তাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কৃষ্ণের এই ভক্তবাৎসল্য পূর্ণ দামোদর মূর্তি দেখলে ভক্তমাত্রেরই মনঃপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণচরণে বিকিয়ে যায়। কৃষ্ণের এই দামোদর মূর্তি ভক্তগণের বড়ই হৃদয়গ্রাহিণী। শ্রীভগবান বললেন, হে নলকুবর ও মণিগ্রীব! তোমরা যে নারদ ঋষির কৃপাতেই কৃতার্থ হয়েছ এবং তা হৃদয়ঙ্গম করে 'দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ' এই কথায় তা ব্যক্ত করছো অর্থাৎ বলেছ যে

হে ভগবন্‌ ! একমাত্র নারদ ঋষির কৃপাতেই আমরা আপনার দর্শনলাভ করেছি, তাতে আমি পরমপ্রীতি লাভ করেছি। আমার ভক্তের নিকট যাদের অপরাধ হয়, আর সেই ভক্তই যদি তা ক্ষমা না করে তবে তারা কদাপি আমার কৃপালাভ করতে পারে না। দেবর্ষি নারদ কেবল অভিসম্পাতই প্রদান করেননি, তিনি অভিসম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ অনুগ্রহও করেছেন। তোমাদের কি দেবর্ষির অনুগ্রহ বাক্যের কথা মনে নেই ?

বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধা দিব্যশরচ্ছতে।
বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ॥

(ভাগবত ১০।১০।২২)

তিনি বলেছিলেন— দেবপরিমাণে শতবৎসর অতিক্রান্ত হলে, তোমরা বাসুদেবের নিকট হতে পারবে এবং ভক্তিমান হয়ে স্বর্গে নিজস্থানে গমন করবে।

তাঁর কৃপাতেই আজ তোমরা আমার নিকট আসতে পেরেছ, তাঁর কৃপাতেই তোমরা ভক্তিলাভ করেছ আর সেইজন্যই তোমরা 'বাণী গুণানুকথন' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা সাধনের শক্তি লাভ করার জন্য আমার নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করছ। সূর্যোদয় হলে যেমন রাত্রির অন্ধকার দূর হয়, নয়নে কোনো ধাঁধা থাকে না সেইরকম ভক্তদের দেখা হলে কারও অজ্ঞান আঁধার থাকে না, মায়ার ধাঁধা কেটে যায়। ভক্তগণের এমনই স্বভাব যে তাঁদের দর্শন মাত্রেই সংসার নয় আমার চরণভজন করাই কর্তব্য— এই পরম সত্যের উপলব্ধি হয়।

আমার একান্ত ভক্তগণ সকলেই 'সাধু' অর্থাৎ তাঁদের ইহলোক বা পরলোকে কোনো প্রকার ভোগবাসনা নেই, কেবলমাত্র আমার সেবার বাসনায় তাঁরা ইহলোক বা পরলোকের চিন্তা ভুলে আমার সেবা নিয়ে মত্ত থাকেন। আমার একান্ত ভক্তগণ সমচিত্তসম্পন্ন, তাঁদের মান, অপমান, স্তুতি, নিন্দা এসব কোনো কিছুরই জ্ঞান থাকে না। তাঁরা স্বভাবসিদ্ধ করুণাময় দৃষ্টিতে সকলকে সমান দেখেন, তাদের কেউ শত্রু নয়, সকলেই মিত্র। কাউকে অন্যায় করতে দেখলে তাঁরা ক্রুদ্ধ হন না, বরং তাদের কুপ্রবৃত্তি দূর করার জন্য আমার

নিকট বিনীত প্রার্থনা করেন। এইপ্রকার সাধু ও সমচিত্ত একান্ত ভক্তের সঙ্গে কবে দেখা হবে তা বলা যায় না। কিন্তু যদি কোনো অনির্বচনীয় ভাগ্যবশে কখনো কারোর এই প্রকার একান্ত ভক্তের সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে তার আর কোনো সংসার বাসনা থাকে না, সে আমার চরণে ভক্তিলাভ করে কৃতার্থ হয়।

চৈতন্যচরিতামৃতকার এই প্রকার ভক্ত দর্শনের কথা বলেছেন—

'কোনও ভাগ্যে কোনও জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়।'

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

একান্ত ভক্তগণের সঙ্গে দেখা করার জন্য কোনো সাধনা করতে হয় না। যার সংসার বাসনা ক্ষয় হওয়ার সময় হয়ে আসে তারই এই প্রকার ভক্তসঙ্গ আপনিই লাভ হয়ে থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—হে নলকুবর, হে মণিগ্রীব ! তোমরা ধনমদে মত্ত হয়ে নানা অনাচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলে। কিন্তু তোমাদের কোনো অনির্বচনীয় ভাগ্যবশতঃ আমার ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছিল। আর দেখামাত্র তোমরা কৃতার্থ হয়েছ, তোমাদের অজ্ঞান-আঁধার দূর হয়ে গিয়েছে, তোমরা ভক্তিলাভের যোগ্য হয়েছ। তারপর দেবর্ষি নারদ শাপানলে দগ্ধ করে তোমাদের সমস্ত দোষ নষ্ট করে ভক্তির সুপাত্র করে তুলেছেন। তোমাদের আর কোনো চিন্তা নেই, দেবর্ষি নারদের কৃপায় তোমরা কৃতার্থ তো হয়েই গিয়েছ, হৃদয়ে ভক্তিবাসনার বীজও অঙ্কুরিত হয়েছে। তোমরা 'বাণী গুণানুকথন' প্রভৃতি বাক্যে যে প্রার্থনা করেছ সে ভাবও তোমাদের লাভ হয়েছে। দেবর্ষি নারদের কৃপায় তোমাদের যে 'ভাব' লাভ হয়েছে তার প্রভাবেই তোমরা দীনাতিদীনের ন্যায় নিজেদের অনধিকারী মনে করছ এবং সাধন ভক্ত্যাঙ্গ যাজনের প্রার্থনা করছ। সাধক ভক্তগণ বহুকাল শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন ভক্ত্যাঙ্গ যাজন করে যে সুফল ভাব লাভ করে, দেবর্ষি নারদের কৃপায় তোমরা বিনাসাধনেই তা লাভ করেছ। শ্রীভগবান বরদান কালে আরো বলেছেন—**'সঞ্জাতো ময়ি ভাবো'** এবং **'বামীপ্সিতঃ পরমোহভবঃ'** অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে 'ভাব' অঙ্কুরিত হয়েছে তার ফলে

তোমরা **'পরমঃ অভবঃ'** লাভ করেছো।

এখানে অভবঃ শব্দের অর্থ 'ন ভবঃ সংসারে যস্মাৎ স অভবঃ' মানে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক, মোহ, ক্ষুধা, পিপাসা, দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব, অভিযোগ প্রভৃতি সংসার দুঃখ যাকে ভোগ করতে হয় না, সেই হল 'অভব'। জ্ঞানিগণ জ্ঞানসিদ্ধিতে এবং যোগিগণ যোগসিদ্ধ অবস্থায় যখন জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ করেন, তখন তারা এই 'অভব' অবস্থা প্রাপ্ত হন। কিন্তু তা 'পরম অভবঃ' অবস্থা নয়। কেননা জীবন্মুক্ত জ্ঞানসিদ্ধ ও যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণেরও শ্রীভগবান ও তাঁর ভক্তদের নিকট যদি কোনো অপরাধ হয় তাঁদের তবে পুনঃ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। গীতায় তাই ভগবান বলেছেন, **'শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে'** (৬।৪১) অর্থাৎ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ (জীবন্মুক্তগণ) যদি কখনো যোগভ্রষ্ট হন, তাহলে তাঁরা শুদ্ধচিত্ত ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

আর ভক্তগণের সম্বন্ধে বলছেন—

'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' (গীতা ৯।৩১)।

'হে অর্জুন ! তুমি সবাইকে প্রতিজ্ঞা করে জানাও যে 'আমার ভক্তর কখনো বিনাশ নেই।'

ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবকালে স্তুতি করে বলছেন—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ, ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া, বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো॥

(ভাগবত ১০।২।৩৩)

হে ভগবন্ ! দেহাভিমানী জ্ঞানীপুরুষ আপনার ও আপনার ভক্তগণের নিকট কোনো অপরাধ করলে তাঁরা পুনরায় সংসার সাগরে পতিত হন। কিন্তু আপনি ভক্তগণের ব্যাপারে পক্ষপাতী, তাঁদের সর্বদা রক্ষা করেন, তাই তাঁরা সর্ব বাধাবিঘ্নর মস্তক পদদলিত করে নির্ভয়ে বিচরণ করেন। ভক্তই **'পরম অভব'** অর্থাৎ তাঁরা পতনাশঙ্কাবিহীন হয়ে সংসার থেকে মুক্তিলাভ করেন।

শ্রীভগবান বললেন, হে নলকুবর ও মণিগ্রীব ! দেবর্ষি নারদের পরমানুগ্রহে তোমরা এই পরম-অভব রূপ ভাব লাভ করে কৃতার্থ হয়েছো।

তোমরা আমার চরণে ঐকান্তিক ভক্তিলাভ করেছ তাই তোমাদের আর সংসার বাসনার অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে নিজভবনে গমন করো।

শ্রীভগবানের এই প্রকার কৃপাশীর্বাদ বাক্যাবলী শ্রবণ করে নলকুবর ও মণিগ্রীব নিজেদের ধন্য মনে করলেন। শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে করতে তাঁরা উদূখলে বদ্ধ কৃষ্ণকে পরিক্রমা করে স্বস্থানে যেতে উদ্যত হলেন। যাওয়ার সময় তাঁরা দেবর্ষি নারদের অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত কৃপা এবং তজ্জনিত কৃষ্ণ কৃপার কথা মনে করে পরমানন্দে আত্মহারা ও দিশাহারা হয়ে কৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে গমন করলেন।

ভাব ও প্রেম — কিছু কথা — দেবর্ষি নারদের কৃপায় নলকুবর ও মণিগ্রীবের 'ভাব' লাভ হয়েছিল। এ ভাব কীরকম তা শ্রীরূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন।

প্রেমস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যাভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অর্থাৎ 'প্রেমের প্রথমাবস্থার নাম ভাব। ভাবের উদয় হলে ভাববান ভক্তের অত্যল্পমাত্র অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার পরিলক্ষিত হয়।' সূর্যোদয়ের কিয়ৎকাল পূর্বেই যেমন পূর্ব গগন অরূণিত হয়, জগতের আঁধার দূর হয় এবং রাত্রিচর হিংস্র জন্তুগণ পলায়ন করে, সেইরকম প্রেম-সূর্যোদয়ের কিয়ৎকাল পূর্বেই সাধক-হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রেমচ্ছটা অরুণিত হয়, অজ্ঞানরূপী আঁধার দূর হয় আর কামনা-বাসনা-বিষয়াশক্তিরূপ হিংস্র জন্তুগণও পলায়ন করে। এরই নাম ভাব যা প্রেমের পূর্বাবস্থা। এই ভাব অবশ্য শ্রবণ কীর্তনাদি সাধন ভক্ত্যাঙ্গ যাজনের অনেক পরে লাভ হয়ে থাকে।

প্রেমলাভের উত্তরণের পথ সম্বন্ধে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বলেছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ঃ প্রেম্ন-প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

শ্রদ্ধা— কোনো অনির্বচনীয় ভাগ্যবশত কোনো ভাগ্যবান জীব, শ্রীভগবানের অযাচিত অপার কৃপায় প্রথমত শ্রদ্ধালাভ করেন। সাধু, শাস্ত্র আর গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসই হল শ্রদ্ধা।

সাধুসঙ্গ—এই শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি যদি শ্রীগোবিন্দ ভজনপরায়ণ ভক্তের সঙ্গলাভ করেন তবে তাঁর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

ভজনক্রিয়া— ভক্তসঙ্গ ক্রমে তাঁকে শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনে প্রবৃত্ত করায়। ভজনশীল ভক্তের সঙ্গলাভ করেও যদি শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনে প্রবৃত্তি না জাগে তবে বুঝতে হবে যে তিনি যে-ভক্তের সঙ্গলাভ করেছেন তিনি আদৌ ভজনপরায়ণ নন বা তাঁর নিজেরই যথাযথ সঙ্গলাভ করা হয়নি। (**সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব সিদ্ধ হয়।**) (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অনর্থ নিবৃত্তি—ভক্তসঙ্গকারী সাধক যদি যথাযথ শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন যাজনে প্রবৃত্ত হন তখন সাধকের অনর্থ নিবৃত্তি হয়। সাধনভক্তি যাজনের প্রতিবন্ধক মাত্রেরই নাম অনর্থ। জগতের জীব কেউ অবিশ্বাসবশত, কেউ বা আলস্যবশত, কেউ রোগাদিবশত আবার কেউ বিষয়কার্যবশত নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনভক্তি যাজন করতে পারে না। সুতরাং এই অবিশ্বাস ইত্যাদি সকলই অনর্থ। সাধনভক্তি যাজন করতে করতে ক্রমশ এই অনর্থর নিবৃত্তি হয়ে থাকে। সাধনভক্তি যাজন করেও যদি অনর্থ নিবৃত্তি না হয়, তবে বুঝতে হবে তার বহু জন্ম সঞ্চিত অনর্থ জমে আছে। নিবৃত্তি করতে হলে আরো বহু শ্রবণ-কীর্তনাদি করতে হবে।

নিষ্ঠা—অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে গেলে নিষ্ঠা লাভ হয়, তখন আর তার সাধন-ভক্তি যাজনে কোনো বাধা থাকে না। নিরন্তর সাধনভক্তি করা যায়। সাধনভক্তিতে নিয়ত স্থিতির নামই নিষ্ঠা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন গোস্বামী আদির নিষ্ঠা এই প্রকার বলা হয়েছে।

সাড়ে সাত প্রহর যায় ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড বিশ্রাম তাও নহে কোন দিনে॥

রুচি— নিষ্ঠাবান ভক্তের কৃষ্ণভজনে যখন রুচি জন্মায় তখন কেবল কৃষ্ণভজন করতে ভালো লাগে, বিষয়-কর্ম বিষবৎ বলে মনে হয়।

আসক্তি ও ভাব— নিষ্ঠা হলে কৃষ্ণ-ভজনে আসক্তিলাভ হয়। বিষয়ীরা যেমন বিষয়ে আসক্তি, ভক্তের তদপেক্ষা কোটি কেটি গুণ বেশি সাধন-ভজনে আসক্তি হয়। এইরূপ ভজনাসক্ত ব্যক্তির হৃদয়েই 'ভাবের' আবির্ভাব হয়ে থাকে। তার হৃদয় তখন কৃষ্ণ প্রেম-রূপী-সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হয়, অজ্ঞানরূপী আঁধার কেটে যায়, কামনা-বাসনারূপী হিংসুক জন্তুগণ পলায়ন করে। ভাব লাভের পূর্বে কখনো কারো অজ্ঞান অন্ধকার কাটে না, বিষয়বস্তুর বাসনাও যায় না। আর এসব বাসনা সুস্পষ্ট দেখতে পাওয়া না গেলেও তা হৃদয়ের গভীরতম অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাকে এবং সময় পেলেই আত্মপ্রকাশ করে।

কামনা-বাসনা জীবকে নানাভাবে প্রতারণা করে। সাধন-ভক্তি যাজন করে 'ভাব' লাভ না করতে পারলে এদের হাত থেকে মুক্তি নেই, কেননা এরা জীবের শত্রু। ভাব বা প্রেমের পূর্বাবস্থা প্রকাশ হওয়ার সাধারণতঃ এই প্রণালী, তবে কোনো কোনো ভাগ্যবান ব্যক্তি অতি সুলভে ভাবলাভ করে থাকেন।

সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা।
প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে॥
আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলাদয়ঃ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অতি ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনভক্তি যাজনে ক্রমশ অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি দ্বারা 'ভাব' লাভ করেন কিংবা শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর ভক্তের কৃপায় সাধন-ভক্তি অনুষ্ঠান বিনাই 'ভাব' লাভ করতে পারেন। 'ভাব' লাভের এই দ্বিবিধ উপায় আছে। তার মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্তনাদি সাধন ভক্তানুষ্ঠানজনিত 'ভাব' প্রায়শই দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিনা সাধনে কেবলমাত্র কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণভক্তের কৃপাজনিত ভাব, এ পর্যন্ত দুই-

চারজন লাভ করেছে কিনা সন্দেহ। এরূপ ভক্তের সাধনানুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই, হঠাৎ ভাবতরঙ্গে মন-প্রাণ নেচে ওঠে, সমস্ত বিষয়বাসনা দূর হয়ে হৃদয়ে এক অনাস্বাদিত পরমানন্দর লহরী খেলে যায়। ভগবদ্ভক্ত শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাগত হয়ে সেবাপ্রাপ্তির জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করে। নিজেকে দীনাতিদীন মনে করে প্রথম সাধকের মতো সাধনানুষ্ঠানের জন্য লালায়িত হন।

সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে।
স ভাবঃ কৃষ্ণতদ্ভক্ত প্রসাদজইতীর্যতে॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

শ্রবণ কীর্তনাদি সাধন ভক্ত্যাঙ্গ যাজন ব্যতীত হঠাৎ যে ভাবের আবির্ভাব হয় তাকে কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণভক্তের কৃপাজনিত ভাব বলে শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে শক্তিবিহীন অজ্ঞ জীবগণ প্রায়শই শ্রবণ-কীর্তনাদিতে প্রবৃত্ত না হয়ে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত কৃপাজনিত ভাবলাভের জন্য লালায়িত হন। কেউ বা ভাবেন সদগুরুর চরণ আশ্রয় করেছি তাই সাধন বিনাই, তাঁর কৃপাতে প্রেমবান হওয়ার আশা করেন। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য, আর সাধনভক্তি যাজনের প্রবৃত্তি জন্মানোর জন্য শ্রীভক্তিরসামৃত গ্রন্থে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলেছেন—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তিমানশূন্যতা
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্গুনাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

সম্পূর্ণরূপে ভাব প্রকাশ তো দূরের কথা, যার হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুরোদগমও হয়, তারও নয়প্রকার ভাবচিহ্ন প্রকাশ পায়।

ভাবাঙ্কুর সাধকের নয় প্রকার ভাবচিহ্ন—

ক্ষান্তি— যার ভাবাঙ্কুরোদ্গম হয়, সে কোনো জাগতিক সুখ বা দুঃখে বিচলিত হয় না, তার শত পুত্র লাভেও আনন্দ নেই বা শতপুত্র নাশেও দুঃখ

নেই। রাজ্য লাভেও আনন্দ নেই বা ভিখারি হলেও দুঃখ নেই। সুখ-দুঃখ দুই কৃষ্ণের অনুগ্রহের দান বলে মনে করে সে তা নীরবে গ্রহণ করে এবং সাধনভক্তি যাজন করে।

অব্যর্থকালত্বং—এই প্রকার ভক্তের কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ছাড়া এক নিমেষ সময়ও ব্যর্থ বলে মনে হয়।

বিরক্তি—স্ত্রী-পুত্র-পরিজন বা বিষয়-বৈভব দেহ-গেহাদির সম্বন্ধে সে সদাই বিরক্ত বোধ করে। কৃষ্ণভজন ছাড়া তার আর কিছুই ভাল লাগে না।

মানশূন্যতা— সেই ভক্ত যদি জাতি কুল বিদ্যা সাধনানুষ্ঠান প্রভৃতিতে সর্বশ্রেষ্ঠও হয়, তবু আপনাকে অতি নিকৃষ্ট বলে মনে করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচর্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নিজেকে বলেছেন—

নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কর্ম। কুবিষয়ে বিষ্ঠাগর্ত্তে গোঙানু জনম।।

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আশাবন্ধঃ— কৃষ্ণভাবাঙ্কুরোদগম ব্যক্তির কখনো কৃষ্ণকৃপায় অবিশ্বাস থাকে না। সে মনে করে, কৃষ্ণ পরম দয়ালু তিনি আমার ন্যায় অধমকে নিশ্চয় কৃপা করবেন।

সমুৎকণ্ঠা—এই প্রকার সাধক তখন আর কৃষ্ণ ভজনা না করে নিশ্চিন্ত মনে আহার নিদ্রাতে কালক্ষেপ করতে পারে না। তখন কৃষ্ণসেবার জন্য মনে প্রবল উৎকণ্ঠা হয়।

নামগানে সদারুচিঃ—তখন তার কৃষ্ণ নামগানে সদারুচি হয়।

আসক্তিস্তদ্ গুণব্যাখ্যানে—তার কৃষ্ণ গুণকীর্তনে আসক্তি হয়।

প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে—সেই ভাবাঙ্কুরোদগম ভক্তের কৃষ্ণমন্দির, কৃষ্ণধাম, কৃষ্ণলীলা কীর্তন স্থান, তুলসী কানন কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র ইত্যাদি কৃষ্ণ বসতি স্থলে অত্যন্তিক ভালোবাসা জন্মায়।

এই নয় প্রকার ভাবচিহ্ন প্রকাশ পেলে তবেই বুঝতে হবে যে তার অন্তরে কৃষ্ণভাবাঙ্কুর উদগম হয়েছে।

———o———

ব্রহ্মা-মোহন স্তুতি

(দশম স্কন্ধ, চতুর্দশ অধ্যায়)

প্রাক্‌কথন

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা দ্বারা পাঁচবার শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করা হয়েছে।

ব্রহ্মার প্রথম স্তুতি— তৃতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে স্তুত। স্তুতিটির কাল (সময়) বর্তমান সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্বেতবরাহ কল্পে। পদ্মযোনি ব্রহ্মা নিজের সৃষ্টির পর জগৎ সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হলে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঋক্‌বেদের পুরুষসূক্ত দ্বারা শ্রীভগবানের স্তবে প্রবৃত্ত হন। শ্রীভগবান আশীর্বাদ করে বললেন **'প্রজা সৃজ যথাপূর্বং যাশ্চ ময্যনুশেরতে'** (ভাগবত ৩।৯।৪৩) অর্থাৎ জীব-সৃষ্টি পূর্বকল্প হতেই আমাতে লীন আছে, তুমি অন্যাপেক্ষা না করে তৎসমুদয়ই পূর্ববৎ সৃষ্টি করো।

ব্রহ্মার দ্বিতীয় স্তুতি—তৃতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে স্তুত। বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে যখন পৃথিবী অসুর ভারাক্রান্ত হল তখন ব্রহ্মা ভগবানের অবতাররূপে আবির্ভাবের জন্য ইন্দ্রাদি দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষিরোদসাগরে বিষ্ণুর স্তুতিতে নিমগ্ন হন।

ব্রহ্মার তৃতীয় স্তুতি— দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্তুত। মথুরায় কংস কারাগারে দেবকীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণর আবির্ভাবের পর ব্রহ্মা দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন।

ব্রহ্মার চতুর্থ স্তুতি—দশম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে স্তুত। শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর বধের পর ব্রহ্মা গোপবালক ও গো-বৎসদের অপহরণ করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর মোহমুক্তি হয় এবং তারপরেই তিনি ব্রহ্মা-মোহন স্তুতি করেন।

ব্রহ্মার পঞ্চম স্তুতি—একাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্তুত। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবসানের পূর্বে যখন শ্রীকৃষ্ণের স্বধামগমনেচ্ছা হল তখনই ব্রহ্মা ও দেবতাগণ মর্ত্যে এসে ভগবানকে স্বধামে প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনাস্তুতি করেন।

বর্তমান উল্লেখিত 'ব্রহ্মা-মোহন স্তুতি' চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত হলেও তার মূল উপলক্ষ্য হল ভাগবতের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়, যেখানে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণর অপূর্ব ভক্তবাৎসল্য লীলা বর্ণিত হয়েছে আর এরই অন্তে আছে জ্ঞান ও দীনতায় ভরা এবং অপূর্ব ভক্তি ও সুষমামণ্ডিত 'ব্রহ্মাস্তুতি'। ব্রহ্মাস্তুতির মূল সূত্র হল সমগ্র ব্রজবাসীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় প্রণয়। ব্রজের গো ও গোপীগণ যশোদানন্দনকে নিজ নিজ বৎস ও পুত্র অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণ ভালোবেসেও সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, কেননা শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের নিজ গর্ভজাত পুত্র নয়। তাঁদের একমাত্র বাসনা শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁদের পুত্র হয়। তাঁরা সদাই বিধাতার নিকট প্রার্থনা করেন—'হে বিধাতা !। কৃষ্ণ যেন আমাদের পুত্র হয়।' কিন্তু তাদের এ বাসনা পূর্ণ হওয়ার উপায় কী ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করলেন—তথাস্তু ! এবার ব্রজের গো ও গোপিনীগণের মনোবাসনা পূরণ করব। আমি এবার তাদের সকলের পুত্র হয়ে সকলকে বাৎসল্য রস আস্বাদন করাব এবং স্বয়ং পরিতৃপ্ত হব।

শ্রীভগবানের ইচ্ছাই তাঁর লীলায় রূপান্তরিত হয়। অঘাসুরের বধ উপলক্ষ্যে শ্রীভগবানের খণ্ড খণ্ড লীলামাধুর্য তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াই প্রকাশে সহায়তা করেন। ব্রহ্মা-মোহন স্তুতি বর্ণনা পূর্বে আমরা অঘাসুর বধ উপলক্ষ্যে তাঁর লীলামাধুর্যের আস্বাদন করব।

লীলা-১— অঘাসুর হচ্ছে বকাসুর ও পুতনার ভাই। শ্রীকৃষ্ণের হাতে বকাসুরের মৃত্যুর পর অঘাসুর ক্রোধে দিশাহারা হয়ে ঠিক করল যেভাবেই হোক সে কৃষ্ণকে বধ করবে। সে তখন এক মহা অজগর সর্পরূপে মুখ ব্যাদান করে বৃন্দাবনে উপস্থিত হল। গোপবালক ও গোবৎসগণ এই প্রকাণ্ড অজগর দেহধারী অঘাসুরকে অজগরাকৃতি বনশোভা মনে করে ঘন ঘন করতালি সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে হই হই করতে করতে অঘাসুরের প্রসারিত বদনে প্রবিষ্ট হলেন। কৃষ্ণ তাদের হাত তুলে ডাকার চেষ্টা করলেও গোবৎস ও গোপবালকগণের অঘাসুরবদন বিবরে প্রবেশ রোধ করলেন না। অবশ্য এ তাঁর লীলারই অঙ্গ। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সাথী গোপবালক ও গোবৎসদের রক্ষা করার জন্য নিজেই মহা অজগররূপী অঘাসুরের মুখগহ্বরে প্রবেশ করলেন। অঘাসুর মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হয়ে ভাবল এইবার বুঝি শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই ভীষণ আকৃতির সর্পমুখে প্রবেশ করে

অঘাসুরের গলচ্ছিদ্র আবরণ করে প্রকাণ্ড মূর্তিতে দণ্ডায়মান হলে অঘাসুরের প্রাণবায়ু তার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে নির্গত হয়ে গেল। তখন সেই মহাস্থূল সর্পদেহ হতে এক পরমোজ্জ্বল জ্যোতিঃ নির্গত হয়ে অবস্থান করতে লাগল। আকাশস্থ দেবগণ পরমবিস্মিত হয়ে সেই উজ্জ্বল জ্যোতির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিন্তু তাঁরা এই তত্ত্ব বুঝতে পারলেন না। এমন সময় ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, গোপবালকগণ ও গোবৎসগণসহ অঘাসুরের মুখের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসলেন আর তৎক্ষণাৎ আকাশস্থ জ্যোতির্ময় বস্তু তাঁর চরণপ্রান্তে বিলীন হয়ে গেল। দেবগণ তখন বুঝতে পারলেন আকাশস্থ সেই জ্যোতির্ময় বস্তু অঘাসুরেরই জীবচৈতন্য এবং তা কৃষ্ণচরণ প্রান্তে বিলীন হয়ে চিরতরে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করল।

আকাশস্থ দেবগণ অঘাসুরের ন্যায় মহাপাপীরও এইভাবে অনায়াসে এবং অযাচিতভাবে মুক্তিলাভ করায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং কৃষ্ণের অপার কৃপাবৈভব স্মরণ করে তাঁরই শরণাপন্ন হলেন।

লীলা-২—শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর বধ লীলার আর একটা বিশেষ চমৎকারিত্ব হল এই যে, তিনি তাঁর পঞ্চম বৎসর বয়সে এই লীলা করেছেন, কিন্তু গোপবালকগণ তার এক বছর পরে (কৃষ্ণের ছয় বছর বয়সে) এই কথা বৃন্দাবনে তাদের মা-বাবার কাছে বলেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের চিত্ত কৃষ্ণকথা শোনার জন্য সর্বদাই ব্যাকুল। শ্রীশুকদেবের মুখ হতে কৃষ্ণের অঘাসুর বধ লীলা শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল আর গোপবালকগণের একবছর বাদে অঘাসুর বধবার্তা ঘোষণা করার কথা শুনে মনে মনে ভাবলেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের কোনো অনির্বচনীয় লীলামাধুর্য লুকিয়ে আছে। তাই তিনি বলছেন—

বয়ং ধন্যতমা লোকে গুরোঽপি ক্ষত্রবন্ধবঃ।
যৎ পিবামো মুহুস্ত্বত্তঃ পুণ্যং কৃষ্ণকথামৃতম্॥ (ভাগবত ১০।১২।৪৩)

হে গুরো ! আমরা পুনঃ পুনঃ আপনার মুখনিঃসৃত পরম মধুর শ্রীকৃষ্ণ লীলা পান করে ধন্য। আমার মনে হয়, এই যে ব্রজলীলার কথা বললেন এ নিশ্চয় গূঢ় আর এতে নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা আছে নাহলে কখনো এমন

হতে পারে না।

মহারাজ পরীক্ষিত যখন শ্রদ্ধাভরে এই প্রশ্ন করলেন শ্রীশুকদেবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের গোপবালকগণসহ পুলিন ভোজনাদি লীলা-স্মৃতির স্ফূর্তি হল এবং তিনি এমনই তন্ময় হয়ে গেলেন, কিছুতেই তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসল না। সূত বলছেন—

'বাদরায়ণি স্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ। কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহিদৃশিঃ শনৈঃ প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম॥' (ভাগবত ১০।১২।৪৪)

শ্রীশুকদেবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তি হওয়ায় তাঁর সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তি স্থিমিত হয়ে গেল। তখন মহারাজ পরীক্ষিত এবং গঙ্গাতীরে সমবেত সমস্ত যোগীন্দ্র মুনীগণ সকলেই সমস্বরে হরিনাম কীর্তন করে শ্রীশুকদেবের বাহ্যজ্ঞান ফেরালেন। তিনি ধীরে ধীরে মুদ্রিত নয়ন ঈষৎ উন্মীলিত করে গদগদ বচনে আবার কৃষ্ণ লীলাকথা বর্ণনা করতে লাগলেন।

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলতে লাগলেন—**'সাধু পৃষ্টং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম'** (ভাগবত ১০।১৩।১) অর্থাৎ হে রাজন্ ! তুমি যে পরমাগ্রহ ও উৎকণ্ঠা সহকারে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করছ, তা তোমাদের ন্যায় ভক্ত চূড়ামণিগণেরই স্বাভাবিক গুণ। হে পরীক্ষিত ! তোমার ন্যায় ভাগ্যবান কেউই নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তোমার পিতামহীর ভ্রাতা, পিতামহের সখা, তোমার গৃহদেবতা আর তোমার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা প্রচার হবে বলে তিনি তোমার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্রতাপ হতে রক্ষা করেন। আর সেই মহাসৌভাগ্য বলেই আজ তোমার শ্রীকৃষ্ণ লীলাকথায় এত আগ্রহ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ কথায় তোমার এত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা আছে বলে তোমার নিকট পরম গোপনীয় কৃষ্ণলীলা-কথা বলতে আমি সদাই প্রস্তুত। প্রেমবান শিষ্যের নিকট গুরু কোনো রহস্যই গোপন করেন না।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায়ে আপনি॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীশুকদেব বলতে লাগলেন হে রাজন্ ! শ্রীনন্দনন্দন সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী অঘাসুরের মুখ হতে গোবৎস ও গোপবালকগণকে রক্ষা করে আর

অঘাসুরকে মুক্তি প্রদান করে, গোপবালক ও গোপবৎসগণসহ যমুনা পুলিনে এসে উপস্থিত হলেন। গোপবালকগণ সখ্যপ্রেমের ঘনীভূত মূর্তি, তাঁরা কেউই কৃষ্ণের সঙ্গে ক্ষণবিয়োগ পর্যন্তও সহ্য করতে পারেন না। যমুনা উপকূলে এসে গোপবালকগণ গোবৎসগণকে যমুনার জল পান করিয়ে তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর কৃষ্ণকে ঘনমণ্ডলাকারে বেষ্টন করে উপবেশন করলেন এবং ভোজনের আয়োজন করতে লাগলেন।

কৃষ্ণের ইচ্ছে— শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণের সঙ্গে পরমানন্দে ভোজন করতে করতে হঠাৎ মনে করলেন যে ঘন ঘন অসুরের উৎপাত হচ্ছে তাতে গোবৎস ও গোপবালকদের সঙ্গে আমার ক্রীড়া বিহারাদিতে বড়ই ব্যাঘাত হচ্ছে। এই তো সেদিন বৎসাসুর এসে আমাদের গোবৎসগণের সঙ্গে মিশে কত অনর্থ করেছিল, তারপর বকাসুর, অঘাসুর আদি কত অনিষ্টকারী অসুরই না এল। আমার সখা গোবালক ও পাল্য গোবৎসগণ আমাকে ছেড়ে একদম থাকতে পারে না। তাই এদের যদি কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে রাখা যায়, তাহলে আমি একাকী বনে এসে সর্ববিধ উৎপাত দমন করে, তার পর নিশ্চিন্ত মনে তাদের সঙ্গে বিহারাদি করতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার চিন্তা করা মাত্র, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া তাঁর যে পূর্ব ইচ্ছা ছিল গোপী ও গোপগণের সন্তান হয়ে তাঁদের বাৎসল্য রস আস্বাদন করাবেন ও বর্তমান ইচ্ছা গোপবালক ও গোবৎসগণের স্থানান্তর করাবেন, এই উভয় ইচ্ছা ফলবতী করতে স্বয়ংচেষ্ট হলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির আধার যোগমায়া এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে সংকল্প করতেই আকাশস্থিত ব্রহ্মার হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ এই ভাব উদয় হল যে গোপবালক ও গোবৎস্যগণকে স্থানান্তরিত করি। তিনি এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলারসে আবিষ্ট হয়ে, তাঁর বাল্যলীলা মাধুর্যে আত্মহারা হয়েছিলেন, এখন তাঁর মনে এই ভাব জাগল যে শ্রীকৃষ্ণের এই বাল্যলীলা রসসিন্ধুর গর্ভে না জানি আরো কত মাধুর্য, কত ভক্তবাৎসল্য রত্নরাজি নিহিত আছে।

ব্রহ্মার মনে এই জল্পনা হওয়ায় তিনি ইতস্তত চারণরত গোবৎসগণকে মায়ামুগ্ধ করার জন্য ব্রহ্মলোক থেকে বৃন্দাবন ধামে অবতরণ করলেন। ব্রহ্মা

প্রথমে গোবৎসগণকে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপবালকগণের দৃষ্টিবহির্ভূত দেখে তাদের মায়ামুগ্ধ করে ব্রজমণ্ডলস্থ কোনো গিরিগুহায় স্থাপন করলেন। এমন সময় যমুনাপুলিনে ভোজনবিলাসে মত্ত গোপবালকগণ, গোবৎসগণকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়লে কৃষ্ণ তাদের রেখে দিয়ে একাই গোবৎস সন্ধানে গেলেন। আর এই অবসরে ব্রহ্মা যমুনা পুলিনে এসে গোপবালকগণকেও মায়ামুগ্ধ করে গোবৎসগণসহ তাদের একই গিরিগুহায় স্থাপন করলেন। ব্রহ্মা যদিও এইভাবে কৃষ্ণের লীলাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় মুগ্ধ হয়ে গোবৎস ও গোপবালকগণকে মায়ামুগ্ধ করে স্থানান্তরিত করেছিলেন কিন্তু তবু তিনি মোহবশত মনে করলেন যে তিনি নিজ মায়ায় এদের মুগ্ধ করে স্থানান্তরিত করেছেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসগণকে না পেয়ে যমুনাপুলিনে ফিরে এসে গোপবালকগণকেও দেখতে পেলেন না। কিন্তু শ্রীভগবানের প্রেমাধীনতা-স্বভাবের কী অনির্বচনীয় মহিমা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক ও গোবৎসগণের প্রেমে আত্মহারা হয়ে, নিজ ভক্তবাৎসল্যগুণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে, বনে বনে 'হা শ্রীদাম ! হা সুবল ! কোথায় তোমরা' বলে রোদন করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে অনেক অন্বেষণ করেও তাঁর বয়স্যদের সন্ধান না পেয়ে চিন্তামণি চিন্তাসিন্ধুতে নিমগ্ন হলেন। শ্রীভগবান সর্বজ্ঞতাদি অনন্ত শক্তির পূর্ণনিকেতন। তিনি যতক্ষণ গোপবালক ও গোবৎসগণের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে, ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমাধীনতা স্বভাবের বশে বনে বনে তাদের খুঁজছিলেন ততক্ষণ তাঁর সর্বজ্ঞতা শক্তি, তাঁর লীলা ও ইচ্ছাশক্তির অধীন হয়ে নিশ্চেষ্ট ছিল। কিন্তু যখন গোপবালক ও গোবৎসগণের প্রতি তাঁর মাধুর্য ভাবের বদলে চিন্তা ভাবনা শুরু হল অমনি ভগবানের সর্বজ্ঞতা শক্তি প্রকাশ পেল। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন ব্রহ্মাই ব্রহ্মলোক থেকে এসে তাঁরই লীলাশক্তি প্রভাবে এবং তাঁরই ইচ্ছাশক্তি পূরণের নিমিত্ত মায়া বিস্তার পূর্বক গোপবালক ও গোবৎসগণকে অপহরণ করে রেখেছেন। ভগবান এও বুঝলেন যে, ব্রহ্মা কিন্তু উল্টে ভাবছেন, তিনি ভাবছেন এসব যেন তাঁরই নিজ মায়ার ফলে সংঘটিত হয়েছে যাতে তাঁর

আরো শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যলীলা দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই এতে বিন্দুমাত্র কুপিত না হয়ে বরং সন্তুষ্ট ই হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন চিন্তা করলেন আমি আমার মাতৃসমা গো এবং গোপীগণের বাৎসল্য ইচ্ছা, আমার নিজ সখা গোপবালকগণের স্থানান্তরণের ইচ্ছা এবং ব্রহ্মার আমার বাল্যলীলা মাধুর্য দেখার ইচ্ছা—এ সকলই পূরণ করব।

ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্তৃং তন্মাতৃণাং চ কস্য চ।

উভয়ায়িতমাত্মানাং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ॥ (ভাগবত ১০।১৩।১৮)

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গো, গোপীগণ এবং ব্রহ্মার ইচ্ছা পূরণের জন্য, তাঁদের আনন্দ বর্ধনার্থে স্বয়ং গোবৎস ও গোপবালকরূপ ধারণ করলেন।

ভগবান শ্রীকষ্ণ এইরূপ অসংখ্য রূপধারী গোপবালক ও গোবৎসাদি রূপ ধারণ করে, নিজেকেই নিজে আদেশ করে, নিজের দ্বারা নিজেই পরিচালিত হয়ে, বন হতে গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তন করলেন। বাৎসল্যবতী গোপরমণীগণ প্রতিদিনই দিবাবসানকালে প্রতিদিনের মতো বেণুরব শ্রবণের জন্য উৎকীর্ণ হয়ে দৌড়ে এলেন। অন্যদিন তাঁরা সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে ছুটে এসে কৃষ্ণকেই কোলে করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আজ তা না করে নিজ নিজ পুত্রকেই কোলে নিলেন এবং অন্যদিন যেমন কৃষ্ণকে আদর করেন আজ তেমন নিজ নিজ পুত্রগণকে আদর করতে লাগলেন। কৃষ্ণপার্ষদ গোপবালক ও গোবৎসগণ মূর্তিমান কৃষ্ণপ্রেম ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে গোপবালক ও গোবৎসরূপে প্রকাশ করে স্বয়ং গো ও গোপীগণের এই অভিনবভাবে বাৎসল্য প্রেম বিবর্ধনপূর্বক তা স্বয়ং বহুরূপে আস্বাদন করলেন এবং তাঁদের মনোবাসনাও পরিতৃপ্ত করালেন।

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিনব লীলাবিলাসে এক বৎসর গোপবালক ও গোবৎসরূপে অতিবাহিত করলেন।

লীলা-৩—শ্রীকৃষ্ণ যেদিন অঘাসুর মোক্ষণ ও গোপবালকগণসহ পুলিন ভোজন করছিলেন, সেদিন বলরাম অন্যান্য দিনের মতো কৃষ্ণের সঙ্গে গোচারণে যাননি। কাজেই তিনি গোবৎসাদি হরণ এবং কৃষ্ণের গোবৎসাদি

রূপধারণ বৃত্তান্তের বিষয় বিন্দুমাত্রও জানতেন না। লীলাময় ভগবানের এমনই প্রভাব, যে লীলায় যাঁর উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকার কথা তাই ঘটে যায়। শ্রীবলরাম সঙ্গে থাকলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তাধীনতাবশত নরলীলায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আনুগত্য লঙ্ঘন করেন না এবং তাঁর ইচ্ছাতেই শ্রীবলরামের সঙ্গে বন ভ্রমণাদি করে থাকেন। কিন্তু অঘাসুর বধের দিন, ব্রহ্মা গোপবালক-গোবৎসাদি হরণ করলে পাছে বলরামের কষ্ট হয় তাই যোগক্রমে সেইদিনই বলরামের জন্মনক্ষত্র হল এবং মাঙ্গলিক কার্যানুষ্ঠানের জন্য তাঁর জননী তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আসতে দেননি। আবার একবছর পরে যখন ব্রহ্মার ভ্রমমুক্তি হল, গোপবালক ও গোবৎসগণ গিরিগুহা থেকে মুক্ত হলেন এবং ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণস্তুতিতে প্রবৃত্ত হলেন তখনও বলরাম জন্মনক্ষত্র হেতু শ্রীকৃষ্ণর সঙ্গে আসেননি পাছে এতে ব্রহ্মার সংকোচ হয়।

যাইহোক শ্রীকৃষ্ণের এই অভিনব লীলাপ্রকাশের যখন এক বছর পূর্ণ হতে পাঁচ ছয় দিন বাকি আছে, তখন শ্রীকৃষ্ণ ঠিক করলেন বলরামকে এ ঘটনা বলে দেবেন। সেদিন শ্রীদাম, সুবলাদি গোপবালকগণের পিতা, কাকা প্রভৃতি গোপগণ গোবর্ধন পর্বতের উপর স্থিত সমতল ক্ষেত্রে গোচারণা করছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকসহ গোবৎসগণকে নিয়ে পর্বতের তটদেশে গোবৎস চারণা করাচ্ছিলেন। সেই সময় নানাবিধ হাস্যকৌতুক করতে করতে কৃষ্ণ, বলরামসহ গোপবালকগণ শিঙ্গা বেণুরব করতে লাগলেন। অতি উচ্চ ও দূরস্থান থেকে গোরুরা তাদের বাছুর দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। তারা ঘন ঘন হাম্বা রব করতে করতে তাদের বাছুরগণের নিকটে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হল। গোগণকে এইভাবে চঞ্চল হতে দেখে বয়স্ক গোপগণ লাঠি হাতে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। কিন্তু গোপগণের শত চেষ্টা ব্যর্থ হল, গোগণ বাৎসল্যস্নেহে আত্মহারা হয়ে ঊর্ধ্বমুখে ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে বলিষ্ঠ গোপগণকে হেলাভরে অতিক্রম করে এবং কণ্টক বৃক্ষাকীর্ণ ও প্রস্থর খণ্ড পরিব্যাপ্ত দুর্গম পথ অতিক্রম করে দ্রুতবেগে গোবর্ধন পর্বত তটস্থ বৎসগণের নিকটে উপস্থিত হল। এই গাভীগণ তাদের দু-তিন-দিন পূর্বের

জাত বৎসগণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, তাদের মুক্তস্তন্য বাছুরদের নিকট এসে পরম স্নেহে, পরম আনন্দে তাদের লেহন করতে লাগল। যাদের মন কৃষ্ণের জন্য ব্যস্ত হয়, তারা কোনো প্রতিবন্ধকতাই মানে না এবং কৃষ্ণোদ্দেশে তাদের উদ্দাম গতিকে কেহই বাধা দিতে পারে না।

এইভাবে অসংযত ধেনুপালকগণকে সংযত করতে না পেরে বয়স্ক গোপগণ বিশেষ লজ্জিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হল। তাঁরা মনে করলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণের শিঙ্গা বেণু বাজানোর ফলেই আমাদের ধেনুপাল একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিল। এই কথা চিন্তা করে নিজেদের অক্ষমতার জন্য লজ্জিত এবং গোপবালকগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের শাসন করার জন্য তারা ক্রোধারক্তনয়নে লাঠি হাতে গোবর্ধন শিখর থেকে তাড়াতাড়ি নিচে নামলেন। গোপবালকগণও পিতা, পিতৃব্য আদিকে অতি ক্রুদ্ধ হয়ে আগত দেখে ভয়-বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। গোপগণ কিন্তু পর্বতের নিচে এসে তাদের গাভীগণের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে তারা পরম স্নেহে তাদের বাছুরদের বাৎসল্যক্ষরিত স্তন্যদুগ্ধ পান করাচ্ছেন। তারপর গোপবালকগণের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন তারা এক অভিনব বালমাধুর্যে পর্বতের তটদেশ আলোকিত করে ভীতচকিত নয়নে দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখামাত্র তাদের কী হল ? **'তদীক্ষনোৎ প্রেমরসাপ্লুতাশয়া জাতানুরাগা গতমন্যাবোহর্ভকান্'** (ভা. ১০।১৩।৩৩) সেই গোপগণের ক্রোধ তৎক্ষণাৎ একেবারেই শান্ত হয়ে গেল আর হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হয়ে গেল। তাদের হাত থেকে লাঠি মাটিতে খসে পড়ে গেল আর তারা নিজ নিজ পুত্রগণকে প্রেমকম্পিত হাতে কোলে নিয়ে, বুকে চেপে ধরে শত শত বার মুখ চুম্বন করে, পুনঃ পুনঃ মস্তক আঘ্রাণ করতে লাগলেন। গোপগণ এইভাবে অনেকক্ষণ আনন্দসিন্ধুতে মগ্ন রইলেন তারপর অতি কষ্টে গাভীগণকে একত্রিত ও সংযত করে প্রেমাশ্রুসিক্তনয়নে তাঁদের পুত্রদের দিকে সজল দৃষ্টিপাত করতে করতে গোবর্ধনশিখর অভিমুখে গমন করলেন।

বলরাম কৃষ্ণ স্কন্ধে বাম অঙ্গ হেলান দিয়ে এত সব কিছু দেখছিলেন। তিনি বিস্মিত লোচনে এইসব দেখে চিন্তা করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই এই অভাবনীয় ঘটনার নির্দেশ করতে পারলেন না। তিনি বিচার করলেন যে নিজ আত্মাকে অনাদর করে কেহ কখনই পুত্রাদি আত্মীয়গণকে ভালোবাসতে পারে না, কিন্তু কী আশ্চর্য আমি এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ দেখছি। এই সমস্ত গোপগণ চিরদিনই 'কৃষ্ণের সখা' মনে করেই নিজ নিজ পুত্রাদিকে ভালোবাসতেন, কিন্তু এখন দেখছি তারা সে সম্বন্ধ ভুলে এখন নিজ 'পুত্র বুদ্ধিতেই' তাদের ভালোবাসছে। এরকম ভাববৈষম্য কেন হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না। আজ কী আশ্চর্য, সকল আত্মার আত্মীয় শুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট ও নিকটে থাকলেও সকল গো, গোপ এমনকি আমার ভালবাসাও শ্রীকৃষ্ণ ছাড়াও গোপবালক ও গোবৎসদের প্রতি সমানভাবে যাচ্ছে কেন ? গোপগণ তাদের পাঁচ বছরের বাচ্চাদের এমন ভাবে কোলে করে আদর করছেন যেন স্তন্যপায়ী শিশুদের মা তাদের বাচ্চাদের কোলে নিয়ে আদর করছে আর জগতের সব ভুলে গেছে। গাভী ও গোপগণের এইরকম সন্তান বাৎসল্যভাব আর সন্তান পালনের উৎকণ্ঠা আগে কখনই দেখিনি। এরকম ভাববৈষম্য কেন হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না। আজ এরকম অভাবনীয় দৃশ্য কেন দেখছি ?

বলরাম ভাবছেন—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্যুতাসুরী।

প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥

(ভাগবত ১০।১৩।৩৭)

অর্থাৎ কোন সে অঘটন পটীয়সি মহাশক্তির প্রভাবে আমার এই প্রকার ভাবান্তর ঘটল আর এই মহাশক্তি কোথা হতেই বা আসল ?

এ কি দেবমায়া, নরমায়া না আসুরী মায়া ! এ সব মায়ায় তো আমাকে মোহিত করতে পারা উচিত নয়। কৃষ্ণ যেখানে থাকে, সেখানে তো মায়ার প্রভাব কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

কৃষ্ণ সূর্য সম মায়া ঘোর অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

বলরাম ভাবছেন কেন গোপবালক ও গোবৎসগণকে দেখে আমিও মুগ্ধ হয়ে পড়ছি, কেন আমারও তাদের কৃষ্ণের মতো সমভাবে ভালোবাসতে ইচ্ছা করছে। এতো কোন অসুরের মায়া হতে পারে না, কেননা অসুরের মায়া তো গোপবালক ও গোবৎসগণকে মুগ্ধ করলেও আমাকে কিছুতেই মুগ্ধ করতে পারবে না। বলরাম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় ব্যূহ মূল সংকর্ষণ হলেও, তিনি কৃষ্ণপ্রেমাবশে নিজ সর্বজ্ঞতা ভুলে অজ্ঞের ন্যায় কৃষ্ণলীলায় সহায়তা করে থাকেন। অবশ্য প্রয়োজন হলেই তাঁর নিত্যসিদ্ধ সর্বজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

আজও যেমনি বলদেব, নিবিষ্টচিত্তে গোপবালক ও গোবৎসগণের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন, অমনি তিনি দেখলেন যে কৃষ্ণই অসংখ্য গোপবালকরূপে গোপগণের কোলে উঠে তাদের বাৎসল্যপ্রেমের পরমাদর আস্বাদন করছেন এবং কৃষ্ণই অসংখ্য গোবৎসরূপে গো-গণের বাৎসল্য প্রেমক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করছেন। এ দেখে বলদেব চমৎকৃত হলেন, বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি বামবাহু দ্বারা কৃষ্ণের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁর চিবুক ধরে অনিমেষ নয়নে তাঁর মুখারবিন্দ পানে চেয়ে যেন ইঙ্গিতের ভাষায় বললেন—ওরে ! প্রেমের পাগল ! তোমার কি যশোদা-নন্দরূপে গো-গোপ গোপীগণের প্রেমরসাস্বাদন করেও তৃপ্তি হল না ? এখন তুমি নিজেই অসংখ্য গোপবালক আর গোবৎসরূপ ধারণ করে গোপ ও গো-গণের বাৎসল্য প্রেমরসাস্বাদন করছো ! ভাই, তোমার প্রেমাধীনতায়, তোমার ভক্তবাৎসল্য সিন্ধুতে গোলোক হতে ভূলোক পর্যন্ত ডুবে আছে, আর কত ভক্তবাৎসল্য দেখাবে ভাই ! তোমার এক মূর্তির খেলাতেই প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সর্বজগৎ পাগল হয়ে আছে, তুমি যদি অনন্ত মূর্তিতে খেলা আরম্ভ করো, তাহলে জগতের কী গতি হবে ?

তুমি অচিন্ত্য অনন্ত লীলার উৎস, তোমার লীলা বোঝার শক্তি এ জগতে কারোর নেই। ভাই কৃষ্ণ ! তোমার এই অসংখ্য গোপবালক ও গোবৎস রূপ ধারণে কী গূঢ় রহস্য আছে, তা তুমি না জানালে আমি কিছুতেই জানতে পারব না। বলরাম এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরমাদ্ভূত লীলার রহস্য জানবার জন্য ব্যাকুল হলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অঘাসুর মোক্ষণ, ব্রহ্মাদি দেবগণের আকাশপথে আগমন, পুলিন ভোজনে ব্রহ্মার বিস্ময়, গোপবালক ও গোবৎসাদি হরণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপবালকাদির অন্বেষণ ও পরিশেষে গোপবালক ও গোবৎসরূপ ধারণ করে গৃহে আগমন প্রভৃতি সমস্ত লীলা-রহস্যই জানিয়ে দিলেন—**'বৃত্তং প্রভুণা বলোঽবৈৎ'** (ভাগবত ১০।১৩।৩৯)।

বলদেব এই সমস্ত লীলারহস্য জানতে পেরে একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হলেন। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে অচিন্ত্য, অনন্ত লীলাসিন্ধু কৃষ্ণের এই সমস্ত অসম্ভাবনীয় ও অচিন্ত্যনীয় লীলারহস্য বুঝতে পারে এমন সাধ্য কারোর নেই। একমাত্র কৃষ্ণের কৃপায় এই রহস্যর কিছু মর্মগত হওয়া যায়। দেখা যাক এই পরম অনির্বচনীয় লীলার পরিণাম কী হয় !

লীলা-৪—এইভাবে অভিনব লীলারসাস্বাদন করতে করতে এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে আর লীলাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করলেন, এবার ব্রহ্মার মোহমুক্তি করে গোপবালক ও গোবৎসগণের হরণলীলা সমাপ্ত করবেন। লীলাময়ের লীলাশক্তির এমন আশ্চর্য যোগাযোগ যে, তাঁর লীলায় যার উপস্থিতি দরকার বা যার অনুপস্থিতির প্রয়োজন তাই ঘটে যায়। ব্রহ্মার গোবৎস হরণের দিন আর তার ঠিক এক বছর পূর্ণ হওয়ার দিন যেদিন ব্রহ্মা আবার ফিরে আসবেন, সেইদিন লীলাময়ের লীলারসাস্বাদনে বলরামের উপস্থিতি পাছে ব্যাঘাত ঘটায় তাই লীলাশক্তির প্রেরণায় বলরামের জন্মনক্ষত্র যোগ উপস্থিত হল আর সেই হেতু মাঙ্গলিক কর্মানুষ্ঠানের জন্য বলরামের বনে আসা হল না। ব্রহ্মাকে কৃতার্থ করার জন্য কৃষ্ণ গোপবালক ও গোবৎসসহ নিভৃত বনে এসে উপস্থিত হয়ে নানাবিধ বাল্যক্রীড়ায় রত হলেন।

এদিকে ব্রহ্মাও গোবৎসাদি হরণ করে ব্রহ্মলোকে গিয়ে **'আত্মমানেন ত্রুটনেহসা'** অর্থাৎ তাঁর নিজ সময়ের ত্রুটির (ক্ষণিককাল) মধ্যেই বৃন্দাবনে ফিরে এলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন বৃন্দাবনের যমুনা পুলিনে তখনও কৃষ্ণ গোপবালকগণের সঙ্গে মত্ত হয়ে গোষ্ঠক্রীড়া করছেন। লীলাময়ের লীলাভঙ্গি দেখে ব্রহ্মা স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে গোবৎসাদি হরণের পর এক বছর কেটে গেলেও একদিনের জন্যও কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা রসাস্বাদনে বিরাম ঘটেনি। কী করে এইকরম ঘটনা ঘটল এই চিন্তা করে ব্রহ্মা পুনরায় যে স্থানে গোপবালক ও গোবৎসগণকে মায়ামুগ্ধ করে স্থানান্তরিত করেছিলেন সেইস্থানে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন সমস্ত গোপবালক ও গোবৎসগণ পূর্বের মতো অচেতন অবস্থাতেই পড়ে আছেন। ব্রহ্মা এইভাবে যুগপৎ একই গোপবালক ও গোপবৎসগণকে মায়ানিদ্রায় নিদ্রিত আবার কৃষ্ণের সঙ্গেও ক্রীড়ারত দেখে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মোহিত হয়ে তাঁর অষ্টলোচন বিস্ফারিত করে অনিমেষে তাদের দিকে চেয়ে রইলেন। কমলযোনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মা বহুক্ষণ সমাধিস্থ হয়েও এর কুলকিনারা করতে পারলেন না।

সিদ্ধান্ত এই যে, সাধারণ জীবগণ চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় দ্বারা নিজ নিকটস্থ বস্তু ছাড়া অন্য কিছুই দেখতে পায় না। কিন্তু যোগিগণের যোগদৃষ্টিতে কোনো কিছুই অদৃশ্য থাকে না। এর মধ্যে আবার যুঞ্জান ও যুক্তভেদে যোগিগণ দ্বিবিধ। যুঞ্জান যোগিগণ বাহ্যদৃষ্টিতে সর্ববিধ বস্তু প্রত্যক্ষ করতে না পারলেও ধ্যানস্থ হয়ে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সর্ববস্তু ও সর্ববিষয়ে দেখতে ও জানতে পারেন। কিন্তু যুক্ত যোগিগণের কিছু দেখতে বা জানতে ইচ্ছে হলে ধ্যানস্থ হওয়ার প্রয়োজন হয় না, তাঁরা বাহ্যদৃষ্টিতে সমস্তই দেখতে বা জানতে পারেন।

ব্রহ্মা, রুদ্র, নারদ, চতুঃসন প্রভৃতি সকলেই যুক্তযোগী। এঁরা বাহ্যদৃষ্টিতেই সমস্ত দেখতে বা জানতে পারেন বটে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-লীলার কাছে সকলের সকল শক্তিই কুণ্ঠিত হয়ে যায়। বাহ্যদৃষ্টিতে কৃষ্ণের এই অভিনব লীলার তথ্য জানা তো দূরের কথা, সমাধিস্থ হয়ে বহুক্ষণ অন্তর্দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করেও যুক্তযোগী ব্রহ্মা এর কোনো তথ্যই আবিষ্কার করতে

পারলেন না।[১] ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর মায়াজাল বিস্তার করতে গিয়ে ব্রহ্মা স্বয়ং নিজেই মহাপরাধ জালে জড়িয়ে পড়লেন।

ব্রহ্মা যখন মুগ্ধ ও স্তব্ধ হয়ে অনিমেষ নয়নে ব্রজরাজ নন্দনের গোপবালকের সঙ্গে বিবিধ লীলা তন্ময় ও আত্মহারা হয়ে প্রত্যক্ষ করছেন তখন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অভিনবভাবে মহাভিনয়ে পটপরিবর্তন হয়ে গেল।

তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ।
বদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ॥

(ভাগবত ১০।১৩।৪৬)

সমস্ত গোপবালকের চরণের নূপুর, হাতে শিঙ্গা বেণু, কক্ষের পাঁচনী লাঠি আদি সকলই বদলে গেল আর এ সমস্তই চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্যামলসুন্দর মূর্তিতে ব্রহ্মার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হলেন। দেখতে দেখতে গোবৎসগণ ও তাদের পদ, পুচ্ছ, গলবদ্ধ ঘণ্টা প্রভৃতিও চতুর্ভুজ শ্যামসুন্দর মূর্তিতে ব্রহ্মার দৃষ্টি গোচর হল। ব্রহ্মা আরো দেখলেন অগণিত শ্যামলসুন্দর মূর্তির চারিদিকে অগণিত ব্রহ্মাণ্ড এবং তদস্থিত প্রতিটির অগণিত ব্রহ্মা থেকে কীটাণু পর্যন্ত সর্বজীব, সমস্ত জড় পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ সকলেই নিজ নিজ মূর্তিতে সেই অগণিত শ্যামলসুন্দর মূর্তির চরণপ্রান্তে উপস্থিত। তাঁরা সকলেই কেহ নৃত্য, কেহ গীত, কেহ বাদ্য, কেহ বা স্তবপাঠ, কেহ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে নিজ নিজ অধিকার অনুসারে সেই শ্যামল সুন্দর মূর্তির সেবায় রত। অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব আদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ সকলেই সেই শ্যামলসুন্দর মূর্তির মহাপ্রভাবে নিষ্প্রভ হয়ে, নিজ নিজ প্রভুত্ব বিসর্জন দিয়ে তাঁর সেবাতেই আত্মনিয়োগ করেছেন।

এই সমস্ত পরমাশ্চর্য দর্শনে ব্রহ্মা একেবারে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে

---

[১]এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ॥

(ভাগবত ১০।১৩।৪৪)

গেলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন এ আমি কী দেখছি! জগৎসৃষ্টির পূর্বে যাঁর নাভিকমলে বসে কত শত শত বছর তীব্র তপস্যা করে যাঁকে দেখতে পাইনি, আজ সেই পরমপূজ্য ব্রহ্মাণ্ডপতির অসংখ্য মূর্তি আমার সম্মুখে স্বয়ং প্রতিভাত, এ কি সত্য না আমার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে। এই কথা চিন্তা করতে করতে ব্রহ্মা একেবারে মহাভয় ও বিস্ময়ে জড়ীভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর চক্ষুঃকর্ণ আদি একাদশ ইন্দ্রিয় একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়ল এবং তিনি অচেতন প্রায় হয়ে নিজবাহন হংসের উপর পতিত হলেন।

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ **'চ্ছাদাজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোঽজাজবনিকাম্'** (ভাগবত ১০।১৩।৫৭) অর্থাৎ তাঁর যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য দেখেই ব্রহ্মার ওইরূপ অবস্থা দেখে শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করলেন, ব্রহ্মাকে আর এই ঐশ্বর্য দেখানো উচিত হবে না। অমনি ব্রহ্মার দৃষ্টি থেকে যোগমায়া অপসারিত হলেন আর মায়া-যবনিকা প্রসারিত হল। অতঃপর ব্রহ্মা আবার আগের মতো গোপবালক ও গোবৎসগণসহ গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণকে দেখলেন।

এখানে বক্তব্য এই যে, বহির্মুখ জীবের দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করে মায়া-যবনিকা প্রসারিত আছে, যার ফলে শ্রীভগবানের স্বরূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য কারো দৃষ্টিগোচর হয় না। ভগবানের ঐশ্বর্য মাধুর্য এসবই উপলব্ধ হয় তাঁরই কৃপাসাপেক্ষে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— **'মামেব য প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'** (গীতা ৭।১৪) অর্থাৎ তাঁর শরণাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত নিজ শক্তিতে যদি কেউ এই মায়া যবনিকা অপসারণ করতে চেষ্টা করে তবে সে কখনই ভগবানের স্বরূপ, ঐশ্বর্য বা মাধুর্য আস্বাদন করতে পারে না। যাইহোক এবার ব্রহ্মা যেন এক নতুন জীবন পেয়ে নতুন দৃষ্টিতে নতুন জগৎ দেখতে লাগলেন। বিস্ময় ও কৌতূহল বিজড়িত দৃষ্টিতে ব্রহ্মা যেদিকে তাকান দেখেন সবই নতুন—সবই মধুর।

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষকাদিকম্॥ (ভাগবত ১০।১৩।৬০)

ব্রহ্মা দেখছেন—শ্রীবৃন্দাবনে স্বাভাবিক বৈরভাবযুক্ত মানুষ, বাঘ, বিড়াল, ইঁদুর, সাপ-বেজি আদি প্রাণিগণ পরস্পর মিত্রভাবে বাস করছে। শ্রীভগবানের এই লীলাভূমিতে ক্ষুধা, পিপাসা, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির লেশমাত্র গতি নেই। এখানে নরনারী, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, তরুলতা প্রভৃতি সকলেই নিশ্চিন্ত, সকলেই উৎফুল্ল। এখানে যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় সেদিকেই নিরাবিল আনন্দের ছড়াছড়ি, নির্মল প্রেমের গলাগলি আর অপ্রাকৃত ভাবোচ্ছ্বাসের মাতামাতি। ব্রহ্মা যতই দেখেন ততই শ্রীবৃন্দাবনের অভিনব মাধুর্য-সিন্ধুর মহাপ্লাবনে তাঁর হৃদয় ভেসে যায়। ব্রহ্মা, অশ্রুসিক্ত অষ্টলোচন বিস্ফারিত করে দেখলেন যে, তাঁর সম্মুখে কোটি সূর্যের মতো দীপ্তিশালী শ্যামল চতুর্ভুজমূর্তি অথবা অসংখ্য গোপবালক বা গোবৎস নেই— আছে কেবল অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য-মাধুর্য নিকেতন, গোপবালক নরাকৃতি পরব্রহ্ম। ব্রহ্মা দেখলেন এই সেই বৃন্দাবন যেখানে প্রকাশিত পরব্রহ্মের সবই অচিন্ত্যনীয়, সবই পরম মধুর।

শ্রুতি বলছেন, ব্রহ্ম **'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং'** অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদিবিহীন, কিন্তু ব্রহ্মা দেখলেন ব্রজরাজনন্দনের মূর্তির রূপের ছটায় বনভূমি আলোকিত, বাঁশীর তানে স্থাবর-জঙ্গম আলোড়িত, চরণস্পর্শে বনভূমি আর করস্পর্শে বৃক্ষলতাদি শিহরিত।

শ্রুতি বলছেন, ব্রহ্ম **'অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা'** অর্থাৎ তিনি হস্ত-পদবিহীন কিন্তু তিনি দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ সপাণি রূপে বিরাজিত। সেই এক বৎসর পূর্বে দেখা দধিমাখা অন্নের গ্রাস এখনও বৃন্দাবনে প্রকাশিত ব্রহ্মের হস্তে অবিকৃত ভাবেই অবস্থিত। শ্রুতি বলছেন ব্রহ্ম **'একমেবাদ্বিতীয়ং'** অর্থাৎ তিনি এক ও দ্বিতীয়বিহীন। কিন্তু ব্রহ্মা দেখছেন বৃন্দাবনে প্রকাশিত ব্রহ্মর একাকী থাকতে ভাল লাগে না, তিনি গোপবালক ও গোবৎসদের সঙ্গে গোষ্ঠক্রীড়া করতেই ভালোবাসেন। শ্রুতি বলছেন, **'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'** অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্বব্যাপী। কিন্তু ব্রহ্মা দেখলেন বৃন্দাবনে প্রকাশিত

ব্রহ্মা—অজ্ঞের মতো, মুগ্ধের মতো 'কোথায় আমার গোপবালক', 'কোথায় আমার গোবৎস' বলে বনে বনে তাদের অন্বেষণে ব্যস্ত।

নরাকৃতি পরব্রহ্মর এই প্রকার মহিমা দেখে ব্রহ্মা আর আকাশপথে নিজ বাহনের ওপর উপবিষ্ট থাকতে পারলেন না। শ্রুতি বলেন, **'ন দেবা ভুবি স্পৃশন্তি'** অর্থাৎ ভূমিস্পর্শ হয় না, কিন্তু ব্রজরাজনন্দনের চরণে শরণাগত হয়ে নিজ অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থনা করবার জন্য ব্রহ্মা ভূলোকে এসেছেন, তাই এখন তাঁর দেহাভিমান নেই আর তাই ভগবানের কৃপাস্পর্শে তিনি বৃন্দাবনভূমির স্পর্শ-অধিকার পেলেন। যাই হোক ব্রহ্মা সত্বর নিজ বাহন থেকে নেমে ব্রজরাজ-নন্দনের চরণাগ্রে লম্বিত হয়ে পড়লেন।

উত্থায়োত্থায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্।
আস্তে মহিত্বং প্রাগ্‌দৃষ্টং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ ॥

(ভাগবত ১০।১৩।৬৩)

অর্থাৎ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের যে মহামহৈশ্বর্য দর্শন করেছেন তা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করতে করতে বারে বারে শ্রীকৃষ্ণর চরণে পতিত ও উত্থিত হতে লাগলেন। তিনি মনে মনে বোধ করলেন যে, আমার মস্তক থেকে অনাদিসঞ্চিত অভিমানের বোঝা নেমে গেল, আজ আমি চিরকৃতার্থ হলাম।

এইভাবে পড়ে থেকে, কিয়ৎকাল পরে ব্রহ্মা, প্রেমজড় ও মহাপরাধ কম্পিত কলেবরে ধীরে ধীরে উঠে শ্রীকৃষ্ণের চরণাগ্রভূমিতে নতজানু হয়ে আবার উপবেশন করে অপরাধজনিত লজ্জায় অধোবদন হয়ে গদগদ বচনে ব্রজরাজনন্দনের স্তুতি করতে প্রবৃত্ত হলেন।

———o———

ব্রহ্মার স্তুতি

(দশম স্কন্ধ চতুর্দশ অধ্যায়, শ্লোক ১-৪০)

প্রাক্‌কথন

ব্রহ্মার বর্তমান স্তুতিটি দশম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে এক থেকে চল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত পাঁচটি স্তবকে উক্ত।

ভগবানের ভক্তাধীনতা—	শ্লোক ১-৮
ব্রহ্মার দীনতা—	শ্লোক ৯-১৯
ভগবৎ মহিমা কীর্তন—	শ্লোক ২০-২৯
গোপিনীগণের প্রেমাধীনতা—	শ্লোক ৩০-৩৬
ব্রহ্মার কৃপা প্রার্থনা—	শ্লোক ৩৮-৪০

ভগবানের ভক্তাধীনতা (শ্লোক ১—৮)

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায় ।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ ১

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥ ২

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে-
প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ৩

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ৪
পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্॥ ৫
তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা॥ ৬
গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥ ৭
তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ৮

সরলার্থ— ব্রহ্মা বললে, প্রভু ! নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্তব-বাণীর দ্বারা বন্দনাযোগ্য একমাত্র আপনিই। আমি আপনার চরণে প্রণতি জানাচ্ছি। নবীননীরদশ্যামল আপনার দেহ, তাতে স্থির সৌদামিনীর মতো শোভা পাচ্ছে উজ্জ্বল পীতবসন। আপনার গলার গুঞ্জীমালা, কানে মকরাকৃতি কুণ্ডল, মাথায় ময়ূরপুচ্ছের দীপ্তিতে আপনার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। বক্ষে লম্বিত বনমালা, হাতে অন্নের গ্রাস, কক্ষে বেত ও শিঙ্গা, কটিদেশের বন্ধনীতে বাঁশরী, যা যা আপনার অঙ্গসঙ্গ লাভ করেছে— সব কিছুর মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে আপনার অসীম সৌন্দর্যের দ্যুতি। কমল-কোমল চরণদ্বয়ে ধরাতল স্পর্শ করে বিরাজ করছেন আপনি গোপ-বালকের মনোহর বেশে ! (আমি আর কিছুই চাই না, ওই দুটি চরণে নিজেকে সমর্পণ করলাম !) ॥ ১ ॥ হে স্বপ্রকাশ !

ভক্তজনের অভিলাষ পূরণের জন্যই আপনার এই বিগ্রহধারণ, আমার প্রতি আপনার কৃপা-প্রসাদস্বরূপ আপনার চিন্ময়ী ইচ্ছার এই মূর্তিমান প্রকাশ ঘটিয়েছেন আপনি। এতো ভৌতিক স্থূল দেহ নয়, অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বময় এই তনুর অলৌকিক মহিমা আমি বা অন্য কেউই সমাধির দ্বারাও নির্ণয় করতে সক্ষম নয়। সেক্ষেত্রে, কেবল আত্মানন্দ-অনুভবস্বরূপ সাক্ষাৎ আপনার মহিমা সর্বতো-নিরুদ্ধ অন্তর্মুখী একাগ্র মনের সাহায্যেও কারও পক্ষেই কি জানা সম্ভব ? ২ ॥ তাই আপনাকে জানার এই উদগ্র প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে, যেখানে যেমন স্থিতিতে আছেন, সেখানেই স্থিরভাবে শান্ত থেকে যাঁরা কেবল সজ্জন সংগতিকেই আশ্রয় করেন, আপনার প্রেমিক ভক্তগণের মুখে উদ্‌গীত আপনার লীলা-গুণগান—যা তাঁদের সঙ্গ করলে স্বতঃই শোনার সৌভাগ্য হয়—কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে সেবন করতে করতে শেষ পর্যন্ত তাকেই নিজেদের জীবনস্বরূপ করে ফেলেন, তার অভাবে প্রাণধারণ করতেও সমর্থ হন না, প্রভু ! আপনি তাঁদের প্রেমের অধীন হয়ে পড়েন ; হে অজিত ! ত্রৈলোক্যে চির-অপরাজিত হয়েও আপনি, তাঁদের কাছে পরাজিত হন॥ ৩ ॥ হে সর্বব্যাপী প্রভু, আপনার প্রতি ভক্তিই সর্ববিধ কল্যাণের উৎস—অভ্যুদয় থেকে মোক্ষ সবই ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। তা সত্ত্বেও যারা সেই ভক্তিকেই পরিত্যাগ করে কেবল জ্ঞানলাভের জন্য বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করে, তাদের কিন্তু সেই কষ্টই সার হয়, আর কিছুই লাভ হয় না। ঠিক যেমন, যার ভিতরে চালের দানা নেই, সেই তুষ অবহনন করলে (কুটলে) শুধু পরিশ্রমই সার হয়, চাল পাওয়া যায় না॥ ৪ ॥ হে অচ্যুত ! হে অনন্ত ! পুরাকালেও এই লোকে বহু যোগী যোগাদি সাধনার দ্বারা বহুপ্রকারে আপনাকে লাভ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে সফলতা লাভ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের সকল প্রয়াস তথা বৈদিক এবং লৌকিক সমস্ত কর্মই আপনার চরণে সমর্পণ করেছেন। এইভাবে কর্মসমর্পণের ফলে এবং আপনার লীলাকথা শ্রবণে নিষ্ঠারতি জন্মানোয় তাঁদের আপনার প্রতি ভক্তিলাভের সৌভাগ্য হয় এবং সেই ভক্তির মাহাত্ম্যে অচিরেই আপনার স্বরূপের উপলব্ধি তথা পরমপদ প্রাপ্তি—সবই তখন তাঁদের অনায়াসে সাধিত হয়॥ ৫ ॥ হে অসীমস্বরূপ ! আপনার সগুণ এবং নির্গুণ—এই উভয় রূপেরই

জ্ঞান অত্যন্ত কঠিন হলেও ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যাহারের দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণে আপনার নির্গুণস্বরূপের মহিমা অনুভূত হতে পারে। তার প্রক্রিয়া এইরূপ : বিশেষ আকারকে পরিত্যাগ করে আত্মাকার অন্তঃকরণে সাক্ষাৎকার ঘটে। এই আত্মকারতা ঘট-পটাদি রূপের (বিষয়ের) মতো জ্ঞেয় পদার্থের সাক্ষাৎকার নয়, কিন্তু কেবলমাত্র আবরণ-ভঙ্গ। 'এই ইনিই ব্রহ্ম', 'আমি ব্রহ্মকে জানলাম' ইত্যাদি রূপেও এই সাক্ষাৎকার ঘটে না, কিন্তু স্বপ্রকাশ-রূপেই তা স্ফুরিত হয়॥ ৬ ॥ কিন্তু হে ভগবন্ ! আপনার সগুণ-স্বরূপের গুণসমূহের পরিমাপ কে করবে ? বহুকালের বহুজন্মের পরিশ্রমে হয়তো কোনো কোনো সুদক্ষ সমর্থ পুরুষ পৃথিবীর ধূলিকণাসমূহ, কিংবা অন্তরীক্ষের হিমকণারাশি অথবা আকাশের জ্যোতিষ্কগুলির কিরণ পরমাণু নিচয়েরও গণনা করতে পারেন, কিন্তু অশেষ কল্যাণগুণের আকর আপনার সমগ্র গুণাবলীর নিঃশেষে অবধারণ দূরে থাক, তার সামান্য ভগ্নাংশেরও পরিমাপ করার সাধ্য তাদের হবে না। সেই আপনিই জগতের কল্যাণবিধানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, আপনার এই মহিমার রহস্য ভেদ করা বা তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করাও অপরের পক্ষে দুরূহ॥ ৭ ॥ এইজন্যই প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইসব তত্ত্ববিচারের পথে গিয়ে জীবনের অমূল্য সময়ের অপচয় ঘটান না। তিনি জগৎ-সংসারের চতুর্দিকেই আপনার করুণার স্রোতধারা নিত্যবহমান দেখতে পান, সমগ্র হৃদয় তাঁর উন্মুখ হয়ে থাকে, তিনি নিশ্চিত জানেন আপনার করুণা-কিরণে তাঁর জীবনেরও সমস্ত অন্ধকার একদিন এক নিমেষেই তিরোহিত হবে। তাই নিজের প্রারব্ধ অনুসারে সুখ বা দুঃখ যা-ই আসুক না কেন, তা তিনি সমভাবে নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করেন। তাঁর হৃদয়, তাঁর বাণী, তাঁর শরীর আপনারই চরণতলে লুটিয়ে থাকে, তাঁর সমগ্র জীবনটিই হয়ে ওঠে আপনার উদ্দেশে সমর্পিত একটি নৈবেদ্য-স্বরূপ। আর এইভাবেই পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের যেমন আপনা হতেই উত্তরাধিকার জন্মায়, তার জন্য যেমন তাকে পৃথকভাবে বিশেষ কোনো প্রয়াস করতে হয় না, সেইরকমেই আপনার পরমপদে তাঁর অধিকার হয় স্বতঃসিদ্ধ, মোক্ষাদিসম্পদ তাঁর পক্ষে হয় অপরিমিত বিত্তশালীর পুত্রের অযত্নার্জিত পৈতৃক রিক্‌থ[১] (উত্তরাধিকার-সূত্রে

[১]ধন (ভাগবত ১।১০।১০)

প্রাপ্ত ধনসম্পদ) ! ৮ ॥

মূলভাব—ব্রহ্মা করজোড়ে নতজানু হয়ে বলছেন—**হে ঈড্য ! তে নৌমি** অর্থাৎ হে জগৎ বন্দনীয় আমি আপনার স্তবে প্রবৃত্ত হলাম। অনেকে অনেক দেবতার পূজা করেন কিন্তু তা প্রকারান্তরে আপনারই পূজা।

আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্বদেব নমস্কারং কেশবং প্রতিগচ্ছতি॥ (মহাভারত)

অর্থাৎ যেমন আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টি যেখানেই পড়ুক না কেন সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়, তেমন যে-কোনো দেবতার উদ্দেশেই অর্চনা করা হোক না কেন তা শ্রীগোবিন্দ-চরণাভিমুখেই পতিত হয়।

শ্রীমদ্‌ভগবদগীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ (গীতা ৯।২৩)

অর্থাৎ হে অর্জুন ! যারা শ্রদ্ধাপূর্বক অন্য কোনো দেবতার উপাসনা করে, তারা প্রকারান্তরে আমারই উপাসনা করে, কিন্তু তাদের সেই উপাসনা হয় অবিধিপূর্বক।

অতঃপর ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করে ব্রহ্মা বলছেন— **'মৃদুপদে তে নৌমি'** (ভাগবত ১০।১৪।১) অর্থাৎ হে ভগবন্ ! আপনি কৃপাপূর্বক অনেকবার আপনার চরণ দর্শনলাভের সৌভাগ্য দান করেছেন ; কিন্তু এবারের মতো সুখসেব্য চরণদর্শন ভাগ্যে কখনই ঘটেনি। আপনার নৃসিংহলীলায় দেখি আপনার চরণভারে ব্রহ্মাণ্ড টলমল করছে আর পরমোগ্রমূর্তিতে ত্রিজগৎ কম্পমান। সাহস করে সেই চরণের সেবা করতে পারিনি, দূর হতেই স্তুতি প্রণামাদি করেছি। বামন অবতারকালে আপনি যখন আপনার চরণ প্রসারণ করলেন তখন তা সপ্তলোক অতিক্রম করে আমার নিবাস সত্যলোক পর্যন্ত পৌঁছয়। তাই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধৌত করে সেই চরণজল নিজ মস্তকে ধারণ ও কমণ্ডুলে স্থাপন ছাড়া সেই চরণের অন্ত আমি আজও খুঁজে পাইনি। এবার আপনার পরম মনোহর এই ব্রজলীলায়, আপনার চরণ দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছি। আপনার এই লীলায় পৃথিবী ও বৃক্ষলতাদি এমনকি ভ্রমর প্রভৃতি কীটপতঙ্গ পর্যন্ত আপনার চরণস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি। হে প্রভু ! আমি কি আমার কৃতকর্মের

জন্য এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হব ?

ব্রহ্মা পরের শ্লোকে স্তুতি করে বলছেন—**'অস্যাপি দেববপুষো'** (ভাগবত ১০।১৪।২) হে ভগবন্ ! আপনি যখন আমা কর্তৃক সৃষ্ট জগতে মৎস্য, কূর্মাদিরূপে অবতীর্ণ হন, তখন আমি পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে আপনার শ্রীবিগ্রহ ও লীলা ধ্যান করে, কিছুমাত্র তত্ত্ব গ্রহণে সমর্থ হই না। আপনার কী পরমাদ্ভুত লীলা, আমি যখন দুর্বুদ্ধিবশত আপনার গোবৎস ও গোপবালকগণকে স্থানান্তরিত করেছিলাম তখন আপনি প্রাকৃত বালকের ন্যায় বনে বনে তাদের অন্বেষণ করে বেড়ালেন। আপনি সর্বযজ্ঞের অগ্রভোক্তা হয়েও পরমানন্দে গোপবালকদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। আপনার ইঙ্গিতমাত্রই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডস্থিত চন্দ্র, সূর্য, তারকাদি পরিচালিত হয়, অথচ আপনি গোচারণের সময় লাঠি হাতে গোগণের পিছনে ছোটেন। আপনার যে কি পরমাদ্ভুত লীলা, তার মর্ম বোঝার সাধ্য কারোর নেই। আপনার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ঐশ্বর্য, মাহাত্ম্য সবই অজ্ঞেয়, আপনি কৃপাপূর্বক যতটুকু আমার জ্ঞানগোচর করেছেন তাই আমি প্রকাশ করে বিরত হলাম।

ব্রহ্মার এই বাক্যে মনে হতে পারে যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান যদি অজ্ঞেয়ই হন তবে শ্রুতিবাক্যে যে বলা হয়েছে—**'ত্বমেব বিদিত্বাইতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'** (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।৮) অর্থাৎ সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বস্তুকে জানতে পারলে তবেই জীবের সংসার নিবৃত্তি হয়, এছাড়া সংসার নিবৃত্তির আর কোনো দ্বিতীয় উপায় নেই। এটি কী করে সম্ভব ? শ্রুতির সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য তাই ব্রহ্মা বলছেন—**'স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্'**। (ভাগবত ১০।১৪।৩)। অর্থাৎ হে ভগবন্ ! যারা আপনার ভক্তগণের সঙ্গে থেকে, তাঁদের মুখে আপনার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি শুনে এবং কায়মনোবাক্যে সেবন করে জীবন ধারণ করে, আপনি ত্রিজগতে কারোর বশীভূত না হলেও তাদেরই বশীভূত হয়ে প্রীতি লাভ করেন।

পদ্মপুরাণেও তাই বলেছে—

যত্র যত্র প্রবর্তেত কলৌ ভাগবতীকথা।
তত্র তত্র হরর্যাতি গৌরীব সুতবৎসলা॥ (পদ্মপুরাণ)

কোনও চঞ্চল ও বলবতী গাভীকে আয়ত্ত করা সম্ভবপর না হলেও তার বৎস ধরে রাখলে যেমন তাকে পাওয়া যায়, তেমন অনন্ত-অচিন্ত্য-ঐশ্বর্যমাধুর্য-সম্পন্ন শ্রীভগবানকে কোনো সাধনার দ্বারা অনুভব করা না গেলেও, যাঁরা তাঁর চরণাশ্রিত, তাঁদের যারা আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা শ্রীভগবানকে অনায়াসে পেয়ে কৃতার্থ হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান কপিল জননী দেবাহুতিকে বলছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

(ভাগবত ৩।২৫।২৫)

অর্থাৎ আমার ভক্ত চূড়ামণিগণ পরস্পর আলাপ প্রসঙ্গে আমার যে কথা বলে থাকেন, তা শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, অর্থজ্ঞানে হৃদয়ে পরমানন্দের সঞ্চার হয় আর সেই সব কথায় সাক্ষাৎরূপে আমার মহিমাদিরই প্রকাশ হয়ে থাকে। আর যাঁরা আমার ভক্তমুখোচ্চারিত আমার নাম, রূপ, গুণ-লীলাদির কথা সেবা করেন, তাঁরা অচিরাৎ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি লাভ করে অনায়াসে সংসার হতে মুক্ত হয়ে যান।

পরবর্তী তিনটি শ্লোকে (৬-৮) ব্রহ্মা ভগবানের নির্গুণ ও সগুণের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন—

প্রসঙ্গত ভগবান ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে নিজে বলছেন—

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ॥ (ভাগবত ১১।১৩।৪০)

হে উদ্ধব ! আমি প্রাকৃত গুণরহিত এবং প্রাকৃত বিশেষত্বরহিত, সুতরাং আমি নির্গুণ ও নির্বিশেষ কিন্তু আমি সর্বজীবের সুহৃৎ।

শ্রীভগবানের সর্বজীবে সমতা, সত্ত্বাদি প্রভৃতি গুণ অপরিসীম বলে তিনি অগুণ অর্থাৎ ইহা নিত্য, স্বাভাবিক ও স্বরূপভূত। ব্রহ্মা **'তথাপি ভূমন্'** (ষষ্ঠ শ্লোকে) ও **'গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্'** (সপ্তম শ্লোকে) এই দুই শ্লোকে বলেছেন, শ্রীভগবানের সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়বিধ স্বরূপের মধ্যে নির্গুণ স্বরূপের জ্ঞান আত্মাকার চিত্তে প্রকাশ হয় বটে কিন্তু সগুণ স্বরূপ কেউ কিছুতেই ধারণা করতে পারে না।

ভগবান গীতাতেও বলেছেন—

বহুনাং জন্মনাং অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (গীতা ৭।১৯)

অর্থাৎ বহু জন্ম সাধনানুষ্ঠান করে কোনো কোনো মাহাত্মা '**বাসুদেবঃ সর্বং**' এইপ্রকার নির্বিশেষ জ্ঞান লাভ দ্বারা আমার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করে আর এইরূপ মহাত্মাও জগতে অতি দুর্লভ।

এই প্রসঙ্গে প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে (অষ্টম শ্লোক) ব্রহ্মা বলছেন—

'**হৃদ্বাগবপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে**' অর্থাৎ হে ভগবন্! বহু জন্ম তীব্র সাধনানুষ্ঠান করে যদিও কদাচিৎ কোনো মহাত্মার ভাগ্যে আপনার নির্বিশেষ স্বরূপের সাক্ষাৎলাভ ঘটে, কিন্তু আপনার সগুণ স্বরূপের সাক্ষাৎকার সকলের পক্ষেই সুদূর পরাহত। কিন্তু যারা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি সংসার দুঃখতে বিচলিত না হয়ে, তা প্রতিকারের জন্য তীব্র প্রচেষ্টা না করে এবং এসব নিজ নিজ অনাদি জন্মসঞ্চিত কর্মফলেরই প্রকাশ ও আপনারই অনুগ্রহের দান বলে মনে করে তা অম্লানবদনে ভোগ করেন ও কায়মনোবাক্যে আপনারই চরণে শরণাগত হয়ে থাকেন, তারাই আপনার চরণাশ্রয়ের অধিকারী হন।

পদ্মপুরাণ বলছেন—

নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন।

মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনার চরণে নিশ্চলা ভক্তিই প্রকৃত মুক্তি। আর যাঁরা আপনার চরণে কায়মনোবাক্যে ভজন করেন, সংসার মুক্তি তাঁদের কাছে অযত্নলভ্য আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।

সর্বেশ্বর সর্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানকে কোনো সাধন দ্বারাই কেউ নিজায়ত্ত করতে পারে না, কিন্তু তিনি ভক্তিরই কেবল বশীভূত—

ভক্তিরেবৈং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি

ভক্তিরেব ভূয়সী, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ॥

(গোপালতাপনীয়)

ব্রহ্মার দীনতা (শ্লোক ৯—১৯)

পশ্যেশ মেঽনার্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চিরগ্নৌ ॥ ৯
অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎ পৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি॥ ১০
ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥ ১১
উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ॥ ১২
জগৎত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা
কিং ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি॥ ১৩
নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী-
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ১৪
তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ
কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব।

কিং বা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব
কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি॥ ১৫
অত্রৈব মায়াধমনাবতারে
হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃ স্ফুটস্য।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা
মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে॥ ১৬
যস্য কুক্ষাবিদং সর্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তত্ত্বয্যপীহ তৎ সর্বং কিমিদং মায়য়া বিনা॥ ১৭
অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে
মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্
বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ
সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং
ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে॥ ১৮
অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্ম-
ন্যাত্মাঽঽত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান
ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ॥ ১৯

সরলার্থ—ব্রহ্মা স্তুতি করে বলছেন, প্রভু! দেখুন আমারই বা কীরকম দুষ্প্রবৃত্তি! আপনি অনন্ত, আদিপুরুষ, পরমাত্মা, আমার মতো বহু বহু মায়াবীও আপনার মায়ায় মোহিত ও বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও আমি আপনার ওপরে নিজের মায়া বিস্তার করে নিজের ক্ষমতা দেখাতে চেয়েছিলাম। বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ার ফলে আমার একবারও এই চিন্তা উদিত হয়নি যে, আমি আপনার কাছে কতটুকু? প্রজ্বলিত অগ্নির সামনে একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের গুরুত্ব কতখানি? ৯ ॥ হে অচ্যুত! আমার উৎপত্তি হয়েছে

রজোগুণ থেকে। আপনার স্বরূপ সম্পর্কে আমার যথার্থ জ্ঞান নেই। তারই ফলে আমি নিজেকে আপনার থেকে পৃথক বিশ্বের প্রভু বলে ধারণা করেছিলাম। আমি জন্মরহিত, জগতের স্রষ্টা—এই গর্বের মহামোহান্ধকারে আমার দৃষ্টি (বিচারশক্তি) আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রভু ! আপনার ক্ষমাগুণেরও তো অন্ত নেই, তাই 'এ তো আমারই অধীন, আমিই এর রক্ষাকর্তা প্রভু, তাই একে তো অনুকম্পা করতেই হবে'—এইরকম করুণাদৃষ্টি অবলম্বন করে আমাকে ক্ষমা করুন॥ ১০ ॥ প্রভু ! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী—এই অষ্ট আবরণে বেষ্টিত এই ব্রহ্মাণ্ডই আমার শরীর—যা আমার নিজের পরিমাপে সাড়ে তিন হাত। আর এই রকম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আপনার একটি রোমকূপের ছিদ্রপথে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে থাকে, যেমন গবাক্ষপথে (আলোকরশ্মির মধ্যে দৃশ্যমান) অতিক্ষুদ্র ধূলিকণাসমূহ (ত্রসরেণু) অগণিত সংখ্যায় ভেসে বেড়ায়। আপনার সেই অনন্ত মহিমার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র আমার কোনো বিচারেই কোনো তুলনা চলে কি ? ১১ ॥ হে অধোক্ষজ (বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের অগোচর) ! মাতৃগর্ভস্থিত শিশু অজ্ঞানবশে পদাদি সঞ্চালনের দ্বারা মাতৃ অঙ্গে কার্যত পদাঘাত করলেও তাতে কি তার অপরাধ হয়, অথবা মা-ও কি সেজন্য সন্তানের প্রতি রুষ্ট হন ? সমগ্র বিশ্বজগতে 'অস্তি' (ভাবাত্মক বা সৎ) বা 'নাস্তি' (অভাবাত্মক বা অসৎ) পদবাচ্য এমন কোন্ পদার্থ আছে, যা আপনার কুক্ষির (উদরের) অন্তর্গত নয় ? ১২ ॥ প্রলয়কালে ত্রিলোক ধ্বংস হয়ে গেলে কারণ সমুদ্রশায়ী নারায়ণের নাভিকমল থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন (শ্রুতিসমূহের) এই উক্তি তো মিথ্যা হতে পারে না। তাহলে, হে পরমেশ্বর ! আপনিই বলুন, আমি কি আপনার থেকেই জন্মাইনি, আপনারই সন্তান নই ? ১৩ ॥ প্রভু, একথাও কি সত্য নয় যে, আপনিই সেই নারায়ণ, যিনি সকল জীবের আত্মা (নার=জীবসমূহ এবং অয়ন= আশ্রয়), যিনি সমগ্র জগৎ এবং জীবকুলের অধীশ্বর (নার=জীব এবং অয়ন=প্রবর্তক) এবং যিনি সর্বলোকের সাক্ষী (নার=জীব এবং অয়ন=জ্ঞাতা)। নরদেব (বিরাট পুরুষরূপী ভগবান) থেকে উৎপন্ন জলরাশির মধ্যে বাস করার জন্য যাঁকে নারায়ণ (নার=জল এবং

অয়ন= নিবাসস্থান) নামে অভিহিত করা হয়, তিনিও প্রকৃতপক্ষে আপনারই অংশভূত। আবার এই অংশরূপে দর্শনও তত্ত্বত সত্য নয়, তাও আপনারই মায়া॥ ১৪ ॥ হে ভগবন্‌! নিখিল জগতের আশ্রয়স্বরূপ আপনার সেই বিরাট শরীর যদি সত্যে সত্যই সে সময় জলেই থাকত, তাহলে আমি শত বৎসর ধরে কমলনাল পথে অন্বেষণ করেও তাকে দেখতে পাইনি কেন ? আবার, যখন আমি তপস্যা করলাম, তখন হৃদয়মধ্যে তার সম্যক দর্শনলাভই বা কী করে হল এবং পুনরায় অত্যল্পকালের মধ্যেই সেই রূপ আমার কাছে অদৃশ্যই বা হল কেন ? ১৫ ॥ হে মায়াবিনাশী ! সেসব পুরাকালের কথারই বা কী প্রয়োজন, আপনার এই অবতারেই তো আপনি জননী যশোদাকে এই বাইরের দৃশ্যমান সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চ নিজের জঠরে (মুখবিবর পথে) দর্শন করিয়েছেন, যা দেখে তিনি ভীতা ও বিস্মিতা হয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকেও তো এই বিশ্বসংসার যে আপনার মায়ামাত্র, তাই প্রমাণিত হয়॥ ১৬ ॥ আপনি-সহ এই সমগ্র বিশ্ব যেমন বাইরে প্রকাশিত রয়েছে, তেমনই আবার আপনার উদরেও আপনি-সহ-ই দেখা গেল—এটা আপনার মায়া ছাড়া আর কী হতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি-প্রপঞ্চ আপনার মায়াশক্তির লীলামাত্র, এছাড়া এর আর কোনো ব্যাখ্যা নেই॥ ১৭ ॥ সেদিনের কথাও যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, আজই কি আপনি আমাকে আপনি ছাড়া সমগ্র বিশ্ব যে আপনারই মায়াস্বরূপ, তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেননি ? প্রথমে আপনি একলা ছিলেন, তারপর সমস্ত গোপবালক, বৎসবৃন্দ তথা বেত্রাদি উপকরণসমূহের রূপ ধারণ করলেন। এরপর আমি দেখলাম, আপনার এইসব রূপই চতুর্ভুজ দিব্যমূর্তি এবং আমার সঙ্গে সকল তত্ত্বই তাদের উপাসনায় নিরত। ক্রমে আমার অনুভবে এল, এই অনন্ত নিখিলে গণনাতীত ব্রহ্মাণ্ডরূপেও আপনিই বিরাজিত এবং এখন দেখছি সব কিছুর পর্যবসানে অপরিমেয় অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বরূপে আপনিই রয়েছেন॥ ১৮ ॥ আপনার স্বরূপ যাদের অজ্ঞাত তাদের কাছে আপনি স্বতন্ত্র হয়েও প্রকৃতিকে আশ্রয় করে স্থিত জীবরূপে প্রতীত হন, নিজ মায়া বিস্তার করে আপনি তাদের কাছে সৃষ্টি সময়ে আমার (ব্রহ্মা) রূপে, পালনকার্যে নিজের (বিষ্ণু) রূপে এবং ধ্বংসের সময়ে ত্রিনেত্র (মহেশ্বর)রূপে, (তত্ত্বত অভিন্ন

হয়েও) ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকেন॥ ১৯ ॥

মূলভাব—ব্রহ্মা ব্রজরাজনন্দনের স্তবে প্রবৃত্ত হয়ে বলছেন—হে ভগবন্! আপনি অজ্ঞেয় কিন্তু আপনার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি অবলম্বন করে শরণাগত থাকাই আপনাকে বশীভূত করার উপায়। এই পর্যন্ত বলে ব্রহ্মা মনে মনে বিচার করলেন যে শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হলে কৃতার্থতা লাভ হয় বটে কিন্তু যে শ্রীভগবানের ও তাঁর ভক্তের নিকট অপরাধী হয় তার কিছুতেই শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতি লাভে প্রবৃত্তিই হয় না। অতএব আমার কোনো গতিই নেই।

ব্রহ্মার অপরাধ কীর্তন—ভক্তের নিকট অপরাধ হয়েছে এই কথা মনে করে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের চরণে নিজকৃত মহাপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন বলে পুনঃ নিজ অপরাধ কীর্তন করতে লাগলেন। ব্রহ্মা স্তুতি করে বলছেন—হে অপার-করুণার্ণব! আমার অপরাধের কথা আর কী বলব। আপনি সর্বেশ্বর, আপনি আমার প্রভু, আপনার প্রদত্ত মন্ত্রে উপাসনা করে আপনারই প্রদত্ত সৃষ্টি শক্তিতে আমি সৃষ্টিকর্তা হয়েছি। ব্রহ্মা বলছেন—**'কিয়াদৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ'** (ভাগবত ১০।১৪।৯) অর্থাৎ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির নিকট তুচ্ছ সেইরকম আমিও আপনার নিকট তুচ্ছ। অথচ আমার কী মূর্খতা দেখুন **'মায়াং বিতত্য ইক্ষতুম আত্মবৈভবং'** (ভাগবত ১০।১৪।৯) অর্থাৎ আমি মায়াধীন হয়েও সর্বমায়াধীশ আপনাকেও মায়ামুগ্ধ করে আপনার ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেছিলাম। হায়! হায়! আমার একবারও মনে হল না যে, আপনার অপার মহিমা-সিন্ধুর কাছে আমি তুচ্ছ, বালুকাকণা হতেও তুচ্ছ, কোন্ ছার!

ব্রহ্মা এইভাবে নিজকৃত মহাপরাধের কথা বলে পরিশেষে বলছেন—হে অচ্যুত! আমি আপনার দাস হয়েও আপনার কাছে অপরাধ করে দাস-স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়েছি, কিন্তু তা বলে কি আপনি আমাকে ক্ষমা না করে প্রভু-স্বভাব থেকে চ্যুত হবেন! জগতের সকল ব্যক্তি ও বস্তুই নিজ নিজ স্বভাব থেকে চ্যুত হয়, কিন্তু একমাত্র আপনিই অচ্যুত। আপনি কখনো আপনার করুণা, ভৃত্যবাৎসল্য প্রভৃতি মহাগুণ থেকে চ্যুত হন না। তাই আমার প্রার্থনা, আপনি আমার সর্ব অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি অতি তুচ্ছ হতেও তুচ্ছ, আর

আপনি মহান হতেও সুমহান। অবশ্য আমার তুচ্ছতার যথেষ্ট কারণ আছে। আমি রজোগুণ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করি বলে রজোগুণ আমার সঙ্গী, সুতরাং রজোগুণের চাঞ্চল্য আমাতে বিশেষভাবে বর্তমান। আবার প্রাকৃত রজোগুণ তমগুণ শূন্য হতে পারে না বলে আমার তমোগুণজনিত অজ্ঞতারও অভাব নেই। ব্রহ্মা তাই দশম শ্লোকে বলছেন **'অজাবলেপান্ধতমোহন্ধচক্ষুস'** (ভাগবত ১০।১৪।১০) অর্থাৎ এই তমোজনিত অজ্ঞতার বশেই আপনার সর্বগত প্রভুত্বের কথা ভুলে নিজেকে পৃথক বলে মনে করেছিলাম। তাই আপনাকে মায়ামুগ্ধ করে নিজ কর্তৃত্ব অনুভব করতে চেষ্টা করেছিলাম।

হে ভগবন্! আপনি প্রপঞ্চ ও অপ্রঞ্চর নাথ, নিয়ন্তা এবং স্বয়ং ভগবান। আপনার অংশাংশ এবং প্রকৃতির অন্তর্যামী সর্বপ্রপঞ্চ মহাবিষ্ণুর কাছেও আমি কত তুচ্ছ তার পরিমাপ হয় না। আমি প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহংকারতত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই অষ্ট আবরণ বেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ সাড়ে তিন হাত পরিমিত এক জীব আর আপনার অংশাংশ সেই অন্তর্যামী মহাবিষ্ণুরূপ পুরুষের লোমকূপেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যুগপৎ ধূলিকণার মতো প্রবেশ করে আর নির্গত হয়।

যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মপুরাণ)

অর্থাৎ নিজ লোমকূপের বিবরস্থ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডপতিগণ যাঁর নিঃশ্বাস পরিমিতকাল পর্যন্ত জীবিত থাকে সেই মহাবিষ্ণুও যাঁর অংশাংশ, সেই সর্বকারণের কারণ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ চরণই আমার ভজনীয়।

অতএব হে ভগবন্! আপনার মহত্ত্বের সঙ্গে আমার তুচ্ছতার যে কত দূরত্ব তা কারও ধারণাতেই আসতে পারে না। আপনি সর্বকারণের কারণ স্বয়ং ভগবান, আপনার বিলাসমূর্তি **পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ,** তাঁর অংশ **কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ,** তাঁর অংশ **গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ** এবং তাঁর নাভিকমল থেকে আমার জন্ম। সুতরাং আমার মতো তুচ্ছ জীবের অপরাধ

আপনার দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব কিনা তা আমি জানি না।

এইরূপে ব্রহ্মা ব্রজরাজনন্দনের নিকট নিজের দীনতা ও মূর্খতা জ্ঞাপন করে অবশেষে দ্বাদশ শ্লোকে বলছেন—**'উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে'** (ভাগবত ১০।১৪।১২) অর্থাৎ হে ভগবন্ ! কোনও জননী কি নিজ গর্ভগত সন্তানের পাদতাড়নে রুষ্ট হন। আপনার রোমকূপ বিবরের বাইরে এমন কোনো স্থান নাই যেখানে জীবগণ বা ব্রহ্মাণ্ড সমূহ অবস্থান করতে পারে। হে পদ্মনাভ ! আমি আপনার সাক্ষাৎপুত্র, তাই আমার অপরাধ আপনার অবশ্যই মার্জনীয়। হে ভগবন্ ! আপনি শ্রীকৃষ্ণই মূলতত্ত্ব এবং আপনি অনন্ত বৈকুণ্ঠে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত মূর্তিতে, অনন্ত লীলা করে থাকেন।

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য, দেবিমহেশহরিধামসু তত্র তত্র।
তে তে প্রভাবনিচয় বিহিতাশ্চ যেন, গোবিন্দমাদিপুরুষং বমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

যিনি গোলোক নামক নিজধামে, তন্নিম্নস্থ হরিধাম (পরব্যোম), মহেশধাম (কারণার্ণব) এবং দেবীধাম (প্রকৃতি) সমূহে নিজ মহাপ্রভাব বিস্তার করে লীলা করছেন, আমি সেই সর্বমূলস্বরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দের চরণ ভজনা করি।

ব্রহ্মা স্তুতির চতুর্দশ শ্লোকে বলছেন—**'সর্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাৎ।'** (ভাগবত ১০।১৪।১৪)' অর্থাৎ ব্রহ্মা এই শ্লোকে নারায়ণের বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করেছেন, যেমন **অধীশ, নরভুজলায়নাৎ, অখিল লোকসাক্ষী** এবং **সর্বদেহিনামাত্মাস্য**।

ভগবানের লোকসৃষ্টি—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মূর্তি ও অনন্ত লীলা। তিনি গোলোকে গো-গোপ-গোপী প্রভৃতি পার্ষদগণসহ নিজ দ্বিভুজ মুরলীধর বিগ্রহে অশেষ মাধুর্য বিস্তার করে লীলারসাস্বাদন করেন। আবার বৈকুণ্ঠে তিনিই স্ব-মূর্তি নারায়ণ, মহানারায়ণ, মহাবিষ্ণু, সদাশিব প্রভৃতি নামে অভিহিত। শ্রীভগবানের গোলোক এবং এই বৈকুণ্ঠের মূর্তির সঙ্গে মায়া ও মায়িক কোনো বস্তুরই সম্বন্ধ নেই। আবার শ্রীভগবানের যখন জগৎ সৃষ্টি

করতে ইচ্ছে হয়, তখন তাঁর বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণমূর্তিরই এক অংশ এই কারণার্ণবে শয়ন করেন।

ভগবানের অবতারত্ব—নারায়ণস্ত্বং নরভুজলায়নাৎ (কারণার্ণবশায়ী) —শ্লোকটির এই অংশ ব্রহ্মা প্রকৃতির অন্তর্যামী, প্রথম পুরুষাবতার, 'কারণার্ণবশায়ী নারায়ণকে' উদ্দেশ্য করেই বলেছেন। ব্রহ্মার বক্তব্য এই যে 'নর' শব্দের অর্থ শ্রীভগবান এবং তাঁর হতে 'ভূ' অর্থ উৎপত্তি যার, এতাদৃশ জল এই হল 'নরভূজল' অর্থাৎ 'কারনার্ণব'।

নারায়ণঃ স ভগবান্ আপতস্মাৎ সনাতনাৎ।

আবিরভূঃ কারনার্ণবো নিধিঃ........ (ব্রহ্মসংহিতা)

এই ব্রহ্মসংহিতার বচনেও জানা যায় যে মূল নারায়ণ পরব্যোমাধিপতির (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপতির) অঙ্গ হতে যে জল আবির্ভূত হয়, তার নামই কারণার্ণব। পরব্যোম আর প্রকৃতির (সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণময়ী) মাঝে শ্রীভগবানের অঙ্গজলে প্রবাহিত পরম কল্যাণদায়িনী এই বিরজা বা কারণার্ণব।

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি। অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি॥

চিন্ময়র জল সেই পতিত পাবন। যার এক কনা গঙ্গা জগৎ পাবন॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ইচ্ছা হলেই তাঁরই বিলাস অংশ বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণ মূর্তির এক অংশই কারণার্ণবে শয়ন করে সত্ত্ব, রজ, তমোগুণময়ী প্রকৃতিতে দৃষ্টিপাত করলে তখন প্রকৃতি বিক্ষোভিত হয়ে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু হয়। শ্রীভগবানের এই কারণার্ণবশায়ী শ্রীবিগ্রহই প্রথম পুরুষাবতার নামে নানা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। **'তদৈক্ষত বহুস্যাম্ প্রজাজেয়'** প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যও ইঁহারই উদ্দেশ্যে বলা হয়।

দূর হতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। জীব রূপে বীর্য তাতে করেন আধান।

এক অঙ্গ ভাসে করে মায়াতে মিলন। মায়া হতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অখিললোকসাক্ষী (গর্ভোদকশায়ী)— কারণার্ণবশায়ীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হলে তা হতে মহত্তত্ত্বাদিক্রমে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং শ্রীভগবানের কারণার্ণবশায়ী মূর্তিই তখন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন।

শ্রীভগবানের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট এই অনন্ত মূর্তিই দ্বিতীয় পুরুষাবতার 'গর্ভোদকশায়ী' বলে নানা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। **'তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশতৎ'** প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য এবং পুরুষসূক্ত শ্রুতি 'সহস্রশীর্ষ পুরুষঃ' প্রভৃতি বাক্যে এঁর স্বরূপ বর্ণিত আছে।

সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সাজিয়া। সব অণ্ডে প্রবেশিল বহু মূর্তি হইয়া॥
নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিয়া সৃজন। সেই জলে কৈল অর্দ্ধব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥
জলে ভরি অর্দ্ধে তাহা নিজ কৈলবাস। আর অর্দ্ধে কৈল চেদ্দি ভুবন প্রকাশ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই গর্ভোদকশায়ীর নাভিকমল হতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় এবং এই নাভিকমলনালেই চতুর্দশ ভুবন অবস্থিত। অখিললোকসাক্ষী—এই বাক্যে ব্রহ্মা প্রতিপাদন করেছেন যে, শ্রীভগবান দ্বিতীয় পুরুষাবতাররূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের সর্বাবস্থার সাক্ষাৎ দ্রষ্টা।

অনন্তব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদিধাম
তাঁহা যত জীব তার ত্রিকালিক কর্ম। তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান তার মর্ম॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

সর্বদেহিনাম আত্মসি (ক্ষিরোদশায়ী)— সর্বদেহিনাম্ আত্মা এই বাক্যে ব্রহ্মা সর্বজীবের অন্তর্যামী তৃতীয় পুরুষাবতারের কথা নির্ণয় করে বলেছেন— শ্রীভগবান এই পুরুষাবতারে সর্বজীবের হৃদয়ে অবস্থিত। শ্রীভগবানের কৃপায় ব্রহ্মা সৃষ্টিশক্তি লাভ করে অনন্ত জীবদেহ সৃষ্টি করলে, শ্রীভগবান ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ ক্ষিরোদ সাগরে শয়ন করে এবং অনন্ত জীবহৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করে সেখানে বিরাজমান থাকেন। শ্রীভগবানের জীবহৃদয়ে প্রবিষ্ট এই মূর্তিই তৃতীয় পুরুষাবতার যা ক্ষিরোদশায়ী নামে অভিহিত। **'তৎস্রষ্টা তৎ অনুপ্রাবিষৎ'**, **'স এষ আত্মা হৃদি'** প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে এবং **'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি'** ইত্যাদি গীতাবাক্যেও এঁরই উদ্দেশ্যে ব্যক্ত হয়েছে। যোগিগণ নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা নিজ হৃদয়ে এঁরই অনুসন্ধান করে থাকেন।

কমলের নাভিনাল মধ্যেতে ধরণী। ধরণীর মধ্যেতে সপ্তসমুদ্র যে গণি॥
তাঁহা ক্ষিরোদধি মধ্যে শেতদ্বীপ নাম। পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজধাম॥

সকল জীবের তেঁহ হয় অর্ন্তয্যামী। জগৎপালক তেহঁ জগতের স্বামী॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

'নারস্য অয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ' অর্থাৎ যাঁর শক্তিতে সর্বজীবের দর্শন, শ্রবণ, বচন, গমনাদি কার্যের সিদ্ধি হয় সেই জীবান্তর্যামী তৃতীয় পুরুষই 'নারায়ণ' নামে অভিহিত।

এইভাবে ব্রহ্মা বলছেন—বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপক সর্বেশ্বর শ্রীভগবানের ত্রিবিধ পুরুষাবতার আছেন। তার মধ্যে প্রথম পুরুষাবতার **প্রকৃতির অন্তর্যামী** মহৎস্রষ্টা, তিনি **কারণার্ণবশায়ী** নারায়ণ। দ্বিতীয় পুরুষাবতার **ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী** তিনি **গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ**। আর তৃতীয় পুরুষাবতার **সর্বাভূতান্তর্যামী** তিনি **ক্ষীরোদশায়ী** নারায়ণ।

'নারায়ণস্ত্বং ন হি' প্রভৃতি শ্লোকের 'অধীশ' অংশ দ্বারা ব্রহ্মা প্রতিপাদন করছেন যে আপনি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষাবতাররূপে সমস্ত জীবের ঈশ বা নিয়ন্তা। আবার পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ এই সমস্ত পুরুষাবতারের 'ঈশ' তাই তিনি 'অধীশ' (ঈশেভ্যোঃ পুরুষাবতারেভ্যঃ অধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ)। এই পরব্যোমাধিপতিও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি, অতএব শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ।

জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার। তা সবা হতে তোমার মহিমা অপার॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্বপিতা। তোমার শক্তিতে তাঁরা জগৎ রক্ষিতা॥
নারের অয়ন যাতে কারণ পালন। অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্লোকটির শেষে ব্রহ্মা বলেছেন—**'তচ্ছাপি সত্যং ন তবৈব মায়া'** অর্থাৎ হে ভগবন্ ! আপনি আপনার অচিন্ত্য মহাশক্তির প্রভাবে অসীম হয়েও সীমাবদ্ধের মতো অবস্থান করেন। আপনার শ্রীবিগ্রহ মহৎ হতেও মহত্তর এবং ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্রতর। প্রাকৃত বস্তুর মহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ কিন্তু হে ভগবন্! আপনাতে মহত্ত্ব এবং ক্ষুদ্রত্বে কোনো বিরোধ নেই। দামবন্ধনাদি লীলায় আপনি একই সময়, একই বিগ্রহে, মহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্বকে স্থান দিয়ে আপনার অচিন্ত্য মহাশক্তির পরিচয় প্রদান করেছেন।

ভগবৎ মহিমা কীর্তন (শ্লোক ২০—২৯)

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি
তির্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্মদনিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ॥ ২০

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্ ।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ ২১

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥ ২২

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥ ২৩

এবং বিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি
স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
গুর্বর্কলব্ধোপনিষৎ সুচক্ষুষা
যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্॥ ২৪

আত্মানমেবাত্মতয়াবিজানতাং
তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে
রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা॥ ২৫

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।

অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে
বিচার্যমাণে তরণাবিবাহনী॥ ২৬
ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা॥ ২৭
অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব
হ্যতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ
সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ॥ ২৮
অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ২৯

সরলার্থ—আপনার এই যে স্বরূপ, সেটি প্রকৃতপক্ষে সর্বজীবেরই আপন স্বরূপ। যাঁরা গুরুরূপী সূর্যের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞানরূপ দিব্যদৃষ্টি লাভ করে তার দ্বারা আপনাকে নিজেদের আত্মারূপে সাক্ষাৎকার করেন, তাঁরা এই মিথ্যা সংসারসাগরকে যেন উত্তীর্ণ হয়ে যান। (সংসার-সাগরটিই মিথ্যা, তার কোনো তাত্ত্বিক সত্তা নেই, সুতরাং তা পার হয়ে যাওয়াও অযথার্থ বা অবিচার-দশার দৃষ্টিতে ; এইজন্য মূলে 'যেন' শব্দটির প্রয়োগ)॥ ২৪ ॥ যে সকল ব্যক্তি পরমাত্মাকেই নিজেদের আত্মা বলে উপলব্ধি করে না, তাদের সেই অজ্ঞানের ফলেই এই নামরূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চের উৎপত্তির ভ্রম জন্মায়। জ্ঞান জন্মানোমাত্রই কিন্তু এসবের ধ্বংস বা নিবৃত্তি ঘটে, ঠিক যেমন ভ্রমবশে রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি এবং ভ্রমের নিবৃত্তিমাত্রই সেই সর্পের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে থাকে॥ ২৫ ॥ প্রকৃতপক্ষে সংসার-বন্ধন এবং তার থেকে মুক্তি—এই দুটিই অজ্ঞানকল্পিত, অজ্ঞানেরই দুটি নামমাত্র। সত্য এবং জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার থেকে পৃথক কোনো অস্তিত্বই এদের নেই। সূর্যে যেমন দিন এবং রাত্রির কোনো ভেদ নেই, সেই রকমই যথার্থ বিচারে অখণ্ড চিৎস্বরূপ কেবল শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে বন্ধন বা মোক্ষ কিছুই নেই॥ ২৬ ॥ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবদের অজ্ঞতাও যে কী গভীর, তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। যে আপনি হলেন

আপন আত্মা, সেই আপনাকেই পর মনে করে এবং যা বস্তুত পর, সেই দেহাদিকেই আত্মা মনে করে, আবার শেষ পর্যন্ত সেই আত্মাকেই (আত্মারূপী আপনাকেই) বাইরে খুঁজে বেড়ায় যারা, তাদের হতভাগ্যতার কি সীমা আছে ? ২৭ ॥ হে অনন্ত ! আপনি তো সকলেরই অন্তঃকরণে বিরাজমান, আর সেইজন্যই সৎপুরুষেরা আপনার অতিরিক্ত যা কিছু প্রতীয়মান হয়ে থাকে, সেগুলিকে ত্যাগ করে নিজেদের ভিতরেই আপনার অন্বেষণ করে থাকেন। কারণ, রজ্জুতে সর্পের অস্তিত্ব না থাকলেও, প্রতীয়মান সর্পকেও মিথ্যা বলে নিশ্চয় না করা পর্যন্ত, সেই নিকটস্থ সত্য রজ্জুটিকেই কি সুধীগণের পক্ষেও ধারণায় আনা সম্ভব ? ২৮ ॥ হে দেব ! ভক্তের হৃদয়মন্দির আলোকিত করে আপনি নিজ করুণাবশে স্বয়ংই প্রকাশিত হয়ে থাকেন, আর সেই উপলব্ধির এমনই মহিমা যে, তার ফলে এই অজ্ঞানকল্পিত জগৎ-রূপ মোহান্ধকার চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। আপনার সেই সচ্চিদানন্দময় মহিমার দুরবগাহ তত্ত্ব কেবল সেই জানে, যে আপনার যুগল চরণকমলের সামান্যতম কৃপা-কণিকাও অন্তত লাভ করেছে। অন্যথায় জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি-সাধনার বহুবিধ দুরূহ পথে বহুকাল অন্বেষণ করেও কেউই আপনার মহামহিমার স্বরূপ ধারণা করতে পারে না ॥ ২৯

মূলভাব—ব্রহ্মা এইরূপে দীন ভাবে ও নানাভাবে নারায়ণতত্ত্ব প্রকাশ করে তাঁর ক্ষুদ্র সামর্থ্যে মূল নারায়ণরূপে ব্রজরাজনন্দনের স্বরূপ স্থাপন করতে প্রবৃত্ত হলেন। শ্রুতি বলছে—‘**যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিংশন্তি তৎ ব্রহ্ম**’ অর্থাৎ আপনা হতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পায়, আপনারই ইচ্ছায় স্থিত হয়, আবার পরিশেষে আপনাতেই পর্যবসিত হয় কিন্তু কেউই আপনাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। আর ব্রহ্মা বলছেন, আপনারই কৃপায় আজ আমি অনুভব করলাম যে আপনিই সমস্ত জগতের মূলতত্ত্ব। আপনি এক হয়েও নিজ অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ অনন্ত জীবহৃদয়ে অবস্থিত।

বরাহপুরাণ বলছে—‘**সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ**’ (বরাহপুরাণ) অর্থাৎ শ্রীভগবানের সর্ববিধ শ্রীবিগ্রহই নিত্য ও সনাতন। আপনি যাকে যেভাবে বোঝবার শক্তি দিয়েছেন, সে সেইরূপেই আপনার স্বরূপ

বুঝবে, তা ব্যতীত কেউই নিজ শক্তিতে আপনার কোনো তত্ত্বই জানতে পারে না। কিন্তু তা বলে জগতের ওপর আপনার কৃপার অন্ত নেই। জগৎ আপনাকে জানতে পারুক বা না পারুক, আপনার চরণে শরণাগত হোক বা না হোক, আপনি কিন্তু যুগে যুগে জগতে অবতীর্ণ হয়ে নানাভাবে জগতের জীবকে কৃতার্থ করে থাকেন। হে ভগবন্ ! আপনার অচিন্ত্যশক্তির মহিমার কথা আর কত বলব ! আপনারই মায়াশক্তিতে প্রকাশিত এই জগৎ স্বপ্ন বস্তুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হলেও এতেই অভিনিবিষ্ট হয়ে জীব আত্মস্বরূপ ভুলে যায় আর পদে পদে দুঃখ ভোগ করে। এই জগৎ আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত বলে কিন্তু একে অনিত্য, অজ্ঞানময়, দুঃখাত্মক বলে বোধ হয় না। আপনার নিত্যতার কারণেই জগৎকে নিত্য বলে মনে হয়, আপনার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত হয়, আপনার স্বরূপানন্দেই জগৎকে সুখময় বলে মনে হয়। জীব তাই আপনাকে ভুলে কেবলমাত্র আপনাতে অধিষ্ঠিত জগৎ দেখেই মুগ্ধ হয় এবং তাতে অভিনিবিষ্ট থাকে, আর এর ফলেই নানাভাবে দুঃখ বোধ করে। আর যারা সর্বজগতের অধিষ্ঠানরূপে আপনাকে জানতে পারে তারাই সর্বভাবে দুঃখমুক্ত হয়, কৃতকৃতার্থ হয়। **'একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি'** আদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানা যায়, আপনি এক হয়েও **অনন্তরূপে** লীলারস আস্বাদন করেন। আপনার কৃপা ব্যতীত কেউই আপনার একরূপ সত্তার বহুরূপে প্রকাশিত হওয়ার মাধুর্য গ্রহণ করতে পারে না। আপনি এখন শ্রীবৃন্দাবনে সখ্য-বাৎসল্যাদি প্রেমময় গোপ-গোপীগণের সঙ্গে পরমানন্দ রসাস্বাদন করছেন, আবার আপনিই তো অন্যরূপে প্রকৃতির নিয়ন্তা, ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা এবং জীবের সর্বনিয়ন্তা পরমপুরুষ। প্রকৃতি, ব্রহ্মাণ্ড আর জীব-হৃদয়—এই ত্রিবিধপুরে আপনি অবস্থান করেন বলেই আপনি পুরুষ নামে অভিহিত। একমাত্র আপনিই **সত্য ও নিত্য**। আপনিই আপনার নিত্য ও সত্য মূর্তিতে জগতে আবির্ভূত ও তিরোহিত হন। আবার জগতের জাগতিক সমস্ত মিথ্যা বস্তুরও অধিষ্ঠানরূপে আপনি অবস্থিত আছেন। ব্রহ্মা তাই তেইশতম শ্লোকে স্তুতি করে বলছেন—**'ত্বম্ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ'** অর্থাৎ তুমিই সত্যম্ অর্থাৎ তুমি সত্য, নিত্য, স্বপ্রকাশ, অনন্ত এবং অনাদি। আমাদের দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু অনুভূত তার

মধ্যে তুমি একমাত্র সত্য।

সত্যে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণে সত্যমাত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যাৎ সত্যো হি গোবিন্দস্তমাৎ সত্যো হি নামতঃ॥ (মহাভারত)

এই মহাভারত বচনে জানা যায় যে কৃষ্ণে সত্য প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যে কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত। জগতে যা কিছু বস্তুই আমরা সত্য বলে মনে করি না কেন, তার মূল সত্যতা কিন্তু কৃষ্ণে, এই জন্যে কৃষ্ণেরই নাম সত্য। জগতের সমস্ত বস্তুই কারোর না কারোর সাহয্যে প্রকাশিত হয় এবং সমস্ত ব্যক্তিই কারোর না কারোর সাহায্যে জ্ঞান লাভ করে থাকে। কিন্তু হে ভগবন্! আপনি 'স্বয়ং জ্যোতিঃ' অর্থাৎ **স্বপ্রকাশ ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ**। আপনার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত, আপনার প্রদত্ত জ্ঞানেই সকলে জ্ঞানবান।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ (গীতা ১৫।১২)

অর্থাৎ গীতায় ভগবান বলছেন—তাঁরই অঙ্গজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি আদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী জগতের অন্ধকার দূর করতে সমর্থ হয়।

আপনার **অনাদিত্বর** কথা আর কী বলব ? যদিও আপনি নন্দ ও যশোদার পুত্ররূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন তবুও আপনিই জগতের আদি। আপনার বিশুদ্ধ সত্তা অর্থাৎ স্বপ্রকাশতা শক্তিই আপনার মাতাপিতারূপে বিরাজিত আর আপনি জগন্মাতা ও জগৎ পিতা হয়েও তাঁদেরই পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

পিতা মাতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

প্রভু আপনি অনন্ত। পৃথিবীব্যাপী সমুদ্র, গগনস্পর্শী পর্বত বা সর্বগত আকাশ প্রভৃতি জগতের সকল বস্তুরই অন্ত আছে, কিন্তু হে ভগবন্! আপনার কোনো অন্ত নেই, আপনি অনন্ত। আপনার এই মধুর বাল্যলীলায় আপনি কতভাবেই না আপনার অনন্ততা দেখিয়েছেন। দাম-বন্ধন লীলায় মা যশোদা গোকুলের সমস্ত রজ্জু জোগাড় করেও আপনাকে বাঁধতে পারেনি। আবার

জৃম্ভন লীলায় (হাই তোলা) আপনার ছোট্ট মুখ গহ্বরে মা যশোদা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। আপনার মতো আপনার লীলাবিগ্রহও অনাদি ও অনন্ত। হে ভগবন্! আপনি অক্ষয়। ধূলিকণা থেকে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত সর্ববিধ জড় বস্তু, আবার কীটাণু থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত সকল চেতন বস্তুরই যথাকালে উৎপত্তি ও বিনাশ হয়ে থাকে। **'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ'** (গীতা ১৫।১৮) এই গীতা বাক্যেও ভগবান বলেছেন তিনি ক্ষর ও অক্ষর থেকেও শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মা নিজ সম্বন্ধেও বলছেন—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত তুয়া নাহি আদি অবসানা।

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর লহরী সমানা॥ (বিদ্যাপতি)

এইভাবে ব্রহ্মা তেইশতম শ্লোকে 'একস্তমাত্মা' আদি স্তুতি দ্বারা শ্রীভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করে চব্বিশতম শ্লোকে বলছেন— হে ভগবন! আপনি জগতের জীবগণকে কৃতার্থ করার জন্য নানাবিধ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে নানাপ্রকার লীলা করে থাকেন কিন্তু অনাদি বহির্মুখ জীব অনাদিকাল থেকেই আপনার স্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত হয়ে দেহ-গেহাদি এবং আমি-আমার আদি অভিনিবেশ নিয়ে মত্ত থাকে। আর এরফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক, মোহ, ক্ষুধা, পিপাসা, দুঃখ, দৈন্য আদি তরঙ্গ-সমাকুল সংসার-সিন্ধুতে নিমগ্ন হয়ে যায়। ব্রহ্মা এরপর চব্বিশতম শ্লোকে বলছেন —**'গুর্বর্ক-লব্ধোপনিষৎ সুচক্ষুসা'** অর্থাৎ হে ভগবন্! এইরূপ মোহবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য আপনি বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশ করেন, গুরুরূপে সেই শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়ে দেন এবং অন্তর্যামীরূপে সেই শাস্ত্রোক্ত সাধনানুষ্ঠানের প্রবৃত্তিও দান করেন।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাই স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান

কৃপায় করিল কৃষ্ণ বেদপুরাণ।

শাস্ত্রগুরু আত্মারূপ আপনা জানান।

কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা এই হয় জ্ঞান॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

সূর্য যেমন আপনার প্রকাশ-শক্তিতেই জগৎ প্রকাশক, তাছাড়া সূর্যের আর

স্বতন্ত্র প্রকাশ.শক্তি নেই, সেইরূপ জগতেও যাঁরা গুরুরূপে শাস্ত্র ও সাধনোপদেশ দ্বারা ভ্রান্ত জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, তাঁরাও আপনার শক্তিতেই শক্তিমান। এইরূপে আপনার কৃপাশক্তিতে শক্তিমান হয়ে যাঁরা আপনারই স্বরূপ জানিয়ে দেন তাঁরাই গুরুপদবাচ্য হন।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্ত যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥

অর্থাৎ যিনি কৃপাপূর্বক সর্বভাবে পরিপূর্ণ ও পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ-সাধকের মনে উদ্ঘাটন করেন, তিনিই গুরু। তাঁর চরণে প্রণাম।

ব্রহ্মা শ্লোকটির শেষ অংশে বলছেন—**'তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্'** অর্থাৎ যাঁরা গুরুকৃপায় আপনার এই স্বরূপ জানতে পারেন এবং কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সর্ববিধ কর্ম আপনার উদ্দেশেই অনুষ্ঠান করেন ও আপনারই শরণাগত হন, তাঁদের আর সংসার মোহসমুদ্রে পতনের আশঙ্কা থাকে না।

এই অজ্ঞানজনিত মোহ, যা বন্ধনের কারণ সে সম্বন্ধে ব্রহ্মা ছাব্বিশতম শ্লোকে বলছেন— **'অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধ মোক্ষৌ'** অর্থাৎ জীবের সংসার বন্ধন এবং তা হতে মুক্তিলাভ অজ্ঞানেরই নামান্তর। জগতেও দেখা যায় যে সূর্যের প্রকাশে ও অপ্রকাশে দিবা ও রাত্রির ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু সূর্যে দিবা নেই রাত্রিও নেই **'নান্যৌ তরণাবিবাহনী'**। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।১,৪)

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে জীবের সংসার-বন্ধন কিংবা মুক্তি কিছুই নেই। আমারই বহিরঙ্গা শক্তি ত্রিগুণময়ী মায়া হতেই এই বন্ধন-মোক্ষ ব্যবহার ঘটে থাকে। কারণ জীবের অনাদি অবিদ্যাবশত সংসার-বন্ধন এবং অবিদ্যা নিবৃত্তিতে তার তাপ হতে মুক্তিলাভ হয়ে থাকে। এই অবিদ্যা ও মূঢ়তা

সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলেছেন—'**অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্**' (গীতা ৯।১১) অর্থাৎ আমি যে সকল আত্মার আত্মস্বরূপ, তা মূঢ়জন কিছুতেই ধারণা করতে পারে না এবং আমার নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বরূপকেও প্রাকৃত মনুষ্যদেহ বলেই মনে করে।

ব্রহ্মা তাই আঠাশতম শ্লোকের স্তুতিতে বলছেন—'**অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব হ্যতৎ ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ**'। হে ভগবন্ ! এ জগতে যারা বিবেকবান, তারা অনুভব করতে পারে যে, যদিও আপনি অনন্ত লীলা করেন তবু আপনার ব্রহ্ম, পরমাত্মাদি সর্ববিধ প্রকাশ এবং মৎস্য, কূর্মাদি, সর্ববিধ শ্রীবিগ্রহর কথা ভুলে আপনার ব্রজরাজনন্দন মূর্তির আশ্রয় লাভই শ্রেয়। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চনাদি সেবারূপ ভক্তিযোগই শ্রীভগবানকে পাওয়ার প্রকৃষ্ট পথ।

শ্রীধ্রুবও ভগবৎ দর্শন লাভের পরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর স্তুতিতে বলছেন—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-ধ্যানাদ্
ভবজ্জন কথা শ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ,
কিং ত্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৯।১০)

অর্থাৎ হে নাথ ! আপনার পাদপদ্মধ্যান, আপনার মধুর লীলা শ্রবণে যে অভূতপূর্ব আনন্দ পাওয়া যায় তা ব্রহ্মলীন হয়ে পাওয়া যায় না। স্বর্গাদি সুখের আনন্দের সঙ্গে যে এর কোনো তুলনাই চলে না, তা বলাই বাহুল্য।

তৎসাক্ষাৎ করনাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোস্পদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যপি জগদগুরো॥

(হরিভক্তিবিলাস)

হে ভগবন্ ! তোমার দর্শনানন্দ-সিন্ধুতে মগ্ন হয়ে মনে হচ্ছে যে, এ আনন্দের কাছে ব্রহ্মানন্দও গোষ্পদতুল্য।

ব্রহ্মা এই প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে সমস্ত পরমার্থতার মূলে যে ভগবৎ

কৃপা, তাঁর সেই আকুতি বর্ণনা করেছেন—

তে পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো।

(ভাগবত ১০।১৪।২৯)

হে ভগবন্ ! যদিও জ্ঞানিগণ জগৎকে দুঃখময় জেনে একমাত্র আপনাকেই আনন্দ-নিকেতন অনুভব করেন এবং বিবেকিগণ তাঁদের যথাযোগ্য বিবেকানুসারে কেউ আপনাকে ব্রহ্মরূপে, কেউ পরমাত্মারূপে, কেহ আপনার বিবিধ অবতাররূপে (মৎস্য-কূর্মাদি) অথবা কেউ বা আপনার নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে আপনারই অনুসন্ধানে রত হন। কিন্তু কেউই আপনার কৃপাশক্তি ব্যতীত নিজ আত্মশক্তিতে আপনাকে জানতে সমর্থ হয় না।

আপনার সমস্ত মূর্তি এবং ব্রহ্মপরমাত্মাদি সর্ববিধ প্রকাশই মায়াতীত, তাই মায়ার অধিকার থেকে নিবৃত্ত না হলে কারও আপনার স্বরূপ সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ হয় না, আর মায়া নিবৃত্তি তো একমাত্র আপনারই কৃপালব্ধ। গীতাতেও (৭।১৪) তাই আপনি বলেছেন **'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'** অর্থাৎ কেবল আপনার শরণাগত ব্যক্তিই মায়াকে অতিক্রম করে। জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্যাদি সাধনাভ্যাস বা কোনো প্রকার সিদ্ধিলাভের আভাস পেয়ে কেউ যদি স্পর্ধাবশত আপনার শরণাগত না হয়ে আত্মশক্তিতে মায়া নিবৃত্তি করতে প্রবৃত্ত হয় তাহলে তা বিফল পরিশ্রম ছাড়া কিছুই নয়।

জ্ঞানী জীবন্মুক্তিদশা পাইনু বলে মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

হে দেব ! আপনি অযাচিতভাবে জগতের জীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করার জন্যই জগতে অবতীর্ণ হয়ে বিচিত্র লীলা করে থাকেন। আপনার কৃপাই জীবের একমাত্র সম্বল। যারা আপনার কৃপা থেকে বঞ্চিত হন তাদের ভবসিন্ধু পার হওয়ার কোনো উপায় থাকে না। আপনার কৃপার অসাধ্য কিছুই নেই, আপনার কৃপায় মূকও বেদপরায়ণ হতে পারে, পঙ্গুও পর্বত লঙ্ঘন করতে পারে, আপনার কৃপায় সকলই সম্ভব। আপনার স্বরূপ, ঐশ্বর্য, মাহাত্ম্য প্রভৃতি অপার, অনন্ত হলেও এবং আপনার কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হলেও, তাঁরা আপনাকে আস্বাদন করতে সমর্থ হন, কিন্তু আপনার কৃপা উপেক্ষা করে

কোনো মহত্তম জীব যদি সহস্র সাধনানুষ্ঠানও করে, তবে একবিন্দুও আপনাকে জানতে সক্ষম হন না। অতএব আপনার স্বরূপাদি সাক্ষাৎকারে আপনার কৃপাই একমাত্র ভরসা। আপনার এই লীলায় যে প্রকার ভক্তবাৎসল্য, করুণা, প্রেমাধীনতা দেখা যায় তা আর অন্য কোনো লীলায় দেখা যায় না। তাই উদ্ধব মহাত্মা বিদুরকে বলছেন—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২।২৩)

আপনার লীলামাধুর্য ও করুণার দান দেখে উদ্ধব বিদুরকে বলছেন —অহো ! কৃষ্ণের কথা আর কত বলব ! হিংসাবৃত্তি কলুষিত হৃদয়া পুতনা রাক্ষসী যাঁকে স্তন্যপান করিয়েও ধাত্রীগতি লাভ করেছে, তার মতো করুণাময় আর কে আছে। আমরা এমন করুণাময় বিগ্রহের চরণ ছেড়ে আর কার শরণ নেব।

গোপিনীগণের প্রেমাধীনতা (শ্লোক ৩০-৩৬)

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেহত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোহপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥ ৩০

অহোহতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যত্তৃপ্তয়েহদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ॥ ৩১

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩২

এষাং তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা-

মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্বাদয়োঽঙ্‌ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে॥ ৩৩
তদ্‌ ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্‌ গোকুলেঽপি কতমাঙ্‌ঘ্রিরজোঽভিষেকম্‌।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্‌ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥ ৩৪
এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্‌ কিং দেব রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্‌ মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎ প্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে॥৩৫
তাবদ্‌ রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্‌।
তাবন্মোহোঽঙ্‌ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥ ৩৬

সরলার্থ—তাই, হে নাথ ! আমার এই জন্মেই হোক অথবা অন্য যে কোনো জন্মে, এমনকি পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্যক জাতির মধ্যে জন্মলাভ করেও যেন আপনার ভক্তদের একজন হয়ে আপনার চরণপল্লব সেবার অসীম সৌভাগ্যোদয় হয়—এই আমার একান্ত প্রার্থনা॥ ৩০॥ হে সর্বব্যাপী প্রভু, সৃষ্টির আদি থেকে কতশত যজ্ঞই তো অনুষ্ঠিত হয়েছে আপনার উদ্দেশ্যে কিন্তু সেগুলির কোনোটিই আপনাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করতে পারেনি ; অথচ সেই আপনিই ব্রজের গাভী এবং গোপনারীগণের বৎস এবং পুত্রের রূপ ধারণ করে তাঁদের অমৃততুল্য স্তনদুগ্ধ পরম আনন্দে পান করেছেন, এর চাইতে অধিক সৌভাগ্য তাঁদের আর কী হতে পারে ? ধন্য তাঁরা, ধন্য তাঁদের জীবন ! ৩১ ॥ নন্দ-গোপ এবং অন্যান্য ব্রজবাসিগণেরও সৌভাগ্যের আর সীমা নেই, কারণ পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং আপনি তাঁদের আত্মীয়, তাঁদের বান্ধব॥ ৩২ ॥ হে অচ্যুত ! এই বজ্রবাসীদের সৌভাগ্য-মহিমার কথা অবশ্য আলাদা ; কিন্তু মহাদেব প্রমুখ আমরা যে একাদশ দেবতা

একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা রয়েছি, সেই আমাদের ভাগ্যও তো কম শ্লাঘনীয় নয়। আমরাও তো এই ব্রজবাসিগণের মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে পান-পাত্ররূপে ব্যবহার করে আপনার চরণকমলের মকরন্দ-রস, যা কিনা মধুর, আসবের তুলনায়ও মাদক—তা-ই নিরন্তর পান করে চলেছি। এক-একটি ইন্দ্রিয়পথে এই আস্বাদ লাভ করেই যখন আমরা বিহ্বল হয়ে যাচ্ছি, নিজেদের ধন্য মনে করছি, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যারা তা সেবন করছে, সেই ব্রজবাসীদের সৌভাগ্যের কথা আর কী বলা যাবে ? ৩৩ ॥ প্রভু ! আমার এই বিশেষ প্রার্থনা, এই একান্ত নিবেদন, যদি এই মনুষ্যলোকে, এই বৃন্দাবনের মধ্যে, বিশেষ করে এই গোকুলে যে কোনো প্রাণীরূপেও আমার জন্ম হয়, তাহলে তা আমি আমার মহাভাগ্য বলে মনে করব। কারণ, তাহলে আপনাতেই যাঁরা নিবেদিত-প্রাণ, আপনিই যাঁদের জীবনসর্বস্ব, সেই প্রেমিক ভক্ত ব্রজবাসিগণের মধ্যে কারো-না-কারো চরণধূলিতে অবশ্যই অভিষিক্ত হবে এই শরীর। আর তাঁদের চরণরেণু, হে ভগবান মুকুন্দ ! আপনারই পদরজঃস্বরূপ — যার সন্ধানে বেদসমূহ অনাদিকাল থেকে অন্বেষণরত, আজও তাঁরা যা লাভ করতে পারেননি॥ ৩৪ ॥ হে দেবদেব ! এই অনন্য প্রেমভাবময়ী সেবার জন্য এই ব্রজবাসীদের আপনি কোন্ ফল দান করবেন, তা ভেবে আমার চিত্ত মোহগ্রস্ত হচ্ছে। সর্বকর্মফলেরও ফলস্বরূপ তো আপনিই, এমন কী ফল আছে, যা আপনার তুলনায় মহত্তর ? সেই নিজেকে (নিজস্বরূপতা) দান করেও তো আপনি এঁদের কাছে ঋণমুক্ত হতে পারবেন না। কারণ, কেবলমাত্র সাধ্বী স্ত্রীলোকের (ভক্ত গোপ-রমণীর) বেশ ধারণ করেই তো ক্রূরহৃদয়া পূতনা (বকাসুর-অঘাসুরসহ) সপরিবারে আপনাকেই প্রাপ্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে যাঁরা নিজেদের গৃহ, ধন, আত্মীয়-বান্ধব, প্রিয়জন, শরীর, পুত্র-কন্যা, প্রাণ, মন—সব কিছুই আপনার চরণে সমর্পণ করেছেন, যাঁদের সর্বস্বই আপনারই জন্য, সেই বজ্রবাসীদেরও আপনি সেই একই ফল (আত্মস্বরূপতা) দান করে কীভাবে ঋণমুক্ত হবেন ? ৩৫ ॥ হে কৃষ্ণ, হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্যামসুন্দর ! জীবগণ যতকাল পর্যন্ত আপনার

শরণ নিয়ে আপনারই জন না হয়ে যায়, ততকালই রাগদ্বেষাদি দোষ চোরের মতো তাদের সর্বস্ব অপহরণ করতে থাকে, ততদিনই গৃহ (এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ) তাদের কারাগারের মতো বহুবিধ (সম্বন্ধের) বন্ধনে বদ্ধ করে রাখে, এবং ততকালই মোহ তাদের পায়ের শৃঙ্খলস্বরূপ হয়ে গতিরোধ করে থাকে॥ ৩৬ ॥

মূলভাব—পূর্ব পূর্ব শ্লোকে ব্রহ্মা এইভাবে সচ্চিদানন্দ প্রাপ্তির নানাবিধ সাধনানুষ্ঠান ও সর্বমূল স্বরূপ শ্রীভগবানের কৃপার কথা বলে পরিশেষে বলছেন, হে ভগবন্! আমার ওপর আপনার কি যে অযাচিত কৃপা তা বলে শেষ করা যায় না। জগতে দেখি যার ওপরই আপনার কৃপা হয়, সেই জড়জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আপনাকেই জীবনের লক্ষ্য ও সারবস্তু মেনে আপনারই উপাসনায় রত হয়। উপাসকদের মধ্যেও যাঁরা আপনার চরণে একান্ত শরণাগত তাঁরাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে আপনার সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে। তার মধ্যেও আবার যাঁরা প্রেমবশত আপনার চরণে শরণাগত, তারাই আপনার এই নরাকৃতি পরব্রহ্ম ব্রজরাজনন্দন মূর্তির সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারে আর আপনার কৃপায় আপনার চরণ লাভের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। কিন্তু জানি না কোন্ এক অনির্বচনীয় সৌভাগ্যের ফলে এবং আপনার অযাচিত করুণার বলে আমি আপনার ব্রজরাজনন্দনমূর্তির চরণ-নিকটে উপস্থিত হতে পেরেছি। যদিও আমার ব্রহ্মাপদ প্রাপ্তিও আপনারই কৃপার দান, তবে আপনার চরণে উপস্থিত হয়ে আর ব্রহ্মাপদের শ্রেষ্ঠতা অনুভব হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যে আপনার চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তিই সব। এখন অনুভবও করছি যে আমার ব্রহ্মাজন্ম ও তদনুরূপ দেহ কিংবা অন্য জীব বা পশুপক্ষীরূপ জন্ম ও তদানুরূপ দেহ কিছুতেই আগ্রহ নেই। এখন বুঝতে পারছি, যে দেহে আপনার চরণ সেবাধিকার পাওয়া যায়, সেই দেহই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম চিন্তা করছেন ব্রজরাজনন্দনের এই লীলায় সামান্য কীট ভ্রমর, গোবৎস ও হরিণ, সামান্য পশু, শুক-পিকাদি সামান্য পক্ষী এমনকি নব নব কোমল তৃণ সামান্য উদ্ভিজ্জ হলেও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সবাই আপনার সেবায় ব্যগ্র। তাই ব্রহ্মা স্তুতিতে বলছেন

—হে কৃপাসিন্ধো ! আমাকে সেই কৃপা করুণ যাতে আমি যে দেহই পাই না কেন, আপনার চরণ সেবায় রত থাকতে পারি।

কিয়ে মানুষ পশু পাখী জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে গতাগতি পুনপুন মতি বহুতুয়া পরসঙ্গে॥

(বিদ্যাপতি)

ব্রহ্মা এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবাধিকার প্রার্থনা করে পরক্ষণেই ভাবছেন, আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ, সুতরাং চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্য নই, কেননা তাঁর নিত্যপার্ষদগণেরই এই সেবায় মুখ্য অধিকার, আর বৃন্দাবনের গো-গোপ-গোপী এবং অন্যান্য নরনারী ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেই তো কৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ। সুতরাং কৃষ্ণের চরণ সেবাধিকার প্রার্থনা করা অপেক্ষা ব্রজবাসী ভক্তগণের চরণ সেবাধিকার প্রার্থনা করাই শ্রেয়। এই চিন্তা মনে উদয় হওয়াতেই ব্রহ্মা ত্রিংশ শ্লোকে **'তদস্তু মে নাথ'** আদি শ্লোকে স্তুতি করছেন—

যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্।

(ভাগবত ১০।১৪।৩০)

অর্থাৎ হে ভগবন্! আমি পশুপক্ষী প্রভৃতি যে জন্মই গ্রহণ করি না কেন, যেন আমি আপনার ব্রজবাসী ভক্তগণের অর্থাৎ গো-গোপ-গোপী এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতি যে কোনও ভক্তের চরণ সেবন করতে পারি। তাঁদের কৃপা হলেই আমি কৃতার্থ হব, এবং কোনো না কোনো দিন আপনার চরণ সেবাধিকার পাব এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এরপরেই ব্রহ্মা স্তুতি করে বলছেন, হে ভগবন্ ! আমি সমস্ত ব্রজবাসিগণের প্রেমমাহাত্ম্য প্রকাশ করতে সক্ষম নই, কিন্তু যদি আংশিকভাবেও সাধ্যমতো তাঁদের প্রেমমাহাত্ম্যর কথা আলোচনা করি তাহলে আমাদের সকলেরই চমৎকৃত হতে হবে।

প্রভু আপনি বিভু অর্থাৎ আপনি স্বরূপ, ঐশ্বর্য মাহাত্ম্য প্রভৃতি সর্বভাবে পূর্ণ। আমরা স্বর্গবাসী দেবগণ নানা উপাচারে কর্মকাণ্ডের বিধি অনুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে অমৃতের নৈবেদ্য দ্বারা আপনার উপাসনা করে থাকি, কিন্তু আমরা জানি না আপনি কোনোদিন ইহার যৎকিঞ্চিৎও গ্রহণ করছেন কি

না ? আবার আমরা স্বর্গবাসী দেবগণ অমৃতপায়ী হয়েও যজ্ঞভাব গ্রহণের লোভ সম্বরণ করতে পারি না, কিন্তু আপনি যজ্ঞভাবে অনাসক্ত হলেও ব্রজের গো এবং গোপরমণীগণের স্তনদুগ্ধ পানের লোভ ছাড়তে পারেন না। সেইজন্যই আপনি আমার দ্বারা গোবৎস এবং গোপবালকগণকে স্থানান্তরিত করিয়ে, নিজেকে গোবৎসরূপে গোগণের এবং গোপরমণীগণের পুত্ররূপে তাদের স্তন্য পান করেছেন। তাই ভাবি, আপনার ব্রজবাসী ভক্তগণের কী অনির্বচনীয় মহিমা ! ব্রহ্মা স্তুতিতে তাই বলছেন, **'অতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা'** (ভা. ১০।১৪।৩১) অর্থাৎ অহো ! ব্রজবাসী গো ও গোপীগণ সত্যি অতি ধন্য, কেননা আপনি অনন্ত গোবৎস্য এবং গোপবালক মূর্তি ধারণ করে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ব্রজের গো এবং গোপীগণের স্তন্যপান করেছেন।

ব্রহ্মা এইরূপে ব্রজের গো ও গোপরমণীগণের প্রেমমহিমা বর্ণনা করে পরের দ্বাত্রিংশ শ্লোকে বলছেন—**'অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্'** (ভ. ১০।১৪।৩২) অর্থাৎ হে ভগবন্ আপনার ব্রজে আপনার অনন্ত প্রকার পার্ষদ আছেন, সেখানকার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সমস্তই আপনার পার্ষদ, সকলেই পরম প্রেমবান এবং আপনার অশেষ কৃপা পাত্র। ব্রজবাসী জীবমাত্রেরই কী অনির্বচনীয় সৌভাগ্য যে এরা সকলেই আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসে আর আপনিও এদের অত্যন্ত ভালবাসেন। জগতে সর্বত্রই দেখা যায় যে, আনন্দ পাওয়ার জন্য সকলেই ছুটাছুটি করে বেড়ায় কিন্তু, আপনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হয়েও আমি যখন গোপবালক ও গোবৎসগণকে অপহরণ করে রেখেছিলাম, তখন তাদের পাওয়ায় জন্য আপনি কত ছোটাছুটি করে বেড়ালেন, কত বনে খোঁজাখুঁজি করে বেড়ালেন, তাদের নাম ধরে কত ডাকাডাকি করলেন। ব্রজবাসী জীবমাত্রেরই এই সৌভাগ্যের কারণ—'**যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্** (ভাগবত ১০।১৪।৩২)।' অর্থাৎ আপনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হয়েও ব্রজবাসী জীবমাত্রেরই অকৃত্রিম বন্ধু এবং ব্রজের ছোট-বড় সর্বজীবের উপরেই আপনার অকৃত্রিম ও অচ্ছেদ্য ভালোবাসা।

ব্রহ্মা এইরূপে ব্রজবাসী জীবমাত্রেরই মহাসৌভাগ্য বর্ণনা করতে করতে প্রেমানন্দে পুলকিত হয়ে পড়লেন এবং ব্রজরাজনন্দনকে বললেন, হে ভগবান ! আপনার পরম প্রিয় ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের কথা আর কত বলব। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব কিন্তু তাদের ভাগ্য মহিমায় আমিও কৃতার্থ। কেবল একা আমি নয়, আমরা একাদশ ইন্দ্রিয়র একাদশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলেই কৃতার্থ। জীবমাত্রেরই চতুর্দশ ইন্দ্রিয় আছে—

	ইন্দ্রিয়	অধিষ্ঠাত্রী দেবতা	বিষয়গ্রহণ
কর্মেন্দ্রিয়	বাক্	বহ্নি	—
	পানি	ইন্দ্র	—
	পাদ	বিষ্ণু	—
	পায়ু	মিত্র	—
	উপস্থ	প্রজাপতি	—
জ্ঞানেন্দ্রিয়	চক্ষু	সূর্য	রূপ
	কর্ণ	দিক	শব্দ
	নাসিকা	অশ্বিনী	গন্ধ
	ত্বক	বায়ু	স্পর্শ
	জিহ্বা	রস প্রচেতং	প্রচেতা
অন্তরিন্দ্রিয়	মন	চন্দ্র	সংশয়
	বুদ্ধি	ব্রহ্মা	নিশ্চয়
	অহংকার	রুদ্র	শর্ব
	চিত্ত	বাসুদেব	স্মরণ

কিন্তু চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ই জড় পদার্থ, তাই তারা স্বয়ং কোনো বিষয় গ্রহণ করতে পারে না। সেইজন্য বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান এই চতুর্দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা এই চতুর্দশ প্রকার বিষয় গ্রহণ নিস্পাদন করার জন্য চতুর্দশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিযুক্ত করেছেন। এই চতুর্দশ ইন্দ্রিয়র চতুর্দশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই এই ইন্দ্রিয়র দ্বারা

বিষয় সকল গ্রহণ করিয়ে তা দেহাভিমানী জীবকে আস্বাদন করান।

এই চতুর্দশ ইন্দ্রিয়র মধ্যে পায়ু ও উপস্থ—এই দুটি অধঃ কর্মরত এবং এই দুই ইন্দ্রিয়র সাথে কৃষ্ণসেবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই বলে এবং এদের ক্রিয়াও শ্লীলতাসম্পন্ন নয় বলে ব্রহ্মা এদের সম্বন্ধে কিছু বলেননি। আর চিত্তাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাসুদেবও সাক্ষাৎ কৃষ্ণেরই চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত বলে তাঁর নামও নিজের মধ্যে ধরেননি। ব্রহ্মা তাই বলেছেন—**'একাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ'** (ভাগবত ১০।১৪।৩৩) অর্থাৎ ব্রহ্মা চতুর্দশ ইন্দ্রিয়র চতুর্দশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা না বলে বলেছেন 'আমরা একাদশ ইন্দ্রিয়র একাদশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা'। ব্রহ্মা বলেছেন—**'শর্বাদয়োঽঙ্ঘ্রযুদজমধ্বমৃতাসবং'**-এর তাৎপর্য হল যদিও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে অন্তরিন্দ্রিয় বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেব হলেন ব্রহ্মা, কিন্তু তিনি তাঁর অপরাধজনিত কারণে নিজের নামোচ্চারণ না করে 'অহংকারের' অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'শর্ব' অর্থাৎ রুদ্রর কথা উল্লেখ করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির তুলনায় শ্রীভগবান ও তাঁর পার্ষদগণের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হলে কিছুই ধারণা করতে পারা যায় না। উপনিষদ্ বলছেন, জীবের ইন্দ্রিয়রাজী কেবলমাত্র জড় বস্তুই গ্রহণ করে থাকে, তাতে সচ্চিদানন্দ বস্তুর জ্ঞান হয় না।

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণোৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্'

(কঠোপনিষদ্ ২।১।১)

অর্থাৎ বিশ্বনিয়ন্তার নির্মাণকৌশলে, জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বহির্বস্তু গ্রহণের জন্য নির্মিত হয়েছে, তাই জীবের ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল বহির্বস্তুরই জ্ঞান হয়ে থাকে, কদাপি অন্তঃরাত্মাকে দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীভগবানের পার্ষদগণ, তাঁদের চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বদাই সর্বান্তরাত্মা শ্রীভগবানের রূপমাধুর্য গ্রহণ করে থাকেন, সুতরাং তাদের ইন্দ্রিয়সকল যে প্রাকৃতিক জীবের ইন্দ্রিয়ের মতো নয়, তা বলাই বাহুল্য।

জীব ও পার্ষদগণের ইন্দ্রিয়গুলির পার্থক্য হল জীবের ইন্দ্রিয়বর্গ সবই

জড়-পদার্থ, সুতরাং তাদের স্বশক্তিতে বিষয় গ্রহণের সামর্থ্য নেই, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের শক্তিতেই জীব জড়-ইন্দ্রিয় দ্বারা জড়-বিষয় গ্রহণ করা হয়। তবে এই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ জড় বিষয়-কার্যের সহায়তা করেন মাত্র, তাঁরা বিষয়ভোক্তা নহেন। কিন্তু শ্রীভগবানের পার্ষদগণের ইন্দ্রিয়বর্গ জড়পদার্থ নয়, তাঁদের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের শক্তির কোনো প্রয়োজন নেই তাঁরা স্বশক্তিতেই শ্রীভগবানের রূপরসাদি গ্রহণ করে থাকেন।

ব্রহ্মা এই সমস্ত তত্ত্ব জেনেও প্রেমাবেশে এবং ব্রজবাসী ভক্তগণের সৌভাগ্যজনিত আনন্দাবেশে নিজেও আত্মাহারা হয়ে তাঁদের (অর্থাৎ ভগবানের পার্ষদদের) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়র এবং জীবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়র পার্থক্য বিস্মৃত হয়েছেন। **'এষান্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তাং'** (ভাগবত ১০।১৪।৩৩) শ্লোকে কেবল পরম্পরা সম্বন্ধে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে ব্রহ্মা বলছেন, হে ভগবান ! ব্রজবাসীগণের একাদশ ইন্দ্রিয়ে আপনার মাধুর্য আস্বাদিত হয় বলে আমরা সকলে যারা জীবের একাদশ ইন্দ্রিয়ের একাদশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তারাও ধন্য।

কিন্তু এইরূপ স্তুতি করতে করতেই ব্রজবাসিগণের মহামাহাত্ম্য তাঁর চিত্তে স্ফূর্তি হওয়ায় পরবর্তী শ্লোকেই ব্রজবাসীগণের চরণকমলের স্তুতি করে ব্রহ্মা বলছেন—**'তদ্ ভুরিভাগ্যমিহ.......কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্'** (ভাগবত ১০।১৪।৩৪) অর্থাৎ হে ভগবন্ ! আমি পূর্বে প্রার্থনা করেছিলাম যে 'আমি যেন এই জন্মেই কিংবা পশু-পক্ষী প্রভৃতি হয়েও যে কোনো জন্মান্তরে ব্রজবাসী ভক্তগণের চরণ সেবন করতে পারি।' কিন্তু এখন আমি ব্রজবাসিগণের ভাগ্যমহিমা আলোচনা করে দেখছি যে আমার প্রার্থনায় অতীব ধৃষ্টতা প্রকাশ হয়েছে, কেননা আমি কোনোক্রমেই ব্রজবাসী ভক্তগণের চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যই নই। সেইজন্য এখন প্রার্থনা করছি যেন আমি তাঁদের চরণধূলিকণায় অভিষিক্ত হতে পারি, কৃতার্থ হতে পারি।

পূর্ব পূর্ব শ্লোকে শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতি প্রার্থনা করে এখন কেন

আবার তিনি ব্রজবাসিগণের চরণধূলিকণিকা প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হচ্ছেন তা তিনি পরবর্তী শ্লোকে ব্যক্ত করেছেন। ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্ ! আমার মনে হচ্ছে আপনি ব্রজলীলায় এই পরমপ্রেমময় ব্রজবাসী ভক্তগণকে তাদের প্রেমসেবার প্রতিদানরূপে কিছু দেবেন ! কর্মীগণ কর্মযোগে আপনার উপাসনা করে ইন্দ্রপদ, ব্রহ্মপদ প্রভৃতি লাভ করেন। জ্ঞানিগণ জ্ঞানযোগে আপনাতে সাযুজ্য লাভ করেন আর অষ্টাঙ্গ যোগিগণ যোগমার্গে আপনার উপাসনা দ্বারা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু এই তিনটির একটিও ব্রজবাসি ভক্তগণের প্রেমসেবার উপযুক্ত প্রতিদান নয়। কেননা অসুরগণ পর্যন্ত অনেক সময় ইন্দ্রপদ লাভ করেন। আপনার এই লীলায় অঘাসুর, বকাসুর ও সাযুজ্য লাভ করেছে, রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি রাক্ষস ও অসুরগণও অণিমাদি যোগসিদ্ধি লাভ করেছেন। এইরূপ কত কত জ্ঞানী, যোগী, ঋষি, ন্যাসী, তপস্বী, প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রম ও তীব্র সাধন-ক্লেশ স্বীকার করে আপনার উপাসনা করে বটে, কিন্তু তাদের সকলেরই ভুক্তি, মুক্তি কিংবা সিদ্ধিপ্রাপ্তির কামনা থাকে। কিন্তু আপনার ব্রজবাসী ভক্তগণের প্রেমমহিমা আর কত বলব। যারা আপনাকে না পেয়েও ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকতে পারে না, তাদের প্রেমের কী তুলনা আছে। ব্রজবাসী ভক্তগণ আপনার সঙ্গে যে পরম প্রেমের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে আছে এবং আপনাকে আবদ্ধ করে রেখেছে, তা এই ব্রজ ছাড়া আর কোথাও সম্ভবপর হয় না। হে ভগবন্ ! অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের যোগী, ঋষি, জ্ঞানী, কর্মী, তপস্বী ও সাধকগণের সাধন ও ভজনের অনুরূপ ফলপ্রদানে আপনি যে প্রতিশ্রুত **‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্’** অর্থাৎ ‘আমাকে যে, যেভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেইভাবেই ফল প্রদান করে থাকি’ আপনার এই সাহংকার প্রতিজ্ঞা পূরণ সম্ভব হলেও, ব্রজবাসী ভক্তর বেলায় কিন্তু কিছুতেই আপনি আপনার এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবেন না। চিরতরে তাদের প্রেমঋণে আবদ্ধ থাকবেন। ব্রহ্মা তাই বিস্ময়ে বলছেন—**‘এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং ফলং দেব**

রাতেতি' (ভাগবত ১০।১৪।৩৫)। ব্রজবাসিগণের এই নির্ভর গভীর প্রেমের প্রতিদান দেওয়া সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, সর্বফলদাতা শ্রীভগবানের পক্ষেও অসম্ভব তাই তিনি ব্রজবাসী ভক্তগণের প্রেমে চিরদিনই ঋণী। সেইজন্যই ব্রহ্মা এই ব্রজবাসী ভক্তগণের চরণধূলিকণিকা স্পর্শাধিকার প্রাপ্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলে স্থির করলেন এবং তা পাওয়ার জন্য ব্রজরাজনন্দনের চরণে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানালেন।

ব্রহ্মা ব্রজবাসিগণের শ্রীভগবানের প্রতি আসক্তি এবং জীবের বিষয়াসক্তির উল্লেখ করে এ বিষয়ে ছত্রিশতম শ্লোকে **'তাবদ্ রাগাদয়ঃ স্তেনাঃ...'** ইত্যাদি বলে বর্ণনা করেছেন। দেহ-গেহাদি বিষয়ে আসক্তির নামই রাগ (বা অনুরাগ)। আর রাগের মতো পরম শত্রু জীবের আর দ্বিতীয় নেই। জীবগণ যখন প্রথম জগতে আসে তখন তাদের রাগের পাত্র বেশি থাকে না, আর প্রথমে অল্প রাগ থাকলেও ক্রমে বিবাহ, পুত্র-কন্যাদি উৎপাদন, ধন উপার্জন, মান, যশ লাভ ইত্যাদির মাধ্যমে রাগের সাম্রাজ্য বর্ধন করে, তারপরে পুত্র-কন্যাদিগণকে সেই পথের পথিক করে, এবং জগতের সমস্ত জীবেরই যাতে দেহ-গেহাদিতে রাগ বৃদ্ধি পায় তার জন্য সর্ববিধ প্রযত্ন করে থাকে।

এই দেহগেহাদিতে **বিষয় আসক্তি** বা রাগ সকলেরই চিরসহচর এবং সযত্নে লালিত হয়ে হৃদয়ে অবস্থান করে। এই রাগ তস্করের মতো জীবের সর্ববিধ সৎপ্রবৃত্তি ও শুভবাসনা অপহরণ করে জীবকে একেবারে নিঃস্ব করে দেয়। জগতে অনেক লোকেরই অনেক রকম সৎপ্রবৃত্তি ও শুভবাসনা দেখা যায়, কিন্তু তাদের অন্তরে যখন বিষয়াসক্তি প্রকাশ পায়, তখন দেখা যায় যে তাদের ভেতর আর সেই সৎপ্রবৃত্তি বা শুভবাসনার লেশমাত্র নাই। দরিদ্র লোক দীন অবস্থায় অতিবাহিত করে কিন্তু ধন পেলে—**'অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ'** অর্থাৎ সমস্ত জগৎই তার কাছে তৃণবৎ বলে মনে হয়।

এই দেহ-গেহাদি **বিষয়ের বন্ধন** কারাবন্ধন থেকেও কম তো নয়ই বরং সর্বাংশে বেশি। কারাবন্দীর কারাবন্ধের নির্দিষ্ট সময় আছে, কিন্তু দেহ-

গেহাদিতে আবদ্ধ জীবের সময়ের কোনো ইয়ত্তা নেই। তারা অনাদিকাল থেকে এই বন্ধনে আবৃত আছে আর কবে যে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হবে তার কোনো স্থিরতা নেই। যারা কারাবন্দী তারা কারাগৃহে বন্ধন দুঃখদায়ক মনে করে তার থেকে নিরন্তর মুক্তিলাভের জন্য ব্যাগ্র থাকে কিন্তু দেহ-গেহাদির এমন আশ্চর্য কারাগার যে, এতে যারা বন্দী হয় তারা একেই পরম সুখভোগের স্থান বলে মনে করে এবং জন্মজন্মান্তর ধরে এতেই বন্ধন হয়ে থাকতে চায়।

আবার দেহ-গেহাদি আসক্তি হতেই **'মোহ'** বা অবিবেক উৎপন্ন হয়। দেহ, গেহ, পুত্র, বিত্ত, মান যশোলাভে আসক্ত ব্যক্তির কোনো প্রকার ভালো মন্দ বিচার করার শক্তি থাকে না। দেহ-গেহাদিতে আসক্তিবশত, তাদের দ্বারা সুখ অর্জনের জন্য, তার তখন কোনো কর্তব্যই আর কর্তব্য মনে হয় না। শাস্ত্র, আচার্য আদির শত শত উপদেশও তাদের হৃদয়ে অবিবেক দূর করতে সমর্থ হয় না। দেহ-গেহাদিতে আসক্ত ব্যক্তির এই মোহই হল পায়ের শিকল। সেইজন্য এই দেহ জরাজীর্ণ হলে, নিজে গৃহ-পুত্রাদিবিহীন হলেও কেউ মোহরূপী শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারে না।

তাহলে এই আসক্তির থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কী ? আসক্তির স্বভাবই হল এই যে, সে চিরকালই প্রিয়বস্তুর অন্বেষণ করে। আপনি (শ্রীকৃষ্ণ) সকল আত্মারই আত্মা, সুতরাং আপনার মতো প্রিয়জন জীবের আর কেউই নেই। কিন্তু যার আসক্তি আপনাতে নেই, সেই আসক্তিই তস্কর-স্বভাবপ্রাপ্ত হয়ে জীবের সর্ববিধ সৎপ্রবৃত্তি ও শুভবাসনা অপহরণ করে, দেহ-গেহাদিতে আকর্ষণকে কারাগারে পরিণত করে আর মোহের শৃঙ্খলে তাকে আবদ্ধ করে। কিন্তু যার আসক্তি আপনাতে, তার আর চিন্তা কী আছে ? লোহা যদি অস্ত্রাকৃতি ধারণ করে, তা হলেও সে স্পর্শমণির স্পর্শ পেলে আর কিছুই ছেদন করতে পারে না, এমনকি শৃঙ্খলাকৃতি লোহাও স্পর্শমণির স্পর্শ পেলে তা অলংকারে পরিণত হয়। হে পরমানন্দ-বিগ্রহ ! আপনার ব্রজবাসী ভক্তগণের কথা আর কী

বলব ! তাদের আসক্তি আপনা ভিন্ন আর কিছুতেই নেই। তাদের দেহ গৃহ, পুত্র, বিত্তাদি সকলই হচ্ছে আপনার সেবার উপকরণ। আর এইভাবে যাঁদের ঐকান্তিক সেবায় তুষ্ট হয়ে আপনি তাঁদের নিজ জন বলে অঙ্গীকার করেন, তাদের রাগ, তস্করবৃত্তি পরিত্যাগ করে আপনারই সেবায় নিযুক্ত হয়, দেহ-গেহাদি বিষয়-কারাগার আনন্দভবনে পরিণত হয় এবং মোহের বন্ধন তাঁদের আপনার চরণের সঙ্গে চিরবন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়।

আত্মারামগণের বিষয়-আসক্তি বা তজ্জন্য মোহ না থাকলেও তাঁদের আত্মা আপনার স্বরূপানন্দে মগ্ন থাকে, কিন্তু আপনার ব্রজবাসিগণের আত্মা পর্যন্ত আপনার সেবাতেই নিযুক্ত। হে ভগবন্ ! আমাদের মতো তুচ্ছ জীবের কথা আর কী বলব। আপনার চরণসেবার অধিকার প্রাপ্তি তো দূরের কথা, আমরা অনাদি বহির্মুখতার জন্য আপনার সেবার ইচ্ছা পর্যন্ত হারিয়েছি।

জীবের বহির্মুখতার কথা নিবেদন করে প্রকরণটির অন্তিম শ্লোকে ব্রহ্মা বলছেন, হে ভগবন্ ! আপনার সঙ্গে জগৎ ও জাগতিক কোনো ভাবের সম্বন্ধ না থাকলেও আপনি জন্মগ্রহণ, দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, ক্ষুধা প্রদর্শন, বাল্যচাপল্য আদি জাগতিক ভাবের অনুসরণ করে জগতে নানাবিধ লীলা করে থাকেন। ব্রহ্মা স্তুতি করে বলছেন — **'প্রপন্নজনতানন্দ সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো'**। অর্থাৎ হে ভগবান ! আপনার চরণাগতজন, আপনার পরমমধুর লীলা আস্বাদন করে পরমানন্দসিন্ধুতে মগ্ন হন।

ব্রহ্মার কৃপা প্রার্থনা (শ্লোক ৩৮-৪০)

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ ৩৮
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্বং ত্বং বেৎসি সর্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎতবার্পিতম্॥ ৩৯

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্
ক্ষ্মানির্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্ ।
উদ্ধর্মশার্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুগ্
আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্ নমস্তে॥ ৪০

সরলার্থ— ব্রহ্মা প্রার্থনা করছেন, হে ভগবন্— বেশি কথারই বা প্রয়োজন কী ? যাঁরা আপনার তত্ত্ব জানেন বলে মনে করেন, তাঁরা জানুন ; প্রভু, আমি তো জানি, আমার মন, বাক্য, শরীর—এসবের এমন সামর্থ্য নেই যে, আপনার মহিমা ধারণা করতে পারে॥ ৩৮ ॥ আপনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বসাক্ষী— সবই আপনি জানেন। আপনিই সর্বজগতের নাথ, জগৎ আপনাতেই স্থিত। ('আমি সৃষ্টিকর্তা, আমার সৃষ্ট এই জগৎ'—এইসব নির্বোধের অভিমান, অহং-মমতাদি আপনি নিজের অসীম করুণায় দূর করে দেওয়াতে) এই জগৎ-সহ নিজেকে আমি আপনার সত্তাতেই সত্তাবান বলে উপলব্ধি করতে পারছি, এই দ্বৈতভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম আপনার চরণে, হে নিখিলের আকর্ষণকর্তা, হে জগতের পরম গতি, হে কৃষ্ণ, স্বীকার করুন, গ্রহণ করুন আমাকে ! আর আজ্ঞা করুন, এবার এই শরীর নিজ লোকে গমন করুক॥ ৩৯ ॥ হে কৃষ্ণ ! আপনি যদুকুলরূপ পদ্মের পক্ষে প্রীতিদায়ক সূর্য (যদুকুল নলিন-দিনেশ) এবং পৃথিবী, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পশু (গোধন)-রূপ সমুদ্রের বৃদ্ধি-সম্পাদক চন্দ্র। আবার পাপাচার তথা অধর্মরূপ নৈশ অন্ধকারের দূরীকরণে একাধারে সূর্য এবং চন্দ্রস্বরূপও আপনি। পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে যে সব ধর্মদ্রোহী রাক্ষস, তাদের আপনি বিনাশ করেন, সূর্য-সহ তাবৎ দেবতার বন্দনীয় হে প্রভু ! প্রণাম আপনাকে, আকল্পকাল আপনার চরণে প্রণতিতে অবিচল থাকতে পারি যেন আমি, মোহ যেন আর আমায় গ্রাস না করে, হে ভগবান ! ৪০

মূলভাব—শ্রীভগবানের ব্রজবাসী ও ভক্তগণের প্রেমাধীনতা বর্ণনা করে ব্রহ্মা বলছেন, হে অপার মহিমা পারাবার ! আপনার স্বরূপ, ঐশ্বর্য, লীলা

প্রভৃতি সমস্তই অচিন্ত্য।

'মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ, ন মে প্রভো'।

(ভাগবত ১০।১৪।৩৮)

হে ভগবন্! আমার মন কখনই আপনার বৈভব অমৃতসিন্ধুর বিন্দু কণিকা স্পর্শেরও যোগ্য নয়। আমি চতুর্বেদের বক্তা হয়েও আপনার বৈভব দর্শনে অসমর্থ। আবার আমি আপনার সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করলেও, এর কোনো তত্ত্বই জানি না। সুতরাং আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবাধম হয়ে আপনার নিকট কী প্রার্থনা করব, কি-ই বা আপনার স্তুতি করব! সুতরাং আপনারই দাসানুদাস আমি আপনারই অন্তঃপ্রেরণায় আপনাকে কী বলেছি, কীভাবে স্তুতি করেছি এবং তা ভাল কী মন্দ, তা আমি কিছুই জানি না।

হৃদয়ে প্রেরণা কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিলাম ভাল মন্দ কিছুই নাহি জানি॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অতএব হে ভগবন্! **'অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ'** আপনি আমাকে কৃপাদেশ প্রদান করুন যাতে আমি স্বস্থানে চলে যাই। আপনার গোপবালক ও গোবৎসগণকে মায়ামুগ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়ে আমি যে অপরাধ করেছি তার তো কোনো ইয়ত্তা নেই। আমাকে আপনি কৃপা করুন যাতে ভবিষ্যতে আর এরকম গর্হিত কাজে প্রবৃত্তি না জন্মায়। হে ভগবন্! আপনার মহিমার কথা কত আর বলব। **'আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্ নমস্তে'** অর্থাৎ হে ভগবান, ব্রহ্মাণ্ড হতে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত সর্বলোকবাসী সর্বজীবের একমাত্র পূজ্য ও নমস্য তো আপনিই। আমি যেন আমার জীবিতকাল (কল্প পর্যন্ত) অবধি আপনার চরণে প্রণত হয়ে থাকতে পারি। ব্রহ্মা এইরূপে ব্রজরাজনন্দনের যথাসাধ্য স্তুতি করে করজোড়ে তাঁর গুণগান করতে করতে তিনবার তাঁর শ্রীবিগ্রহ প্রদক্ষিণ করে এবং পুনঃপুনঃ ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে চরণে অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে সত্যলোকের দিকে গমন করলেন।

———o———

কালীয় পত্নীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি

(দশম স্কন্ধ, ষোড়শ অধ্যায়, শ্লোক ৩৩—৬২)

কৃষ্ণর বয়স ছয় বৎসর—গ্রীষ্মকাল

প্রাক্‌কথন

পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব মহারাজ বলেছেন যে—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ছয় বছর বয়সে গ্রীষ্মকালে কালীয়দমন লীলা করেছিলেন।' কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিত সংক্ষিপ্তভাবে কালীয়দমন লীলা শুনে পরিতৃপ্ত হলেন না। যখন তিনি বিশেষভাবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন তখন শ্রীশুকদেব আবার কালীয়দমন লীলা বিস্তৃতভাবে ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণনা করলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের বর্ণনা এইরূপ—একদিন বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম, সুবলাদি গোপবালকগণসহ গোচারণ করতে করতে যমুনাতীরে উপস্থিত হলেন। শ্রীবলদেব প্রত্যহই শ্রীকৃষ্ণর সঙ্গে গোচারণে যান, কিন্তু সেদিন তিনি গোচারণে যাননি। যাইহোক, কৃষ্ণ গোচারণ করতে করতে যমুনাতীরে উপস্থিত হলেন, আর তখন গ্রীষ্মকালের প্রখর মধ্যাহ্নসূর্য তাপে তপ্ত ও পিপাসিত হয়ে গোগণ ও গোপবালকগণ দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে যমুনা তটে উপস্থিত হল এবং সেখানকার বিদূষিত জল পান করা মাত্র প্রাণ হারাল। কৃষ্ণ তাদের অবস্থা অবলোকন করে তাঁর অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিপাতে তাদের পুনর্জীবিত করলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন, আমার লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে এইরকম বিষাক্তজল কোনোপ্রকারেই থাকা উচিত নয়। এইস্থানে যমুনার হ্রদমধ্যে মহাবিষধর কালীয়সর্প বহুদিন হতেই বসবাস করছে এবং তার ফলে তারই তীব্র বিষে যমুনার জল বিষাক্ত হয়েছে, তাই এখনই একে বিদায় করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃই সর্বজীবের সর্বদুঃখমোচনকারী, সুতরাং তাঁর সকল কার্যই সকলের পরম হিতকর। তিনি কালীয় সর্পকে শ্রীবৃন্দাবন হতে বিতাড়িত করে তার মহাগর্ব খর্ব করলেন এবং কৃপা করে তার আসুর স্বভাব দূর করে দেবগণের হিত করলেন। যমুনার জল বিষমুক্ত হওয়ায় ব্রজবাসিগণ চিরতরে

শঙ্কামুক্ত হলেন এবং অবাধে যমুনা হ্রদের জল পান করে পিপাসা দূর করলেন। বিশেষত এই মহাতীর্থ উদ্ধার হওয়ায় জগতের পরম কল্যাণও সাধিত হল।

শ্রীশুকদেবের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তৃপ্ত না হতে পেরে মহারাজ পরীক্ষিত বিনীতভাবে শ্রীশুকদেবকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—হে গুরো! যদিও অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে কোনো প্রকার কার্য করতে সমর্থ, তাও আমার জানতে ইচ্ছে করে যে এই অগাধ যমুনা জল হতে তিনি কীভাবে কালীয়কে বিতাড়ন করলেন আর কী করেই বা কালীয় বহুদিন ধরে যমুনা জলে বাস করছিল।

মহারাজ পরীক্ষিতের এই বাক্য শুনে শ্রীশুকদেব বিস্তারিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন লীলা বর্ণনা করতে লাগলেন। শ্রীশুকদেব বললেন, হে মহারাজ ! শ্রীবৃন্দাবন তটে যমুনার দক্ষিণ ভাগে এক সুবিস্তৃত ও সুগভীর জলপূর্ণ হ্রদ ছিল। মহাবিষধর সর্পরাজ কালীয় এই হ্রদে বাস করত। তার বিষ এত তীব্র ছিল যে তার প্রভাবে সেই হ্রদে কোনো জলজন্তু থাকতে পারত না। শ্রীহরিবংশে এই ভীষণ বিষহ্রদের বর্ণনায় দেখা যায়—

দীর্ঘং যোজনবিস্তারং দুস্তরং ত্রিদশৈরপি।
গম্ভীরমক্ষোভ্যজলং নিষ্কম্পমিব সাগরম্॥

অর্থাৎ কালীয়হ্রদ এক যোজন পরিমিত (চারক্রোশ) দীর্ঘ ও বিস্তৃত, দেবতাগণের পক্ষেও যা দুরতিক্রম্য। তাতে কোনো প্রকার জলজন্তু বাস করতে পারে না এমনকি কোনও জলচর পক্ষীও তার উপর দিয়ে যেতে পারে না। তার প্রভাবে এই হ্রদতীরে একটাও তৃণ পর্যন্ত অঙ্কুরিত হতে পারত না।

খলদণ্ড বিধানকারী হরি, কালীয়নাগের গর্ব হরণ এবং তার বিষে বিদূষিত যমুনার দোষ হরণ করার কথা চিন্তা করে নিকটবর্তী কদম্ববৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

এই কদম্ববৃক্ষ সম্বন্ধে বরাহপুরাণে বলা হয়েছে—

কালিয়হ্রদপুর্বেণ কদম্বো মহিতদ্রুমঃ।
শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভিগন্ধি চ॥ (বরাহপুরাণ)

অর্থাৎ কালীয়হ্রদের পূর্বভাগে এক সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্বলোকপূজ্য কদম্ববৃক্ষ আছে, তার শত শত শাখা সুবিস্তৃত আর তার সুরভি দশদিকে আমোদিত। এই বৃক্ষ পরম মনোহর আর এই কদম্ববৃক্ষে বারোমাসই ফুল ফোটে। সমুদ্র মন্থনে অমৃত প্রকটের পরে অমৃত কুম্ভটি দেবতাদের করতলগত হয়। কিন্তু মা বিনতাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার শর্তে গরুড় স্বর্গ থেকে অমৃতভাণ্ড নিয়ে তার সৎ মা কদ্রুর হাতে অর্পণ করে নিজের মাকে মুক্ত করেন। স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে অমৃত নিয়ে আসার পথে গরুড় এই কদম্ববৃক্ষে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, তাই অমৃতভাণ্ডের স্পর্শে বৃক্ষটি সেই থেকে অমর। প্রয়াগ, হরিদ্বার, নাসিক ও উজ্জয়নীর মতো তাই বৃন্দাবনেও কুম্ভমেলা পালিত হয়।

যাই হোক শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে দমন করার জন্য এই কদম্ববৃক্ষের নিকট গেলেন আর বাল্যলীলাচপল ব্রজরাজনন্দন কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় আরোহণ করলেন। **'আরুহ্যচলপঃ কৃষ্ণঃ কদম্বশিখরং মুদা'**। অতঃপর কদম্ববৃক্ষর থেকে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়হ্রদে ঝাঁপ দিলেন, চঞ্চল গোপশিশুর মতো বিচিত্র ভঙ্গি সহকারে সন্তরণক্রীড়া করতে লাগলেন এবং করতাড়ন ও পদক্ষেপ দ্বারা হ্রদের সর্বাংশ আলোড়িত করে তুললেন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার অকুতোভয় জলক্রীড়া দেখে হ্রদতীরস্থ গোপবালকগণ পরম আনন্দিত ও উৎসাহিত হলেও কালীয়সর্পের নিকট তা একটুও প্রীতিকর হল না। কৃষ্ণের নানাভাবে জলতাড়ন কালীয়কে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলল, সে তখন ক্রোধে অধীর হয়ে দ্রুতবেগে নিজ বাসগর্ত হতে বের হয়ে এসে ফণা তুলে তার আশ্রম পীড়কের দিকে ঘন ঘন তীব্র দৃষ্টি পাত করতে লাগল। কালীয় দেখল যে তার আশ্রমপীড়ক পক্ষীরাজ গরুড় নয়, বা ইন্দ্র, বরুণাদি দেবতাও নয় অথবা প্রবল পরাক্রান্ত কোনো অসুরাদিও নয়। কালীয় দেখল আশ্রমপীড়কের নবঘনবিনিন্দিত কলেবরকান্তি তনু হৃদবক্ষঃ আলোকিত ও উদ্ভাসিত করে বিরাজমান। ইহার নয়ন মনোহর অঙ্গ—যা দেখলে যে কারোরই বাহ্য বা আন্তরিক পীড়াও দূর হয় কিন্তু কালীয়ের ভাগ্যে এই পীড়াহারক রূপও কেন পীড়াদায়ক হল, তা বোধগম্য নয়। কালীয় ক্রমে ক্রমে জলমধ্যে তার শতফণা তুলে এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে প্রাণহারক বিষোদ্গারণ করতে করতে তীব্ররোষে কম্পিত ও স্ফীত কলেবরে

কৃষ্ণের দিকে ধেয়ে গেল।

কালীয় ঘোর গর্জন করতে করতে কৃষ্ণের দিকে আসছে দেখে কৃষ্ণ কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হয়ে আগের মতোই পরমানন্দে ও অকুতোভয়ে হ্রদবক্ষ আলোড়ন করে ক্রীড়া করতে লাগলেন। কালীয় ক্রোধে অধীর হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত পদচরণতল, পুনঃ পুনঃ দংশন করতে লাগল। এতেও শ্রীকৃষ্ণ কোনো দৃকপাত না করে সন্তরণে রত হওয়ায় সে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে তার দীর্ঘ সুলম্বিত দেহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণর শরীর বেষ্টন করে তাকে নিষ্পেষণ ও দংশন দ্বারা তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করতে লাগল। কৃষ্ণকে কালীয়গ্রস্ত দেখে কেবল গোপবালকগণই নয়, বরং তাঁকে নিস্পন্দভাবে অবস্থিত দেখে গোপগণ, গো, বৃষ, মহিষ যারাই যমুনাতীরে ছিল সকলেই স্তব্ধ হয়ে বজ্রাহতের মতো দণ্ডায়মান রইল। তারা সকলেই অশ্রুসিক্ত নির্নিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণ পানে চেয়ে রইল।

শ্রীকৃষ্ণ তখন চিন্তা করলেন, তিনি ছাড়া ব্রজবাসীদের আর অন্য কোনো গতি নেই, তাঁরা অনন্য চিত্তে ব্রজরাজ নন্দনেরই চিরশরণাগতি গ্রহণ করেছেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে বৃথা সর্পবন্ধনে আর কালক্ষেপ করা উচিত নয়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয় বন্ধন হতে মুক্ত হতে ইচ্ছা করলেন তখন আর কালীয় তাঁকে বেষ্টন মধ্যে ধরে রাখতে সমর্থ হল না। এতেও কিন্তু কালীয় শ্রীকৃষ্ণের কোনো ঐশ্বর্য অনুভব করতে পারল না বা সে নিজ বলবীর্য ও ঔদ্ধত্য প্রকাশের ত্রুটি করল না। কালীয় ক্রোধে অধীর হয়ে কৃষ্ণের সম্মুখে শত ফণা উন্নত করে দণ্ডায়মান হল আর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে বিষ উদ্‌গীরণ করতে লাগল।

কৃষ্ণ তখন দ্রুত পদক্ষেপে কালীয়র নিকট গমন করে তার অভিমান-ভরা মস্তকে বাম হাত রেখে এবং তা বলপূর্বক অবনত করে, তার সুবিস্তৃত ফণামণ্ডলের উপর আরোহণ করলেন। তারপর নটবর শেখর শ্রীকৃষ্ণ, কালীয় মস্তকে নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করতে লাগলেন। কিন্তু এই পরমানন্দের স্রোতে বহির্মুখ কলেবর কালীয়র হৃদয় ভরে উঠল না, স্পন্দিত হল না। কেননা, তার হৃদয় হতে তখনও জিঘাংসাবৃত্তির নিবৃত্তি হয়নি। তাই সে নিজ মস্তকস্থিত

কৃষ্ণচরণ দংশন করার জন্য ও বারে বারে মাথা নেড়ে মাথা থেকে ঠাকুরকে যমুনাজলে ফেলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। দুষ্টদমনকারী হরি নৃত্য করতে করতে এমনভাবে কালীয় ফণায় পদাঘাত করে তাল দিতে লাগলেন যে তার ফলে কালীয়র অতি প্রবল ও বৃহদাকৃতি ফণাগুলো ভগ্ন হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ পদাঘাতে কালীয় একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ল, তার ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তিও রইল না। তার মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে বিষবমন হতে লাগল আর নাসারন্ধ্র থেকে অবিরল ধারায় রক্ত বেরতে লাগল। সে একেবারে নিস্পন্দ হয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল।

অতঃপর স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহাও সোনায় পরিণত হয়, সেইরকম শ্রীকৃষ্ণ চরণস্পর্শে মহাবহির্মুখ কালীয়ও কৃষ্ণভক্ত চূড়ামণি হল।

স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম।

(ভাগবত ১০।১৬।৩০)

অর্থাৎ প্রবল পরাক্রান্ত কালীয়নাগ তখন নিজ মস্তকস্থিত সর্বনিয়ন্তা পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে স্মরণ করে তাঁরই চরণে শরণ গ্রহণ করল। সে মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করল, হে করুণাময় ! যতদিন আমার দেহে বল ছিল, তখন যদি তোমার এই কৃপা পেতাম তাহলে তোমার নামগুণলীলা কীর্তন করতে করতে, তোমার ভক্তচূড়ামণি অনন্ত নাগের মতো সহস্র ফণা উদ্যত করতে পারতাম। কিন্তু হায় ! আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, যখন আমার অঙ্গ-সঞ্চালন আর বাক্য উচ্চারণেরও ক্ষমতা নেই তখন এই জীবাধমের হৃদয়ে ভক্তিবাসনা জাগালে। হে ভগবান্ ! তুমি পরমস্বতন্ত্র ও সর্বনিয়ন্তা, তাই তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি যে আসন্ন মরণকালেও তোমার চরণ মাথায় নিয়ে তোমাকে স্মরণ ও শরণলাভের বাসনা পেলাম, এটাই আমার মতো বহির্মুখ জীবের পক্ষে প্রভূত লাভ। এ সবই সম্ভব হয়েছে তোমার অযাচিত এবং অফুরন্ত কৃপাবৈভবে।

কালীয়র প্রতি ভগবৎ কৃপার কারণ—কালীয়র এইভাবে কৃতার্থ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে কয়েকটি কারণ দেখা যায়।

প্রথম : ভক্তচূড়ামণি গরুড়ের সঙ্গে কালীয়র চিরবিরোধ ছিল। এই

বিরোধের ফলে কালীয়কে গরুড়ের বাম পাখার আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। এর ফলেই কালীয়র শ্রীবৃন্দাবনস্থ যমুনা হ্রদে বাস করার সৌভাগ্যলাভ হয়েছিল। কৃষ্ণদাসের সঙ্গে শত্রুতাতেও ভবপাশ মোচনের পথ খুলে যায়, কিন্তু বহির্মুখ মনের শত্রুতা বা মিত্রতা উভয়েই ভববন্ধন দৃঢ় করে। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে শত্রুতাও পরম কাঙ্ক্ষনীয় কেননা তার হৃদয়ে সর্বভূতে প্রেম ও হিতাকাঙ্ক্ষা থাকে এবং ভক্তর অভিশাপও অনেক বরদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গরুড়ের অঙ্গস্পর্শই কালীয়র ভক্তিলাভের প্রথম সোপান।

দ্বিতীয় : শ্রীকৃষ্ণ ভজনরত এবং শ্রীকৃষ্ণকথাপরায়ণ স্ত্রী লাভ। যদিও কালীয় কৃষ্ণভজন বিমুখ এবং বহির্মুখ, কিন্তু ভক্তচূড়ামণি পত্নীগণের সঙ্গে একত্র বাস করায় মহৎ সঙ্গ লাভ হত এবং তাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃষ্ণসেবা দর্শন ও কৃষ্ণকথা শ্রবণ হয়ে যেত। বিশেষত কালীয় পত্নীদের মনে সর্বদাই প্রবল বাসনা ও হিতাকাঙ্ক্ষা থাকত যে তাদের পতিও যেন কৃষ্ণসেবা লাভের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। তারা সর্বদাই আক্ষেপ করত যে তাদের বুঝি সারা জীবনই এই কৃষ্ণভজন বিমুখ পতির সঙ্গে কালযাপন করতে হবে। কালীয় পত্নীগণের এই প্রকার সঙ্গ আর তাদের হিতকামনাই কালীয়র কৃতার্থতা লাভের পক্ষে অনেক সাহায্য করেছে।

তৃতীয় : চিরজীবন একান্তভাবে বৃন্দাবনে বাস। গরুড়ের ভয়ে কালীয় এক মুহূর্তের জন্যও যমুনা সন্নিকটস্থ হ্রদের বাইরে যায়নি পাছে গরুড়ের হাতে তার প্রাণ যায়। শাস্ত্রে আছে **'দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে'** (পদ্মপুরাণ) অর্থাৎ একদিন মাত্র ব্রজবাস হলেই হরিভক্তি লাভ হয়। কিন্তু কালীয়র হরিভক্তি লাভে এত বিলম্ব দেখে মনে হয় যে অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ মুক্তি না হলে ভক্তিদেবীর কৃপালাভে বিলম্বই হয়ে থাকে। সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার সময় কালীয়র শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট বিহার দর্শন করলে আর কোনো দুর্বাসনাই থাকে না, শ্রীকৃষ্ণ যে কোনো প্রকারে তা দূর করে দেন। তাই হয়তো দীর্ঘকাল পরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কালীয়র হৃদয় শোধন করে তাকে নিজ চরণে শরণাগত করে নিলেন।

চতুর্থ : কালীয়র পূর্বজন্মের সুকৃতি—

কালীয়ের জন্মবৃত্তান্ত, পূর্বকথন—গর্গসংহিতায় কালীয়র পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত আছে। পূর্বকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভৃগুবংশীয় বেদশিরা নামক একজন মুনি বিন্ধ্যাচলে তীব্র তপস্যা করেন। সেইস্থানে অশ্বশিরা নামে আরেকজন মুনিকে তপস্যা করতে আসতে দেখে বেদশিরা ক্রোধে আরক্তনয়নে বললেন—হে বিপ্র ! তুমি আমার আশ্রমে তপস্যা করতে চাও কেন ? এতে তোমার ভালো হবে না, তোমার কী অন্যত্র তপস্যার করার উপযুক্ত স্থান নেই।

অশ্বশিরা মুনি বেদশিরাকে বললেন— এই ভূমি তোমারও নয় আর আমারও নয়। একমাত্র মহাবিষ্ণুই এই স্থানের অধিকারী। এখানে তো যুগ যুগ ধরে অনেক মুনি-ঋষিই তপস্যা করেছেন, তবে তুমি কিসের জন্য বৃথা সর্পের ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করে গর্জন করছ। আমি অভিশাপ দিচ্ছি তুমি সর্প হয়ে জন্মগ্রহণ করো আর গরুড় ভয়ে সর্বদা ভীত থাক।

বেদশিরা মুনি বললেন— তোমার অভিপ্রায় অতি অসৎ। তুমি সর্বদা কাকের মতো স্বকার্য সাধনে তৎপর আর লঘুপাপে আমায় গুরুদণ্ড দিয়েছ। তাই তুমি কাক হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করো।

এইভাবে মহামুনি বেদশিরা ও অশ্বশিরা পরস্পরের প্রতি শাপ প্রদান করে অতি দুঃখিত মনে অবস্থান করতে লাগলেন। এই সময় শ্রীনারায়ণ সেই স্থানে আবির্ভূত হয়ে সান্ত্বনা প্রদান করে বললেন—হে বেদশিরা ও অশ্বশিরা তোমরা দুজনেই আমার দুই বাহুর ন্যায়, প্রিয়তম ও পরমভক্ত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি নিজবাক্যের অন্যথা করতে পারি, কিন্তু কখনও ভক্তবাক্যের অন্যথা করতে পারি না, এই আমার নিয়ম। হে বেদশিরা ! তুমি সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করবে বটে, কিন্তু তোমার মস্তকে আমার চরণচিহ্ন বিন্যস্ত থাকবে, তাই তোমার কখনও গরুড় ভীতি থাকবে না। আর হে অশ্বশিরাঃ ! তুমি কাকরূপে জন্মগ্রহণ করবে বলে কোনো প্রকার দুঃখ কোরো না, তোমার কাকদেহেও যোগসিদ্ধি সমন্বিত ত্রৈকালিক জ্ঞানলাভ হবে।

যথাকালে মহামুনি অশ্বশিরা নীলপর্বতে যোগীশ্রেষ্ঠ 'ভুশুণ্ড' নামক কাক হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। ভুশুণ্ড সর্বশাস্ত্র জ্ঞানসম্পন্ন, মহাতেজস্বী এবং

রামভক্তচূড়ামণি হলেন। তিনিই পক্ষীরাজ গরুড়কে রামায়ণ-কথা বর্ণনা করেন। অন্যদিকে চাক্ষুস মন্বন্তরে (বর্তমান মন্বন্তর হল বৈবস্বত), দক্ষ প্রজাপতি মহামুনি কশ্যপের সঙ্গে তাঁর একাদশটি কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর এগারোটি কন্যার মধ্যে কদ্রু ও বিনতা অন্যতম। বিনতার পুত্র হলেন ভক্তচূড়ামণি 'গরুড়' আর কদ্রুই বৈবস্বত মন্বন্তরে বসুদেবপত্নী রোহিণী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। যা হোক কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর গর্ভে শত সহস্র মহাসর্পের জন্ম হয়। তারা সকলেই মহাযোদ্ধা, দুঃসহ তীব্র বিষবীর্যসম্পন্ন এবং মহামণিধর ছিল। মহামুনি বেদশিরা ওই সমস্ত কদ্রুনন্দন সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ কালীয়রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পরে গরুড়-ভয়ে রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনের যমুনাস্থিত হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মহারাজ পরীক্ষিত অতঃপর প্রশ্ন করলেন—

নাগালয়ং রমণকং কস্মাত্তত্যাজ কালিয়ঃ।

কৃতং কিং বা সুপর্ণস্য তেনৈকেনাসমঞ্জসম্॥ (ভাগবত ১০।১৭।১)

হে গুরো ! নাগরাজ কালীয় কেনই বা নাগগণের বাসস্থান রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করল আর গরুড়ের কিই বা অপ্রিয় কার্য করেছিল।

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বললেন— হে মহারাজ ! রমণক দ্বীপবাসী সর্পগণ সর্বদা গরুড়ের ভয়ে ভীত থাকত। তাই তারা ভীত হয়ে গরুড়কে বলল, আমরা প্রতি মাসের অমাবস্যার দিন আমাদের প্রতি বাড়ি থেকে নানাবিধ সুস্বাদু সুভক্ষ্য তোমায় প্রদান করব। তুমি আমাদের প্রদত্ত বলি গ্রহণ করো এবং আমাদের অভয় দান করো। গরুড় এই শর্তে স্বীকৃত হল এবং এই প্রথা বহুদিন প্রচলিত রইল। কালক্রমে কালীয় রমণক দ্বীপবাসী সর্পগণের মধ্যে প্রধান পদবি লাভ করল এবং দৈহিক বল ও বিষবীর্যে সমস্ত সর্পের শ্রেষ্ঠ হল এবং সর্পগণের উপর প্রভুত্ব করতে লাগল। সে প্রভুত্বের গৌরবে এবং বীষবীর্যের মহাপ্রভাবে অন্ধপ্রায় হয়ে সর্বজগৎ তুচ্ছ বলে মনে করতে লাগল। কালীয় প্রতি অমাবস্যায় সর্পগণ কর্তৃক গরুড়কে সুভক্ষ্য খাদ্যপদার্থ বলিপ্রদান অতি অপমানজনক বলে মনে করল। তাই সে সর্পগণকে বলল, আমি থাকতে গরুড়ের সাধ্য কী তোমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারে। সদর্পে এই ঘোষণা

করে, এক অমাবস্যা তিথিতে কালীয় নাগ সেই বটবৃক্ষ, যেখানে গরুড়ের সুখাদ্য বলিপ্রদান করা হত সেখানে গেল আর গরুড়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে স্বয়ংই সেই খাদ্যপদার্থ ভক্ষণ করতে লাগল। শ্রীভক্তচূড়ামণি এবং অসীম তেজঃসম্পন্ন পক্ষীরাজ গরুড়, কালীয়ের এই দুষ্ট ব্যবহারের কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। যদিও ভক্তচূড়ামণিদের পক্ষে স্বার্থহানির সম্ভাবনায় ক্রুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়, তবে শ্রীভগবান যেমন দুষ্টদমনের জন্য ক্রোধের ভঙ্গী প্রদর্শন করেন, সেইরকম তাঁর পার্ষদ-ভক্তগণও দুষ্টদমনের জন্য ক্রোধের ভঙ্গী প্রদর্শন করে দুষ্টগণকে দণ্ডপ্রদান করে থাকেন। মহাদুষ্ট সর্পগণকে সংযত ও শাসনাধীন রাখার জন্যই গরুড় তাদের নিকট বলি গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত করেছিলেন।

শ্রীনারায়ণবাহন গরুড় কালীয়কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর বাম পক্ষ দ্বারা অবহেলাক্রমে কালীয়কে একবার আঘাত করলেন। এই এক পক্ষাঘাতেই কালীয়র মস্তক ঘুরে গেল, সে সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখল। সংজ্ঞা লাভ করা মাত্রেই কালীয় প্রাণভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং তার পরিবারবর্গের সঙ্গে দ্রুতবেগে রমণকদ্বীপ পরিত্যাগ করে, যমুনাহ্রদে এসে তার অতল জলে আত্মগোপন করে রইল। এই স্থান গরুড়ের অগম্য তাই কালীয় নিশ্চিত মনে এই স্থানে বসবাস করতে লাগল।

গরুড়ের প্রতি সৌভরিমুনির শাপ— তখন মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন, এই যমুনাহ্রদ গরুড়ের অগম্য ছিল কেন ? তখন শ্রীশুকদেব বর্ণনা করতে লাগলেন।

চতুর্বিংশতি চতুর্যুগের ত্রেতাযুগে (বর্তমান যুগ—অষ্টবিংশতি চতুর্যুগের কলিযুগ) সূর্যবংশীয় মহারাজ মান্ধাতা পৃথিবী পালন করতেন। সেই সময় সৌভরি নামে এক মহাতপা, মহাতেজস্বী ও অশেষ যোগসিদ্ধিসম্পন্ন মুনি যমুনা হ্রদে তপস্যা করতেন। **'যমুনান্তর্জলে মগ্নস্তপ্যমানঃ পরংতপঃ'** ওই সময় একদিন পক্ষীরাজ গরুড় ক্ষুধিত হয়ে যমুনাতীরে আসেন এবং মুনিবাক্য লঙ্ঘন করে যমুনাহ্রদস্থিত এক বৃহৎ মৎস্য চঞ্চুপটে ধরে ভক্ষণ করলেন। মহামুনি সৌভরির আদেশ লঙ্ঘন করায় মহামুনি গরুড়কে অভিশাপ দিলেন

আর তার সর্ববিধ গর্ব খর্ব হয়ে গেল এবং সে চিরতরে ব্রজরাজ নন্দনের চরণে শরণ গ্রহণ করল। শরণাগতর প্রতিপালক, দীনবৎসল হরিও কালীয়র ওপর প্রসন্ন হলেন এবং লঘুমূর্তিতে কালীয়শিরে তাঁর কুসুমকোমল চরণদ্বয় ন্যস্ত করে দাঁড়িয়ে রইলেন, অবতরণ করলেন না। তার কারণ কালীয় অনেকক্ষণ পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শ পেয়েছে কিন্তু নিজ বহির্মুখতাবশত তার মাধুর্যাস্বাদন করতে পারেনি। এখন পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ মনে করলেন যে, যখন কালীয় একান্তভাবে আমার শরণ নিয়েছে তখন কিছুক্ষণ আমাকে মস্তকে ধারণ করে চরণস্পর্শ লাভ করে কৃতার্থ হোক।

কালীয়মস্তকে দণ্ডায়মান হয়ে হরি মনে মনে এও চিন্তা করলেন যে আমার পরমভক্ত কালীয়-পত্নীগণ আমাকে তাদের বাসস্থানের নিকটে পেয়েও বহির্মুখ পতির দুষ্ট ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে আমার কাছে আসতে পারেনি। আমি তাদের কাতর প্রার্থনায় বহির্মুখ পতির সর্ব অপরাধমোচন করে তাকে আমার চরণে শরণাগত করেছি এবং সে সেই শরণাগতির পূর্ণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে সে আমাকে মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার পরম ভক্ত কালীয়-পত্নীগণকে এই দৃশ্য না দেখিয়ে আর ভক্তপতিকে তাঁদের নিকট সমর্পণ না করে আমি কালীয়র মস্তক হতে অবতরণ করব না।

ইচ্ছাময়ের এই প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ হতেই যোগমায়ার প্রেরণায় কালীয় পত্নীগণ যমুনা হ্রদমধ্য হতে উত্থিত হয়ে কৃষ্ণচরণাগ্রে পতিত হল। তাঁরা পতির মহাপরাধে লজ্জিত ও শঙ্কিত হয়েও বিশ্বপতির চরণে প্রণত থাকাই একমাত্র কর্তব্য—এই কথা মনে করে, সর্ববিধ লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্তুতিতে প্রবৃত্ত হলেন। কালীয়-পত্নীগণ তাঁদের স্তুতি মোট ৩০টি শ্লোকের মাধ্যমে করেছেন। তার মধ্যে প্রথম ছয় শ্লোকে তাঁরা করেছেন **কৃষ্ণকৃত দণ্ডানুমোদন**, পরবর্তী দ্বাদশ শ্লোকে **শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন** অতঃপর তিনটি শ্লোকে নিজ **অভিষ্ট প্রার্থনা** করেছেন। অতপর ছয়টি শ্লোকে **কালীয় স্তুতি** এবং অধ্যায়টির শেষ তিন শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনা অনুমোদন করে আদেশ প্রদান করেছেন।

কালীয়র প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দণ্ডানুমোদন (শ্লোক ৩৩-৩৮)

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিং-
স্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টে-
র্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্॥ ৩৩

অনুগ্রহোঽয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো
দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্ দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ
ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ॥ ৩৪

তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্বং
নিরস্তমানেন চ মানদেন।
ধর্মোঽথবা সর্বজনানুকম্পয়া
যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্বজীবঃ॥ ৩৫

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাঽঽচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ৩৬

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছতি যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ॥ ৩৭

তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈ-
স্তমোজনিঃ ক্রোধবশোঽপ্যহীশঃ।
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো
যদিচ্ছতঃ স্যাদ্ বিভবঃ সমক্ষঃ॥ ৩৮

সরলার্থ — নাগপত্নীগণ বললেন — প্রভু ! দুষ্টদের নিগ্রহের জন্যই আপনার পৃথিবীতে এই অবতাররূপে জন্মগ্রহণ, সুতরাং এই অপরাধীর (আমাদের স্বামীর) প্রতি আপনি যে দণ্ডবিধান করেছেন তা সর্বথা উচিতই হয়েছে। আপনার দৃষ্টিতে তো শত্রু এবং পুত্রের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, তাই আপনি যখন কাউকে দণ্ড দেন তখন তার মধ্যে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান এবং সেই সঙ্গে তার পরম কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যই নিহিত থাকে॥ ৩৩ ॥ প্রকৃতপক্ষে আপনার এই দণ্ডপ্রদান আমাদের প্রতি আপনার অপার অসীম অনুগ্রহেরই প্রকাশ। কারণ আপনার প্রদত্ত দণ্ডের দ্বারা অসৎ ব্যক্তির সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। এই আমাদের পতি কালীয় নাগ, যে পূর্ব হতেই পাপাচরণের ফলে অপরাধী হয়ে আছে, তা তো এঁর সর্প জাতির মধ্যে জন্মলাভ থেকেই প্রমাণিত হয়। এইজন্যই আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনার এই ক্রোধকে পরম অনুগ্রহ বলেই মনে করছি॥ ৩৪ ॥ কোনো পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে যেমন এঁর সর্পযোনি লাভ হয়েছে, তেমনই আবার পূর্বের কোনো জন্মে ইনি অশেষ সুকৃতি অর্জনও করেছেন, নতুবা আপনার স্পর্শলাভের সৌভাগ্য এঁর হল কী করে ? হয়তো ইনি কোনো জন্মে নিজে সর্বথা মান-গর্বাদি পরিত্যাগ করে, অপরের প্রতি সর্বদা মান-প্রদর্শন করে সুতীব্র তপস্যা আচরণ করেছিলেন, অথবা সর্বজীবের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ধর্মচর্যার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেছেন, যেজন্য সর্বজীব-স্বরূপ আপনি এঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন॥ ৩৫ ॥ হে দেব ! আপনার চরণধূলি লাভের সৌভাগ্য তো সকলের ঘটে না, বরঞ্চ তা এতই দুর্লভ যে স্বয়ং আপনার অর্ধাঙ্গিণী লক্ষ্মীদেবীকে পর্যন্ত তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাবশত অতি দীর্ঘকাল সর্বভোগবাসনা বিসর্জন দিয়ে এবং ব্রতচারিণী থেকে কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল। তাহলে ইনি (কালীয় নাগ) যে আপনার চরণকমলরেণু-স্পর্শের

অধিকার লাভ করলেন, তা এঁর কোন্ সাধনার, কোন্ পুণ্যফলের প্রভাবে, তা আমরা বহু চিন্তা করেও নির্ণয় করতে পারছি না॥ ৩৬ ॥ প্রভু, যাঁরা আপনার চরণধূলির আশ্রয় লাভ করেছেন, সেই ভক্তগণ তো স্বর্গ অথবা পৃথিবীর সার্বভৌম আধিপত্য কিংবা রসাতলের (পাতালের) রাজত্বও প্রার্থনা করেন না। এমনকি তাঁরা ব্রহ্মার পদেরও অভিলাষী নন। অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা জন্ম-মৃত্যুচক্র থেকে মুক্তি বা মোক্ষও তাঁদের প্রলুব্ধ করতে পারে না॥ ৩৭ ॥ সকলের পক্ষেই পরম দুর্লভ আপনার সেই চরণধূলি, যা পাওয়ার আন্তরিক ইচ্ছামাত্র অন্তরে পোষণ করলেও সংসারচক্রে ভ্রমণশীল জীবের ঐহিক-পারত্রিক সর্ববিধ অভীষ্ট সম্পদ এমনকি মোক্ষ পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ করতলগত হয়ে থাকে, এই নাগরাজ তমঃপ্রধান সর্পকুলে উৎপন্ন এবং একান্তরূপে ক্রোধরিপুর বশবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তা লাভ করলেন, এই অহৈতুকী করুণার রহস্য, হায় নাথ, মূঢ় আমরা কী করেই বা বুঝব ? ৩৮ ॥

মূলভাব—কালীয়-পত্নীগণ কৃষ্ণের নিকট কালীয়র মহাপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও প্রাণভিক্ষা চেয়ে বলছেন—হে সর্বেশ্বর ! আপনি কালীয়র প্রতি যে দণ্ডবিধান করেছেন তা ওর পক্ষে উপযুক্তই হয়েছে, কেননা ওর মতো অপরাধী আর ত্রিজগতে নেই। সে আপনার ভক্তচূড়ামণি গরুড়কে অবজ্ঞা করেছে, আপনার লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে এসে তীব্র বিষ দ্বারা যমুনার জল দূষিত করেছে, যমুনার তীরবাসী স্থাবর-জঙ্গম সবই তার বিষজ্বালায় দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছে এবং পরিশেষে সে আপনাকেও পুনঃ পুনঃ দংশন এবং ফণা দ্বারা বেষ্টন করেছে। তাই তার অপরাধের সীমা নেই।

কালীয়-পত্নীগণ স্তুতিতে বলছেন—

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিং স্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টের্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্॥

(ভাগবত ১০।১৬।৩৩)

হে ভগবন্ ! শত্রু এবং পুত্রে আপনার সমদৃষ্টি, আপনি কেবল অপরাধীকে কৃতার্থ করার জন্যই তার উপর দণ্ডবিধান করে থাকেন। অপরাধীর

দণ্ডবিধান করবার জন্য আপনি মৎস্য, কূর্মাদি নানারূপে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন আর এবার আপনি স্বয়ং স্ব-রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনার নিজ পুত্র যদি খল প্রকৃতি ও সাধু পীড়নকারী হয়, তাহলেও আপনি তার যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করতে কুণ্ঠিত হন না এবং আপনার মহাশত্রুর পুত্রও, যদি সৎস্বভাবসম্পন্ন এবং সজ্জনানুরাগী হয় তাহলে আপনি তাকেও অনুগ্রহ করে থাকেন। আপনার নিজ পুত্র, পৃথিবী গর্ভজাত নরকাসুর সজ্জনপীড়ক বলে আপনার হস্তেই তাঁর মৃত্যু হয়। আবার আপনার মহাশত্রু হিরণ্যকশিপুর পুত্র পরম ভক্ত প্রহ্লাদ যে আপনার বিশেষ অনুগ্রহ পাত্র তা সকলেই জানে। অপরাধী হলেই আপনি তার দণ্ডবিধান করে জগতের কল্যাণ করে থাকেন।

কালীয়-পত্নীগণ আরো বলছেন—

যদ্ দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ ॥

(ভাগবত ১০।১৬।৩৪)

অর্থাৎ হে প্রভু ! এই মহাপরাধী এবং দেহভিমানী জীবের সর্পত্ব প্রাপ্তি এবং এর উপর আপনার ক্রোধ— এই দুইই আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং এই মহাপরাধী এবং আপনার ভক্তজনবিদ্বেষী কালীয়ের প্রতি আপনি যে দণ্ডবিধান করেছেন, তা সর্বতোভাবে সমুচিত এবং সর্বজন হিতকর হয়েছে।

হে ভগবন্ ! কালীয়র অবস্থা দেখে মনে হয় যে আপনি তাকে বড়ই নিগ্রহ করেছেন কিন্তু আপনার পদপ্রহারে সে মৃতপ্রায় হয়নি, সে সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়ে আপনার ভক্তজন মধ্যে গণ্য হয়ে গিয়েছে। এ আপনার পরম অনুগ্রহেরই পরিচায়ক। কালীয়-পত্নীগণ অবাক হয়ে তাই বলছেন —**'ধর্মোঽথ বা সর্বজনানুকম্পয়া যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্বজীবঃ'** (ভাগবত ১০।১৬।৩৫) অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ! আমরা জানি আপনি অনাথের নাথ, সজ্জনের প্রতি প্রীতিপরায়ণ কিন্তু এই কালীয় সর্বভূতে দয়াপরায়ণ হয়ে এমন কোন্ ধর্মের অনুষ্ঠান করেছে, যে আপনি সর্বাত্মা হয়েও ওর প্রতি এত প্রসন্ন। আমরা জানি না ওর কোন্ পুণ্যের ফলে আপনার পদপ্রহারেই কালীয় সর্বপাপ

হতে মুক্ত হয়ে আপনার ভক্তজন মধ্যে গণ্য হল। আমরা তো কালীয়ের বর্তমান জন্মে তার এমন কোনো সদনুষ্ঠানই দেখতে পাইনি, অথচ এখন তার আকৃতি সর্পের মতো থাকলেও আপনার চরণে শরণাগতির প্রভাবে তার প্রকৃতি এখন পরম বিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

হিরণ্যকশিপু, রাবণ, জরাসন্ধ প্রভৃতি অনেকেই তীব্র তপস্যা ও ধর্মানুষ্ঠান করেছেন কিন্তু কেহই আপনার চরণে শরণাগত হতে পারেননি। প্রত্যুত তাঁরা নিজ নিজ তপঃশক্তিপ্রভাবে কেবল পরপীড়নই করেছেন। এতে মনে হয় কেবল তপস্যা, ধর্মানুষ্ঠান দ্বারাই আপনি প্রসন্ন হন না বা আপনার চরণে শরণাগতি লাভ করা যায় না। হে ভগবন্! কালীয়র মতো আপনার চরণধূলিকা তো দূরের কথা, যে আপনার চরণে শরণাগতি লাভ করে তার নিকট পৃথিবীর আধিপত্য, স্বর্গসুখ, পাতাল-সুতলাদির আধিপত্য, ব্রহ্মপদ, অণিমাদি, অষ্টসিদ্ধি এমনকি মোক্ষপদ পর্যন্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হয়। কালীয়-পত্নীগণ বলছেন—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং ন পারমেষ্ঠং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎ পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥

(ভাগবত ১০।১৬।৩৭)

এই শ্লোকে পার্থিব সার্বভৌমপদ হতে আরম্ভ করে মোক্ষপদ পর্যন্ত কয়েকটি শ্রেষ্ঠপদ অর্থাৎ প্রার্থনীয় বস্তুর উল্লেখ আছে। এখানে বিবেচ্য এই যে, যতপ্রকার পার্থিব সুখ আছে তার মধ্যে সার্বভৌমপদ অর্থাৎ সসাগরা ধরার আধিপত্যই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যেহেতু মর্ত্যের মানুষ অল্প পরমায়ুবিশিষ্ট হওয়ায় তা বেশিদিন তা ভোগ করতে পারে না তাই তার চেয়ে স্বর্গসুখ শ্রেষ্ঠ, কেননা স্বর্গলোকবাসী দেবতাগণ এক মন্বন্তরকাল পর্যন্ত জীবিত থেকে জরাবার্ধক্যাদিবিহীন দেহে তুলনামূলকভাবে অধিক মাত্রার স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারেন। আবার স্বর্গলোকবাসী দেবতাদেরও অনেক সময়ই অসুরাদির উৎপীড়ন ভোগ করতে হয় বলে সুতলাদি নাগলোকবাসিগণের সুখভোগই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মন্বন্তরাবসানে সুতলাদি সর্বলোক ধ্বংস হয় বলে

তদপেক্ষা ব্রহ্মপদই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মারও সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত থাকতে হয় বলে ব্রহ্মপদেও বাধ্যবাধকতা আছে, আর এই জন্য যোগসিদ্ধি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার যোগসিদ্ধ পুরুষদেরও পতনাশঙ্কা আছে বলে মোক্ষপদই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মোক্ষপদ পেলে আর পুনর্বার সংসারে আসতে হয় না এবং মোক্ষপদের কখনও ধ্বংস হয় না বলে মোক্ষপদের মতো উচ্চপদ আর নেই।

কালীয়-পত্নীগণ বলছেন, হে ভগবন্! যারা আপনার চরণে শরণাগতি লাভ করতে পারেন তাঁরা এত উচ্চ অবস্থাসম্পন্ন যে, মোক্ষপদলাভকেও তুচ্ছ বলে মনে করেন। মুক্তজীব ভগবানের স্বরূপ-সাযুজ্য লাভ করে সর্ববিধ সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে যায়। কিন্তু আপনার চরণে শরণাগতি লাভ করতে পারলে চিরদিনের জন্য আপনার সেবানন্দ লাভ করা যায়।

ব্রহ্মানন্দো ভাবদেশ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥ (স্কন্দপুরাণ)

ব্রহ্মানন্দ যদি পরার্ধগুণ-ও গুণিতক হয় তা হলেও ভক্তিসুখ সমুদ্রের বিন্দুকণিকার সঙ্গেও তার তুলনা হয় না। সেইজন্য আপনার চরণে শরণাগত ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলে মনে হয়। এই সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির কবলগ্রস্ত হয় এবং নিজ নিজ কর্মানুসারে নানা যোনিতে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করতে থাকে। এইভাবে সংসার চক্রে পরিভ্রমণরত কোনো জীবের যদি আপনার চরণলাভের বাসনা হয় তবে একমাত্র তারই সমস্ত দুঃখ, দৈন্য, অভাব-অভিযোগের তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হয় এবং সে সমস্ত ঐহিক ও পারত্রিক সুখের আকর হয়।

সংসার ভ্রমিতে কোনও ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহ যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

কালীয়-পত্নীগণ মহাবিস্ময়ে বলছেন, হে প্রভো ! আমরা জানি না কালীয়র কী অনির্বচনীয় মহাভাগ্য যে, সে আপনার চরণে চিরশরণাগতি পেয়ে চিরকৃতার্থ হয়ে গেল। আপনার কৃপায় সবই সম্ভব, এ ব্যতীত আমরা আর কিছু ধারণা করতে পারি না।

অতঃপর কালীয়-পত্নীগণ কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনে প্রবৃত্ত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন (শ্লোক ৩৯-৫০)

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে॥ ৩৯
জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তেঽপ্রাকৃতায় চ॥ ৪০
কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে।
বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্বহেতবে॥ ৪১
ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে।
ত্রিগুণেনাভিমানেন গূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে॥ ৪২
নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে।
নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে॥ ৪৩
নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ॥ ৪৪
নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥ ৪৫
নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে॥ ৪৬
অব্যাকৃতবিহারায় সর্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে।
হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু মুনয়ে মৌনশীলিনে॥ ৪৭
পরাবরগতিজ্ঞায় সর্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ।
অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্দ্রষ্টেঽস্য চ হেতবে॥ ৪৮
ত্বং হ্যস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ প্রভো
গুণৈরনীহোঽকৃতকালশক্তিধৃক্ ।
তত্তৎ স্বভাবান্ প্রতিবোধয়ন্ সতঃ
সমীক্ষয়ামোঘবিহার ঈহসে॥ ৪৯

তস্যৈব তেঽমূস্তনবস্ত্রিলোক্যাং
শান্তা অশান্তা উত মূঢ়যোনয়ঃ।
শান্তাঃ প্রিয়াস্তে হ্যধুনাবিতুং সতাং
স্থাতুশ্চ তে ধর্মপরীপ্সয়েহতঃ॥ ৫০

সরলার্থ—কালীয়-পত্নীগণ বলছেন, অনন্ত অচিন্ত্য ঐশ্বর্যের নিত্য নিধি হে ভগবান! আপনাকে প্রণাম। সকলের অন্তর্যামী হয়েও সর্বাতীত, সর্বাতিগ আপনি। সর্বপ্রাণীর, সকল পদার্থের আশ্রয়স্বরূপ আপনি, আবার সর্বভূতরূপেও একমাত্র আপনিই বিরাজমান ; আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তির পূর্বেও আপনি বিদ্যমান ছিলেন ; কারণ আপনিই পরম কারণস্বরূপ এবং কারণেরও অতীত পরমাত্মা॥ ৩৯ ॥ সকল জ্ঞানের, সকল অনুভবের আপনিই পরম আধার। আপনার মহিমা, আপনার শক্তি, সবই অনন্ত। আপনার স্বরূপ অপ্রাকৃত, দিব্য, চিন্ময় ; কোনো প্রাকৃতিক গুণ বা বিকার আপনাকে স্পর্শও করতে পারে না। আপনিই পরম ব্রহ্ম — আপনাকে প্রণাম॥ ৪০ ॥ আপনিই প্রকৃতির মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টিকারী কাল, আবার কালশক্তির আশ্রয় তথা কালের ক্ষণ-কল্প ইত্যাদি অবয়বসমূহের সাক্ষীও আপনিই। আপনি বিশ্বরূপ হয়েও বিশ্বের থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করে তার দ্রষ্টা, নিমিত্তকারণরূপে তার স্রষ্টা এবং উপাদানকারণরূপেও আপনিই বর্তমান॥ ৪১ ॥ প্রভু! পঞ্চভূত এবং সেগুলির তন্মাত্রসমূহ, ইন্দ্রিয়সকল, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং এদের সকলের আশ্রয়স্বরূপ চিত্ত—এই সবই আপনি। তিনগুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) এবং তাদের কার্য (দেহাদি) সমূহে উৎপন্ন অভিমানের দ্বারা আপনি (আপনারই অংশভূত জীবসমূহের থেকে) নিজের স্বরূপের অনুভবকে আবৃত করে রেখেছেন॥ ৪২ ॥ আপনি দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত, অসীম। সূক্ষ্মের থেকে সূক্ষ্ম, কার্য-কারণের সমস্ত বিকারের মধ্যেও আপনি একরস, অবিকারী এবং সর্বজ্ঞ। 'ঈশ্বর আছেন অথবা নেই', 'তিনি সর্বজ্ঞ অথবা অল্পজ্ঞ' ইত্যাদি বহুবিধ মতভেদ অনুসারে সেই সেই মতবাদীদের কাছে তাদের নিজেদের অভীষ্ট তত্ত্বরূপেও আপনিই প্রতিভাত হয়ে থাকেন। শব্দের অর্থও যেমন আপনি, শব্দস্বরূপও তেমন

আপনিই এবং এই উভয়ের সম্বন্ধ-ঘটয়িত্রী শক্তিও আপনিই। সর্বরূপেই আপনাকে প্রণাম॥ ৪৩ ॥ প্রত্যক্ষ-অনুমান-আদি যাবতীয় প্রমাণের (যাথার্থ্য-নিরূপক) মূল আপনিই। শাস্ত্রসমূহের উৎপত্তি আপনার থেকেই ঘটেছে, আপনার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। মনকে (কর্মাদি বিষয়ে) প্ররোচিত করার বিধিরূপে এবং তাকে সবকিছু থেকে প্রত্যাহৃত করার আজ্ঞারূপে যথাক্রমে প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গও আপনি এবং এই দুইয়ের মূল যে বেদ, তা-ও আপনিই। আপনাকে বার বার প্রণাম॥ ৪৪ ॥ আপনি শুদ্ধসত্ত্বময় বসুদেবের পুত্র বাসুদেব, সংকর্ষণ এবং প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে ভক্ত উপাসকগণের পালক ; আপনি যাদবদের রক্ষাকর্তা। হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনার চরণে পুনঃপুনঃ প্রণত হচ্ছি আমরা॥ ৪৫ ॥ আপনি অন্তঃকরণ এবং তার বৃত্তিসমূহের প্রকাশক, সেগুলির দ্বারাই আবার আপনি নিজের স্বরূপ আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। অপরপক্ষে, আপনার স্বরূপের কিছু কিছু সংকেত, যা উপলব্ধিগোচর হয়, কখনো কোনো ক্ষণিক উদ্‌ভাস যে ঘটে থাকে, সেও তো আবার সেই অন্তঃকরণ এবং তার বৃত্তিগুলির মাধ্যমেই। এই সবেরই দ্রষ্টা বা সাক্ষীও আপনিই, স্বয়ং-প্রকাশ, স্ব-সংবেদ্য, নিজেই নিজের জ্ঞাতা, আপনাকে প্রণাম॥ ৪৬ ॥ অব্যাকৃতরূপা মূল প্রকৃতি আপনার নিত্য বিহারভূমি (আপনার স্বরূপমহিমা সর্ববিচারবুদ্ধির অগোচর), সমগ্র ব্যাকৃত (ব্যক্ত, প্রকাশিত) জগৎ, যা স্থূল অথবা সূক্ষ্মরূপে অনুভবগোচর হয়ে থাকে, তার সিদ্ধি বা প্রামাণ্য আপনার সত্তা দ্বারাই নিরূপিত হয়। হে হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়সমূহের অধীশ্বর তথা প্রবর্তক) ! আপনি আত্মারাম, বাক্-এর অগোচর নিত্য-মৌনের যে ভূমি তাই আপনার 'স্ব'-ভাব, সেই আপনাকে নমস্কার॥ ৪৭ ॥ আপনি স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি সর্বপ্রকার গতির জ্ঞাতা এবং সকলের অধ্যক্ষ, সর্বসাক্ষী। নামরূপাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চের যেখানে নিষেধ ঘটে থাকে, সেই বিশ্বাতীত অবস্থারও অবধি বা সীমা আপনি, আবার বিশ্বের অধিষ্ঠান হওয়ার কারণে বিশ্বরূপও আপনি। বিশ্বের অধ্যাস (ভ্রান্তি, মিথ্যা সত্তার ধারণা) এবং তার অপবাদ (নিরাকরণ)—দুইয়েরই সাক্ষী আপনি, অজ্ঞানকৃত বিশ্বের সত্যত্বভ্রান্তি এবং স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা তার আত্যন্তিক

নিবৃত্তিরও কারণ আপনিই। আপনার চরণে প্রণাম॥ ৪৮ ॥ প্রভু ! কর্তৃত্বের অভাববশত আপনি কোনো কর্মই করেন না, সর্বদা নিষ্ক্রিয় আপনি, তথাপি অনাদি কালশক্তিকে ধারণ করে প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা আপনি এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহারের লীলা করে থাকেন। আপনার এই লীলাও তো অমোঘ ; আপনি যে সত্যসংকল্প ! কেবলমাত্র ঈক্ষণের দ্বারাই জীবগণের সুপ্ত সংস্কাররূপে স্থিত স্বভাবের উদ্বোধন বা জাগরণ ঘটানোর মাধ্যমেই আপনার এই বিশ্বসৃষ্টি লীলা সংঘটিত হয়ে থাকে॥ ৪৯ ॥ ত্রিভুবনে তো মূলত তিন প্রকার জীবসৃষ্টি দেখা যায়, সত্ত্বপ্রধান শান্ত, রজঃপ্রধান অশান্ত এবং তমোগুণপ্রধান মূঢ়। এরা সকলেই আপনারই লীলামূর্তি। তাহলেও বর্তমানে সত্ত্বগুণপ্রধান শান্তজনেরাই আপনার বিশেষ প্রিয়, কারণ সাধুগণের রক্ষা এবং ধর্মের পরিপালন ও প্রসারসাধনের জন্যই আপনি এই পার্থিবলোকে অবতরণ এবং আনুষঙ্গিক কর্তব্যাদি-পালনরূপ লীলা স্বীকার করেছেন॥ ৫০ ॥

মূলভাব— কালীয়-পত্নীগণ অতঃপর কৃষ্ণের অচিন্ত্য মহাশক্তি বৈভব কীর্তনে প্রবৃত্ত হয়ে **'নমস্তভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে'** প্রভৃতি দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চান্নটি (৫৫) কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রকাশ করেছেন। শ্রীধরস্বামীপাদ এই মহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলেছেন— **'অহিস্ত্রীভিঃ প্রসন্নো বস্তাসামিব ভবেদ্ধরিঃ'** অর্থাৎ কালীয়-পত্নীগণ স্তুত এই কৃষ্ণস্তুতি যিনি পাঠ করবেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁদের প্রতিও সেইরূপ প্রসন্ন হন। স্তুতিটি ভাবগাম্ভীর্য ও উচ্চ তাত্ত্বিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং তাঁরা অতুলনীয় স্তুতিতে ভগবানের শক্তির প্রকাশ এইভাবে বর্ণনা করেছেন।

অনন্তশক্তি—কালীয়-পত্নীগণ স্তুতি করে বলছেন—হে ভগবন্ ! আপনি অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিনিকেতন, আর এই অনন্ত শক্তিগণের কোনো বিরোধ নেই এবং তাদের প্রভাবে আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। আপনি পুরুষরূপে সর্বজগৎ কারণ। প্রকৃতিতে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ও অনন্ত জীবহৃদয়ে বর্তমান থেকেও সর্বদা অপরিচ্ছিন্ন (অখণ্ডময়)। শ্রুতির **'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'** মন্ত্রে আপনার অপরিচ্ছিন্নতা আর **'তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ'** মন্ত্রে 'আপনি জগৎ সৃষ্টি করে সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন' এবং এতে আপনার অন্তর্যামীত্ব

শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যা অখণ্ড, যা অপরিচ্ছিন্ন তা কখনো কোথাও প্রবেশ করতে পারে না কিন্তু আপনি আপনার অখণ্ডশক্তি প্রভাবে নিজে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হয়েও সকল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ট, আবার ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ হয়েও অনন্ত জীবহৃদয়েও অনুপ্রবিষ্ট। আপনি সর্বভূতের ও সর্বজীবের আশ্রয় হয়েও সর্বভূত ও সর্বজীবরূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন।

জ্ঞানস্বরূপ—হে ভগবন্! আপনার অচিন্ত্য শক্তির কথা আর কত বলব। আপনি জ্ঞানস্বরূপ হয়েও জ্ঞানবান। **'সত্যং জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্ম'** প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে আপনিই জ্ঞান। আবার **'যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ'** প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, আপনি সর্ববস্তু বিষয়ক জ্ঞানশালী। বর্তমান শ্লোকে কালীয়নাগ পত্নীগণ স্তুতি করে বলছেন—'জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে' অর্থাৎ আপনি মায়াগুণাতীত হলেও স্বরূপভূত জ্ঞানে সর্বজ্ঞ।

ত্রিবিধভেদ রহিত—এই শ্লোকেরই স্তুতিতে কালীয়-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণনা করেছেন **'ব্রহ্মনেহনন্তশক্তয়ে'** বলে অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদভাব বর্জিত হয়েও স্বয়ং অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে অনন্তশক্তিনিকেতন। এই ত্রিবিধভেদ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিত্য॥ (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ প্রতি বৃক্ষের পত্র পুষ্প ফল যেমন পরস্পর পৃথক, ইহা হল স্বগত ভেদ; অন্যবৃক্ষ হতে ভেদ স্বজাতীয় এবং কাষ্ঠ পাষাণাদি হতে ভেদ বিজাতীয়। কিন্তু ভগবান আপনি সচ্চিদানন্দ—তাই আপনাতে এই ত্রিবিধ ভেদ নেই।

আপনি সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই ত্রিবিধ প্রাকৃত গুণরহিত হয়েও ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, আপনি কারণাতীত হয়েও এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, আপনি নির্বিকার হয়েও ভক্তজন পরিপালক। আপনার এই স্বরূপ ও কার্য সর্ব প্রকার বিরুদ্ধ মনে হলেও আপনার অচিন্ত্য মহাশক্তির কথা মনে করলে এই সর্বপ্রকার বিরোধেরই অবসান হয়।

কালশক্তি—পরবর্তী শ্লোকে কালীয়-পত্নীগণ ভগবানের কালশক্তি সম্বন্ধে

স্তুতি করে বলছেন—**'কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে'** (ভাগবত ১০।১৬।৪১) অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনার যে মহাশক্তি প্রভাবে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন, স্থিত এবং আপনাতেই বিলীন হয়ে যায়, সেই দুর্দমনীয় মহাশক্তির নাম 'কালশক্তি'। এই কালশক্তির প্রভাব অতিক্রম করার ক্ষমতা কারোর নেই। জগৎ এবং জগতের যে কোনো বস্তুই এই কালশক্তির অধীন। কালচক্রের ঘূর্ণাবর্তের ওপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত। কালচক্রের আবর্তনে কত যে দিবা, রাত্রি, মাস, বছর, যুগ, কল্প এবং কত শত শত উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশাদি সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে তার কিছুমাত্রই ইয়ত্তা নেই। কালে কত শত জগৎ, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা এবং জগতের অগণিত স্থাবর জঙ্গমাদি বর্তমানের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয় এবং অন্তর্হিত হয় তার সীমা সংখ্যা নেই। হে প্রভু! এই মহাভিনয়ের আপনিই প্রবর্তক, আপনিই সূত্রধার, আপনিই নট ও আপনিই দর্শক। শ্রীমদ্ভাগবত বচনে জানা যায় **'যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো শ্চেষ্টামাহুশ্চেষ্ট তে যেন বিশ্বং।'** অর্থাৎ যে মহাশক্তি প্রভাবে এই বিশ্ব সর্বদাই ভ্রাম্যমাণ, সেই কালশক্তি শ্রীভগবানেরই চেষ্টা অর্থাৎ লীলাবিশেষ। গীতায়ও শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন—**'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ'** (গীতা ১১।৩২) অর্থাৎ এই যে বিশ্বরূপ দর্শন করছ তা আমার লোকক্ষয়কারী অত্যুৎকট কালস্বরূপ।

সূক্ষ্ম-স্থূল— কালীয়-পত্নীগণ আরো বলতে লাগলেন, হে ভগবন্! আপনার অচিন্ত্য শক্তির কথা বলে শেষ করা যায় না। আপনি অনন্ত অর্থাৎ সর্বব্যাপী হয়েও অতি সূক্ষ্ম। **'অনোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'** প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে আপনার একধারেই অণুত্ব এবং পরমমহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও একধারে অণুত্ব এবং বৃহত্ত্বের সমাবেশ প্রাকৃত বস্তুতে হয় না কিন্তু আপনার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। আপনি মা যশোদার কোলে গোপশিশু মূর্তিরই বদনবিবরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি প্রদর্শন করে আপনার অচিন্ত্যমহাশক্তির পরিচয় প্রদান করেছেন। তাই আপনাকে ছোট বা বড় যাই বলা হোক না কেন তা সবই ভ্রান্ত। শ্রুতিও তাই আপনাকে 'অস্থূলমনণু' রূপে বর্ণনা করে আপনার স্থূলত্ব বা অণুত্ববর্ণন নিষেধ করে

আপনার অচিন্ত্য শক্তির পরিচয়ই ঘোষিত করেছে।

অনির্বচনীয় ভাব—বেদ-পুরাণাদি অনন্ত শাস্ত্র অনাদি কাল হতেই আপনার অনন্ত অনির্বচনীয় স্বরূপের পরিচয় প্রদান করেন। নানা মতবাদিগণ তারই এক এক অংশ অবলম্বন করে এক এক ভাবে আপনার স্বরূপ-তত্ত্ব নির্ধারণ করতে চেষ্টা করে। যদিও আপনার স্বরূপের বাচক হতে পারে এমন কোনো শব্দই নেই, তথাপি আপনিই শব্দে বাচকতা শক্তি সঞ্চার করে আপনিই তার বাচ্য হয়েছেন। শ্রুতিও আপনার অনির্বচনীয়তা সম্পর্কে বলেছেন **'যতোবাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'** (তৈত্তরীয়োপনিষদ্ ২।৯।১) অর্থাৎ আপনার স্বরূপ সবার মন ও বুদ্ধির অগোচর। শঙ্করাচার্যও তাঁর শারীরিক ভাষ্যে (ব্রহ্মসূত্র) বলেছেন—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্তস্য লক্ষণম্॥

অর্থাৎ যে সমুদায় ভাব অচিন্ত্য তা তর্ক দ্বারা নিরূপিত হয় না তাই তাকে তর্ক দ্বারা যোজনা করো না। আর অচিন্ত্যের লক্ষণ কী, না যা প্রকৃতির পর (অর্থাৎ সম্পর্কশূন্য)।

শ্রীভগবানই প্রমাণের মূল—কালীয়-পত্নীগণ শ্রীভগবানকে বলছেন, হে ভগবন্! আপনিই সমস্ত প্রমাণের মূলস্বরূপ, আপনার শক্তিতেই যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। **'চক্ষুষশ্চক্ষুঃ উত শ্রোতস্য শ্রোত্রং'** প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যেও জানা যায় যে শ্রীভগবান চক্ষুরও চক্ষু, কর্ণেরও কর্ণ। শ্রুতি আরো বলে, **'অপানি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃনোত্যকর্ণঃ'** অর্থাৎ আপনি চক্ষুর সাহায্য ছাড়াই দর্শন করেন আর কর্ণের সাহায্য ব্যতীতই শ্রবণ করেন। আপনি সর্বপ্রমাণ নিরপেক্ষ হলেও প্রত্যক্ষাদি কোনো প্রমাণই শ্রীভগবানের স্বরূপানুসন্ধানে সক্ষম নয় কিংবা ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনানুষ্ঠান সম্বন্ধে অভ্রান্ত কোনো উপদেশ পাওয়া যায় না। একমাত্র শাস্ত্রই এ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ও অভ্রান্ত প্রমাণ। বেদ-পুরাণাদি সর্বশাস্ত্রই শ্রীভগবান হতে প্রকাশ এবং তাঁরই অনুগ্রহের দান। শ্রুতি আরো বলেছেন, **'অস্যৈব মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেত দৃগ বেদঃ সামবেদ'** অর্থাৎ বেদ-পুরাণাদি সর্বশাস্ত্রই শ্রীভগবানের নিঃশ্বাসসম্ভূত।

মায়ামুগ্ধ জীবগণকে নিজের স্বরূপ জানাবার জন্যই শ্রীভগবান কৃপাপূর্বক এই অমূল্য বস্তু দান করেছেন।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
কৃপায় করিল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥
শাস্ত্রগুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

কালীয়নাগ পত্নীগণ শ্রীভগবানকে বলতে লাগলেন, হে প্রভু ! আপনি শাস্ত্রযোনি অর্থাৎ আপনার থেকেই বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহের উদ্ভব হয়েছে আর এই সমস্ত শাস্ত্র হতেই আপনার তত্ত্ব নির্ধারণ হয়ে থাকে। ব্রহ্মসূত্র উল্লিখিত '**শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**' সূত্রটিও এই সত্যই ব্যাখ্যা করে। কর্মকাণ্ড প্রবর্তক প্রবৃত্তিশাস্ত্র, জ্ঞানকাণ্ড প্রবর্তক নিবৃত্তিশাস্ত্র ও উপনিষদ্ এবং জ্ঞানপ্রদর্শক নিগমশাস্ত্র আপনা হতেই সমুদ্ভূত এবং বিভিন্ন অধিকারীর জন্য আপনিই কৃপাপূর্বক জগতে ইহা প্রকাশ করেছেন। আপনিই শাস্ত্র, আপনিই শাস্ত্রপ্রচারক, আপনিই শাস্ত্রবেদ্য, সুতরাং আপনার অচিন্ত্যশক্তিতে সকলই সম্ভব।

চতুর্ব্যূহ তত্ত্ব—এইভাবে নানা স্তুতি করে কালীয়-পত্নীগণ শ্রীভগবৎস্বরূপের অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির কথা চিন্তা করে তাঁর চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করলেন। তদন্তর শ্রীবিগ্রহের অচিন্ত্য বৈভবের কথা মনে করে বলছেন—

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥ (ভাগবত ১০।১৬।৪৫)

অর্থাৎ হে ভগবন্ ! আপনি পরমমোহন ব্রজরাজনন্দন মূর্তিতে কালীয় শিরে দণ্ডায়মান রয়েছেন, কিন্তু আপনার এই শ্রীবিগ্রহই নানাধামে নানামূর্তিতে প্রকাশিত। আপনিই বাসুদেব, সংকর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন এই চতুর্ব্যূহরূপে বৈকুণ্ঠাদি ধামে অবস্থিত। এছাড়া আপনার আরো কত যে মূর্তি আছে তা আর কী বলব ! যদিও শ্রীভগবানের মৎস্য-কূর্মাদি অনন্তমূর্তি আছে, তথাপি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহরূপে মথুরামণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েছেন বলে কালীয়-পত্নীগণ এখানে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের চতুর্ব্যূহ মূর্তিরই নামোল্লেখ করেছেন।

ভগবানের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও লীলা— ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি ও মাহাত্ম্যের বর্ণনার অন্তে কালীয়নাগ পত্নীগণ তাঁর সৃষ্টি ও লীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা স্তুতি করে বলছেন—হে প্রভু! অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ও এর অনন্ত জীব এবং অনন্ত বস্তু আপনারই সৃষ্টি। আপনি কোন্ অভিপ্রায়ে কোন্ জীব বা কোন্ বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা বোঝার সাধ্য কারও নেই। আপনি বিশ্ব-বৈচিত্র্যের নির্মাতা কিন্তু সৃষ্টিবৈচিত্র্যে আপনার কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব নেই। জগতে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ মূর্খ, কেহ বিদ্বান, কেহ দেবতা, কেহ মনুষ্য ইত্যাদি নানা প্রকার বিচিত্র বস্তু সম্ভার, কিন্তু আপনার কোনো পক্ষপাত নেই। অনাদি কর্মসংস্কারবশত যে জীব যেরকম সুখ-দুঃখ কিংবা স্বভাবাদি উপভোগ করার উপযুক্ত, আপনার সৃষ্ট জগতে অভ্রান্তভাবে তার ঠিক তদনুরূপ দেহপ্রাপ্তি ও পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাতে আপনার কোনো প্রকার ইচ্ছা-বৈষম্য নেই।

আবার কালীয়-পত্নীগণ ভক্তদের সৃষ্টির ক্রম সম্বন্ধে অন্যভাবে স্তুতি করে বলছেন—'**সতঃ সমীক্ষয়ামোঘবিহার ঈহসে**।' (ভাগবত ১০।১৬।৪৯) অর্থাৎ জগতে পূর্বকল্পগত সাধক ভক্তগণকে দেখবার জন্য আপনি প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং পূর্বজন্মের সাধনসংস্কারসহ আপনার ভক্তগণ জগতে জন্মগ্রহণ করে আপনারই চরণারবিন্দ ভজন করেন এবং আপনিও তাদের পালন করেন আবার মহাপ্রলয়ে আপনিই সকলকে প্রলয় নিদ্রায় নিদ্রিত করে নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করেন। এ যেন স্নেহময়ী জননী তাঁর পুত্রকে জাগিয়ে দুগ্ধপান করান, নানাভাবে লালনপালন করেন আবার যথাসময়ে পুত্রকে নিদ্রাবিষ্ট করে ক্রোড়ে ধারণ ও শয়ন করান। শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধে এই নৈমিত্তিক প্রলয়ের কথা বলা হয়েছে যে সময়ে বিশ্বস্রষ্টা শ্রীভগবান বিশ্ব আত্মসাৎ করে অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন।

ঈশ্বর-কৃত 'সৃষ্টি' ও তার লালন-পালনাদি ভক্ত ও অভক্ত সবার জন্য একই নিয়মে প্রযোজ্য হলেও ভক্তদের নিকট তা মাধুর্যময় লীলারূপে আর অভক্তদের নিকট তা ঐশ্বর্যময়রূপে প্রতিভাত হয়। তাঁর মাধুর্যময় লীলায় শ্রীভগবান ভক্তগণের আনন্দবর্ধনের জন্য বিবিধ লীলা করে থাকেন। আপনার

এই পরম মধুর ব্রজলীলাতে আপনি প্রেমবশ্যতাদি গুণ প্রকাশ করেছেন বলে আপনি গুণপ্রদীপ। ব্রজলীলায় আপনি ভক্তাধীনতা, প্রেমবশ্যতা প্রভৃতি গুণ দ্বারা নিজ স্বরূপৈশ্বর্য আচ্ছাদিত রাখেন, সেই জন্য ব্রজের গোপ-গোপীগণ আপনাকে সর্বেশ্বর বলে ধারণা করতে পারে না এবং আপনার নন্দ-নন্দনরূপে অসমোর্ধ মাধুর্যরাশিই আস্বাদন করে থাকে।

কালীয়-পত্নীগণ স্তুতিতে বলছেন— **'অব্যাকৃতবিহারায় সর্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে'** (ভাগবত ১০।১৬।৪৭) অর্থাৎ আপনার লীলা 'অব্যকৃত' অর্থাৎ তা অপ্রাকৃত হলেও প্রাকৃতের অনুকরণেই প্রকৃত জগতে প্রকাশ হয়ে থাকে। আপনি অজ হয়েও জন্মগ্রহণ করেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপালক হয়েও বালকের মতো ব্যবহার করেন, নিত্যশুদ্ধ হয়েও ননী চুরি করেন আবার, ক্ষুধা-পিপাসার অতীত হয়েও ব্যাকুল হয়ে মা যশোদার নিকট খাদ্যদ্রব্য প্রার্থনা করেন। আপনি আত্মারামশিরোমণি হয়েও অপূর্ণর মতো ব্যবহার করেন। আপনার এই পরমাদ্ভুত লীলায় প্রেমময় ব্রজবাসিগণ আনন্দসাগরে মগ্ন হন কিন্তু বহির্মুখ দৃষ্টিতে এই লীলার মাধুর্যানুভব হয় না। আপনার অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রভাবে আপনার কোনো লীলাই অসম্ভব নয়। আপনার লীলা আপনাতেই সম্ভব। আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভীষ্ট পূরণের জন্য প্রার্থনা (শ্লোক ৫১-৫৩)

অপরাধঃ সকৃদ্ ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ।
ক্ষন্তুমর্হসি শান্তাত্মন্ মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ॥ ৫১
অনুগৃহ্ণীষ্ব ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ।
স্ত্রীণাং নঃ সাধুশোচ্যানাং পতিঃ প্রাণঃ প্রদীয়তাম্॥ ৫২
বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া।
যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ॥ ৫৩

সরলার্থ—হে শান্তস্বরূপ ! নিজ প্রজার কৃত অপরাধ অন্তত একবার তো প্রভুর সহ্য করা উচিত। এই নাগ তো মূঢ়, আপনার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এঁকে আপনি ক্ষমা করুন॥ ৫১ ॥ হে ভগবান, দয়া করুন, এঁর প্রাণ যেতে

বসেছে। আমরা অবলা স্ত্রীলোক, পতিহীন হলে স্ত্রীগণের দশা অতি শোচনীয় হয়ে থাকে, সাধুব্যক্তিগণ এইজন্য সর্বদাই স্ত্রীজাতির ওপর করুণাপরবশ হয়ে থাকেন। এই নাগ আমাদের স্বামী, আমাদের প্রাণস্বরূপ, আপনি আমাদের সেই প্রাণ দান করুন (এঁকে ছেড়ে দিন)॥ ৫২ ॥ আমরা আপনার দাসী, আদেশ করুন, আমরা আপনার কী সেবা করব ? আমরা তো জানি, শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার আজ্ঞা পালন করলে সর্বপ্রকার ভয়ের থেকে মুক্ত হওয়া যায়॥ ৫৩ ॥

মূলভাব—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করে, কালীয়নাগ পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের কাছে কালীয়র হয়ে কৃপাপ্রার্থনা করলেন। তাঁরা বলছেন—হে ভগবন্ ! এবার আপনি যে লীলা করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, আপনি আপনার চরণাশ্রিত সজ্জনগণকে রক্ষা করছেন ও ধর্মসংস্থাপন করছেন। লীলায় সাত্ত্বিক প্রকৃতির সজ্জনগণই আপনার প্রিয় আর রাজস ও তামস প্রকৃতির জীবগণই আপনার অপ্রিয় হয়। যদিও আপনার সকল লীলাতেই এই এক প্রকার নিয়ম, তাহলেও আপনার বর্তমান লীলায় মনে হয় এর ব্যতিক্রম হয়েছে এবং যা অনুভব করলাম তা আপনার চরণে নিবেদন করলাম। আমরা বুঝতে পারছি আপনার বর্তমান লীলায় দুষ্ট কালীয় কোনো মতেই অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য নয়। তাকে আপনি যে নিগ্রহ করেছেন তাতে তো কোনো অন্যায় হয়ইনি বরং সমুচিত কাজই হয়েছে, কারণ আপনার ভক্তচূড়ামণি গরুড় থেকে শুরু থেকে ব্রজবাসিগণ—সকলের প্রতিই সে মহাপরাধ করেছে। কিন্তু হে প্রভু ! আমাদের বলতে ইচ্ছা হয় '**অপরাধঃ সকৃদ্ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ**' (ভাগবত ১০।১৬।৫১) অর্থাৎ কালীয় তার বহির্মুখতা দোষে আপনাকে প্রভু বলে জানতে না পারলেও আপনি তার প্রভুই। পিতার অত্যাচারী পুত্র কি নিজ পুত্র নয়। রাজার অবাধ্য প্রজা কি প্রজা নয়। আপনি সর্বজগতের পিতা, তাই কোনো জীব যদি তার বহির্মুখতা দোষে আপনার চরণে অপরাধী হয়, তাহলে তার অপরাধ আপনার ক্ষমা করা উচিত। কালীয় জাতিস্বভাবে অত্যন্ত ক্রোধী এবং হিংসাপরায়ণ, তার হিংসা ব্যতীত অন্য কোনো সদ্বৃত্তির প্রকাশ হওয়াই সম্ভবপর নয়। অতএব আপনি যদি একে ক্ষমা না করেন তবে তো তার আর অন্য কোনো গতিই নেই।

হে ভগবন্! আপনি অপার করুণাবারিধি, এই ভরসায় আপনার চরণে প্রার্থনা করছি যে, আপনি কালীয়ের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন এবং তার উপর অনুগ্রহের দৃষ্টিপাত করুন। কালীয়র ভাব দেখে মনে হচ্ছে, সে এখন আপনার চরণে শরণাগত হয়েছে। আপনিও এখন যদি এর প্রাণভিক্ষা দান করেন তবে আমরা ভক্তিপতির সঙ্গিনী হতে পারব। বিশেষতঃ আমরা স্ত্রীজাতি, তাই স্বভাবতঃই আমরা অবলা, অতএব দয়াকরে আমাদের পতির প্রাণভিক্ষা দান করুন। তাঁরা স্তুতি করে বলছেন—

বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া।
যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্বতোভয়াৎ॥ (ভাগবত ১০।১৬।৫৩)

অর্থাৎ কালীয়-পত্নীগণ এইভাবে কৃষ্ণের চরণে শরণাগত হয়ে পুনঃপুনঃ তাঁদের পতির প্রাণভিক্ষা চাইলেন। পরিশেষে তাঁরা বললেন, হে ভগবন্! আপনার অন্তঃপ্রেরণায় আমরা আপনার চরণে প্রার্থনা জানালাম, তা আমাদের হিতকর কি না কিছুই জানি না। জীব নিজ নিজ বাসনাবশতঃ আপনার চরণে নানাবিধ প্রার্থনা করে, কিন্তু তাদের যাতে হিত হয় আপনি তাই করেন। আমরাও আমাদের স্বভাব অনুযায়ী যাই প্রার্থনা করি না কেন, আপনি যাতে আমাদের হিত হয়, সেইরূপ কর্তব্যের উপদেশ প্রদান করে আমাদের চিরকৃতার্থ করুন। আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতকর কাজ। যারা শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গের উপদেশ অনুসারে আপনার আজ্ঞা পালন করতে পারে, তারাই সর্ববিধ সংসার ভয় হতে মুক্তি লাভ করে। হে প্রভু ! হে করুণাসিন্ধু! তাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা আপনি যেন কৃপাপূর্বক আপনার এই চিরকিঙ্করীগণের চিরজীবনের অনুষ্ঠেয় কর্মের আদেশ প্রদান করে চিরকৃতার্থ করুন।

কালীয়র শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি (শ্লোক ৫৪-৫৯)

ইত্থং স নাগপত্নীভির্ভগবান্ সমভিষ্টুতঃ।
মূর্চ্ছিতং ভগ্নশিরসং বিসসর্জাঙ্ঘ্রিকুট্টনৈঃ॥ ৫৪

প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ কালিয়ঃ শনকৈর্হরিম্।
কৃচ্ছ্রাৎ সমুচ্ছ্বসন্ দীনঃ কৃষ্ণং প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৫৫
বয়ং খলাঃ সহোৎপত্ত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ।
স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ লোকানাং যদসদ্গ্রহঃ॥ ৫৬
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ধাতর্গুণবিসর্জনম্।
নানাস্বভাববীর্যৌজোযোনিবীজাশয়াকৃতি ॥ ৫৭
বয়ং চ তত্র ভগবন্ সর্পা জাত্যুরুমন্যবঃ।
কথং ত্যজামস্ত্বন্মায়াং দুস্ত্যজাং মোহিতাঃ স্বয়ম্॥ ৫৮
ভবান্ হি কারণং তত্র সর্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ।
অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্ বিধেহি নঃ॥ ৫৯

সরলার্থ—শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! নাগপত্নীগণ এইভাবে ভক্তিভরে ভগবানের স্তুতি করলে তিনি কৃপা করে সেই নাগকে ছেড়ে দিলেন, তখন তাঁর পদাঘাতে তার ফণাগুলি ছিন্নভিন্ন এবং সে মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে॥ ৫৪ ॥ ধীরে ধীরে কালীয়ের প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহে চেতনার সঞ্চার হতে লাগল, সে অতি কষ্টে শ্বাস নিয়ে, দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলল॥ ৫৫ ॥ কালীয় নাগ বলল—নাথ ! আমরা তো জন্মগতভাবেই দুষ্টপ্রকৃতি, তমোগুণী এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রতিশোধ-স্পৃহা পোষণকারী এবং অত্যন্ত ক্রোধী স্বভাব। নিজের স্বভাব ত্যাগ করা তো প্রাণীদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন—এই কারণেই তো সংসারে লোকেদের নানান দুরাগ্রহের বশে বহু দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়॥ ৫৬ ॥ বিশ্ববিধাতা ! আপনিই তো গুণভেদে এই জগতে নানাপ্রকারের স্বভাব, বীর্য, বল, যোনি, বীজ, চিত্ত এবং আকৃতি নির্মাণ করেছেন॥ ৫৭ ॥ ভগবন্ ! আপনারই এই সৃষ্টিতে আমরা সর্পজাতিও রয়েছি, জন্ম থেকেই আমাদের ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল। আপনারই মায়ায় তো আমরা মোহিত, সুতরাং আমরা নিজেদের চেষ্টায় এই দুস্ত্যজ মায়াকে অতিক্রম করব কী করে ? ৫৮ ॥ আপনি সর্বজ্ঞ, সমগ্র জগতের অধীশ্বর। আমাদের এই স্বভাব এবং এই মায়ারও কারণ তো আপনিই। এখন আপনার নিজের ইচ্ছায়, আমার ওপর অনুগ্রহ অথবা দণ্ডবিধান যা উচিত মনে করেন, তা-ই করুন॥ ৫৯ ॥

মূলভাব—শ্রীভগবান পরম করুণাময় এবং সর্বজীবের ওপর সর্বদাই প্রসন্ন। তাহলেও কখনো কখনো অপরাধী জীবের হৃদয় শোধন করার জন্য তাঁকে মাঝে মাঝে নির্মম হতে হয়। যাই হোক, শ্রীভগবান কালীয়-পত্নীগণের স্তুতিবাক্য শুনে পরম প্রীত হলেন এবং তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন। কালীয়-পত্নীগণের প্রার্থনানুসারে তিনি বিষণ্ণ ও ভগ্নমস্তক কালীয়র ফণা থেকে অবতরণ করে তার সামনে দাঁড়ালেন ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে কালীয় ও তার পত্নীদের সর্ববিধ ভয় ও তাপ দূর করলেন। তখন কালীয়র জীবনীশক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি ফিরে আসল।

কালীয়, দৈহিক বল ও বিষবীর্যের অভিমানে মত্ত এবং বহির্মুখ-শিরোমণি ছিল, কিন্তু কৃষ্ণের অপার কৃপায় যখন তার সমস্ত অভিমান খর্ব হয়ে গেল তখন সে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হল আর তার হৃদয়ে সর্ববিধ তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হল। শ্রীকৃষ্ণই যে সর্বেশ্বর এবং সর্বনিয়ন্তা, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কারোর কিছু করার সাধ্য নেই, কৃষ্ণচরণে শরণাগতির প্রভাবে কালীয়র তা হৃদয়ঙ্গম হল। কালীয় তখন কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করে নিবেদন করলেন—হে বিশ্ববিধাতা ! আমরা স্বভাবতঃ তমোগুণাচ্ছন্ন, খলপ্রকৃতি ও অত্যন্ত ক্রোধী। আপনি বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা। আমরা আপনারই সৃষ্ট জীব কেহই স্বয়ং সৃষ্ট হইনি। আপনি যাকে যেভাবে সৃষ্টি করবেন ও যে স্বভাবসম্পন্ন করবেন সে সেই স্বভাবেরই অনুগত থাকবে। আপনার নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারে এমন জীব কখনই সম্ভব নয়। আপনার অলঙ্ঘ নিয়মেই সৃষ্ট হয় প্রতি জীব এবং প্রতি বস্তুর স্বভাব। শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে **'অসৈব প্রশাসনে গার্গী সূর্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ' 'অসৈব প্রশাসনে গার্গী প্রাচোহন্যা নদ্যঃ শ্রবন্তে'** অর্থাৎ আপনার অলঙ্ঘশাসনেই চন্দ্র, সূর্য অস্খলিতভাবে আকাশে অবস্থান করে ও নিয়ত নিজ পথে ভ্রমণ করে এবং পর্বতগুহা নিঃসৃত নদনদী সমুদ্রাভিমুখে আপনিই ধাবমান হয়। আপনার শাসনাধীনতাই যে স্বভাব তা কারোর ধারণায় আসে না। বহির্মুখ জীবগণ যে দেহ-গেহাদিতে 'আমি' 'আমার' ভাব পোষণ করেন ও তার ফলে যে কুকার্যে রত হয় তাও আপনারই অপ্রতিহত বিধান। এইরূপ কারও নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করার উপায় নেই। অধিক কথা আর কী বলব, আপনিও নিজ স্বভাব

লঙ্ঘন করতে সমর্থ হন না। সেইজন্য আমি বহির্মুখ স্বভাববশত দেহগেহাদিতে মত্ত আছি দেখে, আপনি আপনার সহজ কারুণ্য স্বভাববশত আমার সর্ববিধ গর্ব খর্ব করে আমাকে নিজ চরণে শরণাগত করে নিয়েছেন।

আপনার ভক্তচূড়ামণিগণও আপনার কৃপায় অশেষ সদ্গুণে পূর্ণ, কাজেই তাদের নিকট গেলেও আপনিই স্তব-পূজাদি পেয়ে থাকেন। কিন্তু আপনারই ইচ্ছায় আমরা দোষের আকর ; সুতরাং আমাদের নিকট আসলে আপনি ক্রোধ, হিংসা, দুষ্টতা ছাড়া আর কিই বা পাবেন। আপনি যদি আমাদের হৃদয়ে সদ্বুদ্ধি দিতেন তবে আপনি আসামাত্র আমরা স্তব-প্রণামাদি দ্বারা আপনার সৎকার করতাম। কিন্তু কী করব, হে সর্বেশ্বর! আপনি তো আমাদের তা দেননি, সুতরাং যা দিয়েছেন তাই আপনাকে সমর্পণ করলাম। এতে আপনি তুষ্ট হোন বা রুষ্ট হোন আমাদের কিছু বলার বা করার নেই। আপনি সকলেরই মনোবৃত্তি অবগত আছেন তাই আমার মনোবৃত্তি জেনে এবং আমার হৃদয় আপনি কীভাবে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন তা বিবেচনা করে আপনার যা ইচ্ছা তা করুন।

কালীয়র প্রতি শ্রীকৃষ্ণর কৃপা ও আদেশ (শ্লোক ৬০-৬২)

ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্যমানুষঃ।
নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্।
স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতাং নদী॥ ৬০
য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্।
কীর্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুষ্মদ্ ভয়মাপ্নুয়াৎ॥ ৬১
যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চেৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৬২

সরলার্থ—শ্রীশুকদেব বললেন—কালীয় নাগের কথা শুনে লীলা-মনুষ্য (কার্যসাধনের জন্য মানুষরূপধারী) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'হে সর্প! তুমি এখানে আর থেকো না। তুমি নিজের জ্ঞাতি, পুত্র এবং পত্নীদের নিয়ে অবিলম্বে সমুদ্রে চলে যাও। গবাদি পশু এবং মানুষেরা এখন থেকে নির্ভয়ে এই নদীর জল ব্যবহার করুক॥ ৬০ ॥ যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার

প্রতি আমার এই অনুশাসন স্মরণ ও কীর্তন করবে, সর্পজাতি থেকে তার কখনো কোনো ভয় যেন উৎপন্ন না হয়॥ ৬১ ॥ আমি এই কালীয়দহে ক্রীড়া করেছি, এইজন্য যে ব্যক্তি এখানে স্নান করে এর জলের দ্বারা দেবতা এবং পিতৃগণের তর্পণ করবে এবং উপবাসী থেকে আমাকে স্মরণ করে আমার পূজা করবে, সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে॥ ৬২ ॥

মূলভাব—শ্রীব্রজরাজনন্দনের পাদপ্রহারে ভগ্নমস্তক ও ক্ষীণদেহ কালীয় কোনো প্রকারে দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করতে করতে করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যা বললেন, তাতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালীয়র প্রতি প্রসন্ন হলেন এবং বুঝলেন কালীয়র দুরভিমান দূর হয়েছে আর সে এখন তাঁর আদেশ প্রতিপালন করতে কুণ্ঠিত হবে না। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন কালীয়কে বললেন, হে সর্প! আমার লীলাস্থান ব্রজমণ্ডলে তোমার বাস করা উচিত হবে না—কেননা তুমিও তোমার জাতি স্বভাববশত অত্যন্ত ক্রোধী এবং বিষবীর্যবান। যদিও তুমি আমার ভয়ে ক্রোধ সম্বরণ করে শান্তভাবে অবস্থান করছো তাহলেও তোমার স্বভাবগত বীষবীর্যে যমুনার জল দূষিত হয়ে ব্রজবাসী জীবগণের অনিষ্ট করতে পারে। আবার যদি বলো আমার চরণস্পর্শে তোমার সর্ববিধ বিষদোষ অন্তর্হিত হয়েছে তাহলেও তোমার এস্থানে বাস করা উচিত নয়, কেননা তোমার মূর্তিই এমন ভয়ংকর যে তা দেখলে সকলেরই প্রাণে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হয়। তোমার পত্নীগণ আমার ভক্তচূড়ামণি ছিল বলেই আমি তোমাকে অঘাসুরাদির ন্যায় বিনাশ না করে কেবলমাত্র কিছু দণ্ড দিয়েই দৈহিক বল ও বীষবীর্যের দুরভিমান দূর করে দিয়েছি। ভগবান বললেন, **'নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্'** অর্থাৎ আমি তোমাকে আদেশ করছি। তুমি এখন বিশুদ্ধ চিত্তে তোমার জ্ঞাতি বান্ধবদের সঙ্গে আমার লীলাস্থল পরিত্যাগ করে স্বস্থানে চলে যাও। ভগবান আরো দুটি আশ্বাসবাণী দিলেন—

য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্।
কীর্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুস্মত্তয়মাপ্নুয়াৎ॥ (ভাগবত ১০।১৬।৬১)

অর্থাৎ আমার এই লীলা ও তোমার প্রতি আমার এই আদেশবাক্য যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে নিত্য স্মরণ ও কীর্তন করবে তাদের তোমা হতে বা তোমার বংশজাত সর্প হতে কোনো ভয় থাকবে না।

ভগবান বললেন কেবল সর্পভয়ই নয়—**'উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চেৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে'** (ভাগবত ১০।১৬।৬২) অর্থাৎ এই স্থানে যে তুমি একলাই কৃতার্থ হলে এমন নয়, আজ হতে এই যমুনা হ্রদ এক মহাতীর্থ ও সর্বজীবের পরম মঙ্গলময় স্থানরূপে পরিগণিত হল। যে এই হ্রদজলে স্নান, তর্পণ ও তীর্থোপবাসাদি করে, আমার এই লীলা স্মরণ করে, আমাকে অর্চনা করবে সে ত্রিবিধ পাপ (কায়িক, বাচিক ও মানসিক) হতে চিরমুক্তি লাভ করবে।

শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপায় তাঁর চরণে একান্ত শরণাগত কালীয়, শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত আদেশ বচন অবনত মস্তকে শুনল ও অক্ষরে অক্ষরে পালন করার কৃতসংকল্প হল। সে কেবল ভাবতে লাগল, হে নাথ! আমি তোমার অজভব শ্রীবাঞ্ছিত চরণকমল মস্তকে পেয়েও তা ধরে রাখতে পারব না, কেননা এই যমুনা হ্রদ হতে নির্গত হলেই গরুড়ের হাতে আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শ্রীকৃষ্ণ কালীয়র এই প্রকার মনোভাব জেনে তাকে বললেন, হে কালীয়! সমুদ্রস্থ রমণকদ্বীপই নাগগণের উপযুক্ত বাসস্থান। যাই হোক তোমার মস্তক উপরে আমার পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। এই চিহ্ন দেখলে গরুড় আর তোমার সঙ্গে কোনো শত্রুতা করবে না বরং তোমাকে আমার পদচিহ্নে চিহ্নিত ভক্তশ্রেষ্ঠ মনে করে, পরমাদরে ও আগ্রহে তোমার সঙ্গে মিত্রতা করে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করবে। তুমি মস্তকে আমার পদচিহ্ন ধারণ করে স্বচ্ছন্দে চলে যাও, তোমাকে আর ব্রহ্মাণ্ডের কারোর থেকে ভয় পেতে হবে না, তুমি এখন সর্ববিধ ভয় হতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হলে।

শ্রীশুকদেব বলছেন—শ্রীকৃষ্ণর মতো অদ্ভুতকর্মা আর কেউ নেই। কেবল কালীয় কেন তাঁর সমস্ত লীলাই পরমাদ্ভুত এবং অতি চমৎকার। একমাত্র কৃষ্ণ-কৃপাই জীবের সম্বল আর তাতে অনাস্থা থাকলে জীবের আর কোনো গতি নেই। তিনি ব্রজলীলায় সর্বত্র তাঁর কৃপাশক্তির ও মহাবৈভবের প্রকাশ করে সর্বজীবকে তাঁর কৃপাপ্রার্থী হওয়ার ইঙ্গিত করেছেন। ব্রজরাজনন্দনের কৃপা ব্যতীত আত্মশক্তিতে কেউই কোনোদিনই কৃতার্থ হতে পারেনি, পারবেও না।

——o——

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের কৃষ্ণস্তুতি

(দশম স্কন্ধ, ত্রিবিংশ অধ্যায়)

প্রাক্‌কথন

শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপবালকগণ প্রত্যহই গোচারণের উদ্দেশ্যে গৃহ হতে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য নিয়ে গোচারণে যেতেন। মা যশোদাও বলদেব, শ্রীদাম, সুবলাদি গোপবালকগণকে শ্রীকৃষ্ণের খাওয়ার দিকে নজর দিতে বলে দিতেন। একদিন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রেরণায় কারও গৃহ হতে কোনো খাদ্যদ্রব্য আনার কথা মনে নেই, আর তাঁরা যে বনে গোচারণে এসেছেন সেখানে অশোক বৃক্ষ ছাড়া কোনো ফলবান বৃক্ষও নেই। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এই দুইজনে যমুনাতীরস্থ অশোককাননের শোভা দর্শন করছেন এমন সময় গোপবালকগণ সমস্বরে এসে বললেন, তাঁরা খুব ক্ষুধার্ত, এক্ষুনি খাবার না পেলে মারা যাবেন।

ভগবানের লীলার কী মহিমা, যাঁর চরণ-স্মৃতি মাত্রে সংসারে ক্ষুধার অবসান হয়, সেই সর্বতাপহারী শ্রীহরির পার্ষদরা আজ ক্ষুধায় কাতর হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করছেন। ভক্তবৎসল হরি তাঁর ভক্তদের সঙ্গে যে এইরকম কত মধুর খেলা খেলেন তার ইয়ত্তা নেই। শ্রীকৃষ্ণ আজকের এই দূরদেশ অশোকবনে আগমন, গোপ বালকগণের ক্ষুধার উদ্রেক দেখে চিন্তা করলেন যে, অবশ্যই এ সব তাঁর লীলাশক্তির কার্য, কারণ যাজ্ঞিক পত্নীদের আবাস নিকটেই। তাঁদের আজ অবশ্যই কৃতার্থ করতে হবে কারণ অনেক দিন ধরে তাঁরা মনে মনে আমার চরণে আত্মসমর্পণ করে আমারই কৃপালাভের জন্য প্রতীক্ষায় কালযাপন করছেন, কিন্তু এখনও একবারও আমাকে চোখে দেখার সুযোগ লাভ করেননি।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে যজ্ঞপত্নীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগ্রহময়ী লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। দেবর্ষি নারদ এই প্রসঙ্গে নারায়ণ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ ! কোন্ পুণ্যবলে ব্রাহ্মণপত্নীগণ এই প্রকার পরম

প্রেমময় কৃষ্ণকৃপা, যা মুনীন্দ্র ও সিদ্ধগণের দুর্লভ, তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই পুণ্যবতী ব্রাহ্মণপত্নীগণ আসলে কে এবং তাঁরা কী দোষেই বা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, এ সব সবিস্তারে বর্ণনা করে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

নারায়ণ ঋষি বলতে লাগলেন— অত্রি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, মরীচ আদি সপ্তর্ষিগণের অনেক পত্নী ছিলেন। তাঁরা সকলেই রূপে-গুণে অতুলনীয়া, অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ও পতিব্রতা ছিলেন। একদিন তাঁরা হোমকুণ্ডের কাছে বসে আছেন, এই সময় অগ্নি তাঁদের অপূর্ব রূপলাবণ্য দেখে, তাঁদের স্পর্শ করার ইচ্ছায় বহুতর শিখাবিস্তার করে তাঁদের অঙ্গস্পর্শ করলেন। ঋষিপত্নীগণ অগ্নি দেবতার এই বিকার কিছুই বুঝতে পারলেন না এবং একইভাবে হোমকুণ্ডের নিকট অবস্থিত থাকলেন। কিন্তু সপ্তর্ষিগণের অন্যতম মহাতেজা অঙ্গিরা ঋষি অগ্নির মনোভাব জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ অগ্নিকে শাপ দিলেন—'তুমি সর্বভুক হও'। অঙ্গিরার শাপবাক্য শুনে অগ্নির চৈতন্যের উদয় হল এবং তিনি হোমকুণ্ডে লজ্জাবনত হয়ে ব্রহ্মতেজে কম্পিত হতে লাগলেন।

অতঃপর ঋষি অঙ্গিরা তাঁদের অগ্নিস্পৃষ্ট ব্রাহ্মণ-স্ত্রীগণকে বললেন, তোমরা সকলে পাপযুক্তা হয়েছ তাই তোমরা মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করো। সেখানে তোমরা—

ভারতে ব্রাহ্মনানাঞ্চ গৃহে লভত জন্ম বৈ।
করিষ্যন্তিতি বিবাহঞ্চ যুস্মান্ কুলজা দ্বিজাঃ॥ (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

অর্থাৎ ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণকুলে তোমরা জন্মগ্রহণ করবে এবং আমাদেরই কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণরা তোমাদের বিবাহ করবে। মহাতেজা অঙ্গিরা ঋষির মুখ থেকে এই শাপ শুনে ঋষিপত্নীগণ কাঁদতে কাঁদতে বললেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমরা আপনাদের ভক্ত ও কিঙ্করী ; তাই অজ্ঞানতাবশতঃ যদি পরপুরুষস্পৃষ্টা হয়েও থাকি তাহলেও আমাদের এইরকম কঠোর শাস্তি বিধান করা উচিত নয়। আমরা কবে আপনাদের নিকট আবার ফিরে আসতে পারব তা আদেশ করুন। আমাদের কি এমনি ভবিতব্য যে আমরা অগ্নির স্পর্শমাত্রই পরিত্যক্তা হব ? আপনি বেদকর্তা ব্রহ্মার পুত্র, ধর্মিষ্ঠ ও বেদবেদাঙ্গপরায়ণ, অতএব বিচারপূর্বক দণ্ড প্রদান করুন।

পরম দয়ালু অঙ্গিরা ঋষি ব্রাহ্মণীগণের এই করুণ বচন শুনে, প্রেমপরিপ্লুত হৃদয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে তিনিও রোদন করতে লাগলেন। সর্ববেদবেত্তা অঙ্গিরা ঋষি অতঃপর বহুক্ষণ ধরে অত্রি, মরীচি প্রভৃতি ঋষি ভ্রাতৃগণের সঙ্গে আলোচনা করে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে তাঁদের এই কথা জ্ঞাপন করলেন—'হে ব্রাহ্মণীগণ ! তোমরা বৃথা দুঃখ করো না। যা ভবিতব্য তা অলঙ্ঘনীয়, আমার মুখ দিয়ে তা বেরিয়ে এসেছে মাত্র। জীবমাত্রই কর্মফল ভোগ করে আর ভোগ সমাপ্ত হলে কখনই আর সে ভোগ ফিরে পাওয়া যায় না। তোমাদের আমাদের সঙ্গে থাকার সুখভোগ শেষ হয়ে গেছে, তাই সে ভোগ আর পুনরায় পাওয়া যাবে না। তোমরা এখন পৃথিবীতে গমন করে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করো। তোমাদের ওপর ভগবানের অশেষ কৃপা কেননা যখন গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন তাঁকে দর্শনমাত্রই তোমাদের গোলোকে গতি হবে। তোমরা যদিও তাঁকে আগে দেখার সুযোগ পাবে না কিন্তু এ জন্মের সংস্কার ও পুণ্য বলে তোমাদের মনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সদা জাগরূক থাকবে। (শ্রীভগবান যোগমায়া শক্তি প্রভাবে তোমাদের ছায়ামূর্তি নির্মাণ করবেন এবং সেই মূর্তি কিছুদিন ব্রাহ্মণগৃহে থেকে আমাদের নিকট পত্নীরূপে ফিরে আসবে।) অতএব তোমাদের পক্ষে আমার এই শাপ, বরদান অপেক্ষাও অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ হবে, এই বলে মহর্ষি অঙ্গিরা দুঃখিতচিত্তে মৌনাবলম্বন করলেন। মহৎ ব্যক্তির শাপেও জীবের সদ্য উপকার সাধিত হয় আর বিপদে না পড়লে কারোরই মহিমা প্রকাশ বা সম্পদ লাভ হয় না। ব্রাহ্মণ পত্নীগণ স্বামী পরিত্যক্তা হয়েও অনায়াসে পরমগতি লাভ করলেন।

মথুরার নিকট বৃন্দাবনে এক ব্রাহ্মণ পল্লি ছিল। সেই পল্লির ব্রাহ্মণেরা উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশ কুলোদ্ভব ছিলেন এবং সর্বদা যাগ-যজ্ঞে নিরত থাকতেন। তাঁরা মথুরা রাজা কংসেরও পুরোহিত ছিলেন এবং রাজার সর্ববিধ যজ্ঞক্রিয়াদি সম্পন্ন করতেন। সপ্তর্ষি ও অন্যান্য মহর্ষিগণের পত্নীগণ শাপগ্রস্ত হয়ে এই ব্রাহ্মণ পল্লিতে জন্মগ্রহণ করলেন এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নী, কন্যা হয়ে ধর্ম নির্বাহ করতে লাগলেন। তাঁরা অন্তঃপুরবাসিনী এবং কখনো শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন না করলেও পূর্বসংস্কারবশতঃ সদা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত থাকতেন। তাঁরা যখন

শ্রীকৃষ্ণ ভজন-কীর্তন করতেন, ব্রাহ্মণ পতিগণ তাঁদের এসব আর্তিপূর্ণ স্তুতি শুনেও শুনতেন না। তাঁরা বেদার্থের যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করতে পারেননি, তাই স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় আঙ্গিরাস যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত থাকতেন। যদি সত্যিই তাঁদের বেদার্থের উপলব্ধি হত তাহলে তাঁরা নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠান পরিত্যাগ করে ভক্তি যাজনে নিজেদের সমর্পণ করতেন।

যাইহোক গোপবালকগণকে ক্ষুধার্ত দেখে শ্রীকৃষ্ণ ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন—ভাই শ্রীদাম ! ভাই সুবল ! তোমরা ওই অদূরবর্তী—যজ্ঞধূম ব্যাপ্ত এবং বেদমন্ত্র মুখরিত স্থানে শীঘ্র গমন করো। ওইখানে যজ্ঞরত বেদবাদী ব্রাহ্মণদের নিকট তোমরা আমাদের হয়ে অন্ন প্রার্থনা করো। অনন্ত লীলাময় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভঙ্গি অতীব দুর্জ্ঞেয়। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বেদজ্ঞ না বলে বেদবাদী বলেছেন, কেননা তাঁরা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় কামনা না করে বিষয়ভোগ কামনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী, এই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যে গোপবালকগণকে অন্নদান করবেন না তা তিনি জানতেন ; তা সত্ত্বেও তিনি গোপবালকগণকে সেখানে পাঠিয়ে জগৎকে জানালেন যে, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন বা উচ্চারণ করে প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, কেবল নিষ্কাম ভক্তিযাজনেই তা লাভ করা যেতে পারে।

গোপবালকগণ উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান দেখে পরম প্রীত হলেন। কিন্তু হায় ! তাঁরা জানেন না যে কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তিগণের বহু আড়ম্বর দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম জগতের কোনো উপকারই সাধিত হয় না। গোপবালকগণ সকলেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপার্ষদ ও ভক্তচূড়ামণি, তাই স্বভাবতঃই তাঁরা পরম সুশীল এবং সর্ববিধ সদ্‌গুণের খনি। গোপবালকগণ, অনেকক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট করজোড়ে দণ্ডায়মান রইলেন এবং তাঁদের মন্ত্রপাঠের বিরামে নিজেদের প্রয়োজনের কথা বললেন। কিন্তু এই প্রকার নানাভাবে বিনীত প্রার্থনা শুনেও ব্রাহ্মণগণ কোনো উত্তর দিলেন না কিংবা অন্নদানের ব্যবস্থাও করলেন না। গীতায় ভগবান বলেছেন **'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্'** (৯।১১) প্রভৃতি—অর্থাৎ শ্রীভগবান যখন নরাকৃতি প্রকাশ করে নরলীলা করেন, তখন বিবেকহীন মূঢ়গণ তাঁকে সামান্য মানব মনে করে তাঁর বিশেষত্ব গ্রহণ করতে

পারে না। ধন্য মায়ার মোহিনী শক্তি। ধন্য অজ্ঞতার মহাপ্রভাব।

গোপবালকগণ অতঃপর বলরাম-শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে গিয়ে মনের দুঃখে সমস্ত ঘটনা জানালেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গোপবালকদের এই কথা শুনে একটু হাসলেন কিন্তু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের প্রতি মোটেই রুষ্ট হলেন না। বহির্মুখ ব্যক্তিগণ ভগবানে প্রীতিবিহীন বলে শ্রীভগবানের ভক্তগণ তাদের ওপর রুষ্ট হন, তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু শ্রীভগবান তাদের প্রতি রুষ্টও হন না বা তাদের উপেক্ষাও করেন না। তিনি জানেন তাঁরই কৃপায় ভক্তগণ তাঁকে ভালোবাসে, তাঁকে সেবা করে কৃতার্থ হয়, আর বহির্মুখ ব্যক্তিগণ তাঁকে ভুলে দেহগেহাদিতে আসক্ত থাকে। কাজেই ভগবান তাদের প্রতি রুষ্ট না হয়ে তাদের মায়ামুক্ত করার জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকেন। তিনি যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে বহির্মুখ জেনেও তাঁদের নিকট শ্রীদাম, সুবলাদি গোপবালকগণকে পাঠিয়েছিলেন তার কারণও তাঁদের উদ্ধার সাধন করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ গোপবালকদের সঙ্গে বাক্যালাপ না করলেও তাঁদের দর্শনেই যে ব্রাহ্মণগণের অনেক কল্যাণ সাধন হয়েছে তা পরে তাঁদের উপলব্ধি হয়।

যাইহোক শ্রীকৃষ্ণ এবার গোপবালকগণকে বললেন, তোমরা তো কর্মজড় ব্রাহ্মণগণকে দেখে এসেছ একবার গিয়ে ভক্তিমতী ব্রাহ্মণপত্নীগণকে দেখে এসো। যদিও তাঁরা কোনও দিন আমাকে দেখেনি, তাহলেও তাঁরা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন তাই দয়াময়ী ব্রাহ্মণপত্নীদের নিকটে আমাদের ক্ষুধার কথা জানালে আর কিছু ভাবতে হবে না। অযাচিত ভাবেই তাঁরা প্রচুর অন্ন দান করবেন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এইভাবে ভক্তচূড়ামণি ব্রাহ্মণপত্নীদের প্রশংসা শুনে গোপবালকগণ আবার ত্বরিৎ গতিতে যজ্ঞস্থলের দিকে অগ্রসর হলেন। এবার কিন্তু তাঁরা ব্রাহ্মণগণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে একেবারে অন্তঃপুরে গমন করলেন এবং ব্রাহ্মণপত্নীগণের সম্মুখে সার সার হয়ে বিনীতভাবে দাঁড়ালেন। তাঁরা বললেন—হে ব্রাহ্মণপত্নীগণ ! শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও আমরা গোচারণ করতে করতে এই সুদীর্ঘ পথ এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কৃষ্ণ অশোকবনে প্রতিক্ষারত, তাই যদি শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সমস্ত গোপবালকদের

জন্য আপনারা কিছু অন্নদান করেন, তবে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারে।

যদিও ব্রাহ্মণপত্নীগণ কোনও দিন কৃষ্ণকে দর্শন করেননি তবু লোকের মুখে শ্রীকৃষ্ণর সৌন্দর্য-মাধুর্য-লীলা-বিলাসাদির কথা শুনে এবং পূর্ব পূর্ব জন্মের অতীব পুণ্য সংস্কারের ফলে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদিত প্রাণই ছিলেন। তাঁরা যখনই সময় পেতেন সকলে মিলে কৃষ্ণকথাই আলাপন করতেন আর এ জন্মে শ্রীকৃষ্ণ চরণ দর্শন হল না বলে সদাই চোখের জল ফেলতেন। তাই আজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মনোরথ পূরণের জন্য অন্নভিক্ষাচ্ছলে গোপবালকদের তাঁদের নিকট পাঠিয়ে, নিজের আগমনবার্তা জানালেন। ব্রাহ্মণপত্নীগণ হঠাৎ দেখেন শৃঙ্গ, বেত্র, বিষাণ, বেণু, বনমালাদিতে পরিশোভিত অসংখ্য গোপবালক তাঁদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। তারা একযোগে বললেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নিকটে আছেন আর তাঁরা ক্ষুধার্ত তাই কিছু অন্নদান করলে তাঁদের প্রাণরক্ষা হয়।

শ্রীশুকদেব বর্ণনা করছেন—

শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ
তৎ কথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ॥ (ভাগবত ১০।২৩।১৮)

অর্থাৎ দ্বিজপত্নীগণ পূর্ব হতেই শ্রীকৃষ্ণ কথায় আকৃষ্টচিত্তা এবং সর্বদাই কৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিতা থাকতেন। এখন গোপবালকগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্তা শুনে তাঁরা একেবারে পরমানন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

ব্রাহ্মণপত্নীগণের মন-প্রাণ সর্বদাই কৃষ্ণচরণেই সমর্পিত। তাঁদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ অচ্যুতভাবে সদা জাগ্রত থাকলেও তাঁরা নয়নভরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখার জন্য সদাই উৎসুক, কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব বুঝে উঠতে পারতেন না। কৃষ্ণ কথালাপ করতে করতে তাঁদের মন এত বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠত যে তাঁরা মনে করতেন যে এই ছার কুল, শীল, ধৈর্য, লজ্জাদির মোহে পড়ে তাদের নিরন্তর কৃষ্ণবিরহ ভোগ করার চেয়ে কুলশীলাদি জলাঞ্জলি দিয়ে চিরতরে শ্রীকৃষ্ণ চরণে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। কৃষ্ণানুরাগিণী, কৃষ্ণচরণদর্শনাকাঙ্ক্ষিনী ব্রাহ্মণ রমণীগণের এই ভাবের তরঙ্গ কত মাস-বৎসর যে অতীত হয়ে গিয়েছ তার

ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কোনো ভক্তের ঐকান্তিক ভাবনা বা কল্পনা কখনও ব্যর্থ হয় না, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ কোনো না কোনো ভাবে তা নিশ্চয়ই সফল করেন। তাই আজ গোপবালকগণের নিকট থেকে শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্তা শুনে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ তৎক্ষণাৎ পাকশালায় প্রবেশ করে এবং অন্ন ব্যঞ্জনাদি চর্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয় আদি সব স্বর্ণপাত্রে থরে থরে সাজিয়ে, কৃষ্ণানুরাগের প্রবল বন্যায় ভাসতে ভাসতে গৃহ হতে নির্গত হলেন।

কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণ রমণীগণ যখন কৃষ্ণ-সাগরে মেলার জন্য ধাবিত হলেন তখন তাঁরা কুলশীলাদি বিসর্জন এবং কোনো প্রকার বিবেচনা না করেই অন্নপাত্র মাথায় নিয়ে ভাবাবেশে, স্খলিত চরণে, উদভ্রান্ত গতিতে সার সার হয়ে কৃষ্ণের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। গোপবালকগণ তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা ব্রাহ্মণরমণীগণের অভূতপূর্ব ভাবের গতি দেখে বিস্মিত হয়ে নিজেরাই তাঁদের অনুসরণ করলেন। কিন্তু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ এসব দেখে আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না, দ্রুতগতিতে এসে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ—যাঁরা তাঁদের পত্নী, কন্যা বা ভগ্নী, তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। কিন্তু কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণীগণের গতিরোধ করে কার সাধ্য। তাঁরা বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু শ্রীভগবানের লীলাশক্তির প্রেরণায় পরিশেষে অসফল হলেন, এবং যজ্ঞস্থলে ফিরে এসে যজ্ঞকার্যে মনোনিবেশ করলেন। ঝর্ণার জল যেমন পর্বতগুহার থেকে নির্গত হয়ে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রেই মিশে যায়, সেইরকম ব্রাহ্মণরমণীগণও তাঁদের গৃহ হতে বেরিয়ে প্রবল বেগে ধাবিত হয়ে কৃষ্ণসিন্ধুতে এসে পড়লেন এবং আত্মহারা হয়ে তাতেই বিলীন হয়ে গেলেন।

শ্রুতি বলছেন—**'আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ'** অর্থাৎ সংসার তাপতপ্ত বহির্মুখ জীবগণ যদি কখনো 'প্রাজ্ঞ' মানে ভক্তচূড়ামণিগণের সঙ্গলাভ করেন তবে তাঁরা কৃষ্ণচরণাশ্রয় পেয়ে কৃতার্থ হন। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরমণীগণও কৃষ্ণকৃপায় গোপ-বালকগণের সঙ্গলাভ করলেন এবং তার ফলে অশোক কাননে এসে বহির্ক্ষেত্রে স্বয়ং কৃষ্ণদর্শনে এবং অন্তরে কৃষ্ণালিঙ্গন পেয়ে কৃতার্থ হলেন।

সর্বান্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণরমণীগণকে এইভাবে সর্বত্যাগ করে, কেবল তাঁরই চরণ দর্শনের জন্য তাঁর নিকটে উপস্থিত হতে দেখে পরম প্রসন্ন হলেন। ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম ভক্তিতে তাঁদের অধীন হয়ে পড়লেন আর তাঁদের মনোরথ পূরণ এবং আনন্দ বর্ধনের জন্য পরমমধুর বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হলেন।

কৃষ্ণের যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি উপদেশ—শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন ব্রাহ্মণপত্নীগণের মাথায় অন্নপাত্র, তাঁদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কৃষ্ণদর্শনানন্দে পুলকিত এবং হৃদয়ে পরমানন্দের ধারা প্রবাহিত—দেখলেন অনুরাগের ঘনীভূত মূর্তিই যেন ব্রাহ্মণীরূপ ধারণ করে সারে সারে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের অন্তরের ভাব ও বাহিরের ব্যবহার উভয়ই অতি মনোহর ও শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপদ। পূতনা প্রভৃতি রাক্ষসীগণের বাহিরের ব্যবহার বাৎসল্যবতী গোপীগণের মতো দেখা গিয়েছিল কিন্তু অন্তরের ভাব ব্রহ্মনিষ্ঠায় পরিপূর্ণ কিন্তু বাহ্য ব্যবহারে কোনোপ্রকার কৃষ্ণ সেবার আভাস পাওয়া যায় না। একমাত্র ভক্তচূড়া-মণিগণেরই অন্তর ও বাহ্য কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণসেবায় ভাবিত থাকে। সেইজন্য ভক্তাধীন ভগবানও এই সমস্ত ভক্তচূড়ামণিগণের মনোবাসনা পূরণ করার জন্য সদা চেষ্টিত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রেমবতী ব্রাহ্মণ-রমণীগণকে বলতে লাগলেন—'**স্বাগতং বো মহাভাগ আস্যতাং করবাম কিম্**' (ভাগবত ১০।২৩।২৫) অর্থাৎ হে ভাগ্যবতী রমণীগণ ! তোমাদের এখানে আসা বড়ই মঙ্গলকর, কিন্তু এখন বলোদিকিনি তোমরা কেন এখানে এসেছ। বল, তোমাদের কী আদেশ পালন করব ? শ্লোকটির পরের অংশে শ্রীকৃষ্ণ আবার বলছেন—

'**যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ**' (ভাগবত ১০।২৩।২৫)

হে দ্বিজপত্নীগণ ! এবার বুঝলাম তোমরা আমাদের দেখতে এসেছ। যাই হোক এখন তোমরা একটু সময় এখানে বসো, তারপর সকলে মিলে যজ্ঞশালায় ফিরে যাও।

যদিও যজ্ঞাদিতে তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, তবু তোমাদের পতিগণ যজ্ঞফল লাভের আশায় বহুদিন হতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যজ্ঞানুষ্ঠানে

রত আছেন। তোমরা যদি যজ্ঞশালায় না যাও তাহলে তাঁদের যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। অতএব হে পরম দয়াবতী ব্রাহ্মণপত্নীগণ ! অনুষ্ঠানের কাল প্রায় অতীত হয়ে গেল, তোমরা আর ক্ষণকালও এখানে বিলম্ব না করে যজ্ঞস্থলে গমন করো। তোমরা আমাকে ভালোবাস বলে তোমাদের গৃহাদিতে আসক্তি না থাকতে পারে কিন্তু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের বহু ক্লেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞকার্য পণ্ড করা তোমাদের মতো সুশীলা রমণীগণের পক্ষে কখনই কর্তব্য নয়।

শ্রীকৃষ্ণ আরো বললেন—হে প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণ ! তোমরা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের গৃহিণী, তাই গর্গাচার্য প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট নিশ্চয়ই শুনে থাকবে যে, আমিই সকলের আত্মার আত্মা এবং পরম প্রিয়তম, নাহলে তোমাদের আমার ওপর এইরকম ভালোবাসা সম্ভব হত না। তোমরা যদি আমাকে পরমাত্মা বলে ধারণা না করতে, তাহলে কিছুতেই পতি-পুত্র-গৃহ-ধনাদি পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আমার দর্শনলাভের আশায় এই অশোক বনে আসতে পারতে না। তোমরা আমাকে পরমাত্মা রূপে হৃদয়ে অনুভব করেছ, যা কত যোগেন্দ্র মুনীও তীব্র সাধনাবশে অনুভব করতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীদের যে ভাব **'অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা'** (ভাগবত ১০।২৩।২৬) অর্থাৎ আমাতে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি তোমরা লাভ করেছ, আমার কাছে এসে আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছ, তাই তোমাদের সর্ব অভীষ্টই পূরণ হয়েছে তোমাদের এখন আর বিলম্বে কাজ নেই, সকলে মিলে যজ্ঞশালায় গমন করো।

স্বজন-প্রেমবিবর্ধন চতুর ব্রজরাজনন্দনের লীলাভঙ্গি এবং প্রেমবান ভক্তের সঙ্গে ব্যবহারভঙ্গি অতীব মনোরম, কিন্তু তার প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানে রত হলে বিজ্ঞগণেদেরও দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। শ্রীভগবান অন্তর্যামীরূপে সকলের হৃদয়ের সর্ববিধ বার্তা জেনেও প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণের নিকট আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, যেন তিনি প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানেন না। এই যে তাঁর প্রেম পরীক্ষার প্রণালী, কিংবা প্রেম বর্ধনের পদ্ধতি তা তিনি ব্যতীত অন্য কারও বোঝার সাধ্য নেই। তিনি ব্রাহ্মণ-রমণীগণকে 'তোমরা আমাদের দেখতে এসেছ' না বলে যদি বলতেন 'তোমরা আমাকে দেখতে

এসেছ' তবে ব্রাহ্মণ-রমণীগণের সঙ্গে তাঁর যে প্রেম সম্বন্ধ আছে তার ইঙ্গিত প্রকাশ পেত, কিন্তু ভগবানের এবম্বিধ ভাবে বলায় মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত গোপবালকগণের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-রমণীগণের একই সম্বন্ধ।

প্রেমাধীন শ্রীভগবান প্রেমবান ভক্তগণের প্রেমসম্বন্ধ পরীক্ষা করে তা আরো সুদৃঢ় করে দেওয়ার জন্য প্রথমতঃ প্রেমবান ভক্তগণের সঙ্গে এই প্রকার আলাপই করে থাকেন—তিনি যেন সহসা প্রেমের ফাঁদে পদার্পণ করতে চান না। কিন্তু তাঁর এই প্রকার উপেক্ষার ভাষ্য শুনেও যাঁরা কিছুতেই চরণ ছাড়তে চান না, তাঁদের তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মদান করে চিরতরে তাঁদের প্রেমে বাঁধা হয়ে থাকেন।

তাই ভক্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে—

যে আমার করে আশ তার করি সর্বনাশ।
তাতেও যদি করে আশ তার হই দাসের দাস॥

শ্রীকৃষ্ণের আদেশবাক্য শুনে হতাশ ব্রাহ্মণপত্নীগণ তখন তাঁর স্তুতিতে প্রবৃত্ত হলেন।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের কৃষ্ণস্তুতি (শ্লোক ২৯—৩০)

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসীদাম পদাবসৃষ্টং
কেশৈর্নিবোঢুমতিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্॥ ২৯
গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
ন্যান্যা ভবেদ্ গতিররিন্দম তদ্ বিধেহি॥ ৩০

সরলার্থ—ব্রাহ্মণ পত্নীগণ বললেন—'প্রভু! এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না। শ্রুতিতে বলা হয়েছে, একবার যে আপনার চরণকমল প্রাপ্ত হয়েছে, তাকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না, বেদ-মুখে প্রোক্ত আপনার সেই বাণী

আপনি সত্য করুন। আমরা তো আমাদের আত্মীয়-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে, তাদের বারণ না মেনে, আপনার চরণমূলে এসে উপস্থিত হয়েছি, শুধু এইজন্যে যে, আমরা আপনারই দাসী (সংসারের নয়), তারই চিহ্ন-স্বরূপ শিরে ধারণ করব ওই চরণচ্যুত তুলসীমালা, আমাদের কেশজালে গ্রথিত সেই আমাদের সত্য পরিচয়ের প্রতীক নিত্যই আপনার চরণস্পর্শের সৌভাগ্য-গৌরব বহন করে শোভান্বিত করবে আমাদের॥ ২৯ ॥ আমাদের পতি, পিতা-মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন—কেউই আর আমাদের গ্রহণ করবে না, (পাড়া-প্রতিবেশী) অন্যদের তো কথাই নেই। (সেই ভেঙে যাওয়া সংসারে তবু আমাদের ফিরে যেতে বলবেন আপনি ?) ওগো অরিন্দম্! আমাদের সর্ব-রিপু-বিনাশকারী! ইহলোকে সংসার অথবা পরলোকে স্বর্গাদি সুখের লোভ আমরা করি না, আপনার পদপ্রান্তে পতিত হয়েছি, আমরা আর কিছু জানি না, অন্য কোনো সহায় চাই-ও না, অন্য কোনো গতিও যেন আমাদের না হয়, তাই-ই করুন'॥ ৩০ ॥

মূলভাব— কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ পতি, পুত্র, গৃহ ও বিত্তাদি সর্বত্যাগ করে বড় আশায় কৃষ্ণের নিকট এসেছিলেন যে তাঁরা চিরজীবনের মতো কৃষ্ণচরণে আত্মবিক্রয় করবেন এবং কৃষ্ণের চরণ সেবনই তাঁদের জীবনের সার সম্বলরূপে অবলম্বন করবেন। কিন্তু কৃষ্ণ, পরমকরুণাময় হয়েও এবং তাঁদের হৃদয়ের সকল ভাব জেনেও তাঁদের চরণসেবাধিকার দানে কৃতার্থ করলেন না। কৃষ্ণের এই উপেক্ষাভাবের কথা মনে করে ব্রজরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের বদনে সতৃষ্ণ ও সজল দৃষ্টিপাত করে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—হে বিভো! আমরা আর আপনাকে কী বলব, আপনি আমাদের অন্তর ও বাহিরের সমস্ত অবস্থানই পরিজ্ঞাত আছেন। আপনি কি সর্বান্তর্যামী হয়েও বুঝতে পারছেন না যে আপনি যদি আমাদের এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য বলেন তবে তো আমাদের আর কোনো গতিই নেই। আপনিই তো শাস্ত্রে বলেছেন—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১) অথবা **'যৎ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'** (গীতা ১৫।৬) ইত্যাদি অর্থাৎ আপনি নিজমুখে বলেছেন আপনাকে যে যেভাবে ভজনা করে আপনি সেইভাবেই তার মনোবাসনা পূরণ করেন এবং আপনার নিকট যেতে পারলে

আর ফিরে আসতে হয় না। আমাদের যদি আপনার চরণপ্রান্তে এসেও ফিরে যেতে হয়, তাহলে আর আপনার শ্রীমুখের আদেশবাণীতে কেউ আস্থা স্থাপন করতে পারবে না। আপনারই শ্রীমুখের আদেশ **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'** আর আমরা তো আমাদের পতি-পুত্র সেবাদি সর্ববিধ ধর্মত্যাগ করেই আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছি আর এতে আপনারই আদেশ পালন হয়েছে। এতে যদি কিছুমাত্র পাপ হয়ে থাকে তাহলেও আমরা কিছুমাত্র ভীত নই, কেননা আমরা জানি আপনার চরণ সেবাধিকার পেলেই আমাদের সর্ববিধ ত্রুটি মার্জনা হয়ে যাবে।

আপনি আমাদের যজ্ঞস্থলে ফিরে যাওয়ার জন্য আদেশ করেছেন বলে আমাদের এই আদেশ পালন অবশ্যই কর্তব্য, কেননা আমরা আপনারই দাসী। কিন্তু হে যজ্ঞেশ্বর ! আমরা আপনার চরণ সেবার আকুলতায় গৃহত্যাগ করে চলে এসেছি আর এখন আপনি ফিরে যেতে বলছেন—আমরা কাতর, আমরা বিভ্রান্ত। আমরা আমাদের পিতা, স্বামী, ভ্রাতা সবার নিষেধ অমান্য করে, তাঁদের উপেক্ষা করে আপনার চরণদর্শন আকাঙ্ক্ষায় চলে এসেছি। আমরা যদি এখন যজ্ঞস্থলে ফিরে যাই তাহলে আমাদের পতিগণ আমাদের গ্রহণ করবেন না। আমাদের আত্মীয়গণ এমনকি আমাদের প্রতিবেশিগণও আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন না। সুতরাং হে প্রভু ! আমাদের আপনি ছাড়া আর কোনো গতি নেই। আপনিও যদি আমাদের পরিত্যাগ করেন তবে আমরা কোথায় যাই ! বিজ্ঞজন বলেন, যার কোনো গতি নেই আপনিই তার একমাত্র গতি। জগতে আমাদের মতো অ-গতির গতি সত্যি আর কেউ নেই, সুতরাং আমাদের আপনার চরণে স্থান দিয়ে অ-গতির গতি প্রদান করুন।

কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ কৃষ্ণের চরণসেবা প্রাপ্তির আশায় তা থেকে বঞ্চিত হয়ে কৃষ্ণের চরণাগ্রে লুণ্ঠিত হয়ে করজোড়ে নানা অনুনয় করে এই প্রকার দৈন্য জ্ঞাপন করতে লাগলেন এবং তাঁদের কাতর প্রার্থনা শুনে ব্রজরাজনন্দন কী আদেশ দেন তা শোনার জন্য অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বদন পানে চেয়ে রইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা ও যাজ্ঞিকপত্নীগণের পরমপদ লাভ
(শ্লোক ৩১—৩২)

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে॥ ৩১
ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ॥ ৩২

সরলার্থ—শ্রীভগবান বললেন—‘দেবীগণ ! আপনাদের পতি-পুত্র, পিতা-মাতা, ভ্রাতা-বন্ধু — কেউই আপনাদের দোষ দেবেন না, তিরস্কার করবেন না। শুধু তাই নয়, সমস্ত লোক, সমগ্র সংসার আপনাদের সম্মান করবে। এর কারণও রয়েছে, এখন যে আপনারা আমার-ই হয়ে গেছেন, আমার সঙ্গে নিত্য-যোগে যুক্ত হয়ে গেছেন। এই যে দেখুন—এই দেবতারাও আমার এই কথা অনুমোদন করছেন ॥ ৩১ ॥ দেখুন, এই সংসারে মানুষী তনু আশ্রয় করে যখন আমি অবস্থান করি, তখন সেই শরীরের সঙ্গ সব মানুষের পক্ষেই আমার প্রতি অনুরাগ বা প্রীতি জন্মানোর কারণ হয় না। সুতরাং এখন আপনারা শারীরিক-ভাবে গৃহে ফিরে যান, কিন্তু আপনাদের মন তো আমাতেই যুক্ত হয়ে রইল। এরই ফলে আপনারা অচিরকালের মধ্যেই আমাকে প্রাপ্ত হবেন’॥ ৩২ ॥

মূলভাব—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণপত্নীগণকে যজ্ঞশালায় ফিরিয়ে দিয়ে তিনপ্রকার আশীষ দান করলেন। তিনি অনুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করে তাঁদের দর্শন দান করলেন, পরজন্মে সেবাধিকার লাভের জন্য বর প্রদান করলেন এবং তাঁদের যজ্ঞশালায় ফিরিয়ে দিয়ে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণেরও ভক্তি লাভ করার পথ সুগম করে দিলেন।

ব্রজরাজনন্দন বললেন— হে পরম সৌভাগ্যশালিনী ব্রাহ্মণরমণীগণ ! তোমাদের পতিগণ তোমাদের গ্রহণ করবে না বলে চিন্তিত হয়ো না। তোমরা যদি আমার আদেশে যজ্ঞশালায় ফিরে যাও তবে তোমার পতিগণ তোমাদের পরম সাদরে গ্রহণ করবেন এবং তাঁরা তোমাদের কোনো দোষদৃষ্টিতে

দেখবেন না। এমনকী তাঁরা যে সমস্ত দেবতার আরাধনা করেছেন, সেই দেবতাগণ পর্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে তোমাদের পরম সমাদর করবেন। তোমরা আমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত বলেই তোমাদের এত সমাদর হবে। হে ব্রাহ্মণপত্নীগণ ! তোমরা যজ্ঞশালায় গমন করলে তোমাদের সঙ্গপ্রভাবে তোমাদের পতিগণও আমাকে পরমেশ্বর বলে ধারণা করতে পারবে এবং তোমরা আমার অনুগৃহীত বলে নিজেদেরও তোমাদের পতি ভেবে পরমসৌভাগ্যশালী মনে করবেন। শ্রীকৃষ্ণ আরো বললেন —হে প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণ ! এই ব্রাহ্মণজন্মে তোমরা আর আমার দাসী হয়ে সেবাধিকার লাভ করতে পারবে না। তোমরা যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও আমার দাসী হয়ে সেবায় রত হও তবে জাগতিক দৃষ্টিতে তা বড়ই দোষাবহ হবে এবং তোমাদের ভালোবাসারও ন্যূনতা প্রকাশ পাবে। তাই তোমরা আজ, নিজ নিজ গৃহে গমন করে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করো এবং তোমাদের আন্তরিক ভাবানুসারে আমাকে নিরন্তর ভাবনা করো। তোমাদের আন্তরিক প্রীতি ও তীব্র ভাবনার ফলে তোমরা এই দেহান্তে আমাকে প্রাপ্ত হবে এবং তোমাদের অভিলাষ অনুযায়ী আমার সেবাধিকার লাভ হবে। তোমরা এ জন্মে আমার দৈহিক সঙ্গলাভ করতে পারলে না বলে দুঃখিত হয়ো না। আমাতে সর্বদা মনোনিবেশ রাখতে পারলেই তোমরা সবাই আমার সঙ্গসুখ অনুভব করতে পারবে এবং দেহান্তে আমার সাক্ষাৎ সেবা করতে পেরে কৃতার্থ হবে।

সর্ব জীবই স্ব স্ব কর্মফলানুসারে পশুপক্ষী-দেব-দানবাদি নানা প্রকার দেহ ধারণ করে এবং সেই দেহের সঙ্গে নানা প্রকার সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। জীবের এই দেহের নাম **কর্মানুবন্ধন দেহ**। প্রারব্ধ কর্মফল ভোগের অবসান হলেই এই দেহ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং কর্মফলানুসারে নতুন দেহ ধারণ করে। এই জন্ম-মৃত্যু-কর্মফল ভোগের প্রবাহ কখনো স্থগিত হয় না। তার মধ্যেই যদি কোনো ভাগ্যবান জীব শ্রীভগবানের অসীম কৃপায়, শ্রীভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গবশত শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দনাদি ভক্ত্যাঙ্গ যাজন করতে করতে তাঁদের এই কর্মানুবন্ধন দেহেই শ্রীভগবানের যথাযোগ্য সেবা ও অন্তরে তাঁর চরণচিন্তা করতে আরম্ভ করেন তখন তাঁদের

ভাবনানুসারে শ্রীভগবানের চরণ-সেবনোপযোগী প্রেমময় দেহের সূচনা হয়। যেমন যেমন প্রাকৃত কর্মের অভিনিবেশ হ্রাস পেয়ে শ্রীভগবৎ-সেবায় অভিনিবেশ বৃদ্ধি পায় তেমন তেমন প্রেমময় দেহ পুষ্ট হয়। তারপর যখন শ্রীভগবানের সেবা-ভাবনা ছাড়া অন্য কোনো প্রাকৃত ভাবনাই হৃদয়ে স্থান পায় না তখনই শ্রীভগবৎসেবা ভাবনার পূর্ণাভিনিবেশ লাভ হয় এবং সেই সময় কর্মানুবন্ধন দেহের নিবৃত্তি ও প্রেমময় দেহের দ্বারা শ্রীভগবৎ-সেবা প্রাপ্তি ঘটে থাকে।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ তাদের কর্মানুবন্ধন দেহে পতিসেবনাদি গার্হস্থ্য ধর্মে রত ছিলেন। তারপর যখন তাঁরা লোকমুখে ব্রজরাজনন্দনের রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ করেন, তখন হতে পূর্বসংস্কারবশতঃ তাঁদের অন্তরে ব্রজরাজ-নন্দনের চরণ-চিন্তা করতে করতে বাহ্যদেহের ব্যবহার প্রায় মুক্তই হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের কর্মানুবন্ধন দেহে যা কিছু অভিনিবেশ ছিল তাও শ্রীকৃষ্ণচরণ দর্শনে, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালনে এবং নিরন্তর ধ্যানযোগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের পর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁদের বাহ্যদেহের আর কোনো কার্য করবার শক্তিই ছিল না। তাঁরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ চরণ চিন্তায় মগ্ন থাকতেন, গ্রহগ্রস্তের মতো অবস্থান করতেন এবং তাঁদের পতিগণও আর তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় বাধা দিতেন না। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণরমণীগণ কর্মানুবন্ধন দেহ পরিত্যাগ করে প্রেমময় দেহে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দেবাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা অতি স্বল্পকাল মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার পেয়েছিলেন বলে তাঁরা 'কৃপাসিদ্ধ ভক্তের' মধ্যে পরিগণিত। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু বলছেন—'**কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্ন্যো বৈরোচনি শুকাদয়ঃ**' অর্থাৎ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ, বলি ও শুকদেব প্রভৃতি হলেন কৃপাসিদ্ধ ভক্ত।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম ভক্তবৎসল হয়েও, ব্রাহ্মণরমণীগণকে যে এইভাবে কেবলমাত্র মানসিক দান করেই বিদায় দিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁর দৈহিক সেবা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন না, এ বিষয়ে শাস্ত্রানুসন্ধান করলে

এইরূপ জানা যায়— শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ 'তটস্থ' ও 'লীলান্তঃপাতী' ভেদে দ্বিবিধ।

তটস্থ ভক্ত — তটস্থ ভক্তগণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণের দর্শন পান না, তাঁরা প্রতিমাদিতে পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে থাকেন। এমনকি শ্রীকৃষ্ণ যদিও প্রকট লীলায় গোপবংশে জন্মগ্রহণ করে বিবিধ লীলা করেছেন কিন্তু তটস্থ ভক্তগণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে এবং তাঁর প্রকট লীলার তত্ত্ব জেনে বা না জেনে, শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীভগবানের প্রতিমারই সেবা করে থাকেন। ভগবানও প্রতিমা রূপেই তাঁদের সর্ববিধ সেবা গ্রহণ করেন এবং আপন নিষ্ঠানুসারে যথাযথ ফল প্রদান করে থাকেন।

লীলান্তঃপাতী ভক্ত —শ্রীভগবানের প্রকটলীলায় যাঁদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে, সেই সমস্ত ভক্তগণ লীলান্তঃপাতী। এই প্রকার ভক্তগণ চার প্রকারের—(১) **প্রথম প্রকার ভক্ত** তাঁর প্রকটলীলাতেই তাঁকে পরমেশ্বর বলে জানেন এবং তদনুরূপ ব্যবহার করে থাকেন। যেমন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব প্রভৃতি দেবগণ তাঁকে নন্দগোপসুত জেনে শিশুকালেই তাঁর চরণে প্রণাম ও স্তবাদি করতে কুণ্ঠিত হননি। (২) **দ্বিতীয় প্রকার ভক্তরা** তাঁর লীলা সহায়ক। গর্গাচার্য প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁকে পরমেশ্বর বলে জেনেও নরলীলার সম্বন্ধানুসারে তাঁর সঙ্গে স্নেহ-বাৎসল্যাদি ব্যবহার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রণাম করেছেন, পদধূলি গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাঁতে তাঁরা আপত্তি করেননি বরং দীর্ঘজীবী হও বলে শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্বাদ করেছেন। এইভাবে দেখা যায় যে—যে সমস্ত ভক্ত, তাঁর নরলীলার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা করে, তাঁদের সঙ্গে সেই সেই প্রকার ব্যবহার করেন। (৩) **তৃতীয় প্রকার ভক্ত** হলেন যাঁরা তাঁর পার্ষদ বা অংশ এবং নরলীলায় আকৃষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে ব্রজলীলায় এসেছেন, তাই তাঁদের প্রায়ই ঈশ্বরত্বের অনুসন্ধান থাকে না। তাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলায় যে সম্বন্ধ থাকে, সেই সম্বন্ধানুসারেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে চেষ্টিত থাকেন। ব্রজলীলায় তাঁরা জগৎপূজ্য শ্রীকৃষ্ণেরও পূজ্য হয়ে তাঁর প্রণামাদি গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁদের প্রেমময় সম্বন্ধের যেমন সখ্য,

বাৎসল্য, মধুর আদির মর্যাদা রেখে নিজের সর্বৈশ্বর্য ভুলে তাঁদের সেই ভাব অনুযায়ী যথাযোগ্য সেবা করে থাকেন। (৪) **চতুর্থ শ্রেণী হল** ভক্তি নিরপেক্ষ যেমন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ—যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ ভালো না বাসলেও যেহেতু তাঁরা মথুরাবাসী যাদবগণের পুরোহিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ তাই ব্রজবাসী গোপগণও তাদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। এঁদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবদ্‌বুদ্ধিও নেই, অত্যন্ত প্রীতিও নেই, এঁরা কৃষ্ণকে সাধারণ গোপবালক বলেই মনে করেন। তাই বলে তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনো প্রকার দ্বেষও নেই। এঁদের শ্রীকৃষ্ণে ভালোবাসা কিংবা দ্বেষ না থাকায় এঁদের অভক্ত শ্রেণীতে গণ্য করা যেতে পারে।

যাহাহোক এই সমস্ত স্বধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় সংশ্লিষ্ট এবং তাঁর নরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য সম্মান করে থাকেন। এই সমস্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পত্নীগণকে যদি শ্রীকৃষ্ণ দাসী বলে গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁর নরলীলার বিশেষ অসামঞ্জস্য হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণরমণীগণের পূর্ণ অনুরাগ এবং তাঁদের চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা জেনেও কেবলমাত্র নরলীলার মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁদের উপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি ব্রাহ্মণরমণীগণকে চিরদিনের জন্য বা সর্বতোভাবে উপেক্ষা করেননি। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণ তাঁর বাচিক ও মানসিক সেবা থেকে বঞ্চিত হননি, কেবল বর্তমান জন্মের মতো তাঁদের দৈহিক সেবা প্রাপ্তি স্থগিত থাকল।

শ্রীকৃষ্ণর বর প্রদানের ফল (শ্লোক ৩৩—৫২)

ইত্যুক্তা দ্বিজপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ।
তে চানসূয়বঃ স্বাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্॥ ৩৩
তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্মানুবন্ধনম্॥ ৩৪
ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্।
চতুর্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ং চ বুভুজে প্রভুঃ॥ ৩৫

এবং লীলানরবপুর্নৃলোকমনুশীলয়ন্।
রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্কৃতৈঃ॥ ৩৬
অথানুস্মৃত্য বিপ্রাস্তে অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ।
যদ্ বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ॥ ৩৭
দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্।
আত্মানং চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্॥ ৩৮
ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥ ৩৯
নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী।
যদ্ বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ॥ ৪০
অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্গুরৌ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্॥ ৪১
নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ॥ ৪২
অথাপি হ্যুত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি॥ ৪৩
ননু স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া।
অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ॥ ৪৪
অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ।
ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্ বিড়ম্বনম্॥ ৪৫
হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়া সকৃৎ।
আত্মদোষাপবর্গেণ তদ্যাচ্ঞা জনমোহিনী॥ ৪৬
দেশঃ কালঃ পৃথগ্দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্মশ্চ যন্ময়ঃ॥ ৪৭
স এষ ভগবান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
জাতো যদুষ্বিত্যশৃণ্ম হ্যপি মূঢ়া ন বিদ্মহে॥ ৪৮
অহো বয়ং ধন্যতমা যেষাং নস্তাদৃশীঃ স্ত্রিয়ঃ।

ভক্ত্যা যাসাং মতির্জাতা অস্মাকং নিশ্চলা হরৌ॥ ৪৯
নমস্তুভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্মবর্ত্মসু॥ ৫০
স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাম্।
অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমম্॥ ৫১
ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ।
দিদৃক্ষবোঽপ্যচ্যুতয়োঃ কংসাদ্ ভীতা ন চাচলন্॥ ৫২

সরলার্থ—শ্রীশুকদেব বললেন, ভগবান এই রকম বললে সেই দ্বিজ-পত্নীগণ পুনরায় গৃহ অভিমুখে গমন করলেন এবং সেই ব্রাহ্মণেরাও তাঁদের প্রতি কোনোরকম দোষদৃষ্টি না করে তাঁদের নিয়ে যজ্ঞ সমাপ্ত করলেন॥ ৩৩ ॥ তাঁদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণপত্নী কিন্তু শ্রীভগবানের কাছে আসতে পারেননি, তাঁর স্বামী তাঁকে বলপূর্বক আটকে রেখেছিলেন। তিনি তখন শ্রীভগবানের কথা যেমন শুনেছিলেন, সেইরূপে তাঁকে নিজের হৃদয়ে স্থাপন করে গভীর ধ্যানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্মজনিত নিজের স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহটি পরিত্যাগ করেছিলেন (অর্থাৎ নিজ শুদ্ধসত্ত্বময় দিব্য শরীরে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন)॥ ৩৪ ॥ এদিকে অনন্ত প্রভাবশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই ব্রাহ্মণীগণ কর্তৃক আনীত সেই চতুর্বিধ খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা গোপবালকদের পরিতোষপূর্বক ভোজন করালেন এবং নিজেও সেই অন্ন গ্রহণ করলেন॥ ৩৫॥ এইভাবে সেই লীলাবশে মনুষ্যবিগ্রহধারী ভগবান মনুষ্যলোকের অনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত থেকে নিজের সৌন্দর্য-মাধুর্য, বাক্য এবং কর্মের দ্বারা গো, গোপ এবং গোপীগণের মনোরঞ্জন এবং নিজেও তাঁদের অলৌকিক প্রেমরস আস্বাদন করে আনন্দলাভ করছিলেন॥ ৩৬ ॥ এদিকে সেই ব্রাহ্মণগণের পরে বোধোদয় হল এবং তাঁরা এই ভেবে অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন যে মানুষবৎ আচরণ করলেও স্বরূপত বিশ্বপতি শ্রীবলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা তাঁরা উপেক্ষা করেছেন ; এজন্য তাঁরা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন॥ ৩৭ ॥ তাঁদের পত্নীগণ ভগবান কৃষ্ণে অলৌকিক ভক্তিসম্পন্ন — এর নিদর্শন তাঁরা কিঞ্চিৎ পূর্বেই

প্রত্যক্ষ করেছেন ; কিন্তু তাঁরা নিজেরা তাতে সম্পূর্ণই বঞ্চিত— এজন্য এখন তাঁদের অনুশোচনা হতে লাগল, তাঁরা নিজেদেরই নিন্দায় প্রবৃত্ত হলেন॥ ৩৮ ॥ (তাঁরা বলতে লাগলেন) 'হায়, আমরা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই বিমুখ। উচ্চ কুলে আমাদের জন্ম হয়েছে, গায়ত্রী গ্রহণ করে আমরা দ্বিজত্ব লাভ করেছি, বেদাধ্যয়ন করে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছি, কিন্তু এসবে লাভ কী হল ? ধিক্ এ-সবে ! আমাদের বিদ্যা ব্যর্থ, আমাদের সমস্ত ব্রতও বৃথাই হয়েছে। আমাদের এই বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান তথা অভিজ্ঞতাকেও ধিক্কার ! আমাদের বংশগৌরব, কর্মকাণ্ডে অর্জিত নিপুণতা, এসবও নিষ্ফলই হয়ে গেল। এই সব কিছুর প্রতিই ধিক্কার, বার বার ধিক্কার ! ৩৯ ॥ শ্রীভগবানের মায়া অবশ্যই যোগিগণেরও মোহ উৎপাদন করে থাকে। এই যে আমরা ব্রাহ্মণ, লোকসমাজে আমাদের বিশেষ সম্মান, অপর সকলের গুরু-স্থানীয় বলে আমাদের পরিচয়— সেই আমরাও তো নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ, যাতে আমাদের শাশ্বত কল্যাণ,—সে বিষয়েই সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত, মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছি॥ ৪০ ॥ আর অপরপক্ষে দেখো তো, আহা, এরা নারী হওয়ার কারণে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক ও সাংসারিক বাধা-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণে কী অসাধারণ ভক্তিভাবসম্পন্ন, সর্ব-বাধা-বিপদ-তুচ্ছ-করা কী অগাধ এদের প্রেম ! তারই বলে তো এরা কেমন অনায়াসে ছিন্ন করে গেল গৃহ-সংসাররূপ মহামৃত্যুপাশ ! ৪১ ॥ অথচ লৌকিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এদের তো ব্রাহ্মণোচিত উপনয়নাদি সংস্কার নেই, (বেদাধ্যয়নের জন্য) গুরুকুলে বাসও এরা করেনি। কোনো তপস্যাচরণ বা আত্মমীমাংসার (আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে বিচার-মননাদি) সুযোগও এদের ঘটেনি। এমনকি, দৈহিক পবিত্রতাও এদের সব-সময় থাকে না, সন্ধ্যা-উপাসনা ইত্যাদি শুভ কর্মও এরা করেনি॥ ৪২ ॥ তা হলেও যোগেশ্বরেশ্বর পুণ্যকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এদের ঐকান্তিক ভক্তি জন্মেছে, আর আমাদের সংস্কার, বেদাধ্যয়ন গুরুকুলবাস প্রভৃতি সব কিছু থাকা সত্ত্বেও শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি জন্মাল না॥ ৪৩ ॥ আমরা তো গৃহস্থ জীবনের নানারকমের কর্মপ্রচেষ্টায় মত্ত থেকে নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ অর্থাৎ পরমার্থকেই বিস্মৃত হয়েছিলাম। কিন্তু ভগবানের করুণারও তো তুলনা

নেই,—আমাদের ঘুম ভাঙানোর জন্য তাঁর প্রেরিত দূতরূপে এল গোপেরা। আহা ! স্বয়ং শ্রীভগবান—যিনি কিনা সকল সজ্জনের পরম গতি, পরম আশ্রয়, তিনি নিজেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলার জন্য গোপমুখে পাঠালেন তাঁর বাণী, এমন সৌভাগ্যের কথা আমরা কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিলাম ? ৪৪ ॥ তিনি নিজে তো পূর্ণকাম, কৈবল্যমোক্ষ পর্যন্ত সর্ববিধ কামনার পূরণকর্তা ; সর্বপ্রকারেই তাঁর অধীন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমাদের তাঁর কীসের প্রয়োজন ? সকলের প্রভু, সর্বসমর্থ সেই ঈশ্বর ক্ষুধার্ত হয়ে খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করলেন আমাদের কাছে ! আমাদের চেতনার উন্মেষ ঘটানো, আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙানো, এছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে তাঁর এই (অন্নপ্রার্থনারূপ) ছলনার ? ৪৫ ॥ স্বয়ং ভগবতী লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত অপর সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে এবং নিজের চঞ্চলতাদি দোষ পরিহার করে যাঁর চরণস্পর্শের আশায় অবিরত ভজনা করে চলেছেন, সেই শ্রীভগবান যখন সাধারণ মানুষের কাছে অন্ন-যাচ্ঞা করেন তখন তাদের মোহ বা বুদ্ধি বিভ্রম জন্মানোই তো স্বাভাবিক (আমাদেরও তা-ই ঘটেছিল, তাঁকে চিনতে পারিনি আমরা।) ! ৪৬ ॥ দেশ, কাল, পৃথক পৃথক দ্রব্য, মন্ত্র, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, ঋত্বিক্‌, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ এবং ধর্ম— এই সবই সেই একই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র ॥ ৪৭ ॥ সেই যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন একথা আমরা শুনেছিলাম, কিন্তু আমরা এমনই মূর্খ যে তাঁকে (সমীপে পেয়েও) চিনে উঠতে পারলাম না ॥ ৪৮ ॥ তবে এসব সত্ত্বেও আমাদের জীবন ধন্য, ধন্যতম আমরা ; আমাদের সৌভাগ্যের আর অন্ত নেই যে, আমরা এইরকম পত্নী লাভ করেছি। তাদেরই ভক্তি প্রভাবে আমাদেরও ভগবান শ্রীহরির প্রতি অবিচলমতি, একনিষ্ঠা প্রীতি জন্মেছে ॥ ৪৯ ॥ প্রভু ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ! আপনাকে প্রণাম। অনন্ত অচিন্ত্যনীয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর আপনি ! আপনার জ্ঞান লোকে ও কালে অবাধিত ! আপনারই মায়ায় আমাদের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, আর তারই ফলে আমরা কত-শত জটিল কর্মপথে ঘুরে মরছি ॥ ৫০ ॥ যিনি আদি পুরুষ, পুরুষোত্তম, তাঁর মহিমা, তাঁর প্রভাব অবধারণ করার সাধ্যও তো আমাদের নেই, তাঁরই মায়ায় মোহিত হয়ে রয়েছি যে আমরা। আর সেজন্যই তো তাঁর

অনুরোধের অমর্যাদা করলাম আমরা ; তিনি কি ক্ষমা করবেন না এই অপরাধ? তিনি তো সব জানেন, তিনি দয়া করুন, ক্ষমা করুন আমাদের ! ৫১ ॥

পরীক্ষিৎ ! এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছিলেন যে ব্রাহ্মণেরা, তাঁরাই এখন নিজেদের পূর্বকৃত অসদাচরণের কথা স্মরণ করে অপরাধ বোধে পীড়িত হচ্ছিলেন, তাঁদের মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মাচ্ছিল যে, একবার গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে দর্শন করে আসেন, কিন্তু কংসের ভয়ে শেষ পর্যন্ত সে-ইচ্ছাকে তাঁরা বাস্তব রূপ দিতে পারেননি॥ ৫২ ॥

মূলভাব—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণের কৃষ্ণদর্শনের উৎকণ্ঠা, কৃষ্ণদর্শনের জন্য পতি-পুত্রাদি ত্যাগ করে অশোকবনে আগমন, সেখানে কৃষ্ণদর্শন, অন্তরে অন্তরে কৃষ্ণালিঙ্গন, তাঁর সেবাপ্রাপ্তির জন্য দৈন্য-জ্ঞাপন এবং শ্রীকৃষ্ণের আদেশে পুনরায় যজ্ঞশালায় প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি আলোচনা করলে এটি স্পষ্ট যে তাঁরা কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি এবং তাঁদের কৃষ্ণানুরাগ চরম দশায় পরিণত। শ্রীকৃষ্ণও তাঁদের পরম অনুরাগের উপযুক্ত পরমানুগ্রহ প্রকাশ করে তাঁদের প্রতি যে প্রতিদান করেননি, এমন নয়। ব্রাহ্মণরমণীগণ, যখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যজ্ঞশালায় গমন করলেন, তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের জন্য আনা অন্নব্যঞ্জনাদির পাত্রগুলি শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁরা এই অন্নব্যঞ্জনাদি শ্রীকৃষ্ণ খাবেন কিনা তা বিবেচনাও করেননি বা খাওয়ার অনুরোধ করেননি। কিন্তু ভক্তাধীন শ্রীভগবানের কী অপার অনুগ্রহ। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে যাঁর উদ্দেশে যজ্ঞাদিতে চরু পুরোডাশাদি অর্পণ করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং স্বহস্তে তা গ্রহণ করেন না, দেবগণ তাঁর উদ্দেশ্যে অমৃতের নৈবেদ্য সমর্পণ করলেও তিনি কখনো প্রত্যক্ষরূপে তা গ্রহণ করেন না, সেই সর্ব আরাধ্য ভগবান স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সমর্পণের অপেক্ষা না রেখে—এমনকি ভোজনের অনুরোধেরও অপেক্ষা না করে নিজে গোপবালকগণসহ ব্রাহ্মণ-রমণীগণ কর্তৃক আনীত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করেন। তিনি সখাগণকে বললেন, এসো আমরা আর কালবিলম্ব না করে প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণের প্রেমের দান গ্রহণ করি। এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

বলদেব ও গোপবালকসহ পরমানন্দে সেই অন্ন পরিবেশনে ও ভোজনে প্রবৃত্ত হলেন।

শ্রীশুকদেব বলছেন—হে মহারাজ ! নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীব্রজরাজনন্দন এইরূপে কতই যে করুণার লীলা প্রকাশ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর সর্ববিধ লীলাই সাধক ভক্তগণের ভক্তশিক্ষার দৃষ্টান্তস্বরূপ। শুদ্ধ ভক্তিতে শ্রীভগবান যে কীভাবে ভক্তের বশীভূত হন, তা তাঁর প্রত্যেক লীলা অনুসন্ধান করলেই প্রতীয়মান হয়।

অতঃপর ব্রাহ্মণরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশপালনই একান্ত কর্তব্য মনে করে এবং প্রতি পদক্ষেপে শত শত বার ফিরে ফিরে, শ্রীকৃষ্ণর বদনারবিন্দ দেখতে দেখতে, ধীরে ধীরে যজ্ঞশালা অভিমুখে অগ্রসর হলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কিন্তু দূর হতে তাঁদের দেখে পরমানন্দ সাগরে ভাসতে ভাসতে দ্রুত তাঁদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং পরম সমাদরে তাঁদের যজ্ঞশালায় নিয়ে গেলেন। যাঁদের শ্রীকৃষ্ণ চরণে পূর্ণ অনুরাগ এবং শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের উপর প্রসন্ন, তাঁদের উপর যে সকলেই প্রসন্ন হবে এ আর বিচিত্র কী ?

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যাপি
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্॥
অরিমিত্রং বিষং পথ্যমজ্ঞানং জ্ঞানতাং ব্রজেৎ।
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্যয়ঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

পদ্মপুরাণ বলছেন— যিনি সর্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দের পূজন করেন, তাঁর সর্বজগতেরই প্রীতি সম্পাদন করা হয়। জল যেমন স্বভাবতঃই নিম্নদিকে গমন করে, সেইরকম সকলের প্রীতিই তাঁর দিকে ধাবিত হয় এবং সকলেই তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়েন। যাঁর অনুরাগে এবং সেবাবিধানে শ্রীভগবান প্রীত হন, তাঁর শত্রুও মিত্র হয়ে যায়, বিষও অমৃতে পরিণত হয় এবং অজ্ঞানও জ্ঞানে পরিণত হয়। ভক্তবৎসল ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণার কথা আর কত বলব। তিনি এইভাবে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞের দোষ ক্ষালন করে তাঁদের যজ্ঞফল লাভের অধিকারী করলেন। প্রথমে তাঁর নিত্য পার্ষদ গোপবালকগণকে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের কাছে পাঠিয়ে তাদের উদ্ধারের সূচনা করেছেন, তারপর তাঁর পরমভক্ত ব্রাহ্মণপত্নীদের প্রতি তাঁদের অনুরাগ সৃষ্টি করে তাঁদের

যজ্ঞফলের অধিকারী করেছেন এবং অবশেষে কৃপাসিদ্ধ পত্নীদের সঙ্গলাভে তাঁদের মধ্যে ভক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছেন।

সূর্যবংশীয় রাজা মুচুকুন্দ শ্রীভগবানের স্তুতি প্রসঙ্গে তাই বলছেন—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ জনস্য তর্হ্যচ্যুত ! সৎ সমাগমঃ।
সৎ সঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥

(ভাগবত ১০।৫১।৫৪)

অর্থাৎ হে ভগবন্ ! সংসার মরুভূমিতে ভ্রাম্যমাণ জীবের যখন অযথা ভ্রমণের নিবৃত্তিকাল উপস্থিত হয়, তখন তাদের আপনার ভক্তগণের সঙ্গ হয়ে থাকে। ভক্তসঙ্গের কী অপূর্ব মহিমা। ভক্তসঙ্গ লাভ হলেই জীবের আপনার চরণাশ্রয় করবার লালসা জন্মে থাকে।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ স্বর্গাদি লাভের আশায় নিরন্তর স্বধর্মানুষ্ঠান এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়া করতেন, কৃষ্ণমহিমা তাদের বুদ্ধির অগোচর। তাই আজ তারা তাঁদের পত্নীগণের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে যে তাদের এই উচ্চাবস্থা তা কিছুতেই ধারণা করতে পারলেন না এবং ভক্তচূড়ামণি পত্নীগণের প্রভাবেই যে তাদের মধ্যেও এই পরিবর্তন, এই কৃষ্ণভক্তির সূচনা তাও বুঝতে পারলেন না।

যাইহোক ব্রাহ্মণপত্নীগণ স্বল্পকাল মধ্যে তাঁদের কর্মানুবন্ধন দেহ ত্যাগ করে প্রেমময় দেহে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবাধিকার লাভ করলেন। আর ভক্ত-চূড়ামণি পত্নীদের সঙ্গমহিমায় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যেন পুনর্জন্ম লাভ করলেন। তাঁরা নিজকৃত অপরাধ স্মরণ করে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং নানাভাবে অনুশোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা ভাবলেন যে, সকলে মিলে নন্দালয়ে গমন করবেন এবং নন্দনন্দনের চরণে পতিত হয়ে দৈন্যজ্ঞাপন করবেন এবং ক্ষমাভিক্ষা চাইবেন। কিন্তু হায় ! কংস ভয়ে ভীত হয়ে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের এই সংকল্প আর কার্যে পরিণত করতে পারলেন না। যাঁর চরণাশ্রয় করলে সাক্ষাৎ শমনভয় পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়, তাঁর চরণাশ্রয় করলে কী কংস-ভয়ের সম্ভাবনা থাকে ? কিন্তু ভক্তি-সাধনাবিহীন ব্রাহ্মণগণের শ্রদ্ধা ততটা দৃঢ়তা লাভ করেনি যে তাঁরা ব্রাহ্মণপত্নীগণের মতো সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে কৃষ্ণের চরণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তদবধি তাঁদের কৃষ্ণনাম কীর্তন, কৃষ্ণলীলা স্মরণ কিংবা কৃষ্ণচরণার্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনে আর কোনো ত্রুটি হয়নি।

অনন্ত লীলাময় ভগবান এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনে কত না মধুর-লীলা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এই লীলায় তিনি ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণরমণীগণকে চিরকৃতার্থ করেছেন এবং তাঁদের সঙ্গপ্রভাবে তাঁদের পতিদেবতা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে অভিমানের মহাপর্বত হতে নামিয়ে ভক্তিসাগরে ভাসমান করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও আবার তাঁর ভক্তিমহিমাও কী অপূর্ব ভাবেই না প্রকাশ করেছেন! তিনি দেখিয়েছেন অঙ্গিরাঋষির শাপও কীভাবে বরদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠফলপ্রদ, মহৎ ব্যক্তির শাপেও জীবের সদা উপকার হয়। আরও দেখিয়েছেন বিপদে না পড়লে কীভাবে জগতে কারোর মহিমা প্রকাশ বা সম্পদ লাভ হয় না। ব্রাহ্মণরমণীগণ পতি পরিত্যক্ত্যা হয়েও কেমন অনায়াসে পরমগতি লাভ করলেন!

———o———

শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনপর্বত ধারণ ও ইন্দ্রস্তুতি

(১০ম স্কন্ধ, ২৪—২৭ অধ্যায়)

শ্রীকৃষ্ণর বয়ক্রম—সাত বৎসর, কার্তিক মাস

প্রাক্‌কথন

শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ লীলা বড়ই মনোরম। এই লীলায় তিনি বহুকাল থেকে ব্রজে প্রচলিত ইন্দ্রযাগের পরিবর্তে গোবর্ধন যাগের প্রবর্তন করেন। এর ফলে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রজভূমি ধ্বংস করার জন্য প্রবল বৃষ্টিপাত, ঝটিকা সঞ্চারণ ও বজ্রপাত করতে প্রবৃত্ত হন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বাম করে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে তার নিচে ব্রজবাসী সমস্ত গো, গোপ ও গোপীগণকে আশ্রয় দান করে তাদের রক্ষা করেন আর ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেন। লীলাটি দশম স্কন্ধের চব্বিশ থেকে সাতাশ—এই চারটে অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

গোপরাজ নন্দর পিতা পর্জন্য গোপ যখন গোকুলে রাজত্ব স্থাপন করেন, সেই সময় হতেই প্রতি বছরেই কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে ব্রজের সমস্ত গোপ-গোপীগণ দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীতি বিধানার্থে ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠান করতেন। যখন পর্জন্য গোপের বয়স হল তিনি বানপ্রস্থে গমন করলেন,

তখনও গোপরাজ নন্দ পূর্ব পৈতৃক-প্রথানুসারে ইন্দ্রযাগ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণর এখন সাত বছর বয়স হয়েছে আর ব্রজধামে ইন্দ্রযাগের প্রস্তুতি চলছে। শ্রীকৃষ্ণের এবার কিরকম যেন কৌতূহল হল, তিনি পিতাকে বললেন—

কথ্যতাং মে পিতঃ কোহয়ং সম্ভ্রমো ব উপাগতঃ।
কি ফলং কস্য চোদ্দেশ্যঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ ॥

(ভাগবত ১০।২৪।৩)

বাবা! আপনারা এই যে মহা আড়ম্বর করে যজ্ঞানুষ্ঠান করছেন তা কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনাদের এই কার্যের ফলে কী লাভ হয়, এটা কার উদ্দেশ্যেই বা করা হচ্ছে এবং এই যজ্ঞ কী করেই বা নির্বাহ হয়, এ সবই আমাকে বুঝিয়ে দিন।

গোপরাজ নন্দ সাগ্রহে বলতে লাগলেন—বাবা কৃষ্ণ! তুমি আমাদের যে কার্যের আয়োজন দেখছ তা ইন্দ্রযাগেরই অনুষ্ঠান। আমরা সকল ব্রজবাসী গোপগণ মিলে প্রতিবৎসর এই দিনে বর্ষাধিদেবতা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীত্যর্থে এই যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকি। গোপালন ও কৃষিকার্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাই বর্ষাদিদেবতা যদি যথাসময় সুবৃষ্টি প্রদান না করেন তবে আমাদের গোরক্ষা আর পরিবার পালনাদি তো অসম্ভব হয়ে পড়ে। বর্ষাদিদেবতা দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপাদৃষ্টিতেই আমরা ব্রজবাসী গোপগণ স্ত্রী, পুত্র ও গো-মহিষাদি পশুগণসহ পরমানন্দে কালযাপন করি। তাই আমরা প্রতিবৎসর তাঁরই সুবৃষ্টিতে উৎপন্ন যব, ধান, গোধূমাদি শষ্য এবং দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ননী, ঘী দ্বারা তাঁর প্রীত্যর্থে এই যাগের অনুষ্ঠান করে থাকি।

শ্রীকৃষ্ণ আজ নন্দাদি গোপগণকে নিমিত্ত করে জগতে প্রকৃত পরমার্থর পথ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন যাঁরা কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত তাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তর সেবাতেই কালাতিপাত করেন। তাঁদের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোনো কামনা-বাসনা না থাকায়, অন্য কারোর পূজা বা সেবা করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যাদের মান, সম্মান, ধন, ধান্যাদি বা বিষয়

ভোগের প্রবৃত্তি থাকে তাদের কর্মফল প্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রাদি দেবতাদের সেবার প্রয়োজন হয়।

গীতায় তাই ভগবান বলেছেন—

যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ (গীতা ৯।২৩)

অর্থাৎ হে অর্জুন ! যারা আমা হতে পৃথক এই জ্ঞানে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উপাসনা করে, তাদেরও এই উপাসনা দ্বারা আসলে আমারই উপাসনা করা হয়। কিন্তু সে উপাসনা অবিধিপূর্বক (অর্থাৎ আমা হতে পৃথক জ্ঞানে করা) তাই তাতে কারো মোক্ষলাভ হয় না বা আমাতে ভক্তিলাভও হয় না।

যা হোক, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণকে সাধারণ লোকের ন্যায় তুচ্ছ ফল কামনায় ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করা কর্তব্য বলে মনে করলেন না। তাঁরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় এবং শুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমে কৃষ্ণের সেবা করেন, তাই তাঁদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর অন্য দেবতার আরাধনার প্রয়োজন নেই। শ্রীকৃষ্ণই সকল দেবতার মূল এবং অন্য সমস্ত দেবতাই শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি। যাদের উপাসনায় কৃষ্ণের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, তারাই নানাবিধ তুচ্ছ ফল কামনা করে নানা দেবতার উপাসনা করে থাকেন। এ সম্বন্ধে গীতায় ভগবান বলছেন—

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ (গীতা ৯।২৪)

অর্থাৎ হে অর্জুন ! আমি সর্বযজ্ঞের আরাধ্য ও ফলদাতা। মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার তত্ত্ব জানে না বলে পরমার্থ লাভে বঞ্চিত হয়। মূঢ় ব্যক্তিগণ যার নিকট হতে কোনো বস্তু লাভ করে তাকেই দাতা মনে করে এবং মূল দাতা শ্রীভগবানকে ভুলে যায়।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দ ও অন্যান্য ব্রজবাসী গোপগণের মধ্যে ইন্দ্রযাগে অনাস্থা জন্মাবার জন্য ঋষি জৈমিনি প্রবর্তিত কর্মবাদ ব্যাখ্যা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন পিতা ! আপনারা যে দেবরাজ ইন্দ্রকেই একমাত্র সুবৃষ্টি প্রদানের কর্তা বলে স্থির করেছেন তা আমার মতে যুক্তিযুক্তি বলে মনে হয় না।

জীবমাত্রেই অনাদি কর্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ। সকলেই নিজ নিজ প্রাক্তন কর্মফলে যথাযোগ্য দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী আদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং নিজ নিজ কর্মানুসারে কেউ সুখে কেউ বা দুঃখে জীবন যাপন করে। তারা নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে যথাসময়ে দেহত্যাগ করে, তারপর আবার নবীনদেহ ধারণ করে, নবীন কর্মফল ভোগ করার তাড়নায়। এই অনাদি অসীম কর্মচক্রে সমারূঢ় জীব পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করেও কোনোদিনই কর্মচক্রের শেষ দেখতে পায় না। কর্মই জগতের একমাত্র মূল ও নিয়ন্তা, তাই আমার ধারণায় আপনাদের সুবৃষ্টি লাভের আশায় দেবরাজ ইন্দ্রের এই আরাধনা ব্যর্থ বলেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন এই যে, জগতে দেখা যায় যে-কেউ ইচ্ছে করলেই সুকর্ম বা কুকর্ম করতে পারে না। মনে হয় নিশ্চয়ই জগতে কোনো নিয়ন্তা আছেন এবং তিনি যাকে সৎকর্ম করার প্রবৃত্তি দান করেন, সেই সৎকর্মানুষ্ঠান করে আর যাকে কুকর্মের প্রবৃত্তি দেন সে কুকর্ম করে। শ্রুতি এ সম্বন্ধে বলছেন—

'এষ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ হ্যেবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে' (কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদ্) অর্থাৎ ঈশ্বর যাকে ঊর্ধ্বগতি প্রদান করতে ইচ্ছে করেন তার দ্বারা সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করান, আবার যাদের অধোগতি প্রদান করতে ইচ্ছা করেন তাদের দ্বারাই কুকর্মের অনুষ্ঠান করান। এর অর্থ হল ঈশ্বরই অন্তর্যামীরূপে অন্তরে প্রেরণা জাগালেই জীবগণের হৃদয় যথাযোগ্য সৎ ও অসৎ কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। জীবের অন্তরের প্রেরণা তার জন্ম-জন্মান্তরের কৃত-কর্মের ফল অনুসারে আসে দুভাবে (ক) **প্রারব্ধ কর্মফল**— যে কর্মফল ভোগের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাকে বলে প্রারব্ধ বা অর্জিত কর্মফল। এই প্রারব্ধ কর্মফল সব জীবের প্রতি জীবনে নতুন নতুন ভাবে আসে এবং তা অবশ্যই ভোগ্য। আর এই প্রারব্ধ কর্মফল ভোগের জন্য পরিস্থিতি প্রকৃতিই তৈরি করে দেয় বা তা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়। আর (খ) কর্মের দ্বিতীয়ভাব সংস্কাররূপে আসে। **'স্বভাবতন্ত্রো হি জন স্বভাবমনুবর্ততে'**—অর্থাৎ স্বভাব বা জীবের প্রাক্তন কর্মদ্বারা অর্জিত সংস্কারই প্রবৃত্তির হেতু এবং এই অনাদি কর্মসংস্কারই সর্বজীবের

সকল ভবিষ্যৎ কর্মের নিয়ন্তা। প্রাক্তন কর্মফলজনিত সংস্কারেই জীবের ইহজন্মের অনুষ্ঠেয় কর্মের (ক্রিয়মাণ কর্ম) পথ প্রদর্শন করে থাকে। জগতেও দেখা যায় কেউ কেউ গুরুর শত উপদেশেও কোনো কর্ম করে উঠতে পারে না আবার আবার কেউ বিনা উপদেশ বা শিক্ষা বলে নানাবিধ কর্মশক্তি লাভ করে। দেবতা, অসুর, মানুষ সকলেরই আপন আপন বিচার বুদ্ধি আছে, কিন্তু তারা কেউই আপন আপন কর্মপ্রবৃত্তি লঙ্ঘন করে নিজ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারে না। এই স্বভাব বা কর্মসংস্কারও কর্মফলের মতো অনাদি।[১]

শ্রীকৃষ্ণ আরো বললেন যে জীবগণ নিজ নিজ জন্মান্তরীণ কর্মফলানুসারেই সর্ববিধ সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে তাতে ইন্দ্রের প্রসন্নতা বা অপ্রসন্নতার কোনো কারণ নেই। তবে আমরা যদি প্রত্যক্ষ উপকারকের সন্ধানে প্রবৃত্ত হই তবে স্পষ্টই জানা যাবে যে—গো, ব্রাহ্মণ ও গোবর্ধনই আমাদের প্রত্যক্ষ ও প্রধান উপকারক। তাই পরম উপকারক ব্রাহ্মণ, গো এবং গোবর্ধনের পূজা করা আমাদের নিতান্ত কর্তব্য ও যুক্তিসিদ্ধ। ইন্দ্রযাগের জন্য যে সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে তার দ্বারাই অনায়াসে গোবর্ধন যাগ হয়ে যাবে। এই কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

অন্যেভ্যশ্চাশ্বচাণ্ডালপতিতেভ্যো যথার্হতঃ।
যবসঞ্চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ॥ (ভাগবত ১০।২৪।২৮)

অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে সমাগত অতিথিগণকে, কুকুর, চণ্ডাল ও পতিত প্রভৃতি সর্বজীবকে অন্ন-বস্ত্রাদি দান করা হোক। গোগণকে তৃণ ভোজন করানো হোক আর গোবর্ধন পর্বতকে গন্ধ পুষ্প ও অন্নাদি উপাচার প্রদান করা হোক। যাগ-

---

[১]তবে এ-বিষয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, মানুষ ঈশ্বর-প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা তার স্বভাবের অশুদ্ধ ভাব অর্থাৎ রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ বর্জন করে নিজ-স্বভাবকে শুদ্ধ করতে সক্ষম। স্বভাব-জাত কর্মে অবশ হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র মানুষই রাগ (আসক্তি)-দ্বেষজনিত দোষ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরলাভের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম (গীতা ৩।৩৪, ৫।৩, ৭।২৭)। এই বিষয়টি বিশেষভাবে বুঝতে হলে গীতা প্রেস থেকে প্রকাশিত স্বামী রামসুখদাস মহারাজ বিরচিত গীতার সাধক-সঞ্জীবনী টীকার ১৮ অধ্যায়ের ৬০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সমাপনান্তে ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দেওয়া হোক এবং নিজ নিজ গাভীগণের মধ্যে যারা মুখ্য তাদেরও পূজা করে প্রদক্ষিণ করা হোক। আপনারা প্রতি বছর যে ইন্দ্রযাগ করেন তার পরিবর্তে গোবর্ধন যাগের অনুষ্ঠানই ব্রজবাসিগণের পক্ষে পরম হিতকর হবে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেবতা, প্রত্যক্ষ উপজীব্য এবং উপকারকগণকে পরিত্যাগ করে স্বর্গবাসী দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

ব্রজরাজনন্দন বয়সে বালক হলেও নন্দ, উপনন্দ আদি বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ গোপগণ সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। তাঁরা ঠিক করলেন এবার থেকে আর ইন্দ্রপূজা না করে গো, ব্রাহ্মণ ও গোবর্ধন পূজার অনুষ্ঠানই করবেন। হরিবংশে বর্ণিত আছে—

আনন্দজননো ঘোষো মহান মুদিত গোকুলঃ।
তুর্য্যপ্রণাদঘোষশ্চ বৃষভানাঞ্চ গর্জিতৈঃ॥ (হরিবংশ)

অর্থাৎ ব্রজে যখন গোবর্ধন যাগের আয়োজন আরম্ভ হল, তখন চতুর্দিকে আনন্দ কোলাহল হতে লাগল এবং ব্রজবাসী গোপগণ আর গোসমূহ পরমানন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে যথাসময় গোবর্ধনতটে শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত গোবর্ধন যাগের শুভারম্ভ হল। ব্রজরাজনন্দন এবং ব্রজবাসী গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথে গর্গ, ভাগুরি প্রভৃতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যথাবিধি অগ্নিস্থাপনাদি করে মহাসমারোহে গোবর্ধন পর্বতের অর্চনা করলেন এবং যথাযোগ্য পুজোপহার প্রদান করলেন। তাঁরা যখন গোবর্ধন পর্বত প্রদক্ষিণ করতে প্রবৃত্ত হলেন, তখন সমাগত ব্রাহ্মণগণ পরমানন্দে সকলকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন এবং গোপরমণীগণ প্রেম বিগলিত নয়নে ও প্রেমরুদ্ধ কণ্ঠে কৃষ্ণগুণগান করিতে লাগলেন।

এই নব প্রবর্তিত গোবর্ধন যাগে একটি পরমাশ্চর্য ঘটনা দেখে গোপরাজ নন্দ এবং ব্রজবাসী গোপগণও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। পূর্ব পূর্ব বৎসরে ইন্দ্রযাগ অনুষ্ঠানে গোপগণ ইন্দ্রের উদ্দেশে বিবিধ নৈবেদ্যাদি সমর্পণ করতেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করতেন না বা গ্রহণ করলেও তা কেউ দেখতে পেত না বা সমর্পিত নৈবদ্যেও তার কোনো চিহ্ন থাকত না। এবার কিন্তু গোপবাসিগণ ইন্দ্রযাগের বদলে গোবর্ধন যাগ

করেছেন, তাঁরা দেখলেন—

কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ।

শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরি বলিমাদদ্ বৃহদ্বপুঃ ॥ (ভাগবত ১০।২৪।৩৫)

অর্থাৎ গোবর্ধনরূপী এক সুবৃহৎ ও মনোহরমূর্তি, 'আমিই গোবর্ধন' এই কথা বলে গোপগণ প্রদত্ত অন্ন নৈবেদ্যাদি প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করলেন।

সর্বারাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গোপরাজ নন্দের পুত্র ও ব্রজবাসী গোপগণের পুত্রতুল্য ও পরম স্নেহাস্পদ। তাঁরা নিজেদের নিত্যসিদ্ধ প্রেম-স্বভাববশত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে থাকেন এবং তাতেই তাঁদের সবার্থসিদ্ধি হয়ে যায়, সর্বদেবতাদের আরাধনাও হয়ে যায় এবং তাঁদের আর পৃথকভাবে অন্য কোনো দেবতারই আরাধনার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে শুদ্ধ প্রেমময় ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকারণের কারণ বলে ধারণা করতে পারেন না, তাই তাঁরই কল্যাণার্থে তাঁরা নানাদেবতার পূজা করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই তাঁদের পূজার এই প্রবৃত্তি সার্থক করার জন্য ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চনা বন্ধ করে, ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবর্ধনের পূজা প্রবর্তন করেন।

যাইহোক শ্রীগর্গসংহিতায় গোবর্ধনযাগের যে বিধি দেখা যায় তাতে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধনযাগের প্রবর্তন কেবল ব্রজবাসীদের জন্যই করেননি, তিনি জগৎবাসী সকলকেই আদেশ করেছেন যে, কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে যেন ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবর্ধনগিরির অর্চনা করেন এবং তাতে সকলেরই পরমকল্যাণ হবে। শ্রীগোবর্ধন পর্বত শ্রীকৃষ্ণদাসবর্য, তাই গোবর্ধন পর্বতের অণু-পরমাণুও ভক্তের নিত্যসেব্য। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে, শ্রীপাদ শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামে একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রীবৃন্দাবন থেকে একখণ্ড গোবর্ধন শিলা ও একগাছি গুঞ্জমালা নিয়ে গিয়েছিলেন এবং পুরীধামে গিয়ে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু সেই গুঞ্জমালা গলায় ধারণ এবং প্রেমাবেশে গোবর্ধন শিলা নিয়ে নানাবিধ প্রেমব্যবহার করতেন। পরিশেষে এই শীলা ও মালা শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দিয়েছিলেন—

দুই অপূর্ব বস্তু পাইয়া প্রভু তুষ্ট হইলা। স্মরণের মালা কালে পড়ে গুঞ্জমালা॥

গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে। কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়ে কভু শিরে ধরে॥

নেত্র জলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর। শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ-কলেবর॥

এইমত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিল। তুষ্ট হয়ে শিলা মাল রঘুনাথে দিল॥
প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ। ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন। অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা। আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥
এই মত রঘুনাথ করেন পূজন। পূজা কালে দেখে শিলা ব্রজেন্দনন্দন॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইভাবে শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীকে গোবর্ধন শিলা প্রদান করেছিলেন এবং শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীও শ্রীমন্মমহাপ্রভুর আদেশমতো সেই শিলার সেবা করতেন এবং পূজাকালে তাঁর গোবর্ধন ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে জ্ঞান হত।

যাইহোক এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবর্ধনের পূজা প্রবর্তন করলেন কেননা এ বিষয়ে ভগবানেরই আদেশ আছে—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন তে ভক্তাশ্চ মে মতাঃ।
মদ্ভাক্তানন্তু যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ (আদিপুরাণ)

অর্থাৎ হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি কেবল আমার ভক্ত কিন্তু আমার ভক্তদের সমাদর করে না, সে আমার ভক্ত নয়। যে ব্যক্তি আমার ভক্তদের সমাদর করে সেই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

এই গোবর্ধনযাগ দ্বারা গিরিরাজ গোবর্ধনের মহিমা প্রকাশ হল এবং ব্রজবাসিগণ পরমানন্দে যাগ সমাপন্তে শ্রীকৃষ্ণসহ হর্ষচিত্তে ব্রজে প্রবেশ করলেন।

গিরিরাজ গোবর্ধনের মাহাত্ম্য—গর্গ-সংহিতায় গোবর্ধন সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

যাবদ্ভাগীরথীগঙ্গা যাবদ্ গোবৰ্দ্ধনো গিরি।
তাবৎ কলেঃ প্রভাবস্তু ভবিষ্যতি ন কর্হিচিৎ॥

অর্থাৎ ভগীরথ কর্তৃক সমানীতা গঙ্গা ও গোবর্ধন পর্বত যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করবেন ততদিন পর্যন্ত কলির প্রভাব ব্যক্ত হবে না।

দেবর্ষি নারদ গোবর্ধন পর্বতের মুখ্য তীর্থসমূহ মিথিলাপতি বহুলাশ্বকে বর্ণনা করেছেন এবং গর্গসংহিতায় বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

গোবৰ্দ্ধনগিরিরাজন্ সর্বতীর্থ বরঃ স্মৃতঃ।
বৃন্দাবনশ্চ গোলোকমুকুটোহদ্রিঃ প্রপুজিতঃ ॥

অর্থাৎ গোবর্ধন পর্বত ও শ্রীবৃন্দাবন সর্বতীর্থ শ্রেষ্ঠ। যে গোবর্ধন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ছাতার মতো শ্রীহস্তে সাতদিন ধারণ করেছিলেন তার মতো শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর কী হতে পারে ?

গোবর্ধন পর্বতের তীর্থসমূহ—

সরোবর ও কুণ্ড—মানসী গঙ্গা, গোবিন্দকুণ্ড, চন্দ্রসরোবর, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, গোপালকুণ্ড, কুসুম সরোবর।

মস্তকশিলা—গোবর্ধন পর্বতের এক অংশে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক স্পর্শ হওয়ায় এই শিলা মস্তক-চিহ্ন সমন্বিত। যে এই শীলা দর্শন করে সে দেবতাগণেরও শিরোধার্য হয়।

চিত্রশিলা—গোবর্ধন পর্বতের যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ চিত্র অঙ্কন করেছিলেন তা এখনো আছে আর সেই সকল চিত্রিত শিলাযুক্ত স্থান চিত্রশিলা নামে খ্যাত।

বাদনীশিলা— এই স্থানে গোপবালকগণের সঙ্গে ক্রীড়া করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ শিলাবাদন করেছিলেন।

কন্দুক ক্ষেত্র—গোবর্ধন পর্বতের এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণের সঙ্গে কন্দুক ক্রীড়া করেছিলেন।

ঔষ্ণীষ তীর্থ—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে গোপবালকগণের উষ্ণীষ লুকিয়ে রেখেছিলেন।

দ্রোণ তীর্থ—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ পলাশ, কদম্ব পত্র দিয়ে দ্রোণ (বা পাত্র) নিয়ে দধি ভোজন করেছিলেন। এখনও এই স্থানের বৃক্ষদের পত্র দ্রোণাকৃতি আর বৃন্দাবনে এখনো পলাশ পত্রাদি দ্বারা প্রস্তুত পাত্রকে দ্রোণ বলে।

শৃঙ্গার মণ্ডল—গোবর্ধন পর্বতের এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীর সঙ্গে শৃঙ্গার বিলাস করেছিলেন।

লৌকিক তীর্থ—শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে গোপবালকগণের সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ক্রীড়া করেছিলেন।

শ্রীনাথ—শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্তিতে গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন, শৃঙ্গারমণ্ডলে এখনো তা বর্তমান আছে। (বল্লভাচার্য সম্প্রদায় কর্তৃক এমূর্তি এখনও নাথদ্বারে প্রতিষ্ঠিত এবং সেবিত)

অব্দাশ্চ চতুঃসহস্রানি তথা চাষ্টৌ শতানি চ।
গতাস্তত্র কলেরাদৌ ক্ষেত্রে শৃঙ্গারমণ্ডলে॥
গিরিরাজগুহামধ্যাৎ সর্বেষাং পশ্যতা নৃপ।
স্বতঃ সিদ্ধঞ্চ তদ্রুপং হরে প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥

(গর্গসংহিতা)

অর্থাৎ আজ থেকে চার হাজার আঠশ বছর ওই মূর্তি সেখানেই থাকবে এবং কলির প্রথম ভাগে তিনি স্বতঃসিদ্ধমূর্তি রূপে প্রকটিত হবেন। চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বৃন্দাবন দর্শনের বর্ণনায় আছে যে, রাত্রে হরিনাম করার সময় তিনি স্বপ্ন দেখলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমি গোবর্ধনের এক কুঞ্জে বাস করি, তুমি আমাকে উদ্ধার করে পর্বতের ওপর এক মঠ করে আমাকে স্থাপন করো'—

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। কবে আসি মাধব আমার করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার। দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রী গোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী। ব্রজের স্থাপিত আমি ইহা অধিকারী॥
শৈল উপর হইতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া। ম্লেচ্ছভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া॥
সেই হইতে রহি আমি এই কুঞ্জ স্থানে। ভালে আইলা তুমি আমা কাঢ়ি সাবধানে॥

(শ্রীশ্রীচতন্যচরিতামৃত)

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই মূর্তি উদ্ধার করে গোবর্ধন পর্বতের উপর এক প্রস্তর সিংহাসনে স্থাপন করেন। এই মূর্তিকে সজ্জনগণ 'দেবদমন' বা শ্রীনাথ বলে অভিহিত করে। ভারতে এই পঞ্চনাথ অতি পবিত্র। ভারতের চতুস্কোণে চারনাথ বিদ্যমান **জগন্নাথ, দ্বারকানাথ, রঙ্গনাথ** ও **বদ্রীনাথ** আর সকলের মাঝে শ্রীবৃন্দাবনে আছেন **শ্রীনাথ**। যে সমস্ত ভাগ্যবানের বৃন্দাবনে শ্রীনাথের দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়নি, তারা যদি নাথদ্বারে গিয়ে শ্রীনাথের দর্শন করেন তবে তাঁদের পঞ্চবিধ 'নাথমূর্তি' দর্শনের ফল লাভ হয়।

ইন্দ্রযাগ বন্ধে ইন্দ্রর রোষ

দেবর্ষি নারদের মুখ থেকে যখন দেবরাজ ইন্দ্র জানতে পারলেন যে, ব্রজবাসী গোপগণ তাঁর যজ্ঞ বন্ধ করে দিয়ে সেই যজ্ঞেরই উপকরণ দিয়ে পরম সমারোহে গোবর্ধন-যাগ অনুষ্ঠান করেছেন তখন আর তাঁর রাগের সীমা-পরিসীমা থাকল না। তিনি স্বর্গের অধিপতি, তেত্রিশ কোটি[১] দেবতা তাঁর অধীনে, উনপঞ্চাশ বায়ু এবং প্রলয়কালীন সংবর্তকাদি মেঘসমূহ তাঁর আজ্ঞাবহ ; তাই ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে তিনি স্থির করলেন ব্রজভূমি একেবারে ধ্বংস করে দেবেন। অতঃপর তিনি প্রলয়কালীন মেঘসমূহ এবং আবহ-প্রবাহ আদি প্রলয়কালীন বায়ুগণকে ব্রজভূমিতে প্রবল বর্ষণ ও ঝড় সৃষ্টির আদেশ দিলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে ব্রজবাসিগণ বংশ পরম্পরায় ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠান করে আসছেন কিন্তু এখন এক নরবালকের কথায় মোহবশত ইন্দ্রযাগের বদলে গোবর্ধন যাগের আয়োজন করেছে। এর সমুচিত শাস্তি না দিলে দেবগণের মান আর থাকবে না। স্বর্গের ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে ইন্দ্র সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকেও সামান্য নরবালকের ন্যায় অবজ্ঞা ও অবহেলা করতে কুণ্ঠিত হলেন না।

ইন্দ্র ক্রোধে আরক্ত নয়নে বলছেন—

অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্।

কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনম্॥ (ভাগবত ১০।২৫।৩)

অর্থাৎ কী আশ্চর্য ! এই বনবাসী গোপগণ ঐশ্বর্য গর্বে সামান্য এক নরবালকের কথায় দেবগণকেও অবজ্ঞা করল।

ইন্দ্র কিন্তু ভুলে গেলেন যে শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্বে পৃথিবী যখন দৈত্যভারে ভারাক্রান্ত তখন ব্রহ্মাসহ ইন্দ্রাদি দেবগণই পরিত্রাণ লাভের জন্য ক্ষীরোদসাগরে শ্রীবিষ্ণুর চরণে শরণাপন্ন হন ও স্তুতি করেন। সমাধিযোগে ব্রহ্মা তখন শুনতে পান যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবার ধরাতলে পূর্ণ অবতাররূপে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করবেন ও দেবগণ যেন নিজ নিজ অংশে সেখানে গিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এতে এটা স্পষ্ট যে শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশে

---

[১]'কোটি' শব্দের একটি অর্থ হল 'প্রকার'।

জন্মগ্রহণ করা ইন্দ্রের অজ্ঞাত নয়, কিন্তু ঐশ্বর্যমদের এমনই মোহ যে ইন্দ্র সে-সব কথা ভুলে গিয়ে আজ সেই স্বয়ং ভগবানকেই নরবালক বলে মনে করছেন ও নানাপ্রকার স্পর্ধা দেখাচ্ছেন। দেবরাজ ইন্দ্র এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পরমপ্রিয় ব্রজবাসী গোপগণের উদ্দেশে তর্জন গর্জন করে সাম্বর্তক মেঘগণকে বললেন—হে মেঘগণ ! তোমরা অবিলম্বে ব্রজধামে গমন করো, সেখানে তোমরা প্রবল বারিবর্ষণ, বায়ুগণ দ্বারা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত সঞ্চারণ এবং মুহর্মুহ বজ্রপাত করে অচিরাৎ নন্দগোষ্ঠের ধ্বংসসাধন করো। আমিও ঐরাবতে আরোহণ করে নিরন্তর বজ্রপাত, অশনী গর্জন, বৃষ্টি ও ঝটিকা সৃষ্টি করব।

ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ— ব্রজের গোপ-গোপীগণ প্রবল বৃষ্টির প্রারম্ভেই নিজের নিজের ঘরে ঢুকে পড়েন। কিন্তু যখন বৃষ্টি প্রবল হল তখন আর গৃহে থাকা নিরাপদ বলে মনে করলেন না। তাঁরা চিন্তা করলেন যে নন্দনন্দনের শরণগ্রহণ ছাড়া আর আত্মরক্ষার অন্য কোনো উপায় নেই। ব্রজবাসীগণ দ্রুতপদে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছে বললেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল॥ (ভাগবত ১০।২৫।১৩)

হে কৃষ্ণ ! তুমি আমাদের সর্বদুঃখহরণকারী, আমাদের বহুজন্মের সুকৃতিবশত তোমাকে পরম আত্মীয়রূপে লাভ করে কৃতার্থ হয়েছি। আমরা তোমা বিনা আর কিছু জানি না। তুমি আমাদের অনেকবার বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ, এবার কুপিত দেবরাজের অত্যাচার থেকে আমাদের রক্ষা করো। আমরা ইন্দ্রযাগ অনুষ্ঠান না করে তোমারই কথামতো গোবর্ধনযাগের অনুষ্ঠান করেছি বলেই মনে হয় দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধপরবশ হয়ে গোকুল ধ্বংসের উপক্রম করেছেন।

ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ, তাই তাদের অপ্রাকৃত দেহে বাতবর্ষাদিজনিত ক্লেশ অনুভবের কোনো কারণই নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রকট লীলায় নানাবিধ প্রাকৃত ভাবের অনুকরণ করেন, তাঁর পার্ষদগণও সেইরকম তাঁর লীলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যোগমায়ার প্রভাবে নিজ স্বরূপ ভুলে প্রাকৃত নরনারীর মতোই ব্যবহার করে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের গোপগণকে আশ্বাস প্রদান ও গোবর্ধন ধারণ—

গোকুল ধ্বংসের জন্য কৃতসংকল্প ও মহাক্রুদ্ধ দেবরাজকৃত অবিরল বর্ষণ, ঝঞ্ঝাবাত ও নিরন্তর বজ্রপাতে ত্রস্তব্যস্ত গো-গোপ-গোপিনীগণের অবস্থা দেখে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিত হলেন যে শরৎঋতুর শেষে (কার্তিক মাসে) এইরকম প্রবল বর্ষণ, ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রপাত প্রভৃতি সম্ভবই নয়। এ নিশ্চয় স্বর্গ ঐশ্বর্য অভিমানে মত্ত দেবরাজ ইন্দ্রের কীর্তি। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী গো-গোপ-গোপীগণের এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখী হলেন এবং ভাবলেন—

তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে।
লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদং তমঃ॥

(ভাগবত ১০।২৫।১৬)

আমি যোগমায়া শক্তির প্রভাবে এর সমুচিত প্রতিকার করব এবং মূঢ়তাবশত লোকপালাভিমানী ইন্দ্রাদি দেবগণের ঐশ্বর্যগর্ব খর্ব করব। তিনি ঠিক করলেন, ইন্দ্রের গর্ব খণ্ডন, ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবর্ধনের মাহাত্ম্য প্রচার আর পরম প্রিয় ব্রজবাসিগণের উদ্ধার সাধন—এই তিন অবশ্য ও আশু কর্তব্য আর দেরি না করেই করবেন। আমি আত্মশক্তি প্রভাবে এদের সবাইকে রক্ষা করব। শরণাগত প্রতিপালনই আমার জীবনের মহাব্রত। ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সমস্ত ব্রজবাসিগণকে আশ্বস্ত করে সমস্ত গো-গোপ-গোপীগণসহ গোবর্ধনতটে উপস্থিত হলেন এবং গোবর্ধন পর্বতকে সমূলে উৎপাটন করে বাম হস্তে ধারণ করলেন। তারপর তিনি দক্ষিণ কটিতে দক্ষিণ করতল স্থাপন করে, গ্রীবা বঙ্কিম করে এবং চরণের উপর চরণ স্থাপন করে অপূর্ব ভঙ্গীতে ছত্রধারী পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্ধনাচলম্।
দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব বালকঃ॥ (ভাগবত ১০।২৫।১৯)

লোকদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ সাত বছরের বালক হলেও তত্ত্বতঃ তিনি '**অনাদিরাদি গোবিন্দঃ**'। লোকদৃষ্টিতে তাঁর অবয়ব সাত বছরের বালকের মতো ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও তা ইয়ত্তাবিহীন।

এইজন্য মহাভারতে মহাত্মা তণ্ডীকৃত তাঁর সহস্র আট নামের বর্ণনায়

আছে তিনি **'অনির্দেশ্যবপুশ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক'** অর্থাৎ তিনি 'অনির্দেশ্যবপু' মানে শ্রীকৃষ্ণর মূর্তি বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ কিংবা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রভৃতি কিছুতেই নির্দেশ করা যায় না, তাঁতে সকলই সম্ভবপর। তাঁর 'শ্রীবিগ্রহ' পরম শোভাময়, তাঁর স্বরূপ 'অমেয়' অর্থাৎ মনোবাক্যের অতীত এবং তিনি 'গিরিবরধারী'। যাঁর লোমকূপ বিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধূলিকণার মতো লীন হয়ে যায় তাঁর পক্ষে যে এই কার্য অতীব অকিঞ্চিতকর তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনস্থিত মানসগঙ্গার উত্তরে অবস্থিত গোবর্ধন পর্বতের অংশ উৎপাটন করে বামহস্তে ধারণ করেন। তাই এখনও মানসগঙ্গার উত্তরে গোবর্ধন পর্বত বিচ্ছিন্ন দেখা যায় (শ্রীজীব গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষণী টীকা)। বরাহপুরাণে আছে শ্রীবরাহদেব পৃথিবীকে বলছেন—

তেষাং সংরক্ষণার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া।

সোঽন্নকুট ইতি খ্যাতঃ সর্বতঃ শক্রপূজিতঃ॥ (বরাহপুরাণ)

অর্থাৎ ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করার জন্য আমি গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলাম। আর গোবর্ধনের সেই অংশ অন্নকূট নামে বিখ্যাত এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই অংশকে পরমসমাদরে পূজা করেন। যাই হোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তের কনিষ্ঠ আঙুলে গিরিগোবর্ধন ধারণ করে, সমগ্র ব্রজবাসিগণকে বারে বারে পর্বতের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করলেন। ব্রজরাজ-নন্দন এইভাবে সপ্তাহাবধি গোবর্ধন পর্বতকে বামহস্তে ধারণ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণও তাঁকে ঘন মণ্ডলাকারে বেষ্টিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে অনিমিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সপ্তাহাবধি দাঁড়িয়ে রইলেন। এই সপ্তাহাবধি শ্রীকৃষ্ণের বা ব্রজবাসিগণের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা বা কোনোরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য হয়নি। এই সাতদিন তাঁদের কাছে যেন নিমেষমাত্র মনে হল। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণর যখন স্বর্গ ও ঐশ্বর্যমত্ত ইন্দ্রের গর্ব খণ্ডন করার ইচ্ছা জাগল, তখন যোগমায়ার প্রভাবে ইন্দ্রের বজ্র ও বাহুদ্বয় নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল হয়ে গেল এবং সুদর্শন চক্র দ্বারা গোবর্ধন পর্বতোপরিস্থ সাম্বর্তক মেঘমালা ছিন্নভিন্ন

হয়ে গেল আর সাম্বর্তক বায়ুবৃন্দ নিরুদ্ধ হয়ে গেল। গর্গসংহিতা ইন্দ্রের সম্বন্ধে বলছেন—

ভয়ভীতস্তদা শক্রঃ সাম্বর্তকগণৈঃ সহ।
দুদ্রাব সহস দেবৈর্যথেভঃ সিংহতাড়িতঃ।। (গর্গসংহিতা)

শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাব দেখে ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ সিংহতাড়িত গজের ন্যায় দেবগণ, সাম্বর্তক মেঘ ও বায়ুগণসহ দ্রুতবেগে পলায়ন করলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ আর কালবিলম্ব না করে তাঁর বামকরস্থিত গোবর্ধন পর্বতকে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য লীলা দেখে সমস্ত ব্রজবাসিগণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র ব্যতীত সব দেবগণ আনন্দে উৎফুল্লিত হলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন বিগ্রহ মূলসংকর্ষণ শ্রীবলদেব, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ লীলার শুরু থেকেই মৌন ও নিশ্চলভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছেন, ভাবছেন—ভাই কৃষ্ণ ! তোমার আবার এ কী অভিনব লীলা। এই ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে এত ক্লেশ সহ্য করার কী দরকার ছিল তোমার ! তুমি কি জান না আমারই অংশাবতার অনন্তনাগের মাথার ওপর এই বিশাল ভূমণ্ডল সরষের মতো অবস্থান করে। আমাকে ইঙ্গিত করলেই তো আমি গোবর্ধন পর্বত শূন্যে তুলে ব্রজবাসিগণকে তার তলায় স্থান করে দিতে পারতাম। আর তারই বা প্রয়োজন কী ? আমার অংশাবতার অনন্তদেবকে ইঙ্গিত করলেই তো সে তার সহস্র ফণা তুলে ব্রজভূমিকে আবরণ করে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করতে পারত। কিন্তু আমি বা আমার অংশাবতার অনন্তদেব যদিও তোমার আদেশ পালন, তোমার সেবার জন্য সদাই ব্যগ্র তবুও তুমি যে কেন গোবর্ধন ধারণের আয়াস স্বীকার করলে, তা তুমিই জান ?

শ্রীবলদেব এইরকম নানা চিন্তা করে অবশেষে এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে 'শ্রীকৃষ্ণের পরম অচিন্ত্য লীলার মহিমা একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত আর সবার অগোচর'। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভক্তবাৎসল্যাদি গুণে কখন কোন্ ভক্তের আনন্দবর্ধনের জন্য কোন্ লীলা করবেন, তা দর্শন, শ্রবণাদি ছাড়া অন্য প্রকার তত্ত্ব জানার প্রয়াস ব্যর্থ। অতএব 'হে কৃষ্ণ তোমার ভক্তবাৎসল্যময়ী এই

লীলার জয় হোক'—এই কথা মনে করে বলদেব দ্রুতপদে শ্রীকৃষ্ণর নিকটে এসে তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে প্রেমাশ্রুতে গণ্ড সিক্ত করতে লাগলেন।

এইভাবে স্বর্গ ও পৃথিবীতে আনন্দলোকের লহরী উঠল। **'তথাবিধান্যস্য কৃতানি গোপিকা গায়ন্ত্য ঈয়ুর্মুদিতা হৃদিস্পৃশঃ।'** (ভাগবত ১০।২৫।৩৩) শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক পরিবেষ্টিত হয়ে এবং গোপরমণীগণ তাঁদের পরমশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের পরমনির্বচনীয় লীলাবলী গান করতে করতে পরমানন্দে ব্রজের নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন।

ইন্দ্রর ভীতি, শ্রীকৃষ্ণর শরণগ্রহণ ও কৃষ্ণস্তুতি—দেবরাজ ইন্দ্র হতগর্ব হয়ে ব্রজ হতে অতি দীনভাবে স্বর্গে গমন করলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর মনে শান্তি এল না। তিনি যেন মহাভয়ে দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হতে লাগলেন। এই খবর পেয়ে দেবগুরু বৃহস্পতি একদিন তাঁর নিকটে এলেন। গুরুদেব বৃহস্পতি ইন্দ্রকে ভর্ৎসনা করে বললেন—হে দেবরাজ ! যদিও তুমি জিষ্ণু অর্থাৎ অসুর বিজয়ী তবুও শ্রীকৃষ্ণের চরণভজনা করোনি বলে কোনো প্রকার উন্নতিলাভ করতে পারোনি। স্বর্গের এই অতুল ঐশ্বর্যই তোমাকে সহস্র নয়ন থাকা সত্ত্বেও অন্ধ করে রেখেছে। তোমার এই দুঃসময়ে একমাত্র ব্রহ্মাই তোমাকে সৎপরামর্শ দানে সমর্থ, তাই তুমি সত্বর ব্রহ্মলোকে গমন করো। অতঃপর ইন্দ্র ব্রহ্মলোকে গেলেন এবং ব্রহ্মাকে নতজানু হয়ে সব অপরাধ নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা বললেন হায় ! হায় ! এ তুমি কী করেছো। তুমি বিবুধাধিপতি হয়েও অবোধের মতো কাজ করেছ। কিছুদিন পূর্বে আমিও একবার শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানতে গিয়ে (গোবৎস-গোপবালক হরণ) মহাধৃষ্টতা প্রকাশ করেছি আর সেই মহাপরাধের ক্ষমা চাওয়ার পথ আমি এখনও খুঁজে পাইনি। এরপর তুমি আবার এমন কাণ্ড করলে ! যাইহোক, গোজাতিতে স্বাভাবিক প্রীতিমান শ্রীভগবানকে যদি সন্তুষ্ট করতে চাও, তবে গোজাতির মাতা সুরভির নিকটে যাও।

ব্রহ্মার আদেশে দেবরাজ ইন্দ্র গোমাতা সুরভির চরণে পতিত হয়ে সব নিবেদন করলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজলোকের দিকে আগমন করলেন।

তারপর কার্তিক একাদশী তীথিতে বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরণে উপস্থিত হওয়ার সময় দেবরাজ ইন্দ্র নিজ বাহন ঐরাবত ও নিজ পার্ষদগণকে স্বর্গেই রেখে এসেছিলেন, কেননা বিনীতভাবে, বিনীত বেশেই প্রকৃত শরণাগতি প্রকাশ পায়। দেবরাজ যে ব্রজরাজ-নন্দনের এইরকম নির্জন স্থানে দর্শন পাবেন তা একবারও ভাবেননি। কিন্তু শরণাগতবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, আগে থেকেই দেবরাজের মনের অবস্থা বুঝে সেই মতো ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি গোবৎস-গোপবালকদের অন্যস্থানে পাঠিয়ে দেবরাজকে কৃতার্থ করার জন্য, কৃপাভাণ্ডারের দারোদ্‌ঘাটনের জন্যই যেন তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় বসে আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ লীলায় এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর চরণে শরণাগতি তো দূরের কথা যে শরণাগতির সংকল্পও করে, শ্রীকৃষ্ণ তার উপরে প্রীত হয়ে তার প্রতি কৃপার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখেন। গোবর্ধন লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাব দেখে ইন্দ্র মহাভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর বৃহস্পতি, ব্রহ্মা ও সুরভির নিকট শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণে ইন্দ্রের যে কী অবস্থা হল তা তিনি নিজেও ধারণা করতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণের চরণে নতজানু হয়ে জোড়করে উপবিষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র অতঃপর গদগদ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগলেন।

ইন্দ্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং
তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।
মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ॥ ৪

কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ তৎকৃতা
লোভাদয়ো যেঽবুধলিঙ্গভাবাঃ।
তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্তি
ধর্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায়॥ ৫

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো
দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।
হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে
মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্॥ ৬
যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিনস্ত্বাং
বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্।
হিত্বার্যমার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া
ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনম্॥ ৭
স ত্বং মমৈশ্বর্যমদপ্লুতস্য
কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবম্।
ক্ষন্তুং প্রভোঽথার্হসি মূঢ়চেতসো
মৈবং পুনর্ভূন্মতিরীশ মেঽসতী॥ ৮
তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ ভুবো ভরাণামুরুভারজন্মনাম্।
চমূপতীনামভবায় দেব ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্তিনাম্॥ ৯
নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥ ১০
স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে।
সর্বস্মৈ সর্ববীজায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ॥ ১১
ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ।
চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা॥ ১২
ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানাং ত্বামহং শরণং গতঃ॥ ১৩

সরলার্থ—ইন্দ্র বললেন, আপনার স্বরূপ পরম শান্ত, জ্ঞানময়, রজঃ এবং তমোগুণরহিত এবং বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত সত্ত্বময়। গুণসমূহের প্রবাহরূপে প্রতীয়মান এই মায়াময় সংসার কেবলমাত্র আপনার স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানের ফলেই আপনাতে আরোপিত হয়ে থাকে, এর কোনো পারমার্থিক সত্তা নেই (অথবা, গুণ-ত্রয়াত্মক, মায়াকৃত, অজ্ঞানোৎপন্ন এই সংসার আপনার মধ্যে

নেই)॥ ৪॥ অজ্ঞান এবং তারই কারণে প্রতীয়মান দেহাদির সঙ্গে আপনার কোনো সম্বন্ধই যখন নেই, তখন অন্য দেহাদি-প্রাপ্তির কারণভূত এবং দেহসম্বন্ধ থেকেই উৎপন্ন লোভ-ক্রোধ প্রভৃতি দোষই বা হে পরমেশ্বর ! আপনাতে কোথা থেকে হতে পারে ? এইসব দোষের অস্তিত্ব তো অজ্ঞানেরই লক্ষণ। এইভাবে যদিও অজ্ঞান এবং তার থেকেই উৎপন্ন জগতের সঙ্গে আপনার কোনো সম্বন্ধই নেই, তথাপি ধর্মের রক্ষণ এবং দুষ্টের দমনের জন্য ভগবান আপনি দণ্ড ধারণ করেন, অবতাররূপে নিগ্রহ-অনুগ্রহও করে থাকেন ॥ ৫ ॥ আপনি জগতের পিতা, গুরু ও অধীশ্বর। জগতের নিয়ন্ত্রণের জন্য দণ্ডধারী অনিস্তার কালও আপনি। ভক্তগণের প্রার্থনাপূরণ ও জগতের কল্যাণের জন্য আপনি স্বেচ্ছায় লীলাশরীর গ্রহণ করে প্রকটিত হয়ে থাকেন, এবং আমাদের মতো যারা নিজেদের ঈশ্বর বলে মনে করে অভিমানে মত্ত হয়, তাদের সেই মিথ্যা মান-গর্ব ধুলায় মিশিয়ে দেওয়ার ছলে নানাবিধ লীলা বিস্তার করেন॥ ৬ ॥ আমার মতো যেসব অজ্ঞ নিজেদের জগতের ঈশ্বর বলে মনে করে, তারা অতি ভয়ংকর সংকটের সময়েও আপনাকে সম্পূর্ণ নির্ভয় (এবং অবিচলভাবে সেই বিপদের নিরাকরণে তৎপর) দেখে অবিলম্বেই ঔদ্ধত্য ত্যাগ করে সর্বপ্রকার অভিমান-অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে সজ্জন-সেবিত ভক্তিমার্গ আশ্রয় করে আপনার ভজনা করে। এইরূপে আপনার প্রতিটি লীলাই দুষ্টদেরও দণ্ডবিধান করে তাদের সৎপথে ফিরিয়ে আনার উপায়-স্বরূপ হয়ে থাকে॥ ৭ ॥ প্রভু ! আমি ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে আপনার কাছে অপরাধ করেছি। আপনার শক্তি, আপনার প্রভাব সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না ! হে পরমেশ্বর ! আপনি কৃপা করে এই মূঢ় অবোধের এই অপরাধ ক্ষমা করুন, আর আপনার অনুগ্রহে আমার এইরকম দুর্মতি যেন আর কখনো না হয়॥ ৮ ॥ হে স্বয়ংপ্রকাশ ! হে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মা ! যে সব দুরাত্মা অসুর সেনাপতি পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে শাসনকর্তা বা দলপতিরূপে নিজেদের স্বার্থ তথা ভোগপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনেই নিযুক্ত আছে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীতে ভোগবাদী চিন্তাধারা এবং তার আনুষঙ্গিক সমস্ত প্রকার কুপ্রবৃত্তির জন্ম দিয়ে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে, তাদের নিঃশেষে ধ্বংস (এবং তার ফলে

তাদের মোক্ষের পথ সুগম করা) এবং অপরপক্ষে আপনার শ্রীচরণের সেবায় নিত্য-নিরত থেকে যাঁরা নিজেদের জীবনে সৎপথের অনুসরণ তথা পৃথিবীতে ধর্মীয় ভাবনার বিকাশ ও বিস্তারের পরিপোষকতা করে চলেছেন, সেই সাধুসজ্জনগণের সর্বথা রক্ষা ও অভ্যুদয় বিধানের জন্যই আপনার এই অবতার॥ ৯ ॥ হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্বান্তর্যামী পুরুষোত্তম তথা সর্বাত্মা বাসুদেব। যদুবংশীয়গণের একমাত্র রক্ষাকর্তা আপনিই। নিখিলজনচিত্তহারী হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে ভক্তবৎসল ! আপনাকে বারবার প্রণাম॥ ১০ ॥ আপনি জীব-সাধারণের মতো কর্মবশে নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, ভক্তগণের বাঞ্ছাপূরণের জন্য নিজের ইচ্ছায় নিজ শরীর ধারণ করেছেন, এবং আপনার এই শরীরও বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ। আপনি সর্বস্বরূপ, সর্ববীজ, সকলের আত্মা। আপনাকে পুনঃপুন নমস্কার করি॥ ১১ ॥ ভগবন্! আমার আত্মগর্বের আর শেষ নেই, ক্রোধও অত্যন্ত প্রবল, আমার নিয়ন্ত্রণের অতীত। আমি যখন দেখলাম যে আমার যজ্ঞ বন্ধ করে দেওয়া হল, তখন নিজেকে আর বশে রাখতে না পেরে, মুষলধার বর্ষণ এবং ঝঞ্ঝাবায়ুর দ্বারা সমগ্র ব্রজমণ্ডলকে ধ্বংস করার এই প্রয়াস করেছিলাম॥ ১২ ॥ কিন্তু প্রভু, আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে আমার গর্বেরও মূলোৎপাটন হয়ে গেছে। আপনিই আমার প্রভু, আমার গুরু, আমার আত্মা, আমি আপনার শরণ নিলাম॥ ১৩॥

ভগবানের মহিমা বর্ণনা (শ্লোক৪-৫)

শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকটে উপস্থিত হয়ে ইন্দ্র দেখলেন যে যদিও তিনি মহাপরাধী তবুও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ওপর কিছুমাত্র কোপ করেননি বা সেজন্য তাঁর কোনো প্রকার চিত্তবিকার হয়েছে বলেও মনে হল না। ইন্দ্র তখন স্তবে প্রবৃত্ত হয়ে বলছেন—

'বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।'

(ভাগবত ১০।২৭।৪)

হে ভগবন্! আপনার স্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় জ্ঞানস্বরূপ এবং পরম শান্ত।

আপনার সঙ্গে রজ ও তমোগুণের কোনো সম্বন্ধ না থাকায় আপনি পরম বিশুদ্ধ ও স্বপ্রকাশ।

শ্লোকটির বক্তব্য এই যে—ভগবান অনন্ত শক্তিসম্পন্ন হলেও প্রধানত তাঁর চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির কথা সর্বশাস্ত্রে পাওয়া যায় এবং এই উভয় শক্তিই সাধারণতঃ তাঁর লীলার সহায়। তারমধ্যে তাঁর স্বরূপ, তাঁর পার্ষদ আর শ্রীবিগ্রহ হল তাঁর চিচ্ছক্তির এবং জগৎ তাঁর মায়াশক্তির বিলাস। জীবগণ শ্রীভগবানের অংশ হলেও তারা অনাদিকাল হতে মায়াশক্তির অধীন হয়ে মায়াশক্তিরই বৃত্তি সত্ত্ব, রজ ও তমগুণময় দেহ ও আনুষাঙ্গিক গেহাদিতে আবিষ্ট হয়ে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে থাকে। ভগবান কিন্তু মায়াধীশ তাই তাঁর সঙ্গে মায়াবৃত্তি যেমন সত্ত্ব, রজ বা তমগুণের কোনো সম্পর্কই নেই। চিন্ময় ভগবানের কেবল চিচ্ছক্তির সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ। বিশুদ্ধ সত্ত্ব তাঁর এই চিচ্ছক্তিরই বৃত্তি বিশেষ আর বিশুদ্ধসত্ত্ব হতেই তাঁর সর্ববিধ লীলা প্রকাশ পায়। শ্রীভগবান যখন মায়িক জগতে তাঁর মায়াতীত লীলা প্রকাশ করে অসুরমারণ, ভূভার হরণাদি লীলা করেন তখনও তাঁর মায়িক সত্ত্ব রজ তমগুণের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই থাকে না। তাই ইন্দ্র বলছেন— হে ভগবন্ ! আমরা মায়িক জগতের জীবগণ মায়াবৃত্তি সত্ত্ব, রজ, তমগুণের অধীন হয়ে কখনো সৎকার্য কখনো বা কুকার্য করে থাকি, কিন্তু আপনি বিশুদ্ধসত্ত্বময় বলে আপনার কোনো চিত্তবিকার হয় না। আমি আপনার চরণে শতভাবে অপরাধী হলেও আপনি আপনার বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে আমার সর্ববিধ অপরাধ উপেক্ষা করে আমার ওপর কৃপা করার জন্য প্রসন্নচিত্তে অবস্থান করছেন।

ভগবানের অনুগ্রহ বর্ণনা (শ্লোক ৬)

হে ভগবন্ ! আপনি যখন জগতে আবির্ভূত হয়ে লীলা করেন তখনও দেখা যায় যে আপনি সজ্জনগণকে পালন করছেন ও দুর্জনগণকে নানাভাবে দণ্ডপ্রদান করছেন। এতে আপাতত আপনার লীলার বৈষম্য প্রতীত হলেও আপনাতে কোনো বৈষম্য নেই। আপনি সজ্জন ও দুর্জন উভয়কেই অনুগ্রহ ও দণ্ড দ্বারা কৃতার্থ করে থাকেন। আপনি জগতের গুরু, কাজেই গুরু যেমন শিষ্যের অধিকারানুরূপ শিক্ষা প্রদান করে থাকেন, আপনিও সেইরকম

জগতের সমস্ত জীবকে যথাযোগ্য শিক্ষাপ্রদান করে তাদের কৃতার্থ করে থাকেন। আপনি **'জগতামধীশো দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ'** (ভাগবত ১০।২৭।৬) অর্থাৎ আপনি জগতের অধীশ বা নিয়ন্তা, তাই আপনার শাসন কিংবা শিক্ষা প্রদান কখনও ব্যর্থ হয় না। আপনি যাকে যেভাবে শাসন বা শিক্ষা প্রদান করতে ইচ্ছা করেন, সে, সেইভাবে শাসিত বা শিক্ষিত হয়ে ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। আপনার প্রদত্ত শাসন-দণ্ড কিংবা শিক্ষা-দণ্ড সকলেরই পরম কল্যাণকর। আপনি অখণ্ডনীয় কালের ন্যায় অলঙ্ঘ দণ্ড ধারণ করে পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় বা শিষ্যের প্রতি গুরুর ন্যায় অনুগ্রহ বা দণ্ড বিধান করে থাকেন। জগতের জীবগণ নিজ কর্মফল ভোগের জন্য কর্মবাধ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু আপনি কাল ও সকল কর্মের নিয়ন্তা হওয়ায় একমাত্র আপনার নিজ ইচ্ছা হেতুই আপনি জগতে আবির্ভূত হয়ে নানা লীলা করে থাকেন। জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ববস্তু এবং সর্বজীবের আপনিই নিয়ন্তা, আপনিই পালক এবং আপনিই মূল। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবগণ প্রায়ই আপনার কর্তৃত্ব ভুলে গিয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র কর্তা বলে মনে করে এবং সেই দুরভিমান-বশত নানা কুকার্য করে। আপনি জগতে আবির্ভূত হয়ে সেই সমস্ত দুরভিমানগ্রস্ত জীবের অচ্ছেদ্য দুরভিমান খণ্ডন করে তাঁদের চিরকৃতার্থ করেন।

ইন্দ্রর দীনতা (শ্লোক ৭-১৩)

দেবরাজ ইন্দ্র এইভাবে জগৎপিতা, জগদ্‌গুরু ও জগন্নিয়ন্তারূপে শ্রীভগবানের স্বরূপ কীর্তন করে পরিশেষে বলছেন— হে ভগবন্‌ ! জগতে আমার মতো অনেক অজ্ঞ আছে, যারা আপনার কর্তৃত্ব ভুলে নিজেকেই কর্তা বলে মনে করে এবং সেই কর্তত্বাভিমানে আপনাকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। আপনি পরম মহান কাজেই জীবের এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যবহারের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না। কিন্তু আপনি যখন জগতে অবতীর্ণ হয়ে আপনার ভক্তগণের সঙ্গে বিবিধ লীলারসে মত্ত থাকেন, তখন আপনার সেই লীলাতেই অজ্ঞ জীবের শিক্ষা হয়ে যায় এবং তারা স্বতন্ত্রতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ করে আপনার শ্রীচরণের শরণাগত হয়। অন্যের কথা আর কী বলব,

আমি এমন অজ্ঞ যে আপনি স্বয়ং জগতে অবতীর্ণ হয়ে আপনার প্রেমবাণ ভক্তদের সঙ্গে লীলাবিলাস করছেন দেখেও আমি কিছুই ধারণা করতে পারিনি। উল্টে আমার যজ্ঞ বন্ধ করে গোবর্ধনযাগ করার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্রপাত, বারিবর্ষণ দ্বারা তাদের বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম। তারপর আপনার লীলাতেই আমার চৈতন্য সঞ্চার হল আর আমি সর্ববিধ অভিমান থেকে মুক্ত হয়ে আপনার চরণে শরণাগত হতে সমর্থ হলাম। হে প্রভু ! তাই বলছি '**ইহা খলানামপি তেহনুশাসনম্**' (১০।২৭।৭) অর্থাৎ আপনার লীলাই খলপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের শাসনদণ্ড। সূর্যোদয় হলে যেমন জগতের অন্ধকার রাশি আপনিই দূর হয়ে যায় তেমন আপনার লীলা প্রকাশ হলেই সকলের সব অভিমান আপনিই দূর হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্রতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্তে আপনার চরণে শরণাগতির প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। আপনি আমাকে স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেছেন বলেই আমি আজ বিপুল ঐশ্বর্য ও তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর আধিপত্য বিস্তার করছি। কিন্তু আমি এমন মূঢ় যে ঐশ্বর্যগর্বে অন্ধ ও আত্মহারা হয়ে আপনার পরম প্রিয় ব্রজবাসিগণের প্রতি অত্যাচার করতেও কুণ্ঠিত হইনি। যদিও আমার এই মহাপরাধের ক্ষমা প্রার্থনাও আর একটি অপরাধতুল্য ; তাও আমি নিতান্ত মূঢ়, তাই প্রার্থনা করছি আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জনা করুন।

দেবরাজ ইন্দ্র, এইভাবে পুনঃ পুনঃ ব্রজরাজনন্দনের চরণে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে পরিশেষে বলছেন—হে অন্তর্যামিন্ ! আপনাকে আর কী বলব ! আপনি যে অযাচিত করুণাবশত আমার মহাগর্ব-পর্বত চূর্ণ করেছেন, সেই অযাচিত করুণাতেই আমাকে আপনার চরণে চিরশরণাগত করে এই মহাপরাধী জীবাধমকে চিরকৃতার্থ করুন।

ভগবানের অনুগ্রহ (শ্লোক ১৫—১৭)

ময়া তেহকারি মঘবন্ মখভঙ্গোহনুগৃহ্নতা।
মদনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্রশ্রিয়া ভৃশম্॥ ১৫

মামৈশ্বর্য শ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্‌ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্॥ ১৬
গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনম্।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জিতৈঃ॥ ১৭

সরলার্থ—শ্রীভগবান বললেন, ইন্দ্র ! তুমি ঐশ্বর্যগর্বে, বিশেষত ইন্দ্রত্ব পদাধিকারবলে দেবরাজ্যলক্ষ্মীকে লাভ করে সম্পূর্ণরূপেই মদমত্ত হয়ে উঠেছিলে। এইজন্য তোমাকে অনুগ্রহ করবার ইচ্ছাতেই আমি তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করেছিলাম। এর ফলে এখন থেকে তুমি নিত্য-নিরন্তর আমাকে স্মরণ করবে, এই ধ্রুবা স্মৃতি তোমার চিত্তে সতত জাগরূক থেকে তোমাকে আর পথভ্রষ্ট হতে দেবে না॥ ১৫ ॥ প্রভুত্ব ও ধনসম্পত্তির গর্বে অন্ধ হয়ে লোকে দণ্ডধর (সর্বান্তক সর্বনিয়ন্তা কালস্বরূপ) আমাকে দেখতে পায় না। কিন্তু যাকে আমি অনুগ্রহ করতে চাই, তাকে সম্পদভ্রষ্ট করে থাকি ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্র ! তোমার মঙ্গল হোক। এবার তুমি নিজ রাজধানী অমরাবতীতে গমন করো এবং আমার আজ্ঞা পালন করো। এরপর থেকে সর্ব দর্প-অহংকার বর্জন করে চলার চেষ্টা করো। সর্বদা আমার সান্নিধ্য, আমার সংসর্গ অনুভবে রেখো এবং নিজ অধিকারে অপ্রমত্ত থেকে যথোচিতভাবে দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত থাকো॥ ১৭ ॥

মূলভাব—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের স্তুতি শুনে তাঁর প্রতি কিছুক্ষণ প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন— হে দেবরাজ ! তুমি ভীত কিংবা বিচলিত হয়ো না। আমি তোমার ব্যাপারে একটুকুও ক্রুদ্ধ হইনি। প্রতিবৎসর গোবর্ধনতটে তোমার যজ্ঞ হত, কিন্তু আমি এবার তার পরিবর্তে গোবর্ধন যাগের প্রবর্তন করেছি বলে তোমার ক্ষুণ্ণ বা ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কেননা আমার প্রবর্তিত গোবর্ধনযাগ প্রতিবছরই তোমার মনে একবার করে আমার স্মৃতি জাগিয়ে দিয়ে তোমার ইন্দ্রপদের মোহনিদ্রা কাটিয়ে দেবে। তোমার এই ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ আসলে তোমার প্রতি আমার দণ্ডবিধান নয়, এ আমার পরমানুগ্রহ দান। তুমি আমাকে তুচ্ছ বালক জ্ঞান করছো আর আমার প্রিয় ব্রজবাসিগণকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলে। আমি যদি তোমার ব্যবহারে রুষ্ট হতাম তা হলে তোমার গর্ব খণ্ডন না করে তোমার

অলক্ষে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করতাম আর তোমার শক্তি লোপ করে দিতাম। কিন্তু আমি তোমার সমক্ষেই গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে তোমাকে আমার প্রভাব দেখালাম, তাতে তোমার গর্ব চূর্ণ হল এবং তোমাকে আমার শরণাগত করালাম।

মামৈশ্বর্য শ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।

তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্‌॥ (ভাগবত ১০।২৭।১৬)

যারা রাজ্য, ঐশ্বর্য, কুল, বিদ্যা প্রভৃতিতে অন্ধ হয়ে যায়, তারা আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। তবে তাদের মধ্যেও যারা আমার অনুগ্রহ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তাদেরই আমি সর্ববিধ গর্বের হেতু ঐশ্বর্য, বল, বীর্য ইত্যাদি হরণ করে থাকি এবং আমার চরণে শরণাগত হওয়ার অধিকার প্রদান করি।

আসলে মায়ামুগ্ধ জীবগণ, যতক্ষণ তাদের আত্মশক্তিতে কোনো কার্য করতে সমর্থ হয় ততক্ষণ তারা কিছুতেই আমার চরণে শরণাগত হতে পারে না। তাদের এই আত্মশক্তি যে আমারই দান তা তারা ধারণা করতে পারে না। আমার অনুগ্রহে যখন তাদের আত্মশক্তি পদে পদে ক্ষুণ্ণ হয়, ঐশ্বর্য বীর্যাদি নিষ্ফল হয়, তখনই তারা কায়মনোবাক্যে আমার শরণাগত হতে পারে। তাই হে দেবরাজ ! তুমি নিশ্চিন্তবুদ্ধিতে স্বস্থানে গমন করো। আমি রুষ্ট হয়ে তোমার গর্ব চূর্ণ করেছি বলে মনে কোরো না, আমি তোমার ওপর পরম সন্তুষ্ট বলেই তোমাকে তোমার এই মহাগর্বের থেকে মুক্তিদান করেছি।

ব্রজরাজনন্দনের এই অভয়বাণী শুনে দেবরাজ আশ্বস্ত হলেন ও দীননয়নে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করলেন— হে করুণাসিন্ধো ! আপনি আপনার স্বভাবসিদ্ধ করুণাবশত যদিও আমার সর্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করলেন, কিন্তু আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ বহির্মুখতাবশত আপনার এই অযাচিত করুণা চিরদিন ভোগ করতে পারব বলে মনে হয় না। আপনার চরণপ্রান্ত থেকে আমি যেমনই স্বর্গরাজ্যে যাব তখনি আমার বিষয়ী স্বভাববশত নানাবিধ দুর্বাসনা জেগে উঠবে এবং আমি আপনার অযাচিত করুণার কথা ভুলে আবার মহাপরাধ সাগরে মগ্ন হয়ে যাব। অতএব হে দীনজন-পরিচালক। আপনি

আমাকে এই কৃপা করুন যাতে আমার আর আপনার চরণপ্রান্ত ছেড়ে অন্যত্র কোনো আকর্ষণ না থাকে। আমি যেন তুচ্ছ কীটাণুকীট বা শুষ্ক তৃণগুচ্ছ হয়েও এই ব্রজভূমিতে পড়ে থাকতে পারি, তাহলে আমি আমার মহাভিমানময় ইন্দ্রপদ অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে কৃতার্থতা লাভ করতে পারি। দেবরাজ ইন্দ্রের এই ইঙ্গিত পেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে দেবরাজ তোমার মঙ্গল হোক, তুমি স্বর্গরাজ্যে গমন করো এবং সর্ববিধ অভিমান ত্যাগ করে নিজ অধিকারে স্বর্গরাজ্য পালন করো। আমার আজ্ঞা পালন করলেও আমার সেবা করা হয়। তুমি যদি ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত থেকে আমার আজ্ঞাপালন বুদ্ধিতে স্বর্গাধিপত্য ভোগ করো তবে তাও আমার সেবা করা হবে এবং আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকব।

ব্রজরাজনন্দনের এই আদেশবাণী শুনে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে গমন করে দেবরাজ্য পালন এবং নিরন্তর তাঁর চরণস্মরণই জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে স্থির করলেন। কিন্তু তাহলেও শ্রীকৃষ্ণ আর কোনো আদেশ প্রদান করেন কিনা তা জানার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রজভূমি ত্যাগ না করে করজোড়ে একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুরভির স্তুতি (শ্লোক ১৯—২১)

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত॥ ১৯
ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে।
ভবায় ভব গোবিপ্র-দেবানাং যে চ সাধবঃ॥ ২০
ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা নোদিতা বয়ম্।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে॥ ২১

সরলার্থ—সুরভি বললেন, হে কৃষ্ণ! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ! হে মহাযোগী! হে বিশ্বস্বরূপ, বিশ্বান্তর্যামী, বিশ্বকারণ! হে অচ্যুত! সর্বলোকের অধীশ্বর আপনাকে আমাদের রক্ষাকর্তারূপে পেয়ে আমরা সনাথ হলাম॥ ১৯ ॥ আপনি জগতের প্রভু, কিন্তু আমাদের কাছে আপনিই পরম

দেবতা। প্রভু ! ইন্দ্র যেমন ত্রিলোকের অধিপতি আছেন থাকুন, কিন্তু গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং সাধুগণের রক্ষা এবং কল্যাণের জন্য আপনিই আমাদের ইন্দ্র হোন॥ ২০ ॥ পিতামহ ব্রহ্মার অনুপ্রেরণায় আমরা আপনাকে আমাদের ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করব। হে বিশ্বাত্মা ভগবান ! আপনি পৃথিবীর ভার হরণের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ২১ ॥

মূলভাব—দেবরাজ ইন্দ্র যখন নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষার জন্য ব্রজরাজ-নন্দনের কাছে এসেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে গোজননী সুরভি, নারদাদি ঋষিগণ, অগ্নি, সোম, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ, তুম্বরু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ এবং সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, অপ্সরা এবং দেবমাতৃকাগণও এসেছিলেন। কিন্তু বহুজন সঙ্গে থাকলে বিনীতভাব অপেক্ষা উদ্ধত ভাবেরই অধিক প্রকাশ পায় বলে গোজননী সুরভি, দেবরাজ ইন্দ্রকে একাকী শ্রীকৃষ্ণচরণে পাঠিয়ে নারদাদি ঋষিগণ এবং অন্যান্য দেবগণসহ কিছু দূরে অবস্থান করছিলেন। এখন দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদেশ পেয়ে তাঁর একপাশে করজোড়ে নতবদনে দণ্ডায়মান দেখে, পরম মনস্বিনী গোজননী সুরভী নিজ সন্তানবর্গসহ ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের চরণাগ্রে উপস্থিত হলেন এবং পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণাম করে দৈন্য ও আর্তিপূর্ণ বাক্যে গোপরূপী মহামহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করে নিজ মনোভাব জ্ঞাত করতে প্রবৃত্ত হলেন। যদিও গোমাতা সুরভী ইন্দ্রের সঙ্গে এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করতে, কিন্তু যখন তিনি স্তুতি করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন ইন্দ্রর অপরাধ মার্জনার কোনো কথাই বললেন না। কারণ সুরভী জানেন সর্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই কৃতকর্ম ও মনোবৃত্তি অবগত আছেন, তাই তাঁর নিকট ইন্দ্রের অপরাধ ব্যক্ত করা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যিনি সর্বজীবের প্রতি সদাই প্রসন্ন তাঁকে কৃপা করার জন্য অনুরোধ করা অপেক্ষা তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর অযাচিত কৃপা গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করাই সমীচীন।

সুরভী স্তুতিতে প্রবৃত্ত হয়ে বলছেন—হে কৃষ্ণ ! আপনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সর্বজগতের নিয়ন্তা ও মূলস্বরূপ। জগতে যে যাই করুক না কেন, আপনার অন্তঃপ্রেরণাই তার কারণ। যদিও আমি বলার আগেই আপনি আমার মনোবৃত্তি অবগত আছেন তবুও আমি কেবল আপনার মহিমা কীর্তন করেই কৃতার্থ হব।

হে লোকনাথ ! আপনি ধূলিকণা থেকে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত, আবার কীটাণু থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলেরই পালক। কিন্তু আপনার বর্তমান লীলায় মনে হয় যেন আপনি কেবলমাত্র আমাদেরই (গোজাতির) পালক। আপনার চরণে আর কী নিবেদন করব। আপনি এই গোপালন লীলাতেই গো-ব্রাহ্মণ এবং দেবতাকে পালন করেছেন আর এই লীলাতেই জগৎ কৃতার্থ করেছেন। আপনি সকলের আরাধ্য হলেও আমাদের বিশেষ আরাধ্য এবং সকলের ঈশ্বর হলেও আমাদের বিশেষ ঈশ্বর।

গো-জননী সুরভী এইভাবে গোপালক-লীলাবিলাস শ্রীভগবানের গোপালন লীলার কারণ ও বিশেষত্ব দেখিয়ে পরিশেষে বলছেন—হে প্রভু ! আজ আমরা আপনাকে গো-গণের অধিপতি (ইন্দ্র)রূপে অভিষিক্ত করব। যদি বলেন 'ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে এই পদে অধিষ্ঠিত করেছেন, তাই এতে তাঁর নিয়ম লঙ্ঘন হবে', তবে বলতে হয় যে আমরা ব্রহ্মার আদেশেই আপনাকে গোগণের ইন্দ্ররূপে অভিষিক্ত করতে এসেছি। ব্রহ্মা আপনার গোবৎসাদি হরণ করে মহাপরাধ করেছেন বলে আপনার সামনে আসতে সাহসী হননি তাই আমাদেরকেই আপনার চরণ নিকট পাঠিয়েছেন। হে ভগবন্ ! যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করলে তার শাখাপত্রাদি সমস্তই সজীব হয়, সেইরকম আপনার চরণ সেবা করলে সর্বজগতের সেবা হয় এবং সর্বজগতের পুষ্টি হয়। বিশেষত আপনি পৃথিবীর ভার হরণ করতে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাই আমরা যে আপনার মহাভিষেক করে সেবা করতে মনস্থ করেছি তা জগতের কল্যাণের জন্য, তাই আপনার সেটি অনুমোদন করা উচিত। হে জগজ্জীবন ! কৃপা করে জগতের আনন্দবর্ধনের জন্য আমাদের এই প্রার্থনা অনুমোদন করুন।

গো-জননী সুরভী এইভাবে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করলে শ্রীকৃষ্ণ কিছু বললেন না কিন্তু প্রসন্ন দৃষ্টিতে একবার মাত্র তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। এতেই সুরভী পরমানন্দে অধীরা হয়ে, ব্রজের সমস্ত গোগণের সঙ্গে মিলে ব্রজরাজনন্দনের অভিষেক করতে প্রবৃত্ত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও তখন পরমানন্দে জয় জয় ধ্বনি করতে করতে দেবমাতৃকা ও দেবর্ষিগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের চরণ সমক্ষে উপস্থিত হয়ে সুরভী কৃত অভিষেক মহোৎসবে

যোগদান করলেন। সমস্ত গোগণ নিজ নিজ স্তনক্ষরিত বিমল-দুগ্ধধারায় ও নয়নপথে বিগলিত প্রেমাশ্রুধারায় শ্রীকৃষ্ণচরণ বিধৌত করে অভিষেক করলেন।

ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং নোদিতো দেবমাতৃভিঃ।
অভ্যষিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ॥

(ভাগবত ১০।২৭।২৩)

ইন্দ্রও মহাভিষেকে প্রবৃত্ত হয়ে, ঐরাবতের শুণ্ডধৃত রত্নঘটে করে আকাশগঙ্গার জলাহরণপূর্বক পরমানন্দে গোপরাজনন্দনের চরণে সমর্পণ করে অভিষেক করলেন। তখন সকলে মিলে গোপালন লীলাবিলাসী গোপরাজনন্দনকে 'গোবিন্দ' নামে উচ্চারণ করে, তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন।

স্কন্ধপুরাণে আছে, যে স্থানে গোজননী সুরভী গোবিন্দাভিষেক করেছিলেন সে স্থান **'গোবিন্দকুণ্ড'** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করল। আর যে স্থানে ইন্দ্র গোবিন্দাভিষেক করেছিলেন সেই স্থান বরাহপুরাণে **'শক্রকুণ্ড'** নামে উল্লিখিত। এই গোবিন্দাভিষেকের সময় স্বর্গবাসিগণ পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন, আর পৃথিবীর আনন্দের কথা আর কী বলব ! গোবিন্দাভিষেকের সময় গোগণের স্তনক্ষরিত দুগ্ধধারায় পৃথিবীর নদ-নদীসমূহে ক্ষীরধারা প্রবাহিত হতে লাগল। পৃথিবীস্থিত ক্ষেতসমূহ আর চাষবাসের অপেক্ষা না করে আপনা আপনি শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। গোবিন্দাভিষেকের সময় সর্বত্র এমন এক শান্ত স্নিগ্ধ ভাবধারার প্রবাহ খেলে গেল যে—তাতে ত্রিভুবন থেকে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলো যেন একেবারে মুছে গেল আর ময়ূর-সাপ, বিড়াল-ইঁদুর, হরিণ-বাঘ, দেব-দানব প্রভৃতি স্বাভাবিক বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন জীবগণ পর্যন্ত একত্রে মিলিত হয়ে স্নিগ্ধভাবে গোবিন্দাভিষেক মহোৎসবের পরমানন্দ উপভোগ করতে লাগল।

দেবরাজ ইন্দ্র এই প্রকারে গোজননী সুরভী, দেবমাতৃকা এবং দেবর্ষিগণের সঙ্গে গোবিন্দাভিষেক মহোৎসব নির্বাহ করে, পুনঃপুনঃ গোবিন্দ চরণে প্রণাম ও তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে ধীরে ধীরে স্বর্গাভিমুখে অগ্রসর হলেন।

———o———

বরুণের অনুচর কর্তৃক নন্দরাজকে বরুণালয় আনয়ন, বরুণস্তুতি (দশম স্কন্ধ—২৮ অধ্যায়)

প্রাক্‌কথন

পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন লীলায় ইন্দ্রের ঐশ্বর্যগর্বান্ধতা, শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাব প্রকাশ এবং পরিশেষে ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগতির কথা বর্ণনা করে জলাধিপতি বরুণেরও ওই একপ্রকার ঐশ্বর্যমত্ততা এবং শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাব প্রকাশের কথা বর্ণনা করেছেন। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং গোজননী সুরভী ব্রজে এসে ব্রজরাজনন্দনের অভিষেক মহোৎসব সম্পন্ন করেছিলেন এবং সেইদিনই শেষরাত্রিতে এই অভিষেক লীলা সংঘটিত হয়।

নন্দ, উপনন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসী গোপগণ সকলেই পরম বৈষ্ণব এবং তাঁরা সকলেই একাদশী তিথিতে যথাবিধি উপবাস, শ্রীভগবৎ পূজা ও শ্রীভগবৎ প্রসঙ্গে রাত্রি জাগরণ করে পরে দ্বাদশীর দিনে প্রত্যুষে পারণাদির অনুষ্ঠান করতেন। কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশীতে ইন্দ্রাদি দেবগণ বজ্ররাজনন্দনের গোবিন্দাভিষেক করেন এবং সেইদিনই ব্রজগোপগণ একাদশী ব্রত পালন করে দ্বাদশীর ব্রাহ্মমুহূর্তে পারণের সময় উপস্থিত দেখে, যমুনায় স্নান ও নিত্যকৃত্যাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলেন। মধ্যরাত্রির পর হতে সূর্যোদয়ের চার দণ্ড পূর্ব পর্যন্ত সময়, শাস্ত্রে আসুরকাল বলে প্রসিদ্ধ এবং সেই সময় স্নানাদি সর্ববিধ কার্যই নিষিদ্ধ আছে। এই সময়ে জলাধিপতি বরুণের অসুর ভৃত্যগণ নদনদী প্রভৃতি জলাশয় রক্ষা করে। গোপরাজ নন্দ শাস্ত্রনিষিদ্ধ আসুরকালে যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্পর্ধা বা নাস্তিকতাবশত তা করেননি, করেছিলেন শাস্ত্রাজ্ঞা পালন করে দ্বাদশীমধ্যে পারণ নির্বাহ করতে। কিন্তু আসুর স্বভাববশত বরুণের অনুচরগণ এসব বিবেচনা না করেই নন্দ মহারাজকে বরুণালয়ে নিয়ে গেলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে বর্তমানে আসুরকালে কেউ যদি জলে নামে তাহলে তো বরুণের অনুচরগণ কোনো শাস্তি প্রদান করেন না ? আসলে বক্তব্য এই যে—কলিকালে মানুষের অবস্থা এতই হীন যে, অসুরগণ পর্যন্ত তাদের তুচ্ছ

বুদ্ধিতে পশুপাখির মতো উপেক্ষা করে থাকে। কাজেই শাস্ত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন করেও কাউকে দণ্ডভোগ করতে হয় না। এটা অবশ্য পরম সত্য যে শাস্ত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন করে তারা হাতে হাতে কোনো দণ্ড না পেলেও তারা চিরকাল নানাবিধ কামনা, বাসনা, জরা ব্যধি ও অন্তহীন জন্ম ও মৃত্যুর প্রবল পীড়ন ভোগ করতে থাকে— এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যদি বিষ্ঠাকূপে ডুবে থাকে তবে রাজপুরুষরাও তাকে ধরে আনতে ঘৃণা বোধ করে, সেইরকম ভোগবাসনা সর্বস্ব বিষ্ঠাকূপে যে কলিহত জীব ডুবে আছে, সে বরুণদেবের অনুচর বা দৈবপুরুষদের থেকে নিষ্কৃতি পেলেও বিষয়-বিষ্ঠাকূপ থেকে মুক্ত হতে পারে না। এটাই এ জন্মে তাদের দণ্ডভোগ।

যাইহোক হঠাৎ নন্দরাজ যমুনায় স্নান করতে করতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় তাঁর সঙ্গী গোপগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও আর্তনাদ করতে লাগলেন। ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ যদিও এই ঘোর রজনীতে নিজের ঘরে শুয়েছিলেন কিন্তু তাঁর একান্ত ভক্তের যে কোনো প্রকার দুঃখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন। তিনি যখন জানতে পারলেন পিতা যমুনাগর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তখনই তিনি বুঝতে পারলেন যে—বরুণ ভৃত্যগণই তাঁকে নিয়েছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ আর কালমাত্র বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ বরুণলোকে গমন করলেন।

জলাধিপতি বরুণ, হঠাৎ নিজ গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে আসতে দেখে বিস্ময় ও সম্ভ্রমে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন — সর্বেন্দ্রিয়র অতীত এবং সর্বনিয়ন্তা ভগবান আজ আমার নয়ন গোচর হলেন, এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে ? আমার কোন জন্মের কত পুণ্য ছিল জানি না, কেননা আজ আমার বাসস্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাকে কত কোটি কোটি যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, শেষ-শিব-সনক-নারদ-ব্রহ্মাদিও তীব্র ধ্যানের দ্বারা পান না, তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন। বরুণদেব তাঁর বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কোনো ত্রুটি না রেখে সেই মহামহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মহাপূজা সম্পাদন করলেন। তিনি ভগবানের দর্শন দান, নিজ ভবনে পদার্পণ ও পূজাগ্রহণ প্রভৃতি অযাচিত মহৎকৃপার কথা মনে করে পরমানন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। অতঃপর জলাধিপতি বরুণ শ্রীকৃষ্ণের চরণাগ্র ভূমিতে পুনঃ পুনঃ প্রণতি করে গদগদভাবে তাঁর স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন।

বরুণ স্তুতি (দশম স্কন্ধ ২৮ অধ্যায় শ্লোক ৫—৮)

অদ্য মে নিভৃতো দেহোঽদ্যৈবার্থোঽখিগতঃ প্রভো।
ত্বৎপাদভাজো ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ॥ ৫
নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা॥ ৬
অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্যবেদিনা।
আনীতোঽয়ং তব পিতা তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি॥ ৭
মমাপ্যনুগ্রহং কৃষ্ণ কর্তুমর্হস্যশেষদৃক্।
গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল॥ ৮

সরলার্থ— বরুণ বললেন—প্রভু ! আজ আমার দেহধারণ সার্থক হল। আজই আমার সর্ব পুরুষার্থ সিদ্ধি তথা চরম ও পরমপ্রাপ্তি ঘটল। কারণ আজ আমার আপনার চরণসেবার শুভযোগ উদয় হয়েছে। অন্তবিহীনরূপে প্রতীয়মান এই যে জীবযাত্রার পথ, যা বেয়ে চলা শুরু হয়েছিল কোনো স্মরণাতীত আদিকালে, তার শেষ, তার পার দেখতে পেয়েছে তো তারাই, হে ভগবন্! যারা পেয়েছে ওই রাতুল চরণের আশ্রয়॥ ৫ ॥ আপনি বেদান্তিগণের ব্রহ্ম, যোগীদের পরমাত্মা, ভক্তদের ভগবান। বিবিধ লোকসৃষ্টির কল্পনা-বৈচিত্র্যপটীয়সী মায়ার কোনো অস্তিত্বই আপনার স্বরূপে নেই, শ্রুতি (বেদবিদ্যা) এইরূপ বলে থাকেন। আমি আপনাকে নমস্কার করি॥ ৬ ॥ প্রভু ! আমার এই সেবকটি অত্যন্ত মূর্খ, নিজের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই। সেই আপনার পিতৃদেবকে এখানে নিয়ে এসেছে, আপনি দয়া করে তার অপরাধ ক্ষমা করুন॥ ৭ ॥ হে গোবিন্দ ! হে পিতৃবৎসল ! এই আপনার পিতা গোপরাজ নন্দ, আপনি এঁকে নিয়ে যান। আর আপনি তো সর্বান্তর্যামী, সর্বসাক্ষী, আপনি জানেন যে এই প্রার্থনা আমার অন্তরের—হে মোহন, হে সর্বহৃদয়হারী কৃষ্ণ, আমার ওপরে যেন আপনার কৃপা থাকে॥ ৮ ॥

মূলভাব—ব্রজরাজনন্দনের স্তব করতে প্রবৃত্ত হয়ে বরুণ বলছেন—হে প্রভো ! আপনি অচিন্ত্য, অনন্ত মহাপ্রভাবশালী। সেইজন্য আমার মতো

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের ঘরে পদার্পণ করতে আপনি কোনোই দ্বিধা করেননি। জগতে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো প্রকারে সামান্যও ধন, বিদ্যা কিংবা কুল প্রভৃতির মর্যাদা লাভ করে তবে সে কখনও তদপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন ব্যক্তির গৃহে অযাচিতভাবে পদার্পণ করে না। কিন্তু আপনার কৃপার কী অসীম মহাপ্রভাব, আপনি আমার মতো ক্ষুদ্র দেবাধমকেও কৃতার্থ করতে কুণ্ঠিত হন না।

আপনার কৃপার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা আমার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভবপর নয়। আপনার এই অযাচিত কৃপাভাজন হয়ে আজ আমার মনে হচ্ছে যে—আমার অনাদি কর্মফলে পুনঃপুনঃ আমার যে দেহধারণ তা আজ সফল হল। আমার মনে হয় যে, যদি কেউ পাপে-পুণ্যে, দুঃখে বা সুখে যে কোনোভাবে জীবনযাপন করে তার দেহ রক্ষা করতে পারে তবে সেও আমার মতো আপনার অযাচিত কৃপালাভে কৃতার্থ হতে পারে। আমি মহাপরাধী হলেও আজ কৃতার্থ হলাম আপনার এই অযাচিত কৃপালাভে। আজ আমার পরমপুরুষার্থ লাভ হল, আমি সর্ব-রত্নাকরপতি হয়েও আপনার কৃপাকণিকা প্রাপ্তির অভাবে এতদিন দীনাতিদীন ছিলাম, কিন্তু আজ আপনার কৃপালাভ করে মনে হচ্ছে আমার অপেক্ষা আর ধনী কেউ নেই। জলাধিপতি বরুণ এইভাবে শ্রীভগবানের কৃপাসিন্ধুর মহাপ্রভাব বর্ণনা করে অতঃপর বলছেন, হে ভগবন্ আপনার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম—‘**নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে**’ (ভাগবত ১০।২৮।৬)।

বরুণ এই প্রকারে ব্রজরাজনন্দনের স্তুতি, পুনঃ পুনঃ প্রণতি এবং চরণে শরণাগতি প্রার্থনা করেও যখন তাঁর কোনো কৃপাদেশ পেলেন না, তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন— আমার মূঢ় ভৃত্যগণ, গোপরাজ নন্দকে যমুনা হতে আমার গৃহে নিয়ে এসে যে মহাপরাধ করেছে সেইজন্যই বোধ হয় পরম করুণাময় শ্রীভগবান আমাকে নিজ চরণে শরণাগত করছেন না। এই কথা মনে করে বরুণ অত্যন্ত ভীত হলেন এবং শীঘ্রই গোপরাজ নন্দের নিকটে গিয়ে তাঁকে সিংহাসনসহ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে স্থাপন করে বললেন—‘**গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসলঃ**’ (ভাগবত ১০।২৮।৮), হে পিতৃবৎসল!

হে গোবিন্দ ! এই আপনার পিতাকে আপনার নিকট প্রদান করলাম। আপনি তাঁকে গ্রহণ করুন এবং এই দেবাধমের উপর অনুগ্রহ বা নিগ্রহ যেমন ইচ্ছা তাই করুন।

এইভাবে গোপরাজ নন্দকে কৃষ্ণ সম্মুখে স্থাপন করে বরুণ একপার্শ্বে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি সঞ্চার করে নন্দরাজকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ নন্দর অনিষ্ট আশঙ্কায় ব্যাকুল ব্রজবাসিগণের নিকট উপস্থিত হলেন। বরুণদেবও শ্রীকৃষ্ণের চরণদর্শন, স্তুতিপ্রণতি করে এবং পরিশেষে তাঁর প্রসন্নদৃষ্টি প্রাপ্তিকে জীবনের পরম লাভ মনে করে আশ্বস্তচিত্তে নিজ লোকে অবস্থান করতে লাগলেন।

ব্রজগোপ-গোপীগণের গোলোক দর্শন—গোপরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন নন্দকে নিয়ে ব্রজে আসলেন তখন সেখানে পরমানন্দের সাড়া পড়ে গেল। গোপরাজ নন্দও তখন বরুণলোকের অদৃষ্টপূর্ব মহাবৈভবের কথা আর বরুণ ও বরুণলোকবাসীগণ কীভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করলেন এবং পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণচরণে প্রণাম করে নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা ও শরণাগতি প্রার্থনা করলেন সেই সব আশ্চর্যময় ঘটনা প্রকাশ করলেন। এইসব কথা শুনে উপানন্দ আদি সমস্ত গোপগণ চিন্তা করলেন আমাদের কৃষ্ণ যে সর্বেশ্বর তাতে কোনো সংশয় নেই। আমরা কোনো প্রকার সাধনানুষ্ঠান না করতে পারলেও সর্বেশ্বর কৃষ্ণ কি আমাদের পরমপদ প্রদর্শন করাবেন না ? **'অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যাদধীশ্বরঃ'** (ভাগবত ১০।২৮।১১)। কিন্তু ব্রজবাসী গোপগণের তত্ত্ব কী ? এঁরা কেউই মায়াবদ্ধ জীব নন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্য পার্ষদ এবং শ্রীকৃষ্ণেরই রূপান্তর মাত্র।

পিতা মাতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীভগবান যাঁদের পিতা মাতা প্রভৃতি রূপে অঙ্গীকার করেন, তাঁরা সকলেই তাঁরই শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ তাঁরই স্বপ্রকাশিকা শক্তিরই ঘনীভূত মূর্তি। যাঁরা নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমসম্বন্ধে আবদ্ধ এবং নিরন্তর নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছেন ও যাঁদের মন-প্রাণ-দেহ-পুত্র-বিত্ত-গৃহ আদি সবই শ্রীকৃষ্ণে

সমর্পিত, তাঁদের সঙ্গে কিছুতেই মায়ার সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর নয়।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর নিত্যপার্ষদ, ব্রজবাসী গোপগণকে গোলক-বৈভব দেখাতে মনস্থ করে চিন্তা করলেন। এই সমস্ত ব্রজবাসিগণ আমার সঙ্গে অপ্রপঞ্চ থেকে প্রপঞ্চ লোকে এসেছে এবং যোগমায়া কৃত অবিদ্যাবশত আমার লীলাভিনিবেশ এবং নিরন্তর বাৎসল্যাদি প্রেমে আমার সেবাভিনিবেশবশত আমি ও আমার সেবা ছাড়া সর্ববিধ জ্ঞানশূন্য হয়ে থাকে। তারা আমার প্রেমে এমনই অন্ধ যে নিজ স্বরূপ ও তাদের নিত্য বাসস্থানের কথা একেবারে ভুলে গেছে, তাই আমাদের ধাম দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছে[১]। আমি ওদের মনোবাসনা পূর্ণ করব।

দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃপরম্ (ভাগবত ১০।২৮।১৪)

এই কথা মনে করে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান তাঁর নিত্যপার্ষদ গোপগণকে মায়াতীত দর্শন করালেন।

আসলে প্রাকৃত ও শুদ্ধসত্ত্বময় ভেদে দেহ দ্বিবিধ। তার মধ্যে যাদের দেহ প্রাকৃত তারা আত্মসুখানুসন্ধানে জাগতিক কর্মে লিপ্ত হয়ে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়। আর যারা শুদ্ধসত্ত্বময় দেহধারী, তারা নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানে নানাবিধ কৃষ্ণসেবায় রত থাকেন তবে যোগমায়ার প্রভাবে কখনো-কখনো তাঁদেরও আত্মবিস্মৃতি হয়ে যায়। উভয়ের পার্থক্য এই যে, প্রাকৃত দেহাভিনিবেশে বিবিধ সংসার দুঃখে নিপীড়িত হতে হয় আর শুদ্ধসত্ত্বময় দেহাভিনিবেশে কৃষ্ণ সেবানন্দে পরিপূর্ণ থাকা যায়। যেমন ব্রজের গোপগণ। তাঁরা একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কোনো বস্তুরই সন্ধান রাখেন না আর কৃষ্ণকেও তাঁদের পরম বান্ধব ব্যতীত আর কিছু ধারণা করতে পারেন না। যাইহোক এই সব চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বৈকুণ্ঠ ও গোলোক দর্শন করালেন। পরবর্তী অন্তিম শ্লোকদ্বয়ে ভগবান বৈকুণ্ঠ দর্শনের ক্রম সম্বন্ধে বলেছেন। এই ক্রমানুসারে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম আমাদের পরিদৃশ্যমান মায়িক জগতের অতীত '**তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা**' (ভাগবত ১০।২৮।১৬) এবং শ্রীকৃষ্ণলোক তারও অতীত।

---

[১]বৈকুণ্ঠ ও গোলোক ।

এই ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেছেন—

সিদ্ধলোকস্তু তমসা পারে যত্র বসন্তি হি।

সিদ্ধাব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিনা হতাঃ ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

অর্থাৎ মায়িক জগতের ঊর্ধ্বে (তমসঃ পারে) সিদ্ধলোক নামক যে স্থান আছে, সেই স্থানে ব্রহ্মসুখে মগ্ন সিদ্ধগণ এবং ভগবান কর্তৃক নিহত দৈত্যগণ অবস্থান করেন। গোপবাসীগণ অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলোক অর্থাৎ গোলোক দর্শন করলেন।

শ্রীবৃন্দাবন থেকে মথুরা নীত হওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় কংস-প্রেরিত অক্রূরও এইভাবে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এ সম্বন্ধে বলছেন—

একদিন অক্রূর ঘাটের উপরে। বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে॥
এইঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল। ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন করিল॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

যমুনার এই ঘাট এখন অবধি '**অক্রূরতীর্থ**' নামে খ্যাত।

যাই হোক ব্রজবাসী গোপগণ দেখলেন যে তাঁদের কৃষ্ণ সেই মহাবৈভবময় লোকে অবস্থান করছেন এবং বেদাধিষ্ঠাতৃদেবগণ তাঁর স্তুতি করছেন। কোনো সম্রাটের পিতা যেমন তাঁর পুত্রের বৈভব দেখে আনন্দলাভ করেন ওইরকম ব্রজগোপবাসিগণও গোলোকে কৃষ্ণের বিভূতি দেখে পরমানন্দসাগরে মগ্ন হলেন।

——o——

রাসলীলা, গোপীগীতা (দশম স্কন্ধ ১৯—২৩ অধ্যায়)

প্রাক্কথন

পরমহংসচূড়ামণি বাদরায়ণনন্দন শ্রীবাদরায়ণি এই পরম রসময় রাসলীলা ভাগবতের পাঁচটি অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যাকে রাসোপনিষদও বলে। ইহা ভক্তি সাধনার পরমসাধ্য এবং পরানুরাগের পরম উচ্ছ্বাস। শ্রীমদ্ভাগবত প্রাকৃত রসশাস্ত্র নয়। শ্রীমদ্ভাগবত হল মুখ্যতম ভক্তিশাস্ত্র, সর্ব বেদান্তের সার ও ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য। এই শাস্ত্রে প্রতিপাদ্য পরম অনির্বচনীয় রসের সন্ধান পেলে তখন আর কোনো রসেই কারো কোনো আগ্রহ থাকে না।

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ (ভাগবত ১২।১৩।১৫)

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য এইভাবে বর্ণিত হয়েছে যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব-বেদান্তের সার। সাধারণতঃ বেদান্তশাস্ত্রে সংসার নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধেই আলোচনা থাকে। কিন্তু সংসার নিবৃত্তির পরেও কীভাবে গোবিন্দর চরণ সেবাধিকার লাভ হয়, তা একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। সেইজন্যই ভাগবত হল সর্ববেদান্তসার আর ভাগবত যে মধুর লীলার সন্ধান দিয়েছেন তা আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ হলে তখন আর অন্য কোনো প্রকার রসাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, আর এরমধ্যে রাসলীলা হল শ্রীমদ্ভাগবতের মাথার মণি।

মদনমোহন লীলা—

অচিন্ত্য-অনন্ত-লীলা-রস-বারিধি শ্রীভগবানের পরম বিচিত্র এই রমণলীলাময় রাসপঞ্চাধ্যায়ীর ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয়ে টীকাকার শ্রীধরস্বামীপাদ রাসমণ্ডল-মণ্ডিত শ্রীভগবানের জয় ঘোষণা করেছেন এবং রাসলীলার তাৎপর্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেছেন **'ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্প-কন্দর্পদর্পহা। জয়তি শ্রীপতির্গোপী-রাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥'** অর্থাৎ কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মদনের প্রভাবে ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্যন্ত যে সময় সময় কুপথে পরিচালিত হন তা পুরাণাদিতে বর্ণিত। ব্রহ্মাদি দেবগণকে পর্যন্ত এইভাবে জয় করে মদনের

এত গর্ব হল, তিনি ভাবলেন আমিই একমাত্র ত্রিলোকবিজয়ী। যেহেতু স্ত্রীমুদ্রাই মদনের সর্ববিধ সম্পদের আকর তাই তিনি এবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জয় করার জন্য বৃন্দাবনের রাসলীলায় অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে উপস্থিত হলেন।

যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্‌বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌসুক্যভৃতাত্মনাম্॥ (ভাগবত ১০।৩৩।৪)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হলেন সেই সময় অত্যন্ত ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে মদন ও দেবগণ নিজ নিজ স্ত্রীবৃন্দসহ দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে, বিমানসমূহ দ্বারা আকাশমণ্ডল পরিব্যপ্ত হয়ে স্থিত হলেন। কিন্তু দেবতাদের মধ্যে স্থিত মদন যখন গোপীমণ্ডলমণ্ডিত নবকিশোর নটবর শ্যামসুন্দরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, অমনি তাঁর হৃদয়ে কী যেন এক ভাবের প্রবাহ হয়ে গেল ! তিনি বিবশ এবং মূর্ছিতপ্রায় কলেবরে ভূমিতে পড়ে গেলেন এবং আক্ষেপ করতে লাগলেন। হে বিধাতঃ ! তুমি আমাকে পুরুষদেহ দিয়ে কেন এ জীবনের মতো বঞ্চনা করেছ ? হায় ! আমি যদি রমণীদেহ পেতাম তবে রমণীমোহন শ্যামসুন্দর তোমার চরণে চিরতরে বিক্রিত হয়ে থাকতাম আর আমার দেহ-মন-প্রাণ-জীবনযৌবন তোমাকে সমর্পণ করে কৃতার্থ হতাম।

গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত শ্যামসুন্দরের মধুর মূর্তি দেখে ও তাঁর লাবণ্যচ্ছটায় আত্মহারা হয়ে, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবের মতো 'মদন'ও মোহিত হয়ে পড়লেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের অনন্তলীলা ও অনন্তমূর্তি থাকলেও তাঁর এই গোপীমণ্ডলমণ্ডিত মূর্তিকেই 'মদনমোহন' বলা হয়।

চড়ি গোপীর মনোরথে মনমথের মনমথে নাম ধরে মদন-মোহন।

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

কামাহত জীবের কামজয়ের উপায় নিদর্শন করার জন্যই শ্রীভগবান সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপে রাসস্থলে অবতীর্ণ হয়ে গোপীগণের সঙ্গে রাসক্রীড়া করলেন এবং জগৎকে দেখিয়ে দিলেন যে অজেয় কামকে যদি কেউ জয় করতে চায় তবে সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপী রাসবিহারীর চরণে শরণাগতিই একমাত্র গতি। এইজন্য পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব রাসলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

(ভাগবত ১০।৩৩।৪০)

অর্থাৎ যদি কেউ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ব্রজবধূগণের সঙ্গে ব্রজরাজনন্দনের এই পরম মধুর লীলা শ্রবণ বা কীর্তন করেন, তাহলে তাঁর হৃদয়ের নিদারুণ কামব্যাধি দূর হয় এবং তিনি শ্রীগোবিন্দচরণে অচলা ভক্তি লাভ করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীগণের মিলন, যমুনাপুলিনে বিবিধ বিহার প্রভৃতি আপাতত প্রাকৃত ছবি বলে মনে হলেও এর বাহ্যাবরণ উন্মোচন করে, লীলার ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে— ইহা একদিকে শ্রীকৃষ্ণের 'আত্মারামত্ব', 'যোগেশ্বরত্ব' ও 'ভক্তবাঞ্ছাপূরণলালসা' এবং অন্যদিকে গোপীগণের 'পরমপ্রেম', 'সর্বত্যাগ' এবং 'কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষা' ইত্যাদি শত শত নিবৃত্তির কাঞ্চন প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত। পরম করুণাময় শ্রীভগবান প্রবৃত্তির সাজে নিবৃত্তির এমন লীলা করেছেন যে তাতে মনোনিবেশ করলে সংসারে দৃঢ় আবদ্ধ জীবও দেখতে দেখতে তার নিজের অজ্ঞাতসারে নিত্য নিরাময় নিবৃত্তিরাজে উপস্থিত হয়। এইজন্য পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব এই লীলা বর্ণনার অবসানে বলেছেন—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

(ভাগবত ১০।৩৩।৩৭)

অর্থাৎ শ্রীভগবান মরজগতের জীবগণকে কৃতার্থ করার জন্য নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হয়ে বিবিধ লীলা করেন যাতে সংসারবদ্ধ জীবগণ তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন। আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রের এই মধুর লীলা শ্রবণ করে এটিকে জীবনের সারসর্বস্বরূপে গ্রহণ করা উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা শৃঙ্গার কথা হলেও ইহা পরা নিবৃত্তির পরম সৌধ শিখরে আরোহণের সুগম শৈলী। অনন্ত-মধুর শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হয়ে কেউ যদি তাঁর এই পরমমধুর লীলাকথা শ্রবণ ও স্মরণে প্রবৃত্ত হন তবে লীলার প্রতি অণু-পরমাণুতে তিনি পরানিবৃত্তির সমুজ্জ্বল মূর্তি দেখতে

পাবেন এবং চিরজীবনের মতো প্রবৃত্তির কথা বিস্মৃত হবেন। তাই ভক্তচূড়ামণি নরোত্তমদাস ঠাকুর তাঁর প্রার্থনায় গেয়েছেন—

'কব হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি।'

ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান ও তাঁর রমণ (আনন্দাস্বাদন)—

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবৎ শব্দের অর্থ নির্দেশে দেখা যায়—

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য বীর্যাতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুনাদিভিঃ॥

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ)

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য—এই ষড়্‌বিধ মহাশক্তির নাম ভগ। হেয় জ্ঞান অর্থাৎ প্রাকৃতগুণসম্বন্ধবিহীন পরিপূর্ণজ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজঃ—এই ছয়টি ভগবৎ শব্দের বাচ্য। এই ষড়বিধ ঐশ্বর্যাদির মহাশক্তির সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহই শ্রীভগবান। এই ষড়বিধ গুণ হল—

ঐশ্বর্য—শ্রীভগবানের সর্ববশীকারিত্ব শক্তির নামই ঐশ্বর্য। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য শক্তিতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সর্ববিধ বস্তুই তাঁর অধীন। জগতে এমন কোনও বস্তুই নেই যা তাঁর অধীনতা ছেড়ে স্বতন্ত্রতাভাবে কিছু করতে পারে। ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা থেকে সুমেরু পর্বত, জলবিন্দু থেকে সিন্ধু, শ্বাসবায়ু থেকে ঝঞ্ঝাবাত, ক্ষুদ্র জীবাণু থেকে ব্রহ্মা বা অচেতন-চেতন সর্ববস্তুই তাঁর ঐশ্বর্য-শক্তিতে সদাই নিয়ন্ত্রিত।

বীর্য— শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তির নাম বীর্য। শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণে তাঁর যে কত অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তার ইয়ত্তা নেই। শ্রীকৃষ্ণলীলায় তাঁর তিনদিন বয়সে পূতনা বধ, তিনমাস বয়সে শকটভঞ্জন, সাত বৎসর বয়সে গোবর্ধনধারণ আদি সমস্তই বীর্য তাঁর, তাঁর অচিন্ত্য মহাশক্তির পরিচায়ক। আর তাঁর ভক্তগণ এ সমস্ত লীলাকথা শ্রবণে পরমানন্দ সিন্ধুতে মগ্ন হন।

যশঃ—অনন্ত কল্যাণময় শ্রীভগবানের কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত লীলাই কল্যাণকর। তাঁর কোনো লীলা আপাততঃ কারো কারো পক্ষে অহিতকর মনে হলেও পরিণামে তা তার পক্ষে অবশ্যই পরম কল্যাণপ্রদ হয়ে থাকে। শ্রীভগবান পূতনা, অঘাসুর প্রভৃতিকে বধ করেছিলেন বলে আপাতত দণ্ডবিধান বলে মনে হলেও তাদের চিরদিনের মতো সংসারমুক্তি হওয়ায় তাতে তাদের পরমকল্যাণই সংঘটিত হয়, এতে সন্দেহ নেই।

শ্রীঃ—শ্রীভগবানের ধাম, পার্ষদ, লীলা, শ্রীবিগ্রহ আদি সমস্তই সর্ববিধ মহাসম্পদে পরিপূর্ণ। তাঁর এই মহাসম্পদই শ্রী।

জ্ঞানঃ—শ্রীভগবানের সর্বজ্ঞতা ও স্বপ্রকাশিকা শক্তিই জ্ঞান।

বৈরাগ্যঃ—শ্রীভগবানের সর্ববিধ মায়িক বস্তুতে অনাশক্তিই বৈরাগ্য।

শ্রীভগবানের সমস্ত মূর্তিই (অবতার) এইরকম নির্লিপ্ত কিন্তু তাঁদের সঙ্গে প্রাকৃত জগতের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধগন্ধ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মায়া বা মায়িক জগতের কোনো সম্বন্ধই নেই। '**এ সবার দর্শনাদ্যে আছে মায়ার গন্ধ। তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥**' (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) এইজন্য ব্রহ্মা তাঁর ব্রহ্মমোহন স্তুতিতে বলছেন—

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।

প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ (ভাগবত ১০।১৪।৩৭)

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি প্রপঞ্চাতীত হয়েও আপনার চরণে একান্ত প্রপন্ন প্রেমবান ভক্তদের আনন্দবর্ধনের জন্যই জাগতিক অনুকরণে আপনার অপ্রাপঞ্চিক লীলা প্রকাশ করে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা পরিপূর্ণ বৈরাগ্যশক্তির ক্রীড়াভূমি। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গো-গোপ-গোপীদের সঙ্গে প্রেমসম্বন্ধে বদ্ধ এবং সম্পূর্ণভাবে তাদের প্রেম বশীভূত হয়েও লীলা করতে করতে মথুরাতে চলে গেলেন এবং ভুলেও আর ফিরে আসলেন না। পরে যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি দ্বারকা থেকে কাম্যবনে এসেছেন কিন্তু অনতিদূরবর্তী বৃন্দাবনে এসে তাঁর বিরহে চিরদুঃখিত ব্রজবাসীদের সঙ্গে দেখাও করতে আসেননি। তারপর দ্বারকালীলাতেও তিনি অসংখ্য পুত্র-পৌত্রাদি আত্মীয়-মিত্র-বান্ধবদের সঙ্গে

লীলা করতে করতে হঠাৎ একদিন ব্রহ্মশাপচ্ছলে যদুকুল ধ্বংস করলেন। শ্রীভগবানের এই সমস্ত লীলা দেখলে মনে হয় যে তাঁর কিছুতেই আসক্তি নেই। অনাসক্তির পরিপূর্ণতা দেখাবার জন্যই আপাত আসক্তির মহাসৌধ গড়ে অকস্মাৎ তিনি তা ফুৎকারে উড়িয়ে দেন।

শ্রীভগবানের অনন্ত মূর্তি, অনন্ত অবতার তিনি অনন্ত লীলামহোদধি। তিনি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, নারায়ণাদি অনন্ত মূর্তিতে অনন্ত লীলা করে থাকেন। শ্রীভগবানের অনন্ত মূর্তিতে স্বরূপতঃ কোনো ভেদ বা তারতম্য না থাকলেও তাঁর ঐশ্বর্য-বীর্যাদি প্রকাশের মধ্যে কিছু তারতম্য থাকায় শাস্ত্রে শ্রীভগবানের অনন্তমূর্তির মধ্যেও অংশ ও পূর্ণাদির তারতম্য বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে শ্রীভগবানের অবতার সম্পর্কে তাই বলা হয়েছে **'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'** (ভাগবত ১।৩।২৮) অর্থাৎ শ্রীভগবানের অন্যান্য অবতার তাঁরই অংশ ও কলারূপে আবির্ভূত কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি রূপে তিনি স্বয়ং ও পরিপূর্ণ। অন্য অবতারে তাঁর পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যাদি মহাশক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয় না কিন্তু যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হন তখন তিনি পরিপূর্ণরূপে সর্বাধিক শক্তিসহ প্রকাশিত হন। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ 'স্বয়ং ভগবান' রূপে প্রসিদ্ধ।

(১) শ্রীকৃষ্ণলীলা আলোচনায় বোঝা যায় যে, শ্রীভগবানের মৎস, কূর্মাদি মূর্তিতে ঐশ্বর্য অর্থাৎ বশীকারিত্ব শক্তির বিকাশ থাকলেও সর্ববশীকারিত্ব শক্তির কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তিনি পূর্ব পূর্ব লীলায় সকলকে নিজ বশে রেখে লীলা করেছেন বটে কিন্তু তিনি নিজে কারো বশে আসেননি। কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণলীলাতেই তিনি মা যশোদার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে দামোদর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন, গোপবালকদের সঙ্গে খেলায় হেরে গিয়ে তাদের কাঁধে বহন করেছেন, আবার মানিনী শ্রীরাধার মান ভঞ্জনের জন্য চরণ ধারণ করেছেন। এইরকম সর্ববশীকারিত্ব শক্তির প্রকাশ আর কোনো লীলাতেই হয়নি। (২) শ্রীভগবানের শ্রীকৃষ্ণলীলায় তাঁর বীর্য অর্থাৎ অচিন্ত্য মহাশক্তিরও পূর্ণবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণলীলায় যেমন পূতনা নাম্নী রাক্ষসী বধ আছে সেইরকম রামলীলাতেও তাড়কা রাক্ষসী বধ আছে, কিন্তু এই দুই বধ্যে অনেক

পার্থক্য। শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রর নিকট মহাপ্রভাবময় অস্ত্রশিক্ষা করেন এবং সেই ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন অস্ত্র প্রহারে তাড়কা রাক্ষসীর বিনাশসাধন করেছেন, কিন্তু পূতনা বধ করতে শ্রীকৃষ্ণর অস্ত্রশিক্ষাদির কোনো প্রয়োজন হয়নি—তিনি তিন দিনের স্তন্যপায়ী বালকমূর্তিতে স্তন্যপান করতে করতে ঘোরাকৃতি পূতনা রাক্ষসীর প্রাণ সংহার করেন এবং তাকে মাতৃগতি প্রদান করেন।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণাদি লীলাতেও আছে তাঁর অচিন্ত্যশক্তি বৈভবের প্রকাশ। শ্রীভগবান কূর্ম মূর্তিতেও মন্দারপর্বত ধারণ করেছিলেন কিন্তু তখন তিনি শত যোজন বিস্তৃত পৃষ্ঠের ওপর মন্দার পর্বত স্থাপন করেছিলেন আর শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীভগবান সাতবছর বয়সেই বাম করতলে, গোবর্ধন পর্বত সাতদিন ধরে ধারণ করেছিলেন আর তার ছত্রছায়ায় সমস্ত গোপ-গোপীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীভগবানের প্রতি নারদ-বাক্যে দেখা যায় নারদ বলছেন—

যে দৈত্যাঃ দুঃশকা হন্তুং চক্রেনাপি রথাঙ্গিনা।
তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ ! নব্যয়া বাললীলয়া।
সার্দ্ধং মিত্রৈর্হরে ! ক্রীড়ন্ ভ্রুভঙ্গং কুরুষে যদি।
সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে খস্থিতাস্তদা॥

হে কৃষ্ণ ! চক্রধারী নারায়ণও চক্র দ্বারা যে সমস্ত অসুরগণকে বিনাশ করতে অসমর্থ হয়ে পড়েন, আপনি অভিনব বাল্যলীলা করতে করতে অনায়াসেই সেই সমস্ত অসুরগণকে (অঘাসুর আদি) বিনাশ করেন। গোপবালকদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে করতে আপনি যদি ভ্রুভঙ্গী করেন তাহলে আকাশমার্গস্থিত ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ ভয়ে কম্পান্বিত হন।

এইরূপে কৃষ্ণলীলার মতন কোনো লীলাতেই শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ অচিন্ত্যশক্তির প্রকাশ দেখা যায় না কেননা শ্রীকৃষ্ণ লীলাতেই শ্রীভগবানের ষড়ৈশ্বর্যর যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পূর্ণ শক্তি বিকাশ পায়।

(৪) শ্রীভগবানের সমস্ত মূর্তিই সর্বজ্ঞতাসম্পন্ন হলেও, কৃষ্ণলীলায় শ্রীভগবানের গোপাল বালকোচিত অজ্ঞতার অন্তরালে যে পরিপূর্ণ সর্বজ্ঞতার বিকাশ দেখা যায় তা অতি মনোরম।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তাই স্বয়ং ভগবান বলছেন—

সন্তি ভুরীনি রূপানি মম পূর্নানি ষড়গুণৈঃ।

ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিনা॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

অর্থাৎ ঐশ্বর্য-বীর্যাদি ষড়্‌বিধ মহাশক্তি-পরিপূর্ণ অনন্ত মূর্তিতে আমি অনন্তলীলা করে থাকি কিন্তু আমার গোপরূপের (কৃষ্ণরূপের) সঙ্গে কোনোরূপের তুলনা করা চলে না।

(৫) অন্যান্য লীলায় দেখা যায় যে সকলেই শ্রীভগবানের নিকট **'ধনং দেহী যশো দেহী'** প্রভৃতি প্রার্থনা জানায় কিন্তু কৃষ্ণের কাছে কারোর এমন কোনো প্রার্থনা জানাতে ইচ্ছাই হয় না। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হলে তাঁর সেবাধিকার পাওয়ার জন্যই সবাই লালায়িত হয়। যদি কেউ অন্য কোনো কামনাবশতও কৃষ্ণভজন করেন তবে তাঁরও ক্রমশ সে কামনা হতে নিবৃত্তি হয় এবং তাঁর মনে কৃষ্ণসেবার কামনা প্রবল হয়ে ওঠে।

কামলাগি কৃষ্ণভজে পায় কৃষ্ণ রসে। কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥

অন্যকামী করে যদি কৃষ্ণের সেবন। না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরন॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

রাস পঞ্চাধ্যায়ীর (পঞ্চ অধ্যায় সম্বন্ধিত রাসলীলার) প্রথম শ্লোকেই শ্রীশুকদেব বলছেন—**'বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ'** (ভাগবত ১০।২৯।১) অর্থাৎ ঐশ্বর্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তি নিকেতন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শারদীয় রজনীতে গোপরমণীগণের সঙ্গে তাঁর 'যোগমায়া' আশ্রয় করে রমণ করতে ইচ্ছা করলেন। এখানে যোগমায়ার আশ্রয় কেন নিলেন ? কেননা অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে প্রেম হয় না, সমানে সমানে প্রেম হয়। শ্রীভগবানের মাধুর্য শক্তির কাছে তাঁর ঐশ্বর্য শক্তি স্তিমিত। আর এ হয়েছে যোগমায়ার সংযোগেই। রাসলীলায় যোগমায়ার প্রভাব, কার্যকারিতা আমরা ক্রমেই আস্বাদন করব। কিন্তু শ্রীভগবানের 'রমণ' কী ? তৈত্তিরীয়োপনিষদ বলছে—**'রসৌ বৈ সঃ। রসং হেব্যায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'**। **'এষহ্যেবানন্দয়তি'** (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।৭।২)। অর্থাৎ পরব্রহ্ম রসস্বরূপ আর তাঁকে রসস্বরূপে গ্রহণ করতে পারলেই জীবগণ আনন্দ ভোগ করতে পারে। তিনিই

জীবজগৎকে আনন্দ প্রদান করে থাকেন। তিনি সর্ববিধ আনন্দের মূল কেন্দ্র তাই জগতের জীব তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হলেও আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান কোন্ প্রয়োজনে বা কী প্রকারে আনন্দ ভোগ করেন তা আপাততঃ ধারণা করা কঠিন।

মুণ্ডক উপনিষদ্ বলছেন—**'দেবস্যৈব স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা'** (মুণ্ডক উপনিষদ্, গোবিন্দভাষ্য) অর্থাৎ বিবিধ লীলাপরায়ণ শ্রীগোবিন্দর নানাবিধ লীলা করাই স্বভাব। তিনি স্বভাবতঃই আপ্তকাম, তাই এতে তাঁর কোনো প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা থাকা সম্ভবপর নয়। শ্রীভগবানের আনন্দোচ্ছ্বাস বশতঃই এই সমস্ত লীলা সংঘটিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে শ্রীভগবান 'রমণ' করতে ইচ্ছে করলেন, এর অর্থ হল তিনি আনন্দাস্বাদন করতে চাইলেন। এই আনন্দাস্বাদন জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই হতে পারে। বিষয়াসক্ত জীবের কিঞ্চিৎ বিষয়ানন্দ ভোগ হয়, অনাসক্ত জীবের সর্ববিধ দুঃখ নিবৃত্তি ও আত্মরামত্ব লাভ হয়, প্রেমবান ভক্তগণের আনন্দস্বাদন হল বিবিধ প্রেমবিকার ও সেবা রসাস্বাদনাদি লাভ এবং শ্রীভগবানের আনন্দাস্বাদন হল তাঁর বিবিধ লীলাবশত স্বরূপানন্দ বিতরণ। তবে প্রথম দুটি আনন্দ, যেমন—বিষয়াসক্ত জীবকে কীভাবে তিনি আনন্দ বিতরণ করেন বা কীভাবে অনাসক্ত জীবগণকে আনন্দ বিতরণ করেন তা রাসপঞ্চাধ্যায়ীর প্রতিপাদ্য নয়। শেষোক্ত দুই আনন্দ, যথা—(১) আনন্দময় ভগবান প্রেমবান ভক্তর প্রেমাধীন হয়ে কীভাবে তাঁদের আনন্দ বিতরণ করেন আর (২) নিজে কীভাবে স্বরূপানন্দাস্বাদন করেন তাই হল রাস-পঞ্চাধ্যায়ীর প্রতিপাদ্য।

শ্রীভগবান তাঁর প্রিয়জনের জন্য যে সর্ববিধ কার্যই করে থাকেন তা পদ্মপুরাণ বচনে বলেছেন—**'মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ'** আর শ্রীভগবানের যেখানে যত ভক্ত থাকুক বা যতই প্রিয়জন থাকুক না কেন, তাদের মধ্যে ব্রজের গোপ-রমণীগণের মতো প্রিয় আর কেউই নেই। শ্রীভগবান আদিপুরাণে অর্জুনকে বলছেন—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি পর্য্যুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগুঢ় প্রেমভাজনম্॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্যাং মৎ শ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥

(আদিপুরাণ)

অর্থাৎ হে অর্জুন ! গোপীগণ তাদের নিজদেহও আমার সেবার উপকরণ বলে মনে করে এবং সেইজন্যই তারা নিজ দেহকে ভালোবাসে আর নানাবিধ বসন-ভূষণাদি দ্বারা সেই দেহ সজ্জিত করে। তাই তাদের মতো প্রিয়পাত্র এই ত্রিজগতে আর আমার কেউই নাই। গোপীগণই একমাত্র আমার সেবা, আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আর আমার মাহাত্ম্য জানে আর কেউই জানে না।

প্রেম বলতে সাধারণত ভালোবাসাই মনে হয় আর এই ভালোবাসা বিষয়াসক্ত জীবেরও আছে আবার কৃষ্ণভক্তেরও আছে। তার মধ্যে বহির্মুখের ভালোবাসা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন বিষয়-বৈভবাদিতে নিবিষ্ট আর কৃষ্ণভক্তের ভালোবাসা নিবিষ্ট একমাত্র কৃষ্ণে। নিজ সুখাকাঙ্ক্ষাই বহির্মুখের ভালোবাসার মুখ্য কারণ, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত কখনও আত্মসুখাপেক্ষায় কৃষ্ণকে ভালোবাসেন না, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে, কৃষ্ণের সুখবিধান।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

নারদপঞ্চরাত্রেও প্রেমের লক্ষণ সম্বন্ধে নারদ বলেছেন—

'অনন্যমমতা বিষ্ণো মমতা প্রেমসঙ্গতা' অর্থাৎ অন্য কোনো বস্তুতে মমতা না থেকে যদি একমাত্র কৃষ্ণেই কারো মমতা থাকে তবে সেই কৃষ্ণনিষ্ঠ মমতাকেই প্রেম বলে। কিন্তু যাদের ঐহিক বা পারত্রিক ভোগ কামনা, অণিমাদি সিদ্ধি কামনা বা বিবিধ দুঃখ দৈন্যাদিময় সংসার বন্ধন হতে মুক্তিকামনা থাকে, তারা শতচেষ্টা করেও শ্রীভগবানে মমতা সমর্পণ করে প্রেমসাগরে ভাসতে পারেন না।

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাস্যকথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত না ভোগাকাঙ্ক্ষা আর মুক্তিস্পৃহারূপ পিশাচী জীবহৃদয়ে জাগরূক থাকে, ততদিন পর্যন্ত কিছুতেই তারা ভক্তিসুখের আস্বাদন পায় না।

তাই মহাজন কবি শ্রীভগবানে মতির (ভক্তির) জয়গান গেয়ে বলে গেছেন—

কিয়ে মানুষ পশু পাখী জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ।। (বিদ্যাপতি)

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকপিলদেব তাঁর জননী দেবাহুতিকে বলেছেন—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্‌।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।।
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।

(ভাগবত ৩।২৯।১১-১৩)

অর্থাৎ গঙ্গাধারা যেমন হিমালয় থেকে নির্গত হয়ে কোনো বাধাবিঘ্ন না মেনে তীব্র বেগে সমুদ্র অভিমুখে যায়, সেইরকম যদি কারো আমার গুণাদি লীলা শ্রবণমাত্রেই ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি প্রাপ্তির সংকল্প না করে এবং নিজ দুঃখ-দৈন্যাদির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, কেবলমাত্র আমার সেবাপ্রাপ্তির জন্যই ব্যাকুল হয়, তাহলে তাদের নিষ্কাম ভক্ত বলা হয় এবং নির্গুণ ভক্তিযোগের এই হচ্ছে স্বরূপ লক্ষণ। এই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তগণ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তি পেলেও শ্রীভগবানের সেবা পরিত্যাগ করে ওই সকল গ্রহণ করতে ইচ্ছে করেন না। শ্রীভগবানের অপার কৃপায় এবং বহু জন্ম সঞ্চিত কোনো অনির্বচনীয় সৌভাগ্যবশত যাঁরা শুদ্ধা ভক্তি অর্জন করতে পারেন তখন তাঁরই পরিণতাবস্থায় সাধকগণ এই 'প্রেম' লাভ করেন এবং নিজ বাসনা অনুরূপ ভগবৎসেবা অধিকার লাভ করে কৃতার্থ হন।

সাধন ভক্তি হতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হলে তার প্রেম নাম হয় ॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হতে। এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

কৃষ্ণপার্ষদ ও কৃষ্ণকান্তাগণ—

অনন্তলীলাময় শ্রীভগবানের লীলাকথা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর লীলা-পার্ষদগণ সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করা আবশ্যক। শ্রীভগবান অপ্রপঞ্চে যে ভক্তগণসহ লীলা করে থাকেন তাদের পার্ষদ বলে। শ্রীভগবান অনাদি কাল থেকে কেবল তাঁর পার্ষদ ও ভক্তগণের সঙ্গেই তাঁর ধামে নিত্য লীলাবিলাস করে থাকেন এবং জগতের জীবগণকে কৃতার্থ করার জন্য তাঁর সেই নিত্যলীলা মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডেও প্রকাশ করে থাকেন। অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি শ্রীভগবানের যেসব লীলাক্ষেত্র আমরা জগতে দেখতে পাই তা তাঁরই নিত্যধামের প্রাপঞ্চিক প্রকাশ মাত্র। শাস্ত্রমতে সৃষ্টিপ্রবাহ যেমন অনাদি, শ্রীভগবানের লীলাপ্রবাহও সেইরকম অনাদি।

শ্রীভগবানকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে এই পঞ্চরসেই আস্বাদন করা যায় এবং এই পঞ্চরসেই নিত্যপার্ষদগণ অনাদিকাল থেকে প্রপঞ্চাতীত ধামে নিজ নিজ ভাবানুসারে শ্রীভগবানের সেবানন্দাস্বাদন করেন।

শান্তভক্ত নব যোগেন্দ্র সনকাদি আর।
দাস্য ভাব ভক্ত সর্বত্র সেবক অপার॥
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত পিতামাতা যত গুরুজন॥
মধুররসে ভক্ত মুখ্য ব্রজে যত গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গনন॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই পার্ষদগণের মধ্যে যাঁরা কান্তাভাবের মধুর রসে আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানে সেবা করে থাকেন, তাঁদের প্রেম, তাঁদের সেবাই সর্বোৎকৃষ্ট। এই সকল প্রেমিক ভক্তগণ বিবিধ প্রকারের এবং তাঁদেরই কান্তা বলে।

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি বিবিধ প্রকার। এক লক্ষীগণ, পুরে মহিষীগণ আর।
ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার।

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীভগবান কৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হয়ে রুক্মিণী, সীতা প্রভৃতিকে যে মহিষীরূপে গ্রহণ করেছেন তাঁরা কান্তাশ্রেণীভুক্ত হলেও মহিষী শ্রেণীভুক্ত। অনন্ত বৈকুণ্ঠাদিধামে শ্রীভগবান নারায়ণাদি রূপে লীলা করেন এবং লক্ষ্মীগণ কান্তারূপে তাঁর সেবা করেন, আর ব্রজলীলায় অগণিত গোপরমণী কান্তারূপে তাঁহার সেবা করেন। শাস্ত্রকারগণের মতে মহিষীগণ বিবাহ বিধিতে স্বীকৃত স্বকীয়া কান্তা, লক্ষ্মীগণ বিবাহ বিধিতে স্বীকৃত না হলেও অনাদিকাল থেকে তাঁরা স্বকীয়া কান্তা আর গোপীগণ পরকীয়া কান্তা। এই ত্রিবিধ কান্তার মধ্যে পরকীয়া গোপরমণীগণের প্রেমই সর্বোচ্চ এবং এঁদের কৃষ্ণসেবা রসাস্বাদনই পরিপূর্ণ ও অতুলনীয়।

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

শ্রীভগবান তাঁর নিত্যপার্ষদগণসহ নিত্যধামে যে সমস্ত নিত্যলীলা রসাস্বাদন করেন, সেইসব লীলাই তাঁর কৃপায় ও ইচ্ছায় মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা শ্রীভগবানের নিত্যলীলারই প্রকাশ। শ্রীভগবান অনাদিকাল হতে রাধা ও কৃষ্ণ এই দুই রূপে আত্মপ্রকাশ করে লীলা রসাস্বাদন করে থাকেন।

তৈছে রাধা কৃষ্ণ দোঁহে একই স্বরূপ। লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা স্বরূপত অভিন্ন হলেও অনাদিকাল থেকে বিভিন্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে লীলা রসাস্বাদন করেন। শ্রীরাধিকা এক মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে রাসাদি লীলা রসাস্বাদন করাতে পারেন না বলেই তিনি আবার ললিতা-বিশাখাদি অনন্তমূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং সেই বহু মূর্তিতে বিবিধ লীলা করে শ্রীভগবানের আনন্দবর্ধন করেন।

রাধাসহ লীলারস আস্বাদ কারণ। আর সব গোপী হয় রসোপকরন॥
বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে। কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার ক্রম—

তিন দিন বয়সে পূতনা বধ

এক বৎসর বয়সে তৃণাবর্ত বধ

তিন বৎসর বয়সে দামোদর লীলা ও বৃন্দাবনে আগমন। বৎসাসুর ও বকাসুর বধ।

চার বৎসর বয়সে অঘাসুর বধ ও ব্রহ্মা কর্তৃক গোবৎস ও গোপবালক হরণ।

পঞ্চম বৎস বয়সে কার্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতে ব্রহ্মামোহন স্তুতি ও গ্রীষ্মকালে কালীয়দমন লীলা।

ষষ্ঠ বৎসরে শ্রীদাম, সুবলাদিদের সঙ্গে পরমানন্দে গোচারণারম্ভ ও গোষ্ঠক্রীড়া।

সপ্তম বৎসরে ধেনুকাসুর বধ ও গোপীদের প্রতি প্রথম অনুরাগ প্রদর্শন।

অষ্টম বৎসর আশ্বিন মাসে **বেণুগীত** প্রসঙ্গে গোপরমণীগণের প্রতি পূর্বরাগ। কার্তিক শুক্ল প্রতিপদে গোবর্ধনযাগ, তৃতীয়া হতে নবমী **গোবর্ধন ধারণ,** একাদশীতে ইন্দ্র ও সুরভী কর্তৃক স্তুতি এবং দ্বাদশীতে বরুণলোক গমন এবং ব্রজবাসিগণের ব্রহ্মহ্রদাবগাহনের পরে গোলক দর্শন। অগ্রহায়ণ মাসে গোপরমণীগণের কাত্যায়নী পূজা ও বস্ত্রহরণ। গ্রীষ্মকালে **যাজ্ঞিক পত্নীগণের** স্তুতি ও তাঁদের প্রতি কৃপা প্রকাশ।

নয় বৎসর বয়সের প্রারম্ভে আশ্বিন-কার্তিক পূর্ণিমায় **রাসলীলা আরম্ভ।** তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বয়স আঠ বছর একমাস তেইশ দিন। রাসলীলা ভগবানের ব্রজলীলার মধুরতম লীলা যদিও শ্রীকৃষ্ণ আরো দুই বছর ব্রজে থেকে লীলা করেন। **'একাদশ সমাস্তত্র গুঢ়ার্চ্চিঃ সবলোহবসৎ'** অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বছর বয়স পর্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন এবং সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য গোপন

করে ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণের প্রেমাধীন হয়ে বিবিধ লীলা করেন।

রাসলীলার প্রারম্ভে তিনি ব্রহ্মমোহন লীলায় **ব্রহ্মার,** গোবর্ধন লীলায় **ইন্দ্রের,** দাবাগ্নি মোক্ষণ লীলায় **অগ্নির** আর নন্দমোক্ষণ লীলায় **বরুণের** দর্প খণ্ডন করে পরিশেষে সর্বজগতের চিত্ত বিক্ষেপকারক দুর্বার **মদনের** দর্প খণ্ডন করার জন্য অগণিত ব্রজরমণীমণ্ডলের সঙ্গে রাসনৃত্য করতে ইচ্ছে করে তাঁর অচিন্ত্য মহাশক্তির বৈভব প্রকাশ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা রসজ্ঞ শ্রীশুকদেব রাসলীলার প্রারম্ভে **'ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে'** বলে এই ইঙ্গিত করেছেন যে শ্রীভগবান প্রেমবতী গোপরমণীগণের সঙ্গে যে রমণ করতে ইচ্ছে করলেন এ কেবল তাঁর ইচ্ছাশক্তিতেই সম্পন্ন হয়নি, এ লীলার আকাঙ্ক্ষা তিনি মন দ্বারাও করেছেন। শ্রীভগবানের রমণেচ্ছা কেবলমাত্র ব্রজ গোপিনীগণের মনোরথ পূরণের জন্য নয়, এতে তাঁর নিজেরও পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা আছে। যদি প্রেমবতী গোপরমণীগণের সঙ্গে রমণে শ্রীভগবানের কোনো প্রয়োজন না থাকত তবে এই রমণেচ্ছা অভিনয় মাত্রই হত। তাই পরমহংস চূড়ামণি শ্রীশুকদেব রাসলীলা উপলক্ষে বলছেন, **'রন্তুং মনশ্চক্রে'** অর্থাৎ রাসক্রীড়ারূপ মহাযজ্ঞে তিনি যজমানের ন্যায় ফলভাগী হতে সংকল্প করলেন। গোপরমণীগণের এমনই বিশেষত্ব যে তাঁদের আকর্ষণে আত্মরাম শিরোমণি শ্রীভগবানেরও রমণেচ্ছা হয়েছে, নির্বিকার ভগবানেরও ভাববিকার প্রকাশ পেয়েছে, পূর্ণকাম ভগবানকেও সকাম হতে হয়েছে।

শ্রীভগবানের প্রেয়সী গোপীগণ নিত্যা ও সাধনসিদ্ধা—

জ্ঞানী, যোগী ও কর্মীগণের সাধনলাভের সঙ্গে, রাগানুগা ভক্তি সাধকগণের সাধন ফল লাভের কিছু পার্থক্য আছে। শ্রুতি জ্ঞানী, যোগী ও কর্মীগণ সম্বন্ধে বলেছেন—**'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'** (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।৪।৬) অর্থাৎ ব্রহ্মভূত এই সাধকগণের সূক্ষ্ম দেহের উৎক্রমণ হয় না, তাঁরা সাধনপ্রভাবে তাঁদের স্থূল দেহ ও সূক্ষ্মদেহ নষ্ট করে পরব্রহ্মে বিলীন হয়ে যান। কিন্তু যাঁরা গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রাপ্তির

লালসায় রাগানুগা ভক্তিসাধন করেন, তাঁদের পরব্রহ্মে লীন হলেই সিদ্ধিলাভ হয় না বা মনোবাসনা পূরণ হয় না। তাঁদের চিরদিনের অভীষ্ট ও সর্বসাধনার সাধ্য হল গোপীদেহ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি। কিন্তু গোপীগর্ভে জন্মলাভ করে নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গলাভ করতে না পারলে কিছুতেই গোপীদেহে কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তিও সম্ভব হয় না। তাই শ্রীভগবান যখন তাঁর প্রপঞ্চলীলা প্রকট করেন তখন তাঁর সেবাপ্রাপ্তির জন্য সমুৎকণ্ঠিত সাধকগণ, যোগমায়ার সাহায্যে প্রকটলীলায় গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গমহিমায় তাঁদের ভাব পরিপক্ক হলে, তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাসলীলায় মিলন হয়। রাসলীলায় শ্রীভগবান এইরূপ অসংখ্য সাধনসিদ্ধ গোপীগণকে তাঁর নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়ে থাকেন।

চতুর্বিধা গোপী—পদ্মপুরাণে চতুর্বিধা গোপীদের বর্ণনা আছে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাসলীলায় সম্প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

গোপস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা দেবকন্যকাঃ।

গোপকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্য কদাচনঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী গোপীগণ শ্রুতি, ঋষি, দেবকন্যা ও গোপকন্যা ভেদে চতুর্বিধা। এঁরা কেহই সামান্য রমণীমাত্র নন। এই চারপ্রকার গোপীগণ হলেন নিত্যসিদ্ধা চিরন্তন গোপকন্যা, যাঁরা আবার গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ আর বাকি সমস্ত গোপীই হলেন সাধনসিদ্ধা। এই সাধনসিদ্ধা গোপীগণের বর্ণনা ও জন্মবৃত্তান্ত বিভিন্ন পুরাণে আছে।

ঋষিপূর্বা—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
রামং দৃষ্টা হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন সুবিগ্রহং॥
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্নবাৎ॥

(পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ পুরাকালে দণ্ডকারণ্য নিবাসী অনেক মহর্ষি কৃষ্ণোপাসক ছিলেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য দণ্ডকারণ্যে গেলে সেই মহর্ষিগণ শ্রীরামচন্দ্রের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে নিজোপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের মাধুর্যোপভোগ করার প্রবল বাসনা হয়। যদিও তাঁরা লজ্জাবশত শ্রীরামচন্দ্রের নিকট এইরূপ কোনো বর প্রার্থনা করতে পারেননি কিন্তু বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তাঁরা রাগভক্তিমার্গে সিদ্ধিলাভ করেন এবং গোকুলে গোপীগণের গর্ভে জন্মলাভ করে এবং নিজ নিজ বাসনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন।

শ্রুতিপূর্বা—

কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ।
কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্যশংসয়ঃ॥
যথা তল্লোকবাসিন্যো কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ।
ভজন্তি রমনং মত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা॥

(বামনপুরাণ)

এছাড়াও কিছু গোপী ব্রহ্মলোকবাসিনী শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে অন্য গোপীদের মতো তাঁদেরও শ্রীসেবাধিকার প্রাপ্তির লালসা জন্মায় এবং তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট আকুল প্রার্থনা করেন—হে কৃষ্ণ ! তোমার কোটি কন্দর্প অনুরূপ অঙ্গকান্তি দেখে আমাদের চিত্ত মদনবিক্ষুব্ধ হয় এবং কামিনীভাবে তোমাকে সেবা করার লালসা হয়। তোমার ধাম (শ্রীবৃন্দাবন)-বাসিনী গোপীকাগণ যেমন তোমাকে প্রাণবল্লভ জ্ঞানে এবং মধুরভাবে সেবা করে, আমাদেরও ওইরূপভাবে সেবা করার প্রবল বাসনা হয়। দয়া করে তুমি তা পূরণ করো।

দেবকন্যা—

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আছে—ব্রহ্মা যখন দৈত্য ভারাক্রান্ত পৃথিবীর দুঃখ দূর করার জন্য দেবগণসহ ক্ষিরোদ সাগর তীরে গমন করে ক্ষিরোদশায়ী নারায়ণের উপাসনা করেন, তখন ক্ষিরোদশায়ী নারায়ণ আকাশবাণীতে ব্রহ্মাকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার কথা

জানিয়ে বলেন—

বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥

(ভাগবত ১০।১।২৩)

অর্থাৎ এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতাররূপে বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হবেন এবং তাঁর প্রিয়াবর্গের সেবার জন্য (অথবা তাঁর আনন্দবর্ধনের জন্য) দেবকন্যাগণও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হোন।

এইভাবে পুরাণ বচন থেকে জানা যায় যে, শ্রীভগবানের আনন্দাংশে শ্রীরাধারানী ও তাঁর নিত্যপার্ষদ গোপীগণ ছাড়াও **দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষি,** ব্রহ্মলোকবাসিনী **শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ** এবং স্বর্গবাসিনী **দেবকন্যাগণও** গোপীদেহ প্রাপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সাধক ভক্তগণেরও শ্রীকৃষ্ণ সেবাধিকার প্রাপ্তি সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের সিদ্ধান্ত এই প্রকার—

সেই জীবগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
এক নিত্য মুক্ত একের নিত্য সংসার॥
নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণের পার্ষদ ভুঞ্জে কৃষ্ণ সেবা সুখ॥
কৃষ্ণ ভুলে যেই অনাদি বহির্মুখ।
সে কারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

সিদ্ধান্ত এই যে নিত্যমুক্ত জীবগণ কোনোদিনই সংসার দুঃখ ভোগ করেননি বা কোনো দিন করবেনও না। আবার নিত্যবদ্ধ জীবগণ কোনো দিন কৃষ্ণসেবা করেননি এবং তাঁরা অনাদিকাল হতে দেহগেহাদিতে অভিনিবিষ্ট হয়ে নিরন্তর তাতেই কালাতিপাত করে থাকেন। অবশ্য বদ্ধজীবেরাও সাধনানুষ্ঠানের ফলে ক্রমে মুক্তির পথে বা প্রেমভক্তির পথে অগ্রসর হন।

সাধক— যেমন যেমন সাধক ভক্তগণের সাধনাভিনিবেশ বাড়তে থাকে তেমন তেমন শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় তাঁদের সাধনানুষ্ঠান ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্মেরই

অবসান হয়ে যায়।

সিদ্ধ— সেই রকম সিদ্ধ ভক্তগণেরও যেমন যেমন সেবাভিনিবেশ বর্ধিত হতে থাকে তেমন তেমন শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ সেবা ব্যতীত অন্য সর্ববিধ কর্মেরই অবসান হয়ে যায়। কিন্তু সিদ্ধভক্তগণেরও যতদিন পর্যন্ত না উৎকট সেবাভিনিবেশ বা সেবাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ হয়, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের কিছু কর্মবন্ধন অবশিষ্ট থাকে কিন্তু তাঁরা কখনই তাঁদের ধর্ম অভিনিবেশ ব্যতীত অন্য কোনো দিকে মন বসাতে পারে না।

বিধিধর্মে ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ। নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, রঘুনাথদাস আদি মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদগণও সাধনবিহীন জীবগণকে সাধনশিক্ষা দেওয়ার জন্য সাধনানুষ্ঠানে রত হলেও তাঁদের যথাযোগ্য রাজকার্য পালন করতেন, কিন্তু অবশেষে যখন প্রভুর কৃপায় তাঁদের সংসার বন্ধন মুক্ত হল তখন আরম্ভ হয় তাঁদের নিত্য মানসসেবা—

সাড়ে সাত প্রহর যায় ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড বিশ্রাম তবু নহে কোন দিনে॥

এইভাবে নিরন্তর তাঁদের সাধন-নিষ্ঠা প্রকাশ পেত।

সেইরকম সাধনসিদ্ধা গোপীগণেরও তাঁদের গৃহকর্ম, শিশুপালন, পতিসেবন আদি কতকগুলি ধর্মের বন্ধন ছিল, কিন্তু তাঁদের সেবাকাঙ্ক্ষা বলবতী হলে কৃষ্ণের অপার করুণায় তাঁদের সেসকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন শুনে শ্রীকৃষ্ণ অভিমুখে ধাবন করলেন।

আবার সাধনসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে যাঁরা প্রাচীনা (বা উচ্চ সংস্কারযুক্ত) অর্থাৎ পূর্বকল্পের প্রকট লীলায় যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ সেবাধিকার পেয়েছেন, তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ সেবা ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার কাজই করতে হয় না। তাঁরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধনের জন্য নিজেদের অঙ্গমার্জনা, অলঙ্কার পরিধানাদি করে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন আর এই বিরহ প্রতীক্ষাই

ছিল তাঁদের সাধনা।

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহ প্রীত। সেহত কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈনু মুই কৃষ্ণে সমর্পণ। তার ধন তাঁর ইহা সম্ভোগ সাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সম্ভাষণ। এই লাগি করে অঙ্গের মার্জন ভূষণ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

প্রেম বিরহ-মিলনাত্মক—স্বজনপ্রেম বিবর্ধন চতুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করার জন্য তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতেন না। কেননা '**ন বিনা বিপ্রালম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে**' (উজ্জ্বল নীলমণিঃ) অর্থাৎ বিরহ ব্যতীত কখনো সম্ভোগের পুষ্টিলাভ হয় না। যেখানে নিরন্তর মিলন, কিন্তু বিরহের কোনো সম্ভাবনাই নেই, সেখানে মিলনের সুখানুভূতিও হয় না। যেমন ক্ষুধায় অন্ন পেলে তার মাধুর্যাস্বাদন হয় কিন্তু অক্ষুধায় কখনই তা হয় না। বিরহের পর মিলনের যেমন মাধুর্য আস্বাদন হয়, চিরমিলনে বা অবাধ মিলনে কখনই তা সম্ভবপর হয় না। লক্ষ্মীগণ শ্রীভগবানের প্রেয়সী হলেও তাঁদের বিরহ নেই, অনাদিকাল থেকে তাঁরা চিরমিলন সিন্ধুতে মগ্না আবার শ্রীকৃষ্ণ বা রাম অবতারের মহিষীগণ বিবাহ বিধিতে অঙ্গীকৃত, তাই তাঁরা নিরুদ্বেগ অবাধ মিলন-সিন্ধুতে নিমগ্না থাকেন, তাই কারও মিলন পূর্ণাসুখাবহ নয়। তাই ব্রজের গোপীগণ সকলেই পরবধূ, তাই তাঁদের যদি কোনো সুযোগে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হয় তবে তাঁরা যে অনির্বচনীয় সুখ আস্বাদন করেন, তার সঙ্গে লক্ষ্মীগণের চিরমিলন বা মহিষীগণের অবাধ মিলনের কোনো তুলনাই হয় না।

তাই চৈতন্যচরিতামৃতকার বলছেন—

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্মল তাঁর প্রেম সর্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য রস আস্বাদন কারণ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই ব্রজবধূগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের পরম শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর প্রেমে এমন বিশেষত্ব আছে যে তাঁর সঙ্গে লীলাবিলাসেই শ্রীকৃষ্ণের

পূর্ণানন্দাস্বাদন হয়ে থাকে এবং শ্রীরাধার সহিত মিলনই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র অভিপ্রেত। তবে শ্রীরাধিকার সঙ্গে পূর্ণ মিলন রসাস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য গোপীজনের সঙ্গে রাসক্রীড়ায় মিলিত হন।

রাসসহ ক্রীড়ারস আস্বাদ কারণ। আর সব গোপী হয় রসোপকরণ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীভগবানের স্বভাবই এই যে, তিনি তাঁর প্রেমবান ভক্তের সেবাগ্রহণের জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত হলেও তাঁদের সেবাকাঙ্ক্ষা বর্ধনের জন্য তিনি কিছুদিনের জন্য ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক নির্লিপ্তের ন্যায় অবস্থান করেন। তারপর প্রেমবান ভক্তগণের তীব্র সেবাকাঙ্ক্ষার অদম্য প্রেরণাবশত যখন শ্রীভগবানের ধৈর্য বিগলিত হয়ে যায়, তখন তিনি আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করে যে কোনো প্রকারে প্রেমবান ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের প্রেমানুরূপ সেবাগ্রহণ করে তাঁদের কৃতার্থ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বর্ণিত আছে যে, দেবর্ষি নারদ তাঁর পূর্বজন্মের পঞ্চম বর্ষ বয়সে যখন সনক-সনাতনাদির নিকট শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র প্রাপ্ত হয়ে নির্জন বনে গমন করে নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন হলেন, তখন শ্রীভগবান তাঁকে একবার দর্শন দিয়েই অন্তর্হিত হলেন। বালক নারদ তখন প্রভুর অদর্শনে উন্মত্তের মতো বনে বনে তাঁকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। নারদের এই আর্তি ও দৈন্য দেখে শ্রীভগবান দৈববাণীতে নির্দেশ দিলেন—

সকৃৎ যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্॥

(শ্রীভাগবত ১।৬।২৩)

বৎস নারদ ! আমাকে দর্শন করার জন্য তোমার উৎকণ্ঠা ক্রমশ যাতে বেড়ে ওঠে সেইজন্যই তোমাকে একবার দর্শন দিলাম।

যাদের আমাকে দেখার তীব্র উৎকণ্ঠা হয়, তাদের ক্রমশ সমস্ত কামনা বাসনা দূর হয়ে যায়। আমার কথা চিন্তা করতে করতে তুমি এই জীবনটা কাটিয়ে পরজন্মে আমার পার্ষদদেহ লাভ করবে।

সাধকদেহে প্রেমলাভ করা অতীব দুর্লভ। সাধক ভক্তগণ, সাধনানুষ্ঠান

করতে করতে যখন প্রেমের পূর্বাবস্থায় রতি বা ভাব লাভ করেন, সেই সময় কৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার প্রেরণায় যে ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণলীলা প্রকট থাকে, সেই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁদের গোপীগর্ভে জন্ম হয়। তখন নিত্যসিদ্ধা কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের সঙ্গবশতঃ তাঁদের রতি গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে প্রেমে পরিণত হয় এবং তা ক্রমশঃ পুষ্ট হয়ে মহাভাবে পরিণত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় তাঁর প্রার্থনা গীতে গেয়েছেন—

'কবে বৃষভানু পুরে, আহিরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব'।

একমাত্র গোপী দেহই রাসাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সেবাপ্রাপ্তির উপযুক্ত দেহ। যতদিন না এই প্রকার দেহ লাভ হয় ততদিন পর্যন্ত মনে মনে এই দেহ কল্পনা করে, নিরন্তর ব্রজ-মানসে কৃষ্ণসেবা ভাবনা করতে হয়, আর বাহ্য সাধকদেহে শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করতে হয়। বাহ্য সাধকদেহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ কোনোই সম্বন্ধ নেই। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষার্থে বলেছেন—

বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন। বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। নিরন্তর করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

গোপীপ্রেম ও জাগতিক প্রেম—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য প্রেম হয় মহাবল॥
লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম, কর্ম। লজ্জা, ধৈর্য, দেহসুখ, আত্মসুখ, মর্ম॥
দুস্ত্যজ, আর্যপথ নিজ পরিজন। স্বজন করয় কত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ। কৃষ্ণপ্রেম লাগি মাত্র প্রেমের সম্বন্ধ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই যে অপ্রাকৃত গোপী প্রেম তা কিন্তু সাধারণ জীবের বোধগম্য নয়। কারণ শ্রীভগবানের অপার কৃপাবৈভবে সকলের বিশ্বাস হয় না। কৃষ্ণকৃপায়

বিশ্বাস করা বহু জন্মের তীব্র সাধনার ফল।

জন্মান্তরসহস্রেষু তপোযোগ সমাধিভিঃ।
নরানাং ক্ষীণপাপানাং হরৌ বক্তি প্রজায়তেঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

সহস্র সহস্র জন্মের তপস্যা, যোগ ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা যাদের সর্ববিধ পাপবাসনা ক্ষয় হয়ে যায়, তাদেরই শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ হয় এবং তার ফলেই শ্রীভগবানের কৃপাবৈভবে বিশ্বাস জন্মায়। তাই শ্রীভগবানে কৃপাবৈভব বা অপ্রাকৃত গোপীপ্রেমে বিশ্বাস থাকা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব রাসলীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে এই গোপীপ্রেম আস্বাদনের প্রকৃত তত্ত্ব তাই মহারাজ পরীক্ষিৎকে এইভাবে বলছেন—**'আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমা'** (ভাগবত ১০।২৯।৪)। অর্থাৎ শ্রীশুকদেব গঙ্গাতীরে বসে বলছেন, রাসলীলায় বংশীশ্রবণ মাত্রেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করলেন। এই শ্লোক শ্রবণ করলে মনে হয় তিনি যেন গোপীদেহে গোপীনাথের নিকট উপস্থিত আছেন আর ওইখানে থেকে গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ নিকট আগমন সাক্ষাৎ দর্শন করছেন। তিনি যদি নিজেকে গঙ্গাতীরেই অবস্থিত ভাবনা নিয়ে রাসলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হতেন, তবে গোপরমণীগণের যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমনকে আগমন বলতে পারতেন না।

এই বর্ণনায় জগতের সাধক ভক্তগণের বিশেষ শিক্ষার বিষয় হওয়া উচিত এই যে—তাঁরা যেন রাসলীলা আলোচনার সময় স্ত্রী, পুত্র-পরিজন বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত গৃহকারাগারে বসে গোপীগণের কৃষ্ণনিকটে গমনের কথা চিন্তা না করেন, তাঁরাও যেন এই মানসে চিন্তা করেন যে তাঁরাও ভাবযোগ্য দেহে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে অবস্থান করছেন এবং গোপীগণের আগমন প্রত্যক্ষ করছেন। প্রাকৃত জগতের নানাবিধ কামনা-বাসনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে অপ্রাকৃত প্রেমরসময় লীলা আলোচনা করতে গিয়ে সকলেরই নানাবিধ অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা প্রভৃতির জালে জড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু কেউ যদি গোপীভাবে ভাবিত হয়ে গোপীর অনুগত হয়ে গোপীনাথের চরণপ্রান্তে

উপস্থিত হতে পারেন এবং সেখান থেকে লীলার রসাস্বাদন করতে পারেন, তাহলেই তিনি এর প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করে কৃতার্থ হতে পারবেন।

যোগমায়ার স্বরূপ—

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব শ্রীভগবানের রাসলীলার বর্ণনাক্রম **'ভগবানপি তা রাত্রি'** প্রভৃতি শ্লোক দিয়ে শুরু করে বলছেন **'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ'** অর্থাৎ এই লীলা সংঘটিত হল শ্রীভগবানের অঘটন-ঘটন পটীয়সী শক্তিরূপা যোগমায়ার সাহায্যে। শ্রীভগবান যদি কেবল তাঁর ঐশ্বর্য বীর্যাদি ষড়বিধ মহাশক্তির সাহায্যেই গোপীগণের সঙ্গে রমণে প্রবৃত্ত হতেন, তা হলে তাঁর এই লীলা সর্বতোভাবে মাধুর্যময় হতে পারত না আর তিনিও গোপীপ্রেমে আত্মহারা হতে পারতেন না। তাঁর যোগমায়া শক্তির বিকাশ হওয়ার ফলেই গোপীপ্রেমে আত্মহারা শ্রীভগবান রাসলীলায় যখন যা ইচ্ছা করেছেন তখনই তার সামঞ্জস্য হয়ে গেছে। রাসলীলায় যোগমায়ার প্রভাব পরবর্তী স্থানে আলোচিত হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধের প্রারম্ভে যেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কথা বর্ণিত আছে, সেখানে দেখা যায় যে দৈত্য-ভারাক্রান্তা পৃথিবীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে ব্রহ্মা যখন ক্ষীরোদসাগর তীরে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের স্তুতি করেন তখন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ দৈববাণীতে নির্দেশ দিয়েছিলেন—

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥

(ভাগবত ১০।১।২৫)

অর্থাৎ এবার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন এবং তাঁর পরমৈশ্বর্যশালিনী মায়া যাঁর প্রভাবে সর্বজগৎ মোহিত থাকে, সেই মায়া স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে সর্ববিধ লীলার সামঞ্জস্য বিধান করবেন।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে আবির্ভাবের পূর্বেই যোগমায়া ভগবানের অগ্রজ বলরামকে দেবকীগর্ভ থেকে আকর্ষণ করে রোহিণীগর্ভে স্থাপন করেন। দেবী যোগমায়া সর্বশক্তিবরীয়সী, শ্রীলীলাতত্ত্বজ্ঞা এবং মহাবিষ্ণুস্বরূপা। এঁর তত্ত্ব জানতে পারলে পরাৎপর দেবদেব শ্রীভগবানের চরণপ্রাপ্তি সুলভ হয়।

এঁর কৃপা ব্যতীত কারও শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। ইনি প্রেমসর্বস্ব স্বভাবা এবং গোকুলাদিষ্ঠাত্রী। ইনি লীলাসম্পাদনকারিণী আর লীলাসৌষ্ঠব সাধন করার জন্য যাকে যখন মোহিত করার প্রয়োজন হয় ইনি তাই করে থাকেন। তবে বহির্মুখ জীবের সঙ্গে এঁর কোনো সম্পর্ক নেই। এঁরই আবরিকা শক্তি মহামায়ার প্রভাবে বহির্মুখ জীব দেহ-গেহাদিতে আবদ্ধ হয়ে স্বপরিকল্পিত বিবিধ সংসার রচনা সৃষ্টি করে এবং সংসার-যাতনা ভোগ করে থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও মায়া ও যোগমায়া এই প্রকার নামের উল্লেখ আছে— **'মায়ামুগ্ধ জীবের নাই স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান'** এবং **'যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি'** ইত্যাদি।

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ভগবানের ত্রিবিধা শক্তির উল্লেখ আছে—এঁরা হলেন **'বিমুখমোহিনী'**, **'উন্মুখমোহিনী'** ও **'আত্মমোহিনী'**।

বিমুখমোহিনী—এ হল যোগমায়ার সেই আবরিকা শক্তি যা অবিদ্যারূপে কৃষ্ণবহির্মুখ জীবকে বন্ধন করে, মার্কণ্ডেয়পুরাণে শ্রীশ্রীচণ্ডী বলছেন, **'মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ'** (চণ্ডী ১।৫৪)। অথবা দেহাভিমানীদের তিনি জগতের প্রতি আকৃষ্ট করে মুগ্ধ করে রাখেন **'যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্বং সর্বেব দেহাভিমানিনঃ'**। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলছেন—

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
সে কারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥

উন্মুখমোহিনী—শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত এবং সেবাপরায়ণ এই সব ভক্তগণের সঙ্গে পূর্বোক্ত বিমুখমোহিনী মায়ার কোনো সম্বন্ধই নেই। শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত ভক্তগণ যেভাবে শ্রীভগবানের সেবা করতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবানের উন্মুখমোহিনী মায়া তাঁদের সেইভাবেই মুগ্ধ করে এবং তাঁদের দিয়ে সেই সেই সেবা সম্পাদন করিয়ে থাকে। মার্কণ্ডেয়পুরাণ বলছেন—**'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী'** (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৫৭) অর্থাৎ এই মহামায়াই বিদ্যারূপে ভক্তগণের সংসারবন্ধন মোচন করে। সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত ব্রজের গোপীগণ তাই কেহ সখ্যে, কেহ বাৎসল্যে কেহ বা মধুরভাবে শ্রীভগবানের সঙ্গে প্রেমসম্বন্ধ স্থাপন করে তাঁর সঙ্গে বিবিধ ব্যবহার

করে থাকেন। বিমুখমোহিনী হল প্রভুর বহিরঙ্গা মায়া আর উন্মুখমোহিনী হল তার অন্তরঙ্গা মায়া।

আত্মমোহিনী— শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়া ও অন্তরঙ্গা মায়া ছাড়া তাঁর আরো একটা অভিনব মায়া আছে—সে মায়ায় শ্রীভগবান নিজে পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যান। গোপীগণের আনন্দবর্ধন করার জন্য কেবলমাত্র গোপীগণই শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা মায়ায় মুগ্ধ হননি, শ্রীভগবানও তাঁদের প্রেমোচিত সেবাগ্রহণ করতে গিয়ে, তাঁদের মনোরথ পূর্ণ করার জন্য, নিজেও নিজ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। শ্রীশ্রীশুকদেব ওই অভিনব মায়াকেই এখানে **'যোগমায়া-মুপ্রাশ্রিতঃ'** বলে অভিহিত করেছেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে মেধস ঋষি ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক এই যোগমায়াকেই বিষ্ণুনিদ্রা বলে অভিহিত করে তাঁর স্তুতিতে প্রবৃত্ত হওয়ার বর্ণনা করেছেন—

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৭১)

শ্রীভগবানের এই আত্মমোহিনী পরাশক্তি যোগমায়া দেবী বিশ্বেশ্বরী, জগজ্জননী, স্থিতিসংহারকারিণী রূপে অভিহিতা এবং মহাপ্রলয়ে মহাবিষ্ণুই আবার নিজশক্তি যোগমায়া দ্বারা নিজেই যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়েন। শ্রীভগবান তাঁর যোগমায়া শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে রাসক্রীড়া করেন আবার তাঁরই প্রভাবে মহাপ্রলয়ে যোগনিদ্রায় অচেতন থাকেন।

শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তি তবে তার মধ্যে তাঁর কৃপাশক্তিই শ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার তাই বলছেন, হে ভগবন্! —

'তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দকর্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম॥' (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভক্তিরসসিন্ধু শ্রীশুকদেব শ্রীভগবানের এই কৃপাকেই যোগমায়া বলে উল্লেখ করেছেন। **'মায়াদম্ভে কৃপায়াঞ্চ'** এই অভিধান বচন অনুসরণ করলে মায়ার অর্থ 'কৃপা' আর **'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ'** অর্থ হয় শ্রীভগবান গোপীগণের সঙ্গে রমণ করতে ইচ্ছুক হয়ে এমনই কৃপাবিশেষ প্রকাশ করলেন

যে, তাতে গোপীগণের তাঁর সঙ্গে অবাধ মিলন সংঘটিত হতে পারে। শ্রীভগবানের সহিত মিলনের একমাত্র কারণই হল তাঁর কৃপা। তাঁর কৃপা ব্যতীত কেউই আত্মশক্তিতে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। যদিও শ্রীভগবানের কৃপা বিতরণে কোনো পক্ষপাতই নেই, তাহলেও ভক্তের আকুল উৎকণ্ঠা ব্যতীত তাঁর কৃপার প্রকাশ হয় না।

নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং বিভুম্॥

(নারায়ণ আধ্যাত্মপোনিষদ্)

শ্রীভগবান নিত্য অব্যক্ত (অবাঙ্মনসগোচর) হলেও নিজ কৃপায় তিনি তাঁর ভক্তগণের দৃশ্য হয়ে থাকেন। তাঁর কৃপা ব্যতীত কেউই পরমাত্মতত্ত্বকে জ্ঞানগম্য করতে পারে না। তিনি আপন কৃপাতেই ভক্তগণের দৃশ্য, বাচ্য, ভাব্য ও সেব্য হয়ে থাকেন, আর তাঁর কৃপা বর্ষিত হয় কেবল ভক্তের প্রেমে আকর্ষিত হয়ে। লোহা যেমন চুম্বকের দিকে স্বভাবতই ধাবিত হয়, সেইরকম শ্রীভগবানের কৃপাও স্বভাবতঃই প্রেমবান ভক্তের দিকেই ধাবিত হয়। শ্রীভগবানের কৃপা যেন লোহা আর ভক্তের প্রেম যেন চুম্বক। চুম্বকের যেমন লোহাকে আহ্বান করতে হয় না, সে তার স্বভাববশতঃই চুম্বকের সঙ্গে জুড়ে যায়, সেইরকম প্রেমেরও কৃপাকে আহ্বান করতে হয় না, কৃপা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই প্রেমবান ভক্তের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু যদি লোহার পরিমাণ অপেক্ষা চুম্বক দুর্বল হয় তবে চুম্বক তাকে আকর্ষিত করতে পারে না। আবার যদি লোহার পরিমাণের থেকে চুম্বক অতি শক্তিশালী হয় তবে লোহা আর স্থির থাকতে পারেনা তা দ্রুত চুম্বকের সংলগ্ন হয়। শ্রীভগবানের কৃপার পরিমাণ এত বেশি যে যৎকিঞ্চিৎ প্রেম তাকে চালনা করতে পারে না। কিন্তু ব্রজরমণীদের প্রেমের কথার আর কী বলার আছে ? সে প্রেমের পরিমাণ এতই প্রচুর যে তা শ্রীভগবানের অনন্ত কৃপাসিন্ধুকেও তার নিজের দিকে অতি সহজেই আকর্ষণ করে।

শ্রীভগবানের মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, নারায়ণাদি অনন্ত মূর্তি আছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ব্যতীত আর কোনো মূর্তিই **'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ'**

(বংশীধারী) নয়। প্রভু এই মূর্তিতে বংশীধারণ করে বনে বনে কুঞ্জে কুঞ্জে যমুনা পুলিনে, গোবর্ধন তটে বিচরণ করে নিজে পরমানন্দ রসাস্বাদন করেছেন ও সর্বজীবে তা বিতরণ করেছেন। লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাই বলেছেন—

সন্ত্বত্বারাঃ সহস্রশঃ পুষ্করনাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত)

পদ্মনাভ শ্রীভগবানের সহস্র সহস্র অবতার আছেন এবং সমস্ত অবতারই সর্ববিধ মহাশক্তিপূর্ণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিনা শ্রীভগবানের এমন কোনো অবতার আছে যিনি বৃক্ষলতাদিকেও প্রেমরসসিক্ত করেছেন। তাই শ্রীভগবানের অনন্ত মূর্তি থাকলেও বংশীধারী মূর্তিই সর্বমনোহর, অনন্তলীলা থাকলেও একমাত্র এই লীলাই আত্মপর-চমৎকারিণী এবং অনন্ত ভাব থাকলেও এই ভাবই ভাবের অবধি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার তাই বলছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা নরবপুঃ তাহার স্বরূপ।
দ্বিভুজ মুরলীধর নব কিশোর নটবর নরলীলার হয় অনুরূপ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি তার শক্তি লোক দেখাইতে।
এই রূপ রতন ভক্তজনের প্রাণধন প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

রাসলীলায় যোগমায়ার প্রভাব—

রাসলীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়ে ভক্তচূড়ামণি শ্রীশুকদেব বলছেন—**'বীক্ষং রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিত'** অর্থাৎ শ্রীভগবানের যখন গোপ-রমণীগণের সঙ্গে রমণের ইচ্ছে হল তখন ভগবানের যাবতীয় ইচ্ছা পূরণের জন্য রাসলীলার সকল উপকরণ যথা—দেশ (শ্রীবৃন্দাবন ধাম), কাল (শরৎ ঋতু) ও পাত্রদের (ব্রজ গোপীগণের) এই রাসলীলার উপযোগী করার ও সমস্ত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য, অঘটন-ঘটন পটীয়সী শ্রীভগবানের অচিন্ত্য মহাশক্তি রূপিণী যোগমায়া দেবী তাঁর পরাশক্তি প্রকাশিত করলেন।

প্রকৃতির পরিবর্তন—শ্রীশুকদেব পরের শ্লোকে বলছেন—**'তদা উড়ুরাজঃ উদগাৎ'** (ভাগবত ১০।২।২৯) অর্থাৎ শ্রীভগবানের রমণেচ্ছা পূরণের জন্য

তারকাপতি উদিত হলেন। **'রমণের ইচ্ছা কানু করিল যখন, হরিষে তারকাপতি উদিত তখন'** (মাধবাচার্যর মধুমঙ্গল)। তাৎপর্য এই যে যখন শ্রীভগবানের চরণে একান্ত শরণাগত ও অনুগত ভক্তগণের ভগবৎ সেবা ও তাঁর আনন্দবর্ধনের জন্য পূরিপূর্ণ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়, তখনই তাঁদের মনোরথ পূরণের জন্য শ্রীভগবানের ইচ্ছার উদয় হয় আর তৎক্ষণাৎ তাঁর অলঙ্ঘ্য ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সর্বজগৎ তাঁর ইচ্ছার অনুরূপভাবে পরিণত হয়ে যায়। শারদ রজনীতেও শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণের প্রবল সেবাকাঙ্ক্ষাবশত শ্রীভগবানের যেমন তাঁদের মনোরথ পূরণ করার জন্য রমণেচ্ছা হল, অমনি পূর্ণ শশধর উদিত হয়ে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যেন ইঙ্গিত করছে হে কৃষ্ণ! তোমারই রাসক্রীড়ার জন্য যমুনা তীরভূমি আলোকিত করেছি এখন তুমি এসে তোমার স্বচ্ছন্দবিহার আরম্ভ করো। আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজরমণীগণের সঙ্গে রমণ করতে ইচ্ছা করলেন তখন শরৎকাল, সুতরাং বসন্ত ঋতুর তখনও দীর্ঘকাল বিলম্ব ছিল (দীর্ঘদর্শন), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছামাত্রেই তাঁর পরম প্রিয় এবং সর্বজীবের সুখসেব্য ঋতুরাজ বসন্ত ঋতু শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়ে সমস্ত রণভূমিই সুসজ্জিত করে দিলেন।

শরীরের পরিবর্তন—শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা জাগা মাত্র গগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় এবং বনভূমিতে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবের ফলে দেশ ও কাল, রমণের উপযোগী হল বটে কিন্তু রমণের পাত্র শ্রীকৃষ্ণ কিংবা গোপীগণের কেউই রমণের উপযুক্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন আট বৎসর মাত্র আর গোপীগণ আরও অল্পবয়স্কা। যদিও শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তি-নিকেতন স্বয়ং ভগবান এবং গোপীগণও তাঁরই হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত মূর্তি তাহলেও মহাপ্রেম রসময় ব্রজলীলায় তাঁরা এমনই মুগ্ধ ও আত্মহারা হয়ে থাকেন যে তখন নিজ নিজ স্বরূপৈশ্বর্য্যাদিরও তাঁদের অনুসন্ধান থাকে না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীগণের সঙ্গে রমণ করতে ইচ্ছে করলেন তখন অচিন্ত্য মহাশক্তিরূপিণী যোগমায়া দেবীর শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব হল। পদ্মপুরাণ বলছেন—

বাল্যেঽপি ভগবান কৃষ্ণঃ কৈশোরং রূপমাস্থিতঃ।

রেমে বিহারৈর্বিবিধৈঃ প্রিয়য়া সহ রাধয়া॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ প্রকটলীলা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ যখন বালক তখন ব্রজরমণীগণের সঙ্গে তাঁর রমণ করতে ইচ্ছে হল তখনই আর তাঁর বাল্যভাব ও বালক-দেহ থাকল না, কিংবা ব্রজগোপীগণও তখন আর বালিকা থাকলেন না। শৃঙ্গার রসের আবির্ভাব হল আর বালক-বালিকা দেহই কিশোর ও কিশোরীরূপে পরিণত হল এবং দেহে কৈশোর শোভা এবং কৈশোরোচিত কার্যক্ষমতা প্রকাশ পেল। রাসলীলা বর্ণনায় পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব বর্ণনা করেছেন—**'বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবস্তনালভননর্মনাগ্রপাতৈঃ'** (ভাগবত ১০।২৯।৪৬)। এই রাসলীলা বর্ণনায় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের সঙ্গে রাসবিহারের বর্ণনায় তাঁদের দেহে ও দৈহিক বর্ণনায় বাল্যভাবের লেশমাত্র ছিল না।

কৃষ্ণের বেণুবাদন— পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব পরবর্তী শ্লোকে বলেছেন— **'জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্'** (ভাগবত ১০।২৯।৩)। অর্থাৎ যোগমায়া কর্তৃক দেশ, কাল, পাত্রর অনুকূল সামঞ্জস্য আসা মাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে আনয়ন করার জন্য যমুনাতীর হতে মোহন বেণুবাদন করলেন। শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদমাধুর্যে সমস্ত বনভূমিই ভাবসিন্ধুতে ভাসমান হল। ওই বেণুনাদ মধুর ও অস্ফুট আর ওই মাধুর্য সকলের চিত্তাকর্ষণ করল এবং সকলেরই মনে হল যেন মোহনিয়ার মোহন বাঁশী তার নাম ধরেই ডাকছে। শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে মহাভাবময়ী ধৈর্যগাম্ভীর্যাদি মহাগুণশালিনী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার ধৈর্যপর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবের কত প্রকার ব্যাখ্যা যে কত শাস্ত্রে করা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবের কী আশ্বর্য বিশেষত্ব, এই বেণুনাদ কেবল অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণেরই কর্ণগোচর হয়েছিল, মাতৃস্থানীয়া গোপী, পিতৃস্থানীয় গোপগণ, শ্রীদাম সুবলাদি বন্ধুবর্গ, গো-মহিষাদি পশুগণ বা অন্য কেউই শ্রীকৃষ্ণের এই পরম মধুর বেণুনাদ শুনতে পারেননি। এই শ্লোকস্থ **'বামদৃশাং মনোহরম্'** এই অংশ হতে জানা যায় যে, অনুরাগিণী ব্রজরমণীগণের সঙ্গে রাসক্রীড়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে বেণুনাদ করেছিলেন, তা

কেবল তাঁর অনুরক্তা ব্রজরমণীগণের কর্ণেই প্রবেশ করেছিল এবং তাঁদের মনোহরণ করেছিল।

ব্রহ্মসংহিতায় আছে—**'গোলোক এব নিবসত্যাখিলাত্মভূতো গোবিন্দ-মাদিপুরুষং তমহং ভজামি'**(ব্রহ্মসংহিতা)। অর্থাৎ অখিলাত্মা আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দ প্রপঞ্চাতীত গোলোকধামে নিজশক্তি (গোপীগণ) সহ নিত্যলীলাবিলাস করে থাকেন। কিন্তু সেখানকার লীলায় পরকীয়া ভাব নেই বা তার আদি নেই, অন্ত নেই, নেই বিরহ, আছে কেবল মিলনোৎকণ্ঠারহিত নিত্যসংযোগ। সেইজন্য রসিক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই নিজশক্তিবর্গকে পরকীয়াভাবে ভাবিত করে মিলন-বিরহাত্মক রসনির্যাস আস্বাদন করার জন্য ভূলোকে অবতীর্ণ হন।

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ জারভাবময় প্রেমের বিশেষত্ব আস্বাদন করার জন্য শ্রীরাধিকাদির নিত্য-প্রেয়সীগণসহ ভূলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং জগৎকে এই প্রেমের বিশেষত্ব দেখিয়েছেন।

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিই না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দুহাঁর রূপ গুণে দুঁহার নিত্য হয়ে মন॥
ধর্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রসনির্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ॥
ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

সখীগণের স্বভাব ও কৃষ্ণপ্রেম—

শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান ও শ্রীরাধিকা তাঁর শক্তি, একজনেরই দুই মূর্তি। শ্রীভগবানের শক্ত্যাভিমানিনী মূর্তি শ্রীরাধিকা এবং স্বরূপাভিমানিনী মূর্তিই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্তি শ্রীরাধিকা এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে লীলারসাস্বাদন করানোর জন্য অনাদিকাল থেকে বহু মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে

লীলা করে থাকেন। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীবৃন্দ তাঁরই মূর্তিভেদ।

আকার স্বরূপভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপে তাঁর রসের কারণ॥
বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলায় সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

কান্তাভাব ও সখীভাব সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় যে শ্রীরাধিকাদি যে সমস্ত কান্তভাবময়ী রমণী আছেন, তাঁরা বিবিধ বিলাসী বিহারী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধন করেন। কিন্তু যাঁরা সখীভাবসম্পন্না তাঁরা কখনই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিলাসবিহারাদির প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁরা নিজ যূথেশ্বরীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করতেই ব্যস্ত থাকেন। মিলনকালে তাঁরা যথাযোগ্য চামরব্যজন, তাম্বূলাদি অর্পণ ইত্যাদি দ্বারাই সেবা করেন এবং তাঁদের জন্য নানাবিধ বিলাস সামগ্রী সম্পাদন করেন।

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় সখীর নাহি মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হতে তাহা কোটি সুখ পায়॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

সাধক ভক্তগণের মধ্যে যাঁরা কান্তাভাব প্রাপ্তির জন্য সাধনানুষ্ঠান করেন তাঁরা সিদ্ধদশায় গোপীদেহ লাভ করে কান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁরা সখীভাব প্রাপ্তির লালসায় নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের আনুগত্যে সাধনানুষ্ঠান করেন তাঁরা সিদ্ধিদশায় গোপীদেহ লাভ করে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁর চরণানুগত ভক্তগণকে সখীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তির সাধনারই উপদেশ করেছেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সখীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তির রাগানুগা সাধনমার্গ প্রচলিত আছে।

যাঁদের শ্রীকৃষ্ণ প্রেম আছে, তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণবিরহে মহাদুঃখ ও

শ্রীকৃষ্ণমিলনে পরমানন্দসাগরে ভাসমান থাকেন। জাগতিক সুখ-দুঃখের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমিলনের ও বিরহের কোনো সাদৃশ্যই নেই।

এই প্রেমের আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বন, মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আমাদের জাগতিক দুঃখভোগ কালে সুখের অনুভূতি হয় না আবার সুখ ভোগ কালে দুঃখেরও অনুভূতি থাকে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবান ভক্তগণ যুগপৎ তাঁদের পরমশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের মিলনসুখ ও বিরহ দুঃখের অনুভব করে থাকেন। তাঁদের যখন বাহ্যদেহে ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হয় তখন অন্তরে শ্রীকৃষ্ণবিরহের তীব্রতাপ অনুভূত হয় আর যখন বাহ্যদৃষ্টি ও বাহ্যদেহে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ হয় তখন অন্তরে অফুরন্ত মিলনান্দর অনুভব হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানন্দ নিত্যনতুন, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মান ভাবে অসমোর্ধ সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়ে থাকে।

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁর প্রকট লীলার শেষ দ্বাদশ বছর পুরীধামে গম্ভীরামধ্যে অবস্থিত থেকে বিরহিনী শ্রীরাধার ভাবে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানন্দাস্বাদন করতেন তা তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে কিছু আস্বাদন করিয়েছেন—

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে নিজভাব করেন বিদিত।
বাইরে বিষজ্বালা হয় অন্তর আনন্দময় কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এইরকমভাবে শ্রীকৃষ্ণ যখন রমণ করতে ইচ্ছা করে বংশীধ্বনি করলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যমুনাকূলের দিকে ধাবিত হলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কতিপয় ব্রজগোপী নিজ নিজ পতিগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে গৃহেই রয়ে গেলেন। পরমহংস চূড়ামণি শ্রীশুকদেব এই গোপীগণের সম্বন্ধে বলছেন—

অন্তর্গৃহগতঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥

দুঃসহপ্রেষ্ঠ বিরহ তীব্রতাপধূতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নিবৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥

(ভাগবত ১০।২৯।৯-১০)

অর্থাৎ গৃহে অবরুদ্ধা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহ দুঃখে চক্ষু নিমিলিত করে তাঁরই চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হলেন। দুঃসহ শ্রীকৃষ্ণবিরহে এই সমস্ত গোপীগণের সর্ববিধ অশুভ দূর হয়ে গেল আর ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণমিলনপ্রাপ্তিজনিত পরমানন্দে সর্ববিধ মঙ্গলেরও অবসান হয়ে গেল। তখন তাঁরা ধ্যানযোগে সেই পরমাত্মাকে পেয়ে সর্ববিধ বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজ গুণময় দেহ পরিত্যাগ করলেন।

এখানে ব্রজরমণীগণের অশুভ ক্ষয় ও মঙ্গল ক্ষয় বলতে প্রারব্ধ কর্ম-জনিত পাপ (দুঃখদায়ক) ও পুণ্য (সুখদায়ক) নয়, কেননা জাতরতি সাধক-ভক্তগণের প্রারব্ধ কর্মবন্ধন থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ সেবাধিকার প্রাপ্তির বাধাই তাঁদের কাছে অশুভ ও শ্রীকৃষ্ণ সেবাধিকার প্রাপ্তিই তাঁদের কাছে মঙ্গল। পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধনদশাতেই তাঁদের অনর্থ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই সর্ববিধ কর্মবন্ধনেরই অবসান হয়েছিল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য যতখানি ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার প্রয়োজন হয় তা পরিপূর্ণ না হওয়ায় তাঁরা গোপীদেহ পেয়েও গোপীনাথের সেবা অধিকার লাভ করতে পারেননি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদের আহ্বান শুনেও যখন তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাওয়া হল না তখন তাঁদের উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা দেখতে দেখতে পূর্ণরূপে বর্ধিত হল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ সেবাধিকার লাভের যোগ্যা হলেন এবং পার্ষদদেহ লাভ করলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেরই অন্তর্গত। যাঁর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম নেই, তার কখনো শ্রীকৃষ্ণে বিরহও হয় না। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম মিলন-বিরহময়। কাজেই পরিপূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণমিলনান্দের জন্যই সাধক, সিদ্ধ এমনকি গোপীদেহেও শ্রীকৃষ্ণ বিরহের আবির্ভাব হয়।

রাসলীলায় আগত গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য ও ব্রজাঙ্গনাদের প্রেমপ্রকাশ—

শ্রীভগবান স্বজনপ্রেমবিবর্ধন চতুর। তিনি কীভাবে কার প্রেমবর্ধনের জন্য

কী লীলা করেন তা কেউই ধারণা করতে পারে না। কর্মবন্ধন থাকলে যদি কোনো ভক্তর প্রেমবর্ধন হয় তবে তিনি তাঁকে কিছুদিন কর্মবন্ধনেই বদ্ধ রাখেন। কারও যদি কর্মমুক্তিতে প্রেমবর্ধন হয়, তবে তিনি তাঁর কর্মবন্ধন ছিন্ন করে দেন। শ্রীভগবানের ভক্তচূড়ামণিগণের কর্মবন্ধনের সঙ্গে কোনো বাধ্যবাধকতাই নেই।

শ্রীকৃষ্ণর বেণুনাদে আকৃষ্টা কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজ রমণীগণ যখন যমুনাতীরস্থ 'রাসৌলী' নামক স্থানে শ্রীকৃষ্ণর নিকটে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁদের অতুলনীয় প্রেম এবং ধৈর্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি পরিত্যাগ করতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং ব্রজরমণীগণের প্রেমের কথা ভেবে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হলেন। প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের এই প্রকার প্রেম ব্যবহার দেখে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলিপ্সা যেন আরো বর্ধিত হল। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন এই প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের হৃদয়কন্দরে না জানি আরো কত প্রেমরত্নরাজি লুকানো আছে। আমার বংশীনাদে যখন এঁদের হৃদয়কপাট একটু উন্মুক্ত হয়েছে, তখন হয়তো আমার বাক্যপ্রয়োগে হৃদয়স্থিত আরো কত না প্রেমভাব প্রকাশ পাবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর দশটি শ্লোকে (১৮-২৭) বাক্যাবলী বিন্যাস করেছেন তাতে **উপেক্ষা ভঙ্গিময়, প্রার্থনাভঙ্গিময়, বাস্তবার্থময়** ও **যুগলার্থ সন্ধাপনময়**— এই চার প্রকার অর্থের প্রতীতি হয়। ব্রজরমণীগণের ভক্তভাবে ভগবানের সঙ্গে মিলনোৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য, স্বজন প্রেমবিবর্ধন-চতুর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার ভঙ্গিমা সমন্বিত বাক্যপ্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এই অর্থ এতই গোপনে সুবিন্যস্ত আছে যে তা সর্বসাধারণের জ্ঞানগোচর হয় না।

পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ তাঁদের বিশুদ্ধ প্রেমের ধারণায় অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণবল্লভ বলেই জানেন। তাঁদের কখনই শ্রীকৃষ্ণর স্বরূপ বা ঐশ্বর্যর কথা মনেও আসত না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উপেক্ষিতা হয়ে যখন ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রাণের বেদনা জানাচ্ছেন, তখন যেন তাঁদের মধ্যে বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাঁদের বাক্যে

ঐশ্বর্যার্থও প্রকাশ করলেন। গোপীগণ আর্তভরা কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে অনুনয় করে বললেন—

'মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।' (ভাগবত ১০।২৯।৩১)

অর্থাৎ হে বিভো ! হে সর্বব্যাপক ! হে সর্বান্তর্যামিন্ ! আপনার পক্ষে এইরকম নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা কোনো প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা আপনি সকলেরই সর্ববিধ মনোভাব অবগত আছেন। আপনি যাকে যেভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করেন, সে তাই করতে বাধ্য হয়। আমরা কোনো বিষয়-সুখের আশায় আপনার কাছে আসিনি, আমরা সর্ববিধ বিষয়-সুখ ভোগবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবলমাত্র আপনার চরণসেবার আশাতেই আপনার চরণ-নিকটে এসেছি। অতএব আপনি চরণ সেবাধিকার প্রদান করে আমাদের চিরবাঞ্ছিত মনোরথ পূরণ করুন।

পরম প্রেমবতী ব্রজগোপাঙ্গনাগণ এইভাবে পরবর্তী ১১টি শ্লোকে (৩১-৪১) কখনো শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রেম নিবেদন করেছেন আর কখনো বা ঐশ্বর্যভাবে স্তুতি করেছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই সকল শ্লোক আস্বাদন করে বলছেন—

'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপুঃ তাহার স্বরূপ।
দ্বিভুজ মুরলীধর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এককণ, ডুবায় সর্ব ত্রিভুবন সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ॥'

ব্রজ গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণর এই রূপে নিজেদের সর্বশঃ বিকিয়ে দিয়ে বলছেন—

'সখি হে ! শুন মোর হতবিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল।
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী, তার প্রবেশ নাই যে শ্রবণে।
কানাকড়ি ছিদ্রসম, জানিহ সে শ্রবণ, তার জন্ম হৈল অকারণ॥'

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমবৈকল্যময় সানুনয় প্রার্থনা বচন শ্রবণ করে ব্রজরাজনন্দনের বাম্য ও উপেক্ষাভাব দূর হয়ে গেল এবং তাঁর স্বাভাবিক প্রেমকোমলতা আর প্রেমাধীনতা প্রকাশ পেল। তিনি ব্রজরমণীগণকে নানাবিধ সুমিষ্ট বচনে পরিতুষ্ট করে তাঁদের সঙ্গে প্রেম ব্যবহারে প্রবৃত্ত হলেন। শ্রীভগবান শত কোটি গোপীগণের সঙ্গে নিজে শত কোটি মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে মিলিত হলেন। তাঁর অচিন্ত্যমহাশক্তির (যোগমায়ার) প্রভাবে সকল ব্রজরমণী-গণই ব্রজরাজনন্দনকে নিজ নিজ নিকটেই দেখেছিলেন, তিনি অন্য ব্রজগোপীগণের নিকটে আছেন কিনা বা তাঁদের সঙ্গে কী ব্যবহার করছেন তা অন্য কারও ধারণাগোচর হয়নি বা অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিও হয়নি।

ব্রজরাজনন্দন যখন ব্রজদেবীদের সঙ্গে মিলন রসাস্বাদনে রত হলেন তখন তাঁর লীলাশক্তি তাঁকে পূর্ণরূপে মিলন-রসাস্বাদনের জন্য এক অভিনবভাবে বিচ্ছেদের অবতারণা করল। শ্রীকৃষ্ণমিলন সৌভাগ্যে ব্রজগোপীগণের মনে হল তাঁরা ব্যতীত জগতে আর কোনো রমণীই এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না। ব্রজরমণীর মান শ্রীকৃষ্ণের ওপর, আর তুচ্ছতা বুদ্ধি (গর্ব) জগতের সমস্ত রমণীর ওপর। ব্রজরমণীগণ এইভাবে সৌভাগ্যগর্বিতা হলেন আর রাধারানী গর্বিতা না হয়ে মানিনী হলেন। ব্রজগোপীদের এই মান আর গর্ব নিরসনের জন্য যোগমায়া তাঁর শ্রীমূর্তি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত করে দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর ব্রজগোপীগণ পরম বিরহ ব্যথায় কাতর হয়ে পড়লেন আর তাঁদের প্রেমভাব নব নব ভাবে উন্মেষিত হল। পরবর্তী ত্রিংশতম অধ্যায়ের ৪৪টি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে কীভাবে গোপীগণের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণর অনুকরণে—পূতনা বধ, কালীয়দমনাদি বিবিধ লীলার সম্পাদন এবং বৃক্ষলতাদি সকলকেই তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন।

ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ বিরহ ও গোপীগীত—

পরম প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ চতুর্দিকে কৃষ্ণান্বেষণে রত হলেন কিন্তু নিজেদের ঘরের কথা কারওরই মনে পড়ল না, কেননা তাঁদের চিত্ত-মন-হৃদয়-ইন্দ্রিয় সবই তখন শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত।

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সংস্মরু॥

(ভাগবত ১০।৩০।৪৪)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনিবিষ্টচিত্তা, শ্রীকৃষ্ণকথালাপরতা, শ্রীকৃষ্ণান্বেষপরায়ণা এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণাবেশে তন্ময়তাপ্রাপ্তা ব্রজরমণীগণ, দেহগেহাদি বিস্মৃত হয়ে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে লাগলেন। তাঁরা ভাবলেন আমরা আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধনের জন্যই আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে এই নির্জন বনভূমিতে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের বিরহসাগরে ভাসিয়ে যদি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ হয়, তাহলে আমরা না হয় চিরজীবন বিরহসাগরেই ভাসব। আমাদের দেখা না দিয়ে যদি তিনি লুকিয়ে থাকতে ভালবাসেন তবে তাই হোক, আমরা আর তাঁর অন্বেষণ করব না। তিনি যাতে সুখ পান, তাই আমাদের একমাত্র বাঞ্ছনীয়।

এই পরমভাবময়ী ব্রজগোপরমণীগণ সমবেতভাবে এইরূপ চিন্তা করে এবং শ্রীকৃষ্ণের করুণা, প্রেমকোমলতা প্রভৃতি অপার গুণাবলী স্মরণবশতঃ তাঁদের চিত্ত এমনই অভিভূত হয়ে গেল যে তাঁরা সকল কিছু ভুলে শ্রীকৃষ্ণের মধুর গুণলীলাবলীই গান করতে করতে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

পরমভাগবত শ্রীশুকদেব পরমপ্রেমময়ী গোপীদের এই শ্রীকৃষ্ণ লীলাগানই গোপীগীত রূপে একত্রিংশ অধ্যায়ে পরিবেশন করেছেন।

গোপীগীত

(দশম স্কন্ধ একত্রিংশ অধ্যায়, শ্লোক ১—১৯)

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥ ১

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা।

সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥ ২
বিষজলাপ্যয়াদ্ ব্যালরাক্ষসাদ্
বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্ বিশ্বতোভয়া-
দৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥ ৩
ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্-
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্ ।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥ ৪
বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্॥ ৫
ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত ।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয়॥ ৬
প্রণতদেহিনাং পাপকর্শনং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্॥ ৭
মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ॥ ৮

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥ ৯

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং
বিহরণং চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥ ১০

চলসি যদ্ ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥ ১১

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ধনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥ ১২

প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্॥ ১৩

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥ ১৪

অটতি যদ্ ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্॥ ১৫
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্-
অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥ ১৬
রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ॥ ১৭
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিষূদনম্॥ ১৮
যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ১৯

সরলার্থ—গোপীগণ বিরহাবেশে গান করতে লাগলেন—ওগো প্রিয়তম দয়িত আমাদের ! তোমার জন্মের ফলে ব্রজভূমির মহিমা, সম্পদ, সৌন্দর্য সবই চরমে পৌঁছেছে, সর্বলোকেই এখন তার জয়জয়কার। সৌন্দর্য-মাধুর্য-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী স্বয়ং এখানে সদা-সর্বদা বাস করছেন। অথচ দেখো, এই ব্রজে যারা একান্তভাবে তোমারই জন, তোমারই জন্য যারা প্রাণ ধারণ করে আছে, তারা, সেই তোমার দাসীরা তোমাকে না পেয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার অন্বেষণে ! কৃপা করো, ওগো নিষ্ঠুর, দেখা দাও॥ ১ ॥ ওগো প্রেমময় হৃদয়স্বামী ! শরতের সরোবরে অপরূপ সৌন্দর্যের পশরা নিয়ে বিকশিত হয় যে অমল কমল, তার কর্ণিকার সম্পূর্ণ শোভাই তো

চুরি গেছে তোমার অতুল চোখ দুটির কাছে। সেই চোখের দৃষ্টি দিয়ে তুমি বধ করছ আমাদের, যারা তোমার বিনামূল্যের দাসী! তুমি তো ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু পরম কারুণিক বরদাতা, বলো তো, শুধু অস্ত্রের দ্বারা বধই কি বধ ? চোখের দ্বারা বধ করলে, তা কি ইহলোকে বধ বলে গণ্য হয় না ? ২ ॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমিই তো কতভাবে কতবার আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছ! যমুনার বিষাক্ত জলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু থেকে, সর্পরূপী অঘাসুরের গ্রাস থেকে, ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের প্রেরিত ভয়ংকর বর্ষা-বায়ু-বজ্রপাত থেকে, দাবানলের দহন থেকে, বৃষাসুর-ব্যোমাসুর প্রভৃতি কত মায়াবী অসুরের হাত থেকে, এছাড়াও আরও যত বিপদে যখনই আমরা ভয় পেয়েছি সে-সব থেকেই তো তুমি আমাদের বারে বারে রক্ষা করেছ! (তাহলে আজ সেই তুমিই এমন উদাসীন হয়ে আমাদের প্রাণ নিতে চাইছ কেন ?)॥ ৩ ॥ তুমি তো শুধু যশোদানন্দন নও— (আমরা তো জানি) তুমি সকল প্রাণীর অন্তর্যামী, দ্রষ্টা, সাক্ষীপুরুষ। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বসংসারকে রক্ষা করার জন্য তুমি এই সাত্বতবংশে, এই যদুবংশে আবির্ভূত হয়েছ, (আর সেই সুবাদেই আমরা পেয়েছি তোমাকে আমাদের করে) ওগো সখা! ৪ ॥ হে বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ! যারা এই জন্ম-মৃত্যুচক্ররূপ সংসারের ভয়ে তোমার চরণে শরণ নেয়, তোমার ভক্ত-বিপদ-নাশক করকমল তাদের নিজের আশ্রয়ে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে অভয় দান করে। প্রিয়তম! সকলের সব কামনা পূরণকারী তোমার সেই করকমল, যার দ্বারা তুমি শ্রীদেবীর পাণিগ্রহণ করেছ, তা আমাদের মাথায় রাখো॥ ৫ ॥ ব্রজজনের দুঃখহারী ওগো বীর! তোমার যারা নিজ জন, ভক্ত-শরণাগত, তাদের মনে যদি কখনো কোনো দুর্গ্রহবশে গর্বের উদয় হয়, তোমার বদনের একটি স্মিতহাস্যরেখা তা মুহূর্তমধ্যে ধ্বংস করে দেয়। (আমাদের সব মান-গর্বও তো তুমি তেমনভাবেই হরণ করে নিতে পারতে, অদৃশ্য হলে কেন ?) ওগো সখা! তুমি নাও আমাদের, গ্রহণ করো সব অপরাধ ক্ষমা করে, সব দোষ মার্জনা করে। আমরা তো তোমার দাসী বই কিছু নই, অবলা আমাদের ওপর রোষ করা কি তোমার সাজে ? দয়া করো, তোমার অভিনব-সুন্দর প্রফুল্ল মুখকমলখানি দেখাও আমাদের॥ ৬ ॥ তোমার চরণকমল প্রণতজনমাত্রের

সর্বপাপহারী, সর্বমাধুর্যের আকর, লক্ষ্মীর নিবাসভূমি। সেই চরণের দ্বারাই তুমি ব্রজের তৃণচর পশুদের অনুগমন কর, এমনকি আমাদের রক্ষার জন্য তুমি ভয়াল কালীয় নাগের ফণার ওপরে পর্যন্ত সেই চরণ স্থাপন করতে দ্বিধা করনি। তোমার বিরহে আমাদের হৃদয়ে যে সুতীব্র দাহ সৃষ্টি হয়েছে, কেবলমাত্র তোমার চরণই পারে তা নির্বাপিত করতে। একবার এসো—তোমার রাতুল পদতল রাখো আমাদের বুকে, যেটাও আমাদের মর্মের কামনা, সরস-শীতল স্পর্শে শান্ত হোক আমাদের তৃষ্ণা, জুড়াক আমাদের জীবন ॥ ৭ ॥ কমলনয়ন ! কত মধু আছে তোমার মুখের বাণীতে, তার পদে-পদে, শব্দে-শব্দে, অক্ষরে-অক্ষরে মাধুর্যরসধারা ক্ষরিত হতে থাকে। তোমার কণ্ঠধ্বনির চিত্তাকর্ষী বৈচিত্র্যে, উচ্চারণভঙ্গী তথা স্বরপ্রক্ষেপের নিপুণতায় এবং সর্বোপরি অর্থগত গভীরতা ও ব্যঞ্জনামাহাত্ম্যে, আমরা তো কোন্ ছার, তাবৎ শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী ও পণ্ডিতজনেরাও অভিভূত হয়ে যান। সত্যি কথা বলতে কী, সরস্বতী তোমার বশবর্তিনী, তোমার বাক্যে তাই এক অলৌকিক মোহিনীশক্তি ক্রিয়াশীল, আর তারই ফলে আমরাও তোমার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে থাকি। আর এখন তোমার বিরহে সেই সব কথা যতই স্মরণে আসছে, ততই আমাদের আকুলতা বাড়ছে, আমরা কী করব ভেবে পাচ্ছি না, ক্রমেই যেন বিভ্রান্ত, মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। আমরা তোমার দাসী, আর তুমি ঐশ্বর্যে বীর্যে অপ্রতিম, দয়াবীর, দানবীর ! আমাদের প্রতি তোমার দাক্ষিণ্য বর্ষণ করো, ওগো বীর ! তোমার অধরসুধা পান করিয়ে আমাদের এই মুহ্যমান দশা থেকে পুনরুজ্জীবিত করো, পরিতৃপ্ত করো ॥ ৮ ॥ তোমার নিজমুখের কথা যেমন মধুর (আমাদের পক্ষে যদিও তার স্মৃতিই এখন মৃত্যুযন্ত্রণার কারণ হয়েছে), তোমার সম্পর্কিত কথা অর্থাৎ তোমার লীলাকথাও তেমনি অমৃতস্বরূপ। সংসারের মৃত্যুগ্রস্ত হতাশ জীবকে তা মৃত্যু-তরণের আশ্বাসবাণী শোনায় (আবার আমাদের মতো তোমার বিরহে কণ্ঠাগতপ্রাণ ব্যক্তিদের পক্ষেও তোমার লীলাকথা কীর্তন-শ্রবণাদিই প্রাণরক্ষার কারণ হয়ে থাকে), ত্রিতাপ-তপ্ত জীবের পক্ষে তা জীবনদায়ী পরমৌষধ, তাপিত জনের তৃষ্ণাহারী শীতল জল। বেদমুখে ব্রহ্মাসহ ব্রহ্মবিদ্ ঋষি-মুনিগণও তোমার কথামৃতের স্তুতি করে

থাকেন, অন্য অমৃত তাঁরা তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আর সাধারণজীব তথা পাপীদের পক্ষে তোমার কথা তো অযাচিত করুণার দান, কারণ তা সর্ব-কলুষ, সর্ব পাপ হরণ করে ! শ্রবণমাত্রই এই কথামৃত শ্রোতার পরম মঙ্গল সাধন করে, তাকে আর কোনো অনুষ্ঠানেরও অপেক্ষা করতে হয় না। সর্বসম্পদের বিশেষত প্রেম-সম্পদের আকর এই কথা তোমার কথা শুনতে শুনতেই অপ্রেমিকের মনেও প্রেমসঞ্চার হয়, প্রকৃত শ্রী-লাভ হয়। বহু-বিস্তৃত সর্বত্র লভ্য তোমার এই লীলাকথা, ভক্ত-মহাত্মাজনের মুখে মুখে বহুল উচ্চারিত, ইচ্ছামাত্রেই শ্রবণপথে গ্রহণ করে পরম কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। আর এই কথার যাঁরা কথক, যাঁরা মানুষের কানে পৌঁছে দেন এই পরম অমৃত সেই অকারণ-করুণাশালী প্রেমিক-ভক্তজনের দানের আর তুলনা নেই, জগতের মহত্তম দাতা তাঁরাই (হয়তো পূর্ব পূর্ব জন্মে বহু দানের পুণ্যের ফলে তাঁরা কোনো জন্মে এইরকম শ্রেষ্ঠ দাতার আসনে বসার সৌভাগ্য লাভ করেন)॥ ৯ ॥ হায় প্রিয় ! তোমার মধুর হাসি, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত, (বয়স্যদের সঙ্গে) তোমার নানারকমের ক্রীড়া, এসব আমরা এক সময়ে দূর থেকেই দেখতাম, আকৃষ্ট হতাম, কিন্তু তোমাকে কাছে পাইনি তখন, তাই তোমার এই সব আচরণই আমাদের ধ্যানের বিষয় ছিল। সেই ধ্যানেই ছিল আমাদের শান্তি, তোমার বিষয়ে ধ্যান যে মঙ্গলজনক, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। হয়তো সেই মঙ্গলময় ফল হিসাবেই একদিন তোমাকে পেলাম আমরা। আর সে পাওয়া যে কী, তা যে পেয়েছে সেই জানে ! অনন্তের মাধুর্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিতে তুমি আমাদের কাছে গোপনে, বিজনে, কথায়, সুরে, আকারে, ইঙ্গিতে, হাসিতে, বাঁশির গানে—তোমার চিৎপ্রবাহময় সমস্ত আচরণের মাধ্যমেই তুমি আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত করে দিতে কোন্ অকূলের, অনন্তের আভাস, জাগিয়ে তুলতে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। ইহলোকের, এই কান্না-হাসির সংসারের মধ্যে থেকেও আমরা হয়ে যেতাম এসবের পরপারে অনন্তলোকবাসিনী ! আমাদের হৃদয়ে পুলকোচ্ছ্বাস জাগানো সেই আনন্দ রসধারা স্নান, সেই অমৃতাভিষেক, সে-সবই আজ স্মরণে এসে শুধু আমাদের মর্মে ক্ষোভ জন্মাচ্ছে। ওহে কপট, ছলনাময় প্রেমহীন ! আমাদের

বুক ফেটে যাচ্ছে ! এই ছিল তোমার মনে ? ১০ ॥

নাথ ! তোমার জন্য কতভাবেই কত কারণেই যে আমাদের প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে, তা কি তুমি জান ? তুমি সকাল বেলাই পশুদের চরানোর জন্য তাদের পিছন পিছন ব্রজ থেকে বেরিয়ে পড়। নিশ্চয়ই তোমার পদ্মের মতো অমল-কোমল চরণে কত শিলাখণ্ড (কাঁকর), তৃণকুশাদি কণ্টকের আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে, এই সম্ভাবনাতেই আমাদের মনে শান্তি থাকে না। প্রিয়তম ! তোমার চরণের ব্যথা যে আমাদের বুকে সহস্রগুণ হয়ে বাজে ! ১১ ॥ দিন শেষ হয়ে এলে যখন তুমি গোধন নিয়ে বন থেকে আবার ব্রজে ফেরো, তোমার পদ্মের মতো মুখটি তখন গোরুর খুরের ধূলায় ধূসর ঘন নীল (কৃষ্ণবর্ণ) কুঞ্চিত কেশরাজি এলোমেলো হয়ে মুখের চারদিকে লেপটে থাকে। সেই মুখটি বারে বারেই আমাদের দিকে ফেরাও তুমি নানা ছলে, যেন আমাদের দেখাতে চাও সেই অপরূপ শোভা ! ওগো বীর ! আমাদের মনে তোমাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগানো, এই অবলাদের চিত্তকে কেবলমাত্র তোমার কামনায় একাগ্র করে রাখার জন্যই কি তোমার এই কৌশল ? ১২ ॥ আমাদের মনের সকল দুঃখ-ব্যথার নিরাময়কারী ওগো আনন্দময় ! তোমার চরণকমল প্রণতজনের সর্ব অভীষ্ট পূর্ণ করে, স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী এবং পদ্মযোনি ব্রহ্মাও তোমার চরণসেবা করতে পেলে নিজেদের ধন্য মনে করেন। সেই দুর্লভ চরণ সম্প্রতি পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে তার শোভা বৃদ্ধি করছে। তোমার চরণ ধ্যান করলে সর্ব বিপদ দূর হয়ে যায় ; আধিভৌতিক, আধিদৈবিক অথবা আধ্যাত্মিক, সর্ববিধ বিঘ্নেরই অমোঘ প্রতিকারকল্পে তাই তোমার চরণ ধ্যানের নির্দেশ সকল শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ দিয়ে থাকেন। ওগো প্রিয় ! সকল সুখের, সকল কল্যাণের সর্বোত্তম আকর তোমার সেই চরণকমল, অর্পণ করো আমাদের বক্ষে, দূর করো আমাদের বিরহ-সন্তাপ॥ ১৩ ॥ বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, প্রিয় আমাদের ! দানে, দয়ায় তোমার সমকক্ষও তো কেউ নেই, নিজের সব কিছুই তুমি অবলীলায় বিলিয়ে দাও। তোমার একান্ত নিজস্ব অধরামৃতদানেও তুমি পরাঙ্‌মুখ হোয়ো না। আমরা যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছি, তার প্রকৃত ঔষধ ওই বস্তুটিই। তোমার মুখের বাঁশিটি তোমারই

অধরামৃত পান করে সুরে সুরে ভরে ওঠে, বিশ্বময় বিতরণ করে মহা নাদের অসীম সম্পদ। জীবনের কোনো বিশেষ শুভক্ষণে যে একবার তোমার অধরসুধারসরূপ পরম দানের, ভাবমগ্নতার কোনো নিভৃত প্রহরে গোপন প্রেমিকের সরভস চুম্বনের মতো তোমার প্রেমের বিদ্যুদ্দীপ্ত চকিত স্পর্শের আস্বাদ লাভ করে, তোমার প্রতি আসক্তি বন্ধন তার আর কখনো ছিন্ন হয় না, দিনে দিনে বেড়ে চলে তার প্রেমোজ্জ্বলা সুরতি, সর্বশোক থেকে বিমুক্ত হয় সে, জাগতিক আর কোনো পদার্থের জন্যই তার কোনো কামনা থাকে না। সেই সুধা পান করিয়ে জীবন রক্ষা করো আমাদের॥ ১৪ ॥ দিনের বেলায় তুমি যখন চারণের জন্য বনে বনে বিচরণ করতে থাক, তখন তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমাদের ক্ষণার্ধকালও এক যুগ বলে মনে হয়। আবার দিনান্তে যখন তুমি ব্রজে ফেরো, তখন তোমার কুঞ্চিত কেশরাজির মধ্যে ঢলঢল শ্রীমণ্ডিত মুখপঙ্কজের দিকে উপবাসী নয়নের সমস্ত তৃষ্ণা নিয়ে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকি আমরা, তখন চোখের পলক দিয়েছেন যে বিধাতা, তাকে নিতান্ত জড়বুদ্ধি বলে মনে হয়। চোখের নিমেষ-পড়ার সময়টুকুর অদর্শনও যে তখন আমাদের পক্ষে অসহ্য ! ১৫ ॥ হে অচ্যুত ! আমরা তো নিজেদের পতি-পুত্র, ভাই-বন্ধু, কুল-পরিবার সব কিছু ছেড়ে, তাদের ইচ্ছা, তাদের সৃষ্ট বাধা এমনকি তাদের প্রতি আসক্তি পর্যন্ত অতিক্রম করে তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাদের এই গতি অর্থাৎ স্বভাব জানো যে, তোমার বাঁশির হৃদয়-কাড়া আকাশ-বাতাস-মহাশূন্য-পূর্ণকরা গভীর তানের আহ্বানে আমরা মোহিত হয়ে যাই, আবিষ্ট হয়ে যাই, না এসে পারি না। আমরাও তো জানি না, তুমি আমাদেরই ডাকছ, যে শোনে, বাঁশি তো তাকেই ডাকে, আর সেই ডাক শুনে বেরিয়ে পড়লে সেই সুরই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। কিন্তু এত সবের পরে, ডেকে ঘরের বাইরে এনে, মিলন সুধার ক্ষণিক আস্বাদ দিয়েও এমন চকিতে অন্তর্ধান ! ওহে কিতব, ওহে প্রতারণাপটু, ভীরু রমণীদের রাত্রিকালে এমনভাবে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে আর কে, তুমি ছাড়া ? ১৬ ॥ একজন মানুষ বিগ্রহধারীর মধ্যে রূপের, বাক্যের, আচরণাদির যে চরম উৎকর্ষ আমরা কল্পনা করতে পারি, তারই সার্থক প্রতিচ্ছবি দেখেছি আমরা তোমার মধ্যে ;

আর তাই আমাদের আকর্ষণ করেছে তোমার দিকে। নির্জনে সেই অন্তরের গূঢ় ভাব-বিনিময় যার ফলে আমাদের হৃদয়ে জেগেছে প্রেমের জোয়ার, তোমার হাসি-ভরা মুখ, অনুরাগ-ভরা দৃষ্টি, আর তোমার বিশাল বক্ষোদেশ—যেখানে নীল আকাশে সোনার রেখার মতো বিরাজ করছেন লক্ষ্মীদেবী শ্রীবৎসচিহ্নরূপে অচলা হয়ে—এইসবে আমাদের নয়ন-মন মুগ্ধ হয়েছে, আর সে মুগ্ধতা কমার কোনো সম্ভাবনাও নেই, বরং তা যেন আরও বেড়েই চলেছে, তোমাকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনকে আবিষ্ট করে রেখেছে, সেই একাগ্র নিষ্ঠায় সংহত হয়ে আছে আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব॥ ১৭ ॥ প্রিয় আমাদের ! আমরা জানি, তোমার আবির্ভাব ব্রজবাসী, বনবাসী তথা সকল বিশ্ববাসীর জন্যেই পরম মঙ্গলময় ঘটনা, সর্বকালের সর্বমানবের সর্বদুঃখ নিরসনের নিশ্চিত আশ্বাস। আমরা তোমার নিজজন, এই ব্রজেরই অধিবাসী, অতি ভয়ংকর হৃদরোগে আক্রান্ত। এই রোগের কারণ কী, তাও শোনো। তোমার প্রতি ধাবিত হয়েছে আমাদের স্পৃহা। সংসারের অন্য কোনো বস্তুর জন্য আমাদের লালসা নেই, শুধু তোমাকে না পেলে আমাদের চলবে না, এই সুতীব্র একমুখী অভীপ্সাই এখন আমাদের দেহ, প্রাণ, মন—আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে গ্রাস করে ফেলেছে। এইটিই আমাদের রোগ। এই রোগের নিরাময়ের ওষুধ তোমার কাছেই আছে, ইচ্ছা করলেই দিতে পার। এখন আমরা করজোড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি, সেই ওষুধ সামান্য একটু আমাদের দাও, আমাদের প্রাণ বাঁচাও॥ ১৮ ॥ আর আমাদের দেখা না দেওয়াই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহলে এই রাত্রিকালে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ো না। মাটিতে পাথর, কাঁকর, কাঁটা কী না আছে ? ওগো প্রিয়তম সুন্দর হৃদ্‌বিলাসী আমাদের ! বিকশিত রক্তপদ্মের শোভা, কোমলতাদি গুণাবলীকে পরাজিত করে অনুপম সৌন্দর্য মূর্তি পরিগ্রহ করেছে বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় তোমার পদতল, যেজন্য আমরা অতি ধীরে সসংকোচে সভয়ে তা বক্ষে ধারণ করি। আমাদের কঠিন, কর্কশ বক্ষের স্পর্শে বুঝি তোমার সুকুমার চরণে ব্যথা বাজে, এই আশঙ্কায় আমরা মরমে মরে থাকি। আর সেই চরণেই কিনা তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছ বনের মধ্যে ? তীক্ষ্ণ তৃণাঙ্কুরে, শিলাখণ্ডে, প্রস্তরকণায়

ব্যথিত হচ্ছে না ওই রাতুল পদতল ? আমাদের তো এই চিন্তায় বুদ্ধিই বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, আমরা মূর্ছাগ্রস্ত হতে বসেছি ! তুমি আমাদের প্রাণ, আমাদের জীবনের জীবন, এমন করে কষ্ট দিও না নিজেকে। ফিরে এসো, নাথ, ফিরে এসো, তোমাকে সুস্থ দেখে তোমার চরণে আমাদের প্রাণ সমর্পণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিঁই আমরা॥ ১৯ ॥

মূলভাব —শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ের উনিশটি শ্লোককে শ্রীকৃষ্ণ বিরহিনী ব্রজরমণীগণের প্রার্থনাগীতি বলা হয়েছে, ইহা এতই পবিত্র এবং ভাবগাম্ভীর্য ও প্রেমদৈন্যে এতই ভরপুর যে একে রাস-উপনিষদও বলা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী তাঁদের টীকায় বলেছেন এই প্রার্থনা-গীতির মর্মোদ্ঘাটন করা বড়ই দুরূহ।

কৃষ্ণৈকগম্যো বাগর্থো যাসাং লেমিতুমিষ্যতে।
জ্ঞাতাপরাধং দেবস্তা ভক্তিং তন্বন্তু মে নিজাং॥

(বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজদেবীগণের প্রার্থনাবাক্যের অর্থ একমাত্র তাঁদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই জানেন। এখানে তাই শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে প্রেম- আর্তিভরা এই শ্লোকের কাব্য-ভাবেই সরলার্থ আলোচিত হল।

১.শুনহে দয়িত ব্রজে জনমে তোমার।
ব্রজের সমৃদ্ধ সুখ অপার ব্যাপার॥
শুন শুন প্রাণপতি আনন্দে ইন্দিরা সতী।
তোমা লাগি ব্রজভূমে করেন বিলাস
কিন্তু হায় গোপিকার দুঃখের নাহিক পার,
তোমার বিরহ তাপে তপ্ত অর্নিবার॥
দেহ হে প্রাণের প্রাণ তোমাতে ধরিয়া প্রাণ
তোমার গোপিকা তোমায় খুঁজে চারিধার॥

২.শুন হে সুরতনাথ তোমার নয়ন ।
সবার সর্বস্ব ধন করবে হরণ॥
শরদ সরসী জল তাহ ফুল্ল শত দল।

তাহা চুরি করি আনি সে চোরের শিরোমণি
ঘোষিতেছে আপন মহিমা
এবে গোপিকার পুনঃ হরি ধর্ম প্রাণ মনঃ
বিনাপণে দাসী করে দিয়েছে তোমার।
করিয়া তাদের বধ বরদ ! না মান বধ
না জানি তোমার এই কিবা ব্যবহার॥

৩. কালিয়ের বিষজলে মৃত ব্রজের প্রাণ দিলে
অজগর গ্রাসে পুনঃ করিলে রক্ষণ।
ইন্দ্রের প্রচণ্ড কোপে বর্ষা বায়ু ব্রজতাপে
গোবর্ধন গিরি তুমি করিয়ে ধারণ॥
অরিষ্ট ব্যোমাদি কত অসুর করিতে হত
দাবানল পান কর তুমি বা
এইরূপে বারে বারে ব্রজবাসী রক্ষা করে
এখন কি লাগি বধ গোপিকায়॥

৪. সখে ! তুমি নহ শুধু গোপিকানন্দন।
সকলের অন্তর্যামী তুমি নারায়ণ॥
ব্রহ্মার প্রার্থনে তুমি পালিবারে মর্ত্যভুমি ;
ভক্তের কুলেতে আসি হয়েছ উদয়।
কিন্তু কেন গোপিকারে না হও সদয়॥

৫. শুন ওহে বৃষ্ণিকুল-কমল-প্রভাকর।
মোদের মাথায় দাও তোমার কমল কর।
ভব ভয়ে হয়ে ভীত যে তব শরণাগত।
তব কর করে তার সর্বভয় দূর।
কামনা যাহার যাহা তব করে পায় তাহা
হে কান্ত তোমার কর সর্ব কামপুর॥
কমলা যে করে ধরি নিয়ত বসতি করি

সকল সম্পদে পূর্ণ রেখেছে গোকুল।
কি দুর্দৈব গোপিকার সে করে নাই অধিকার
তাই শিরে ধরিবারে সদাই ব্যাকুল॥

৬. ব্রজজনের আর্তি হয় হে গোকুল বীর।
তোমার বিরহে মোরা হয়েছি অধীর॥
তোমার মধুর হাসি নিজজনের গর্ব নাশি
দাসী করে বেঁধে রাখে চরণে তোমার।
তোমার কিঙ্করী মোরা বাসনা পুরাও ত্বরা
বদনকমল তব দেখি একবার॥

৭. প্রণতজনের সর্ব পাপ বিমোচন।
বক্ষঃস্থলে দাও মোদের তব শ্রীচরণ॥
তোমার চরণ দুটি ধেনু পালের পাছে ছুটি
ব্রজের কাননভূমি করয়ে পাবন।
পরম যতনে করি লক্ষ্মী যাহা হৃদে ধরি
নিরবধি কায় মনে করয় সেবন।
যে চরণ কালিয় শিরে নানা ছলে নৃত্যে করে
সে চরণ হোক মোর হৃদয় ভূষণ।
প্রবল হৃদয় জ্বালা হউক খণ্ডন॥

৮. মধু হইতেও সুমধুর বচন তোমার।
শ্রবণে উথলে উঠে প্রেম পারাবার॥
কিবা স্বরের মাধুরী পদ-বাক্যের চাতুরী
শব্দে অর্থে তৃপ্ত করে সবাকার মন॥
সে বচন শুনি মোরা হয়ে আছি আত্মহারা
দাসী হয়ে তব পদে সঁপেছি জীবন॥
কিন্তু তব অদর্শনে তপ্ত মোরা রাত্রি দিনে
হৃদয় মাঝারে জ্বলে বিরহ দহন।

তব অধর-সুধাদানে আপ্যায়িত কর প্রাণে
নতুবা রহে না আর মোদের জীবন॥

৯.তোমার বিরহতাপে তপ্ত যেই জন।
তব কথামৃত পানে সে লভে জীবন॥
ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি যত ভক্তগণ অবিরত
কথার মহিমা তব করেন কীর্তন।
সর্ব পাপ করে ক্ষয় শ্রবণে মঙ্গল হয়
মধুর তোমার কথা ব্যাপ্ত ত্রিভুবন॥
তোমার কথা যেবা গায় তুলনা নাহিক তায়
ত্রিজগতে দাতা নাহি তাহার সমান।
তব দীর্ঘ অদর্শনে কথামৃত নিষেবনে
এখনও দেহেতে আছে গোপিকার প্রাণ॥

১০.হাসিমাখা মুখে তব সে মধুর হাসি।
সে বাঁকা নয়নে তব কটাক্ষের রাশি॥
ধরিয়া সবার গলে গোঠে যবে যাও চলে
কিবা অঙ্গভঙ্গি তব কিবা বিহরণ।
নির্জন বনেতে গিয়া মোহন বেণু বাজাইয়া
কিবা তব সুমধুর নর্ম আলাপন॥
সে সব ইঙ্গিত স্মরি নিরবধি আশা করি
হবে বুঝি তব সনে মধুর মিলন।
কিন্তু এবে অদর্শনে ভরসা নাহিক মনে
ব্যাকুল হৃদয়ে জ্বলে বিরহদহন॥

১১.হে কান্ত যখন তুমি যাও গোচারণে।
তখন নিতান্ত ব্যথা পাই মোরা মনে॥
তোমার চরণতল নবনীত সুকোমল
শিল তৃণাঙ্কুরে ব্যাপ্ত ব্রজের বনভূমি।

বিচরণে চরণে কত ব্যথা পাও তুমি॥

১২.দিবা অবসানে দেখি বদন তোমার।
মোদের হৃদয়ে জাগে মদন বিকার॥
কিবা সে মোহন বেশ ললাট কুঞ্চিত কেশ
ধূলায় ধূসর মুখ কিবা শোভা তার।
পরাগ মাথা পদ্মে যেন ভ্রমর সঞ্চার॥

১৩.প্রণত জনের কাম পূরণের তরে
যে পদপঙ্কজ তব অভীষ্ট বিতরে,
পদ্মযোনি ব্রহ্মা যার পূজা করে অনিবার
ধরণীর সেবা লাগি, যে পদ ভূষণ,
বিপদে ধেয়ান-ধ্যেয় চরণকমল প্রিয়
শ্রেষ্ঠ সুখ-বিধায়ক যে তব চরণ-
দুখহারী প্রিয়বর সে পদ যুগল
স্পর্শে তার স্নিগ্ধ করে তব হিয়াতল॥

১৪.তোমার অধর-সুধা বাড়ায় সুরত ক্ষুধা
শোক দুঃখ বিরহের তাপ করে দূর।
আন্ প্রতি রতি যত ভুলাইয়া দেয় শত
তোমার অধরামৃত, ওঠে কামপূর।
নিনাদিত বেণু যাহে চুমে ঘন ঘন
দাও সে অধরসুধা ব্রজেশ-নন্দন॥

১৫.দিবসে কাননে যবে করগো বিহার,
যুগ মনে হয় ক্ষণ-বিরহ তোমার।
সন্ধ্যায় কান হতে ফের যবে গৃহ পথে
অলকা শোভিত হেরি বদন সুন্দর।
নয়ন-নিমেষ-পাতে দরশনে বাদ সাধে
বুঝিনু পলকস্রষ্টা বিধি বুদ্ধি-জড়॥

১৬.ছাড়ি সব পতি সুত বান্ধবনিচয়
আসিয়াছি তব পাশে, ওহে যাদুময়।
তোমার স্বরূপ জানি হে কপটশিরোমণি
তথাপি মোহের বশে ছাড়ি ধর্মলাজ
তোমার বাঁশরীতানে মোরা সবে মুগ্ধ প্রাণে
আসিয়াছি হে প্রিয় অচ্যুত ! আজ॥
প্রীতিভরে আসি যবে কামিনী তরুণী সবে
সঙ্গমলালসা মাগে গভীর নিশীথে,
হেন জন কেবা আছে ছাড়ে উহা নিশিমানে,
নারিনু বুঝিতে তব কিবা বুদ্ধি ইহো॥

১৭.তোমার চাহনী মৃদু প্রেম-সুকোমল
মধুর বয়ান তব হাসিতে উজল।
কমলা-বিলাস স্থল, বিশাল হৃদয়তল
নেহারি সে সব আর শুনি রহঃবাণী—
মদন-উদয় তব কামক্ষোভে নব নব
চঞ্চল করিয়া মুহু মোহিছে পরানি॥

১৮.হে প্রিয় গো কান্ত ! তব ব্রজেতে উদয়
কুশল নিখিল বিশ্বে সদা প্রকাশয় !
তোমার অমিয় লভে ব্রজবাসি জন সবে
দুঃখশোক তাহাদের কর তুমি দূর।
আমরা গো তোমার দাসী হৃদয় বেয়াধি নাশি,
আর্তিপ্রশমনে দাও নিদান মধুর
তোমার স্পৃহায় জাত হৃদয় বেদনা—
শান্ত কর তারে তুমি দানিয়া সান্ত্বনা॥

১৯.যেন শুভ-পরিমল নব শতদল
চরণযুগল তব অতি সুকোমল।
ধরিতাম শঙ্কাভরে কঠিন কুচের বীর

অতিধীরে ও-শ্রীপদ, পাছে ব্যথা বাজে।
এবে বনে চলি হায় কতই না ব্যথা পায়
সে পদ কণ্টক-বন-কঙ্করের মাঝে॥
মোদের হে প্রাণ কান্ত ! সে দুঃখ ভাবিয়া
হৃদয় চঞ্চল হয় বুদ্ধি ব্যাকুলিয়া॥

পরম প্রেমবতী ব্রজগোপীগণের প্রার্থনাগীতিতে (গোপীগীতার) গোপ-বালাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির আকুলতা ও উৎকণ্ঠা বর্ণনা করে পরমভাগবত শ্রীশুকদেব বলছেন—

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ॥ (ভাগবত ১০।৩২।১)

শ্রীকৃষ্ণ বিরহিনী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণ বিরহ কাতরা হয়ে প্রথমে বনে বনে প্রাণ গোবিন্দের অন্বেষণ করলেন, তারপর দর্শন লাভের লালসায় তাঁর লীলা স্মরণ করে তাঁরই উদ্দেশে গান করতে লাগলেন, অবশেষে অত্যন্ত কাতরা হয়ে ক্রন্দন করতে করতে সুস্বরে তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে লাগলেন। শাস্ত্র বলছেন—

ন হি সাধনসম্পত্ত্যা হরিস্তুষ্যতি কর্মবৎ।
ভক্তানাং দৈন্যমেবৈকং হরিতোষনসাধনম্॥

(শ্রীমদ্বল্লভাচার্যকৃত সুবোধিনী টীকা)

অর্থাৎ সাধনসম্পত্তি দ্বারা শ্রীহরি কারও প্রতি সন্তুষ্ট হন না কেননা একমাত্র ভক্তগণের দৈন্যই হরিতোষণের কারণ।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতরা ব্রজগোপীগণ যখন পরম ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করতে লাগলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে দর্শন দিলেন। এই দর্শন কীভাবে দিলেন ?

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ (ভাগবত ১০।৩২।২)

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন পীতবসন ধারণ করে সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ রূপে আবির্ভূত হলেন। এখানে প্রথম 'মন্মথ' হল যিনি 'মদন' সেই কামরূপী

দেবতাকে যিনি মথন করেন (অর্থাৎ দমিত করেন) তিনি হলেন মহাদেব। আবার কন্দর্পের মথনকারী নীলকণ্ঠ মহাদেবের 'মদ' বা গর্ব যিনি মোহিনীমূর্তিতে মথিত করেন— তিনি হলেন 'মন্মথ মন্মথ' শ্রীবিষ্ণু। আর বিষ্ণুর যত অবতার আছে তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হলেন অবতারবর্য। '**শ্রীকৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাঁহার স্বরূপ**' আবার শ্রীকৃষ্ণের সকল রূপের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনের রাসলীলারূপই শ্রেষ্ঠ— সেখানে তিনি মন্মথ মন্মথ।

শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের রাসলীলা, পরমাত্মা ও আত্মার মিলন—

ভক্ত চূড়ামণি শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের রাসলীলা প্রসঙ্গে আরো বলেছেন—'**রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ**'। (ভাগবত ১০।৩৩।১৭) অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতে জীব যেমন দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব সমর্পণ করে নিজে নিজেকে দেখে আনন্দিত হয়, সেইরকম শ্রীভগবানও তাঁর প্রেমশিরোমণি ব্রজবনিতাদের ভাবদর্পণে নিজেরই আনন্দস্বরূপের প্রতিবিম্ব অর্পণ করে, তাই গ্রহণ করে নিজে আনন্দলাভ করলেন। এই তাঁর আনন্দস্বাদন, এই তাঁর বিমল রমণবিলাস। গোপরমণীগণের প্রেমের এমনই কিছু বিশেষত্ব আছে যে তার আকর্ষণে আত্মরাম শিরোমণি শ্রীভগবানও রমণবিলাসে প্রবৃত্ত হন, নির্বিকার ভগবানেরও প্রেমবিকার প্রকাশ পায় এবং পূর্ণকাম শ্রীভগবানও সকাম হয়ে গোপীগণের প্রতি প্রেমমিলন সংঘটন ব্যাপারে সচেষ্ট হন।

শ্রীভগবান গোপীগণে আকৃষ্ট—

শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য এমনই অপূর্ব যে ঐকান্তিক ভক্তের আর্তিভরা স্তুতিতে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না। ভগবান স্বজন প্রেমবিবর্ধন চতুর তাই তিনি ভক্তের ভাব অনুযায়ী দর্শন দেন, তার প্রার্থনা পূরণ করেন, বা ভক্তর পক্ষে যা মঙ্গলকর তার বিধান করেন। কিন্তু গোপীগণ সাধারণ ভক্ত নন, তাঁদের সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

হ্লাদিনীর সার ‘প্রেম’, প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম-কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপিনী রাধা ঠাকুরানী। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম, তাঁর কৃপা সবাই চায়, তাঁর চরণ সবাই ধ্যান করে, কিন্তু তাঁকে লুব্ধ করার কেউ নেই। চতুর্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মস্তুতিতে তাই ব্রহ্মা বলেছেন—

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা যৎ তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ॥

(ভাগবত ১০।১৪।৩১)

অর্থাৎ **‘অহো ! গো এবং গোপীগণ অতিধ্বন্যা’** তার কারণ **‘যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা’** অর্থাৎ তিনি বাছুর হয়ে বৃন্দাবনের গাভীদের এবং পুত্র হয়ে শ্রীদামাদির মায়েদের স্তন্য পান করেছেন। কেন পান করেছেন সে বিষয়ে ব্রহ্মা বলছেন **‘যৎতৃপ্তয়েহদ্যাপী ন চালমধ্বরাঃ’**। অর্থাৎ সৃষ্টির কোন আদিকাল থেকে কত জীব কত সপ্তর্ষিমণ্ডল তোমার তৃপ্তি বিধানের জন্য যজ্ঞ করেছে, কিন্তু তুমি সেই **‘অধ্বরাঃ’** মানে যজ্ঞসকল তোমার তৃপ্তি বিধানে সমর্থ হয়নি **‘যৎতৃপ্তয়ে ন অলম’** (তুমি অধরাই রয়ে গেলে)। কিন্তু প্রভু ! তুমি আজ তাঁদের স্তনদুগ্ধ কত আনন্দের সঙ্গে পান করেছ, এতই তাঁদের মহিমা।

শ্রীকৃষ্ণকে সবাই পেতে চায়, চায় তাঁর কৃপা, চায় তাঁর পাদপদ্ম দর্শন করতে, কিন্তু কৃষ্ণ যদি কারো দর্শন চান, কারোর পাদপদ্ম স্পর্শ করতে চান তবেই না জানি তাঁর কি মহিমা ! রাধার মহিমা, গোপীর মহিমা সেই জাতীয়, কৃষ্ণ যাঁদের স্পর্শ চান, কৃষ্ণ যাদের চরণ মাথায় নিয়ে বলেন—**‘স্মর গরল-খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারম্’** (গীতাগোবিন্দ ১০।১৯)। **গোপীর কৃষ্ণপ্রেম কেমন** ? শ্রীশুকদেব গোস্বামীপাদ বলছেন **‘গোপীনাং পরমানন্দ আসীৎ গোবিন্দদর্শনে’** অর্থাৎ গোপীরা কৃষ্ণদর্শনে পরমানন্দ পেত। পরীক্ষিৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন—সেই আনন্দের মাত্রা কতখানি ? শ্রীশুকদেব বলছেন তা বলতে পারব না তবে খানিকটা অনুমান

দিচ্ছি। কি রকম ? '**ক্ষণং শতযুগমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ**'। তাদের দর্শনে আনন্দ, মিলনে আনন্দ কতখানি, আমি বলতে পারব না কিন্তু তাদের বিরহের অনুমান দিচ্ছি। কৃষ্ণ অদর্শনের সময় তাদের একটা ক্ষণ শতযুগের মতো মন হত। আর এঁরাই হলেন গোপী। এই হল গোপীর সংজ্ঞা।

আবার বলছেন, গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম যেন খরস্রোতা নদীর মতো। খরস্রোতা নদীতে যেমন যা ফেলবে সে সব টেনে নিয়ে চলে যাবে, তেমনি গোপীদের কৃষ্ণপ্রেমের এমন স্রোত, যে তা সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেছে। কী ভাসিয়েছে ? কুল-শীল-সমাজ-শাস্ত্র—ইহকাল-পরকাল সব ভেসে গেছে সেই প্রেমে।

লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম, কর্ম, লজ্জা, ধৈর্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম।
দুস্ত্যজ, আর্যপথ, নিজ পরিজন স্বজন করয় কত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥

কৃষ্ণকে তাঁরা ভালোবাসেন। এত ভালোবাসেন যে, ভালোবাসার তুলনা নেই। কোনো দ্বিতীয় তুলনা হয় না। আবার জিজ্ঞাস্য, গোপীদের কৃষ্ণর প্রতি ভালোবাসা কেমন ? না গোপীর মতন। যেমন '**রামরাবণযুদ্ধয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব**'। রাম-রাবণের যুদ্ধ কেমন হয়েছিল ? না রাম রাবণের মতো। তেমনি গোপীর প্রেম কেমন, না গোপীরই মতন। গোপীর কৃষ্ণ-প্রেমেরও কোনো উপমা নেই।

ভক্তবর জ্ঞানের আকর উদ্ধব গোপীদের রাসলীলা প্রসঙ্গে বলছেন—

'**রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজ বল্লবীনাম্**।' (ভাগবত ১০।৪৭।৬০) শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ আলিঙ্গন করতে চায় অনেকেই, সবাই চায়, যে যেমন অধিকারী। যাঁরা কম অধিকারী তাঁরা ভাবেন 'ঐ চরণ যদি দেখতে পেতাম', যাঁদের পক্ষে দেখাটা সহজ তাঁরা ভাবেন 'ঐ চরণ যদি ছুঁতে পেতাম'। পরপর মাত্রা বাড়ছে, বাসনার মাত্রা বাড়ছে। সখাদের বাহু দ্বারা কৃষ্ণকণ্ঠ আলিঙ্গনে থাকে একটা সখ্যরসের অনুভূতি, আর শৃঙ্গার রসে বাহু দ্বারা কৃষ্ণকণ্ঠের আলিঙ্গনে থাকে পৃথক অনুভূতি। সুতরাং সবাই কৃষ্ণকণ্ঠ আলিঙ্গন করার বাসনা করে। কিন্তু গোপীর এতেও মন ভরছে

না। 'আমরা কৃষ্ণকণ্ঠ আলিঙ্গন করব না, কৃষ্ণ লুব্ধ হয়ে যদি তাঁর বাহুদণ্ডের দ্বারা আমাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করেন, তবে আমাদের মন ভরবে। উদ্ধব সে কথা জানেন, তাই বলছেন— **'রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীত কণ্ঠ'** অর্থাৎ রাসলীলায় কৃষ্ণের বাহু যুগল দ্বারা 'গৃহীত-কণ্ঠ যে গোপী', তার দ্বারা তাঁর পূর্ণ মনোরথ।

এখানে কৃষ্ণ স্ববাহু দ্বারা গোপীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করায়, যে কৃষ্ণ ছিলেন সকলের আশ্রয়, তিনিই এখন হলেন গোপী প্রেমের আশ্রিত আর গোপীপ্রেম হল তাঁর আশ্রয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলছেন—

রাধিকা প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।

সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৪।১২৪)

এটিই গৌর আবির্ভাবের সূচনা করেছে। কৃষ্ণের 'নিজ প্রেম' আস্বাদন করতে হলে, জানতে হলে, **ভক্ত প্রেমিককে** আশ্রয় করতে হবে। তাই পরবর্তীকালে রাধাপ্রেমকে আশ্রয় করে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হলেন—

'রাধা প্রেম গুরু করি নদীয়াতে করল উদয়'।

শ্রীকৃষ্ণ-গোপী প্রেম—সেব্য-সেবক সম্পর্ক বিলুপ্ত—

ভক্তিমার্গে রাগানুগা সাধনার পথ হল শ্রীভগবানের নিত্যসেবা। কিন্তু রাসলীলার রাধাকৃষ্ণ প্রেম— গোপী প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গোপী সেবায় প্রবৃত্ত হলেন।

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানী সঃ।

প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গপাণিনা।। (ভাগবত ১০।৩৩।২১)

রাসলীলায় ব্রজরমণীগণের রতিবিহারজনিত ক্লান্তি দর্শন করে শ্রীভগবান করুণাবশতঃ রতিলীলা হতে নিবৃত্ত হলেন এবং তাঁর পরম সুখকর করকমল স্পর্শে কেবল ঘামই মুছিয়ে দিলেন না, তিনি ব্যজন করলেন এবং পুনরায় অনুলেপন ও প্রতি অঙ্গের প্রসাধনাদি নিষ্পন্ন করলেন।

ফলশ্রুতি—গীতা আদি সর্বশাস্ত্রে বলা হয়েছে শ্রীভগবানকে পাওয়ার পথ হচ্ছে সকল ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক ভগবানে মনোনিবেশ করা। কিন্তু রাসলীলার অন্তিম শ্লোকে আজন্মব্রহ্মচারী পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য ভক্তচূড়ামণি শ্রীশুকদেব বলছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

(ভাগবত ১০।৩৩।৪০)

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজবধূগণের রাসবিলাস আখ্যান এমন পবিত্র যে তা শ্রবণে বা কীর্তনেই জীবহৃদয়ের সর্ববিধ কামব্যাধি দূর হয়, বিষয় বাসনা ও লালসা পরিবর্জিত হয় ও কামবাসনার সর্বগ্লানি নিঃশেষে বিধৌত হয়ে যায়। শ্রীশুকদেব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, রাসলীলা প্রাকৃত কামলীলার বিবরণ নয়, এর অন্তরালে লীলা ও রসতত্ত্বের যে নিগূঢ় সম্পদের মণিখানি লুকিয়ে আছে, তার অনুসন্ধান করার জন্যই ব্যাস, শুকদেব প্রভৃতি ঋষিগণ পর্যন্তও নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। কিন্তু যিনি ইহা উপেক্ষা করে, নিত্যানন্দদায়িনী শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলাকথায়-শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে শ্রবণ বা কীর্তনের জন্য লালায়িত না হন—তাঁর আনন্দ পিপাসা কেমন করে মিটবে।

সিন্ধু নিকট রাখি কণ্ঠ শুকাওত
কো দুর করিবে পিপাসা।

গোপীদের প্রেমের ঋণ প্রতিদানে শ্রীভগবানের অপারগতা, চৈতন্য অবতারের আবির্ভাব—

ভক্ত চায় যে কোনোভাবে হোক ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। আর ভগবানও শরণাগত ভক্তের এই ভাব পূরণ করেন।

অর্জুনের ছিল সখ্যভাব। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সারথিরূপে চেয়েছিলেন তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারথি হলেন। ঋষি বিশ্বামিত্র ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি ভগবানকে শিষ্যরূপে মনে করতেন তাই রাম অবতারে ভগবান তাঁর শিষ্য হলেন। যশোদা ও অনুসূয়া তাঁকে পুত্ররূপে চেয়েছিলেন তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও

দত্তাত্রেয়রূপে তাঁদের পুত্র হলেন।

ভগবান গীতায় তাই দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ (গীতা ৪।১১)

অর্থাৎ 'ভক্ত যেভাবে আমার শরণাগত হয়, আমি তাকে সেইভাবে আশ্রয় দান করি। ভক্তেরও তাই আমার পথ অনুসরণ করা উচিত।' কিন্তু ব্রজলীলায়, রাসলীলায় সবই বিপরীত, তাঁর কোনো নিয়মই যেন এখানে খাটে না। তাঁর বজ্র নির্ঘোষণা আশ্বাস ব্রজদেবীদের প্রেমের কাছে অন্তর্হিত।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হইতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখবচনে॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।১৫১-৫২)

রাসলীলায় সংপ্রবৃত্ত হওয়ার আগে (বত্রিশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে) তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আনত মস্তকে বলছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

(ভাগবত ১০।৩২।২২)

অর্থাৎ হে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ! আমি যদি দেবতাদের মতন সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল পাই তা হলেও তোমাদের এই প্রেমনিষ্ঠাময় সদাচারের প্রতিদান দিতে পারব না। আমি তোমাদের ঋণ শোধে অক্ষম।

শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, এ ঋণ কেবল ব্রজগোপীদের উদারতা বা সৌশীল্য গুণেই (**তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা**) পরিশোধ হতে পারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজকৃত কোনো আচরণ দ্বারা নয়। তাইতো শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধিকার ঋণপরিশোধার্থে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যরূপে নদীয়ায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাই ভক্ত কবি গেয়েছেন—

রাধার প্রেমের ঋণ শোধ হবেন সেদিন
নবদ্বীপে যেদিন গৌর হবেন হরি।
সাধের গোলোকতেজে পথের কাঙ্গাল সেজে
ধূলায় পড়ে ঠাকুর দেবেন গড়াগড়ি॥

উদ্ধবের গোপীস্তুতি—

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য (কাকা) দেবভাবের পুত্র, নিজজন ও আত্মীয়, তাঁর একান্ত ভক্ত, কৃষ্ণের দয়িত এবং প্রিয় সখা। তিনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, বৃষ্ণিগণের প্রধান পরামর্শদাতা এবং অতীব বুদ্ধিমান। তিনি সৌম্যদর্শন-প্রশান্তমূর্তি এবং রূপে গুণে বয়সে প্রায় শ্রীকৃষ্ণেরই মতন। এই উদ্ধবকেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দূত হিসাবে ব্রজধামে পাঠিয়েছেন ব্রজবাসীগণকে তাঁর বার্তা ও কৃষ্ণকথায় আশ্বাসিত করতে। উদ্ধব মথুরাবাসী যে ধাম ঐশ্বর্যপ্রধানা। উদ্ধবের ভাবভক্তিও জ্ঞানমিশ্রা। কিন্তু ব্রজভূমি হল মাধুর্যময়ী, ভক্তিপ্রধানা। তাই ব্রজধামে এসে উদ্ধব ব্রজদেবীদের কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় নিজের কৃষ্ণভক্তি তৃণতুল্য অকিঞ্চিৎকর মনে করছেন। নিজ দৈন্য অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাঁর মনে প্রেমলাভের গভীর লালসা জাগল। উদ্ধব পরম দৈন্যে আকুল হৃদয়ে তাই প্রার্থনা করছেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

(ভাগবত ১০।৪৭।৬১)

অর্থাৎ তিনি অনুভব করলেন যে ব্রজগোপীগণের চরণধূলির দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া এবং তাঁদের কৃপাশক্তি লাভই তাঁর সেই অভিলাষ পূর্ণ করার একমাত্র পথ। উদ্ধব ব্রজধামের গুল্মলতাদি হয়ে জন্মগ্রহণ করে চরণধূলি লাভের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করেছেন। উদ্ধবের তাই একমাত্র প্রার্থনা যেন তিনি ব্রজ-বৃন্দাবনে মনুষ্যরূপে নয়, উচ্চবৃক্ষাদিরূপে নয়, তিনি নিম্ন মৃত্তিকা সংলগ্ন গুল্মাদিরূপেই যেন জন্মগ্রহণ করেন যাতে কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের চরণধূলি প্রচুর পরিমাণে স্বীয় অঙ্গে মাখতে পারেন।

ব্রজগোপীগণকে দেখে তাঁর জাতি, কুল, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতির সমস্ত প্রকার গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। বৃন্দাবনে ব্রজদেবীগণের সঙ্গে বাস করে এবং তাঁদের সৎসঙ্গের প্রভাবে এখন উদ্ধবের চিত্তের সমস্ত মলিনতাও দূর হয়েছে। তিনি আরো বলছেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, রুদ্রাদি আধিকারিক দেবতাগণ, আপ্তকাম আত্মারাম মুনিগণ বা পরম যোগেশ্বরগণও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম দুর্লভ চরণকমল অর্চনা করে থাকেন কিন্তু সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হন না। অহো ! ব্রজগোপীগণের গুণমহিমা ও প্রেমের কী অপূর্ব প্রভাব, তার বলে ব্রজসুন্দরীগণ রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সর্বারাধ্য পরমদুর্লভ চরণকমল নিজ নিজ স্তনোপরি ধারণ ও আলিঙ্গন করে হৃদয়ের সন্তাপ দূর করেছিলেন।

—○—

ব্রজলীলার অন্ত ও মথুরা লীলার প্রারম্ভ

অক্রূর স্তুতি (দশম স্কন্ধ, ৪০ অধ্যায়)

প্রাক্‌কথন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৯ বছর বয়সে রাসলীলা এবং তৎপরে সুদর্শন নামে বিদ্যাধর মুক্তি, শঙ্খচূড় বধ, যুগলগীত, অরিষ্টাসুর বধ, কেশিদৈত্য বধ, ব্যোমাসুর আদি লীলা সম্পন্ন করেন।

শ্রীশুকদেব বলছেন—**'একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ'** অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর একাদশ বয়স পর্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন এবং সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য গোপন করে ব্রজগোপ-গোপীগণের প্রেমাধীন হয়ে বিবিধ লীলা করেন।

প্রেমরসনির্যাস আস্বাদন ও প্রেমানন্দ বিতরণ উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা সম্পাদন করেছেন, কেননা উহাই ছিল ব্রজলীলার মুখ্য প্রয়োজন। কিন্তু এই রসপুষ্টির সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে মথুরাদিলীলারও গৌণভাবে হলেও যোগ রয়েছে। মথুরার যাদব প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের প্রেমসেবানন্দের সুযোগ দানও আনন্দঘনবিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

তাই ব্রজলীলার পরম আস্বাদ্য ‘সর্বলীলামুকুটমণি’ রাসলীলা যখন সম্পাদিত হয়ে গেল—তারপরে পরেই ভক্তপ্রবর নারদ সর্বানন্দদায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যাদবগণের আনন্দ বিধান এবং কংস, জরাসন্ধাদি বধ উদ্দেশ্যে মথুরালীলা সংঘটনের প্রতি তাঁর কৃপা আকর্ষণ করলেন। কেননা তিনি জানেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই জগদীশ্বর আর তিনি যাদবদেরও প্রাণপ্রিয়।

তাই শ্রীশুকদেব বলছেন—

অরিষ্টে নিহতে দৈত্যে কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা।

কংসায়াথাহ ভগবান্ নারদো দেবদর্শনঃ॥ (ভাগবত ১০।৩৬।১৬)

অর্থাৎ অরিষ্টাসুর (বৃষাসুর) শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রজভূমিতে নিহত হলে দৈবদর্শন ভগবান শ্রীনারদ কংসের নিকট উপস্থিত হলেন। দেবর্ষি নারদ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান প্রভৃতি কালত্রয়ের দ্রষ্টা বলে তাঁর বিশেষ দর্শন বা জ্ঞান সর্বজন বিদিত। দুরাচার কংসের অত্যাচারে যাদবগণ বড়ই নিপীড়িত এবং দেবগণও উদ্বিগ্ন। যাতে এই অত্যাচারী দুরাচার কংসের সত্বর বিনাশসাধন হয় ও পৃথিবীর ভারমুক্তির জন্য আর কাল প্রতীক্ষা করতে না হয় তারজন্য ত্রিকালজ্ঞ দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট বিস্তারিতভাবে সব বর্ণনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস এবার করালরূপী অরিষ্ট নামে বৃষভাসুরকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সেও যে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়েছে, সে খবর কংস তখনো পাননি। দেবর্ষি নারদ সেই খবর দিয়ে তাঁর বার্তা শুরু করলেন।

নারদ বললেন—হে অসুররাজ কংস! দেবকীর গর্ভে যে কন্যা উৎপন্ন হয় বলে তুমি জান, তা প্রকৃতপক্ষে যশোদার কন্যা। আর যশোদার পুত্র বলে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ও রোহিণীর পুত্র বলে প্রসিদ্ধ রাম (বলরাম) এরা উভয়েই দেবকীর অষ্টম ও সপ্তম গর্ভের সন্তান। তোমার ভয়ে ভীত হয়ে বসুদেব এই দুই পুত্রকে নিজ মিত্র মহারাজ নন্দগোপের নিকট গোপনে রেখে এসেছেন এবং এই পুত্রদ্বয়ই আপনার অরিষ্ট, তৃণাবর্তাদি সমস্ত অনুচর ও আত্মীয়স্বজনের বিনাশের কারণ।

অবশেষে দেবর্ষি নারদ কংসকে তার জন্মবৃত্তান্তও বর্ণনা করলেন। নারদ বললেন—দ্রুমিল নামে এক কামার্ত গন্ধর্বের ঔরসে তার জন্ম। ওই দুরাচারী

গন্ধর্বই কংসের প্রকৃত পিতা। সে উগ্রসেনের রূপ ধারণ তাঁর পতিব্রতা ধর্মচারিণী মাতার সঙ্গে মিলিত হয়। মাতা যখন এই ছলনার রহস্য ধরে ফেলেন তখন তাঁর রোষবহ্নি জ্বলে ওঠে এবং তিনি ক্রোধভরে বললেন—রে পামর ! তোমার ঔরষে আমার গর্ভের পুত্র কখনই শ্রীমান ও ধীমান হতে পারে না বরং কুলের কুলাঙ্গার হয়ে সেই গুণহীন পুত্র দেব, ব্রাহ্মণ ও তপস্বীগণের চিরনিগ্রহের কারণ হবে। শাপভয়ে ভীত হয়ে সেই মায়াবী গন্ধর্ব তখন এই কথা বলে অন্তর্হিত হলেন যে—'তোমার এই পুত্র বান্ধবগণের শত্রু হবে'। (শ্রীমদ্‌বীর রাঘবাচার্যকৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক ও হরিবংশ আদি পুরাণে উল্লিখিত)

নারদ নিশ্চিত জানতেন যে, এই সংবাদ শ্রবণ করে অত্যাচারী কংস বসুদেবের প্রতি আরো কঠিন ও নৃশংস অত্যাচারে নিযুক্ত হবে এবং যখন তার পাপাচার চরম অবস্থায় উঠবে তখন তা ভগবানের কৃপা আকর্ষণ করবেই আর দুষ্টমতি কংস আপন স্বখাতসলিলে ডুবে মরবে। দেবর্ষি নারদ ত্রিকালজ্ঞ, তাঁর নিকট কংসের জীবনপ্রবাহের সমস্ত গতিধারাই সুস্পষ্টগোচর। কংসের কর্মফল ভোগের কাল যে সমাপ্ত প্রায় এটা ভক্তপ্রবর নারদ বুঝেছেন আর এও জানেন যে তিনি এবং তাঁর এই দৌত্য, কর্মকাণ্ড ইত্যাদি নিমিত্তমাত্র।

কংসের শ্রীকৃষ্ণ নিধনোদ্যোগ—

ভোজপতি কংস দেবর্ষি নারদের মুখে এই নিগূঢ় সংবাদ শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং তাঁর হিতাহিত বিবেকবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রবঞ্চক বসুদেবকে বধ করার জন্য ক্রোধোন্মত্ততায় সুতীক্ষ্ণ অসি গ্রহণ করলেন। দেবর্ষি নারদ তখন কংসকে বোঝালেন— দেখো, বসুদেব নয় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামই তোমার মূল শত্রু, মৃত্যুরূপী এই দুই শত্রুকে আশু পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সচেষ্ট হও। যদি বসুদেবকে বধ কর তবে পুত্রদ্বয় ভীতিবিহ্বল হয়ে পলায়ন করতে পারে। তারচেয়ে বরং যদি বসুদেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখো তবে তারা পিতামাতার বন্ধন মুক্তির জন্য নিশ্চয় তোমার নিকট আসবে আর তখন তুমি তাদের বধ করতে পারবে। এখন তুমি সত্বর

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে সংগোপনে মথুরা আনার ব্যবস্থা করো এবং তোমার উদ্দেশ্য সম্পন্ন করো। দেবর্ষি নারদ এইভাবে কংসকে যথাবিহিত উপদেশ দিলেন যাতে তার মৃত্যুবীজ অতি সত্বর ফলে পরিণত হয়। এইভাবে নিয়তির অমোঘ বিধান ত্বরান্বিত করে, নারদ কংসরাজের সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

দেবর্ষি নারদের পরামর্শক্রমে ভোজপতি কংস, বসুদেব ও তৎপত্নী দেবকীকে লৌহপাশে আবদ্ধ করে রাখলেন। অতঃপর কংস কেশী নামক একজন অশ্বাকার অসুরকে বৃন্দাবনে পাঠালেন যাতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বিনাশসাধন হয়। কেশীকে ঐরূপ আদেশ প্রদান করে কংস তার অন্য অমাত্যবর্গ যেমন মুষ্টিক, চানুর, শল, তোষলক এবং হস্তিপকবৃন্দকে ডেকে বললেন—দেখো ! আমি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে আসব। হস্তিপালকগণ শোন, বালকদ্বয় আসামাত্রই তোমরা তাদের ওপর মত্ত হস্তি চালিয়ে দেবে যাতে তারা হাতির পদস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায়। তাতেও যদি কোনোপ্রকারে তারা মৃত্যুর হাত হতে নিষ্কৃতি পায় তবে তোমরা যারা মল্ল আছ যেমন চানুর ও মুষ্টিক ইত্যাদি, তোমরা এখানে যে মল্লমঞ্চ প্রস্তুত থাকবে তাতেই ওদের বিনাশ করবে।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নিধনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে কংস ভাবলেন কীভাবে কৃষ্ণ-বলরামকে আনা যায়। তখন তিনি সম্পর্কে কৃষ্ণর কাকা ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত এবং তাঁর অন্যতম পার্ষদ অক্রূরকে আহ্বান করলেন। অক্রূর যাদবদের মধ্যে গোষ্ঠপতি কিন্তু অন্য যাদবদের মতো কংস ভয়ে মথুরা ত্যাগ করেননি। তিনি মথুরায় অপেক্ষা করে আছেন কবে তাঁর প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আসবেন আর তিনি তাঁকে সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা জানাবেন। যেহেতু অক্রূর কংসের মিত্র এবং যদুবংশেরও বিশ্বাসভাজন তাই কংস অক্রূরকে নির্দেশ দিলেন যাতে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সহ নন্দগোপ, উপানন্দ সকলকেই ধনুর্যজ্ঞে ও মল্লক্রীড়ায় তাঁর হয়ে অবশ্যই আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং অক্রূর নিজে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে যেন রথে করে মথুরায় নিয়ে আসেন। এইজন্য কংস অক্রূরকে এক নতুন সুসজ্জিত রথও প্রদান করলেন। এইভাবে

কংস শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে নিধন করার বাকি সকল ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করেও অস্থির চিত্তে অবস্থান করতে লাগলেন।

নারদ-কৃষ্ণ সংবাদ—এ দিকে দেবর্ষি নারদ মথুরায় কংসকে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সম্বন্ধে যথাবিহিত উপদেশ প্রদান করে নিজে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হলেন। কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন কংস প্রেরিত কেশী দৈত্যকে অবলীলাক্রমে সংহার করে শান্তভাবে মৃদুমন্দ হাস্যরত ছিলেন।

দেবর্ষিরুপসঙ্গম্য ভাগবতপ্রবরো নৃপ।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণং রহস্যেতদভাষত।। (ভাগবত ১০।৩৭।১০)

দেবর্ষি নারদ ভাগবত প্রবর এবং ভাগবত গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর স্থান শ্রেষ্ঠ। তিনি ভক্তিরসিক, গোপালমন্ত্রদ্রষ্টা ও ভক্তিতত্ত্বের প্রচারক। তিনি তাঁর দেবদৃষ্টিতে বুঝেছিলেন যে, কংসের পাপরাশি ফলোন্মুখ হয়েছে। এখন বিশ্বের কল্যাণে, ভক্তজনের কল্যাণে, দেবগণের কল্যাণে, কংসের নিধন ত্বরান্বিত করাই তাঁর কর্তব্য। এই মহৎদ্দেশ্য নিয়েই তিনি কংসের নিকট বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান দিয়ে এবং তাঁদের মথুরায় আনার উপদেশ দিয়ে, ব্রজে এসেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণতি করতে। অধর্মের পুঞ্জীভূত গ্লানি যেন আজ কংসরূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং জগৎ যেন সেই পাপে পূর্ণ হতে চলেছে। কাজেই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন যাঁর ব্রত—সেই বিশ্ব পালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী কংসকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ধরিত্রীকে অধর্মের গ্লানি থেকে মুক্ত করবেন—এই নারদের বিশ্বাস। তিনি জানেন—অচিন্ত্যপ্রভাব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমেই পূতনা, বৃষাসুর, কেশী প্রভৃতির বিনাশ সাধন করেছেন—এ সবে তাঁর কোনো ক্লেশই হয় না কেননা তিনি '**অক্লিষ্টকর্মা**'।

কিন্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্তমানে ভক্তপ্রেম আস্বাদনের জন্য নরলীলা রূপ প্রকট করে ব্রজভূমিতে গো ও গোপবৃন্দের সঙ্গে লীলারস সিন্ধুতে মগ্ন আছেন। ভক্ত প্রেমাস্বাদন ও নিজ প্রেমানন্দ বিতরণই যে তাঁর স্বভাব, যা তাঁর

অন্তরঙ্গ স্বভাব। কিন্তু তাঁর বহিরঙ্গ স্বভাবও তো আছে আর সেটাই দেবর্ষি নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণতি নিবেদন করে বলছেন—

'অবতীর্ণো বিনাশায় সাধুনাং রক্ষণায় চ'। (ভাগবত ১০।৩৭।১৩)

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন কিন্তু ভক্ত প্রেমাস্বাদন ছাড়াও ভক্তিবিরোধী রাজন্যবর্গ বিনাশ আর ভক্তি প্রবর্তক সাধুগণের রক্ষা যা পরবর্তীতে মথুরালীলা ও দ্বারকালীলায় প্রকটিত হবে তাও তো আপনিই সম্পাদন করবেন। ভক্ত নারদ তাঁর এই প্রার্থনা ১৫টি শ্লোকে (১০।৩৭।৯-২৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেছেন।

ভাগবতপ্রবর দেবর্ষি নারদ দিব্যদৃষ্টিতে ভগবানের ভাবীকালের সমস্ত দৃশ্যাবলীই দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বলছেন—'হে বিভূতিস্বরূপ ভগবন্! দুর্মতি কংস দ্বারদেশে মদমত্ত হস্তী আর মল্লমঞ্চে চানুর ও মুষ্টিক আদি মল্লবীরদের আপনার বধোদ্দেশে নিয়োগ করবে এবং আমি জানি এ সকলই আপনি আপনার অমিতপ্রভাবে ছিন্ন করবেন আর কংসকেও নিহত করবেন এবং আমার পরম সৌভাগ্য যে এসবই আমি দেখবে পাব'। দেবর্ষি নারদ তাঁর স্তুতিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকালীলার কিছু কিছু বর্ণনাও প্রণত হয়ে নিবেদন করেছেন।

দেবর্ষি নারদ ভগবানের দুর্বৃত্ত নাশ প্রসঙ্গে বলেছেন—হে প্রভো! আপনি পঞ্চ-জনাসুর, কালযবন, নরকাসুর, মুরাসুর, কাশীরাজ পৌণ্ড্রক, মোহাচ্ছন্ন ও গর্বিত চেদীরাজ শিশুপাল, দন্তাবক্র আদি আসুরিক ভাবাপন্ন রাজাদের নিধন করবেন আর তা আপনারই কৃপাপ্রভাবে এবং দৈবদৃষ্টিতে যেন এই সকল দৃশ্যই আমি প্রত্যক্ষরূপে দেখতে পাচ্ছি।

আবার ভগবানের ভক্তপালক লীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদ বলছেন— হে ভগবন্! আপনি (ভীষ্মক কন্যা) লক্ষ্মী অংশভূতা রুক্মিণী, (জাম্বুবান কন্যা) পার্বতী অংশভূতা জাম্ববতী, (সত্যাজিত কন্যা) ধরিত্রী অংশভূতা সত্যভামাকেও বিবাহ করবেন, গুরুর মৃত পুত্রকে জীবনদান, পারিজাত পুষ্পাহরণ, নৃগরাজের মুক্তি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবদের অক্ষৌহিণী সৈন্য বিনাশ আদি অনেক অনেক বৈভবলীলা

করবেন। এইরূপে ভবিষ্যতে, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিদের গীত উপযোগী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বীর্য ও ঐশ্বর্য প্রকাশক মথুরা ও দ্বারকার লীলাবৈভবের প্রতি দেবর্ষি নারদ সঙ্কেত প্রদান করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করে নারদ আজ পরম কৃতার্থ, এ যেন তাঁর কাছে মহোৎসব স্বরূপ। ভক্ত ভগবান ভিন্ন আর কিছু জানে না কাজেই শ্রীভগবানের দর্শনজনিত প্রেমানন্দ ভক্তের নিকট মহামহোৎসবেরই সৌভাগ্য বহন করে। নারদের প্রার্থনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্ত যাদবগণের রক্ষার জন্য মথুরায় গিয়ে দুর্মতি কংসের নিধন সাধন করবেন নারদ তাও বুঝেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সাক্ষাৎভাবে সম্মতিসূচক কিছুই বললেন না, কিন্তু নারদের প্রস্তাব শুনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রণতি গ্রহণ করলেন তখন দেবর্ষি নারদ **'প্রণিপত্যাভ্যনুজ্ঞাতো যয়ৌ তদ্দর্শনোৎসবঃ'** অর্থাৎ শ্রীভগবানের চরণকমলে প্রণাম করে তার দর্শন লাভরূপ উৎসবের প্রতিক্ষায় থাকব বলে, তাঁরই অনুমোদনক্রমে তথা হতে প্রস্থান করলেন।

অক্রূরের মথুরা গমন—কংস যেদিন অক্রূরকে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে আনার জন্য প্রস্তাব করেন, সেদিন ছিল একাদশী তিথি। সেই দিন প্রাতঃকালে ভোজপতি দুর্মতি কংস কেশী দানবকে ব্রজভূমিতে যাওয়ার জন্য আদেশ দেন। অন্যদিকে পরম বৈষ্ণব অক্রূর সেই রাত্রিতে মথুরাতে একাদশী ব্রত উপলক্ষে অবস্থান করে ভগবচ্চিন্তায় রাত্রিযাপন করেন এবং পরদিন দ্বাদশীর প্রাতে ব্রজভূমির উদ্দেশে যাত্রা করে সন্ধ্যায় ব্রজধামে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে আবার ঐ দ্বাদশীর দিনই প্রাতঃকালে ব্রজের গোষ্ঠভূমিতে কেশীবধ অনুষ্ঠিত হয় এবং ভক্ত নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রার্থনা নিবেদনান্তে প্রস্থান করেন। অতঃপর দ্বাদশীর অপরাহ্ণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর হস্তে ব্যোমাসুর নিহত হয় আর সন্ধ্যায় ব্রজভূমিতে প্রবেশ হয় অক্রূরের।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ভক্ত অক্রূরের হৃদয়ে যে ভাবস্ফূর্তি প্রকাশ পেয়েছে তাতে তাঁর হৃদয়ে পরম ভগবদ্‌ভক্তি জেগে উঠেছে। ভক্তিভাবিত চিত্তে তাই তিনি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করতে লাগলেন—পরম দুর্লভ কমললোচন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার বহু জন্মের পুণ্যের ফলেই ঘটে থাকে।

বহুজন্মের অর্জিত পুণ্যরাশি ফলোন্মুখ হলে তবেই জীবের মায়াবন্ধন শিথিল হয়ে যায় এবং শ্রীভগবানের চরণ দর্শনলাভ ঘটে। তাই ব্রজপুরীতে যাওয়ার পথে তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন— অহো ! আমি কী এমন মঙ্গলানুষ্ঠান করেছি যার ফলে শ্রীহরির সাক্ষাৎকারের ন্যায় দুর্লভ অথচ পরমতম সৌভাগ্য লাভ করতে চলেছি। আমার ন্যায় ভক্তিহীন, অকিঞ্চন জনের পক্ষে এ স্বপ্নেরও অগোচর। ধন, জন, গেহ, দেহ প্রভৃতি বিষয়বস্তুর জালে আবদ্ধ হয়ে আমি ভগবানের পরমপদ সেবার অধিকার হারিয়েছি। আমি অধমাধম কংসরাজার অনুচর, ভক্তি ক্ষীণ, তা সত্ত্বেও কী করে ভগবানের দর্শন পাব।

কিন্তু সর্ববিধ অকল্যাণ নাশ যে ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল, তাই বিঘোষিত করে পরমহংসাচার্য শ্রীশুকদেব সূত-শৌনক সংবাদ বর্ণনা করে বলছেন—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্য শ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
নষ্টপ্রায়েস্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

(ভাগবত ১।২।১৭-২১)

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পাবনী যে লীলাকথা, তার শ্রবণ-কীর্তনে পবিত্রতা আনয়ন করে। তাঁর লীলাকথা শ্রবণের মাধ্যমে হৃদয়ে আবির্ভূত ভক্তজনসুহৃৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতৃজনের কামবাসনাদি-জাত অমঙ্গলনিচয় দূর করেন। এইভাবে অকল্যাণসমূহ নষ্টপ্রায় হলে ভগবদ্ভক্তর উত্তমঃশ্লোক

শ্রীভগবানে সতত বিদ্যমান নৈষ্ঠিকভক্তির উদয় হয়। তখন রজঃ ও তমোভাব এবং তদুৎপন্ন কামলোভাদি তার চিত্তকে অভিভূত করে না এবং চিত্তও তখন সত্ত্বে স্থিত হয়ে প্রসন্নতা লাভ করে। এই প্রকার কামাদি আসক্তি বর্জিত প্রসন্নমনা ব্যক্তির আচরিত ভক্তিযোগ হতে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয়। আত্মস্বরূপ ঈশ্বর দৃষ্ট হলে দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থিরূপ অহংকার দূর হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ চিন্তা করতে করতে সন্ধ্যার গোধূলির শুভলগ্নে অক্রূর বৃন্দাবনের গোষ্ঠভূমিতে উপস্থিত হলেন। তিনি দূর হতে দেখতে পেলেন শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত চরণযুগলের চিহ্ন বক্ষে ধারণ করে, ব্রজের গোষ্ঠভূমি যেন পরমতম শোভায় বিরাজ করছে। অখিল-লোকপাল ব্রহ্মা আদি দেবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে চরণরেণু সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় মস্তকে ধারণ করে ধন্য হন, পরম দুর্লভ সেই চরণচিহ্নিত ধূলিরেণু আজ সাক্ষাৎ দর্শন করে অক্রূরের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল।

'তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ প্রেম্নোর্ধ্বরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ'।

(ভাগবত ১০।৩৮।২৬)

অক্রূর তখন সেই চরণচিহ্ন দেখে আনন্দাতিশয়ে সসম্ভ্রমে এবং প্রেমপুলকিত ও অশ্রুসমাকুল লোচনে ভাবলেন, 'অহো ! এই তো প্রভুর চরণরেণু' আর এইরূপ চিন্তা করে প্রেমনির্ভর হৃদয়াবেগে রথ থেকে অবতরণ করে, সেই চরণরেণুর মধ্যেই লুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন।

বৃন্দাবনের পথে ভগবৎকথা স্মরণ করতে করতে যখন নন্দিগ্রামে পৌঁছলেন তখন অক্রূর দম্ভ ভয় শোক দুঃখ সব কিছু পরিত্যাগ করেছেন। কংসরাজের মন্ত্রী বলে আজ আর তাঁর কোনো দম্ভ নেই, বরং ভক্তোচিত দৈন্য প্রকাশ করে তিনি নিজেকে ভগবদ্ভক্তের অবস্থা বিশেষেরই পরিচয় দিচ্ছেন। রথারোহণের পরের থেকেই তিনি ব্রজভূমিতে যাচ্ছেন — এই পরমতম সৌভাগ্যের চিন্তায় অক্রূর কত ভাবেই না বিভোর হয়ে আছেন !

অতঃপর গোষ্ঠভূমিতে প্রবেশ করে পীতবসনধারী শ্রীকৃষ্ণ ও নীলবসনধারী শ্রীবলরামকে গোদোহন স্থানে এবং গোবৎসগণের মধ্যে

সাক্ষাৎ দর্শন করে অক্রূর নয়ন পরিতৃপ্ত করলেন। পরমহংস প্রবর শ্রীশুকদেব অক্রূরের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করেছেন—

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদবাস্পপর্যাকুলেক্ষণঃ ।
পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠাৎ স্বাখ্যানেঽপি হি নাশকত॥

(ভাগবত ১০।৩৮।৩৫)

শ্রীভগবদ্দর্শনজনিত আনন্দাবেশে অক্রূরের লোচনযুগল বাষ্পাকুল ও দেহ রোমাঞ্চিত হল, আর উৎকণ্ঠাতিশয্যে তিনি নিজ পরিচয় দিতেও সমর্থ হলেন না। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলেছেন—

'দিশো বিতিমিরা রাজন্ কুর্বাণৌ প্রভয়া স্বয়া' (ভাগবত ১০।৩৮।৩৩) অর্থাৎ যাঁর অসাধারণ দীপ্তিশালী রূপচ্ছটায় বিশ্বের সকলের অঙ্গে অপরূপ রূপসুষমা ও দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়, যাঁর অঙ্গজ্যোতির কণামাত্র লাভ করে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতিস্মান হয়—**'যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'** অক্রূর দেখছেন তাঁদেরই রূপের সেই অসাধারণ প্রভায় রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হয়ে গিয়েছে।

অক্রূরের নয়নপ্রান্ত থেকে দরদর ধারে প্রেমাশ্রু বয়ে চলেছে, তাঁর দেহে কদম্বকেশরের ন্যায় পুলক শিহরণ জেগে উঠছে—আনন্দের পর্যাপ্তি তাঁর দেহ ও মন ব্যাপ্ত করে আছে। তখন স্নেহবিহ্বল দাস্যভাবোচিত প্রেমভাবে তাঁর বাহ্যজ্ঞান দূরীভূত হল। যাঁকে চাইলে সকল চাওয়া ও পাওয়ার নিবৃত্তি হয়ে যায়—সেই সর্বৈশ্বর্যনিকেতন সর্বারাধ্য শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ নয়ন সম্মুখে দেখতে পেয়ে তাঁর যেন আর কিছু বলার নেই, সকল মনোরথ বুঝি বা তাঁর পূর্ণ হয়েছে তাই তাঁর এই প্রেম বৈবশ্য।

সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ বুঝেছেন কালের অমোঘ নিয়মে অত্যাচারী কংসের নিধন আসন্ন। অক্রূরের ব্রজে আগমনই সেই শুভ সঙ্কেত বহন করছে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে তাঁর ব্রজে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে অক্রূর কংসের অত্যাচার, তাঁর দুরভিসন্ধি এবং ধনুর্যজ্ঞক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নিধনের চক্রান্ত ব্যক্ত করলেন কিন্তু কৃষ্ণ-বলরাম উপেক্ষার হাসি হাসলেন এবং হাসতে হাসতে পিতা নন্দমহারাজকে কংসরাজের আদেশ বৃত্তান্ত জানালেন। কিন্তু

অবশ্যই কংসের কোনো দুরভিসন্ধির কথা পিতাকে ব্যক্ত করলেন না, কেননা তাহলে পুত্রবৎসল নন্দ কখনই তাঁদের মথুরায় যেতে দেবেন না।

অতঃপর নন্দ মহারাজ মথুরারাজের এই আমন্ত্রণ ব্রজরক্ষকগণের দ্বারা তখনই প্রচার করে দিলেন এবং আদেশ দিলেন যে এই বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান দর্শন করতে যেন ব্রজবাসীগণ সকলেই মথুরা গমন করেন।

গোপীগণের বিরহ (শ্লোক ১৩-১৮)—গোপরাজ নন্দ বিশিষ্ট ব্রজ-নাগরিকবৃন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ-বলরামসহ মথুরাপুরীতে কংসরাজ আয়োজিত ধনুর্যজ্ঞে যাচ্ছেন একথা দাবানলের মতো সমগ্র ব্রজে ছড়িয়ে গেল। ভক্তচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোপীদের এই শ্রীকৃষ্ণ বিরহ সম্বন্ধে বলছেন—

গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্।
রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতম্॥ (ভাগবত ১০।৩৯।১৩)

অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাণগতা ব্রজগোপীগণ যখন শুনলেন যে তাঁদের প্রাণের প্রাণ, পরম দয়িত ব্রজেন্দ্রনন্দন গোবিন্দকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্রূর ব্রজে এসেছেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তাঁদের দুঃখ এতই দুর্বিষহ হল যে মরণও বুঝিবা তখন তাঁদের পক্ষে সুখকর। প্রাণের প্রাণ শ্রীগোবিন্দই যদি তাঁদের সঙ্গ ছেড়ে ব্রজ থেকে মথুরায় চলে যান তবে তাঁরা কিভাবে এই বিরহ নিয়ে প্রাণ ধারণ করবেন। অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমে যাঁরা নিত্য প্রাণ-গোবিন্দের সেবায় তৎপর, তাঁরা দয়িতবিরহে কি করে প্রাণ ধারণ করবেন, এ যে অপ্রাকৃত প্রেম।

কৈতবরহিতং প্রেম ন হি ভবতি মানুষে লোকে।
যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে ভবতি কো জীবতি॥

(প্রাচীন শ্লোকঃ)

প্রাণগোবিন্দ অচ্যুতের প্রতি গোপীদের চিত্ত নিত্যলগ্না, তাঁদের প্রেমভাবের কোনো বিচ্যুতিই নেই, কেননা তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়গৌরবে গরবিনী। সেই প্রাণকান্তর আসন্ন বিরহের বিষাদ মুহূর্তে তাই তাঁদের প্রথমেই মনে পড়ল শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ প্রেমবিলাসের কথা, কেননা তাঁদের হৃদয়ে সেই

মধুর রতির স্ফূর্তি নিত্য তরঙ্গায়িত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বিরহ বেদনায় এমনই বিহ্বল ও শোকার্ত হয়ে পড়লেন যে, সকলেই অশান্ত ক্রন্দনে তাঁদের হৃদয়ের সুগভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করতে লাগলেন।

গোপীগণের আর্তি (শ্লোক ১৯-৩১)—**'অহো বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়া'** (১০।৩৯।১৯) প্রভৃতি তেরোটি শ্লোকে বিধাতাকে ধিক্কার দিয়ে গোপীগণ অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে, হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা উৎসারিত করে আপন অদৃষ্টকে আর বিধাতাকে দোষায়িত করে বলতে লাগলেন— হে বিধাতঃ ! তুমি এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব কিছুর সমুচিত বিধান করো, কিন্তু তোমার শাসনে কী দয়ার একটুকুও বিধান নেই। তাই যদি থাকত তবে তুমি এত নির্দয় হতে পারতে না ! বুঝলাম তুমি একান্তই হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর আর তোমার স্বভাবই এই নিষ্করুণতার সাক্ষী। হে বিধাতা ! আমরা জানি আমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের যোগ্য নই—তাহলে কেন তুমি অকারণে আমাদের মিলন সংঘটিত করেছিলে আর মিলনই যদি ঘটালে তবে কেনই বা এমন করে শুধু ক্ষণিকের জন্য এই বিধান দিলে। বিচ্ছেদের দাবদাহে শতগুণে বর্ধিত করে আমাদের দগ্ধ করার জন্যই কি তোমার এমন বিধান !

এইভাবে সকরুণ বিলাপ করতে করতে বিরহকাতরা ব্রজরমণীগণের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ রূপমাধুরীর স্ফূর্তি জেগে উঠল। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নীলকুন্তলাবৃত সুন্দর কপোল, উন্নত নাসা, স্নিগ্ধহাস্য শোভিত বদনকমল যে আর দেখতে পাবেন না এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং পুনরায় বিলাপ করতে লাগলেন—হে বিধাতঃ ! তুমি যে শুধু দয়াহীন, বিবেকহীন, বিচারহীন তা নয়, তুমি দুষ্কৃতকারীও বটে। বিষ্ণুপুরাণ বলছেন—

সারং সমস্ত গোষ্ঠস্য বিধিনা হরতো হরিম্।

প্রহৃতং গোপযোষিৎসু নির্ঘৃণেন দুরাত্মনা॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

হে বিধাতা ! ব্রজভূমির সৌন্দর্যসার শ্রীহরিকে হরণ করে তুমি গোপীগণের প্রতি নিষ্ঠুর ও দুরাত্মার মতো আচরণ করেছো।

এই প্রাণান্তক বিচ্ছেদের জন্য প্রথমে নিষ্ঠুর বিধাতাকে দায়ী করে তারপর

গোপীরা বলছেন—**'মৈতদ্বিধস্যাকরুণস্য নাম ভূদক্রূর ইত্যেতদতীব দারুণঃ'** (ভাগবত ১০।৩৯।২৬)। অহো! সেই ক্রূর বিধাতাই বোধহয় আজ অক্রূর নাম ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করতে এসেছেন। কিন্তু এখন তাঁরা কেমন করে জীবন ধারণ করবেন ? প্রাণের প্রাণগোবিন্দকে ছাড়া তাঁদের প্রাণ কখনই অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না। পরক্ষণেই আবার তাঁদের মনে হল—অক্রূরকে দোষ দিয়েই বা লাভ কী ? ও তো কংসের দূত। আমাদের প্রিয়তমই তো প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে কঠোর হৃদয় নিয়ে রথে বসে আছেন, তাহলে অক্রূরকেই বা তাঁরা আর কী বলবেন ? হয়তো বা অক্রূরের ক্রূরতাই সর্বত্র সঞ্চারিত হয়েছে ফলে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন ক্রূর ও নিষ্ঠুর। তাঁরা নিজেদের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে বলছেন— **'দৈবঞ্চ নোঽদ্য প্রতিকূলমীহতে'** (ভাগবত ১০।৩৯।২৭)। হায় ! আজ আমাদের বিধাতা বাম, দৈব অপ্রসন্ন, তাই সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। দৈব যদি অনুকূল হত তবে যাত্রার সমস্ত আয়োজন সত্ত্বেও হয়তোবা বজ্রপাত আদি বা অন্য কোনো প্রকার উৎপাত বা বিঘ্ন এসে আমাদের প্রাণগোবিন্দের যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করত। কিন্তু হায়, আমাদের দৈবই প্রতিকূল।

অবশেষে ব্রজগোপীগণ সাহস অবলম্বন করে ঠিক করলেন, নিজেরাই শ্রীগোবিন্দের মথুরা যাত্রায় বাধা দেবেন। তখন তাঁরা কী করলেন—

বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং গোবিন্দন দামোদর মাধবেতি॥

(ভাগবত ১০।৩৯।৩১)

ব্রজস্ত্রীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণেই আসক্ত থাকায়, তাঁরা অত্যন্ত বিরহকাতর হয়ে এইরূপ বিলাপ করতে করতে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে সমবেত কণ্ঠে 'হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব ! বলে উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগলেন।' গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—সখা ! বলো তোমার বিচ্ছেদে আমরা কীভাবে জীবনযাপন করব ! যদি মরি, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু মরলেও দুঃখ থেকেই যাবে, কেননা তোমাকে তো আর আমরা দেখতে পাব না। এমনি

কত আবেগে, কত আকুলতায়, কত মিনতিতে সেই অবলা ব্রজগোপীগণ নিরন্তর শ্রীগোবিন্দকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য আঝোরধারে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন এবং তাঁদের সেই সমুচ্চ ক্রন্দন রোল আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে তুলল।

অবশেষে সেই মর্মস্পর্শী অন্তিমক্ষণ উপস্থিত হল। গোপীগণ দেখলেন, তাঁদের প্রাণপ্রিয় শ্রীগোবিন্দ রথে আরোহণ করে অক্রূরের সঙ্গে প্রস্থান করছেন। তাঁরাও কিয়দ্দূর পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করে রথের দিকে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। নিজ রথের পশ্চাতে অনুগামিনী দুঃখসন্তপ্তা ব্রজগোপীগণকে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-করুণার্দ্র হৃদয় বিগলিত হল। তিনি তখন তাঁদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য প্রেমভরে দূতের মাধ্যমে বললেন—**'সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ'** (ভাগবত ১০।৩৯।২৫)। ভগবান বললেন, **'আয়াস্য'** অর্থাৎ আমি 'শীঘ্রই ফিরে আসব' ব্যথাবেদনার এমন অমৃতময় পরম শান্তির প্রলেপ আর নেই। অতএব একেই সম্বল করে, একমাত্র একেই পাথেয় করে শ্রীগোবিন্দের প্রত্যাবর্তনের আশায় গোপীগণ দিন-যামিনী অতিবাহিত করতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের অক্রূরসহ মথুরা গমন
(দশম অধ্যায়—৪০শ অধ্যায়)

পূর্বকথা—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও অক্রূরসহ ব্রজ ছেড়ে মথুরার পথে যাত্রা করলেন। বিদায়লগ্নে ব্রজগোপীগণের প্রিয়জনবিরহের বেদনার গুরুত্ব অক্রূর অবশ্যই উপলব্ধি করেছেন আর তাঁরও যে করুণার উদ্রেক হয়নি তা নয়, কিন্তু নিজ গাম্ভীর্যগুণেই তিনি সেটি অপ্রকাশ রেখেছেন।

যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন—মধ্যাহ্নকালে তাঁরা রথযোগে কালিন্দীকূলে (যমুনা তটে) উপস্থিত হলেন। ভক্ত অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের অনুমতি নিয়ে যমুনায় স্নান করতে গেলেন। প্রথমবার জলে নিমগ্ন হয়ে ব্রহ্মমন্ত্র জপ করতেই শ্রীকৃষ্ণ বলরামের যুগলমূর্তি জলমধ্যেই তাঁর নয়ন সম্মুখে উদিত হল। অক্রূর

তাড়াতাড়ি জলের ওপর উঠে দেখেন দুই ভ্রাতা আগের মতোই রথে সমাসীন আছেন। নিজ মতিভ্রম হয়েছে ভেবে অক্রূর আবার জলে ডুব দিলেন। কিন্তু এবার আর যুগল ভাইকে জলের মধ্যে দেখতে পেলেন না। তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে দেখলেন এক অলৌকিক দৃশ্য, শ্রীবলদেবাংশ ভগবান অনন্তদেবের বিরাট বৈভব মূর্তি। তিনি সর্পকুলের অধীশ্বর এবং সনক প্রভৃতি সিদ্ধগণ, বাসুকি প্রভৃতি সর্পগণ ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি অসুরগণ কর্তৃক স্তুত হচ্ছেন। সকলেই অশেষ শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে শেষনাগ ভগবান অনন্তর স্তব-স্তুতি করে চলেছেন। অক্রূর পুনর্বার জলে নিমগ্ন হলে অনন্তদেবের ক্রোড়দেশে পীতবসনধারী চতুর্ভুজ প্রশান্তমূর্তি দর্শন করলেন। এই পুরুষবর আর কেউ নন, ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণাংশ বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণ। অক্রূরের মহাসৌভাগ্য যে তিনি যমুনার জলমধ্যে তাঁর-অভীষ্ট বৈকুণ্ঠলোক ও বৈকুণ্ঠপতির অলোকসামান্য রূপ দর্শন করলেন। অক্রূর আরো দেখলেন, সেই সর্বসৌন্দর্য-নিকেতন শিববিরিঞ্চি-বন্দিতচরণ শ্রীবিষ্ণুর পরিকরগণকে। নির্মলচিত্ত সুনন্দ, নন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ, সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ ও ব্রহ্ম-রুদ্রাদি নিত্য সেবাপরায়ণ দেবগণ সকলেই তাঁকে ঘিরে স্তব করছেন। প্রজাপতি নামে প্রসিদ্ধ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও দক্ষ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও ভক্তিভরে তাঁর স্তুতি করছেন। এঁরা ছাড়াও প্রহ্লাদ, নারদ, বসু প্রমুখ মহাগুণশালী শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ দীন উপাসকের অভিমান নিয়ে ভক্তিবিনম্রভাবে সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের স্তুতি করছেন। তাঁদের মধ্যে নিত্যপার্ষদগণ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং তার চারটি কোণ—এই আটদিকেই অবস্থিত ছিলেন। সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ পশ্চিমদিকে, ব্রহ্মা-রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ দক্ষিণ দিকে, মরীচি, অত্রি আদি প্রজাপতিগণ বামে, ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ সম্মুখে এবং দেবর্ষি নারদ সম্মুখোর্ধ্বে অবস্থিত ছিলেন। এঁরা সকলেই শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ।

যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণশক্তিদের দর্শন—অক্রূর জলমধ্যে আরো দেখলেন

বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীবিষ্ণুর শক্তিসমূহও তাঁর সেবায় নিত্য নিযুক্ত। শ্রীভগবান অনন্ত ও বিচিত্র শক্তির আশ্রয় আর তাঁর সেই শক্তিসমূহও অচিন্ত্য ও অনির্বচনীয়। পরমহংসবর্য শ্রীশুকদেব এই শক্তিনিচয় সম্বন্ধে বলছেন—

শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া।
বিদ্যয়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্॥

(ভাগবত ১০।৩৯।৫৫)

অর্থাৎ শ্রী, পুষ্টি, বাণী, কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি, ইলা, উর্জা, বিদ্যা, অবিদ্যা, শক্তি (বা ইচ্ছা) ও মায়া আদি দ্বাদশটি শক্তিবর্গ কর্তৃক সেই পরমপুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুপরিসেবিত।

শ্রীভগবানের ত্রিবিধা শক্তি হল **অন্তরঙ্গা**-চিৎশক্তি, **তটস্থা**-জীবশক্তি ও **বহিরঙ্গা**-মায়াশক্তি। অন্তরঙ্গা শক্তি আবার ত্রিবিধ—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎরূপা। শ্রীভগবানের ষড়বিধ ঐশ্বর্য তাঁরই স্বরূপভূত শক্তি। এখানে উল্লিখিত দ্বাদশ শক্তির মধ্যেই ষড়বিধ ঐশ্বর্য বিরাজিত। তাঁর শ্রীশক্তিতে **ঐশ্বর্যের**, পুষ্টিতে **বীর্যের**, বাক্যে **জ্ঞানের**, কান্তিতে **শোভার**, কীর্তিতে **যশের** এবং তুষ্টিতে **বৈরাগ্যের** প্রকাশ। এছাড়াও ইলা হল ভূশক্তি অর্থাৎ ইনি **সন্ধিনী** নাম্নী শক্তি, পৃথিবী এঁর বিভূতি। উর্জা হল ভগবান বিষ্ণুর **অন্তরঙ্গা** লীলাশক্তি। জীব যে শ্রীভগবানের নিত্যদাস এই স্বরূপজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের স্বরূপভূত জ্ঞানসমুদ্রেরই বিন্দুমাত্র শক্তি। বিদ্যা হল জীবের **মুক্তির হেতু** আর অবিদ্যা হল জীবের **বন্ধনের** বা সংসারগতির **হেতু**। তটস্থা-শক্তিসম্পন্ন জীব যতদিন **বহিরঙ্গা মায়ার অধীন** হয়ে তার বশীভূত থাকে ততদিন শ্রীভগবানের **অন্তরঙ্গা** শক্তির সন্ধান পায় না। এখানে 'শক্তি' নামে তাঁর মূর্তি হল **অন্তরঙ্গা** শক্তি যার তিন ভাগ—হ্লাদিনী, সন্ধিনী আর সংবিত শক্তি ; আর মায়া হল তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি, তিনিও মূর্তিমতীরূপে প্রকাশিতা। ভগবানের এই বহিরঙ্গা শক্তি মায়া শ্রীভগবানের সেবা করলেও তাঁর অঙ্গস্পর্শ করতে পারে না, দূরেই বিদ্যমান থাকে।

ভাগবতের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ব্রহ্মা-নারদ সংবাদে' সৃষ্টির ক্রম বর্ণনায় ব্রহ্মা বলেছেন—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।

বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥ (ভাগবত ২।৫।১৩)

শ্রীভগবানের দৃষ্টিপথে থাকতে যে মায়া লজ্জা বোধ করে, সেই মায়ায় মুগ্ধ হয়ে জীব 'আমি' ও 'আমার' ব্যবহার করে থাকে। শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তিবৈভবের অন্ত পাওয়া যায় না। অক্রূর ভাগ্যবান তাই শ্রীভগবানের কৃপালাভে ধন্য হয়ে তিনি যমুনার জলে বৈকুণ্ঠমণ্ডলী মধ্যস্থ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এবং তাঁর পার্ষদগণের ও বিচিত্র শক্তিরূপ পরিজনবর্গের পবিত্র পরিবেশ দর্শন করেন। যমুনার ঘাটের এই স্থানটি 'অক্রূরতীর্থ' বলে অদ্যাপি পরম পবিত্রতায় চিহ্নিত।

অক্রূর দাসভক্ত। শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্যময় পরিবেশের অপরিহার্য প্রভাবে তাঁর ঐশ্বর্যভাব স্তিমিত হয়ে গেছে আর তিনি মাধুর্যভাবে মুগ্ধ। কিন্তু যখন তিনি ব্রজ ছেড়ে মথুরার দিকে চললেন তখন তাঁর সেই সাধনোচিত ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভক্তিভাবের মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলমধ্যে অক্রূরের নয়নসম্মুখে নিজ ঐশ্বর্যমণ্ডিত বৈভবের চিত্র উদঘাটিত করেন। অক্রূর বুঝলেন 'শ্রীকৃষ্ণই' তাঁর আরাধ্য বিষ্ণু আর বিষ্ণুই 'শ্রীকৃষ্ণ'।

গিরা গদগদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাত্বতঃ।

প্রণম্য মূর্দ্ধনাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ॥ (ভাগবত ১০।৩৯।৫৭)

এই অলৌকিক দর্শনে এবং অত্যাশ্চর্য অনুভূতিতে অক্রূর মুগ্ধ পুলকিত হয়ে গেলেন, তাঁর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ ও লোচনযুগল প্রেমার্দ্র হয়ে গেল। সত্ত্বভাবের উদ্রেকে পরম ভক্তিভরে অবনত মস্তকে তাঁর আরাধ্য বিষ্ণুকে বিনীত প্রণাম জানালেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে গদগদ বচনে ধীরে ধীরে সর্বকারণ-কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন।

অক্রূর স্তুতি (১০ স্কন্ধ ৪০ অধ্যায় শ্লোক ১—৩০)

ভগবানের এই অলৌকিক দর্শনে অক্রূর উপলব্ধি করলেন যে, মধুর বৈভবমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ ও অপরিসীম ঐশ্বর্যমণ্ডিত তাঁর অভীষ্টদেব শ্রীবিষ্ণু এক এবং অভিন্ন। এই অভিনব ভাবের উপলব্ধিতে তিনি বিস্ময়ে-বিমুগ্ধ চিত্তে এবং ভাব গদগদ বচনে ত্রিশটি শ্লোকে শ্রীভগবানের স্তুতি করেছেন। এই স্তুতি পাঁচটি প্রকরণে স্তুত।

ভগবান সর্বকারণের কারণ	শ্লোক ১—৩
সাধনার ধারা	শ্লোক ৪—১০
শ্রীভগবানের বিরাটরূপের স্তুতি	শ্লোক ১১—১৫
শ্রীভগবানের অবতারলীলা	শ্লোক ১৬—২২
শরণাগতি	শ্লোক ২৩—৩০

ভগবান সর্বকারণের কারণ (১—৩)

নতোঽস্ম্যহং ত্বাখিলহেতুহেতুং
নারায়ণং পূরুষমাদ্যমব্যয়ম্।
যন্নাভিজাতাদরবিন্দকোশাদ্
ব্রহ্মাবিরাসীদ্ যত এষ লোকঃ॥ ১

ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদি-
র্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি।
সর্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্বে
যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ॥ ২

নৈতে স্বরূপং বিদুরাত্মনস্তে
অজাদয়োঽনাত্মতয়া গৃহীতাঃ।
অজোঽনুবদ্ধঃ সঃ গুণৈরজায়া
গুণাৎপরং বেদ ন তে স্বরূপম্॥ ৩

সরলার্থ—অক্রূর বললেন, প্রভু! আপনি প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্ত কারণেরও পরম কারণ। আপনিই অবিনাশী বিকারহীন আদিপুরুষ নারায়ণ। আপনার নাভি

থেকে উৎপন্ন পদ্মকোষেই ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছিলেন, যে ব্রহ্মা থেকেই এই চরাচর জগতের উদ্ভব। আমি আপনার চরণে প্রণতি জানাচ্ছি॥ ১ ॥ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহংকার, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মন, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় এবং তাদের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাগণ—যারা এই জগতের হেতু-স্বরূপ। এরা সকলেই আপনার শ্রীমূর্তি হতে উৎপন্ন॥ ২ ॥ প্রকৃতি এবং প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থই 'ইদংবৃত্তি' দ্বারা গৃহীত হয়, এইজন্য সেগুলি সবই অনাত্মা। অনাত্মা হওয়ার কারণে সেগুলি সবই জড়-পদার্থ এবং সেইজন্য তারা আপনার স্বরূপ জানতেও অসমর্থ—কারণ আপনি স্বয়ং আত্মারও আত্মা। ব্রহ্মা অবশ্য স্বরূপত আপনারই প্রকাশ, কিন্তু তিনিও প্রকৃতির গুণ দ্বারা যুক্ত, এইজন্য তিনিও প্রকৃতির এবং তার গুণসমূহের অতীত আপনার স্বরূপ জানেন না॥ ৩ ॥

মূলভাব—অক্রূর প্রথম তিনটি শ্লোকে শ্রীভগবানের অনাদিত্ব, দুর্জ্ঞেয়ত্ব এবং সর্বকারণ-কারণত্ব প্রতিপাদন করেছেন। অক্রূর বলছেন হে প্রভু ! আপনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বকারণের কারণ। আপনিই বিশ্বচরাচরের মূল স্রষ্টা, আপনিই আদি দেবতা। আপনার শক্তি ও স্বরূপ অনাদি। আপনার করুণাতেই পিতামহ ব্রহ্মা স্থূল জগৎ সৃষ্টির সামর্থ্য লাভ করে সৃষ্টিকর্তা বলে পরিচিত। পিতামহ ব্রহ্মা আপনার নাভি-পদ্ম হতে জাত এবং আপনিই সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করে পিতামহ ব্রহ্মাকে সেই শক্তির অধীশ্বর করেছেন। তাই সর্বশাস্ত্রে বলে আপনি—**'অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্'** (ব্রহ্মসংহিতা)।

শ্রীভগবানই জগতের মূলকারণ জানিয়ে অক্রূর বলছেন **পঞ্চভূত, মহত্তত্ত্ব ও অহংকারেরও** আপনি মূল কারণ। ভগবানের 'আমি বহু হব' এই বহুভাবে অভিব্যক্তির সংকল্পই মহত্তত্ত্বের অভিব্যক্তি এবং তা হতে 'আমি হব'—এই আমিত্বেই অহংকার-তত্ত্ব প্রকাশ পায়। আর এই অহং তত্ত্বেরই প্রকৃতি-বিকৃতি হল **পঞ্চতন্মাত্র**, যেমন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধ। পরে পঞ্চ **মহাভূত**, ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম, **পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন** আদি বৃত্তি প্রকাশ পায়।

অক্রূর তাঁর স্তবে ইহা প্রতিপাদন করে বললেন যে 'যে হেতবস্তে

জগতোঽঙ্গভূতাঃ’ হে ভগবন্ ! প্রকৃতি, জীব, কাল, কর্ম হেতুস্বরূপ সবই আপনার অঙ্গ থেকে জাত। কিন্তু সর্বকারণ-কারণ শ্রীভগবান গুণাতীত। অন্যদিকে মায়া বা প্রকৃতি গুণময়ী এবং প্রত্যক্ষগোচর কিন্তু জড়স্বভাব তাই প্রকৃতি শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির বৃত্তান্ত অবগত নয়। এমনকী স্বয়ং ব্রহ্মা, যিনি শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁরই নাভিকমল থেকে উদ্ভূত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে সমর্থ, তিনিও তাঁর তত্ত্ব জানেন না। ব্রহ্মা হলেন আদি গুরু, তিনি কল্পকালে জন্মরহিত, তাই তাঁকে বলা হয় অজ, কিন্তু তিনিও মায়ার গুণের আবরণে আচ্ছন্ন থাকায় গুণাতীত শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্ব জানতে পারেন না। কারণ হল শ্রীভগবান মায়িক নন, তিনি অপ্রাকৃত এবং সচ্চিদানন্দ। কেবল তিনিই নন, তাঁর অলৌকিক ধামও মায়ার অতীত। এই ব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবানের **পাদবিভূতি** বা মায়াবিভূতি কিন্তু তাঁর নিজ ধাম **ত্রিপাদ-বিভূতি** বা স্বরূপ-বিভূতি যা প্রাকৃত গুণত্রয় বিবর্জিত।

শ্রীভগবানের তটস্থাশক্তি হল জীব। যদি জীব মায়াপাশ অতিক্রম করতে সমর্থ হয় তবে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না অবিদ্যার আবরণ দূর হয়, ততদিন তার পক্ষে স্বরূপানুভূতি জানা সম্ভবপর নয়। জীবের অণুচৈতন্যে চৈতন্যের উপলব্ধি আছে। তার ফলে জীব পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা **ইন্দ্রিয়ার্থ-বিষয়** বা জ্ঞানবলে নিজ **স্বরূপ অবগত** হওয়ার বা ভগবৎ কৃপায় পরমার্থ-জানার সামর্থ্য সকলেরই আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীভগবানকে সে তখনই উপলব্ধি করতে পারে যখন জ্ঞানের অন্তরায় স্বরূপ মায়াকে সম্পূর্ণরূপে সাধনার দ্বারা অতিক্রম করে সে সাধনার পথে সিদ্ধিলাভ করে। এই আলোচনার সূত্র ধরেই পরবর্তী শ্লোকগুলিতে অক্রূর ভগবদ্ উপলব্ধির নানা সাধন তত্ত্বের বর্ণনা করেছেন।

সাধনার ধারা (৪—১০)

ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্।
সাধ্যাত্মং সাধিভূতং চ সাধিদৈবং চ সাধবঃ॥ ৪
ত্রয্যা চ বিদ্যয়া কেচিৎ ত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ।

যজন্তে বিততৈর্যজ্ঞৈর্নানারূপামরাখ্যয়া॥ ৫
একে ত্বাখিলকর্মাণি সংন্যস্যোপশমং গতাঃ।
জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্॥ ৬
অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্॥ ৭
ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণম্।
বহ্বাচার্যবিভেদেন ভগবন্তমুপাসতে॥ ৮
সর্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥ ৯
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥ ১০

সরলার্থ—সাধু-যোগিগণ সদা আপনাকেই নিজেদের অন্তঃকরণে স্থিত 'অন্তর্যামী'রূপে, সমস্ত ভূত-ভৌতিক পদার্থে ব্যাপ্ত 'পরমাত্মা'-রূপে এবং সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবমণ্ডলে স্থিত 'ইষ্টদেবতা'রূপে এবং এসবের সাক্ষী 'মহাপুরুষ' এবং 'নিয়ন্তা ঈশ্বর'রূপে আপনাকে দর্শন করে, আপনারই উপাসনা করে থাকেন॥ ৪ ॥ অনেক কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণ কর্মমার্গোপদেশক ত্রয়ীবিদ্যা বা বেদের কর্মমূলক উপদেশ অনুসারে বিস্তৃত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনাকেই ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন দেববাচক নামে তথা বজ্রহস্ত, সপ্তার্চি প্রভৃতি অনেক রূপে অভিহিত করে—আপনারই আরাধনা করেন॥ ৫॥ আবার অনেক জ্ঞানমার্গানুসারী সাধক সমস্ত কর্ম সম্যক্ রূপে আপনাতেই ন্যস্ত অর্থাৎ ত্যাগ করে (সর্বকর্মসন্ন্যাসের দ্বারা) শান্ত-স্বরূপে স্থিত হন। এইভাবে সেই জ্ঞানিগণ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ আপনারই উপাসনা করেন॥ ৬ ॥ বহু শুদ্ধচিত্ত তথা সংস্কারসম্পন্ন বৈষ্ণবগণ আপনারই উপদিষ্ট পাঞ্চরাত্রাদি বিধি অনুসারে ভজননিষ্ঠায় তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়ে (ভাবনায় আপনার মধ্যে নিজেদের লীন করে দিয়ে) আপনার চতুর্ব্যূহ প্রভৃতি অনেক বা আবার কখনো নারায়ণরূপে এক স্বরূপের পূজা করে থাকেন॥ ৭ ॥ ভগবন্! আবার অন্যান্য শৈব সাধকগণ শিবপ্রোক্ত সাধনপদ্ধতি—যার মধ্যে আচার্যভেদে বহু

অবান্তরভেদ বর্তমান—সেগুলির মধ্যে যার যেমন রুচি তদনুযায়ী পথ অবলম্বন করে শিবস্বরূপ আপনারই উপাসনা করেন॥ ৮ ॥ হে প্রভু ! যে সকল ব্যক্তি অন্য দেবতাদের ভক্তি করেন এবং তাঁদের আপনার থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন, তারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে আপনারই আরাধনা করেন, কারণ সব দেবতারূপে আপনিই আছেন এবং সর্বেশ্বরও আপনি॥ ৯ ॥ প্রভু ! যেমন পর্বত থেকে উৎপন্ন নদীসমূহ বিভিন্ন পথে প্রবাহিত এবং বর্ষার জলে পুষ্টি লাভ করে বহুস্রোতা হয়ে নানা শাখায় প্রবাহিত হয় কিন্তু শেষপর্যন্ত সকল শাখাই ঐ এক সমুদ্রেই গিয়ে মিলিত হয়, সেইরকম সব উপাসনামার্গই শেষ পর্যন্ত আপনাতেই গিয়ে স্থিতি লাভ করে॥ ১০ ॥

মূলভাব—জীবের পক্ষ থেকে ভগবৎ ভজনাই সাধনা আর ভগবানের পক্ষ থেকে তার স্বীকৃতিই তাঁর করুণা। তাই অক্রূর স্তব প্রসঙ্গে বলেছেন যে, শ্রীভগবানের তত্ত্ব ব্রহ্মাদির পক্ষে দুর্জ্ঞেয় হলেও এবং তিনি জীবের সাক্ষাৎ অগোচর হয়েও কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি যে কোনো একটি সাধনমার্গ অনুগামীদের উপাসনা দ্বারা উপলব্ধিগম্য হয়ে থাকেন। সাধকের শিক্ষা ও রুচিভেদে সাধনার প্রচলিত বিভিন্ন ধারা যেমন কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, বৈষ্ণবমার্গ, শৈবমার্গ প্রভৃতি নানা পথ ও নানা মতের সন্ধান-শাস্ত্রেই নির্দেশিত আছে এবং এদেরই কোনও একটি মার্গের উপাসনাতেই শ্রীভগবানের উপলব্ধি হতে পারে।

যোগী—যোগমার্গের সাধকগণ অষ্টাঙ্গ যোগ অবলম্বনে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে ঈশ্বর-প্রণিধান করে থাকেন। যোগী সাধক কায়িক, বাচিক ও মানসিক সর্ববিধ সংযম একাগ্রচিত্তে অভ্যাস করে শেষপর্যন্ত ঈশ্বরে চিত্তবৃত্তি সমাহিত করে ঈশ্বর উপলব্ধি করেন। স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মাকে বলে যোগের প্রথম উপদেষ্টা। তিনি যোগযুক্ত চিত্তে তপস্যা নিরত হয়ে দীর্ঘকাল সমাধিস্থ থাকা অবস্থাতে শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই তাঁর স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।

কর্মযোগী— যাঁরা কর্মযোগী বা কর্মমার্গের উপাসক, তাঁরা বেদবর্ণিত যজ্ঞাদি কর্মকেই ধর্ম বলে থাকেন। তাঁদের এই যজ্ঞাদি শুভকর্মে ইহলোকে ও পারলৌকিক ইষ্টসিদ্ধি হয়। যথা সংকল্পিত স্বর্গাদি বা অন্যান্য ফললাভের জন্য বেদে অগ্নিষ্টোম দশপূর্ণমাস প্রভৃতি বিবিধ যাগ এবং অগ্নিহোত্রাদি

হোম— এইরূপ কত ক্রিয়াকলাপ বিধান দৃষ্ট হয়। আবার বেদোক্ত কর্মবিধি অনুসারে দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগকে বলা হয় **'যাগ'**—**'দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগো যাগঃ'**। তাঁরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য, পূষা, সোম প্রভৃতি নানা দেবতার উদ্দেশে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন বটে কিন্তু যাগ বা যজ্ঞের সময় চিরন্তন এই উপলব্ধি করতে হবে যে তাঁদের এই উপাসনায় তাঁরা সর্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবানেরই উপাসনা করছেন। দেবগণ নানা নামে অভিহিত হলেও তাঁরা একই পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। শ্রুতি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন—**'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিঃ যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ'** (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬)। ইন্দ্রাদি দেবতাবিষয়েও পরমেশ্বরই মূলতত্ত্ব আর যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞবিধিতে সেই তত্ত্বস্বরূপ শ্রীভগবানেরই উপাসনা করেন।

জ্ঞানমার্গী—জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ কর্মফলে বিতৃষ্ণ হয়ে কর্মসন্ন্যাস করে থাকেন। যজ্ঞাদি কাম্য কর্মের লভ্য স্বর্গাদি ফল যে অক্ষয় এবং স্থায়ী নয় এটা তাঁরা জানেন এবং জানেন বলেই যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানে তাঁদের আগ্রহ নেই। কারণ **'তে ত্বং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'** (গীতা ৯।২১) অর্থাৎ স্বর্গলাভকারীগণ পুণ্যক্ষয় হয়ে গেলেই আবার মর্ত্যবাসী হন।

জ্ঞানের সাধারণতঃ তিনটি অবস্থা। (১) জড়বস্তু-বিষয়ক যে জ্ঞান তা **'ব্যবহারিক জ্ঞান'**। (২) জ্ঞানযোগ সাধনায় সিদ্ধিদশায় গুণাতীত নির্বিশেষ যে ভগবৎজ্ঞান তাকে বলে **'ব্রহ্মজ্ঞান'**। আর (৩) ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন পরিপূর্ণ সবিশেষ শ্রীভগবদ্-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাই আনন্দঘনমূর্তি **'শ্রীভগবানের উপলব্ধির জ্ঞান'**। এরমধ্যে দ্বিতীয় প্রকার সাধন, যেমন জ্ঞানমার্গের সাধকগণ জ্ঞানযোগে শ্রীভগবানেরই 'নিস্কলং, নিষ্ক্রিয়ং, শান্তং, নিরঞ্জনং' স্বরূপের উপাসনা করে থাকেন আর তৃতীয় প্রকার সাধন হল ভক্তিমার্গের সাধন।

ভক্তিমার্গী—অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতনে তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্॥

(ভাগবত ১০।৪০।৭)

আবার অন্য যে সকল ভক্তিমার্গের উপাসক, বৈষ্ণব বা শৈব ধর্মে দীক্ষিত

হয়ে নিজ নিজ সংস্কারের উপযোগী সাধনা দ্বারা নানা দেবতা ভেদে যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপাসনা করেন তাঁরাও কোনো না কোনো প্রকারে শ্রীভগবানেরই অর্চনা করেন।

বৈষ্ণব— বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানেরই কথিত পঞ্চরাত্রাদি বিধিমতে নারায়ণের চতুর্বিধ ব্যূহমূর্তি— বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ আদি ভেদে শ্রীভগবানেরই উপাসনা করেন। তাঁদের কাছে কিন্তু শ্রীভগবানই হলেন মূল উপাস্য দেবতা।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

(ভাগবত ৪।৩১।১৪)

অর্থাৎ বৃক্ষের মূলে জলসেচন করলে যেমন তার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্তি লাভে পুষ্ট হয়, প্রাণের উদ্দেশ্যে আহার্যের দ্বারা যেমন সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, তেমনি শ্রীভগবান অচ্যুতের আরাধনাতেই সকলের আরাধনা সাধিত হয়।

শৈব—শৈব সাধকগণের মধ্যেও শৈব ও পাশুপত মার্গের ভেদক্রমে ও নানা মূর্তিতে যে উপাসনার রীতি দেখা যায় তাতেও প্রত্যুত শ্রীভগবানেরই উপাসনা করা হয়। স্বয়ং উমাপতি শিব পাশুপত জ্ঞানমার্গের উপদেশ দিয়েছেন। অক্রূর স্তব প্রসঙ্গে ইহাই উল্লেখ করেছেন।

আবার যাঁরা অন্য অন্য ক্ষুদ্র দেবতার অর্চনা করেন কিন্তু তাঁদের মনে এই স্থান পায় না যে এইসব দেবতাদের মধ্যেও সর্বেশ্বর শ্রীভগবানই অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁদেরও উপাসনা বিফল যায় না। কারণ তাঁদের সেই উপাসনাও, শ্রীভগবানের উপাসনাতেই পর্যবসিত হয়। গীতাতেও শ্রীভগবান এই প্রকার ভক্ত সম্বন্ধে বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

(গীতা ৯।২৩-২৪)

হে অর্জুন ! আর যাঁরা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে অন্য দেবতার ভজনা করেন, তাঁদেরও আমার আরাধনা করা হয় সত্য, কিন্তু তাঁদের সে আরাধনা মোক্ষবিধি বিবর্জিত। আমি সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও কর্মফলদাতা কিন্তু আমাকে যথার্থরূপে সর্বদেবতার মধ্যে না জেনে জাগতিক আকাঙ্ক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে অন্যান্য দেবতার ভজনকারীগণ সংসারে পুনঃ পুনঃ আগমন করে।

অক্রূর স্তবচ্ছলে বলছেন—

যদাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ প্রর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥

(ভাগবত ১০।৪০।১০)

শ্রীভগবান সর্বদেবময়। সকল দেবতার নানা মত ও নানা পথ থাকলেও এসকল উপাসনার অর্ঘ্য তাঁতেই পর্যবসিত হয়। পর্বত হতে নদীসমূহ উৎপন্ন হয়ে বৃষ্টির জলধারায় পুষ্টি লাভে বহুস্রোতা হয়ে নানা শাখায় প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একই সমুদ্রগর্ভে মিলিয়ে যায়, সেইরকম সকল উপাসনা, সকল দেবতার অর্চনাই শ্রীভগবানে পর্যবসিত হয়।

সাংখ্য, সনাতন অষ্টাঙ্গযোগ এবং বেদসমূহ— এরা সকলেই এবং মন্ত্রদ্রষ্টা সকল ঋষিগণও সর্বস্বরূপ পুরাণপুরুষ নারায়ণের কথাই বলেছেন কারণ তিনি সর্বপ্রবর্তক ও সর্বান্তর্যামী।

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ॥
নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ॥

(ভাগবত ২।৫।১৫-১৬)

অর্থাৎ বেদসমূহ নারায়ণের উদ্দেশ্যে পর্যবসিত, দেবগণ তাঁর অঙ্গ হতে জাত, স্বর্গাদি লোকসমূহ শ্রীনারায়ণেরই অংশ, সমস্ত যজ্ঞ নারায়ণের

ফলশ্রুতি। আবার অষ্টাঙ্গযোগ —উহাও নারায়ণেই পর্যবসিত, নারায়ণই তপশ্চর্যার তাৎপর্য, নারায়ণই জ্ঞানের পর্যাবসনা আর শ্রীনারায়ণই পরমগতি।

শ্রীভগবানের বিরাটরূপের স্তুতি (শ্লোক ১১—১৫)

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভবতঃ প্রকৃতের্গুণাঃ।
তেষু হি প্রাকৃতাঃ প্রোতা আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ॥ ১১
তুভ্যং নমস্তে ত্ববিষক্তদৃষ্টয়ে
সর্বাত্মনে সর্বধিয়াং চ সাক্ষিণে।
গুণপ্রবাহোঽয়মবিদ্যয়া কৃতঃ
প্রবর্ততে দেবনৃতির্যগাত্মসু॥ ১২
অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং
সূর্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ।
দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবোঽর্ণবাঃ
কুক্ষির্মরুৎ প্রাণবলঞ্চ কল্পিতম্॥ ১৩
রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ঃ শিরোরুহা
মেঘাঃ পরস্যাস্থি-নখানি তেঽদ্রয়ঃ।
নিমেষণং রাত্র্যহনী প্রজাপতি-
র্মেঢ্রস্তু বৃষ্টিস্তব বীর্যমিষ্যতে॥ ১৪
ত্বয্যব্যয়াত্মন্! পুরুষে প্রকল্পিতা
লোকাঃ সপালা বহুজীবসঙ্কুলাঃ।
যথা জলে সঞ্জিহতে জলৌকসো-
ঽপ্যুডুম্বরে বা মশকা মনোময়ে॥ ১৫

সরলার্থ—আপনার প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত চরাচর জীবই প্রাকৃত এবং বস্ত্র যেমন সুতাসমূহে ওতপ্রোতঃ থাকে, সেইরকম এরা সবাই প্রকৃতির এই গুণসমূহে ওতপ্রোতঃ রয়েছে॥ ১১ ॥ কিন্তু আপনি সর্ব-স্বরূপ হয়েও কোনো কিছুতেই লিপ্ত নন। আপনার দৃষ্টি নির্লিপ্ত কারণ আপনি সমস্ত বৃত্তির সাক্ষী। গুণপ্রবাহ থেকে

উৎপন্ন এই সৃষ্টি অজ্ঞানমূলক এবং তা দেবতা, মানুষ এবং পশুপাখি প্রভৃতি প্রজাতিসমূহে পরিব্যাপ্ত (তাদের মধ্যে এবং তাদের নিয়ে প্রবর্তিত) হয়ে আছে। কিন্তু আপনি তা থেকে সর্বথা ভিন্ন, তার দ্বারা অস্পৃষ্ট। সেই সর্বাত্মা হয়েও সর্বথা বিনির্মুক্ত উদাসীন সাক্ষীস্বরূপ আপনাকে নমস্কার॥ ১২ ॥ অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী চরণ, সূর্য এবং চন্দ্র নেত্রস্বরূপ। আকাশ আপনার নাভি, দিকসমূহ কান, স্বর্গ আপনার মস্তক। দেবেন্দ্রগণ আপনার বাহু, সমুদ্রগুলি আপনার উদরস্বরূপ এবং বায়ু আপনার প্রাণশক্তিরূপে কল্পিত হয়েছে॥ ১৩ ॥ আপনি পরমপুরুষ। ব্রহ্ম এবং ওষধিসমূহ আপনার রোমাবলি, মেঘেরা কেশ, পর্বতেরা অস্থি এবং নখস্বরূপ। দিন এবং রাত আপনার চোখের উন্মেষ-নিমেষ। প্রজাপতি আপনার জননেন্দ্রিয় এবং বৃষ্টি বীর্যরূপে অভিহিত হয়েছে॥ ১৪ ॥ হে অবিকারী অবিনাশী পুরুষ ! জলের মধ্যে যেমন অজস্র জলচর জীব অথবা যজ্ঞডুমুরের ফলের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রকীট বিচরণ করে, তেমনই উপাসনার জন্য স্বীকৃত আপনার মনোময় বিরাট পুরুষ-শরীরে লোকপালগণসহ অসংখ্য জীবসংকুল অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডলোকে সঞ্চরণশীল রয়েছে, এইভাবে নিখিল প্রপঞ্চের আধার-রূপে আপনাকে দেখা হলেও পরমার্থত আপনার স্বরূপে এজন্য কোনো বিকারের প্রসক্তি ঘটে না, কারণ তাতে এসবই আরোপিত মাত্র॥ ১৫ ॥

মূলভাব—অক্রূর তাঁর স্তুতিতে বলছেন—**'সত্ত্বং রজস্তমঃ ইতি ভবতঃ প্রকৃতের্গুণাঃ'** (ভাগবত ১০।৪০।১১) অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ এবং তমঃ এই গুণরাজি শ্রীভগবানেরই শক্তিরূপা **'প্রকৃতির'** গুণাবলী এবং এই গুণাবলীর মধ্যে যাবৎ স্থাবর, জঙ্গম এমনকী ব্রহ্ম হতে কীটাণু পর্যন্ত বিশ্বের যাবতীয় প্রাণ ওতপ্রোতঃ ভাবে প্রোথিত থাকে। কাজেই ব্রহ্মাদি নানা দেবতাদের উদ্দেশে সাধকের যে অর্চনা তা প্রথম দশায় শ্রীভগবানের শক্তিরূপা প্রকৃতিতেই গিয়ে আশ্রয় লাভ করে। আর যেহেতু শ্রীভগবানের সঙ্গে প্রপঞ্চ প্রকৃতির সম্বন্ধ রয়েছে, তাই যখন প্রাকৃত উপাধির লয় হয় তখন সব কিছুই গিয়ে শ্রীভগবানে পর্যবসিত হয়। ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানেরই শক্তি 'প্রকৃতির' গুণসমূহে

ওতপ্রোতঃভাবে বিজড়িত, কাজেই তাঁরা সর্বদেবময় শ্রীভগবান থেকে পৃথক নয়।

কিন্তু ভক্ত অক্রূর জানেন যে শ্রীভগবান মায়িক বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, আর দেবতাদের মধ্যে তো অবিদ্যাকৃত মায়িক গুণপ্রবাহ নিত্য বিদ্যমান, তাহলে তাঁরা কীভাবেই বা নিজ নিজ উপাসকবৃন্দকে উদ্ধার করবেন ও প্রপঞ্চাতীত পরমপুরুষার্থ প্রদান করবেন ? অক্রূর তাই প্রণত হয়ে স্তুতি করে বলছেন—**'তুভ্যং নমস্তে ত্ববিষক্তদৃষ্টয়ে......'** (ভাগবত ১০।৪০।১২) **অর্থাৎ** 'ভগবান আপনি সর্বাত্মভূত তাই সর্ববিধ পূজা-অর্চনাই অন্তে আপনাতে পর্যবসিত হয়, কারণ আপনিই সকলের পরমতম আশ্রয়'। বিশেষত যাঁরা একান্ত ভক্তিভরে তাঁকে ভজনা করে, সর্ববুদ্ধির অধিষ্ঠাতারূপে ভক্তাধীন শ্রীভগবান তাঁদের সেই ভক্তিভাব অবগত হন এবং তাঁদের প্রতি আর পূর্বের ন্যায় উদাসীন থাকতে পারেন না এবং তাঁর করুণা আপনা হতেই উৎসারিত হয়।

গীতায়ও তাই শ্রীভগবান বলেছেন—

সমোঽহং সর্বভুতেষু না মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।। (গীতা ৯।২৯)

অর্থাৎ আমি সর্বভূতে সম, কেহ আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিভাবে আমার ভজনা করে, আমি আমাতে তাঁদের এবং তাঁরা আমার প্রত্যক্ষ।

অক্রূর শ্রীভগবানের সর্বময়ত্ব ও সর্বময়েশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য আবার বলছেন—**'অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং সূর্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ'** (ভাগবত ১০।৪০।১৩)। অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজাই শ্রীভগবানের কাছে পর্যবসিত তা নয়, এই বিশ্বপ্রপঞ্চে যা কিছু আছে— অগ্নি, সূর্য, দিক্, কাল, আকাশ, পৃথিবী, প্রজাপতি, পর্জন্য, বৃক্ষ— এঁরা সমস্তই শ্রীভগবানের বিরাট-রূপের অঙ্গ, বল বা বীর্যস্বরূপ, সুতরাং এঁদের উদ্দেশে প্রদত্ত পূজাকেও শ্রীভগবানের পূজারূপে গণ্য হয়।

অক্রূর স্তব প্রসঙ্গে তাই শ্রীভগবানের সেই বিরাট বা বৈরাজ্য রূপের স্তুতি করে বলছেন— হে ভগবন্ ! অগ্নি আপনার মুখস্বরূপ (**অগ্নির্বৈ দেবানাং মুখং**)। অতএব অগ্নিদেবতার প্রতি যে হোম ও পূজা বিহিতাদি করা হয় তা প্রত্যুত আপনার মুখেই নিবেদিত হয়। এই পৃথিবী আপনার চরণ স্বরূপ, একে আশ্রয় করেই জীবলোক বেঁচে থাকে। সূর্য ভূলোককে প্রকাশ করে তা আপনার চক্ষুস্বরূপ। আকাশ আপনার নাভিস্থল, দিক্‌সকল আপনার শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বর্গ আপনার মস্তক, ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনার বাহু, সাগর আপনার কুক্ষি এবং বায়ু আপনার প্রাণ ও বল। হে সচ্চিদানন্দ ! আপনি সর্বকারণের কারণ হয়েও আপনার অচিন্ত্য শক্তিতে আপনি নির্বিকার।

শ্রীভগবানের অবতারলীলা (শ্লোক ১৬—২২)

যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি।
তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ॥ ১৬
নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ।
হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভ-মৃত্যবে॥ ১৭
অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে।
ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্তয়ে॥ ১৮
নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোক-ভয়াপহ।
বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ॥ ১৯
নমো ভৃগূণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে।
নমস্তে রঘুবর্যায় রাবণান্তকরায় চ॥ ২০
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥ ২১
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে।
ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্র-হন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে॥ ২২

সরলার্থ—অর্থাৎ হে প্রভু ! আপনি ক্রীড়ার জন্য পৃথিবীতে যে সকল রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, সেই অবতার শরীরসমূহের ভজন-

পূজনাদির দ্বারা জীবগণের শোক-মোহাদি দূরীকৃত হয় এবং তারা পরমানন্দে আপনার যশগান করে॥ ১৬ ॥ আপনি বেদ, ঋষিগণ, ওষধিসমূহ এবং সত্যব্রতাদি ধর্মপরায়ণগণের রক্ষণ তথা দীক্ষার নিমিত্ত মৎস্যরূপ ধারণ করে প্রলয়-পয়োধিজলে স্বচ্ছন্দে বিহার করেছিলেন। আপনার সেই কারণ-মৎস্যরূপকে আমি নমস্কার করি। হয়গ্রীব রূপধারী আপনাকে নমস্কার এবং মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের সংহারকারী আপনাকে নমস্কার॥ ১৭ ॥ বিশাল কচ্ছপরূপ গ্রহণ করে আপনি মন্দার পর্বত ধারণ করেছিলেন, সেই আপনাকে নমস্কার। পৃথিবী উদ্ধারলীলায় আপনি বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন, সেই আপনাকে বারংবার নমস্কার॥ ১৮ ॥ আপনি সাধু-ভক্তজনের দুঃখ-কষ্ট-ভয় দূর করার জন্য সর্বদা তৎপর থাকেন, তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে (পিতৃকৃত) অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য আপনি নৃসিংহরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সেই অলৌকিক নৃসিংহ আপনাকে নমস্কার। আবার বামনরূপে আপনি নিজ পদবিক্ষেপে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করেছিলেন—আপনার পদমূলে আমার প্রণতি নিবেদন করছি॥ ১৯ ॥ অহংকারোন্মত্ত অত্যাচারী ক্ষত্রিয়কুলরূপ বনকে উচ্ছেদ করার জন্য আপনি (কুঠারধারী) ভৃগুপতি পরশুরামরূপ গ্রহণ করেছিলেন, সেই উগ্রমূর্তি আপনাকে নমস্কার। দুষ্ট-রাবণ ধ্বংসকারী, রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রামরূপে অবতীর্ণ আপনাকে প্রণাম করি॥ ২০ ॥ বৈষ্ণবভক্তসজ্জন তথা যদুবংশীয়গণের পালন-পোষণের নিমিত্ত বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহরূপে প্রকটিত আপনার চার মূর্তিকেই প্রণাম জানাচ্ছি আমি (আবিষ্ট অবস্থায় ভগবানের নিত্য চতুর্ব্যূহ মূর্তি প্রত্যক্ষ করছেন অক্রূর)॥ ২১ ॥ দৈত্য-দানবদের মোহিত করার জন্য আপনি বুদ্ধরূপে শুদ্ধ অহিংসা-মার্গের প্রবর্তন করবেন, সেই আপনাকে আমার নমস্কার। আবার পৃথিবীর ক্ষত্রিয়গণ যখন কুৎসিত ম্লেচ্ছাচারে রত হয়ে অধর্মের প্রচার-প্রসারে প্রবৃত্ত হবে, তখন আপনি তাদের ধ্বংস করার জন্য কল্কিরূপে আবির্ভূত হবেন, আপনার সেই মূর্তিকে প্রণাম করি আমি॥ ২২ ॥

মূলভাব—শ্রীভগবানের স্তব প্রসঙ্গে ভক্ত অক্রূর বলেছেন, শ্রীভগবানের স্বরূপ অচিন্ত্যনীয় ও তাঁর তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। তাই তিনি বলছেন, শ্রীভগবানের স্বরূপ-তত্ত্বের জ্ঞানলাভ যখন একান্তই দুর্লভ তখন তাঁর স্বরূপজ্ঞানের প্রয়াস না করে ভক্তগণ তাঁর নানাবিধ অবতারের কথামৃতই নিত্য সেবন করেন এবং এর দ্বারা শোক-দুঃখ ভুলে পরম রসাস্বাদন করেন। ব্রহ্মা-মোহন স্তবে ব্রহ্মা বলছেন (ভাগবত ১০।১৪।৩), সাধুভক্তগণ স্বভাবত আপনার কথামৃত শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে আপনার সেবন দ্বারাই জীবন ধারণ করেন, তাই আপনি কাল-কর্মাদি কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন না হয়েও তাঁদের দ্বারা প্রায়ই এই ত্রিলোক মধ্যে বশীভূত হয়ে থাকেন।

ভক্ত অক্রূরও তাই বলছেন—

যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি।
তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ॥

(ভাগবত ১০।৪০।১৬)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের ক্রিড়নার্থ যে যে রূপ ধারণ করেন তাঁর ভক্তগণ সেই লীলা শ্রবণ, আস্বাদন করে তাঁর যশোগান করে থাকেন।

আর এটা বৈষ্ণব সাধনারও একটি বিশেষ অঙ্গ। অক্রূর একে 'মুদা গায়ন্তি' বলেছেন। যদিও শ্রীভগবানের অবতার অসংখ্য ও অনন্ত, **'অবতারাহ্যসংখ্যেয়া'** তবু এঁদের মধ্যেও তাঁর যে যে অবতার প্রসিদ্ধ, ভক্ত অক্রূর তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে প্রত্যেকের উদ্দেশেই প্রণাম নিবেদন করেছেন।

মৎস্যাবতার—পুরাণে জানা যায় শ্রীভগবান এক কল্পে মৎস্যাবতাররূপে দুবার আবির্ভূত হন। সায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়গ্রীব নামে দৈত্য বেদহরণ করে নিয়ে গেলে, ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভগবান মৎস্যমূর্তিতে প্রকট হয়ে হয়গ্রীব দৈত্যকে বধ করে বেদ উদ্ধার করেন। দ্বিতীয়বার চাক্ষুস মন্বন্তরে তিনি ক্ষুদ্র মৎস্যমূর্তিতে অবতীর্ণ হন ও ক্রমে বিরাট আকৃতি ধারণ করেন। এই সময় অকস্মাৎ প্রলয় হয় আর মৎস্যাবতারের আদেশে তাঁর প্রিয় ভক্ত সত্যব্রত, সমস্ত ঔষধি, প্রধান

প্রধান প্রাণীগণ ও ঋষিগণসহ নৌকায় আরোহণ করেন। মৎস্যরূপী ভগবান সেই নৌকা আকর্ষণ করে প্রলয় সমুদ্রে বিচরণ করেন ও সত্যব্রতকে উপদেশ দান করেন। এইজন্য স্তবে অক্রূর বলছেন—**'নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ'**।

হয়শীর্ষ অবতার—অক্রূর শ্রীভগবানের হয়শীর্ষ অবতারকে প্রণাম জানালেন। প্রলয় অবসানে যখন সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন ছিল, তখন কারণ সলিলে ভাসমান বিষ্ণুর কর্ণমল হতে মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্য উৎপন্ন হয়ে, নাভি কমলস্থিত ব্রহ্মাকে নাশ করতে উদ্যত হল। এদিকে বিষ্ণু তখন যোগনিদ্রায় নিদ্রিত তাই ব্রহ্মা যোগনিদ্রা রূপিণী মহামায়ার স্তবে প্রবৃত্ত হলেন। স্তবে তুষ্ট যোগনিদ্রা বিষ্ণুর নেত্র ত্যাগ করলে, বিষ্ণু দেবতাদের দুঃখের কারণ অবগত হয়ে হয়শীর্ষ মূর্তিতে মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্যকে বধ করেন।

কূর্মাবতার—অমৃত প্রাপ্তির আশায় দেবতা ও অসুরগণ সমুদ্র মন্থন করতে উদ্যত হলে, শ্রীভগবান বহুযোজনব্যাপী বিরাট কূর্মমূর্তিতে ক্ষিরোদ সাগরের মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে নিজপৃষ্ঠে মন্দার পর্বত ধারণ করেন। শ্রীভগবানের সেই বিরাট কূর্মমূর্তিকেও তাই অক্রূর বিনীত প্রণাম জানালেন।

বরাহ অবতার— অক্রূর ভগবানের বরাহ অবতারের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বলছেন—**'ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্তয়ে'** অর্থাৎ ধরণীর উদ্ধারার্থে বিহারপরায়ণ বরাহমূর্তিধারী আপনাকে নমস্কার। পৃথিবী সৃষ্টির পর তা জলমগ্না হলে ব্রহ্মা পৃথিবীর উদ্ধারোপায় চিন্তা করছেন, এমন সময় তাঁর নাসাবিবর হতে এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বরাহমূর্তি নির্গত হয়ে তৎক্ষণাৎ পর্বত প্রমাণ মূর্তি ধারণ করল। ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হয়ে বরাহরূপী নারায়ণ জলমগ্না পৃথিবীকে দন্তাগ্রে ধারণ করে উত্তোলন করেন। **স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে** শ্রীভগবানের এই লীলা প্রকট হয়। **চাক্ষুস মন্বন্তরেও** হিরণ্যাক্ষ বধের জন্য শ্রীভগবানের বরাহমূর্তিতে আবির্ভাব দেখা যায়। ভগবানের সেই অপ্রাকৃত শূকর মূর্তিকে অক্রূর প্রণাম জানালেন।

নৃসিংহ অবতার—অনন্তর অদ্ভুত নৃসিংহরূপধারী শ্রীভগবানের উদ্দেশে অক্রূর প্রণাম জানিয়ে বললেন—**'সাধুলোক ভয়াপহ'** অর্থাৎ আপনি

সাধুলোকের ভয় অপনোদনকারী। ভক্ত প্রহ্লাদের মতো সাধুজন জগতে বিরল, আর তাই যখন তাঁর পিতা কর্তৃক তিনি নিপীড়িত হলেন তখন ভগবান স্বয়ং নৃসিংহ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে তার বক্ষ বিদারণ করে তাকে বিনাশ করেন।

বামন অবতার— এরপর অক্রূর বামন রূপধারী শ্রীবিষ্ণুর অবতারকে প্রণাম জানিয়েছেন। বিষ্ণুভক্ত দান গর্বিত দৈত্যরাজ বলির দর্প চূর্ণ করার জন্য ভগবান বিষ্ণু, অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলিরাজের যজ্ঞস্থলে বামনরূপ ধারণ করে উপস্থিত হন ও তাঁর নিকট ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি ভিক্ষা চান। দৈত্যরাজ ভূমি দিতে রাজি হলে ভগবান তাঁর দুটি চরণ দিয়ে আকাশ ও পৃথিবী আবৃত করেন আর নাভিদেশ থেকে উদ্ভূত তৃতীয় চরণ বলিরাজের মস্তকে স্থাপন করে তিনি তাঁকে পাতালে প্রেরণ করেন। এই অবতার খর্বাকৃতি বলে তিনি বামন নামধারী।

পরশুরাম অবতার—ভগবান বিষ্ণু ভৃগুবংশীয় জমদগ্নি ঋষির পুত্র পরশুরামরূপে আবির্ভূত হয়ে মদগর্বে গর্বিত পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। সেই ভৃগুবংশীয় লীলাবতার পরশুরামের উদ্দেশেও অক্রূর প্রণাম জানালেন।

চতুর্ব্যূহ তত্ত্ব—শ্রীভগবান বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ মূর্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ভক্ত অক্রূর এই চতুর্ব্যূহ তত্ত্বকে প্রণাম জানালেন।

বুদ্ধ ও কল্কি অবতার — পরিশেষে অক্রূর শ্রীভগবানের ভবিষ্যৎ আবেশাবতার বুদ্ধ ও নিগ্রহ কল্কির উদ্দেশ্যেস্বরূপেও প্রণাম জানালেন। বুদ্ধরূপে তাঁর শুদ্ধ শীলচর্চা অহিংসা, করুণা, মৈত্রী সম্বন্ধে স্তুতি করতে গিয়ে বলছেন—**'নমো শুদ্ধায় বুদ্ধায়'**। অক্রূর কল্কিরূপধারী বিষ্ণুর ভবিষ্যৎ অবতারেরও বন্দনা করলেন। কল্কি অবতারে ভগবান ম্লেচ্ছরূপে ভ্রষ্টাচারে মগ্ন ক্ষত্রিয়বৃন্দকে নিহত করে পৃথিবীতে ধর্মসংস্থাপন করবেন। কথিত আছে, কলিযুগের অবসানকালে ভগবান বিষ্ণু শম্ভলা নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন এবং দেবদত্ত নামক অগ্নিময় খড়্গের আঘাতে ভ্রষ্টাচারীদের উচ্ছেদ সাধন করে অধর্মের বিনাশপূর্বক পৃথিবীতে সত্যযুগের

সূচনা করবেন। শাস্ত্র-তত্ত্ববিশ্বাসী ভক্ত অক্রূর এই কল্কি অবতারের উদ্দেশেও তাই প্রণাম জানালেন।

ভক্তকবি জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী শ্রীগীতগোবিন্দের **'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্'** প্রভৃতি দশাবতার স্তোত্রও এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শরণাগতি (শ্লোক ২৩—৩০)

ভগবন্ সর্বলোকোঽয়ং মোহিতস্তব মায়য়া।
অহং মমেত্যসদ্গ্রাহো ভ্রাম্যতে কর্মবর্ত্মসু॥ ২৩
অহং চাত্মাত্মজাগার-দারার্থ-স্বজনাদিষু।
ভ্রমামি স্বপ্নকল্পেষু মূঢ়ঃ সত্যধিয়া প্রভো॥ ২৪
অনিত্যানাত্মদুঃখেষু বিপর্যয়মতির্হ্যহম্।
দ্বন্দ্বারামস্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাত্মনঃ প্রিয়ম্॥ ২৫
যথাবুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছন্নং তদুদ্ভবৈঃ।
অভ্যেতি মৃগতৃষ্ণাং বৈ হিত্বাহং ত্বাং পরাঙ্মুখঃ॥ ২৬
নোৎসহেঽহং কৃপণধীঃ কাম-কর্ম-হতং মনঃ।
রোদ্ধুং প্রমাথিভিশ্চাক্ষৈর্হ্রিয়মাণমিতস্ততঃ॥ ২৭
সোঽহং তবাঙ্ঘ্র্যুপগতোঽস্ম্যসতাং দুরাপং
তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে।
পুংসো ভবেদ্ যর্হি সংসরণাপবর্গ-
স্ত্বয্যব্জনাভ! সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ॥ ২৮
নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্বপ্রত্যয়-হেতবে।
পুরুষেশপ্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে॥ ২৯
নমস্তে বাসুদেবায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ।
হৃষীকেশ! নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো॥ ৩০

সরলার্থ—হে ভগবন্! এই সমগ্র জীবলোক আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে 'আমি-আমার'—এইরূপ মিথ্যা বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে অনিত্য দেহ-

গেহাদির প্রতি আকর্ষণে বদ্ধ হয় এবং তার ফলে কর্মমার্গে আবর্তিত হয়ে চলে॥ ২৩ ॥ হে সর্বব্যাপী প্রভু আমার ! আমি নিজেও তো আপনার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে স্বপ্নের মতো অনিত্য ক্ষণস্থায়ী, দেহ-গেহ, পত্নী-পুত্র, ধন-জন প্রভৃতিতেই সত্যবুদ্ধি করে কর্মমার্গে ভ্রমণ করছি॥ ২৪ ॥ মূর্খতার বশে আমি অনিত্য বস্তুকে নিত্য, অনাত্মাকে আত্মা এবং দুঃখকে সুখ বলে মনে করছি। এই বিপরীতবুদ্ধির কি কোনো সীমা আছে ? এইভাবে অজ্ঞানের বশে সাংসারিক সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বে আসক্ত হয়ে তাতেই ডুবে রয়েছি এবং এই সত্য সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছি যে, আপনিই আমার প্রকৃত প্রিয়॥ ২৫ ॥ যেমন কোনো নির্বোধ লোক জলের আশায় জলাশয়ে গিয়ে জলজ তৃণ-শৈবালাদিতে ঢাকা থাকায় সেখানে জল দেখতে না পেয়ে তা ছেড়ে (জলের অলীক প্রতিচ্ছবি) মরীচিকার দিকে ছুটে চলে, সেইরকম আমিও নিজমায়ায় প্রতিচ্ছন্ন আপনাকে ছেড়ে সুখের আশায় বিষয়াদির প্রতি ধাবিত হয়েছি॥ ২৬ ॥ আমি অবিনাশী অক্ষর বস্তুর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। তার ফলে আমার মনে বহুবিধ বস্তুর কামনা এবং সেসবের জন্য কর্ম করার সংকল্প জন্মাতেই থাকে। তাছাড়া এই প্রবল এবং দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গুলি আমার মনকে মথিত করে বলপূর্বক এদিকে-ওদিকে টেনে নিয়ে যায়—তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সাধ্যই আমার হয় না॥ ২৭ ॥ এইভাবে বহুপথ ঘুরে আমি এবার অসাধুজনের পক্ষে যা দুর্লভ, আপনার সেই চরণকমলের ছায়ায় এসে উপনীত হয়েছি। প্রভু ! আমি জানি এবং মানি যে, এ আপনারই কৃপা-প্রসাদ। কারণ, হে পদ্মনাভ ! প্রকৃতপক্ষে (আপনার কৃপায়) যখন মানুষের (জন্ম-মরণ প্রবাহরূপ) সংসারচক্র থেকে মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন (আপনারই কৃপায়) সজ্জন-মহাপুরুষগণের সেবা-উপাসনার সুযোগ ঘটে জীবনে এবং তার ফলস্বরূপ সে আপনাতে দৃঢ়ভাবে লগ্ন হয়ে থাকে আর তার চিত্তবৃত্তি, তার ভাবনা-চিন্তা, মতি-বুদ্ধি অনুক্ষণ আপনাকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে॥ ২৮ ॥ আপনি বিজ্ঞানস্বরূপ, বিজ্ঞানঘনবিগ্রহ। সর্ব প্রতীতির, সকল প্রকার বৃত্তির কারণ এবং অধিষ্ঠান আপনিই। জীবরূপে এবং জীবের সুখ-দুঃখাদির প্রাপক বা নিমিত্তস্বরূপ কাল, কর্ম, স্বভাব তথা প্রকৃতিরূপেও আপনিই বিদ্যমান। আবার

এইসবের নিয়ন্তাও আপনিই। আপনার শক্তি অনন্ত। আপনি স্বয়ং ব্রহ্ম। আপনাকে প্রণাম, প্রণাম এবং প্রণাম॥ ২৯ ॥ প্রভু ! আপনি চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব, আপনি সকল জীবের আশ্রয় সংকর্ষণ ; আপনিই বুদ্ধি এবং মনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা হৃষীকেশ (প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ)। আমি বারবার আপনাকে প্রণাম করি। আমি আপনার শরণ নিলাম, প্রভু, রক্ষা করুন আমাকে॥ ৩০ ॥

মূলভাব—ভক্ত অক্রূর পূর্ব প্রকরণে **'যানি যানীহ রূপানি'** প্রভৃতি সাতটি শ্লোকে, লোকোদ্ধারের জন্য ও ধর্মপ্রয়োজনে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের বিবিধ অবতারের বন্দনা দ্বারা নিজ হৃদয়ের সুগভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে, অবশেষে **'ভগবন্ সর্বলোকোঽয়ম্'** প্রভৃতি আটটি শ্লোকে শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত হয়ে নিজ অন্তরের আর্জি জানিয়েছেন ও সংসার-মুক্তি প্রার্থনা করেছেন।

ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুকম্পার আবেগ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান যুগে যুগে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে বিবিধ অবতার লীলা প্রকট করেন। কিন্তু হায় ! জগৎজীবের কী দুর্ভাগ্য যে, ভগবানের অমোঘ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে জীব শ্রীভগবানকে ভুলে নিত্য 'আমি'-'আমার' করে নিজ দেহ-গেহাদিতে ব্যস্ত থাকে আর তার ফলে নিরন্তর দুঃখময় সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে। অনাদি বহির্মুখতা-বশতঃই তাদের দেহ-গেহাদিতে অভিনিবেশ আসে, অনিত্য বস্তুতে আগ্রহ হয়, বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং এর ফলে তারা কর্মচক্রের আবর্তনে জন্মবন্ধময় কর্মমার্গে দিশাহারা হয়ে নিরন্তর ঘুরে মরে।

কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদিবহির্মুখ। সে কারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু শুন্যে উঠায় কভু নরকে চুরায়। দণ্ড্য জনে রাজা যেন জলেতে চুবায়॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অক্রূর তাঁর স্তুতিতে নিজ দৈন্য ও আর্তি প্রকাশ করে বলছেন—

পুংসো ভবেদ্ যর্হি সংসরণাপবর্গস্ত্বয্যব্জনাভ ! সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ॥

(ভাগবত ১০।৪০।২৮)

হে প্রভু ! এ জগতের অধিকাংশ জীবই আপনার দুর্লঙ্ঘ্য মায়ায় মোহিত এবং আমিও তার প্রভাব থেকে মুক্ত নই। আপনার শ্রীচরণে ভক্তিলাভের জন্য

আমার লালসা আছে সত্য, কিন্তু অসজ্জনের সঙ্গ হেতু অনিত্য বস্তুর প্রতি আমার আসক্তি রয়েছে আর মূঢ়তাবশত আমি পুত্র-কলত্র, দেহ-গেহাদিতে সত্যবুদ্ধি করে আপনার মায়ায় আবদ্ধ আছি। আপনিই একমাত্র পুরুষার্থ, কিন্তু মূর্খ আমি সেই পরমপুরুষার্থ ছেড়ে বিষয়সুখের প্রতি ধাবিত হচ্ছি। অক্রূর জানেন তাঁর মায়া-মোহিত অন্তঃকরণ নিতান্ত অসহায় ও অস্বতন্ত্র এবং এক্ষেত্রে একমাত্র শ্রীভগবানের অপার করুণাই তাঁর সম্বল। আর তিনি যে এখন শ্রীভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেছেন তাও শ্রীভগবানের অপার করুণারই ফল। শ্রীভগবান অন্তর্যামী, তাই তাঁর কৃপা হলেই জীবের সংসার বন্ধন হতে মুক্তির সম্ভাবনা হয়, আর তখনই সাধুসেবা বা ভক্তজনের সেবালাভে আগ্রহ হয় এবং শ্রীভগবানের প্রতি তার ভক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। শ্রীভগবানের কৃপালাভ না হলে সাধু সেবার সুযোগও উপস্থিত হয় না আর শ্রীভগবানেও অনুরাগ হয় না।

অনন্তর ভক্ত অক্রূর শ্রীভগবানের রাতুল চরণে প্রণত হয়ে মিনতিভরে প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন—

'হৃষীকেশ ! নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো'।

(ভাগবত ১০।৪০।৩০)

হে প্রভু ! আপনাকে প্রণাম। আমি আপনার শরণাগত, আমাকে সংসার পাশ হতে রক্ষা করুন। হে পদ্মনাভ ! আপনার অনুগ্রহের সীমা নেই। আপনি আমার একমাত্র সেব্য তাই আপনারই সেবা করার অধিকার দান করুন যাতে দুষ্ট ভূপতি কংসের সেবার দুর্ভর গ্লানি আর বহন করতে না হয়। হে হৃষীকেশ ! আমার সকল ইন্দ্রিয় ও মনের একমাত্র অধিষ্ঠাতারূপে আপনি তাদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করুন, যাতে স্ত্রী-পুত্র-সংসাররূপ অনিত্য বস্তুর প্রতি ঐ সকল ইন্দ্রিয় ও মন যেন আর ধাবিত না হয়। 'প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো'—হে প্রভো ! শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন, এই দুস্তর সংসার-সমুদ্র হতে আমায় ত্রাণ করুন।

ভক্ত অক্রূরের জ্ঞানমিশ্র ভক্তি, তাঁর দাস্যভাব। তাঁর ইষ্টদেব ঐশ্বর্যপ্রধান ভগবান বিষ্ণু। সেই বিষ্ণু ও ব্রজে লীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ যে এক ও অভিন্ন, তা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই অক্রূর পথিমধ্যে যমুনার জলে অবগাহন করার সময়ই অনুভব করেছিলেন। শ্রীভগবানের স্বরূপ মহিমা কেবল তাঁর কৃপাতেই অনুভবগম্য হয়।

যা হোক, অক্রূর জলে নিমজ্জমান অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন করে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি স্নানান্তে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হলে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন অক্রূর আপনার মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন জলে কিছু আশ্চর্যজনক জিনিস দেখেছেন ? এর উত্তরে অক্রূর যা বলেছেন তার মধ্যে বিশেষ তত্ত্ব নিহিত আছে। অক্রুর বলছেন—**'ত্বয়ি বিশ্বাত্মকে তানি কিং মেহদৃষ্টং বিপশ্যতঃ'** (ভাগবত ১০।৪১।৪) অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনিই বিশ্বাত্মা, বিশ্বরূপী, আপনাতেই সমস্ত বস্তু, সমস্ত জগৎ চরাচর স্থিত রয়েছে, আর তাঁকে যখন শ্রীভগবান তাঁর স্বরূপ দর্শন করিয়েছেন তখন তাঁর না-দেখা বা দেখার যোগ্য আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

শ্রুতিও এ বিষয়ে বলেছেন—**'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতম্'** (ছান্দোগ্য ৬।১।৩) যদ্দারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অচিন্তিত বস্তু সুচিন্তিত হয় এবং অজ্ঞাত বস্তুও জ্ঞাত হয়—সেই তাঁকে জানলেই সমস্ত বস্তুর জ্ঞান হয়। শ্রুতি আরো বলছেন—**'আত্মনো বারে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্'** (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫) অর্থাৎ সর্ব কারণের কারণ ব্রহ্মকে **দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান** দ্বারা জানতে পারলেই, তাঁর থেকে সৃষ্ট সমস্ত জগৎকে জানা যায়, কিছুই আর অজ্ঞাত থাকে না। অক্রূরও সেইরকম পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত দর্শন করে জেনেছেন যে শ্রীকৃষ্ণর অতিরিক্ত বা তাঁর ভিন্ন আর কিছুই নেই, তাঁকে দর্শন করলে বা জানলে সমস্তই জানা হয়ে যায়।

অক্রূর আবার ভগবদ্‌ভক্ত—তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তাঁরই কৃপায় যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করে তাঁরই স্তুতিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আর স্তুতি এইরূপ

হৃদয় হতে স্বতঃউৎসারিত হলে তবেই তা ভগবানের আস্বাদ্য হয় এবং তা হয় তাঁরই কৃপায় তাঁর গুণমহিমা হৃদয়ে অনুভূত হলে। শ্রীভগবানের যথার্থ স্বরূপ একমাত্র তাঁর কৃপার আলোকে অনুভব করা যায় অন্য কোনো উপায়ে নয়। শ্রুতিও বলছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

(কঠোপনিষদ্ ১।২।২৩)

অর্থাৎ আত্মাকে প্রবচন (শাস্ত্রব্যাখ্যাদি) দ্বারা মানা যায় না। যাকে ইনি কৃপা করে বরণ করেন তিনিই তাঁকে লাভ করে থাকেন। শ্রুতি আরো বলেছেন—'**তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ**' (কঠ. ১।২।২০) অর্থাৎ একমাত্র নিষ্কাম ব্যক্তিই (অক্রতুঃ) শ্রীভগবানের প্রসাদেই (ধাতুঃ প্রসাদাৎ) আত্মার মহিমা দর্শন করে শোকাতীত হন।

সুদর্শন চক্রাবতার শ্রীনিম্বার্কাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলেছেন '**কৃপাঽস্য দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে যয়া ভবেৎ প্রেমবিশেষলক্ষণা**' (দশশ্লোকী-৯) অর্থাৎ দৈন্যাদি গুণযুক্ত শরণাগত পুরুষেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা উপজাত হয় এবং সেই কৃপা হতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের (ভগবানের) প্রতি প্রেমরূপা ভক্তিলাভ হয়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখনীয় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে অক্রূরকে নিজ স্বরূপ দেখিয়েই সহসা অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। এর দ্বারা ভগবানের কী উদ্দেশ্যই বা সাধিত হল ! উদ্দেশ্য এই যে শ্রীভগবান লীলার প্রয়োজনেই এইরূপ করেছেন। ভক্ত অক্রূর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকালীলার সহায়ক। সেই লীলার প্রয়োজনে অক্রূরের কাজ এখনো অনেক বাকি আছে, তা সম্পন্ন করা প্রয়োজন। সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপবিগ্রহ—যা তাঁর কৃপায় অক্রূর দেখেছেন, তা যদি অক্রূরের মনে স্থির ও স্থায়ী থাকে তবে অক্রূর তাঁতেই নিত্য মগ্ন হয়ে থাকবেন, তাঁর দ্বারা আর ভগবল্লীলার প্রয়োজনীয় কোনো জাগতিক কাজই সম্ভব হবে না। সেইজন্য ভগবান তাঁর স্বরূপ একবার

মাত্র অক্রূরকে দর্শন দিয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করলেন এবং তৎপরেই সংহরণ করে নিলেন। সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এটা একটা লীলাচাতুর্য।

আরও কথা এই যে, ভগবৎকৃপার প্রভাবে যে তাত্ত্বিক ও দর্শনাদি লাভ হয়, তা পরে সাধনার দ্বারা সাধকের আয়ত্ত করতে হয়, না হলে বিনা সাধনায় সেই সকল কৃপালব্ধ তত্ত্ব ও দর্শনাদির স্থায়ীফল লাভ হয় না। তবে সাধকের সাধনার পক্ষে সেই সকল অনুভব বিশেষ সহায়ক হয়, কারণ স্মৃতিরূপে, বা সংস্কাররূপে সেই সকল অনুভব চিত্তে থেকে যায় এবং নানাভাবে সাধকের সাধনায় সহায়তা করে। সেই সকল কৃপালব্ধ অনুভব ও দর্শনাদি বিশেষ সৌভাগ্যশালী সুকৃতিমান ভক্ত-সাধকেরই লাভ হয়ে থাকে এবং তাঁর সাধন জীবনে সেই সকলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও থাকে।

নামদেব আখ্যান—

নামদেবজীর আদি নিবাস ছিল হায়দরাবাদের দক্ষিণভাগে, নরসী ব্রাহ্মণী গ্রামে। বাবার নাম দামসেট আর মায়ের নাম গোনাই দেবী। এঁরা বংশপরম্পরায় বিঠ্ঠলদেবের ভক্ত। পূজা, নামকীর্তন, ভগবদ্ সেবা— সে বাড়ির ধারা। মাত্র নয় বছর বয়সেই সবাই নামদেবকে বাল ভাগবত বলে ডাকত।

দেশীয় প্রথা অনুযায়ী তাঁর অল্পবয়সেই বিবাহ হয়। বাবা-মার মৃত্যুর পর ভক্তসঙ্গলাভের জন্য আর সাধন-ভজনের সুবিধার জন্য নামদেব সস্ত্রীক পণ্ডারপুরেই চলে আসেন এবং বসবাস করতে থাকেন। বিঠ্ঠলদেব, নামদেবজীর সঙ্গে মানুষের মতো কথা বলতেন, সামনে বসে খেতেন। নামদেবের কাছে বিঠ্ঠলজীর বিগ্রহ পাথরের মূর্তিমাত্র ছিল না, তিনি সাক্ষাৎ চিন্ময় রূপে ধরা দিয়েছিলেন।

পণ্ডারপুরে গোরাকুমারের বাড়ি। একবার তাঁর ঘরে বড় সন্তসভা বসেছে। সভায় বহু সন্তের সঙ্গে তীর্থভ্রমণ শেষে ভগবতপ্রতিম তিন ভাই নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানেশ্বর, সোপানদেব ও তাঁদের ভগ্নী মুক্তাবাইও এসে উপস্থিত।

ছিলেন নামদেবও। ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছে। এমন সময় মুক্তাবাই দেখেন কাঠের একটা থুপি পড়ে আছে। মুক্তাবাই গোরাকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কী ? গোরা বলল—এটা মাটির ঘট তৈরি হওয়ার পর ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করে দেখার যন্ত্র, ঘটটা কাঁচা আছে না পাকা। মুক্তাবাই ছেলে মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল আমরা দেহধারী মাত্রই তো ঘট, তাহলে থুপি দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখি কে পাকা কে কাঁচা। নামদেবজীর কিন্তু এই ব্যাপারটা পছন্দ হল না। তিনি বললেন ধর্ম আলোচনার মাঝে এটা আবার কী খেলা। কিন্তু কোনো কথায় কান না দিয়ে মুক্তাবাই কিন্তু সকলের মাথায় থুপি ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করছেন আর বলছেন এ পাকা। অবশেষে নামদেবের মাথায় থুপি ঠুকে বললেন, আরে এ তো কাঁচা। নামদেব শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। গোরাকুমার তখন বললেন—নামদেব আপনি রাগ করছেন কেন ? বিঠ্‌ঠলদেব আপনার সঙ্গে কথা বলেন ঠিকই, কিন্তু আপনার তাঁর তত্ত্ব ঠিকমতো অনুধাবন হয়নি।

রাগে, দুঃখে, অপমানে নামদেব সঙ্গে সঙ্গে সভা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, সোজা গিয়ে হাজির বিঠ্‌ঠলদেবের মন্দিরে এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে সব কথা নিবেদন করলেন। হাসতে হাসতে ভগবান বিঠ্‌ঠলদেব বললেন—কেন গোরা তো ঠিকই বলেছে। এতে তো তোমার রাগের কিছু নেই। আমিও তো এই কথাটাই বলব বলব ভাবছিলাম। এখনও তোমার আমার তত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে জানা হয়নি। আমি সর্বভূতে বিরাজমান এ উপলব্ধি যতক্ষণ না তোমার হৃদয়ে আসে ততক্ষণ তোমার মধ্যে ভগবৎ প্রেম পূর্ণভাবে জাগ্রত হবে না।

নামদেব বললেন—বা ! এ কিরকম কথা ! আমি যখন-তখন তোমার দর্শন লাভ করি, তোমার সঙ্গে কথা বলি ; তবুও আমি কাঁচা কী করে ? ভগবান বললেন, তা তো ঠিকই কিন্তু তুমি এখনও কাঁচা। আমাকে শুধু মূর্তিতে বা এক দেহেই পরিচ্ছিন্ন মনে করো। কিন্তু আমি শুধু এটুকুই নই। এই জগৎ-সংসারে অণু-পরমাণুতেও যে আমি আছি। এই ভগবৎ সমুদ্রে জগৎ যে এক তরঙ্গের

খেলা সেটা তো তোমার উপলব্ধি হয়নি। তুমি এক কাজ করো। বিশোপা খেচর নামে আমার এক ভক্ত আছেন তুমি তাঁর কাছে যাও। তিনি তোমাকে এই তত্ত্ব বুঝিয়ে বলবেন।

নামদেব তখনই বিশোপা খেচরের খোঁজে বেরোলেন। খুঁজতে খুঁজতে বিশোপা খেচরকে পেয়েও গেলেন। কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি শিবলিঙ্গের উপর দু-পা রেখে বিশ্রাম করছেন। দেখে তো নামদেবের চক্ষু চড়কগাছ। ভাবলেন বিঠ্‌ঠলদেব তার সঙ্গে রসিকতা করেছেন, আমাকে এমন লোকের কাছে পাঠিয়েছেন ! যেই তিনি ফিরে যাবেন, তখনই বিশোপা খেচর তাঁকে ডাকলেন এবং আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। নামদেব বললেন, সেটি পরে হবে ; আগে বলুন, আপনি এভাবে শিবলিঙ্গে পা রেখে ঘুমাচ্ছেন কেন ? বিশোপা খেচর বললেন—'ভাই ! আমি বুড়ো হয়েছি, নড়াচড়া করারও শক্তি নেই, তুমি যদি কষ্ট করে পা-দুটো একটু সরিয়ে দাও !' নামদেব তখন পা-দুটো তুলে সরিয়ে দিলেন, কিন্তু আশ্চর্য ! সেখানেও শিবলিঙ্গ গজিয়ে উঠল। নামদেব সরিয়ে যেখানেই পা নামাতে যাবেন, সেখানেই দেখছেন শিবলিঙ্গ। এবার নামদেবের চক্ষু খুলে গেল, তিনি বিশোপা খেচরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অনেক বছর তাঁর নির্দেশে সাধন ভজন করলেন। অবশেষে গুরুকৃপায় নামদেবের যথার্থ ঈশ্বরের তত্ত্ব অনুভূতি হল।

ফিরে এসে নামদেব পণ্ডারপুরে বসবাস করতে লাগলেন। পণ্ডারপুরে একাদশী ব্রতর খুব সমাদর। সকলেই সারাদিন উপবাসে থেকে রাতের বেলায় মনের আনন্দে নামকীর্তন, পূজাপাঠে কাটিয়ে সকালে দ্বাদশীর পারণ করতেন। সেদিন একাদশীর সকালেই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিথি হিসাবে হাজির। তার আবার নিয়ম যে তিনি গৃহস্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে আহার করেন। নামদেব অনেক বোঝালেন যে আজ একাদশী, তাঁর পক্ষে এই মহাব্রত ভাঙা সম্ভব নয়। অতিথি ব্রাহ্মণকে তিনি অনেক বুঝিয়েও স্বতন্ত্রভাবে আহার করতে রাজি করাতে পারলেন না। রাত্রে যখন নামদেবের বাড়িতে নামকীর্তন হচ্ছে তখন

বৃদ্ধ অতিথি ঘরের বাইরেই অভুক্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন। রাত্রি প্রভাত হলে নামদেব স্নানাদির জন্য বেরিয়ে অতিথিকে বাইরে শয়ান দেখলেন। অতিথিকে জাগাতে গিয়ে দেখলেন অভুক্ত অতিথি মৃত। অনুতপ্ত নামদেব বললেন—এই অতিথি আমার কাছে বারেবারে আহার চেয়েও পায়নি তাই প্রায়শ্চিত্তরূপে আমি আজ সহমৃত হব। বাড়িতে কান্নার রোল উঠল।

নামদেব চিতায় উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় মৃত অতিথি চিতার থেকে উঠে পড়লেন—মুখ ভর্তি ছলনার হাসি। নামদেব তারপর তাঁকে বাড়িতে অতি যত্ন করে আহার করালেন। অতিথিরূপী ভগবান বিঠ্ঠলদেব নামদেবকে স্বরূপ দর্শন করিয়ে হরিপদে ভক্তিলাভ হোক বলে অন্তর্হিত হলেন।

একবার নামদেব যাচ্ছেন তীর্থ করতে। পথে এক বড় গাছ দেখে তার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছেন আর ভগবানের নাম জপ করতে করতে রুটি তৈরি করে রাখছেন। এমন সময় একটা কুকুর এসে রুটির গোছা নিয়ে দৌড় লাগাল। নামদেব ছুটলেন পিছু পিছু— হাতে ঘিয়ের বাটি। নামদেব চিৎকার করে কুকুরটিকে ডাকছেন—ও ভগবান ! ও ভগবান ! যাবেন না একটু দাঁড়িয়ে যান। রুটিতে ঘি লাগানো হয়নি একটু ঘি লাগিয়ে দিই তারপর সেবা করবেন। নামদেবও দৌড়চ্ছেন আর রুটির গোছা নিয়ে কুকুরও দৌড়চ্ছে। শেষে কুকুরটি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ রূপে দর্শন দিয়ে নামদেবকে কৃতার্থ করলেন। নামদেব তাড়াতাড়ি রুটিতে ঘি মাখান আর ভগবান প্রেমের সঙ্গে তাই খান। নামদেবের সর্বভূতে ভগবদ্ দর্শন সার্থক হয়।

একবার নামদেব জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি ভাগবতের সঙ্গে চলেছেন তীর্থ ভ্রমণে। পথে চলতে চলতে সকলের খুব তৃষ্ণা পায়। কোথাও জল নেই। একটা কুয়ো পাওয়া গেল তাও শুকনো। নামদেবের আকুল আহ্বানে সেই শুকনো কুয়ো জলে ভর্তি হয়ে যায় বিঠ্ঠলদেবের কৃপায়। বিঠ্ঠলদেবের উপর নামদেবের বিশ্বাস ও শরণাগতি দেখে সবাই চমৎকৃত হলেন। জ্ঞানেশ্বরজীও নামদেবের শরণাগতির প্রভূত প্রশংসা করেন।

আর একবার নামদেবজী গ্রামান্তরে গেছেন। থাকার জায়গা নেই তাই এক পোড়ো বাড়িতে উঠলেন। গ্রামের সবাই বলল ওটাতে ভূত থাকে। নামদেবজী বললেন—এই সারা বিশ্বে বিঠ্‌ঠলদেব ছাড়া আর কিছু আছে নাকি ? ভূতও তো আমার বিঠ্‌ঠল। রাত গভীর হতেই ভূত এসে হাজির। নামদেব ঢিপ করে লম্বা প্রণাম করে বললেন—ওগো আমার বিঠ্‌ঠলদেব, এসেছ। এসেছই যখন তখন একটু ভজন শুনে যাও, বলে একটি স্তব শুনিয়ে দিলেন। অমনি ভূত হাসতে হাসতে বিঠ্‌ঠলরূপ ধারণ করলেন।

নামদেব ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হয়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে ঘুরে বেড়াতেন আর মধুর স্বরে ভগবৎ কীর্তন গাইতেন। পাঞ্জাবের ঘুমানে নামদেবজী ১৭ বৎসর বাস করেন এবং তথায় সকলের হৃদয়ে ভক্তিভাবের বীজ রোপণ করেন, যা পরে বাবা নানকের হাত ধরে শিখধর্মরূপী মহীরুহে পরিণত হয়। এখনও ঘুমানে তাঁর নামে স্মৃতিফলক আছে। আর রাজস্থানে আছে শিখদের দ্বারা তাঁর নামে মন্দির। ঘুমানে থাকায় সময় তিনি ১২৫টি হিন্দি অভঙ্গ (শ্লোক) লেখেন যার মধ্যে ৬১টি অভঙ্গ শিখদের পবিত্র গ্রন্থ '**গুরুগ্রন্থসাহেব**'-এ নামদেবজীকি মুখবাণী রূপে স্থান পেয়েছে।

'গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ সঙ্গি নামদেব মন লেনা
আঠ দাম কো সেপারো এইযে লাখিনা।' (গুরুগ্রন্থসাহেব, পৃ. ৮৭)

অর্থাৎ এই নামদেবের মূল্য কানাকাড়িও নয় কিন্তু গোবিন্দের চরণে মন দেওয়াতেই এই আঠ পয়সার নামদেব লাখপতিরূপে শ্রদ্ধা পাচ্ছে।

নামদেবের বিবাহ হয় এগারো বছর বয়সে আর তাঁদের চার ছেলে এক মেয়ে। তাঁর বড় বোন তাঁদের সঙ্গে থাকতেন। আর থাকতেন জনাবাই নামে দাসীসহ পনেরোজন। অথচ সংসার চলত ভগবানের অনুগ্রহে। তাঁর অনেক ভক্তশিষ্যদের মধ্যে জনাবাই, চোখামেলা আদি সবাই ছিলেন ভগবদ্দ্রষ্টা মহাপুরুষ। আশি বছর বয়স হয়ে গেল নামদেব মহারাজের। অন্তিম সময় সমাগত। নামদেবের ইচ্ছে তাঁর শরীর বিঠ্‌ঠলদেবের মন্দিরের সিঁড়িতে

সমাহিত করা হোক, যাতে তিনি ভক্তপদধূলি সব সময় তাঁর মস্তকে পান। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এই সর্বভূতে ভগবৎ দর্শনকারী মহাপুরুষের দেহ বিঠ্‌ঠলদেবের মন্দিরেই সমাহিত হয়।

ভাবগ্রাহী জনার্দন ! ভক্তের হৃদয়ে ভাব পরিপক্ক হলে তখনই তা আস্বাদনের যোগ্য হয়, ভগবানের আস্বাদনের বিষয় হয়। ভাব 'যেমন একটি ফুলের কারক (কুঁড়ি) তাতে গন্ধ থাকলেও তা থাকে অস্পষ্টভাবে এবং তা আস্বাদনের যোগ্য হয় না। আর ক্রমে যখন কুঁড়িটি প্রস্ফুটিত হয়ে ফুল হয় তখনই তার থেকে গন্ধের বিস্তার হয়, ঠিক সেইরকম ভাবের মধ্যে প্রেম আছে কিন্তু সেই প্রেম পরিস্ফুট নয়। আর প্রেম পরিস্ফুট না হলে গন্ধ পাওয়া যায় না, তাহলে আস্বাদন হবে কীভাবে ! এইজন্য ভাবকে ক্রমশ ক্রমশ আবর্তন বা অনুশীলন করতে হয় যাতে ভাবটি পরিপক্ক হয় আর ভাব পরিপক্ক হয়ে প্রেম হলেই ভগবান ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে তা আস্বাদন করেন। সাধনরূপ আগুনে ভাবকে পুনঃ পুনঃ আবর্তন করতে হয়, অনুশীলন করতে হয় যাতে সেই ভাবই প্রেমরূপী ক্ষীরে পরিণত হয়। সাধনার দ্বারা ভাবের আবর্তন বা অনুশীলন না করলে ভাব ক্রমশ শুকিয়ে যায়।

ভাবের পরিপক্কতায় যেমন আসে 'প্রেম', প্রেমের পরিপক্ক অবস্থায় আসে 'রস'। সেই 'রস' ভক্ত ও ভগবান উভয়কেই গলিয়ে দেয়, এক করে দেয় তখন আর দুই থাকে না। ভগবদ্‌ভক্ত অক্রূরের ভাবের প্রগাঢ়তা ও পরিপক্কতা লাভের প্রয়োজন ছিল। অক্রূরের ব্রজে আগমনে ও ব্রজবাসীগণের সংসর্গে এই ভগবদ্ ভক্তি প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছিল। তাই মথুরা প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে তাঁর স্বরূপ দর্শন করান, যাতে মথুরায় কংস সান্নিধ্য এবং দ্বারকায় শত প্রতিকূলতার মধ্যেও যেন তাঁর ভক্তি অবিচলিত থাকে। তবে অক্রূর যেহেতু ঐশ্বর্যভাবের ভক্ত, মাধুর্যভাবের নয়, তাই অক্রূরকে ঐশ্বর্যরূপেরই দর্শন দেন।

———o———

শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনেচ্ছা—ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতি
(একাদশ স্কন্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়)
প্রাক্‌কথন

ভগবানের অবতার প্রসঙ্গ— ভাগবতে ভগবানের অবতার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

(ভাগবত ১।৩।২৬)

অর্থাৎ অক্ষয় সরোবর হতে যেমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, সেইরকম শুদ্ধ রসাত্মক শ্রীগোবিন্দ হতে অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব হয়ে থাকে। এই অবতারের আবির্ভাব হয় দুটি মূল উদ্দেশ্য নিয়ে।

প্রথম— তিনি প্রকৃতিকে অধীনস্থ করে আসেন। গীতায় তাই ভগবান নিজমুখেই বলেছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ (গীতা ৪।৬)

অর্থাৎ আমি জন্মরহিত, অবিনাশীস্বরূপ এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও যখন অবতার রূপে প্রকট হই তখন প্রকৃতিকে নিজ অধীনস্থ করে যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই।

দ্বিতীয় হল— অবতারদের কর্মবিন্যাসও এক নয়। তাঁরা আসেন নানা কারণে নানা ভাবে, তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে কিছু ঐশ্বর্যের প্রাধান্য নিয়ে। তাই নানা শাস্ত্রও তাঁর ঐসকল অবতার বর্ণনা করেছেন **বহিরঙ্গা প্রধানা, অন্তরঙ্গা প্রধানা** ও **আত্মরঙ্গা প্রধানা** হিসাবে।

বহিরঙ্গা—গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(গীতা ৪।৭-৮)

অর্থাৎ যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান হয় তখনই আমি অবতাররূপে প্রকটিত হই। যুগে যুগে আমার এই অবতাররূপে আবির্ভূত হওয়ার কারণ হল ভক্তগণকে রক্ষা করা, পাপকর্মকারীদের নাশ করা আর ধর্মকে যথাযথ সংস্থাপন করা।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও দেবী চণ্ডিকা বলছেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যামরিসংক্ষয়ম্॥ (চণ্ডী ১১।৫৫)

অর্থাৎ যখনই দানবশক্তির প্রাদুর্ভাববশত জগতের সৃষ্টিতে বিঘ্ন উপস্থিত হয় তখনই আমি অবতীর্ণ হয়ে এই আসুরিক শক্তি নাশ করি।

অন্তরঙ্গা— ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির স্ফুরণ তখনই অবতারের মধ্যে প্রকাশ পায়, যখন ভক্তের পালন ও দুষ্কৃতী দমন ছাড়াও তাঁর প্রেমিক ভক্তরা তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া করতে চান, তাঁর লীলা আস্বাদ করতে চান। ভগবানের অবতাররূপে এইভাবে আবির্ভাবের মূল কারণ হল একান্তি ভক্তের সঙ্গে তাঁর মিলন, তাঁদের প্রেমাস্বাদন বিতরণ। তাই ভগবান পদ্মপুরাণে বলেছেন—

মুহুর্তেনাপি সমহর্তুম হতবান দানবান বলান্।
মন্তানাং বিনোদার্থ করোমি বিবিধা ক্রিয়া॥

অর্থাৎ অসুর নিধন উপলক্ষ মাত্র, তা তো মুহূর্তের ইচ্ছাতেই সম্ভব, কিন্তু আমার অবতার গ্রহণের আসল হেতু হল ভক্তদের সঙ্গে লীলা-রসের আস্বাদন।

রাসলীলাতেও ভক্তচূড়ামণি শ্রীশুকদেব বলছেন—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

(ভাগবত ১০।৩৩।৩৭)

অর্থাৎ ভগবানের সকল লীলা ভক্তানুগ্রহের জন্য। তিনি মানুষী তনুর সব

লীলাই করে থাকেন ভক্তদের তাঁর দিকে আকর্ষিত করার জন্য।

আত্মরঙ্গা —আবার ভগবান কখনো কখনো লীলাবতার করেন নিজ প্রেমরস আস্বাদনের জন্য। কলিপাবনাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইরূপে আবির্ভূত, তাঁর রসরাজ মহাভাবরূপ। এই অবতারে ভগবানের বহিরঙ্গা, অন্তরঙ্গা ও আত্মরঙ্গা তিন ভাবই বিরাজমান।

চৈতন্যচরিতামৃতকার বলছেন—

বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সংকীর্তন।

অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস আস্বাদন॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আর ভক্তকবি বলছেন—

রাধার প্রেমের ঋণ শোধ হবে সেদিন

নবদ্বীপে যেদিন গৌর হবেন হরি।

সাধের গোলোক ত্যেজে পথের কাঙ্গাল সেজে

ধুলায় পড়ে ঠাকুর দেবেন গড়াগড়ি॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণর লীলার কাল—

আবির্ভাব—মথুরায়, শ্রাবণ কৃষ্ণা অষ্টমী, রোহিণী নক্ষত্র, মঙ্গল-বুধবার রাত্রি ১.৩০। ৮ সেপ্টেম্বর খ্রিস্টপূর্ব ৩২০৮ (ইংরাজি ২০১৩ সালের হিসাবে ৫২২০ বৎসর পূর্বে)।

তিরোভাব— দ্বারকায়, শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশী, রবিবার বৈকাল ৩.২৫ ঘটিকায়। ২০ আগস্ট খ্রিস্টপূর্ব ৩১০২ (ইংরাজি ২০১৩ সালের হিসাবে ৫১১৫ বৎসর পূর্বে)।

শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চভৌতিক দেহে ছিলেন ১০৫ বৎসর ১১ মাস ১২ দিন।

শ্রীরাধিকা পাঞ্চভৌতিক দেহে ছিলেন ৬৫ বৎসর ৭ মাস।

মহাভারত যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ৭১ বৎসর ৪ মাস।

শ্রীকৃষ্ণের দেহান্তের ৬৫ বৎসর পর মহাভারত রচিত হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণের দেহান্তের ৬ ঘণ্টা পরে অর্জুন হস্তিনাপুর থেকে এসে উপস্থিত হন ও পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন করেন।

ভগবানের এই প্রাপঞ্চিক অবতারের অসংখ্য লীলার মধ্যে ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলার কিছু প্রধান লীলার বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের নব্বইটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্রজলীলা (১—৪০ অধ্যায়)—শ্রীকৃষ্ণর কংস কারাগারে জন্ম ও তাঁকে নন্দগোপ গৃহে (বৃন্দাবনের গোকুলে) আনয়ন এবং তৎপরে পূতনা বধ, শকট ভঞ্জন ও তৃণাবর্ত বধ, দামোদর লীলা ও যমলার্জুন উদ্ধার, বৎসাসুর ও বকাসুর বধ। অঘাসুর বধ ও ব্রহ্মার মোহনাশলীলা, ধেনুকাসুর বধ, দাবাগ্নি মোক্ষণ, প্রলম্বাসুর বধ। গোপীদের বস্ত্রহরণ, যাজ্ঞিক পত্নীদের প্রতি কৃপা ও গোবর্ধন ধারণ এবং ইন্দ্র ও সুরভি কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, সুদর্শন উদ্ধার ও শঙ্খচূড় বধ, অরিষ্টাসুর বধ ও ব্যোমাসুর বধ।

মথুরালীলা (৪১—৫০ অধ্যায়)—শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় প্রবেশ, কুব্জাকে অনুগ্রহ, কুবলয়পীড় (রাজহস্তী) বধ, চাণুর ও মুষ্টিক (মল্ল) বিনাশ, কংস বধ, জরাসন্ধের সঙ্গে সংঘর্ষ ও দ্বারকাপুরী নির্মাণ।

দ্বারকালীলা (৫১—৯০ অধ্যায়)—কালযবন বিনাশ, রুক্মিণী হরণ ও কৃষ্ণ-রুক্মিণী বিবাহ, শম্বরাসুর বধ, কালিন্দী, জাম্ববতী, সত্যভামা, নাগ্নজীতি আদির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ। সুর ও নরকাসুর বধ। বাণ কর্তৃক অনিরুদ্ধর বন্ধন ও বাণরাজার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ, পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজ বধ। বলরামের সঙ্গে দ্বিবিধ বানরের যুদ্ধ। জরাসন্ধ বধ, শিশুপাল বধ, শাল্ব বধ, কৃষ্ণের সুদামা বিপ্রর প্রতি সেবা। শ্রীকৃষ্ণের যদুকুল সংহার ও প্রাকৃতিক দেহ ত্যাগের ইচ্ছা, অর্জুনকে হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকায় আহ্বান।

দেবতাদিগের দ্বারকায় আগমন ও স্তুতি—ভগবানের আদর্শে ভক্তগণের মন গঠিত, তাঁরা আর কিছু চায় না, চায় কেবল ভগবৎসান্নিধ্য। তারা আর সব সহ্য করতে পারে, সহ্য করতে পারে না কেবল ভগবানের বিরহ। ভগবান তাঁর শ্রীকৃষ্ণ অবতারের লীলা শেষ করে স্বীয় ধামে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে, তাঁর সে ইচ্ছাতন্ত্রীর ঝংকার ভক্তহৃদয়ে গিয়ে পৌঁছল। ভক্ত ও ভগবান একই তনু, সুতরাং ভগবানের ভাব ভক্ত হৃদয়ে প্রতিফলিত হবে, এতে আর আশ্বর্য কী ? ভগবানের তিরোধান ইচ্ছা ব্রহ্মাদির হৃদয়ে পৌঁছল। তখন সনকাদি

আত্মজ, সকল দেবতা ও প্রজাপতিগণসহ ব্রহ্মা এবং ভূতগণসহ ভূতপতি শংকর দ্বারকায় গমন করলেন। তারপর মরুদ্‌গণসহ ইন্দ্র, আদিত্যগণ, বসুগণ, অঙ্গিরাগণ, রুদ্রগণ, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ, ঋষি ও পিতৃগণ—সকলেই কৃষ্ণদর্শন কামনায় দ্বারকায় আগমন করলেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ স্বর্গোদ্যানজাত কুসুমমাল্যে যদুপতিকে আচ্ছাদিত করে বিচিত্র পদ ও অর্থযুক্ত বাক্যে জগদীশকে স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতি (৭—১৯)

নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং
বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈ-
র্মুমুক্ষুভিঃ কর্মময়োরুপাশাৎ॥ ৭

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্‌গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিত কর্মভিরজ্যতে বৈ
যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ॥ ৮

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ॥ ৯

স্যান্নস্তবাঙ্‌ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ
ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভি-
র্ব্যূহেঽর্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায়॥ ১০

যশ্চিন্ত্যতে প্রয়তপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ
ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।

অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং
জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ॥ ১১
পর্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং
সংস্পর্দ্ধিনী ভগবতী প্রতিপত্নীবচ্ছ্রীঃ।
যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদন্নো
ভূয়াৎ সদাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ॥ ১২
কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতস্ত্রিপতৎপতাকো
যস্তে ভয়াভয়করোঽসুরদেবচম্বোঃ।
স্বর্গায় সাধুষু খলেষ্বিতরায় ভূমন্
পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ॥ ১৩
নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্যমানাঃ।
কালস্য তে প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য॥ ১৪
অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ।
সোঽয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ
কালো গভীররয় উত্তমপূরুষস্ত্বম্॥ ১৫
ত্বত্তঃ পুমান্ সমধিগম্য যয়াস্য বীর্যং
ধত্তে মহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্যঃ।
সোঽয়ং তয়ানুগত আত্মন অণ্ডকোশং
হৈমং সসর্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্॥ ১৬
তৎ তস্থুষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো
যন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়য়োপনীতান্ ।
অর্থান্ জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো
যেঽন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্ম॥ ১৭

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈ-
র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্ব্যঃ॥ ১৮
বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্‌ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ-
স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি॥ ১৯

সরলার্থ— দেবতারা প্রার্থনা করে বললেন, হে সর্বময়কর্তা ! কর্মের কঠোর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কামনায় মুমুক্ষুজন ভাব-ভক্তি সহযোগে যার স্মরণ-মনন করে থাকেন, আপনার সেই পাদপদ্মে আমরা নিজ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বাণীর দ্বারা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করছি। আমরা ধন্য ! ৭ ॥ হে অজিত ! আপনি মায়িক রজঃ আদি গুণে স্থিত হয়েও নিজ ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা সৃষ্ট নাম-রূপযুক্ত প্রপঞ্চের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। কর্ম করেও আপনি কর্মে নির্লিপ্ত থাকেন ; কারণ আপনি রাগ (আসক্তি)-দ্বেষাদি দোষসকল থেকে সর্বত মুক্ত এবং নিজ নিরাবরণ অখণ্ড স্বরূপভূত পরমানন্দে মগ্ন রয়েছেন॥ ৮ ॥ হে স্তুতিযোগ্য পরমাত্মা ! যাঁদের চিত্তবৃত্তি রাগ (আসক্তি)-দ্বেষাদি কলুষমণ্ডিত তাঁরা বেদ অধ্যয়ন, দান তপস্যা এবং যজ্ঞ সম্পাদন করলেও তাঁদের শুদ্ধি শ্রবণপুষ্ট শুদ্ধান্তকরণ ব্যক্তিদের স্তরে কখনো পৌঁছতে পারে না ; কারণ এই শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিগণ আপনার লীলাকথা ও কীর্তি শ্রবণপূর্বক উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরিপূর্ণতা লাভের শ্রদ্ধায় যুক্ত থেকে এক সুউচ্চ ভূমিতে অবস্থান করে থাকেন॥ ৯ ॥ আপনার পাদপদ্মের মাহাত্ম্য অসীম। মননশীল মুমুক্ষুগণ মোক্ষপ্রাপ্তি কল্পে নিজ প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে তা ধারণ করে বিচরণ করে থাকেন। পাঞ্চরাত্র বিধি অনুসরণকারী ভক্তসদৃশ ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে যাঁর উপাসনা করেন, জিতেন্দ্রিয় আত্মস্থ ব্যক্তিগণ স্বর্গলোক অতিক্রমণ পূর্বক ভগবদ্ধাম প্রাপ্তির মানসে ত্রিসন্ধ্যা যাঁর

পূজা করে থাকেন, যাজ্ঞিক ব্যক্তিগণও ত্রিবেদ নির্দেশিত বিধি দ্বারা নিজ সংযত হস্তে হবিষ্য ধারণ করে যজ্ঞ-কুণ্ডে আহুতি দিয়ে তাঁরই ধ্যানে প্রীতি মনোনিবেশ করেন। আপনার আত্মস্বরূপে যুক্ত জিজ্ঞাসু যোগিগণ হৃদয়ের গভীরে আধ্যাত্মযোগ সহকারে যাঁর ধ্যান করে থাকেন, আর পরম প্রেমযুক্ত আপনার ভক্তগণ আপনাতেই পরমারাধ্য ইষ্টজ্ঞানে মগ্ন থাকেন। আপনার সেই পাদপদ্ম আমাদের বাসনাসকলের ভস্মীভূত করবার জন্য অগ্নিস্বরূপ হোক এবং আমাদের পাপ-তাপ সমুদায় ভস্ম করে দিক॥ ১০-১১ ॥ এই পদ্মাসনা লক্ষ্মী আপনার বক্ষঃস্থলে ধারিত বিশুষ্ক পর্যুষিত বৈজয়ন্তীমালাকেও সতীন জ্ঞানে ঈর্ষা করেন। তবুও আপনি তাঁর সংশয়কে আমল না দিয়ে ভক্তের দেওয়া সেই বিশুষ্ক মালা পূজারূপে প্রেমপূর্বক স্বীকার করে থাকেন। হে প্রভু! অন্তরে এই মনোবাসনা যে, ভক্ত-বৎসল প্রভুর পাদপদ্ম সর্বদা আমাদের বিষয়-বাসনাকে ভস্মসাৎ করবার জন্য অগ্নিস্বরূপ হোক॥ ১২ ॥ হে অনন্তশয়ান ! বামনাবতারে দৈত্যরাজ বলির দেওয়া ভূমি পরিমাপন কালে আপনি আপনার চরণপদ্ম যখন প্রসারিত করেছিলেন তখন আপনার দ্বিতীয়পদ সত্যলোকেও পৌঁছেছিল। তা দেখে মনে হয়েছিল যেন বিশাল জয়পতাকা উড়ছে। ব্রহ্মার পাদপ্রক্ষালন কার্য শেষে পাদসম্ভূত গঙ্গার ত্রিধারায় প্রবাহিত জলরাশিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনটি পতাকা একযোগে উড্ডীয়মান। তাই দেখে একদিকে অসুরসেনা ভীত ও অন্যদিকে দেবসেনা আশ্বস্ত হয়েছিল। আপনার সেই পাদপদ্ম সাধু-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপনারই বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্তির অনুভূতি দেয় এবং দুষ্টদের যথাযোগ্য অধোগতির কারণ হয়। হে ভগবন্ ! আপনার সেই পাদপদ্মযুগল আমাদের মতন ভজনকারীদের সমস্ত পাপ-তাপ সম্মার্জন করুক, এই প্রার্থনা করি॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মাদি শরীরধারীগণ সত্ত্ব, রজ, তম— এই ত্রিগুণের পরস্পরবিরোধী ত্রিবিধ ভাবের তারতম্যে প্রাণ-ধারণ ও প্রাণ-ত্যাগ করেন। তাঁরা সুখ-দুঃখের গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত এবং বাধ্য পোষ্য বলদের মতন আপনার বশীভূত। আপনি তাঁদের জন্যও কালস্বরূপ। তাঁদের জীবনের আদি, মধ্য, অন্ত আপনারই অধীন। তদুপরি

আপনি প্রকৃতি এবং পুরুষ অবস্থার ঊর্ধ্বে স্থিত স্বয়ং পুরুষোত্তম। আপনার পাদপদ্মযুগল আমাদের কল্যাণ করুক॥ ১৪ ॥ হে প্রভু! আপনি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-এর উপাদান-কারণস্বরূপ ; কারণ শাস্ত্রের বিধানানুসারে আপনি প্রকৃতি, পুরুষ এবং মহত্তত্ত্বর নিয়ন্ত্রণকর্তা মহাকাল। শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা-কালরূপ তিন অক্ষাগ্রকীলক যুক্ত সংবৎসরের রূপধারী, সকলকে ক্ষয় অভিমুখে ধাবিত করার কাল আপনিই। আপনার গতি অবাধ ও গম্ভীর। আপনি স্বয়ং পুরুষোত্তম॥ ১৫ ॥ আদি পুরুষ আপনার শক্তিতে অমোঘবীর্য হয়ে মায়ার সঙ্গে মিলিত হয় এবং বিশ্বের মহত্তত্ত্বরূপ গর্ভ তাহাতে স্থাপন করে। তারপর সেই মহত্তত্ত্ব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অনুসরণ করে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহংকার এবং মনরূপ সপ্ত আবরণযুক্ত সুবর্ণময় ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে॥ ১৬ ॥ অতএব হে হৃষীকেশ! আপনি সমস্ত জগৎ চরাচরের অধীশ্বর। তাই আপনি মায়ার গুণবৈপরীত্য হেতু উদ্ভূত পদার্থসমুদায় উপভোগ করেও তাতে লিপ্ত হন না। এটা কেবল আপনার পক্ষেই সম্ভব। অন্যরা তা ত্যাগ করেও বিষয় থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন॥ ১৭ ॥ আপনার নিবাস ষোড়শ সহস্র রাজমহিষীগণের মধ্যে। তাঁরা সকলে স্মিতহাস্য, কটাক্ষ প্রেক্ষণ, মনোহর ভ্রু সঞ্চালন এবং রতিরঙ্গ সহযোগে প্রৌঢ় সম্মোহক কামবাণ নিক্ষেপ এবং কামকলার বিবিধ রীতি প্রয়োগ করে আপনার মন আকর্ষণ করার চেষ্টায় যুক্ত থাকেন কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁদের পরিপুষ্ট কামবাণ প্রয়োগ করেও আপনার মন চঞ্চল করতে সফল হন না। তাঁদের প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় না॥ ১৮ ॥ আপনি ত্রিলোকের পাপরাশিকে বিধৌত করবার জন্য দুই পবিত্র ধারাপ্রবাহ উন্মুখ রেখেছেন—প্রথম আপনার অমৃতময়ী লীলাতে পরিপূর্ণ কথানদী এবং দ্বিতীয় আপনার পাদপ্রক্ষালন জলজাত গঙ্গা নদী। সৎসঙ্গসেবী বিবেকযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্ণদ্বার দ্বারা কীর্তিকথা নদীতে এবং শরীর দ্বারা গঙ্গা নদীতে অবগাহন করে দুই তীর্থেরই সেবন করেন ও নিজ পাপ-তাপ নিবারণ করেন॥ ১৯ ॥

মূলভাব—চরণদর্শন, যশশ্রবণ ও স্মরণ—দেবগণ স্তুতি করে বলছেন, হে পূজ্য! আপনার চরণবন্দনা, কীর্তিকলাপ, যশ শ্রবণ ও স্মরণ দ্বারা যে

প্রকার সাত্ত্বিক শুদ্ধি হয় অন্য কোনো প্রকারেই তা হয় না। শ্রবণ ও স্মরণ দ্বারা শ্রদ্ধা জন্মে, আর এইপ্রকার জাত শ্রদ্ধা ভিন্ন আত্মশুদ্ধির অন্য উপায় নেই। বিদ্যায়ও শুদ্ধি হতে পারে, কিন্তু যারা দুরাশয় তাদের বিদ্যা গর্ব এনে দেয় তাই তাদের সর্ববিধ বিদ্যাশ্রম ব্যর্থ হয়ে থাকে। আবার কেবলমাত্র ভগবানের চরণদর্শনেও ভক্তির উদয় হয়, আর তা যশশ্রবণ ও স্মরণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাহলেও শাস্ত্রাদিমুখে তাঁর লীলা শ্রবণে ও স্মরণে সেই ভক্তি প্রকৃষ্ট রূপে বর্ধিত হয়। এই প্রবৃদ্ধ ভক্তিতে মানবের কামনা-বাসনার লেশমাত্র থাকে না, জন্ম, মুক্তি ও নরককে তুল্য জ্ঞান হয়, ভক্ত নারায়ণপরায়ণ হয়ে কেবল তাঁর কিঙ্করত্ব কামনা করে। তখন অন্য কোনো কামনা তো থাকেই না কিন্তু স্বর্গাদি বাসনা পরিত্যাগের উপায় প্রাপ্তির জন্য নিত্য অচ্যুতের চরণার্চনার ইচ্ছা বলবৎ থাকে। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ ভগবানের নিকট বর প্রার্থনা করেছিলেন যে হৃদয়ের কামনার বীজ যেন না জন্মে। সাধন স্তরে এই বর প্রার্থনা ভগবদ্ভক্তের সাধনদশায় অতীব শিক্ষণীয়।

সাধন ধারা—জ্ঞান-যোগ-ভক্তিমার্গ—শ্রীভগবান ভক্ত দ্বারা যেমন পূজিত হন, ভক্তিমান জ্ঞানীগণ দ্বারাও সেইরূপ পূজিত হন। জ্ঞানীগণ করজোড়ে ঘৃত গ্রহণপূর্বক আহ্বানীয়াদি যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে ভাবেন—ভগবানেরই একাংশ, তদীয় বাহু-বিভূতি স্বরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণ হয়ে তা গ্রহণ করছেন, আর এই ভক্তিময় ভাবনায় তাঁরা ভগবানের সমীপেই উপনীত হন। আধ্যাত্ম যোগমার্গেও ভগবানের মায়তরণের উপায় আছে। যোগীর যে মায়া হতে উত্তরণ, তার মূলীভূত কারণ হল জিজ্ঞাসা। কিন্তু যারা পরম ভাগবত ও প্রেমভক্তির উপাসক, তাঁরা সর্বতোভাবে নিষ্কাম হয়ে ভগবানের প্রতি ভালোবাসার সম্বন্ধ স্থাপন করেন। দেবগণ স্তুতি করে বলছেন—**'সদা স্যন্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ'** (১১।৬।১২) অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমার চরণকমল আমাদের সর্ববিধ বিঘ্ননাশের ধূমকেতু স্বরূপ হোক।

ভগবানের পাদপদ্ম— শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য এমনই অপূর্ব যে, ঐকান্তিক ভক্ত প্রদত্ত পর্যুষিত পুষ্পেও তিনি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না। গীতায় ভগবানই বলেছেন, ভক্তের ভক্তির সহিত প্রদত্ত পত্র-পুষ্প-জল-ফল আমি সাদরে গ্রহণ করে থাকি। ভগবৎ পাদপদ্মের ভক্তপক্ষপাতিত্ব প্রসিদ্ধ, তা ভক্তজনের বিজয়ধ্বজ স্বরূপ। বামন অবতারে বলি বিজয়ের জন্য তিনি ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল আবৃত করে একটি পাদ বলির মস্তকে বিন্যস্ত করেন। শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম দেবগণের অভয় ও দানবগণের ভয়প্রদ। শ্রুতি বলেছেন—ভগবানের পবিত্র অনাদি পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়ে দুষ্কৃতিকারীরাও পবিত্র হয়।

ভগবান পুরুষোত্তম—ভগবানের একটি নাম পুরুষোত্তম। যিনি উত্তম, তিনি অখিলের প্রণম্য। তিনি সকলের বৃহৎ, তাই তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মাদি দেবগণ গুণের বাধ্য, কিন্তু তিনি গুণাতীত। পরমাত্মার তদীয় অংশ মর্ত্যাদি দেহে বিষয়ভোগ করেও তাতে লিপ্ত হন না। এক একটি মোহিনীমূর্তি ব্রহ্মাদি দেবগণকে মোহিত করে ফেলে, কিন্তু কৃষ্ণের একটি-দুটি নয়, উক্তরূপ ষোড়শ সহস্র নারীও তাঁর মন মথন করতে পারেনি তাই তিনি 'পুরুষোত্তম'। সর্ব পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, গুণময় দেব-মানুষের মতো এই সকল জাগতিক রূপে আকৃষ্ট হন না, কিন্তু শুদ্ধ প্রেমশৃঙ্খল তাঁর চরণে পরিয়ে দিতে পারলে তিনি আবদ্ধ হয়ে থাকেন। দেবগণ এই প্রসঙ্গে তাঁদের স্তুতিতে বলছেন—

'বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্'।

(ভাগবত ১১।৬।১৯)

অর্থাৎ হে ভগবন্ ! আপনার অমৃতরূপী কীর্তিকথা আপনার পাদ-প্রক্ষালনজাত গঙ্গার ন্যায় ত্রিলোকেরই পাপ হরণ করে।

মহেশসমভিব্যাহারী হয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবান গোবিন্দের এইরূপে স্তব করে শূন্যমার্গ আশ্রয় করে পুনর্বার প্রণামপূর্বক প্রার্থনা করতে প্রবৃত্ত হলেন।

ব্রহ্মার স্তুতি (২১—২৭)

ভূমের্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো।
ত্বমস্মাভিরশেষাত্মন্ তৎ তথৈবোপপাদিতম্॥ ২১
ধর্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্বয়া।
কীর্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্বলোকমলাপহা॥ ২২
অবতীর্য যদোর্বংশে বিভ্রদ্ রূপমনুত্তমম্।
কর্মাণ্যুদ্দামবৃত্তানি হিতায় জগতোঽকৃথাঃ॥ ২৩
যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ।
শৃণ্বন্তঃ কীর্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসা তমঃ॥ ২৪
যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো॥ ২৫
নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্যাবশেষিতম্।
কুলং চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্॥ ২৬
ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে।
সলোকাঁল্লোকপালান্ নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্॥ ২৭

সরলার্থ — ব্রহ্মা বললেন, হে সর্বাত্মপরায়ণ প্রভু ! পূর্বে আমরা আপনাকে অবতাররূপ ধারণ করে ভূভার লাঘবের প্রার্থনা করেছিলাম। আপনি আমাদের প্রার্থনানুসারে সেই কার্য সুচারুভাবে সম্পাদন করেছেন॥ ২১ ॥ আপনি সত্যনিষ্ঠ সাধুব্যক্তিদের কল্যাণ হেতু ধর্ম সংস্থাপিত করেছেন এবং দিগ্‌দিগন্তে আপনার কীর্তি প্রসারের ব্যবস্থা করেছেন যা শ্রবণ করে সকলে মনের আবিলতা অপসারণে সক্ষম হয়॥ ২২ ॥ আপনি এই সর্বোত্তম রূপ ধারণ করে যদুবংশে অবতার হয়ে জগৎকল্যাণে উদারতা এবং পরাক্রম সমৃদ্ধ প্রভূত লীলাভিনয় করলেন॥ ২৩ ॥ হে প্রভু ! কলিযুগে যে সদভিপ্রায় ব্যক্তিগণ আপনার এই সকল লীলার শ্রবণ-কীর্তন করবেন তাঁরা নিশ্চিতভাবে এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে অতিক্রম করতে পারবেন॥ ২৪ ॥ হে পুরুষোত্তম ! হে সর্বশক্তিমান প্রভু ! আপনার যদুবংশে অবতাররূপে আগমনের একশত পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে॥ ২৫ ॥ হে সর্বাধার, ধরণীধর ! আমাদের আর কোনো এমন কর্ম অবশিষ্ট নেই যা চরিতার্থ করবার নিমিত্ত আপনার

এখানে অবস্থান করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণদের অভিশাপে আপনার এই যদুকুল যেন ধ্বংস হয়েই গেছে॥ ২৬ ॥ অতএব হে বৈকুণ্ঠনাথ ! যদি আপনি সমুচিত মনে করেন তাহলে পরমধামে প্রত্যাগমন করুন এবং আপনার সেবক আমাদের উপর ন্যস্ত মতো লোকপালদের এবং আমাদের উপর ন্যস্ত লোকাদির লালন-পালন করুন॥ ২৭ ॥

মূলভাব—ভগবান তো কিছুরই বাধ্য নহেন, তবে তিনি এতকাল মর্ত্যধামে—কখনো বৃন্দাবনে, কখনো মথুরায়, কখনো দ্বারকায়, কখনো বা নন্দালয়, কখনো বসুদেবগৃহ আবার কখনো বা দ্বারকারমণীগণের নিকট আবদ্ধ হয়ে রইলেন কেন ? তিনি তো বাধ্যবোধক সম্বন্ধে কারও নিকট আবদ্ধ নহেন ! কারণ অবশ্যই আছে আর তা হল তাঁর সেই দয়ামূর্তি, যা প্রসাদ দানে, চরণামৃত বিতরণে, সকল চরাচর চরিতার্থ ও পবিত্র করার জন্য তিনি আবদ্ধের ন্যায় এই সংসারে লীলাবতার করেন। ব্রহ্মা বলছেন—**'যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ। শৃন্বন্তঃ কীর্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসা তমঃ॥'** (ভাগবত ১১।৬।২৪)। হে ঈশ ! কলিকালে আপনার সেই সকল কার্য শ্রবণ ও কীর্তন করে সত্তমগণ সত্বর পাপ হতে পরিত্রাণ লাভ করেন। অবশেষে ব্রহ্মা ও অন্য সকল দেবাদিগণ তাঁকে স্তুতি করে বললেন—হে জগধীশ ! হে পুরুষোত্তম ! হে বিভো ! যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে আপনার একশো বছরের ওপর অতিবাহিত হয়ে গেছে। হে অখিল-আধার ! সম্প্রতি আপনার দেবকার্য সাধনেরও আর কিছু অবশিষ্ট নেই এবং বিপ্রশাপে যদুকুলও নষ্টপ্রায় হয়েছে। হে প্রভো ! আপনি স্বীয়ধামে প্রবেশ করুন, আর যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে লোক এবং লোকপালসহ হে বৈকুণ্ঠকিঙ্কর ! আমাদের রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা ও অন্য সকল দেবাদি দ্বারা এইভাবে স্তুত হয়ে ভগবান বললেন—হে দেবাধীশ ! আপনি যা বলেছেন তা পূর্বেই আমি নিশ্চয়ই করেছি। আর লোকরক্ষার জন্য শৌর্যবীর্যে উদ্ধত যাদবগণকেও আমি নিরুদ্ধ করেছি। আমি যদি উদ্ধত এই যদুকুলকে সংহার না করে প্রস্থান করি তা হলে তারাই উদ্বেল হয়ে এ জগৎ পীড়নে রত হত।

ভগবান লোকনাথ কর্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হয়ে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁকে প্রণাম পূর্বক দেবগণসহ স্বীয়লোকে গমন করলেন।

অতঃপর ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ও কৃষ্ণমায়ামোহিত এই সব যাদবগণের স্পর্ধাজনিত ক্রোধ, যেমন বংশ হতে জাত বহ্নি বন দগ্ধ করে সেইরকম এই ক্রোধই সমস্ত যাদবকুল ধ্বংস করল। এইরূপ স্বীয় বংশীয় সমস্ত যাদবকুল নিঃশেষরূপে নষ্ট হলে ভগবান কেশব ভূভার অবতারিত হয়েছে বলে মনে করলেন। এরপরে বলরামও পরমপুরুষের ধ্যানরূপ যোগ অবলম্বন করে আত্মায় আত্ম-সংযোগ করে সমুদ্রতটে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্য দেহত্যাগ— বলরামের মহাপ্রস্থানে দেবকীতনয় শ্রীকৃষ্ণ শোকে তুষ্ণীভাব অবলম্বনপূর্বক চতুর্ভুজরূপ ধারণ করে অশ্বত্থ তরুর নীচে উপবিষ্ট হলেন। ভক্তচূড়ামণি শ্রীশুকদেব তাঁর এইরূপ বর্ণনা করে বলছেন—

বনমালাপরীতাঙ্গং মূর্তিমদ্ভির্নিজায়ুধৈঃ।
কৃত্বোরৌ দক্ষিণে পাদমাসীনং পঙ্কজারুণম্॥

(ভাগবত ১১।৩০।৩২)

অর্থাৎ তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গলায় বনমালা, হস্তে চক্রগদাদি অস্ত্র। তিনি তাঁর কমলতুল্য লোহিত বামচরণ দক্ষিণ উরুদেশে রক্ষিত করে সমাসীন হলেন। ইতিমধ্যে যাদবগণ কর্তৃক চূর্ণিত মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ড দ্বারা জরা নামক এক ব্যাধ শর নির্মাণ করেছিল। সে সেই শর দ্বারা কৃষ্ণের মৃগ মুখাকার বর্ণের চরণকে মৃগের মুখ মনে করে বিদ্ধ করল। অনন্তর জরা ব্যাধ চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে দেখে বুঝল যে সে মহৎ পাপ করেছে এবং ভীত হয়ে কৃষ্ণের পা দুটো ধরে নিবেদন করল—

অজনতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন।
ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমশ্লোক মেহনঘ॥

(ভাগবত ১১।৩০।৩৫)

হে মধুসূদন ! আমি পাপী, না জেনে এই পাপ করেছি, হে অপাপবিদ্ধ উত্তমঃ শ্লোক ! আমার পাপের ক্ষমা করুন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তুমি ভয় করো না, তুমি আমার অভিলষিত কার্যই সম্পন্ন করেছো। তুমি পুণ্যবানদের স্বর্গে গমন করো। **অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নশ্বরদেহ ত্যাগ করলেন।**

———०———

॥ শ্রীহরিঃ ॥

যখন কোনো বাক্য বা বাক্যাংশ স্বস্থান থেকে আলাদা করা হলেও তাঁর দ্বারা কোনো অনুভব, উপদেশ প্রভৃতির জ্ঞান হয় তাকে 'সুক্তি' বলা হয়। বর্তমান 'স্তুতি' পুস্তকের বিভিন্ন সুক্তি অনুক্রমণিকা অনুসারে উদ্ধৃত হল

বেদ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

শ্রীশ্রীচণ্ডী

ক্রমাঙ্ক	শ্লোক	অধ্যায়/স্কন্ধ	পৃষ্ঠা

ভাগবত

অ

উপনিষদ্

মহাভারত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ক্রমাঙ্ক	শ্লোক	অধ্যায়/স্কন্ধ	পৃষ্ঠা

পুরাণ ও অন্যান্য

———o———

॥ শ্রীহরি ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) 1118 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে**
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা
গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা

(২) 763 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) 1577 **শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম খণ্ড)**

(৪) 1744 **শ্রীমদ্ভাগবত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৫) 1574 **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (প্রথম খণ্ড)**

(৬) 1660 **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৭) 1662 **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**

(৮) 556 **গীতা-দর্পণ**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৯) 13 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**
অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থসহ সরল অনুবাদ।

(১০) 496 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**
মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(১১) 1736 **গীতা প্রবোধনি** (লেখক—স্বামী রামসুখদাস)

(১২) 1393 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (বোর্ড বাইন্ডিং)

(১৩) 1444 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**
অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

কোড নং

(১৪) 395 গীতা-মাধুর্য

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(১৫) 1851 গীতা রসামৃত

(১৬) 1901 সাধন-সমর বা দেবী মাহাত্ম্য

(১৭) 1937 শিবপুরাণ

(১৮) 1455 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (লঘু আকারে)

(১৯) 1883 শ্রীরামচরিতমানস (তুলসীদাসী রামায়ণ)

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত, অখণ্ড সংস্করণ, সম্পূর্ণ নূতনরূপে অনুদিত।

(২০) 275 মানুষ কর্ম করায় স্বাধীন, নাকি পরাধীন ?

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(২১) 1456 ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(২২) 1469 সর্বসাধনার সারকথা

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(২৩) 1119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(২৪) 1305 প্রশ্নোত্তর মণিমালা

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(২৫) 1102 অমৃত-বিন্দু

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(২৬) 1115 তত্ত্বজ্ঞান কী করে হবে ?

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

(২৭) 1925 ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মহত্ত্ব

(২৮) 1936 ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস

কোড নং

(২৯) 1358 **কর্ম রহস্য**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'**—সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(৩০) 1122 **মুক্তিলাভের জন্য গুরুকরণ কি অপরিহার্য ?**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

(৩১) 276 **পরমার্থ পত্রাবলী**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(৩২) 816 **কল্যাণকারী প্রবচন**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(৩৩) 1460 **বিবেক চূড়ামণি (মূলসহ সরল টীকা)**

শ্রীমৎ শংকরাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(৩৪) 1454 **স্তোত্ররত্নাবলী**

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(৩৫) 1603 **উপনিষদ্**

(৩৬) 1604 **পাতঞ্জলযোগ**

(৩৭) 903 **সহজ সাধনা**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সাধন পথের সহজতম দিক্-দর্শন।

(৩৮) 312 **আদর্শ নারী সুশীলা**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(৩৯) 1415 **অমৃত-বাণী**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৪০) 1541 **সাধনার দুটি প্রধান সূত্র**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(৪১) 1478 **মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

বিভিন্ন সাধন-মার্গের নির্বাচিত ২০টি প্রবচনের এক অমূল্য সংগ্রহ।

কোড নং

(৪২) 1651 হে মহাজীবন ! হে মহামরণ !!
স্বামী রামসুখদাস মহারাজের স্বপ্রসঙ্গের নির্দেশাবলী।

(৪৩) 1306 কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৪৪) 955 তাত্ত্বিক-প্রবচন
লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(৪৫) 428 আদর্শ গার্হস্থ জীবন
লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(৪৬) 296 সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা

(৪৭) 1359 পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি

(৪৮) 1884 ঈশ্বর লাভের বিবিধ উপায়

(৪৯) 1303 সাধকদের প্রতি

(৫০) 1579 সাধনার মনোভূমি

(৫১) 1580 অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়

(৫২) 1581 গীতার সারাৎসার

(৫৩) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন

(৫৪) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী

(৫৫) 1513 মূল্যবান কাহিনী

(৫৬) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম

(৫৭) 956 সাধন এবং সাধ্য

(৫৮) 1489 গীতা দিনলিপি (November to January of every year)

(৫৯) 1293 আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

(৬০) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি

(৬১) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব

(৬২) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া

(৬৩) 443 সন্তানের কর্তব্য

(৬৪) 469 মূর্তিপূজা

(৬৫) 849 মাতৃশক্তির চরম অপমান

(৬৬) 1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা

(৬৭) 1742 শরণাগতি

(৬৮) 762 গর্ভপাতের পরিণাম ? একবার ভেবে দেখুন

(৬৯) 1075 ওঁ নমঃ শিবায়

(৭০) 1043 নবদুর্গা

(৭১) 1096 কানাই

	কোড নং	
(৭২)	1097	গোপাল
(৭৩)	1098	মোহন
(৭৪)	1123	শ্রীকৃষ্ণ
(৭৫)	1292	দশাবতার
(৭৬)	1439	দশমহাবিদ্যা
(৭৭)	1652	নবগ্রহ
(৭৮)	1787	মহাবীর হনুমান
(৭৯)	1495	ছবিতে চৈতন্যলীলা
(৮০)	1888	জয় শিব শংকর
(৮১)	1889	স্বনামধন্য ঋষি-মুনি
(৮২)	1891	রামলালা
(৮৩)	1892	সীতাপতি রাম
(৮৪)	1893	রাজা রাম
(৮৫)	1977	ভগবান সূর্য
(৮৬)	330	ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৮৭)	1496	পরলোক ও পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা
(৮৮)	1659	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম
(৮৯)	1881	হনুমানচালীসা (মূলপাঠ, অর্থসহ)
(৯০)	1880	হনুমানচালীসা (মূলপাঠ)
(৯১)	1852	রামরক্ষাস্তোত্র
(৯২)	1356	সুন্দরকাণ্ড
(৯৩)	1322	শ্রীশ্রীচণ্ডী
(৯৪)	1743	শ্রীশিবচালীসা
(৯৫)	1785	ভাগবতের মণিমুক্তা
(৯৬)	1786	মূল শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয়রামায়ণম্
(৯৭)	1795	মনকে বশ করার কয়েকটি উপায় ও আনন্দের তরঙ্গ
(৯৮)	1784	প্রেমভক্তিপ্রকাশ, ধ্যানাবস্থায় প্রভুর সঙ্গে বার্তালাপ
(৯৯)	1797	স্তবমালা
(১০০)	1835	সত্যনিষ্ঠ সাহসী বালক-বালিকাদের কথা
(১০১)	1834	শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল) ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম
(১০২)	1839	কৃত্তিবাসী রামায়ণ
(১০৩)	1838	জীবন যাপনের শৈলী
(১০৪)	1853	আমাদের লক্ষ্য ও কর্তব্য
(১০৬)	1854	ভাগবত রত্নাবলী
(১০৬)	1920	আহার নিরামিষ না আমিষ ? সিদ্ধান্ত নিজেই নিন
(১০৭)	1946	রামায়ণ মহাভারতের কতিপয় আদর্শ চরিত্র
(১০৮)	1948	এর নাম কি উন্নতি, না ধ্বংস ?—একটু ভেবে দেখুন

গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুরের রেলওয়ে স্টেশন স্টল

৭. ধানবাদ প্ল্যাটফর্ম নং— ২-৩

৮. নিউ দিল্লি প্ল্যাটফর্ম নং— ১২-১৩

৯. দিল্লি প্ল্যাটফর্ম নং— ১২

১০. হজরত নিজামুদ্দিন প্ল্যাটফর্ম —৪-৫

১১. কানপুর প্ল্যাটফর্ম নং —১

১২. আমেদাবাদ প্ল্যাটফর্ম নং —২-৩

১৩. ইন্দোর প্ল্যাটফর্ম নং —৫

১৪. বরোদা প্ল্যাটফর্ম নং —৪-৫

১৫. ব্যাঙ্গালোর প্ল্যাটফর্ম নং —১

১৬. যশবন্তপুর (কর্ণাটক) প্ল্যাটফর্ম নং —৬

১৭. রাজকোট প্ল্যাটফর্ম নং —১

১৮. সেকেন্দ্রাবাদ প্ল্যাটফর্ম নং —১

১৯. মোগলসরাই প্ল্যাটফর্ম নং — ৩-৪

২০. হরিদ্বার প্ল্যাটফর্ম নং —১

২১. পাটনা—(প্রধান প্রবেশপথের কাছে)

২২. বিকানীর প্ল্যাটফর্ম নং —১

২৩. ঔরঙ্গাবাদ প্ল্যাটফর্ম নং —১

২৪. বেনারস প্ল্যাটফর্ম নং — ৪-৫

২৫. কোটা (রাজস্থান) প্ল্যাটফর্ম নং —১

২৬. লখনৌ (N. E. Rly)

২৭. গোরক্ষপুর প্ল্যাটফর্ম নং—১

২৮. রাঁচী প্ল্যাটফর্ম নং—১

২৯. মজঃফরপুর প্ল্যাটফর্ম নং —১

৩০. গুয়াহাটি প্ল্যাটফর্ম নং —১

৩১. ভুবনেশ্বর—প্ল্যাটফর্ম নং —১

৩২. কটক প্ল্যাটফর্ম নং —১

৩৩. সমস্তীপুর প্ল্যাটফর্ম নং —২

৩৪. রায়পুর (ছত্তিসগড়) —১

৩৫. জামনগর প্ল্যাটফর্ম নং —১

৩৬. ভারুচ প্ল্যাটফর্ম নং —৪-৫

৩৭. শ্রী সত্যসাইঁ প্রশান্তি নিলয়ম্ —১

৩৮. হুবলী (কর্ণাটক) —১-২

৩৯. ছাপরা (বিহার) প্ল্যাটফর্ম নং —১

৪০. বিজয়ওয়াড়া প্ল্যাটফর্ম নং —৬

———o———